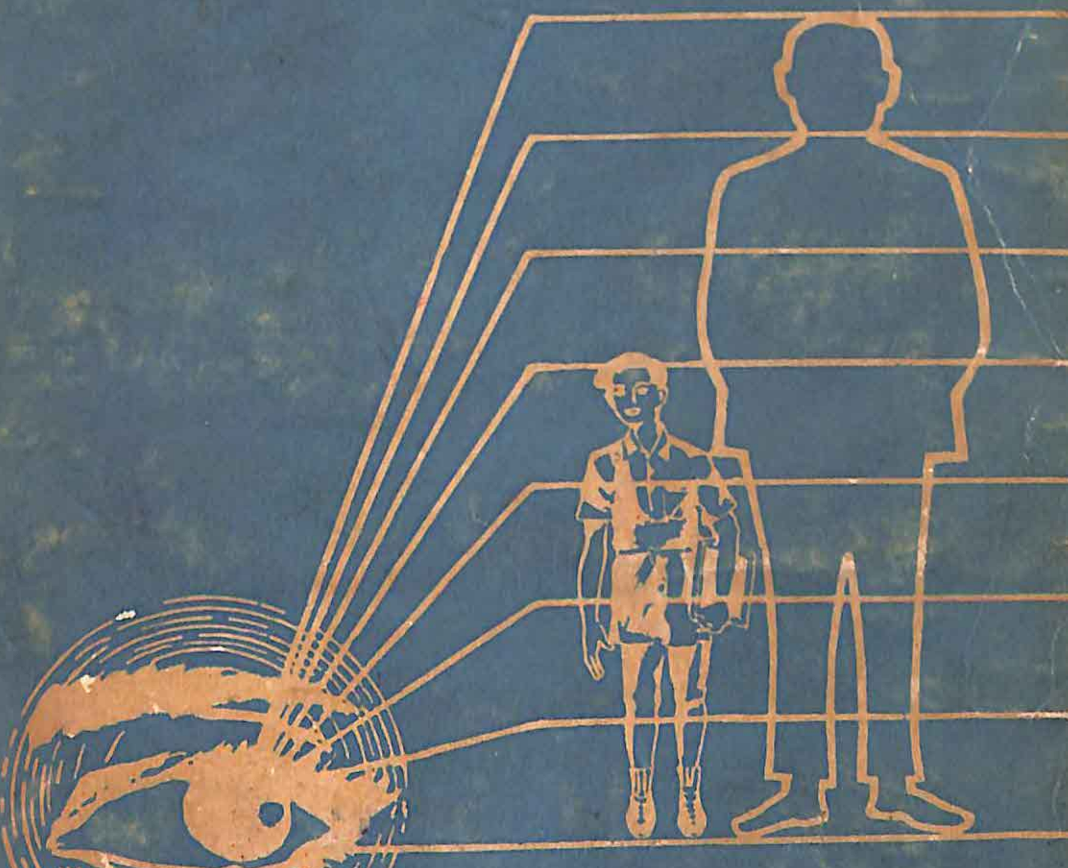
শিক্ষা-মনোবিদ্যা



সুশীল রায়

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে বি. এ (শিক্ষা-বিজ্ঞান), বি. এড., বি. টি পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যার (Educational Psychology) পাঠ্যপুস্তক।

শিক্ষা-মনোবিদ্যা

[EDUCATIONAL PSYCHOLOGY]

সুশীল রায় এম. এস. সি., বি. টি.
আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজ, জলপাইগুড়ি

পরিবেশক

স্বরাজ ভাণ্ডার
১২৭ এ. এস. পি. মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

সঞ্চয়
৩০।১ বি কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা—
এডুকেশনাল বুক করপোরেশনের পক্ষে,
শ্রীমতী শোভারাণী চক্রবর্তী
১২৭ এ, এস. পি, মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

॥ প্রথম সংস্করণ ॥
রথযাত্রা
২৮শে আষাঢ়, ১৩৭৯

॥ মূল্য—আঠার টাকা ॥

প্রচ্ছদ : হরেন কর্মকার

মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬।
শ্যামা প্রেস,
কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা।
বর্দ্ধন প্রেস,
কাশীঘোষ লেন
কলিকাতা,
সুকল্যাণী প্রেস
কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা।

ভূমিকা

নতুন কিছু বিষয় নয়; তাই ভূমিকা লেখার কোন অবকাশ আছে বলে মনে করি না। বাংলা ভাষায় শিক্ষা-মনোবিদ্যার অনেক ভাল বই আছে। তাদের তুলনায় নতুন কিছু প্রচেষ্টাও নয়। আলোচনার বিষয়বস্তুও গতানুগতিক। বি.এ. (শিক্ষা বিজ্ঞান), বি. এড্ ও বিটি'র পাঠ্যসূচীর সীমা রেখার মধ্যে আবদ্ধ। নতুন বিষয়বস্তু অবাঞ্ছিত; অতিরিক্ত পাঠের আশা বর্তমানে কল্পনাবিলাস। তাই ভূমিকাও নিয়মিত ছকে বাঁধা।

*　　　*　　　*　　　*

বিশেষ কারো উপকার করবো বলে লিখি নি। না শিক্ষার্থীদের, না সহকর্মীদের, না সমাজের, না আমার নিজের তাগিদ! সেও না অন্তরের, না বাইরের। তবে নেশা হ'তে পারে।

*　　　*　　　*　　　*

ঘোর কেটে যেতে দেখি একটা সাধারণ পাঠ্য পুস্তক। অতি সাধারণ। বক্তব্য আমার কাছে পরিষ্কার। আপনার কাছে (?)। বিষয়বস্তুর শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে নিম্নাকারে।

মানস জীবনের জৈবিক আধার ● প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের কৌশল সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ শিক্ষা ও মনোবিদ্যা ● শিশুর জন্মগত প্রবণতা ও ক্রিয়া ● মানব জীবনের বিকাশ ● মানব জীবন বিকাশের কৌশল ● শিক্ষণ সহায়ক মানসিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা ● ব্যক্তি-জীবনের পরিবর্তিত রূপ ● শিক্ষা মনোবিদ্যা ও শিক্ষকের সমস্যা।

*　　　*　　　*　　　*

এই টুকুই মাত্র বইয়ের পরিচিতি। ভাল লাগার মত কিছু নেই। তবু যদি ভাল লাগে কৃতার্থ বোধ করবো।

*　　　*　　　*　　　*

ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক আছে। তার জন্য ক্ষমা চাইছি না। জানি সকলে সহনশীল। সংশোধনে সাহায্য পেলে ঋণী থাকবো।

*　　　*　　　*　　　*

কৃতজ্ঞতা আমার সকলের কাছে। সকল মানুষের কাছে, জগতের কাছে। অবশ্য আমার দৃষ্টি দ্বারা যা সীমিত।

আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজ
জলপাইগুড়ি
জুনের ছয়, ১৯৭২

—সুশীল রায়

প্রথম পর্ব

মানস জীবনের জৈবিক আধার
[Physical basis of Mental life]

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের কৌশল ঃ সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ
[Primary Processes of Experience : Sensation & Perception]

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

মানব জীবনের বিকাশ

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষা ও মনোবিদ্যা

[Education and Psychology]

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

জন্মগত প্রবণতা ও ক্রিয়া

[Innate Tendencies & Actions]

অষ্টম অধ্যায়

P65

দ্বিতীয় পর্ব

মানব জীবনের বিকাশের কৌশল

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

শিখন সহায়ক মানসিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পর্ব

মানস জীবনের জৈবিক আধার

[Physical basis of Mental life]

দেহ ও মনের মধ্যে একটা অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমরা বলি—"শরীরটা ভাল লাগছে না তাই পড়ায় মন বসছে না।" শরীর সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে; শরীর খারাপ থাকলে মনটাও খারাপ লাগে। যারা দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে, তাদের মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়। অপর পক্ষে, আমরা দেখতে পাই, হঠাৎ কোন মানসিক আঘাত পেলে, অনেকে অজ্ঞান (senseless) হ'য়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেও প্রমাণিত হ'য়েছে, বিশেষ-মানসিক অবস্থা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহ যন্ত্রের কাজেরও তারতম্য হয়। যেমন প্রক্ষোভের (emotion) সময় বিভিন্ন রকম দৈহিক পরিবর্তন হয়, রাগ করলে, চোখদুটো লাল হ'য়ে যায়; ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে; হাত পায়ের নাড়াচাড়া বেড়ে যায়, গলার স্বর জোর হয়, ইত্যাদি আরও নানা রকম দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়। সুতরাং, সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে মনোবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ার (Mental process) সঙ্গে একটা করে বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়া জড়িত আছে। অর্থাৎ, যে কোন ভৌত ঘটনা (Physical event) যা শরীরের উপর ক্রিয়া করে, তা মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তাই শরীরতত্ত্বের আলোচনা মনোবিদ্যার পক্ষে অপরিহার্য।

উপসংহার—নানা রকম দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেহ-মনের সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হ'লেও এই সম্পর্কের যে আসল প্রকৃতি কি, তা' নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে এবং দার্শনিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যেমন পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ, সমান্তরবাদ ইত্যাদি। কিন্তু দেহ মনের সম্পর্ককে যেমন পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা বুঝান যায় না তেমনি সমান্তরবাদ দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু, দেহ মনের মধ্যে যে একটা নিগুঢ় সম্পর্ক আছে, তাকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে একথাও ঠিক মানসিক পরিবর্তনকে শুধুমাত্র দৈহিক পরিবর্তন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের জীবন উদ্দেশ্যমুখী। তার বিভিন্ন আচরণও উদ্দেশ্যমুখী। পরিবেশের সাথে সার্থক অভিযোজনের মাধ্যমেই জীবনের সফলতার পথে তার অগ্রগতি। দেহকে সে এই কাজে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃত পক্ষে দেহ ও মনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দৈহিক প্রক্রিয়া মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার মনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহকে কাজে লাগাতে পারে। তাই তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য অযথা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ নেই। ও নিয়ে দার্শনিকগণ মাথা ঘামাবেন। **মনোবিদ্ রস্** (Ross) এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একই মন্তব্য করেছেন।[1] কিন্তু তাই বলে শিক্ষা মনোবিদ্যায় (Educational Psychology) বা মনোবিদ্যার অন্য যে কোন শাখায়, এর আলোচনাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারি না। যেহেতু মানুষের আচরণকে দেহ এবং মন উভয়ে প্রভাবিত করে, সেহেতু এটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা আলোচনা করলে, সেই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই দেহযন্ত্রের যে সব অংশ বিশেষভাবে আমাদের আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাদের সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে। মনোবিদ্‌গণ তাদের আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানসিক প্রক্রিয়ার বা অবস্থার সঠিক সংব্যাখ্যান দেওয়ার জন্য দেহযন্ত্রের যে অংশগুলোর সাহায্য নিয়েছেন, তা হ'ল—**স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous System) এবং **গ্রন্থিতন্ত্রের** (Glandular System)। সুতরাং এই অধ্যায়ে আমরা এই দুই তন্ত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

---

1. "All such speculation as to the nature of body and mind and their connection with one another are of profound interest and importance to the student of Philosophy, but the educational Psychologist may, with a good conscience leave them to his leisure moments."—Educational Psychology : —J. Ross.

প্রথম অধ্যায়

স্নায়ুতন্ত্র

[NERVOUS SYSTEM]

পথে সাপ দেখলে আমরা দূরে সরে যাই ; কোন পরিচিত বন্ধুকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে আমরা ডাক দিই ; উড়োজাহাজের শব্দ শুনলে আমরা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি ; কোন খাদ্য বস্তু আমাদের সামনে রাখলে মুখে জল আসে ; রাস্তায় চলতে চলতে কোন ভাল গন্ধ পেলে, তার উৎস খুঁজে বেড়াই। এই যে কাজগুলো করি এর সব কিছুর মূলে হ'ল আমাদের স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)। এই স্নায়ুতন্ত্রই হ'ল আমাদের সব অভিজ্ঞতা (experience), প্রতিক্রিয়া (response) এবং অনুভূতির

সূচনা (feeling) মূল। কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের অক্ষিপটে (Retina) পড়লেই আমরা দেখতে পাই না। দৃষ্টির অনুভূতি হয় অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত চক্ষুস্নায়ু (Optic nerve) দ্বারা। আমাদের দেহের মধ্যে তিন ধরনের যন্ত্র আছে। কতকগুলো বাইরের জগত থেকে উত্তেজনা গ্রহণ করে। সাধারণভাবে এদের আমরা **ইন্দ্রিয়** (sense organ) বলি। কিন্তু ইন্দ্রিয় কথাটা খুব সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বৈজ্ঞানিকগণ এর সাধারণ নাম দিয়েছেন **সংগ্রাহক যন্ত্র** (Receptor organ)। কিন্তু শুধুমাত্র উত্তেজনা গ্রহণ করলেই চলবে না সেই অনুযায়ী কাজও করতে হবে। এই উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া করার দায়িত্ব সংগ্রাহকের নয়। দেহের মধ্যে যে সব যন্ত্র এই কাজ করে তাদের প্রচলিত কথায় বলা হয় **কর্মেন্দ্রিয়**। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদের বলা হয় **চালক যন্ত্র** (Effector organ বা, Motor Organ)। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পেশী ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই দুই দেহ যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কে? কারণ প্রতিক্রিয়া (Response) এবং উদ্দীপনার (Stimulation) মধ্যে একটা সুসামঞ্জস সম্পর্ক সব সময়ে বর্তমান। এর পেছনেই কাজ করছে **স্নায়ু** (Nerve)। এই স্নায়ু, দেহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় জালের মত ছড়িয়ে থেকে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করছে। আমাদের দেহের মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে সূক্ষ্ম সূতার মত এক ধরনের পদার্থ। এদেরই আমরা স্নায়ু (Nerve) বলে থাকি।

মাথার খুলির (Skull) মধ্যে অবস্থিত মস্তিষ্ক (Brain), মেরুদণ্ডের (Spine) মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) এবং এই দুই প্রধান অংশ থেকে যে সব শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে, তাদের একত্রে বলা হয় **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous System)। কার্যকারিতা আর জৈবিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা স্নায়ুতন্ত্রকে (Nervous System) প্রধান তিনটে অংশে ভাগ করতে পারি। তবে অংশ মানে তাদের মধ্যে ফাঁক আছে তা নয়। শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য এই সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন তন্ত্রের কিছুটা করে অংশ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা ক'রব। এই অংশগুলো হ'ল—

স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

॥ এক ॥ **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Central Nervous System)।
॥ দুই ॥ **উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র** (Peripheral Nervous System)।
॥ তিন ॥ **স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র** (Autonomic Nervous System)।

॥ এক ॥ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System) :—

আগেই বলেছি স্নায়ুতন্ত্র বলতে আমরা মস্তিষ্ক আর সুষুম্নাকাণ্ড এবং তাদের থেকে উদ্ভূত শাখা-প্রশাখাকে বুঝি। এখানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলতে আমরা শুধুমাত্র মস্তিষ্ক (Brain) আর সুষুম্নাকাণ্ডকেই বুঝি। অর্থাৎ, এখানে আমরা তাদের কোন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রব না। সুতরাং শুধুমাত্র মস্তিষ্ক (Brain) আর সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ গঠিত তাকেই বলছি—**কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Central Nervous system)। কেবলমাত্র মস্তিষ্ক আর সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা গঠিত ব'লে এর আর এক নাম হ'ল **সেরিব্রো-স্পাইনাল অ্যাক্সিস্** (Cerebro-Spinal axis)। এখন আমরা এই স্নায়ুতন্ত্রের দু'টো প্রধানঅংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে আলোচনা ক'রব।

॥ ১ ॥ মস্তিষ্ক [Brain] :—

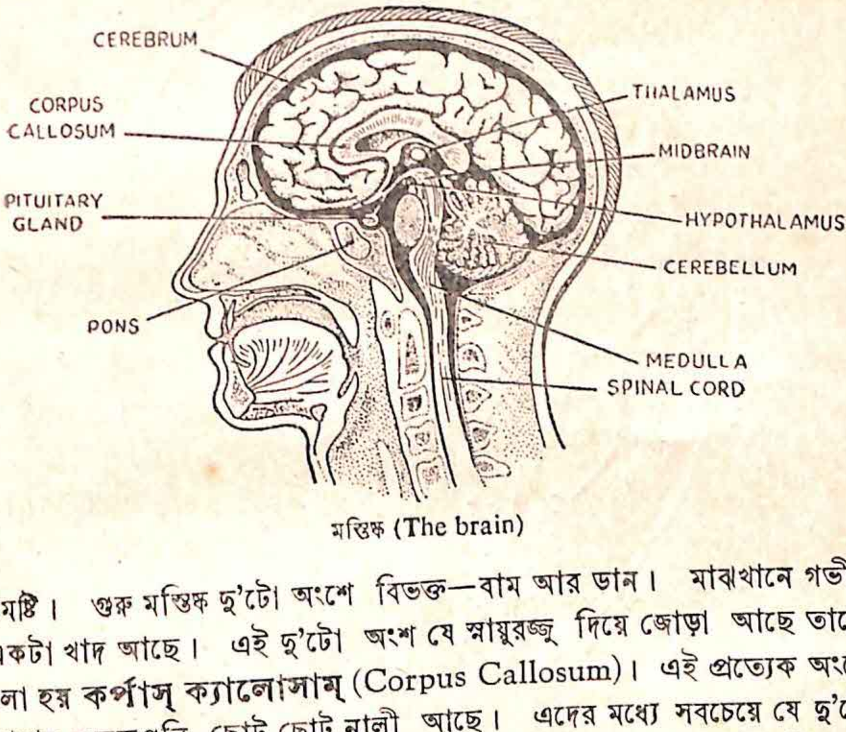
স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হ'ল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হ'ল বিচার, বুদ্ধি ও ইচ্ছা-শক্তির কেন্দ্র। এক কথায়, মস্তিষ্ক সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়ার উৎস। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড। বিশেষ বিশেষ কার্যক্ষমতা অনুযায়ী আমরা মস্তিষ্ককে চারটে অংশে ভাগ করতে পারি : (ক) **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum), (খ) **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum), (গ) **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid Brain), (ঘ) **সুষুম্নাশীর্ষ** (Medulla Oblongata)।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

(ক) **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum): মাথার উপরে সামনের দিকের বৃহত্তর অংশের নাম গুরুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের প্রায় $\frac{9}{10}$ অংশ। এর উপরটা ধূসর রঙের স্নায়ুকোষ (Nerve cell) দিয়ে তৈরী। এর উপরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁজ আছে এখানে অসংখ্য স্নায়ু ও ধমনী

গুরু মস্তিষ্কের অংশ

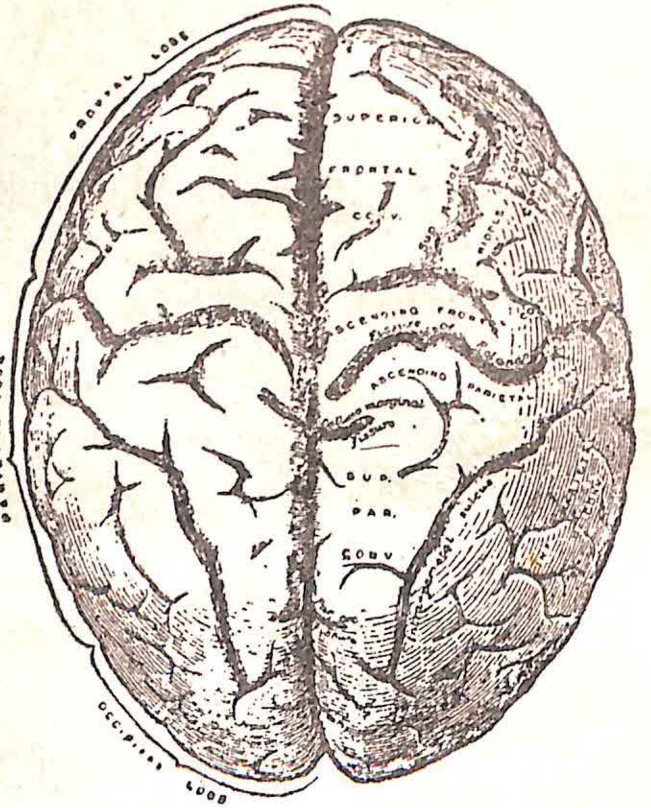
এসে মিলিত হয়েছে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের ধূসর অংশের উপর ভাঁজ তত বেশী। এই ধূসর অংশকে বলা হয় **কর্টেক্স** (Cortex)। এর নীচের বা ভেতরের অংশ একেবারে সাদা, এই অংশটা স্নায়ুকোষ থেকে উদ্ভূত শাখার



মস্তিষ্ক (The brain)

সমষ্টি। গুরু মস্তিষ্ক দু'টো অংশে বিভক্ত—বাম আর ডান। মাঝখানে গভীর একটা খাদ আছে। এই দু'টো অংশ যে স্নায়ুরজ্জু দিয়ে জোড়া আছে তাকে বলা হয় **কর্পাস্ ক্যালোসাম্** (Corpus Callosum)। এই প্রত্যেক অংশে আবার কতকগুলি ছোট ছোট নালী আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে দু'টো বড় তাদের নাম হ'ল—**রোলেণ্ডো** (Rolando) আর **সিলভিয়াস** (Sylvius)। এই সুষুম্নানালী গুরুমস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশকে চারটে অংশে ভাগ করেছে। এরই এক একটা অংশকে বলা হয় পিণ্ড (Lobe)। এই চারটে পিণ্ড (Lobe) হ'ল—**সম্মুখ** (Frontal lobe), **মধ্য** (Perietal lobe), **পশ্চাৎ** (Occipital lobe) আর **নিম্ন** (Temporal lobe)। গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুই অংশের বিশেষ বিশেষ স্থান আমাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের কাজ চালনা করে। দর্শন (Vision), শ্রবণ (Hearing), গন্ধ (Smell), স্বাদ (Taste) প্রভৃতি কাজের জন্য আমাদের মস্তিষ্কের উভয় দিকেই

বিশেষ বিশেষ জায়গা আছে। এই স্থানবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে আলাদা ভাবেই ক'রব। কারণ সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে জানার পরই এটা বুঝতে সুবিধা হবে। কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে আমাদের দেহের ডান অঙ্গগুলো সব গুরুমস্তিষ্কের বাম ভাগের অধীন আর বাম অঙ্গগুলো ডানভাগের অধীন। আবার বাক্‌শক্তির কেন্দ্র মাত্র একটা এবং সেটা বামভাগেই থাকে।



গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন পিণ্ড ও উহার মধ্যেকার খাঁজ Lobes of the Brain, convolutions & ulci (after Lickly—The Nervous system)

কোন বস্তু চোখের সামনে এলে তার ছবি গিয়ে অক্ষিপটে (Retina) পড়ে এবং তখন চক্ষুস্নায়ুর ক্রিয়া কতকটা উত্তেজনা গিয়ে আমাদের গুরুমস্তিষ্কের যে অংশটা দৃষ্টিশক্তির অনুভূতির কেন্দ্র সেখানে কাজ করে। ফলে আমরা বস্তুটা দেখতে পাই। আবার কানের পর্দায় শব্দতরঙ্গ এসে পৌছালে ঐ পর্দা কাঁপতে থাকে। তখন ঐ উত্তেজনা বিশেষ স্নায়ুমণ্ডলী (Auditory Nerve) দ্বারা গুরুমস্তিষ্কে যায়, তবেই আমরা শুনতে পাই। সারা জীবন ধরে যা শিখি তার স্মৃতিও আমাদের গুরুমস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশে থাকে। কোন কারণে সেই

অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে আমরা স্মৃতিভ্রষ্ট হই। আবার গুরুমস্তিষ্কের ডান দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে বাম অংশগুলো অকেজো হয়ে যায় আর বাম দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে ডান অংশগুলো অকেজো হয়ে যায়। একেই বলা হয় পক্ষাঘাত।

(খ) **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum): লঘুমস্তিষ্ক থাকে গুরুমস্তিষ্কের পেছনে এবং নীচে। সাদা স্নায়ুকলাকে (Nerve tissue) আবৃত করে ধূসর রঙের স্নায়ুকোষ (Nerve cell) আছে। এরও দু'টো অংশ আছে। গুরুমস্তিষ্কের দু'টো অংশ যেমন একটা স্নায়ুরজ্জু দ্বারা জোড়া থাকে ঠিক তেমনি লঘুমস্তিষ্কের দু'টো অংশও একটা মোটা স্নায়ু তন্তুদ্বার সংযুক্ত থাকে। এই স্নায়ুতন্তুকে বলা হয় **পনস্ ভেরোলি** (Pons varolli)।

লঘুমস্তিষ্কের অংশ

(গ) **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid Brain, Basal ganglion, Interbrain):— এটা গুরুমস্তিষ্ক আর লঘুমস্তিষ্কের মাঝখানে আছে এবং এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে। এর সামনের দিকে একটা প্রধান কেন্দ্র হ'ল **থ্যালেমাস** (Thalamus) আর তার ঠিক নীচে আছে **হাইপোথ্যালেমাস** (Hypothalamus)।

মধ্যমস্তিষ্কের অংশ

(ঘ) **সুষুম্নাশীর্ষ** (Medulla Oblongata):—মস্তিষ্কের একেবারে পেছনের দিকে সুষুম্নাশীর্ষ থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) উপরের দিকটার স্ফীত অংশ। মস্তিষ্কের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের যোগ স্থাপন করাই হ'ল এর কাজ। এটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। এই সুষুম্নাশীর্ষকেই আমাদের গুরুমস্তিষ্কের দু'টো অংশ থেকে আগত স্নায়ুরজ্জুগুলো পরস্পরকে ছেদ করে শরীরের বিপরীত দিকে চলে যায়।

সুষুম্নাশীর্ষ

॥ ২ ॥ **সুষুম্নাকাণ্ড** [Sipnal Cord]:—

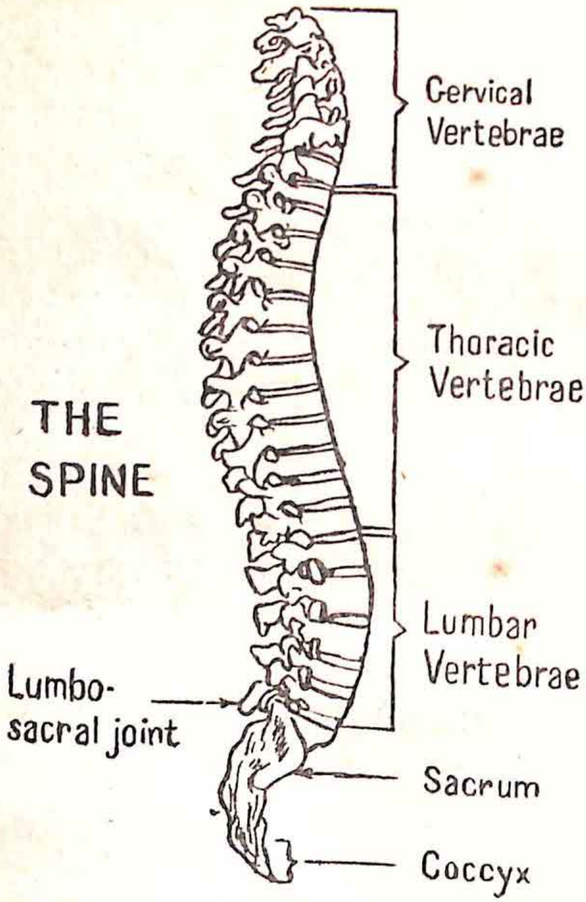
যে স্নায়ুগুচ্ছ মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ডের মাঝখানে সুষুম্নাপথে নেমে আসে তাকে বলা হয় সুষুম্নাকাণ্ড। কেবলমাত্র করোটিকা (Skull) ছাড়া শরীরের আর সমস্ত অংশের স্নায়ুগুলো সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সুষুম্নাশীর্ষ থেকে কোমরের হাড় পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় আঠারো ইঞ্চি। এটা প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু। এই সুষুম্নাকাণ্ড থেকে একত্রিশ জোড়া স্নায়ু নারকেল বা খেজুর গাছের পাতার মত দু'দিকে ছড়িয়ে আছে।

সুষুম্না কাণ্ডের অংশ

॥ **দুই** ॥ **উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র** (Peripheral Nervous System):—

যে সব সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুগুলো আমাদের শরীরের বহিরংগগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশের সংযোগ স্থাপন করছে তাদের বলা হয় উপান্ত স্নায়ু

(Peripheral nerve)। এই সব উপান্ত স্নায়ুগুলোকে এক সঙ্গে বলা হয় **উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র** (Peripheral nervous system)। উৎপত্তি-স্থান অনুযায়ী এই স্নায়ুগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। [১] যে সব স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি মাথার খুলির মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে যায়, তাদের বলা হয় **করোটি স্নায়ু** (Cranial



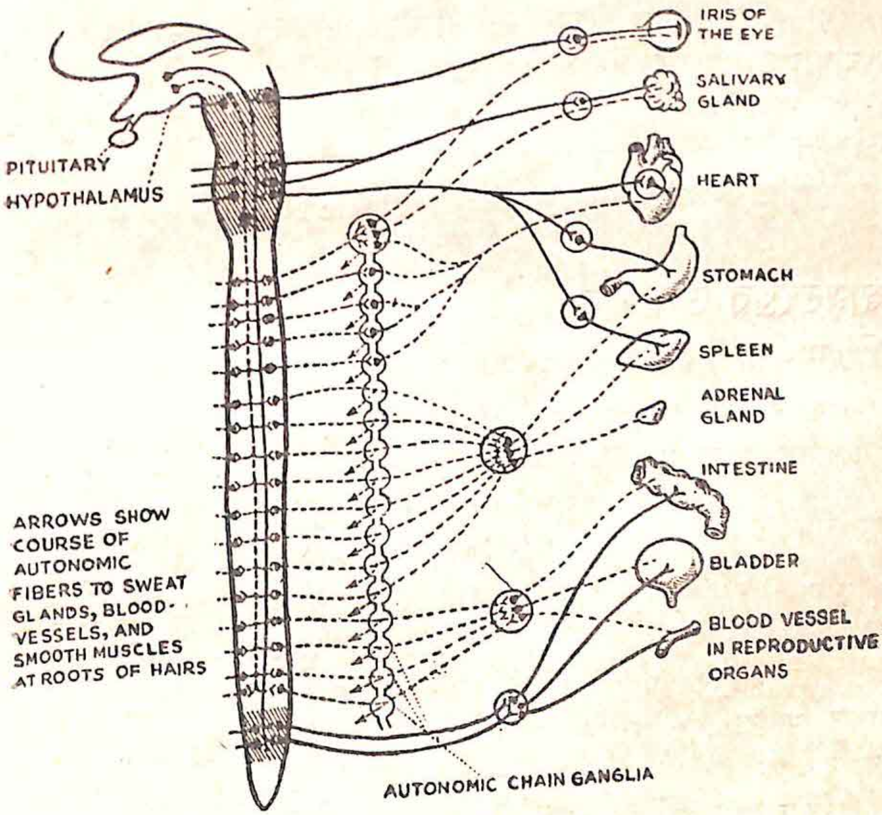
সুষুম্নাকাণ্ড (The Spinal cord)
(after Havemann—Reader's Digest, Oct., 1953)

nerves)। ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা ও কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই করোটি স্নায়ুগুলোর আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। নীচে এই রকম কয়েকটি করোটি স্নায়ু আর তাদের কাজের তালিকা দেওয়া হ'ল। এছাড়া আরও অনেক রকমের করোটি স্নায়ু আছে। তাদের বিষয়ে আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। [২] এই উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের অপর অংশের নাম **সুষুম্নাস্নায়ু** (Spinal nerve)। এগুলো সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়েছে, এই স্নায়ুগুলো হাত, পা, চামড়া প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যে একত্রিশ জোড়া স্নায়ুতন্তু

করোটি স্নায়ু (Cranial nerves)	কাজ (Functions)
১। গন্ধস্নায়ু (Olfactory Nerve)	১। গন্ধ (Smell)
২। চক্ষুস্নায়ু (Optic Nerve)	২। দর্শন (Vision)
৩। শ্রবণস্নায়ু (Auditory Nerve)	৩। শ্রবণ (Hearing)
৪। স্বাদের স্নায়ু (Gustatory Nerve)	৪। স্বাদ (Taste)
[ক] Facial nerve	[ক] জিহ্বার সামনের ⅔ অংশের স্বাদ
[খ] Glosopharyngeal nerve	[খ] জিহ্বার পেছনের ⅓ অংশের স্বাদ

বেরিয়েছে সেগুলোও এই সুষুম্নাস্নায়ুর ভেতর পড়ে। এদের আর এক নাম হ'ল দৈহিক স্নায়ু (Somatic nerve)।

॥ তিন ॥ **স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System) :—** কেন্দ্রীয় ও উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া আমাদের সুষুম্নাকাণ্ডের দু'পাশে কতকগুলো



স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous system
(After Munn—Psychology, Plate 10, p, 400, Harrap.)

স্নায়ুগ্রন্থি (Ganglia) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে পরস্পর যুক্ত থেকে একটা স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র গড়েছে (Autonomic Nervous system)। এই স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের আদেশাধীন নয়। শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী এরা স্বাধীনভাবে এদের কাজ চালিয়ে যায়। অর্থাৎ এদের কাজ সম্বন্ধে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। পাকস্থলী, অন্ত্র, হৃদযন্ত্রের স্নায়ুগুলো এর ভেতর পড়ে।

উপান্ত স্নায়ুর সঙ্গে এদের তফাত হ'ল এই যে এই স্নায়ুগুলো অন্তরংগে ছড়িয়ে থাকে আর উপান্ত স্নায়ুগুলো বহিরংগের সঙ্গে যুক্ত। একটা কথা মনে রাখার দরকার: উপান্ত এবং স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র এদের উভয়েরই উৎপত্তি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন না কোন অংশ থেকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড থেকে। উৎপত্তির স্থান অনুযায়ী এই স্নায়ুতন্ত্রকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি।

[ক] **উর্ধ্ব বিভাগ** (Upper division): যে সব স্নায়ুগুলো সুষুম্নাশীর্ষ আর মধ্য মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে তারা উর্ধ্ববিভাগের অন্তর্গত।

[খ] **মধ্যবিভাগ** (Middle division): এগুলো বেরিয়েছে সুষুম্না-কাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গা থেকে।

[গ] **নিম্নবিভাগ** (Lower division): নিম্নবিভাগের স্নায়ুগুলো সুষুম্নাকাণ্ডের একেবারে নীচের দিক থেকে বেরিয়েছে।

এর মধ্যে মধ্যবিভাগটিকে বলা হয় **সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্র** (Sympathetic Nervous system) আর বাকী দু'টোকে এক সঙ্গে বলা হয় **পরা-সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্র** (Para-sympathetic Nervous system)।

স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান
[Elements of the Nervous System] :—

এতক্ষণ আমরা স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এবারে বলব স্নায়ুতন্ত্রের উপাদানের কথা। অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র কি দিয়ে গঠিত।

স্নায়ুকোষ

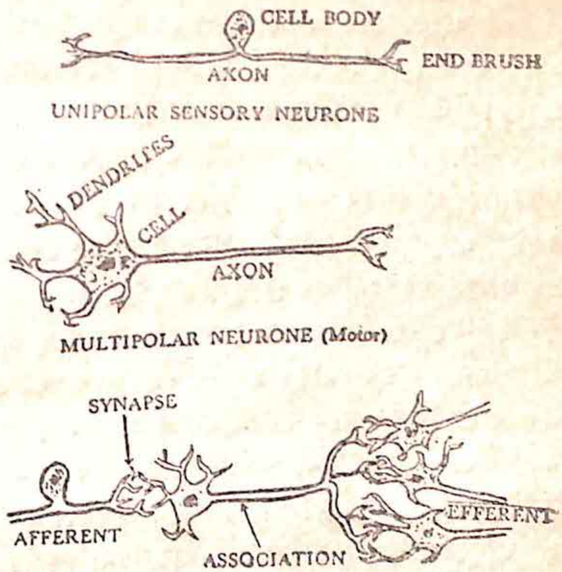
আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু (Nerve) ছোট ছোট স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরী। এই স্নায়ুকোষের (Nerve-cell বা Neurone) কথা আমরা আগেই অনেক জায়গায় শুনেছি। যে বিশেষ কোষ দ্বারা আমাদের স্নায়ুগুলো তৈরী তাকে বলা হয় **স্নায়ুকোষ** (Neurone)। প্রাণীজগতে মানুষের দেহের কোষ (cell) গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে জটিল। আবার মানবদেহের অন্যান্য কোষের চেয়ে স্নায়ুকোষের গঠন আরও জটিল। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শরীরে লক্ষ লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ থাকে।

প্রত্যেক স্নায়ুকোষের দু'টো অংশ আছে। সাধারণতঃ যে কোন ধরনের কোষেরই এই দু'টো অংশ থাকে—(ক) কোষের মূল অংশ বা নিউক্লিয়াস

(Nucleus)। আর একটা হ'ল (খ) এই স্নায়ুকোষের বাইরের কাঠামো বা দেওয়াল (Cell-wall)। স্নায়ুকোষের এই দেওয়াল থেকে চতুর্দিকে কতকগুলো সাদা রঙের তন্তু বেরিয়ে থাকে। এই তন্তুগুলো আবার দুই

স্নায়ুকোষের অংশ

ধরনের হয়। এদের কতকগুলোকে বলা হয় (ক) **অ্যাকস্‌ন** (Axon) আর কতকগুলোকে বলা হয় (খ) **ডেন্‌ড্রাইটস্‌** (Dendrites)। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটা অ্যাক্‌সন আর কতকগুলো ডেনড্রাইট্‌স থাকে। ঐ সাদা তন্তু-গুলোর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বড় তাকেই বলা হয় অ্যাকসন। এটা অনেক সময় পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। একটা পরিপুষ্ট অ্যাকসনকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের মধ্যে তিনটে সম-কেন্দ্রীক বৃত্তীয় অংশ আছে। একেবারে ভেতরে যে নরম জৈবিক অংশ আছে তাকে বলা হয় অ্যাক্সিল সিলিণ্ডর (Axil Cylinder)। এই অ্যাক্সিল সিলিণ্ডারকে (Axil cylinder) আবৃত করে পর পর দুটো সাদা নালী আছে। একেবারে বাইরের ঢাকনাটাকে বলা হয় প্রিমিটিভ সিদ্‌ (Primitive sheath) আর ভেতরেরটাকে বলা হয় মিডিউলারি সিদ্‌ (Medullary sheath)। এই অ্যাকসনের চেয়ে ছোট ছোট যে তন্তুগুলো তাদের বলা হয় **ডেনড্রাইটস্‌**। সাধারণতঃ স্নায়ুকোষের অ্যাকসনটাকেই বলা হয় **স্নায়ুতন্তু** (Nerve Fibre) আর এরকম কতকগুলো মিলেই হয় স্নায়ু (Nerve)। যেখানে কতকগুলো কোষদেহ (Cell body) মিলিত হয় তাকে বলে **স্নায়ুগ্রন্থি** (Ganglion)।



স্নায়ুকোষ (Synapse)

[উপরে বহুমুখী স্নায়ুকোষ বা চালক স্নায়ুকোষ : মধ্যে একমুখী স্নায়ুকোষ বা সংবেদক স্নায়ুকোষ : নীচে সংযোজক স্নায়ুকোষ।]

এখন যদিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটা করে অ্যাক্‌সন আর কতকগুলো ডেনড্রাইটস্‌ থাকে, তবুও অনেক সময়ে এর ব্যতিক্রম হয়। অর্থাৎ, এই গঠনের তারতম্য দেখা যায়। আর এই তফাত অনুযায়ী

আমরা স্নায়ুকোষকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) **বহুমেরু স্নায়ুকোষ** (Multipolar neurone)—এই সব স্নায়ুকোষে একটা করে অ্যাক্সন আর কতকগুলো করে ডেনড্রাইটস্ থাকে। অনেকগুলো করে শাখা-প্রশাখা থাকে বলে এদের বহুমেরু স্নায়ুকোষ বলা হয়। (২) **একমেরু স্নায়ুকোষ** (Unipolar neurone)—এই সব স্নায়ুকোষে বহু শাখা-প্রশাখা নেই, শুধু একটা মাত্র অ্যাক্সন, কোষদেহ (cell body) থেকে একটু দূরে গিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এই স্নায়ুকোষের অ্যাকসন্ বা ডেনড্রাইটস্-এর প্রান্তগুলো আবার ঘাসের ডগার মত ভাগ হ'য়ে বেরিয়ে থাকে। একে বলা হয় End brush বা **শেষ প্রান্ত**। এই সব বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুকোষের সমবায়ে স্নায়ু গঠিত হয়। একটা স্নায়ুকোষের সঙ্গে আর একটা স্নায়ুকোষ জুড়ে থাকে। এই জোড়া লাগার একটা বিশেষ নিয়ম আছে। একটা স্নায়ুকোষের অ্যাকসনের শেষ প্রান্ত আর একটা স্নায়ুকোষের একটা ডেনড্রাইটস্-এর শেষ প্রান্ত প্রায় স্পর্শ করে থাকে। এই সন্ধিস্থলকে বলা হয় **স্নায়ুসন্ধি** (Synapse)।

এ পর্যন্ত বলে আমরা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা শেষ ক'রব। এখন আলোচনা ক'রব স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের কাজ সম্বন্ধে—এক এক ক'রে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উপর স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের এর উপাদানের অর্থাৎ, বিভিন্ন স্নায়ুকোষের কাজ সম্বন্ধে জানা দরকার। সুতরাং স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান বা স্নায়ুকোষের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করার পর আমরা অন্যান্য অংশের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রব।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ
[Function of the Nervous System] :—

॥ এক ॥ **স্নায়ুকোষের কাজ** (Function of the neurone): সাধারণভাবে স্নায়ুকোষের কাজ হ'ল দু'রকম—একটা হ'ল **উত্তেজিত হওয়া** (Irritability) আর একটা হ'ল **পরিবহন করা** (Conductivity)। অর্থাৎ সামান্যতম উত্তেজক বস্তুর উপস্থিতিতে এই সব স্নায়ুকোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পৌঁছে দেয়। কোন শক্তি যখন স্নায়ুকোষের উপর ক্রিয়া করে, তখন তা চেতনা জাগায়, অর্থাৎ তার দেহের মধ্যে একটা সাড়া জাগে। এটাই হ'ল, স্নায়ুকোষের উত্তেজিত হওয়ার ধর্ম, এই উত্তেজনা-প্রবণতা যে কোন রকম কোষেরই ধর্ম। এখন কোন শক্তি

উত্তেজন ও পরিবহন ক্ষমতা

দ্বারা স্নায়ুকোষ উত্তেজিত হ'লে সে উত্তেজনা অ্যাকসনের মধ্যে দিয়ে অপর প্রান্তে (End brush) যায়, তারপর সেই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ডেনড্রাইটস্-এর মধ্য দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে। এইভাবে উত্তেজিত কোন সংবেদন স্থান (Sensory Region) বা কর্মস্থানে পৌঁছায়। স্নায়ুকোষের এই ধর্মকে বলা হয় পরিবহন-ক্ষমতা (Conductivity)।

এই দু'টো সাধারণ কাজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকোষ কতকগুলো বিশেষ ধরনের কাজ করে। যেমন—(i) কতকগুলো আছে যারা স্নায়বিক উত্তেজনাকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় থেকে সুষুম্নাকাণ্ডে বা মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। এদের বলা হয় **অন্তর্মুখী স্নায়ুকোষ** (Afferent neurone) বা **সংজ্ঞা স্নায়ুকোষ** (Sensory neurone)। সাধারণতঃ একমেরু (Unipolar) স্নায়ুকোষ এ কাজ করে। এই সব স্নায়ুকোষের কোষদেহ (Cell body) বাইরে থাকে, কিন্তু অ্যাকসনের দু'ভাগের এক ভাগ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, আর একটা ভাগ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশের সঙ্গে জুড়ে থাকে। (২) আর এক রকম স্নায়ুকোষ আছে, যাদের কাজ হ'ল স্নায়বিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইন্দ্রিয়ে বয়ে আনা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যকরী করা। এগুলো ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে আসে ব'লে এদের বলা হয় বহির্মুখী স্নায়ুকোষ (Efferent neurone) বা চালক স্নায়ুকোষ (Motor neurone)। এ কাজ সাধারণতঃ বহুমেরু স্নায়ুকোষ (Multipolar neurone) করে থাকে। (৩) এ দু'রকম স্নায়ুকোষ ছাড়া আরও এক ধরনের স্নায়ুকোষ আছে, তাদের কাজও ওদের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। সাধারণতঃ এক বিশেষ ধরনের বহুমেরু স্নায়ুকোষ এ কাজ করে। এই কাজ হ'ল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ুকোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু-কোষের কাজ

যে কোন রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা একবার সংজ্ঞা স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করলে তাকে চালক স্নায়ুকোষের মাধ্যমে ফিরে আসতে হবেই। এই হ'ল স্নায়ুকোষের ধর্ম।

এছাড়া স্নায়ুগ্রন্থিরও (Synapse) এক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এরা স্নায়বিক শক্তির যাতায়াতে বাধা দেয়। যদিও স্নায়ুকোষগুলো স্নায়ুগ্রন্থির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জুড়ে আছে তবুও বিভিন্ন ভাবে এটা স্নায়বিক শক্তি (Nerve current) পরিবহনে বাধা দেয়। এই বাধা বিভিন্ন পরিমাণে এবং বিভিন্ন নিয়ম অনুসারে হয়। এই বাধার জন্য উত্তেজনা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে চেতনা আসে না।

স্নায়ুসন্ধির কাজ

॥ দুই ॥ **স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ** (Function of the Different Parts of the N. S.) :—

উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Function of the peripheral system) : নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনা আগে হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে আমরা প্রথমে উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনা করছি, তার কারণ আসলে এই উপান্ত-স্নায়ুই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আর বাইরের জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। স্নায়ুকোষ যেমন দু'রকমের—সংজ্ঞা স্নায়ুকোষ আর চালক স্নায়ুকোষ, তেমনি স্নায়ুও ঠিক দু'রকমের। (১) **সংজ্ঞা স্নায়ু** (Sensory nerve), বা এর আর এক নাম হ'ল **অন্তর্মুখী স্নায়ু** (Afferent nerve)। এই সব স্নায়ুগুলো সংজ্ঞা স্নায়ুকোষের অ্যাকসন (Axon) দিয়ে তৈরী এবং এদের কাজ হ'ল বাইরে থেকে বা ইন্দ্রিয় থেকে খবর কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশে পৌছে দেওয়া। (২) আর এক রকম স্নায়ু আছে তাদের বলা হয় **চালক বা বহির্মুখী স্নায়ু** (Motor বা Efferent nerve)। এদের কাজ হ'ল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খবর নিয়ে যাওয়া। এগুলো চালক স্নায়ুকোষের অ্যাকসন দিয়ে তৈরী। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যে একত্রিশ জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে এদের মধ্যে দুরকম স্নায়ুই আছে। বহির্মুখী স্নায়ুগুলো (Efferent nerve) সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়ে পেটের দিকে এসে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন পেশীতে চলে গেছে। আর অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলো (Afferent nerve) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে এসে পিঠের দিক দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একটা উদাহরণ দিলে বহির্মুখী আর অন্তর্মুখী স্নায়ুর কাজ সহজে বুঝতে পারা যাবে।

বিভিন্ন স্নায়ুর কাজ

ধরা যাক পায়ে মশা কামড়াচ্ছে, এর অনুভূতি অন্তর্মুখী স্নায়ু দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কে পৌছাল। তখন মস্তিষ্ক চোখকে আদেশ করল দেখার জন্য। এই আদেশ এল চোখের সঙ্গে যুক্ত বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে। চোখে মশার দরুন যে উত্তেজনা, সেটা মস্তিষ্কে যখন গেল অমনি বোঝা গেল মশা কামড়াচ্ছে। এখন মস্তিষ্ক আবার চালক স্নায়ুর মাধ্যমে কর্মেন্দ্রিয় বা হাতের পেশীতে উত্তেজনা পাঠাল, সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠল তাকে মারার জন্য। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলো নিজেরা কিছু কাজ করতে পারে না। তাদের কাজ হ'ল শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আদেশমত চলা, আর কোন রকম ভৌত পরিবর্তনের খবর তার কাছে পৌছে দেওয়া।

উদাহরণ

॥ তিন ॥ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ (Function of the different parts of the Central Nervous System) :—

মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক [Relation between Mind & Brain] : মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের

চেয়ে আমাদের মস্তিষ্কই (Brain) বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। এই সিদ্ধান্তে আসার পেছনে যে যুক্তিগুলো আছে—

॥ ১ ॥ শরীরের বিভিন্ন অংশের স্নায়ুগুলো সব মস্তিষ্কে গিয়ে মিশেছে। দেখা গেছে এই যোগাযোগের যে কোন অংশ নষ্ট হ'য়ে গেলে সেই অংশের অধীন শরীরের অন্য অংশগুলোও অকেজো হয়ে যায়। একে বলে পক্ষাঘাত। এর থেকে বোঝা যায় কোন বাইরের উত্তেজনা থেকে জ্ঞান পেতে হ'লে সেই উত্তেজনাকে মস্তিষ্ক দিয়ে আসতে হয়।

॥ ২ ॥ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে উত্তেজনা প্রয়োগ আর তার দরুন যে সংবেদন সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে একটা সময়ের পার্থক্য থাকে। এই যে সময়ের পার্থক্য এটাকে মনোবিদ্ ও শারীরবিজ্ঞানীগণ স্নায়ুবাহী সময় বলেন। অর্থাৎ, উত্তেজনার মস্তিষ্কে পৌছতে ঐ সময় লাগে।

॥ ৩ ॥ আমরা যখন খুব বেশী চিন্তা করি বা খুব বেশী আবেগের (Emotion) বশবর্তী হই, তখন আমাদের মস্তিষ্কের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এর থেকে বোঝা যায় আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা সম্বন্ধ আছে।

॥ ৪ ॥ আবার এরকমও দেখা গেছে মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল ঠিকমত না হ'লে মানসিক বিকৃতি হয়। অর্থাৎ চিন্তাশক্তি বিকৃত হয়। অনেক সময় রক্ত চলাচলের অভাবে আমাদের চেতনা থাকে না।

॥ ৫ ॥ হঠাৎ মস্তিষ্কে কোন আঘাত লাগলে আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি। তখন আমাদের মানসিক ক্রিয়া (Mental activities) কিছুই থাকে না।

॥ ৬ ॥ আবার এও দেখা গেছে বেশী চিন্তা করলে আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন (fatigued) হ'য়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাথা ধরে।

॥ ৭ ॥ কতকগুলো মানসিক রোগ, যেমন—Aphasia (কতকগুলো শব্দ শোনা যায় কিন্তু উচ্চারণ করা যায় না) মস্তিষ্কের আঘাতের সঙ্গে জড়িত।

॥ ৮ ॥ এও দেখা গেছে মানুষের বুদ্ধি মস্তিষ্কের ওজনের সঙ্গে সমানুপাতী।

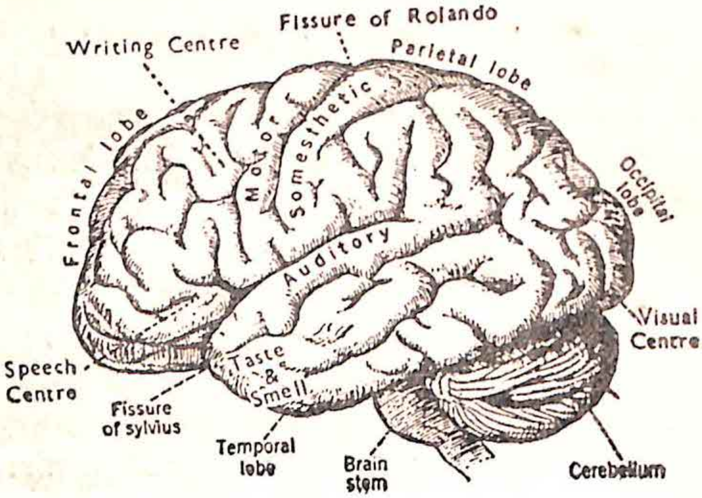
এই সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। তাই মনোবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

[ক] **গুরুমস্তিষ্কের কাজ : গুরুমস্তিষ্কের স্থানবিভাগের সূত্র** (The function of the Cerebrum : Theory of the localization of the functions in the Cerebrum) : গুরুমস্তিষ্কের কাজ হ'ল বিভিন্ন উত্তেজনায় সচেতনভাবে সাড়া দেওয়া। আগেই বলা হয়েছে গুরুমস্তিষ্কই হ'ল সমস্ত রকম উন্নত ধরনের মানসিক ক্রিয়ার উৎস। এখন গুরুমস্তিষ্ক কি ভাবে বিভিন্ন উত্তেজনায় সাড়া দেয় বা আরও ব্যক্তিগত (Subjective) দিক থেকে বলতে

গেলে কি ভাবে আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন উত্তেজনায় বিভিন্ন ভাবে সাড়া দিই সেই কথাই আলোচনা করব। গুরুমস্তিষ্কের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনায় বলা হয়েছে যে এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গের কাজ পরিচালনা করে।

স্থান বিভাগ

অর্থাৎ পৃথক পৃথক কাজের জন্য আমাদের গুরুমস্তিষ্কে পৃথক পৃথক অংশ নির্দিষ্ট আছে। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, কোন বিশেষ কাজের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক সামগ্রিকভাবে উত্তেজিত হয় না। শ্রবণের জন্য আমাদের গুরুমস্তিষ্কের যে অংশ কাজ করে দর্শনের বা



গুরুমস্তিষ্কের স্থানবিভাগ [Localization of the functions in the Cerebrum]

স্বাদের জন্য সে অংশ করে না। এই যে আমাদের গুরুমস্তিষ্কে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান আছে। একে বলা হয় Localization। কর্মক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা সাধারণভাবে এই অংশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

[১] **সংবেদন স্থান** (Sensory region), [৩] **কর্মস্থান** (Motor region), [৪] **সংযোগস্থান** (The region of association)।

সংবেদন স্থানগুলো (Sensory region) গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো আছে। গুরুমস্তিষ্কের মধ্যার্ধে (Parietal lobe) রোলাণ্ডো নালীর ঠিক

সংবেদন স্থান

ডাকদিকে এবং উত্তর কেন্দ্রীয় আবর্তের (Post-central gyrus) উপরের অংশে আছে স্পর্শ (Touch) ও পেশী (Muscle) বোধের কেন্দ্র। শ্রবণের কেন্দ্র (auditory region) আছে গুরু-মস্তিষ্কের নিম্ন অংশে (Temporal lobe) সিলভিয়াস নালীর (Fissure of sylvius) ডানদিকে। ঠিক এই প্রকোষ্ঠেই একেবারে নীচে আছে স্বাদ এবং

গন্ধের কেন্দ্র (Region for taste & smell)। বাকি দৃষ্টির কেন্দ্র আছে পশ্চাৎ অংশের (Occipital lobe) নীচের দিকে।

কর্মস্থানগুলো (Motor regions) আমাদের গুরুমস্তিষ্কের একেবারে সম্মুখ অংশে অবস্থিত (Frontal lobe)। রোলাণ্ডো নালীর বামদিকে, প্রাক্-কেন্দ্রীয় আবর্তের (Pre-central gyrus) মধ্যবর্তী অংশে মূল কর্মকেন্দ্র অবস্থিত; উপরের দিক থেকে নীচের বিভিন্ন অঙ্গের কেন্দ্রগুলো পর পর এইভাবে সাজানো আছে—পায়ের আঙ্গুল (Toe), পা (Foot), হাঁটু (Knee), জঙ্ঘা (Hip), হাত (Hand) ও মুখ (Mouth)। কথা বলবার কেন্দ্র (Speech centre) কর্মস্থানের একেবারে নীচের দিকে।

কর্মস্থান

গুরুমস্তিষ্কের অনেকগুলো স্থান আছে যাকে সংবেদন স্থান অথবা কর্মস্থান কোনটির ভিতরে ফেলা যায় না। এই সবগুলোকে সংযোগস্থান (Association region) বলা হয়। এই সব কেন্দ্র সম্বন্ধে শারীরবিজ্ঞানীগণ বিশেষ কিছু বলতে পারেন না; তবে শারীরবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে এই জায়গাগুলি আমাদের কর্মস্থান এবং সংবেদন স্থানের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার ফলে আমরা কোন উত্তেজনার (Stimulation) অর্থ খুঁজে পাই। তাই এদের বলা হয় সংযোগস্থান। এই সংযোগস্থানগুলোকে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়। প্রত্যেক সংবেদন স্থানের পাশেই যে সংযোগস্থান আছে, তারা সংবেদনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে আমাদের কাছে (gives meaning to our sensations)। এই সব কেন্দ্রগুলো নষ্ট হ'য়ে গেলে আমাদের সংবেদন হয়, কিন্তু তাদের বিশেষ বিশেষ যে অর্থ তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। অ্যাফেসিয়া (Aphesia) ব'লে একরকম অসুখ হয় তাতে দেখা গেছে রুগীরা, কেউ যদি কথা বলে তার শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে তার গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্র (Auditory region) ঠিক আছে, তবে ঐ শ্রবণকেন্দ্রের পাশে যে সংযোগকেন্দ্রটি আছে তা নষ্ট হয়ে গেছে যার জন্য সংবেদন ক্রিয়া বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সেই শব্দের কোন অর্থ সে করতে পারছে না।

সংযোগ স্থান

গুরুমস্তিষ্কে যে বিভিন্ন স্থানবিভাগ আছে তার প্রমাণ শারীরবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেছেন। কোন প্রাণীর মাথার খুলির বিশেষ একটা বিন্দুতে ফুটো ক'রে মস্তিষ্কের একটা স্থানে খুব দুর্বল তড়িৎশক্তি (Electric current) দিয়ে দেখা গেছে তাতে বিশেষ কোন অঙ্গ কাজ করে; আবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার ক'রে দেখা গেছে তার মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশ কাজ করছে না। এই মস্তিষ্কের স্থান নির্ণয়ের বেশীর ভাগ কাজ করেছেন ডেনিশ বিজ্ঞানী ল্যাসলে (Lashley)।

[খ] **লঘুমস্তিষ্কের কাজ** [Function of the Cerebellum]: লঘুমস্তিষ্ক আমাদের শরীরের পেশীগুলোকে সঠিকভাবে চালনা করে। এটা আমাদের শরীরের ভারসাম্য (balance) ঠিক রাখে। হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া প্রভৃতির সময় যে ভারসাম্যের (balance) প্রয়োজন হয়, লঘুমস্তিষ্ক সেই ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই লঘুমস্তিষ্ক নষ্ট হ'য়ে গেলে মানুষ দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না।

[গ] **মধ্যমস্তিষ্কের কাজ** [Function of the Mid Brain]: মধ্যমস্তিষ্কের কাজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এর মধ্য দিয়ে গুরুমস্তিষ্ক স্নায়বিক উত্তেজনা শরীরের অন্যান্য অংশে পাঠায়। তবে অনেকে বিশ্বাস করেন এখানে অবস্থিত থ্যালেমাস (Thalamus) ও হাই পোথ্যালেমাস (Hypothalamus) সুষুম্নাশীর্ষ (Medulla oblongata) আর স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) মধ্য দিয়ে আমাদের আবেগের সময় যে সব আন্ত্রিক পরিবর্তন (Visceral change) হয়, সেগুলো ঘটায়।

[ঘ] **সুষুম্নাশীর্ষের কাজ** [Function of the Medulla Oblongata]: মস্তিষ্কের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন করাই হ'ল এর কাজ। এখানে যদি কোন ক্ষতি হ'য়ে সমস্ত শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ বন্ধ হ'য়ে যায়, ফলে যে কোন রকমের অঘটনই ঘটতে পারে; এটা আমাদের শরীরের শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system), রক্ত সংবহন তন্ত্র (Circulatory system) ও পাচনতন্ত্রকে (Digestive system) নিয়ন্ত্রণ করে।

[ঙ] **সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ** [Function of the Spinal Cord]: সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ হ'ল উপান্ত স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে আগত উত্তেজনাকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া। এছাড়াও সুষুম্নাকাণ্ডের নিজেরও কিছু কাজ চালনা করার ক্ষমতা আছে। প্রতিক্রিয়াজনিত কর্মগুলো (Reflex action) সব এই সুষুম্নাকাণ্ডের পরিচালনাধীন। যেমন—হাত-পা নাড়া, ইত্যাদি। এছাড়াও অভ্যাসজনিত কিছু কর্মও (Habitual action) সুষুম্নাকাণ্ড পরিচালনা করে। যেমন—হাঁটা, দৌড়ান ইত্যাদি। এই সব কাজগুলো স্বতশ্চল (automatic) হয়; এই সব কাজ করার জন্য কোন রকম মানসিক প্রস্তুতির বা চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

॥ চার ॥ **স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের কাজ [Function of the Autonomic Nervous System]**: স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা রেখেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আমাদের দেহের স্বতশ্চল যে সব প্রক্রিয়া আছে (পাচন, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন) তাদের কার্য চালনা করে। এটা বিশেষ করে আমাদের আবেগময় অবস্থায় কাজ করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার

দ্বারা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে এই স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের তিনটে অংশ আলাদা আলাদা কাজ করে।

॥ ১ ॥ **ঊর্ধ্ব বিভাগ** (Upper division) আমাদের পাচনতন্ত্রের কাজের সাহায্য করে। আবার হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন কমিয়ে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীর কাজকে ব্যাহত করে।

॥ ২ ॥ **মধ্যবিভাগের** (Middle division) কাজ কিন্তু ঠিক উল্টো। এটা আমাদের পাচনতন্ত্রের কাজকে ব্যাহত করে কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন বাড়িয়ে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই বিভাগটিকে বলা হয় সহানুভূতিশীল বিভাগ। এই বিভাগ আমাদের আবেগময় অবস্থায় বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

॥ ৩ ॥ **নিম্নবিভাগ** (Lower division) আমাদের জনন-গ্রন্থিকে কার্যকরী রাখে।

একত্রে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ

[The Function of the Nervous system as a whole] :—

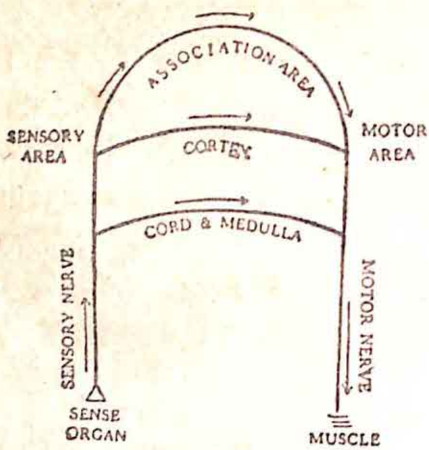
পূর্বেই আমরা আলাদা আলাদা ভাবে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের আর বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সুতরাং আবার তাদের কাজ সম্বন্ধে একত্রে আলোচনা করায় কোন প্রয়োজন থাকা উচিত নয়। তা'হলেও, আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের সঙ্গে আমরা এইসব খণ্ড কাজগুলোকে যাতে গুলিয়ে না ফেলি তার জন্য একবার এই সব কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কাজে আমাদের কি ধরনের স্নায়বিক ক্রিয়া হয় তাও আলোচনা করব।

সূচনা

আমরা বেঁচে আছি প্রকৃতির (Nature) সঙ্গে লড়াই করে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। কোন শক্ত জিনিস চোখের সামনে এলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু চিন্তা করার আগেই চোখ বন্ধ করে দিই, আবার বিপদে পড়লে ঠিক বিচার-বিবেচনা করে কি করা উচিত তাই করি। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব সাধারণ অবিবেচনাপূর্ণ কাজ থেকে শুরু করে উচ্চমানসিক ক্রিয়াসম্পন্ন সব রকমের কাজই করি। এই সমস্ত কাজ করায় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র, এ কথা আমরা আগেও বলেছি। এখন যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব সময় বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে সেহেতু সব সময় এগুলো উত্তেজনা গ্রহণ করছে। এই উত্তেজনা উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞাস্নায়ু দিয়ে গিয়ে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আবার উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের চালকস্নায়ু দিয়ে

চাপ

কর্মেন্দ্রিয়ে বা পেশীতে ফিরে আসে। এর ফলেই আমাদের বিশেষ উত্তেজনা বা বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ উত্তেজনা সংগ্রাহক (Receptor) বা কোন ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে যে পথ দিয়ে ঘুরে কর্মেন্দ্রিয়ে (Effector) যায় সেই সমস্ত পথটাকে বলে **চাপ** (Arc বা Circuit)। উত্তেজনা যখন যে পথ দিয়ে ঘুরে কর্মেন্দ্রিয়ে আসবে সেই মত এই চাপ ছোট-বড় হবে। আবার এই চাপের দৈর্ঘ্যের উপরই কাজের প্রকৃতি নির্ভর করে। চাপের দৈর্ঘ্য হিসেবে আমরা কাজ বা ঐ চাপকেই তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

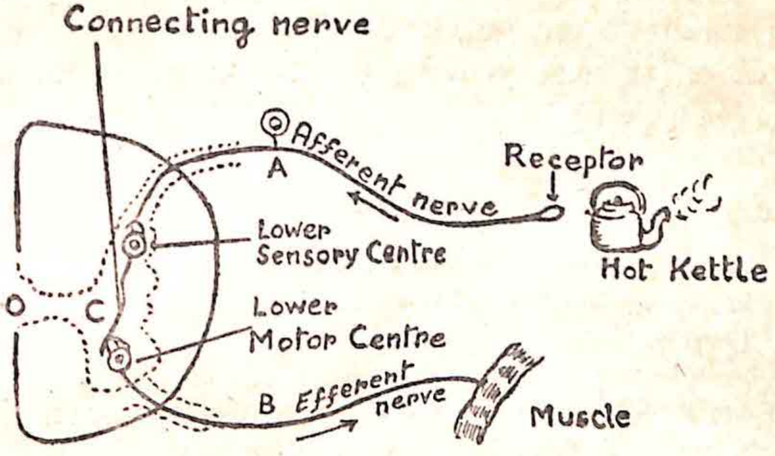


স্নায়বিক উত্তেজনার তিন প্রকার চাপ
[Three arcs of nerve current]
প্রথম ধাপ—অবচেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ
[Unconscious Reflex arc]
দ্বিতীয় ধাপ—চেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ
[Conscious Reflex arc]
তৃতীয় ধাপ—বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কাজের চাপ
[Arc of intellegent actian]

॥ এক ॥ **অবচেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ** [Unconscious Reflex Arc]: ঘুমন্ত কোন লোকের হাতে একটা গরম বা খুব ঠাণ্ডা জিনিস লাগালে দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে সে না জেগেই হাত সরিয়ে নিল। এ রকম অচেতন অবস্থায় আমরা সকলে কিছু না কিছু কাজ করে থাকি। এই সব কাজ খুব তাড়াতাড়িই করি, আর ভেবেচিন্তেও করি না। তাই এদের বলা হয় অবচেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Unconscious Reflex action)। এই সব কাজের সময় চাপ সবচেয়ে ছোট হয়। ইন্দ্রিয় থেকে উত্তেজনা সংজ্ঞাস্নায়ু দিয়ে, সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে সুষুম্নাশীর্ষ পর্যন্ত গিয়ে চালকস্নায়ু দিয়ে পেশীতে ফিরে আসে। উপরের ছবিতে একেবারে নীচের চাপটা এই ধরনের কাজের চাপ। অতএব সোজা কথায় সুষুম্নাকাণ্ড ও সুষুম্নাশীর্ষ যে সব কাজগুলোর কর্তা তাকেই বলা হয় **অবচেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** বা **তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া** (Reflex action of Unconscious type)।

॥ দুই ॥ **চেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ** (Conscious Reflex arc): যখন নাকে সর্দি জমে তখন তার একটা বিশেষ অনুভূতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাঁচি বা নাক পরিষ্কার করি। এ সব কাজগুলোও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ভিতর পড়ে, কিন্তু এগুলোর সম্বন্ধে আমরা

একেবারে অচেতন নই অর্থাৎ এইসব প্রতিক্রিয়াগুলো আমরা বেশ বুঝতে পারি, তবে তাদের পেছনে কোন বিচারবুদ্ধির দরকার হয় না। সুতরাং যেহেতু আমরা এই সব কাজ সম্বন্ধে সচেতন সেহেতু এদের উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্ক পর্যন্ত যায়, কিন্তু গুরুমস্তিষ্কের সংযোগকেন্দ্র পর্যন্ত পৌছায় না। অর্থাৎ উত্তেজনা



সচেতন তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ার চাপ [Conscions reflex arc]

সংজ্ঞাস্নায়ু দিয়ে গিয়ে গুরুমস্তিষ্কে সংবেদন স্থান থেকে সোজাসুজি কেন্দ্রিয় স্নায়ু আর চালাক স্নায়ু হ'য়ে পেশীতে (কর্মেন্দ্রিয়ে) ফিরে আসে। এই সব কাজের চাপকে বলা হয় চেতন-তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ। ছবিতে মাঝের অংশে যে চাপটা সেটাই হ'ল এই ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার পথ।

এই সব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজনিত চাপে তিন রকমের স্নায়ুকোষই, সংজ্ঞা-স্নায়ুকোষ (Sensory neurone), চালক স্নায়ুকোষ (Motor neurone) আর সংযোগ-স্নায়ুকোষ (Association neurone) কাজ করে, এগুলো কি ভাবে কাজ করে উপরের ছবিতে দেখানো হ'ল।

॥ তিন ॥ **বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কাজের চাপ [Arc involving higher mental activities] :** যখন আমরা বিচার বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করি তখন চাপটি আরও জটিল হয়। চেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখেছি যে উত্তেজনা সংজ্ঞাস্নায়ু (Sensory nerve) দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে চালকস্নায়ু দিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কাজে ঐ চাপ একটু বড় হয় এবং একটা আংটা (Loop) তৈরি করে মস্তিষ্কের সংযোগ স্নায়ু পর্যন্ত যায়। ছবিতে সব চেয়ে যে বড় চাপটি সেটি হ'ল এই রকম ধরনের কাজের চাপ। এই চাপ সংযোগস্নায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য এই সব কাজের পেছনে বিচারবুদ্ধি বেশী পরিমাণে থাকে।

এই গেল সংক্ষেপে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কাজ। তা'হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে স্নায়ুতন্ত্র। এছাড়া সংজ্ঞাস্নায়ু আর চালকস্নায়ু কি ভাবে আমাদের কাজ করছে তা উপান্ত স্নায়ুর কাজের আলোচনার সময় বলা হয়েছে। সুতরাং নতুন করে আর বলার প্রয়োজন নেই। স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের কাজ তো একেবারেই স্বতন্ত্রই। এটা আমাদের শরীরে অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করে।

[এই স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হ'ল।]

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. Name the different parts of the nervous system and discuss their importance in regulating human bevaviour.
[সম্পূর্ণ অংশ]

2. Describe with the help of a diagram the different parts of the human brain and briefly state their functions. [C. U., B. A., '69]
[৪—৭ পৃষ্ঠা ; ১৪—১৮ পৃঃ]

3. What is meant by cerebral localization ? Show with the help of a diagram the different regions in the Cerebrum and explain their functions.
[১৫—১৮ পৃঃ]

4. A boy hears the sounds but cannot distinguish them. Explain the phenomenan with special reference to the localization in the Brain area.
[১৫—১৮ পৃঃ]

5. What is a neurone ? How many types of neurone are there in human body ? Describe their structures and functions.
[১০—১৩ পৃঃ]

6. What do you mean by an arc ? Classify human action according to the nature of the nural-arc. Explain the reflex-action, with example.
[১৯—২২ পৃঃ]

7. Give an account of the Cerebro-spiral axi's and explain in brief the function of each part contained in it.
[৪—৭ পৃঃ ; ১৪—১৮ পৃঃ]

8. Write short notes on the following :
(a) Efferent nerve [পৃঃ ১৪] (b) Afferent nerve [১৪ পৃঃ] (c) Thalamus [পৃঃ ৭] (d) Cerebrum [C.U., B.A.—'68] [৫পৃঃ] ; (e) Neorone [১০পৃঃ] (f) Synapes [C.U.B.A.—'66] [১২] ; (g) Autonomic Nervous system [৯, ১৮ ও ১৯পৃঃ. ! (h) Peripheral Nervous system [১৪পৃঃ].

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থিতন্ত্র

[GLANDULAR SYSTEM]

পেশী (Muscle) বা দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ আমরা বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঠিক স্নায়ুর মত আর এক ধরনের দেহ যন্ত্র আছে যাদের কাজ আমরা বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের মত এদেরও উপযোগিতা সম্পর্কে বর্তমানে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এইসব যন্ত্রগুলো ঠিক একমুখ খোলা বিভিন্ন আকৃতির থলির মত। এদের ক্রিয়া একমুখী। ভেতরের থেকে বাইরের দিকে। সাইকেলে যে কপাটিকা (Valve) ব্যবহার করি তার ক্রিয়া যেমন বাইরে থেকে ভেতরের দিকে হয়। ভেতরের বায়ুকে বাইরে বাহির হতে দেয় না। ঠিক তেমনি এই গ্রন্থিগুলোও একদিকে ক্রিয়া করে, কিন্তু এর বিপরীত। এদের বলা হয় গ্রন্থি (Gland)। দেহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই সব গ্রন্থিগুলো ছড়ানো থাকে। এই সব গ্রন্থি থেকে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ (Chemicals) বাহির হ'য়ে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের কাজকে সহায়তা করে। এই রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয় **হর্মোন** (Hormone)। এক কথায় **গ্রন্থি** (Gland) **বলতে আমরা দেহের সেই সব যন্ত্রকে বুঝি যাদের কাজ হ'ল—বিশেষ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক গুণসম্পন্ন রস ক্ষরণ করা এবং তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকে সহায়তা করা।** ড্রিভার[1] মনোবিদ্যার অভিধানে (Dictionary of psychology) অনুরূপভাবে গ্রন্থির সংজ্ঞা দিয়েছেন। দেহের বিভিন্ন জায়গায় যে সব গ্রন্থি আছে, তারা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। তারা নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেহের অভ্যন্তরে কাজ করে যাচ্ছে। এদের সবগুলোকে একত্রে বলা হয় **গ্রন্থিতন্ত্র** (Glandular System)।

গ্রন্থি কি

Gland: An organ in the body; the function of which is to produce a specific Substance, or specific Substances exercising an important influence on the bodily economy; a very heterogeneous group, but falling into two main divisions—duct glands, and ductless or endrocrine glands.—Driver—Dictionary of Psychology.

আমাদের দেহের মধ্যে যে সব গ্রন্থি আছে, তাদের সাধারণতঃ হু'টো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলো আছে যাদের সঙ্গে নালী (duct) যুক্ত থাকে। এবং সেই নালী দিয়ে গ্রন্থির মধ্যেকার ক্ষরিত রস (Hormone) গিয়ে দেহের বিশেষ কোন অঙ্গকে পুষ্ট করে। এ জাতীয় গ্রন্থিগুলোকে বলা হয় **নালীযুক্ত গ্রন্থি** (Duct glands)। এদের ক্রিয়া বিশেষভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের উপর দেখা যায়। যেমন খাদ্যকে পরিপাক করার জন্য পাকস্থলীতে (Stomach) যে বিভিন্ন ধরনের জারক রসের (Enzyme) ক্ষরণ হয় তা এই সব ধরনের গ্রন্থি থেকে হ'য়ে থাকে। এছাড়া, আমাদের দেহের মধ্যে আর এক ধরনের গ্রন্থি আছে, যাদের সঙ্গে কোন নালী যুক্ত নেই। এদের ক্ষরিত হর্মোন (Hormone) শরীরের মধ্যে অন্য প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হয়। এদের তাই নাম দেওয়া হয়েছে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endo Crine gland) বা **নালীবিহীন গ্রন্থি** (Ductless gland)। এদের থেকে নিঃসৃত হর্মোন ব্যক্তির মানসিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব এত বেশী। পিটুইটারী (Pituitary), থাইরয়েড্ (Thyroid), এড্রিনাল (Adrenal), যৌন গ্রন্থি (Sex gland, gonad) ইত্যাদি এই ধরনের গ্রন্থি। মানসিক প্রক্রিয়ার উপর এদের গুরুত্ব বেশী বলে আমরা কেমলমাত্র এদের সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করব।

গ্রন্থির শ্রেণীবিভাগ ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

এই সব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (endocrine gland) গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ হ'ল **পিটুইটারী গ্রন্থি** (Pituitary gland)। এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে অনেকে একে ইংরাজীতে Master gland বলে থাকেন। এর অবস্থান মাথার পাশের দিকের খুলির (Skull) অভ্যন্তরে ঠিক মধ্য মস্তিষ্কের (Mid brain) উপরে। এই গ্রন্থি থেকে অনেক রকমের হর্মোন নিঃসৃত হয় এবং এই সব হর্মোন দেহের অন্যান্য গ্রন্থির কাজকে প্রভাবিত করে। এই গ্রন্থির হুটো অংশ আছে—সম্মুখ (frontal বা anterior) ভাগ; পশ্চাৎ (occipetal বা posterior) ভাগ। হু'টো অংশের কাজও পৃথক। সম্মুখভাগ থেকে ক্ষরিত হর্মোন দেহের যথাযথ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিশু অবস্থায় এই অংশ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গেলে, ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়, ফলে ব্যক্তি 'বামন' (Dwarf) হয়। আবার, এই অংশের অতিরিক্ত হর্মোন ক্ষরণের ফলে দেহের বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে (unnaturally) বেড়ে যায়; বয়সের তুলনায় বৃদ্ধির হার বেশী দেখা দেয়। সম্মুখ ভাগের অত্যধিক ক্রিয়ার ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে। আবার কখনও কখনও দেহের মধ্যে বিশেষ কোন অঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা যায় এই অংশের অপক্রিয়ার (dysfunction)

পিটুইটারী গ্রন্থি সম্মুখভাগ

দরুন। মানসিক দিক থেকে পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখভাগের হর্মোন বিশেষভাবে মানুষের বুদ্ধি (Intelligence) এবং সাধারণভাবে সমগ্র ব্যক্তিসত্বাকে (personality) প্রভাবিত করে। গ্রন্থির এই অংশ থেকে ক্ষরিত এক ধরনের হর্মোন, এড্রিনাল (Adrenal) গ্রন্থির মাধ্যমে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশে দু'ধরনের হর্মোন বাহির হয়। এর মধ্যে এক ধরনের হর্মোন পাকস্থলী (Stomach) এবং জরায়ুর (uterus) কাজকে প্রভাবিত করে। এই হর্মোন পেশী সংকোচনে সহায়তা করে বলে, প্রসব বেদনার সময় এর থেকে প্রস্তুত ইঞ্জেকশান প্রসূতিকে দেওয়া হয়। অন্য ধরনের হর্মোনটি রেচনতন্ত্রকে (excretory system) বিশেষভাবে সহায়তা করে। এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রস্রাবের (Urination) বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থির (Mammary gland) উপরও এর প্রভাব যথেষ্ট আছে। পিটুইটারী গ্রন্থি মধ্য মস্তিষ্কে অবস্থিত থ্যালেমাসের (Thalamus) সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বলে, মানুষের অনুভূতিমূলক জীবনেও তার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎভাগ

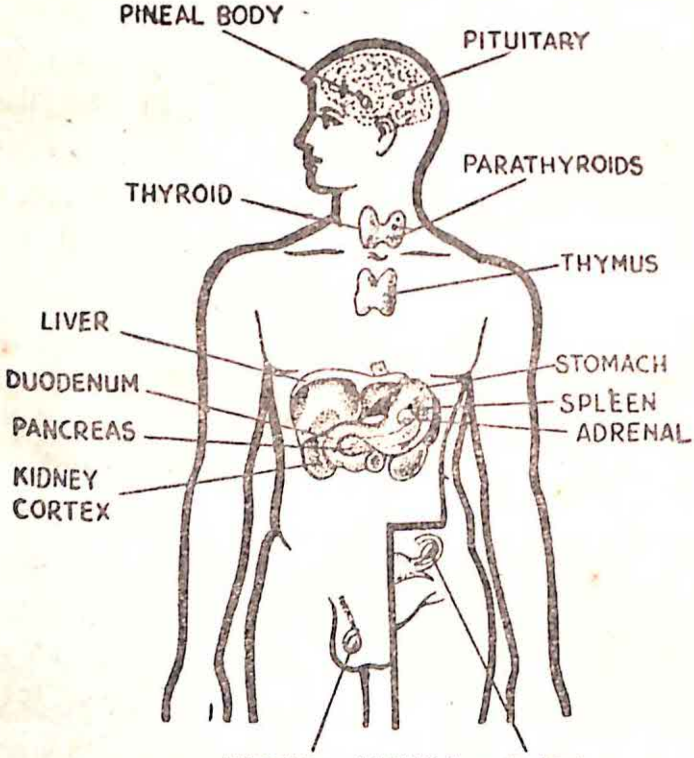
থাইরয়েড্ গ্রন্থি [Thyroid] ঃ

থাইরয়েড্ গ্রন্থি থাকে ঘাড়ের নীচে কণ্ঠার (Adam's apple) দু'দিকে। দেখতে ঠিক ডানা মেলা প্রজাপতির মত। এর থেকে যে হর্মোন নিঃসৃত হয় তার নাম থাইরক্সিন্ (Thyroxin)। এই হর্মোন ধমনীর মাধ্যমে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous system) সহানুভূতিশীল শাখাকে (Sympathetic system) বিশেষভাবে কার্যকরী করে। মানুষের সম্পূর্ণ দৈহিক ক্রিয়ার উপরও এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া সামগ্রিক ভাবে সুস্থ দেহ মনের বিকাশে সহায়তা করে। কোন কারণে এই গ্রন্থির কাজ ব্যহত হ'লে, অর্থাৎ, রস ক্ষরণ কম হ'লে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দেয়। চামড়া কুঁচ্কে যায় (winkled), হাত পা ফোলা ফোলা লাগে ; সামগ্রিক ভাবে দৈহিক বৃদ্ধির হারও কমে যায়। মানসিক দিক থেকে বুদ্ধি হ্রাস পায়, উদ্যমের অভাব, মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার এই গ্রন্থির হর্মোন ক্ষরণের মাত্রা বেশী হ'লেও নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়। অতি ক্ষরণের দরুন ব্যক্তি খুব বেশী মাত্রায় উদ্বেগ গ্রস্ত, চঞ্চল এবং উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে। খুব খিট্ খিটে মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। দেহের ওজনও কমে যায়। এক কথায় এই গ্রন্থিতে উপযুক্ত রস ক্ষরণ না হ'লে স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি

থাইরয়েড্ গ্রন্থির চারটে কোণে ছোট ছোট আরও চারটে গ্রন্থি আছে। এদের বলা হয় **প্যারা থাইরয়েড্ গ্রন্থি** (Para-thyroid)। যদিও থাইরয়েডেরই অঙ্গ তবু এর কাজ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন নিঃসৃত হয় তা দেহের মধ্যে চুন জাতীয় উপাদান নিষ্কাষনে (Extraction of calcium) সহায়তা করে। সুতরাং দেহের মধ্যে চুন উপাদানে গঠিত অস্থি (Bone), দাঁত (Tooth), ইত্যাদির স্বাভাবিক গঠনে এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই গ্রন্থির ক্ষরণের অভাব ঘটলে, অস্থি অপরিপুষ্ট হয়, ফলে দেহ বিকৃত রূপ ধারণ করে। দেহের রক্ত সংবহন

প্যারা-থাইরয়েড্ গ্রন্থি



তন্ত্র (Circulatory system) এবং স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) ক্রিয়ার উপরও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বুদ্ধিহীনতার ছাপ পড়ে।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির ঠিক নীচে, বুকের একেবারে উপরের অঙ্গে উরঃফলকের (Sternum) ঠিক পেছনে আর একটা গ্রন্থি থাকে, যাকে বলা হয় **থাইমাস** (Thymus)। এই গ্রন্থির কাজ সম্পর্কে সঠিকভাবে আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে যেটুকু থেকে জানা গেছে এই গ্রন্থির হর্মোন যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত করে। কৈশোর পর্যন্ত

থাইমাস গ্রন্থি

(upto adolescence) এই গ্রন্থি খুব বেশী রকম সক্রিয় থাকে। আয়তনেও বড় থাকে। কিন্তু তার পরে, এটা শুকিয়ে যেতে থাকে এবং এর রস ক্ষরণের হারও কমতে থাকে। অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়সে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই তার এই নিষ্ক্রিয়তা।

এড্রিনাল গ্রন্থি [Adrenal Gland]:

এড্রিনাল গ্রন্থি মূত্রাশয়ের কাছে অবস্থিত। এর ভিতরের দিকের এবং বাইরের দিকের গঠনের তফাত আছে। এদের কাজও ভিন্ন ভিন্ন। বাইরের অংশের নাম হ'ল **কর্টেক্স** (Cortex) এবং ভেতরের অংশের নাম হ'ল **মিডিউলা** (Medulla)। কর্টেক্স থেকে যে হর্মোন ক্ষরণ হয় তাকে বলা হয় কর্টিন (Cortin) আর মিডিউলা থেকে যে হার্মোন বাহির হয় তার নাম হ'ল এড্রিনিন (Adrenin)। এই গ্রন্থি বিশেষভাবে দেহের জৈবিক ক্রিয়াকে (Metabolism) প্রভাবিত করে। রক্ত সংবহন তন্ত্র (Circulatory system), পাচন তন্ত্র (Digestive system), শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ক্রিয়াকে এই গ্রন্থি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই গ্রন্থির ক্রিয়ার সঙ্গে প্রক্ষোভের বিশেষ সম্পর্ক আছে। রাগ, ভয় ইত্যাদি মানসিক অবস্থা এই গ্রন্থির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এক কথায় যে কোন জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে এ গ্রন্থির প্রয়োজন। তাই ওয়াকার (Walker), ক্যানন (Cannon) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক একে আপৎকালে ক্রিয়াশীল গ্রন্থি (Emergency gland) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়ার দরুন, যে কোন রকম রোগ হ'তে পারে। ব্যক্তির যে কোন রকম রোগ জীবাণুকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কমে যায়। অনেক সময় বিশেষ উপসর্গও দেখা দেয়। যেমন, গায়ের চামড়া (skin) তামাটে হ'য়ে যায়, ঘুম কমে যায়। তাপমাত্রায় পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না। মানসিক দিক থেকে, ব্যক্তির বিচার বিবেচনার ক্ষমতা কমে যায়। মানসিক চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয়।

এড্রিনাল গ্রন্থি

যৌনগ্রন্থি (sex gland or gonads) জননেন্দ্রিয়েরই একটা অঙ্গ। পুরুষের দেহে এই গ্রন্থি থেকে শুক্র আর স্ত্রীলোকের দেহে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়। এছাড়া, এই গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন নিঃসৃত হয় তা ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। এর থেকে নানা রকমের হর্মোন নিঃসৃত হয়। আবার এই সব হর্মোনের কতকগুলো পুরুষ জাতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে; আর কতকগুলো নারীজাতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। এই সব হর্মোনের ক্ষরণের তারতম্য ঘটলে, অনেক সময়

যৌনগ্রন্থি

পুরুষের মধ্যে মেয়েলীভাব এবং মেয়েদের মধ্যে পুরুষের লক্ষণ দেখা দেয়। এই গ্রন্থির ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষ এবং নারী উভয়েরই যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পিনিয়েল (Pineal) নামে আর একটা গ্রন্থি আছে যার কাজ সম্পর্কে এখনও সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি। এই গ্রন্থি মস্তিষ্কের (Brain) একেবারে মাঝখানে অবস্থিত। যেটুকু জানা গেছে তার থেকে বুঝা যায় এই গ্রন্থির নিঃসৃত হর্মোন বিশেষভাবে চোখের উপর ক্রিয়া করে। এর দ্বারা দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়।

পিনিয়েল

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে দেহের মধ্যে অবস্থিত এই সব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (endo-crine gland) নানাভাবে ব্যক্তির সুষম বিকাশে সহায়তা করে। এদের থেকে নিঃসৃত হর্মোন বিভিন্ন দেহ যন্ত্রকেই যে শুধুমাত্র প্রভাবিত করে তা নয়, মানসিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপরও তাদের প্রভাব অপরিসীম। এই সব হর্মোন বিশেষভাবে ব্যক্তির বুদ্ধি (intelligence), অনুভূতি (feeling), যৌন জীবন (sex life) এবং সামগ্রিক ভাবে তার ব্যক্তিসত্বার (personality) উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা একান্ত প্রয়োজন।

আলোচনা

প্রশ্নাবলী

1. What are endocrine glands? Why are they so called? Describe briefly their influence on human personality. [সম্পূর্ণ অংশ]
2. Write notes on: Endocrine glands' [সম্পূর্ণ অংশ] [C.U.B.A. '64]
3. Write a short essay on the physiological basis of mental life. [প্রথম ও ২য় অধ্যায়] [C.U.B.A. '68]
4. Write short notes on the following:
   (a) Pituitary gland [২৪-পৃঃ], (b) Adrenal gland [২৭ পৃঃ], (c) Thyroid gland [২৫ পৃঃ]

প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের কৌশল ঃ সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

Primary Processes of Experience : Sensation & Perception

বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের মূল। তবে প্রশ্ন হ'ল বিদ্যালয়ে আমরা কি করি। তার এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করি মাত্র। বিশেষ শিক্ষা ছাড়াই মানুষ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। কিসের সাহায্যে? শিশু তার প্রকৃতি দত্ত অস্ত্র (ইন্দ্রিয়) আর কৌশলের সাহায্যে জন্মের পর থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যাচ্ছে। শিক্ষার দ্বারা আমরা তার গতিকে ত্বরান্বিত করছি, মার্জিত করছি মাত্র। কিন্তু এই প্রাথমিক কৌশলগুলোই তাকে আজন্ম এ ব্যাপারে সাহায্য করে যাচ্ছে। তাই শিক্ষকতা করতে যাওয়ার আগে, বা শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এই প্রাথমিক কৌশলগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরকার। পরবর্তী পর পর দুটো অধ্যায়ে আমরা সংবেদন (Sensation) এবং প্রত্যক্ষণ (Perception) সম্পর্কে আলোচনা করছি

তৃতীয় অধ্যায়

সংবেদন
[SENSATION]

বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপন হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। এই সংযোগ যদি না হ'ত, আমরা বহির্জগত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না। এ সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক এই সংযোগের ফলে কি হয়। এই সংযোগের ফলে মস্তিষ্কে যে অনুভূতি হয় তাকে বলা হয় সংবেদন (sensation)। কোন ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হ'লে, সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু (sensory nerve) দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কের একটা বিশেষ স্থানকে উত্তেজিত করছে। এই উত্তেজনার দরুন যে সরলতম স্নায়বিক অনুভূতি হ'চ্ছে তাই হ'ল সংবেদন। ধরা যাক্, একজন লোক বসে গান গাইছে। কানের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গানের খবর গেল, চোখের দ্বারা মানুষ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির খবরও মস্তিষ্কে পৌছাল। এই সব কিছুর সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম। একজন লোক বসে গান গাইছে। কিন্তু এই বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান হ'ল, একে আমরা সংবেদন বলি না, বলি প্রত্যক্ষণ (Perception)। সংবেদন বলব ঐ আলাদা আলাদা টুক্‌রো খবর গুলোকে। যেমন, কানের মাধ্যমে শব্দের উত্তেজনা গিয়ে যে স্নায়বিক অনুভূতির সৃষ্টি করল, তাকে। চোখের মাধ্যমে বিভিন্ন উত্তেজনা গিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে যে অনুভূতির সৃষ্টি করল তাকে। এই সব সংবেদনগুলো মস্তিষ্কে একত্রিত হয়ে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বস্তু সম্পর্কে যে অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিল তাকে বলা হ'চ্ছে প্রত্যক্ষণ। তা'হলে **সংবেদন বলতে আমরা সেই সব বিচ্ছিন্ন (Isolated) এবং নিরপেক্ষ স্নায়বিক অনুভূতিগুলোকে বলব, যেগুলো একত্রিত-ভাবে আমাদের বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা গ্রহণে সহায়তা করে।** এক কথায় সংবেদনকে আমরা কোন বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক স্নায়বিক বোধ বলতে পারি। এটা সবচেয়ে সরলতম মানসিক প্রক্রিয়া। সংবেদনের জন্য সব সময় একটা বাহিরের উদ্দীপক (stimulus) দরকার। উদ্দীপক যে কোন ধরনের পার্থিব বস্তু হ'তে পারে। তবে সব পার্থিব বস্তুকে উদ্দীপক (stimulus) বলা যায় না। অন্ধলোকের চোখে আলো পড়লে, তার চোখ কোন উত্তেজনা মস্তিষ্কে পাঠাতে পারে না। অর্থাৎ, সে দেখতে পায় না। সুতরাং, তার কাছে

সংবেদন কি?

আলোকরশ্মি উদ্দীপক নয়। কোন বস্তুকে আমরা সেই অর্থে উদ্দীপক বলব, যে সেই বস্তু আমাদের স্নায়ুগুলোকে এবং শরীরের অন্যান্য অংশগুলোকে উত্তেজিত করতে পারে, বা স্নায়বিক কর্মের শক্তি যোগাতে পারে। সংবেদন হ'ল এই উদ্দীপক সম্পর্কে জ্ঞান। অর্থাৎ, এর দ্বারা আমরা জানতে পারি উদ্দীপকের স্বরূপ কি? সে কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে পারে ইত্যাদি।

সংবেদনের মূল কথা হ'ল—এটা হয় কোন ভৌত ঘটনা (Physical event) এবং কোন মানসিক অবস্থার (Mental state) পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে। যে কোন রকম শক্তি, যেমন শব্দ (sound), আলো (light) ইত্যাদি আমাদের ইন্দ্রিয়ে এসে পৌঁছালে, আমাদের উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, অর্থাৎ, আমরা শুনতে পাই বা, দেখতে পাই। এখানে

সংবেদনের প্রকৃতি

শব্দ তরঙ্গ (sound wave) বা আলোকরশ্মি তরঙ্গ (Light wave) বা সাধারণ অর্থে যে কোন উদ্দীপকই হ'ল ভৌত ঘটনা (Physical event), কিন্তু দেখা (Seeing), শোনা (Hearing) ইত্যাদি হ'ল মানসিক প্রক্রিয়া। এই কারণে অনেকে মনে করেন, সংবেদন পুরোপুরিভাবে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু নয়। ভৌত ঘটনার ফলে মানসিক পরিবর্তনের এটা একটা ধাপ মাত্র। এই সব ভৌত ঘটনার সঙ্গে সংবেদনের যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানের একটা শাখার উদ্ভব হ'য়েছে যার নাম হ'ল—Psycho-physics। এর প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন পদার্থবিদ্ জি. টি. ফেক্‌নার (G. T. Fechner)। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল মন এবং বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান আছে তা নির্ণয় করা।

এ ছাড়া সংবেদনের বিশেষভাবে আলোচনা করার জন্য মনোবিদ্যারও একটা শাখা আছে। তাকে বলা হয় **সংবেদন বিষয়ক মনোবিদ্যা** (Sensory Psychology)। এক কথায় বলা যেতে পারে উদ্দীপক (stimulus), সংগ্রাহক বা ইন্দ্রিয় (Receptors) এবং স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে আলোচনা করাই হ'ল মনোবিদ্যার এই শাখার উদ্দেশ্য।

আলোচনা

সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ
[Classification of Sensation]:—

সংগ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের (Receptor organ or Sense organ) মাধ্যমে আমরা বাহিরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করি। মানুষের দেহের মধ্যে যে সব সংগ্রাহক যন্ত্রগুলো আছে তাদের আমরা প্রধান দুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। বহির্সংগ্রাহক (External receptors) এবং অন্তর্সংগ্রাহক

Internal receptors)। এই সংগ্রাহকের বিভিন্নতা অনুযায়ী সংবেদনকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

বিশেষ সংবেদন

[এক] যে সব উদ্দীপক আমাদের বহির্সংগ্রাহককে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে যে সংবেদন হয় তাকে বলে **বিশেষ সংবেদন**। বহির্সংগ্রাহক বলতে আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বুঝি, যারা বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ রক্ষা করে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগত থেকে আমরা পাঁচ রকমের জ্ঞান আহরণ করতে পারি। তাই ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিশেষ সংবেদনও (special sensation) পাঁচ রকম। **দর্শন** (visual sensation), **শ্রবণ** (Auditory sensation), **ত্বকজাত সংবেদন** (Tactual sensation), **গন্ধ সংবেদন** (Olfactory sensation), **স্বাদ সংবেদন** (Gustatory sensation)।

যান্ত্রিক সংবেদন

[দুই] আমাদের দেহের মধ্যে কতকগুলো যন্ত্র (organ) আছে যাদের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তার দরুন আমাদের সংবেদনও হয়। এই ধরনের যন্ত্রগুলোকে অন্তর্সংগ্রাহক (internal receptors) বলা হয়। এই সব অন্তর্সংগ্রাহকের দরুন যে সব সংবেদন হয় তাদের বলা হয় **যান্ত্রিক সংবেদন** (Organic sensation)। যেমন, যখন পাকস্থলীর পেশী সঙ্কুচিত হয় তখন আমাদের বিশেষ এক ধরনের সংবেদন হয়। যে কারণে আমরা বলি ক্ষিদে পেয়েছে। শরীরের মধ্যে বিশেষভাবে হৃদ্‌ যন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র ইত্যাদির ক্রিয়ার ফলে এ ধরনের সংবেদন হয়।

পেশীয় সংবেদন

[**তিন**] সংগ্রাহকের বিভিন্নতা অনুযায়ী যে দু'ধরনের সংবেদন হয়, তাছাড়া আমাদের আর এক ধরনের সংবেদন হয়ে থাকে। এই ধরনের সংবেদনগুলো হয় আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের (effector organ) ক্রিয়ার ফলে। আমাদের দেহের মধ্যেকার পেশীগুলো (Muscle) নাড়াচাড়া করার ফলে এক ধরনের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনার জন্য এক রকমের সংবেদন হয়। একে বলে **পেশীয় সংবেদন** (Muscular sensation)।

সংবেদনের শ্রেণী-বিভাগ নীচে ছকের সাহায্যে পরিবেশন করা হ'ল।

সংবেদন (Sensation)

- বিশেষ সংবেদন (Special sensation)
  - দর্শন (Visual Sensation)
  - শ্রবণ (Auditory Sensation)
  - ত্বকজাত সংবেদন (Tactual Sensation)
  - গন্ধ সংবেদন (Olfactory Sensation)
  - স্বাদসংবেদন (Gustatory Sensation)
- যান্ত্রিক সংবেদন (Organic Sensation)
- পেশীয় সংবেদন (Muscular Sensation)

শিক্ষায় সংবেদন
[Sensation in Education]

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংবেদনের গুরুত্বকে আর অস্বীকার করা যায় না। সংবেদন, সরলতম মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে, বহুদিন শিক্ষাবিদদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। শিক্ষা বলতে তখন জ্ঞানের সঞ্চয়নকে বুঝাত। আর সংবেদন এই বস্তুধর্মী জ্ঞানে সহায়তা করে না বলে মনোবিদগণ সে দিকে বেশী নজর দেন নি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ উপলব্ধি করেছেন, এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মূল্য আছে। কারণ, ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের জগতের জানালা। কোন বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো উত্তেজিত হওয়ার দরকার। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু থেকেই প্রাথমিক জ্ঞান মন আহরণ করে। শিশু অবস্থায় যখন, মনের চিন্তন শক্তির (thinking) বিকাশ হয় নি তখন জ্ঞান কেবলমাত্র সংবেদনের দ্বারাই সম্ভব। মূর্ত বস্তু (Concrete object) থেকেই মন কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ করতে পারে। বস্তু সম্পর্কে ধারণা বা চিন্তা তখন কাজ করে না। তাছাড়া, প্রত্যক্ষণের ভিত্তি হিসেবে সংবেদন কাজ করে। তাই যে কোন ধরনের সংবেদন ছাড়া বস্তুধর্মী জ্ঞান (Objective knowledge) বা প্রত্যক্ষণ হ'তে পারে না। তাই মন্তেসরীর (Montessori) শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের (sense training) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে বস্তুকে কি ভাবে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করা যায় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার। এবং বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান পেতে হ'লে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার দরকার। আধুনিক কালে শিক্ষাবিদগণ তাই বলেছেন—'Teach through the senses !

প্রশ্নাবলী

1. What is sensation ? Draw a broad classification of the Different types of Sensation. [৩১—৩৩ পৃঃ]
2. What is Sensation ? Discuss the educational implication of sensation. [৩১ পৃঃ ; ৩৪ পৃঃ]
3. Write notes on the following :
   (a) Special sensation [পৃঃ ৩১], (b) Organic sensation [পৃঃ ৩৩],
   (c) Muscular sensation [পৃঃ ৩৩]; (d) Sensory Psychology [পৃঃ ৩১].

চতুর্থ অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ
[PERCEPTION]

সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্যের কথা প্রথম বলেন টমাস রীড (Thomas Reid)। তার আগে পর্যন্ত প্রত্যক্ষণ আর সংবেদন সম্বন্ধে আলাদা কোন ধারণা ছিল না। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম বলেন যে যদিও প্রত্যক্ষণ সংবেদন থেকে সৃষ্টি হয় তবুও সংবেদনের থেকে প্রত্যক্ষণ অনেক জটিল প্রক্রিয়া। তাঁর মতে সংবেদন হ'ল শারীরিক একটা ক্রিয়ার ফল মাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল শরীর এবং মন উভয় পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের পার্থক্য আমরা আলাদা ভাবে আলোচনা করব। এখানে প্রত্যক্ষণকে বুঝানোর জন্য যেটুকু দরকার তাই বলছি।

প্রত্যক্ষণ কী?

প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তুধর্মী জ্ঞান। গোলাপের গন্ধ আজকাল বাজারে নির্যাস বা গুঁড়ো হিসেবে বিক্রি হয়। আমাদের নাকে সেই গুঁড়ো গন্ধ এলে গন্ধের সংবেদন হয়। গন্ধ পেলেই কি সঙ্গে সঙ্গে বলব এটা একটা গোলাপ ফুল? নিশ্চয়ই না। আবার অন্য কোন ফুলের উপর যদি গোলাপের গন্ধ দিয়ে সামনে ধরা হয় আমরা সেটা নিশ্চয়ই গোলাপ বলব না। যদি এমনও করা হয় যে প্রকৃত একটা গোলাপের উপর অন্য গন্ধ দিয়ে দেখানো হলে সেটাকে অন্য কোন ফুল বলে ভুল করব না, তবে এ রকম কি করে হচ্ছে? আমাদের গন্ধের সংবেদনে হচ্ছে। আবার ফুলের বিভিন্ন অংশ থেকে দর্শন-গত সংবেদন হচ্ছে। তার উপরেও আছে অতীত অভিজ্ঞতা। এই সবগুলো মস্তিষ্কে একটা একক এবং ঠিক বস্তুধর্মী অনুভূতিতে সাহায্য করছে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষণ (Perception)। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন উত্তেজনার উৎস সম্বন্ধে যে জ্ঞান (Knowledge) তাই হ'ল প্রত্যক্ষণ। রাস্তায় কোন বন্ধু পেছন থেকে ডাকলে প্রথমে শব্দের সংবেদন হয়, ফিরে তাকাই। এখন তাকে দেখে বা পূর্ব পরিচিতির জন্য বুঝতে পারি যে এটা বিশেষ কোন বন্ধুর কণ্ঠস্বর। যখন এটা বুঝতে পারি তখন ঐ শব্দটা আর নিছক সংবেদন থাকে না—ওটা হয় শব্দের প্রত্যক্ষণ। প্রথম যখন শব্দটা কানে গিয়েছিল তখন ওটা মস্তিষ্কে একটা সংবেদনেরই সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে এই সংবেদন জটিল হয়ে আমাদের একটা অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিচ্ছে। সুতরাং প্রত্যক্ষণকে আমরা সংবেদন-উদ্ভুত অভিজ্ঞতা বলতে পারি। প্রত্যেক প্রকার সংবেদনের সঙ্গে এক এক রকম করে প্রত্যক্ষণ আছে। তাদের আমরা এই ভাবে নামকরণ করতে পারি—দর্শনজনিত প্রত্যক্ষণ (Visual perception),

শ্রবণজনিত প্রত্যক্ষণ (Auditory perception), স্পর্শজনিত প্রত্যক্ষণ (Tactual perception), স্বাদজনিত প্রত্যক্ষণ, (Gustatory perception) আর গন্ধের প্রত্যক্ষণ (Perception of smell)।

সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে তুলনা [Comparison between Sensation and Perception)]

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই হয়েছে, এখানে তার সার অংশটুকু তুলে ধরা হ'ল।

সংবেদন (Sensation)	**প্রত্যক্ষণ** (Perception)
১. সংবেদন শুধুমাত্র বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান।	১. প্রত্যক্ষণ হ'ল সংবেদন এবং সংবেদনের বিশ্লেষণ-উদ্ভুত জ্ঞান।
২. সংবেদন হ'ল জ্ঞান আহরণের যোগানী মাত্র—জ্ঞান নয়।	২. কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল প্রকৃত জ্ঞান।
৩. কোন বস্তু যখন সংবেদনের সৃষ্টি করে তখন তার সঙ্গে আমাদের মনের যোগাযোগ হয় মাত্র। আর এই যোগাযোগ হয় শরীরের মাধ্যমে। এদিক থেকে সংবেদনকে আমরা জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া বলতে পারি।	৩. এই সংবেদনের সাহায্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হ'লেই পরে আমাদের প্রত্যক্ষণ হয় এবং আমরা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করি।
৪. সংবেদনগুলো বিচ্ছিন্ন (Isolated)। কোন বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সংবেদন সৃষ্টি করে। এদিক থেকে সংবেদন আমাদের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা।	৪. কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তু সম্বন্ধে একক অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন গুণাবলী বিচার ক'রে বস্তু সম্বন্ধে যখন একক ধারণা জন্মায় তাই হ'ল প্রত্যক্ষণ।
৫. সংবেদন উত্তেজক-প্রবুদ্ধ।	৫. কিন্তু প্রত্যক্ষণ বিশ্বাস-উদ্ভুত।
৬. সুতরাং সংবেদনে আমাদের মন নিষ্ক্রিয় থাকে।	৬. প্রত্যক্ষণ সংবেদন-বিশ্লিষ্ট। সুতরাং এখানে মন সক্রিয় থাকে।
৭. সংবেদনে বস্তুর উপস্থাপন (Presentation) হয় মাত্র।	৭. কিন্তু প্রত্যক্ষণে বস্তুর উপস্থাপন ও উত্থাপন (Representation) দুইই হয়।
৮. সুতরাং সংবেদন হ'ল প্রত্যক্ষণের একটা হেতু (condition)।	৮. প্রত্যক্ষণ হ'ল একটা মানসিক প্রক্রিয়া (Mental process)।

আমরা কি প্রত্যক্ষ করি বা প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য [What we perceive ? or Characteristics of perception]

এখন প্রশ্ন হ'ল আমরা কি প্রত্যক্ষ করি ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের দ্বারা আমাদের বস্তু সম্বন্ধে কি জ্ঞান হয় ? এখানে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা জানি প্রত্যক্ষণের ভিতর অবগতি (Cognition) আর প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) দুই রকমই প্রক্রিয়া কাজ করে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের দ্বারা আমরা বস্তুর অস্তিত্ব আর তার বিশেষত্ব এই দুই সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করি। অস্তিত্ব উপলব্ধি আমাদের শুধুমাত্র সংবেদন থেকে হ'তে পারে, কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে উপলব্ধি প্রত্যক্ষণ ছাড়া হ'তে পারে না। ধরা যাক কোন ফুল আমরা দেখছি। তার কি কি বিশেষত্ব আমরা দেখতে পারি—রং দেখলাম ওটা নীল। এখন দেখব কতটা নীল। খুব ঘোর নীল না আবছা নীল। অর্থাৎ এই দুই পর্যায়ে আমরা বস্তুর দু'টো বিশেষত্ব দেখছি। একটা হ'ল গুণ (Quality)। আর একটা হ'ল সেই গুণের পরিমাণ (Quantity) বা তীব্রতা (Intensity)। এখন দেখব ফুলটা কত বড়, এটা হ'ল বস্তুর ব্যাপ্তি (Extensity)। বস্তুর এই সব গুণগুলো প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পর আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসি এবং তখন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ঐ ফুলের একটা নামকরণ করি। তা'হলে আমরা বলতে পারি বস্তুর [১] **গুণ (Quality)**, [২] **তীব্রতা (Intensity)**, আর [৩] **স্থানব্যাপ্তি (Extensity)** এই সব বিশেষত্বগুলো দেখি। এছাড়াও আর একটা জিনিস দেখি সেটা হ'ল বিষয় বস্তুর [৪] **কালব্যাপ্তি (Duration)** —কতক্ষণ বস্তুটা আমাদের সামনে আছে। এর থেকে আমরা বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। এই চারটে বিশেষত্বের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু আলোচনা করব।

॥ এক ॥ **গুণ [Quality]** : কোন বস্তুর গুণ আমরা দুই দিক থেকে বিচার করতে পারি। ফুল আমরা চোখে দেখি আর নাকে গন্ধ শুঁকি। আবার শব্দ আমরা কানে শুনি। অর্থাৎ যে জিনিস আমরা চোখে দেখি আর যে জিনিস আমরা কানে শুনি, সে দু'টোর মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। সুতরাং প্রত্যক্ষণের সময় চোখ দিয়ে যা দেখছি—তা মনে এক ধরনের ধারণা দেবে, আবার কান দিয়ে যা শুনছি তা এক ধরনের ধারণা দেবে আমাদের। এই যে ইন্দ্রিয়গত পার্থক্যের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর বিভিন্ন গুণগত বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পারছি, একে বলা হয় জাতীয় প্রভেদ (Generic difference)।

এ ছাড়াও বস্তুর মধ্যে এক ধরনের গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে। সেটা হ'ল প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য। যেমন, চোখ দিয়ে

আমরা লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং দেখি। আবার কান দিয়ে আমরা গান বা গণ্ডগোল দুইই শুনতে পাই। জিহ্বার দ্বারা তেতো আর মিষ্টি দুই স্বাদই পাই। এই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য, একে বলে বিশিষ্ট পার্থক্য (Specific difference)। আমরা প্রত্যক্ষণে বস্তুর এই দুই রকমের গুণই উপলব্ধি করি।

॥ দুই ॥ **তীব্রতা** [Intensity]: তীব্রতা বলতে আমরা সাধারণতঃ গুণের তীব্রতা বুঝব। একটা শব্দ খুব জোর, আবার একটা শব্দ খুব ক্ষীণ। একটা জিনিস ঘোর লাল, আর একটা ফিকে লাল। কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির জন্য আমরা তার গুণের তীব্রতা পরীক্ষা করি। আসলে এটা কিন্তু বস্তুর গুণগত বিশিষ্ট পার্থক্যের (Specific difference) আরও বেশী বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পলাশ আর জবা ফুলের মধ্যে কি পার্থক্য।

॥ তিন ॥ **স্থানব্যাপ্তি** [Extensity]: আমরা কোন জিনিসকে ছোট দেখি, আবার কোন জিনিসকে বড় দেখি। কোন কিছু আমাদের শরীর স্পর্শ করলে বুঝতে পারি সেটা কত বড় জিনিস। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর এই যে বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করি একে বলা হয় তার স্থানব্যাপ্তি (Extensity)। এটা নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজিত স্থানের পরিমাণের উপর। কোন জিনিসের স্থানব্যাপ্তির বুঝার জন্য আমাদের বিস্তৃত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য স্থানব্যাপ্তির বেশীর ভাগ আমরা বুঝতে পারি চোখ আর ত্বকের সাহায্যে। ত্বকের যতটা জায়গা উদ্দীপকের সাহায্যে উত্তেজিত হয়, ততটা জায়গার অনুভূতি আমরা পাই। আরও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে আমাদের ত্বকের বা অক্ষিপটের (Retina) উপর প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি বিশেষ গুণ আছে যার দ্বারা কোন বিস্তৃত (extended) উদ্দীপকের প্রত্যেক বিন্দুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের দেয়। এই বিশেষত্বকে বলা হয় স্থানীয় সঙ্কেত (Local sign)। ইন্দ্রিয়ের উপর সহঅবস্থানকারী (Co-existing) যতগুলি বিন্দু উত্তেজিত হয় তার উপর বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি নির্ভর করে। এর ফলে আমরা বস্তুটিকে ছোট-বড় দেখি। আবার ঐ স্থানীয় সঙ্কেতের সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন উত্তেজনার স্থান উপলব্ধি করতে পারি। এটা হ'ল আমাদের প্রত্যক্ষণের বা স্থানীয় সঙ্কেতের পৃথকীকরণ-ক্ষমতা।

॥ চার ॥ **কালব্যাপ্তি** [Duration]: আমরা বুঝতে পারি আমাদের চোখের সামনে কতক্ষণ বিদ্যুতের ঝলক ছিল; কতক্ষণ আমাদের কানে সেই মিষ্টি স্বরটা এসেছিল। এই যে উত্তেজকের অবস্থান-কাল সম্বন্ধে জ্ঞান, এটাকে আমরা সময়ের প্রত্যক্ষণের (Perception of time) একটা দিক বলতে পারি। আমরা যে বর্তমানকে উপলব্ধি করি তার পেছনে আরও দু'রকমের জ্ঞান কাজ

করে—অতীত এবং ভবিষ্যৎ। যেমন বিদ্যুৎ চম্‌কালে কতক্ষণ আলো জলে তা আমরা আন্দাজ করতে পারি, এর পেছনে অতীত এবং পরের আলোহীন অবস্থার একটা সম্পর্ক আছে। এই দু'টো মিলেই আমাদের সময়ের প্রত্যক্ষণ বা উত্তেজকের কালব্যাপ্তি (Duration) সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই সময়ের প্রত্যক্ষণ মনোবিজ্ঞানে আর একটা বিশেষ আলোচনার বিষয়।

প্রত্যক্ষণের সংঘবদ্ধতা
[Organisation in Perception]

গেষ্টাল্ট মনোবিদ্‌গণের মতবাদ ও সংঘবদ্ধতার কারণ

প্রত্যক্ষণ যে একটা একক অভিজ্ঞতা তা সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ (Gestaltist) বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন। পূর্বে ধারণা ছিল প্রত্যক্ষণ কতকগুলো সংবেদনের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ মিশ্র সংবেদন। কিন্তু সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের প্রথম প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বললেন, প্রত্যক্ষণ আমাদের একক অনুভূতি। প্রত্যক্ষণ যদি বিভিন্ন সংবেদনেরই মিশ্রণ হয়, তা'হলে একটা জিনিস থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উত্তেজনাগুলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করলে, তাদের সংবেদনগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে মিশে বিশেষ বস্তুর জ্ঞান দেওয়া উচিত ; অর্থাৎ বস্তুর প্রত্যক্ষণ হওয়া উচিত। কিন্তু এরকম হয় না। আবার অনেক সময় দেখা যায় সম্পূর্ণ জিনিস না থাকলেও আমাদের প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন—একটা ত্রিভুজের একটা দিক যদি ফাঁক রেখে কাউকে জিজ্ঞেস করি এটা কি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাব 'ত্রিভুজ'। এই সব কারণে সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে প্রত্যক্ষণের একটা বিশেষ গুণ আছে। সেটা হ'ল এই যে—প্রত্যক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময় সুসংবদ্ধ (Organised) হয়। তাঁরা আরও বলেন যে মনের একটা বিশেষ গতীয় গুণ (Dynamical property) আছে যার দ্বারা আমরা একটা একক এবং সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তাঁরা মনের এই গতীয় গুণের অস্তিত্বকে বহু উদাহরণ এবং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। প্রত্যক্ষণে যে আমরা সুসংবদ্ধ একক অভিজ্ঞতা পাই তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার কতকগুলো হ'ল (১) **উত্তেজকগত**, আর কতকগুলো হ'ল (২) **মনোগত**। এখন আমরা এদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

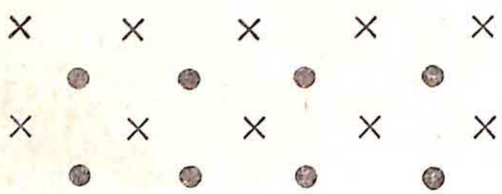
॥ এক ॥ **উত্তেজকগত কারণ [Physical causes] :**

আমরা কোন বিষয় বস্তুকে যে সুসংবদ্ধ দেখি তার কিছুটা নির্ভর করে উত্তেজকগুলোর অবস্থানের উপর। কি কি কারণে উত্তেজকের অবস্থান অনুযায়ী তারা সুসংবদ্ধ হয় তা এক এক করে উল্লেখ করব।

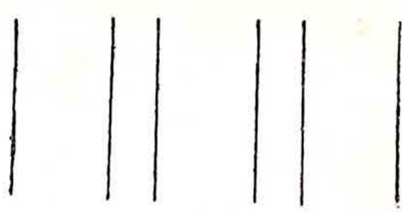
(ক) **নৈকট্য** [Proximity]: যে সব জিনিসগুলো অধিকতর কাছা-কাছি থাকে তাদের আমরা এক সঙ্গে দেখি। পাশের লাইনগুলো দেখে কি বলব? নিশ্চয়ই বলব প্রথমে এক জোড়া লাইন, পরে একটা লাইন। আমরা বলতে পারতাম তিনটে লাইন। কিন্তু তা না বলে আমরা বলি অর্থাৎ দেখি, প্রথমে একজোড়া লাইন। তারপরে একটা লাইন। সুতরাং নৈকট্যের জন্য A আর B লাইনকে একজোড়া হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি। এখানে একটা জিনিস মনে রাখার দরকার যে এই নৈকট্য হ'ল আপেক্ষিক জিনিস। কতকগুলো একই রকম জিনিস অনেক দূরে দূরে থাকলেও তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি যেগুলো আছে সেগুলো এক সঙ্গে মিশে একক অনুভূতি দেবে।

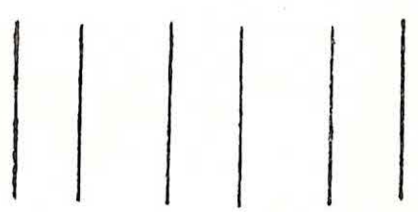


(খ) **সাদৃশ্য** [Similarity]: আমাদের সামনে যদি কতকগুলো জিনিস রাখা হয় যেগুলো সব একই রকম দেখতে সেগুলোকে আমরা এক সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি। পাশের ছবিতে কতকগুলি × চিহ্ন আর কতকগুলি ● বিন্দু আছে। আমরা কি দেখছি? প্রথম একটা শুধুমাত্র ● বিন্দু দিয়ে সাজানো অনুভূমিক লাইন, তারপর একটা ঠিক ঐ রকম × চিহ্ন দিয়ে সাজানো লাইন। কৈ আমরা তো উপর থেকে নীচের দিকে দেখে একটা ● আর একটা × দিয়ে সাজানো কোন লাইন দেখি না। এর কারণ হ'ল এই যে, যে জিনিস-গুলো একই রকম দেখতে তারা এক সঙ্গে শ্রেণী (Group) তৈরি করেছে।



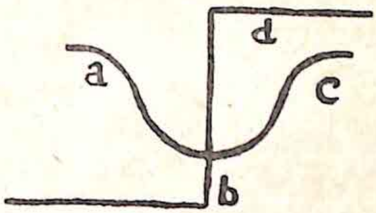
(গ) **সামঞ্জস্য** [Symmetry]: নৈকট্য আর সাদৃশ্য ছাড়াও আর একটা জিনিস আমাদের প্রত্যক্ষণের সংবদ্ধতাকে (Organisation) সাহায্য করে। সেটা হ'ল—সমস্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য। পাশের দু'টো ছবি পর পর দেখলে বুঝতে পারা যাবে। আমরা সাধারণভাবে দেখে যা বলব; —প্রথম ছবিতে দু' জোড়া লাইনের দু'দিকে দু'টো লাইন আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে দেখছি তিন জোড়া লাইন আছে। প্রথম ছবিতেও তো আমরা দু'টো দু'টো লাইন জোড়া দেখতে পারতাম। কিন্তু তা দেখি না,





আমরা ছবিটির সামঞ্জস্য দেখি। এখানে আমরা ধরে নিই মাঝের দু'টো জোড়া লাইনই ঠিক সম্পূর্ণ ছবি, বাকি দুদিকের দু'টো আলাদা লাইন অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ এদের পাশে আর একটা করে লাইন আছে যা ছবির ভেতর আসে নি। ফলে আমরা সমস্ত ছবিটাকেই অসম্পূর্ণ দেখি। এই ধারণাকে শিল্পীরা কাজে লাগান আমাদের কোন অসম্পূর্ণ জিনিসের ধারণা দেওয়ার জন্য। সুতরাং সমস্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য আমাদের প্রত্যক্ষণের সংঘবদ্ধতা নির্ণয় করে।

(ঘ) **অবিচ্ছিন্নতা** [Continuity]: ছবির খণ্ড খণ্ড অংশের মধ্যে সম্বন্ধে থাকার চেয়েও আর একটা জিনিস আমাদের সুসংবদ্ধতায় সাহায্য করে, সেটা হ'ল বিষয়বস্তুর অবিচ্ছিন্নতা। যেমন পাশের ছবিটা দেখে আমরা বলি একটা তিন বার বাঁকানো লাইন আর একটা বাঁকা লাইন (Curve) উপরে চাপানো আছে। এখানেও তো নৈকট্যের জন্য a ও c-এর d অংশের সংযোগ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয় না। ছবির অবিচ্ছিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা তাকে অন্যভাবে প্রত্যক্ষণ করি।



(ঙ) **গতিশীলতা** [Movement]: বিষয়বস্তুর গতিও একটা সংঘবদ্ধতার কারণ। কোন দ্রষ্টব্য বস্তুর একই পরিমাণে গতিশীল জিনিসগুলোকে আমরা এক সঙ্গে প্রত্যক্ষণ করি।

॥ দুই ॥ **মানসিক কারণ** [Mental Causes]: প্রত্যক্ষণের মানসিক কারণ সম্বন্ধে আমরা এখানে বিশদভাবে কিছু আলোচনা করব না, কারণ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানসিক কারণ যেটা হ'ল মনোযোগ, যার আলোচনা আমরা আলাদা ভাবে করব। এছাড়া অনুরাগ (Interest), প্রতিন্যাস (Attitude) ও প্রেষণা (Motivation) আমাদের কোন কিছু জিনিসকে বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষণ করার পেছনে কাজ করে। এছাড়াও কিছু সামাজিক কারণও আছে যা আমাদের সুসংবদ্ধ প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। সেগুলো হ'ল অভিজ্ঞতামূলক।

গভীরতা আর দূরত্বের প্রত্যক্ষণ
[Perception of Distance & Depth]

চোখের গঠন থেকে আমরা জানি, যে কোন বস্তুর ছবি আমাদের অক্ষিপটে (Retina) এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই। এই পর্দাটা একটা বিস্তৃত

জিনিস। এর দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে। তা'হলে এতে যে ছবি পড়বে তার শুধু দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ উপলব্ধি করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের সামনে যদি একটা বাক্স থাকে, তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের প্রতিচ্ছবি আমাদের অক্ষিপটে পড়তে পারে। এর ফলে আমরা একটা আয়তক্ষেত্রের মত জিনিস দেখতে পারি। কিন্তু তা হয় না। আমরা বাক্সটার আর একটা দিকও দেখতে পাই, সেটা হ'ল উচ্চতা বা গভীরতার (Depth) দিক। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সিনেমা দেখার সময়ও হয়। পর্দার উপরে কতকগুলো ছায়া এসে পড়ে, কিন্তু আমরা দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো তারও পেছনে ঘর আছে। আগেকার যুগে মনোবিদ্‌গণ মনে করতেন যে আমাদের দূরত্ব বা গভীরতা-জ্ঞান আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা (Experience) আর বিচারের (Judgement) উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিচার করে জ্ঞান লাভ করে। তা'হলে আমরা এ কথা বলতে পারি সংবেদন থেকে উদ্ভূত অভিজ্ঞতাকে আমরা বিচার করে তবে দূরত্ব অথবা গভীরতার জ্ঞান পাই। হেলমোজ (Helmholtz) বলেন যে, এই যে আমরা সংবেদনকে বিচার করি, সেটা অবচেতন মনে করি। এখন আমরা বলতে পারি দু'টো বিশেষ জিনিস আমাদের এই দূরত্ব আর গভীরতার প্রত্যক্ষণে সাহায্য করছে। একটা হ'ল সংবেদন আর একটা অবচেতন মনের অতীত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ আমাদের এই প্রত্যক্ষণের পেছনে কতকগুলো কারণ আছে যেগুলোর জন্য আমাদের মনের অভিজ্ঞতা দায়ী। এদের মধ্যে প্রথম কারণগুলোকে বলা হয় **মুখ্য কারণ** (Primary Causes) আর শেষের গুলোকে বলা হয় **গৌণ কারণ** (Secondary Causes)। এখন আমরা এই সব কারণগুলো সম্বন্ধে এক এক করে আলোচনা করব এবং কি ভাবে তারা আমাদের গভীরতার জ্ঞানে সাহায্য করছে তাও বলব।

গভীরতা ও দূরত্বের প্রত্যক্ষণ কি

মুখ্য কারণ
[Primary Causes]

মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের মধ্যে দূরত্ব আর গভীরতা প্রত্যক্ষণের কারণ হিসেবে তিনটে জিনিস আবিষ্কৃত হয়। সেগুলো হ'ল :—

॥ এক ॥ **চোখের কেন্দ্রাভিমুখিতা** (The Convergence of the eyes) :—কোন জিনিস দেখতে হ'লে আমরা তার দিকে তাকাই, এবং দু'টো চোখেই দেখি। দু'টো চোখের পর্দাতেই বস্তুটির প্রতিচ্ছবি পড়ে এবং প্রায় সদৃশ বিন্দুতেই পড়ে। এখন কোন জিনিসকে দেখতে হ'লে আমাদের চোখ

দু'টোকে নেড়েচেড়ে এমন ভাবে ঠিক করতে হয় যাতে বস্তুটার ছবি দু'টো চোখের একই জায়গায় পড়ে। একে বলে চোখের কেন্দ্রাভিমুখিতা। অর্থাৎ আমাদের দু'টো চোখের অবস্থিতি বস্তুকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়। এখন বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর জন্য আমাদের চোখ দুটো বিভিন্ন ভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়। এর ফলে চক্ষুপেশীতে বিভিন্ন রকমের সংবেদন হওয়ার জন্য দূরত্বের প্রত্যক্ষণ হয়। বেশী দূরত্বে চোখকে কম কেন্দ্রাভিমুখ হ'তে হয় আর কম দূরত্বে ঠিক তার বিপরীত।

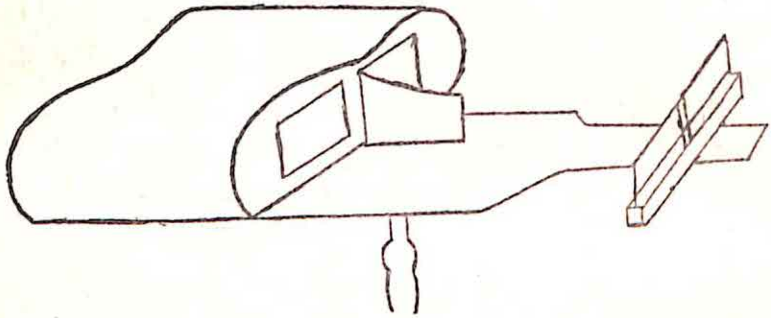
॥ দুই ॥ **দৃষ্ট বস্তুকে ফোকাসে আনার জন্য চোখকে উপযোগী করা (Accommodation) :** কোন বস্তুকে ঠিক ভাবে দেখতে হ'লে সে বস্তুর ছবি যাতে আমাদের অক্ষিপটের (Retina) উপর পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আমরা জানি কোন বস্তু থেকে আলোকরশ্মি প্রথমে আমাদের চোখের জৈবিক লেন্সের (Eye Lens) উপর পড়ে, তারপর সেখান থেকে প্রতিস্থত হয়ে অক্ষিপটে গিয়ে মিলিত হয়, তবেই আমরা দেখি। এখন যাতে অক্ষিপটে ছায়া পড়ে তার জন্য লেন্সের (Lens) ঘনত্বটা (Thickness) বাড়াতে-কমাতে হয়। এই বাড়ানো-কমানো হয় কতকগুলো পেশীর দ্বারা সে আমরা পূর্বেই পড়েছি। এখন বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী এই পেশীগুলো নানা রকমের ভাবে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে লেন্সের (Lens) ঘনত্ব (Thickness) বাড়ায় বা কমায়। একেই বলে Accommodation। দ্রষ্টব্য জিনিস যদি অনেক দূরে থাকে তা হ'লে এই পেশীগুলো আলগা হয়, আর যদি কাছে থাকে তা'হলে টান পড়ে। এর ফলে আমাদের মস্তিষ্কে যে অনুভূতি হয় সেটাই আমাদের বস্তুর দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে।

এখন মনে রাখতে হ'বে কোন জিনিস দেখতে হ'লে আমাদের চোখকে Accommodation আর Convergence এই দু'টো কাজই করতে হ'বে। তাই দুটোকে পৃথকভাবে ভাবা যায় না। তবে মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ড (Wundt) বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্তে আসেন যে আমাদের দূরত্বের বা গভীরতার প্রত্যক্ষণের জন্য Convergenceটাই বেশী প্রয়োজনীয়।

॥ তিন ॥ **দু'টো অক্ষিপটের ছবির মধ্যে পার্থক্য** (Retinal disparity) : আমাদের চোখ দু'টো আমাদের মাথার উপর প্রায় ৬০ থেকে ৭০ মিলিমিটার দূরে অবস্থিত। একটি চোখের অক্ষিপটে বস্তুটির যে ছবি পড়ে অপরটিতে ঠিক সেই ছবি পড়ে না। কোন বস্তু দেখতে হলে বাম চোখ দিয়ে বস্তুর ডান দিকটা যতটা দেখছি ডান চোখ দিয়ে তার থেকে একটু বেশী দেখি। বাম চোখে আবার বস্তুর বেশীর ভাগ বাম দিকটা দেখি। এই যে একই বস্তুকে দু'টো চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, একে বলা হয় অক্ষিপটের ছবির পার্থক্য (Retinal disparity)। দু'টো চোখে দু'রকম দেখলেও কিন্তু আমরা একই

বস্তু দেখছি এবং এরই ফলে আমরা বস্তুটির ঘনত্ব বুঝতে পারছি। দু'টো বিভিন্ন ছবি একসঙ্গে মিশে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ জ্ঞান দিচ্ছে। সেটা হ'চ্ছে গভীরতার।

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে **অলিভার ও ওয়েনডেল হোম্‌স্‌** (Oliver & Wendell Holmes) ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের টেরিওস্কোপ নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে আমরা দু'টো একই বস্তুর ছবি দু'টো প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে দেখি। যে ছবিটা ডান চোখ দিয়ে দেখি সেটা শুধু ঐ চোখ দিয়ে যেভাবে বস্তুটাকে দেখা যায় ঠিক সেই ভাবে আঁকা বা ফটো তোলা হয়েছে আর বাম চোখের দিকের ছবিটা বাম চোখের দেখা অনুযায়ী তোলা হয়েছে। এখন এই



ষ্টেরিওস্‌কোপ (Sterescope)

দু'টো ছবির মধ্যে ৬০—৭০ মিলিমিটার দূরত্ব রেখে প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে দেখা হয়। যাতে দু'টো ছবির ছায়া আমাদের দু'টো চোখের অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিবিম্ব পড়ে তার জন্য প্রিজ্‌ম ও ছবি দু'টির মধ্যে দূরত্ব ঠিক করে নিতে হয় ছবি দু'টিকে নাড়াচাড়া করে। এভাবে দেখলে আমরা তখন দু'টো চোখে একটাই বস্তু দেখি, কিন্তু বস্তুর গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হয়।

গৌণ কারণ
[Secondary Causes]

আমাদের দূরত্ব আর গভীরতা প্রত্যক্ষণের গৌণ কারণ হিসেবে মনোবিজ্ঞানীগণ যেগুলোকে ধরেছেন সেগুলো হ'ল :—

॥ এক ॥ **একটির উপর আর একটির স্থিতি** (Superposition) : অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে একটা জিনিস আড়াল করলে যেটা আড়াল করছে সেটা কাছে আছে। সুতরাং একটার উপর আর একটার অবস্থিতি থেকে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি।

॥ দুই ॥ **বস্তুর আকার** (Size): আমরা জানি দূরের জিনিসকে ছোট এবং কাছের জিনিসকে বড় দেখায়। এই ধারণা আমাদের দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। শিল্পীরা যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁরা বস্তুর আকার ছোট-বড় করে দূরত্ব বুঝাতে চান।

॥ তিন ॥ **আলো আর ছায়া** (Light & Shade): আমরা জানি নীচু জায়গার চেয়ে উঁচু জায়গায় আলো পড়ে। তাই শিল্পীরা উঁচু জায়গা বুঝানোর জন্য বেশী সাদা রাখেন এবং নীচু জায়গা কালো রাখেন। এই আলো আর ছায়া আমাদের গভীরতা প্রত্যক্ষণের সাহায্য করে।

॥ চার ॥ **প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাহায্যে** (Aerial Perspective): প্রকৃতির সাহায্যে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। দূরের জিনিসগুলোকে কাছের জিনিসের চেয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত আবছা দেখি। তাই দু'টো জিনিসের মধ্যে যেটা বেশী আবছা সেটাকে আমরা দূরের ভাবি।

॥ পাঁচ ॥ **ফাঁকা আর ভর্তি জায়গা** (Filled and Empty space): কোন ফাঁকা জায়গার চেয়ে ভর্তি জায়গার দূরত্ব সবসময় বেশী মনে হয়। দু'টো ছবি এঁকে একটাকে কালি দিয়ে ভর্তি করে দিলে দেখা যাবে উহা বেশী দূরের মনে হচ্ছে। তাই ইহা দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে।

গভীরতার আর দূরত্ব প্রত্যক্ষণের যে কারণগুলো বর্ণনা করা হ'ল এদের মধ্যে কোনগুলো বেশী প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেকগুলো বর্তমান থেকে আমাদের প্রত্যক্ষণ ঘটায়। **বার্কলে** যখন প্রথম দূরত্ব এবং গভীরতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন তারপর থেকে বেশ কিছুদিন ধারণা ছিল যে এই ধরনের প্রত্যক্ষণের জন্য একমাত্র মুখ্য কারণগুলোই (Primary causes) দায়ী। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভৌত কারণগুলোই আমাদের গভীরতা আর দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীগণ বহু পরীক্ষা এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে আসলে আমরা যাদের গৌণ কারণ বলে আলোচনা করলাম, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাগুলোই হ'ল মূল কারণ। এই সব অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র চোখ নাড়াচাড়া থেকে আমাদের গভীরতা বা দূরত্বের প্রত্যক্ষণ হ'তে পারে না। তার আগেই আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞতার দরকার। তাই শেষোক্ত কারণগুলোকে মনোবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন **প্রত্যক্ষণের প্রাথমিক স্বয়ংক্রিয় কৌশল** (Primary dynamical mechanism for Perception)।

অধ্যাস ও অমূলক প্রত্যক্ষণ
[Illusion & Hallucination]

এতক্ষণ প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই প্রত্যক্ষণ অনেক সময় বিকৃত হয়। বিকৃত প্রত্যক্ষণ দু'রকম হয়—**অধ্যাস** (Illusion) ও **অমূলক প্রত্যক্ষণ** (Hallucination)।

অধ্যাস (Illusion)

রাত্রিবেলা আবছা চাঁদের আলোতে চলতে চলতে হঠাৎ পথের পাশে একটা সাপ দেখে চমকে উঠলাম—কিন্তু তারপর যখন একটু ভাল করে লক্ষ্য করলাম তখন বুঝা গেল ওটা মোটেই সাপ নয়, ওটা একটা দড়ি পথের পাশে পড়ে রয়েছে। এখানে প্রথমে ভুল প্রত্যক্ষণ হয়েছিল। একই ওজনের কিন্তু বিভিন্ন আকারের দু'টো বোতল নিয়ে যদি পর পর তোলা যায় দেখা যাবে যে আকারে যেটা বড় সেটা বেশী ভারী মনে হচ্ছে। আবার যদি একই হাতের পাশাপাশি দু'টো আঙ্গুলের একটাকে আর একটার উপর আড়াআড়ি ভাবে চাপিয়ে দু'টো আঙ্গুলের ডগার মাঝখানে একটা মার্বেল ধরা যায়, তা'হলে দুটো মার্বেলের অনুভূতি হয়। এখানে প্রত্যক্ষণ বিকৃত হ'চ্ছে। যদি প্রকৃত প্রত্যক্ষণ হ'ত তা'হলে আমরা দু'টো বোতলের ওজন একই বলে বুঝতে পারতাম এবং একটা মার্বেল আছে বলে বুঝতাম। এই সব বিকৃত প্রত্যক্ষণগুলোকে বলে **অধ্যাস** বা **Illusion**। এই অধ্যাসের মূল কথা হ'ল এখানে সংবেদনের কোন ভুল হয় না। ভুল যেটা হয় সেটা প্রত্যক্ষণের। তাহলে **অধ্যাস তখনই হয় যখন কোন উত্তেজক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে আমাদের ভুল প্রত্যক্ষণ হয়।** মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখা যায় তাকেও আমরা অধ্যাস বলি। কিন্তু এসব অধ্যাসের সঙ্গে আলোকরশ্মির ধর্মের একটা সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এসব ভ্রমের কথা আমরা এখানে আলোচনা করব না। এখানে আমরা সেই সব অধ্যাসের কথা আলোচনা করব যাদের উৎপত্তি হয় মনের প্রবণতা থেকে। অবশ্য একটা কথা বর্তমান মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে ভ্রম বা অধ্যাস বলে কোন কথা মনোবিজ্ঞানে থাকতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের কিছু না কিছু বিকৃত জ্ঞান দেয়। যে কোন প্রত্যক্ষণেই উত্তেজকের রূপ পরিবর্তন হয়। গভীরতার অনুভূতি, পরা-ভাবমূর্তি এ সব অভিজ্ঞতাগুলো সবই ভ্রমের ভিতর পড়ে। এ সব কারণ সত্ত্বেও অনেক মনোবিজ্ঞানী এই অধ্যাসের আলোচনা প্রত্যক্ষণ থেকে পৃথক ভাবে করেছেন। এইসব আলোচনাগুলোর কথা আমরা এখানে বলব।

অধ্যাস কি ?

প্রত্যক্ষণ বিকৃত হওয়ার মূলে যে সব কারণগুলো আছে সেগুলো অনুযায়ী আমরা অধ্যাসকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—

(১) আমরা যে ভুল জিনিসটা দেখি সেটা যদি আসল জিনিসের চেয়ে আমাদের বেশী পরিচিত হয় তা'হলে আমাদের বিকৃত প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন হয়—যারা ছাপাখানায় ভুল সংশোধন করে তাদের। হয়ত কম্পোজিটার অর্থাৎ যে হরফ সাজায় সে ভুল করে সাজিয়েছে "**দঁড়াইয়া**"। আর সংশোধনকারী পড়ে গেল "**দাঁড়াইয়া**"। ভুল সংশোধন করা হ'ল না। এর কারণ "দাঁড়াইয়া" কথাটা আমাদের বেশী পরিচিত। তাই আমাদের চোখের দ্বারা "দঁড়াইয়া" এই সংবেদন হ'লেও আমরা "দাঁড়াইয়া" এই কথাটাই প্রত্যক্ষ করি। এক কথায় আমরা বলতে পারি, মিথ্যা জিনিসটি সত্য জিনিসের চেয়ে আমাদের বেশী পরিচিত বলে আমাদের মনের প্রবণতা মিথ্যা জিনিসের উপর আসে।

মানসিক প্রবণতার দরুন অধ্যাস

(২) আগে যে ভ্রমের কথা বললাম তা হ'ল বস্তুধর্মী। কিন্তু অনেক ভ্রমের জন্য আমাদের মানসিক অবস্থা দায়ী। যেমন, অনেক দিন কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় নি, ভাবছি এলে বেশ হয়। হঠাৎ তারই মতন একজনকে রাস্তায় দেখে সেই বন্ধু ভেবে হঠাৎ ডেকে উঠলাম। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পাই। আমার কালো রংএর একটা কলম স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তায় হারিয়ে গেল। আবার বাড়ী থেকে খুঁজতে বাহির হ'লাম রাস্তায়। দূরে একটা কালো জিনিস দেখে আমার হারানো কলমের কথা ভেবে আমি খুশী মনে ছুটে কাছে গিয়ে দেখলাম যে সেটা একটা কালো কাঠি মাত্র। এই সব ভ্রমগুলোর কারণ হ'ল আমাদের মানসিক ইচ্ছা।

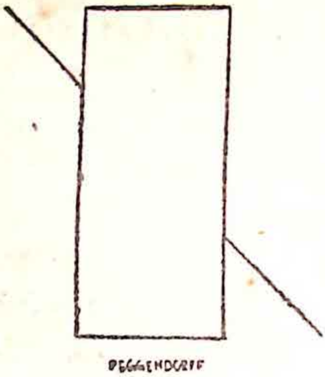
মানসিক অবস্থার দরুন অধ্যাস

(৩) এ ছাড়া আর এক ধরনের অধ্যাস সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করেছেন, সেটা হ'ল **জ্যামিতিক অধ্যাস** (Geometrical Illusion)। আমরা সাধারণতঃ সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে চাই না। তাই যখন কোন ছবি দেখি তখন সব সময় তার খুঁটিনাটি বিচার করে দেখি না। ফলে ছবির সমস্তটা মিলে আমাদের মনে একটা একক অভিজ্ঞতা আসে। এর জন্য অনেক জিনিসের আমাদের ভুল প্রত্যক্ষণ হয়। আবার এও বলা যায় যে ছবির একটা অংশ আর একটা অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমাদের ভ্রম ঘটায়। এই রকম জ্যামিতিক ভ্রম আমাদের বহু ঘ'টে থাকে। নীচে তার মধ্যে কতকগুলো ভ্রমের কথা আলোচনা করা হ'ল :—

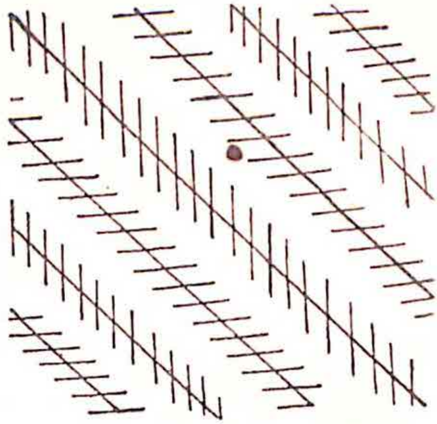
জ্যামিতিক অধ্যাস

[ক] এখানে একটা আয়তক্ষেত্রের ফাঁকা জায়গাটা বাদ দিয়ে কোণা করে একটা সোজা রেখা টানা আছে। অর্থাৎ ছবির দু'টো বিচ্ছিন্ন রেখা একই সরল-রেখার অংশ। কিন্তু আমরা দু'টো আলাদা রেখাই প্রত্যক্ষ করছি, যার একটা

উপরে ও আর একটা নীচে। এটার নাম হ'ল পেগেনডরফ্ (Peggendorff) -এর ছবি। এরই আর একরকম ধরন হ'ল জোলনার (Zollner)-এর ছবি।



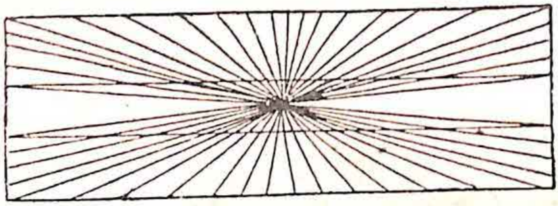
পেগেনডর্ফ-এর ছবি



জোলনার্-এর ছবি

এতে সোজা রেখাগুলি সব সমান্তরাল, কিন্তু বাঁকা রেখাগুলো থাকার জন্য এগুলোকে সমান্তরাল রেখা বলে বুঝা যাচ্ছে না।

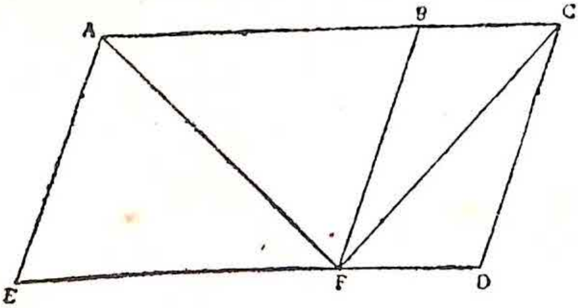
[খ] জোলনার-এর ছবির মতই হেরিং (Herring) ও ভুণ্ড (Wundt)-এর ছবি। এখানে মধ্যের তু'টোর সরল রেখা সমান্তরাল হওয়া সত্ত্বেও অন্য



হেরিং-এর ছবি

কতকগুলি রেখা থাকার জন্য মাঝখানটা বাইরের দিকে ফুলে উঠেছে মনে হয়।

[গ] সেনডোর এই রকম রেখার আর এক ধরনের ভ্রম দেখান। একে

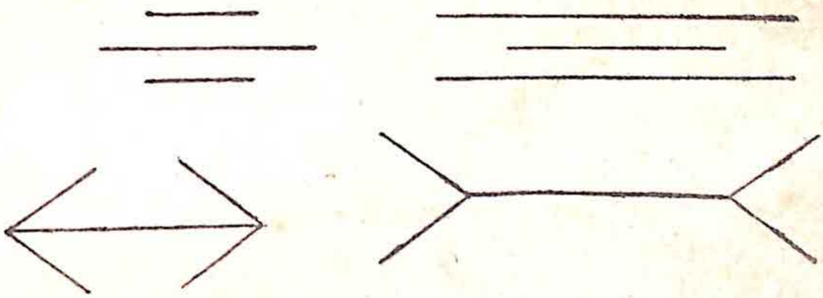


সেনডোর-এর ছবি (Sendor's figure)

বলা হয় সামন্তরিক ভ্রম। যেমন পাশের ছবিতে AF ও FC সমান কিন্তু

সামান্তরিক দু'টোর ভূমিরেখায় তফাতের জন্য একটা কর্ণকে আমরা ছোট ও অপরটাকে বড় দেখছি।

[ঘ] এই সব জ্যামিতিক ভ্রমগুলো ছাড়া যে ভ্রম সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানে বেশী আলোচনা হয়েছে সেটা হ'ল **মূলার-লায়ার এর ভ্রম** (Muller-Lyer Illusion)। এখানে দেখানো হচ্ছে একই লাইনের উপর বিভিন্ন রেখার সমন্বয় কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে আমাদের মনে ভ্রম সৃষ্টি করে। যেমন নীচের ছবিতে দেখানো হচ্ছে একই দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দু'টো রেখায় শেষ প্রান্তে



মূলার-লায়ারের ভ্রম (Muller-Lyer's illusion)

দু'রকম ভাবে দাগ টানা হয়েছে। একটায় তীরের ফলার মত দাগ আর একটায় পালকের মতন। এর প্রথমটাকে ছোট এবং দ্বিতীয়টাকে বড় দেখাচ্ছে। আবার উপরের ছবিতে সমান দু'টো রেখার পাশে দু'টো করে রেখা টানা হয়েছে। একটার দু'পাশের রেখা ছোট এবং অপরটায় বেশ বড়। তার জন্য সমান দু'টো রেখাকে আমাদের অসমান বলে ভ্রম হচ্ছে।

এই সব ভ্রমগুলো সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন এই সব জ্যামিতিক ভ্রমগুলো আমাদের চোখ নাড়াচাড়ার (Eye-movement) দরুন হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন যে আমাদের মনের সৌন্দর্যবোধের (Aesthetic Sense) ক্ষমতা থেকে এর উৎপত্তি হয়। তবে বর্তমান মনোবিজ্ঞানীগণের মতে সমস্ত জিনিসকে একসঙ্গে দেখে তার থেকে একক অনুভূতি পাওয়াই হ'ল আমাদের মনের অথবা প্রত্যক্ষণের ধর্ম। আর সেই কারণে আমরা প্রত্যেক ছবির বিশেষ বিশেষ অংশ না দেখে সম্পূর্ণটা থেকে একটা অভিজ্ঞতা পাওয়ার চেষ্টা করি। ফলে ভ্রমের সৃষ্টি হয়। এ সব কারণ সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু আলোচনার দরকার নেই। শুধু এইটুকু মনের রাখলেই চলবে যে এটা আমাদের মনের একটা বিশেষ অবস্থা উদ্ভূত। অধ্যাস সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে এ আলোচনা শেষ করব। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করে দেখেছি, রাস্তায় একটা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হওয়ার পর যখন আবার দূরে সরে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে নিজের ভুল বুঝতে পারি তখন আর দড়িকে

সাপ দেখি না, দড়িই দেখি। এটা হ'ল ভ্রমের একটা ধর্ম, এটাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই ভ্রম আমাদের ঠিক হয়ে যায়।

অমূলক প্রত্যক্ষণ [Hallucination]

প্রায়ই শোনা যায় কোন লোক সেদিন রাতে ভূত দেখেছে। এ ঘটনা অমূলক প্রত্যক্ষণের (Hallucination) উদাহরণ। আসলে আমরা এই অমূলক প্রত্যক্ষণকে ভুল প্রত্যক্ষণের মধ্যে ফেলতে পারি না। তাই এর সম্বন্ধে আলোচনা এখানে একেবারে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, শিক্ষা মনোবিদ্যায় তার কিছু গুরুত্ব নেই। এই সব অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা প্রত্যক্ষণ বা ভুল প্রত্যক্ষণ বলতে পারি না, তার কারণ প্রত্যক্ষণ এবং অধ্যাস উভয়ের জন্যই একটা উত্তেজক দরকার হয়। কিন্তু অমূলক প্রত্যক্ষে তা থাকে না। আসলে ভূতের কোন অস্তিত্বই নেই। সুতরাং এই সব অনুভূতির সময় ভূতের মতন কোন জিনিস আমাদের সামনে থাকে না। এই সব অভিজ্ঞতার উৎস একেবারে মন। স্নায়বিক উপাদানগুলোর বিকার ঘটলে আমাদের এরকম মানসিক বিকার হয়। স্টাউট বলেন এটা আমাদের মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহের পরিমাণগত পরিবর্তনের জন্য হয়ে থাকে। ফ্রয়েড্ এটাকে এক রকমের মানসিক বিকার বলে অভিহিত করেছেন এবং এর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

প্রত্যক্ষণের শিক্ষামূলক গুরুত্ব [Educational Values of Perception]

বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রত্যক্ষণকে বিবেচনা করলেও আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক প্রক্রিয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিশেষভাবে শিখনের (learning) ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের (Perception) গুরুত্বের কথা মনোবিদগণ স্বীকার করেছেন। তবে প্রত্যক্ষণ, শিখনকে প্রভাবিত করে না, শিখন প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে এ নিয়ে মনোবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। কোন কোন মনোবিদ্ বলেছিলেন, প্রত্যক্ষণে যে অতীত অভিজ্ঞতা কাজ করে তা ব্যক্তির শিখন থেকে আসে। আবার অনেকে বলেন, প্রত্যক্ষণের জন্য শিখন হয়ে থাকে। আধুনিক মনোবিদগণ এই দু'টো মতবাদের কোনটাই এককভাবে ঠিক মনে করেন না। তাঁরা, প্রত্যক্ষণ এবং শিখনের সম্পর্ক নির্ণয়ে পারস্পরিক ক্রিয়ার (interaction) কথা বলেছেন। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষণ এবং শিখন পরস্পর

পরস্পরকে সহায়তা করে। যেমন কতকগুলো অক্ষর পর পর ছাপা থাকলে তাদের আমরা শব্দ হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি না। অক্ষর সমষ্টিকে শব্দ হিসেবে প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশেষ পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন বা শিখনের প্রয়োজন আছে। আবার বিষয়বস্তু শিখনের জন্য প্রথম যা দরকার তা হ'ল আদর্শ প্রত্যক্ষণ। প্রত্যক্ষণ ছাড়া শিখন হতে পারে না একথা গেস্টাল্ট (Gestalt) মনোবিদগণ বা তাঁদের শিখনতত্ত্বে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, শিক্ষার্থী যখন কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তবেই শিখন হয়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষণের বস্তুসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সংঘবদ্ধতা শিখনের মূল কারণ। তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের আদর্শ প্রত্যক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া। কি ভাবে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশকে সুসংবদ্ধ করা যায় তার অভ্যাস গঠন করাতে হবে। শিক্ষার্থী যদি সঠিকভাবে সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষণ না করতে পারে, তা'হলে সে কোনদিনই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কারণ প্রত্যক্ষণ না হলে সমস্যা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান তার জন্মাবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্নের ঠিক মত উত্তর করতে পারছে না। এর একমাত্র কারণ হ'ল তাদের প্রশ্ন সম্পর্কে জ্ঞান পরিষ্কার নয়। অনেক সময় সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকে, যা সমস্যা সমাধানে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। এই অংশগুলোকে বাদ দিয়ে সঠিক অংশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রশিক্ষণ ছাত্রদের না দিলে তারা সমস্যা সমাধান করতে শিখবে না। তাই প্রত্যক্ষণের প্রশিক্ষণ (training in perception) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব কিছু বাদ দিলে চর্চার দ্বারা এই ধরনের অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে গঠন করা সম্ভব। শিক্ষক একই ধরনের বিষবস্তু বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের চর্চার সুযোগ করে দিতে পারেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by perception ? How it differ from sensation ? Explain your answer with concrete examples. [৩২-৩৩ পৃঃ]
2. Define perception. What are its characteristics. [৩২ পৃঃ ; ৩৪-৩৬ পৃঃ]
3. What do you mean by the expression—"our perception of things is an organised experience." What are the factors that determine perceptual organisation. [৩৬-৩৯ পৃঃ]

4. Name and explain the different case to the perception of distance and depth. [৩৪-৪৩ পৃঃ]

5. What are illusions ? Why are they caused ? Illustrate a few of them. [৪৪-৪৮ পৃঃ]

6. Write notes on the following :

[a] Seteroscope [৪২ পৃঃ] [b] Muller-lyer-illusion [৪২ পৃঃ], [c] Hallucination [৪৮ পৃঃ]

শিক্ষা ও মনোবিদ্যা

(Education and Psychology)

অন্যান্য বস্তু বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিদ্যা (Psychology) একেবারে অর্বাচীন। এমন কি বিজ্ঞানের (Biological science) অনেক শাখার তুলনায় এর জীবন কাল অনেক কম। কিন্তু জীবন পরিসর ছোট হ'লেও তা ঘটনা বহুল। তাই এই বিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হ'লে তার ঘটনা বহুল অথচ স্বল্প জীবন পরিসরের আলোচনা প্রয়োজন। শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও এ বিষয় সম্পূর্ণ নতুন। নতুন হ'লেও বলার কিছু ছিল না যদি এর সুসমঞ্জস সামগ্রিক আলোচনার সুযোগ থাকত। শিক্ষা বিজ্ঞানে আমরা শুধুমাত্র তার একটা দিক সম্পর্কেই আলোচনা করি। তাও তার একটা প্রয়োগমূলক দিক মাত্র। তাই সে আলোচনা অনেক সময় অর্থহীন এবং তাৎপর্যহীন মনে হয় আমাদের কাছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে (Educational Psychology) সার্থকভাবে জানতে হ'লে সাধারণভাবে মানুষের জীবনে মনোবিদ্যার ভূমিকা কি এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্রই (Field of Psychology) বা কি সে সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার। মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে হ'লে, তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হ'লে, এই সামগ্রিক ধারণা একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই এই ভূমিকার অবতারণা।

পঞ্চম অধ্যায়

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা

[DEFINITION OF PSYCHOLOGY]

মানুষের মনের প্রথম জিজ্ঞাসা থেকে শুরু হয়েছিল দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy), দর্শন হ'ল পৃথিবী সম্পর্কে একক জ্ঞান। এই জ্ঞান বাস্তব বা অবাস্তব দু'ধরনের সত্বার হতে পারে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে সমস্ত রকম বিজ্ঞানই দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল সুসংবদ্ধ জ্ঞান (Systematic knowledge) আহরণ করা। আমাদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। সুতরাং, সব রকম বিজ্ঞানের উৎস হ'ল দর্শনশাস্ত্র (Philosophy)। অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিদ্যার আলোচনা অনেক পরে শুরু হয়েছে। মনোবিদ্যা কি তা জানতে হ'লে তার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মনোবিদ্যাকে অন্যান্য বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিন্তাবিদগণ তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাবতে শুরু করলেন। ফলে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠল। এর বিষয়বস্তু (Subject matter) কি হবে তা নিয়ে চিন্তাবিদগণের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দিল, এই সব মতবাদকে মনোবিদ্যার 'Schools of Psychology' নামে পরিচিত। এ হ'ল ইতিহাসের কথা। এত ইতিহাস (History of psychology) আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র প্রকৃত ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই সংক্ষেপে তার অবতারণা করছি।

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা

প্রাচীন দার্শনিক **অ্যারিস্টটলকে** (Aristotle) মনোবিদ্যার আদি প্রণেতা বলা যেতে পারে। 'De Anima' নামে রচিত তাঁর বইয়ে তিনি মনোবিদ্যাকে (Psychology) পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেন। গ্রীক ভাষায় Psyche-কথার অর্থ আত্মা (Soul) এবং Logos কথার অর্থ যুক্তিপূর্ণ তথ্য বা বিজ্ঞান (science)। তাই প্রাচীন দার্শনিকগণের ধারণা অনুযায়ী মনোবিদ্যা ছিল, আত্মার অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Psychology is the science of soul)। পরবর্তীকালে **ডেকার্তে** (Decartes) সমস্ত বিশ্বজগতকে দু'ভাগে ভাগ করলেন, জড় জগত (Matter) এবং মনজগত (Mind), এই দু'টো পরস্পর নিরপেক্ষ দু'টো পৃথক সত্বা। তাঁর এই মতবাদকে দর্শনে বলা হয় দ্বৈতবাদ

প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ

(Dualism)। ডেকার্তের মতে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হ'ল মন (Mind)। তার কাজ হবে মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুশীলন করা (Psychology is the science of Mind)। কিন্তু, এই ধরনের সংজ্ঞার অসুবিধা আত্মা অথবা মনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং, এরকম কোন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject matter of science) হ'তে পারে না। তাছাড়া, মনোবিদ্যাকে শুধুমাত্র মনের-বিজ্ঞান বললে অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যেখানে মনের অনুশীলন করা হয়, তার সঙ্গে ঠিক পার্থক্য করা যায় না।

মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মতবাদ ও জেমস্ এর মতবাদ

এই কারণে, **লক্** (Locke), **হবস্** (Hobbes), **বেন** (Bain) প্রভৃতি দার্শনিক এই মতবাদকে আরও বিশ্লেষন করে বললেন—অভিজ্ঞতাই হ'ল সব জ্ঞানের ভিত্তি। এই অভিজ্ঞতা আসে প্রত্যক্ষণের (Perception) মাধ্যমে। 'মনের' যা প্রত্যক্ষ করা যাবে তা হ'ল মানস ক্রিয়া (Process of consciousness)। চেতনার মধ্যেই আমরা মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। এই মতবাদকে আরও সুপ্রতিষ্ঠ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে **উইলিয়ম জেমস্** (William James)। তিনি বললেন, মনোবিদ্যা বস্তুনির্ভর বিজ্ঞান হ'তে পারে যদি তার অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয় চেতনা (Consciousness)। অর্থাৎ, মনোবিদ্যা হ'ল 'চেতনার অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Psychology is the Science of consciousness)। মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাকে যদি মেনে নেওয়া যায় তবে দুটো অসুবিধা দেখা দেয়। একটা হ'ল চেতনার অনুশীলন দ্বারা আমরা মাত্র বিশেষ একজনের মন সম্বন্ধে জানতে পারি, তাও আবার অন্তর্দর্শন (Introspection) দ্বারা। কিন্তু, বিজ্ঞান হ'বে সাধারণ বস্তুধর্মীজ্ঞান এবং একই সময়ে নৈর্ব্যক্তিক (Objective)। দ্বিতীয়তঃ, চেতনার অনুশীলন করে আমরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি না। চেতনা (Consciousness) একটি অপ্রমাণিত অনুমান মাত্র।

আচরণবাদ —ম্যাকডুগাল, ওয়াটসন

মনোবিদ্যার এই সব দার্শনিক সংজ্ঞা পরোক্ষভাবে তাকে বারে বারে বিজ্ঞানের পর্যায় থেকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে মাত্র। তাই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এই সব দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক আলোড়ন হয়েছে। এই সময়কার মনোবিদগণের প্রচেষ্টা মনোবিদ্যাকে বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করায় কেন্দ্রিভূত হ'ল। তাই **উইলিয়ম ম্যাকডুগাল** (William Mcdougall) বললেন—মনোবিদ্যা হ'ল প্রাণীর আচরণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Psychology is the positive science of the behaviour of living beings.)। তিনি প্রাণীর আচরণের (behaviour) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। তাঁরই মত আচরণবাদী

(Behaviourist) **ওয়াটসন** (J. B. Watson), মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিলেন—মানুষের আচরণ অনুশীলন করাই হ'ল মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য (Psychology is the science of human behaviour), ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) আচরণ বলতে উদ্দেশ্যমূলক কাজের কথা বলেছেন (Goal seeking activity)। কিন্তু ওয়াটসন (Watson) আচরণ বলতে শুধুমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ার (Bodily response) কথা বলেছেন। সুতরাং ম্যাকডুগালের সংজ্ঞায় যদিও বা আমরা কিছুমাত্র মানসিক প্রক্রিয়ার (Mental process) অস্তিত্বের উল্লেখ পাই, ওয়াটসনের সংজ্ঞায় তার কোন স্থান নেই। আচরণবাদীদের (Behaviourist) এই যে মতবাদ—মানসিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে মানুষের অনুশীলন তাকে তাই সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া যায় না। আচরণ থেকে মানসিক অবস্থার একটা ধারণা আমরা করতে পারি। কিন্তু সেটাই সব নয়। কারণ, তা'হলে অন্যান্য জীববিদ্যা থাকতে মনোবিদ্যার প্রয়োজন কোথায়?

মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াকে কখনও সম্পূর্ণ বাহ্যিক পরিবর্তনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ কথা বিবেচনা করে মনোবিদ্ **উডওয়ার্থ** (R.S. Woodworth), এক নতুন সংজ্ঞার অবতারণা করলেন। এখানে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। দার্শনিক সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে মনের যে বিমূর্ত ধারণা ছিল, তাকেও যেমন বর্জন করলেন, তেমনি অন্যদিকে চরম আচরণবাদীদের মত তাকে একেবারে অস্বীকার করলেন না। তাঁর মতে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হ'ল মানুষের কাজ (activity), মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করা (Psychology is the science of activities of the Individual)। কিন্তু, শুধুমাত্র ক্রিয়াকলাপ দ্বারা মানুষের বিচার করা যায় না। এমন অনেক মানসিক প্রক্রিয়া আছে, যেখানে ব্যক্তির বাহ্যিক কোন আচরণই লক্ষ্য করা যায় না। যদিও "ব্যক্তি" (Individual) এই কথার মধ্যে দেহ এবং মন দু'টোকেই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তবুও তাঁর সংজ্ঞার মধ্যে বাহ্যিক আচরণকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আচরণবাদ উড্‌ওয়ার্থ

মনোবিদ্যার, এই সব সংজ্ঞা থেকে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন একটা সুদৃঢ় ধারণা করা আমাদের পক্ষে সত্যিই মুশকিল। দার্শনিকদের থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের সংজ্ঞাগুলোকে আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁরা এক একটা দিকের উপর জোর দিয়েছেন। এই সব সংজ্ঞার মধ্যে একটা আপাতঃ বিরোধ দেখা গেলেও একটা মিলও আমরা খুঁজে পেতে পারি। অধ্যয়নের বিষয়বস্তু যে মানুষ, সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হ'লে তার দেহ সম্পর্কে যেমন জানার প্রয়োজন, তেমনি মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও জানা

উপসংহার

দরকার। এদের কোন একটাকে বাদ দিয়ে মনোবিদ্যা চলতে পারে না। সুতরাং মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে জানা আর তার বিষয়বস্তু হ'ল দেহ-মন নিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ। এই মানুষের অস্তিত্ব নিরূপিত হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে তার অভিযোজনের মাধ্যমে। এই অভিযোজনে দেহ এবং মন দুই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আমরা যদি তার এই অভিযোজনকে অনুশীলন করি তা'হলে তাকে সম্পূর্ণ অনুশীলন করা সম্ভব হবে। আধুনিক মনোবিদ্ মান্ (N. L. Munn), মনোবিদ্যার আধুনিক ধারা অনুশীলন করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য, তিনি বলেছেন—"Psychology to-day concerns itself with the scientific investigation of behaviour, including from the point of behaviour of what earlier psychologists dealt with as experience. In the last analysis it studies the over all adjustment of the organism".

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী
[Psychological Point of View]

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিলেই তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝা যায় না। বিশ্বজগতকে জানার আকাজ্ক্ষা থেকে যেমন গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তেমনি মানুষকে পরিপূর্ণরূপে জানার জন্য সৃষ্টি হয়েছে মনোবিদ্যার। মানসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার করে তাদের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করাই হ'ল মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। অন্যান্য বিজ্ঞানে যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেমন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি, আজকাল মনোবিদ্যায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এসব সত্ত্বেও মনোবিদ্যার নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য বস্তুনির্ভর বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় মনোবিদ্যার দৃষ্টিভংগী (Psychological stand point)। এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগতি না থাকলে মনোবিদ্যার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা হবে না।

মনোবিদ্যার বিশেষত্ব

মনোবিদ্যার এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান হ'ল তার বিষয়বস্তুর। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হ'ল বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া (Mental process)। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল জড় পদার্থ। মনের চেতনা (consciousness) আছে, জড়ের তা নেই। আবার জড়ে বিস্তৃতি আছে, অবস্থান আছে, কিন্তু মনের কোন অবস্থিতি নেই। জড়ের অবস্থান নিরূপিত হয় স্থান-কালের মাত্রা (time-space dimension) দিয়ে।

বিষয়বস্তু

মনের অস্তিত্ব নিরূপিত হয় ব্যক্তিসত্তার দ্বারা (subjective dimension)। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনোবিদ্যার একটা নিজস্বতা আছে।

অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ছাড়াও অনুশীলনের পদ্ধতিতেও মনোবিদ্যার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মনোবিদ্যার অনুশীলন পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। অন্যান্য বিজ্ঞান বিশ্বকে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে অনুশীলন করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে হ'তে পারে না। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধদি (objective method) ব্যবহার করা হ'লেও ব্যক্তিনির্ভর বা অন্তর্দর্শন পদ্ধতি (Method of introspection) এখনও মনোবিদ্যার পক্ষে অপরিহার্য।

পদ্ধতি

মনোবিদ্যার আর একটা বিশেষত্ব হ'ল—ব্যক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা (Individualistic)। অন্য যে কোন বস্তু নির্ভর বিজ্ঞান সব সময় কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে। এবং তারা চেষ্টা করে ঐ শ্রেণীর বস্তুর (class of object) কি একক গুণ আছে তা আবিষ্কার করতে। এমনকি সমাজবিদ্যাও (Sociology) মানুষকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করে। কিন্তু মনোবিদগণ প্রত্যেক একক মানুষকে বিচার করতে সচেষ্ট।

দৃষ্টিভঙ্গি

অন্যান্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল ঘটনাকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে আলাদা করে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবেশভিত্তিক। মনের একটা সামগ্রিক রূপ আছে। পরিবেশ থেকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; মানসিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়াগুলোকেও পরস্পর সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। মানুষের অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব। তাই এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদের অনুশীলন করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। কোন রকম কৃত্রিমতাই, ঐ সব মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যহত করে।

পরিবেশের উপর গুরুত্ব

সাধারণতঃ বিজ্ঞানের মধ্যে অধীত বস্তুর দু'টো দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, পরিমাণগত দিক (Quantitative aspect) এবং গুণগত দিক (Qualitative aspect)। বস্তুজগতে প্রত্যেক জিনিসেরই পরিমাণ আছে। তাই সেই বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য বিজ্ঞান তার সংখ্যা ও পরিমাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আধুনিক মনোবিদ্যায়ও আমরা তাই পরিমাপ পদ্ধতির উৎকর্ষণের উপর গুরুত্ব দেখতে পাই। কিন্তু, তা'হলেও সে পরিমাপ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরোক্ষ (indirect)। তাই মনোবিদ্যায় আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গুণগত

পরিমাপ

দিকের (Qualitative aspect) উপর গুরুত্ব দেখতে পাই। এই গুণগত অনুশীলনকে সঠিক সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোবিদগণ পরিমাপের সাহায্য নিয়েছেন মাত্র।

মনোবিদ্যার এই সব দৃষ্টিভঙ্গী তার নিজস্বতার পরিচায়ক। এই সব বৈশিষ্ট্য গুলো তার মধ্যে অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। তবে এই সব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য বা অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তার এই পার্থক্য থাকার জন্য অনেকে তাকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকার করতে রাজী নন। কিন্তু আধুনিক মনোবিদগণ তাঁদের যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ নির্ভর অনুশীলন পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে আর নিছক ধ্যানের কোন স্থান নেই। মনোবিদ্যা সত্যিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যদিও সে পদ্ধতি তার একান্তই নিজস্ব।

উপসংহার

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা
[Different branches of Psychology]

মানুষকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, বা মনোবিদ্যার সৃষ্টি খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। মানসিক প্রক্রিয়ার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য জার্মান মনোবিদ্ ভুণ্ড (W. Wundt) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মানীর লাইপজিগ্ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এক পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। তিনি যে সব বিষয়ের উপর পরীক্ষা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত করেন, তা আধুনিক মনোবিদ্যার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিত্যজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার এই পরীক্ষাগার (Psychological laboratory) মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিকাশে যে যথেষ্ট সহায়তা করেছে, তা বর্তমানে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। পরীক্ষাগারে মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলনের যে সূচনা ভুণ্ড (Wundt) করেছিলেন, তা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষাও যে পরিমাণে বেড়েছে, তার প্রয়োগও বেড়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত রকম কাজের মধ্যে মনোবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োগ করা হ'চ্ছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে মনোবিদ্যার দু'টো মূল শাখা আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের মত। একটা শাখা হ'ল বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা বা তাত্ত্বিক মনোবিদ্যা (Pure Psychology or theoretical Psychology)। এর উদ্দেশ্য হ'ল যে কোন ধরনের পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মানসিক প্রক্রিয়া, আচরণ, ইত্যাদির গতি, প্রকৃতি অনুশীলন করা; তাদের সম্পর্কে বিশেষ ও সামগ্রিক জ্ঞান সংগ্রহ করা। অপর শাখাকে বলা হয় ফলিত

মনোবিদ্যার প্রগতি

মনোবিদ্যা বা প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যা (Applied Psychology)। এই শাখার উদ্দেশ্য হ'ল মানসিক প্রক্রিয়া, আচরণ, ইত্যাদি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের জীবন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা। কিন্তু, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে, মানুষের কর্ম পরিধি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, কোন বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই মনোবিদ্যার জ্ঞানকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে সৃষ্টি হ'য়েছে নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্র। মানুষের আচরণ তার কর্ম পরিস্থিতি ভেদে যে বিশেষ রূপ নেয়, তার সার্থক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার (Applied Psychology) মধ্যেই নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। এখানে আমরা এরকম কয়েকটা শাখা সম্পর্কে উল্লেখ করব।

দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যার যে শাখা মানসিক প্রক্রিয়াকে দৈহিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে, তার নাম হ'ল **দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যা** (Physiological Psychology)। দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু হ'ল ইন্দ্রিয় (senses), পেশী (Muscle), গ্রন্থি (Glands), মস্তিষ্ক (Brain) এবং সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)। মনোবিদ্যার এই শাখার উদ্দেশ্য হ'ল সংবেদন (Sensation), প্রক্ষোভ (Emotion) ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক সংগঠনের বা পরিবর্তনের সম্পর্ক নির্ণয় করা। দেহতত্ত্বগত মনোবিদগণ (Physiological Psychologists) আজ পর্যন্ত দেহ ও মন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

সমাজ-মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যার জ্ঞানের আর একটা প্রয়োগ ক্ষেত্র হ'ল সমাজ। মানুষ সামাজিক জীব। আদিম যুগ থেকে সে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। বৈজ্ঞানিক অর্থে সমাজ বলতে এ রকম একটা দলকে বুঝি যার প্রত্যেক সভ্য (Individual member) পরস্পরের সঙ্গে সচেতন মানসিক আদান প্রদানের মাধ্যমে একটা সাধারণ উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই সমাজ মানুষের প্রয়োজনে তৈরী। তারই প্রয়োজনে সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন হ'য়ে চলেছে। সমাজের এই ইতিহাস আর প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য বিজ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তা হ'ল সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)। কিন্তু এই সমাজ বিজ্ঞানের অনুশীলনে মনোবিদ্যার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। মানুষের গড়া এই সমাজ সম্পর্কে জানতে হ'লে মানুষ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। আর তা আমরা পাই মনোবিদ্যার মাধ্যমে। মনোবিদ্যার যে শাখা মানুষের সমাজ প্রকৃতি ও তার সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান জোগায় তাকে বলা হয় **সমাজ মনোবিদ্যা** (Social Psychology)। কেন

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে? কেন তাদের একটা সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে? কি ধরনের মানসিক বল (Mental force), তাদের এই ধরনের আচরণ করতে বাধ্য করায়? দলগত মানসিকতার (Group mind) বৈশিষ্ট্য কি? এই সবই হ'ল সমাজ মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু। এক কথায় মানুষকে একক বিচ্ছিন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচনা না করে, তাকে দলবদ্ধ জীব হিসেবে ধরে নিয়ে, তার মানসিক অবস্থা ও আচরণ সম্পর্কে অনুশীলনই হ'ল সমাজ মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। সমাজ মনোবিদ্যার জ্ঞান আমাদের সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের সহায়তা করে।

মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য। তবে এর সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। মনোবিদ্যার এই বিশেষ শাখাকে বলা হয় **শিক্ষা-মনোবিদ্যা** (Educational Psychology)। এর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের শিক্ষাকালীন মানসিক অবস্থা ও আচরণকে অনুশীলন করা।

শিক্ষা-মনোবিদ্যা

শিক্ষক (Teacher), শিক্ষার্থী (Pupil) এবং শিক্ষাপদ্ধতির (Teaching method) কর্মক্ষমতাকে (efficiency) বাড়ানোই হ'ল এর উদ্দেশ্য। মনোবিদ্যার এই শাখায় বিশেষভাবে শিশুদের নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর একটা উপশাখা হ'ল শিশু-মনোবিদ্যা (Child-Psychology)। শিক্ষা-মনোবিদ্যায় মানুষের প্রবৃত্তি (Instinct), ও ঐ সব প্রবৃত্তিকে কিভাবে ভাল শিখন পদ্ধতির (Learning method) দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য বিষয় (School-Subject) এবং শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়, মনোবিদ্যার এই শাখায়। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ মানুষের বা আরও বৃহত্তর অর্থে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অনুকূল। আলোচ্য বইয়ের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমরা এ সম্পর্কেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব।

মনুষ্য জীবনের আর একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র, যেখানে মনোবিদ্যার জ্ঞান তাকে সহায়তা করে, তা হ'ল শিল্প ক্ষেত্র। শিল্প প্রতিষ্ঠান (Industrial organisation) হ'ল আধুনিক সভ্যতার প্রতীক, সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্রও বটে। এই সব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মানসিকতার লোক এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। এই

শিল্পতত্ত্বগত মনোবিদ্যা

যে ভিন্ন ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসে বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানে একত্রে কাজ করছে এবং তার ফলে যে নতুন শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জানাই হ'ল **শিল্পতত্ত্বগত মনোবিদ্যার** (Industrial Psychology) উদ্দেশ্য। মনোবিদ্যা শ্রমিক সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ যন্ত্র নয়। তাকে ইচ্ছামত সব কিছু করানো যায় না।

তাকে রক্তে-মাংসে তৈরী স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক সত্তা বলা যেতে পারে। এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার নিজেরই আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি মানসিক অবস্থা। তাই শুধু খেতে দিলেই সে ঠিক চলবে না। তার চাহিদার পূরণ করতে হবে। শিল্পতত্ত্বগত মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করাও বটে কিন্তু কর্মীকে বঞ্চিত করে নয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের সুযোগ সুবিধার উপর লক্ষ্য রাখাও তার কর্তব্য। কর্মী নির্বাচন (Selection of workers), শিক্ষা (Training), তাদের নিয়োগ (appointment), তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা (Health problem), তাদের দুর্ঘটনার সমস্যা (accident), তাদের আর্থিক চাহিদা (Economic need), অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক (Human relation), প্রভৃতি সব কাজকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে করায় মনোবিদ্যা বর্তমানে সাহায্য করছে। এছাড়া, প্রচার (Publicity) এবং বিক্রয় বিভাগের (Marketing) কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারেও মনোবিদ্যা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সাহায্য করছে।

মনোবিদ্যার আর একটা প্রয়োগমূলক দিক হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) রক্ষার ক্ষেত্র। আমাদের শরীরও যেমন অসুস্থ হয়, মনও তেমনি হ'তে পারে। এই অসুস্থ বা অস্বাভাবিক মনকে অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হ'ল **অস্বাভাবিক মনের জন্য মনোবিদ্যা** (Abnormal Psychology)।

অস্বাভাবিক মনের-জন্য মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যার এই শাখা দু'পর্যায়ে কাজ করে। **প্রথমতঃ** মানসিক অসুস্থতাকে পর্যবেক্ষণ করা ও তার কারণ খুঁজে বাহির করার কাজ। চিকিৎসকরা যেমন, বিভিন্ন উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয় করেন, তেমনি মানসিক রোগের চিকিৎসকগণও উপসর্গ দেখে কি ধরনের অসুস্থতা হয়েছে তা নির্ণয় করেন। এই অংশকে বলা হয় 'Psycho-pathology'। **দ্বিতীয়তঃ**, তাঁরা রোগ নির্ণয়েই ক্ষান্ত নন। তার চিকিৎসা পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেছেন। কারণ মানুষকে সুস্থ জীবন যাপনে সহায়তা করাই হ'ল মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তাই মনোবিদ্যায় রোগ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিরও প্রবর্তন করা হয়েছে। এই কাজকে বলা হয় 'Psycho therapy'।

দৈনন্দিন জীবনের এই সব প্রয়োজনীয় দিক ছাড়াও মনোবিদ্যার জ্ঞান আরও নানান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীবন ধারণের তাগিদেই সমস্ত বিজ্ঞানের সৃষ্টি। মনোবিদ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য

উপসংহার

প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকেও আর বর্তমানে অস্বীকার করা যায় না। মনোবিদ্যা মানুষকে তার নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। এই দিক থেকে বিচার করলে, মনোবিদ্যা মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি দান করে। দার্শনিক সক্রেটিস্ বলেছিলেন,—'Know

thyself'। নিজেকে জানবার যে জ্ঞান বা বিজ্ঞান তা জ্ঞানের অন্ত কোন শাখার চেয়ে ছোট বা কম গুরুত্বপূর্ণ হ'তে পারে না। নিজেকে জানার যেমন একটা প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি একটা অনুভূতির দিকও আছে। আত্মজ্ঞান পাওয়ার যে আনন্দ তা কোন বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে প্রকৃতভাবে জেনে, পারিপার্শ্বিকের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় বলেই মনোবিদ্যার অনুশীলন এতই গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা
[DEFINITION OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY]

ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি শিক্ষা-মনোবিদ্যা, মনোবিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মনোবিদ্যার ক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত। সামগ্রিকভাবে মানুষকে তার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করাই তার কাজ। বিশেষভাবে তার আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, নির্ধারণ এবং উন্নতিকরণই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই আচরণ অনুশীলন করতে গিয়ে দেখা গেল, মানুষের আচরণের পরিধি এতই বিস্তৃত এবং পরিবর্তনশীল যে তাকে কোন একটা মাত্র সাধারণ নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। তাকে অনুশীলন করার জন্য আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র দরকার। মানুষের জীবন পরিস্থিতির সমস্ত স্তরেই মনোবিদ্‌কে পৌছাতে হবে। আর সে অনুশীলন দক্ষতার সঙ্গেই করতে হবে। তাই বিশেষজ্ঞের (specialist) দরকার। মানুষের জীবন পরিস্থিতির প্রকৃতিভেদে তার আচরণকে অনুশীলন করার জন্য দেখা দিলেন বিশেষজ্ঞ মনোবিদ্‌গণ (specialist Psychologist)। ফলে তাদের কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বিভিন্ন মনোবিদ্যার শাখা (Branches of Psychology)। কারণ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা এত বেশী পরিমাণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করলেন যে তাদের একত্রিত করলে মনোবিদ্যার সীমা মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology) এমনই একটা আলোচনার ক্ষেত্র। মনোবিদ্যার অন্যান্য শাখার মত শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের আচরণ অনুশীলন করা। কিন্তু এই আচরণ, সামগ্রিক আচরণ নয়, বিশেষ এক পরিস্থিতির আচরণ। এই পরিস্থিতি হ'ল শিক্ষা পরিস্থিতি। তা'হলে, শিক্ষা মনোবিদ্যা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকেই শুধু অনুশীলন করে। অর্থাৎ, **শিক্ষা মনোবিদ্যা হ'ল প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার সেই শাখা যার মধ্যে আমরা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করি** [Educational Psychology is a branch of applied Psychology which deals with behaviour of the organism when he is under the influence of the social process of education] মনোবিদ্‌ জাড্‌ (C. H. Judd), মনে করেন, যে

শিক্ষা মনোবিদ্যা কি ?

শুধুমাত্র 'শিক্ষাকালীন আচরণ', এইটুকু বললে, শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিস্তৃতি বোঝা যায় না। তাই তিনি শিক্ষা (education) কথাটাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের আচরণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব সময়েই পরিবর্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হ'চ্ছে। যে কোন রকম আচরণের পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধনই হ'ল বিকাশের (development) নামান্তর মাত্র, আর তাই শিক্ষা। সুতরাং **শিক্ষা-মনোবিদ্যা হ'ল মনোবিদ্যার সেই শাখা যা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে।**[1]

আধুনিক আমেরিকান মনোবিদ্‌গণ (American Psychologist) শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে আরও ব্যাপক বিশ্লেষণের দৃষ্টি ভংগী দিয়ে দেখেছেন। তাঁরা এর প্রয়োগমূলক দিকের কথা চিন্তা করে বলেছেন, মনোবিদ্যার এই শাখা শুধুমাত্র যে শিক্ষার্থীর (Educand) আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত তা নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে (Field of education) যে সব ব্যক্তিরা থাকেন, বিশেষভাবে শিক্ষক (Teacher) তাঁদেরও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। তাই আধুনিককালে, আমেরিকায় শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology) কথাটার পরিবর্তে **'শিখন ও শিক্ষাদানের জন্য মনোবিদ্যার'** (Psychology of teaching and Learning) এ ধরনের একটা কথা বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মনোবিদ্ **বার্ণার্ড** (Barnerd) বলেছেন, শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ হ'ল বিদ্যালয়ে শিখন (Learning) এবং পাঠদান (teaching) সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তিনি শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন—"Educational Psychology, one of the major divisions of the broad study, deals with learning and teaching, especially in the schools, which is society's formal institution for facilitating learning."[2] যে কোন ধরনের শিক্ষার কথা বিবেচনা করি না কেন আমরা দেখতে পাবো প্রত্যেক জায়গায়ই শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার জ্ঞানকে প্রয়োগ করার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এক কথায় শিক্ষা-মনোবিদ্যা হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ। সাধারণ মনোবিদ্যায় ব্যক্তির আচরণ ও বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সুষ্ঠু

আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গী

1. "Educational Psychology may be defined as the science which describes and explains the changes that take place in individuals, as they pass through various stage of development from birth to maturity"—C. H. Judd: Educational Psychology.

2. Psychology of Learning and teaching : Barnerd.

পথে পরিচালিত করা। মনোবিদ্ স্কিনার (C. E. Skinner) এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা মনোবিদও (Education Psychologist) সাধারণভাবে একজন মনোবিদ্। কিন্তু, তিনি বিশেষভাবে তাঁর জ্ঞানকে প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করেন। তিনিও আচরণ এবং তার সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী, কিন্তু একই সঙ্গে তার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে বেশী উৎসাহী। মনোবিদ্ কোলেসনিক্ (W. B. kolesnik)[1] শিক্ষা-মনোবিদ্যা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁর পুনরাবৃত্তি করে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। তিনি বলেছেন—**শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তার উন্নতি সাধন করতে পারে মনোবিদ্যার যে সব তত্ত্ব, তাদেরই বিশেষ অনুশীলন হ'ল শিক্ষা মনোবিদ্যা। অর্থাৎ মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিকই হ'ল শিক্ষা-মনোবিদ্যা।**"

শিক্ষা-মনোবিদ্যার ইতিহাস
[History of Educational Psychology]

আপাতঃভাবে আমাদের ধারণা হ'তে পারে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় যেহেতু মনোবিদ্যার পরীক্ষিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেহেতু তার বিকাশ মনোবিদ্যার অনেক পরে হয়েছে। একথা ঠিক যে 'শিক্ষা-মনোবিদ্যার' নামকরণ বেশী দিনের নয়। কিন্তু, নামকরণ নতুন হ'লেও সমস্যা খুবই প্রাচীন। তাই প্রাচীন চিন্তা ধারায় এই সমস্যার যে সব সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, তার মধ্যে আমরা শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রাথমিক উপাদান খুঁজে পাই। মনোবিদ্যা (Psychology), শিক্ষা বিজ্ঞান (education) এবং শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology) এই বিচারে প্রায় সমকালীন। প্রাচীন দার্শনিকগণ মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত রকম সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাদের সেই আলোচনার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে যেমন একদিন মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিকাশ হয়েছিল, তেমনি তাদের শিক্ষা চিন্তার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে শিক্ষা বিজ্ঞান (Education) এবং শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology) আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপাদান, অতীতের মধ্যে খুঁজতে গেলে, মনোবিদ্যার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনারই পুনরাবৃত্তি হবে।

সূচনা

1. "Educational Psychology is the study of those facts and principles of Psychology which help to explain and improve the process of education......" Educational Psychology—W. B, Kolesnik.

তবুও পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার দিকের উপর আমরা যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করব। এই ইতিহাসের ধারা আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃত মূল্যায়ণে সহায়তা করবে।

প্লেটো

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক **প্লেটোর** (Plato) চিন্তাধারার মধ্যে শিক্ষা মনোবিদ্যার উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান সঠিক জ্ঞান নয়। অন্তর্নিহিত ধারণাই (ideas) কেবলমাত্র প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে। এই সব ধারণা (ideas) অর্জিত নয়; ব্যক্তি জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে। তার এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের জন্মের পূর্বেই আত্মা এই জ্ঞান ধারণ করে। কিন্তু, যখনই তা দেহ অভ্যন্তরে যায় তখনই ব্যক্তির কাছে ধারণাগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। প্লেটোর এই দার্শনিক তত্ত্ব যতই অস্বচ্ছ এবং অবাস্তব মনে হউক না কেন, শিখন সম্পর্কে তিনি এর থেকে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর এই তত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তিনি বলেছেন, শিখন (Learning) হ'ল এই সব বিস্মৃত ধারণাগুলোকে টেনে বাহির করার প্রক্রিয়া। আর শিক্ষাদানের (teaching) উদ্দেশ্য বাইরে থেকে নতুন কিছু দেওয়া নয় ব্যক্তির মধ্যে যে ধারণাগুলো আছে, সেগুলোকে টেনে বাহির করায় সহায়তা করা। অর্থাৎ, ব্যক্তির নিজস্ব জন্মগত ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে বিকশিত হ'তে সহায়তা করা। প্লেটোর এই দৃষ্টিভংগী নিঃসন্দেহে শিক্ষা-মনোবিদ্যার সূচনা ঈঙ্গিত করে। তাঁরই প্রবর্তিত পথে আজকের মনোবিদ্যা সম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির (Teaching method) প্রচলন করা হয়েছে (Socratic method)। এছাড়াও **প্লেটো** বলেছেন, মনই (Mind) একমাত্র সত্বা যা প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে পারে। এই কাজে মনকে সার্থকভাবে লাগানোর জন্য মনের প্রশিক্ষণ (Training) প্রয়োজন। পরবর্তীকালে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় যে মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of formal discipline) প্রচলিত হ'য়েছিল, প্লেটোর এই চিন্তার মধ্যে আমরা তারই ঈঙ্গিত পাই। সুতরাং, শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু ও আলোচনা হঠাৎ, এক দিনে শুরু হয় নি। বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

অ্যারিষ্টটল

পরবর্তী সময়ে প্লেটোর শিষ্য **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) তাঁর মতবাদের থেকে কিছুটা দূরে সরে জান। তিনি মনে করেন সংবেদনগুলো (sensation) অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এর তাৎপর্য হ'ল প্রত্যক্ষ বস্তুর বর্তমানে জ্ঞান দৃঢ় হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায়। অর্থাৎ, তাঁর এই মতবাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের (sense training) উপর গুরুত্বের এবং বিষয়বস্তুকে যতদূর সম্ভব মূর্ত (concrete) ভাবে উপস্থাপন করার ইঙ্গিত পাই। আধুনিক শিক্ষা-

মনোবিদ্যায়ও এদের গুরুত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্লেটোর মত তিনিও মানসিক শৃঙ্খলাবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশেষভাবে পাঁচটা মানসিক শক্তির (Faculty) চর্চ্চার কথা বলেছেন। শিখন সম্পর্কে তাঁর মতবাদও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক মনোবিদ্যায় তাকে আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি শিখনের জন্য সংযোগকে (Association) দায়ী করেছেন এবং সংযোগের বিভিন্ন সূত্রও (Laws of association) গঠন করেন। যদিও, এই সূত্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তবু একথা ঠিক যে আধুনিক শিক্ষা মনোবিদগণও মানুষের শিখনকে (Learning) অনেক ক্ষেত্রে এই সংযোগ দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম শতাব্দীর (Ist Century, A. D.) শ্রেষ্ঠ রোমান শিক্ষাবিদ্ **কুইন্টিলিয়ন** (Quintilian) তাঁর 'Institute of oratory' তে যে সব মতবাদ প্রচার করেন, তার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিশেষ তফাত আছে বলে মনে হয় না। তিনি এমন অনেক তত্ত্ব প্রচার করেছেন যা আধুনিক মনোবিদগণ অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা পরবর্তীকালে সঠিক বলে প্রমাণিত করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, শিশুরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (Individual difference) বজায় রাখে। এবং শিখনের সময় বিশেষভাবে এদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারণা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির (Readiness) কথা, ছোট ছোট শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভাগ করার কথা (Smaller class unit), মুক্ত শৃঙ্খলার কথা (free discipline) সবই কুইন্টিলিয়ন বলে গেছেন। এ ছাড়া, খেলাভিত্তিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সামাজিক মূল্যের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলে গেছেন। অর্থাৎ, এক কথায় আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের তিনি উল্লেখ করে গেছেন। এটা খুবই আশ্চর্যের ঘটনা, তাঁর এই সব মতবাদ কেন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি! এ কি শুধু আধুনিক শিক্ষামনোবিদগনের পরীক্ষার অপেক্ষায়? না, অন্য কোন সামাজিক কারণে?

কুইন্টিলিয়ন

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম যুগে আমরা লক্ষ্য করি কিছু কিছু ধর্মযাজক শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাঁদের লেখার মধ্যেও আমরা শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপাদান লক্ষ্য করি। এই সব যাজকদের মধ্যে **সেণ্ট জন্ চ্রাইসোস্টম** (St. John Chrysostom), **সেণ্ট অগাস্টাইন** (St. Augustine) এবং **সেণ্ট টমাস্ এ্যাকুইনাস** (St. Thomas Aquinas)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চ্রাইসোস্টম তাঁর 'De liberis Educandis'-তে বিশেষভাবে শিশুর জীবন বিকাশের নীতি (Principle of child development) সম্পর্কে যে

যাজকদের অবদান

আলোচনা করেছেন তা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার নীতির বিশ্লেষণে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে, গৃহ (home). প্রেষণা (motivation), যৌন শিক্ষা (sex-education), বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (vocational guidance), ইত্যাদির গুরুত্বের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেণ্ট অগাস্টাইনের লেখার মধ্যেও আমরা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মনোবিদ্যা সম্মত ধারণা পাই। তিনি নতুন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতকগুলো নীতি নির্ধারণ করেন। এই সব নীতির মধ্যে আছে, খুব বেশী এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলবে না ; ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, শিক্ষার্থীদের অনুরাগ (interest) যাতে সৃষ্টি হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে ; শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সক্রিয় করতে হবে ; বোধ-গম্যতার (understanding) উপর গুরুত্ব দিতে হবে ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটার কথাই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণ উল্লেখ করেছেন, এবং শিখনের আদর্শ শর্ত (conditions of effcective learning) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেণ্ট্ এ্যকুইনাস্ তাঁর 'De Magistro' নামে বইয়ে শিক্ষামনোবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মানুষ আত্ম প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারাই আবিষ্কারের মাধ্যমেই কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ করতে পারে। পাঠদানের কৌশল (Instruction) একটা বাহ্যিক সাহায্য (external aid) মাত্র। পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক কেবলমাত্র প্রস্তাব করেন, তিনি কি ভাবে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান করতেন। এই মতবাদ শিক্ষামনোবিদ্যায় গেস্টাণ্ট মনোবিদগণের (Gestalt Psychologist) শিখন সংক্রান্ত মতবাদেরই অনুরূপ, কারণ সেখানেও আত্ম-প্রচেষ্টামূলক আবিষ্কার বা অন্তর্দৃষ্টির (Insight) উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ষোড়শ (16th century) শতাব্দীর প্রথমভাগে, **জুয়ান লুই ভাইভস্** (Juan Luis Vives) শিক্ষা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেন, তার মধ্যেও আমরা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রচুর উপাদান দেখতে পাই। অনেক ঐতিহাসিক ভাইভস্‌কে তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার জনক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি প্রথম শিখন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পরীক্ষণ এবং যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেন। অর্থাৎ, সাধারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির (Methods of Science) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য এবং সেখানে শিখন সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য নানা কৌশলের উল্লেখ করেন, যা আধুনিক-মনোবিদগণও স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার (intellectual capacity) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বলেন। মেয়েদের বিশেষ

ভাইভস্

চাহিদার কথা বিবেচনা করে, তাদের জন্য পৃথক ধরনের পাঠ্যক্রম (Curriculum) রচনার কথাও তিনি বলেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে (17th Century) দার্শনিক কমিনিয়াস (Comenius) শিক্ষাদানের যে নীতি রচনা করেন তাকেও আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের পূর্বসূরী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর চাহিদা (needs), অনুরাগ (interest), ইত্যাদির গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মনোবিদ্যা সম্মত সিদ্ধান্তের কথা তিনি প্রথম বলেন, তা'হল শিখনকে কার্যকরী করতে হ'লে বিভিন্ন জ্ঞানের সামগ্রীর মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনে অভিজ্ঞতার অনুবন্ধ (Correlation) স্থাপন করতে হবে। এই অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ ছাড়া ইন্দ্রিয়কে সার্থকভাবে ব্যবহার করার জন্য তিনি শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Educational Aids) প্রয়োগের কথাও বলেছেন।

কমিনিয়াস্

জন লক্‌কে (John Locke) অনেকে আধুনিক মনোবিদ্যার জনক নামে অভিহিত করেছেন। তিনিও শিখন (Learning) সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেন তা প্লেটোর সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ জন্মের সময় একেবারে অভিজ্ঞতাহীন ভাবে জন্মায়। তার মন থাকে একটা পরিষ্কার শ্লেটের (Tabula rasa) মত। পরবর্তীকালে সে যা শিক্ষা করে তা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই মনের দরজায় গিয়ে পৌছায়। অর্থাৎ, শিখন যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয় একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনিও মানসিক শৃঙ্খলাবাদে (Theory of formal discipline) বিশ্বাসী ছিলেন। এবং তিনিও মানসিক শক্তির উৎকর্ষণের জন্য গণিতের চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন।

লক্

এ পর্যন্ত আমরা যে সব দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণের মতবাদ আলোচনা করলাম, তারা প্রত্যেকেই তাত্ত্বিক দিক থেকে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিকাশে যে সহায়তা করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ জীন্ জ্যাকস্ রুশো (Jean Jacques Rousseau) থেকেই প্রকৃত প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার শুরু হয়েছে বলা যায়। রুশো থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগের যে ধারা শুরু হয়েছে, তা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিকাশে যেমন সহায়তা করেছে, অন্যদিকে সেই ধারাকে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণ যথার্থ পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে। রুশো ব্যক্তির জীবনকে কয়েকটা স্তরে ভাগ করেছিলেন এবং তাঁর এমিলের (Emile) শিক্ষার জন্য জীবনের বিভিন্ন

রুশো

স্তরের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। তাঁর শিক্ষার-চিন্তার মূলবক্তব্য হ'ল শিক্ষার্থী তার জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে শিখবে। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার জীবন বিকাশের স্তরের (Stages of development) উপর বিশেষ গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই। এ ছাড়া, রুশো শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ক্ষমতা (Natural abilities), প্রবৃত্তি (instinct) গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। রুশো বই পড়ার চেয়ে আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রকৃত অভিজ্ঞতার গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তিনি মানুষের জীবন বিকাশ এবং শিখন সংক্রান্ত যে সব মতবাদ প্রচার করে গেছেন, তা আধুনিক মনোবিদগণও সম্পূর্ণভাবে নাকচ করতে পারেন না। শিশু-মনোবিদ্যা (Child psychology) এবং শিক্ষা-মনোবিদ্যার (Educational psychology) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার ইতঃস্তত মন্তব্য পরবর্তীকালে শিক্ষা-মনোবিদগণের ও শিক্ষাবিদগণের তাঁদের কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। রুশোর কাল পর্যন্ত যে চিন্তা বিশেষভাবে তত্ত্বিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, তাঁরই অনুপ্রেরণায় তা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করেছে। এবং এর ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

পেস্টালোৎসী

রুশোর পরে **পেস্টালোৎসী** (Pestalozzi) শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে প্রকৃত প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের স্তরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রুশোর চিন্তাধারাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন শিশুর বিকাশ বিশেষ একটা নিয়ম মেনে চলে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে এই নিয়মকে আবিষ্কার করে সেই অনুযায়ী তার শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ বস্তুর (real object), সক্রিয়তা (activity), ভ্রমণ (excursion), প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (Observation of nature) ইত্যাদি গুরুত্বের কথা চিন্তা করে, তার প্রয়োগের চেষ্টা করেন। পেস্টালোৎসীকে তাই আধুনিক পরীক্ষামূলক শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

ফ্রয়েবেল

সমসাময়িক কালে **ফ্রয়েবেলও** (Froebel) শিক্ষা-মনোবিদ্যার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁর মতে মানুষের মধ্যেকার 'স্বর্গীয় শক্তিকে' (devine essence) বিকশিত করার জন্য তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এবং সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতিতে, বিভিন্ন ধরনের Gifts এবং occupation-এর সাহায্য নিয়েছেন। খেলা, গান গাওয়া, গল্প শোনা ও বলা এ সবই তাঁর মতে শিশুর স্বাভাবিক শিখন এবং বিকাশে সহায়তা করে।

এ প্রসঙ্গে **যোহান ফ্রেডরিক হার্বার্টের** (Johann Friedrich Herbart) নাম না উল্লেখ করলে এই আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই জার্মান চিন্তাবিদ শিক্ষা এবং পাঠদান সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেছেন, তা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। তিনি বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল নৈতিক বিকাশ সাধন করা। কিন্তু, এই নৈতিক বিকাশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হ'তে পারে না। তার জন্য অভিজ্ঞতা দরকার। তাই হার্বার্তের মতে শিক্ষকের কর্তব্য হ'ল জ্ঞান সরবরাহ করা বা পাঠদান করা। এবং এই পাঠদান প্রক্রিয়া মনোবিদ্যা সম্মত হওয়ার দরকার। একমাত্র সেই পদ্ধতিই কার্যকরী হবে যা মনের স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায়। মনের জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে পাঠ পরিকল্পনা, রচনা ও পাঠদানের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, আধুনিক মনোবিদগণ তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ছাড়া, শিখন সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা, অতীত অভিজ্ঞতা জটের (apperceptive mass) বা ভাবজটের অঙ্গীভূত হয়, এটা আধুনিক গেস্টাল্ট মনোবিদগণও বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

হার্বার্ত

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা-মনোবিদ্যা একেবারে আধুনিক কালের কিছু আবিষ্কার নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণের চিন্তা ধারার মধ্যেই তার উপাদান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়, এমন কি ঋগ্ বেদের যুগেও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা মনোবিদ্যার উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধি (intelligence), সংস্কার (innate tendencies), বংশগতি ও পরিবেশ (Heredity and environment) ইত্যাদির গুরুত্বের কথা তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই সব উপাদান প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বর্তমান বিকাশে সহায়তা করেছে। তাছাড়া বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার (Pure Psychology) জ্ঞানের প্রসার এবং পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার (Experimental Psychology) প্রতিষ্ঠাতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে প্রকৃত রূপ দান করেছে। সবার উপরে এই সব ঐতিহাসিক উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে **এবিংহস্** (Ebbinghous), **হাল** (Hull), **জেমস্** (James), **প্যাভ্লভ্** (Pavlov), **কোহলার** (Kohler), **থর্নডাইক** (Thorndike), **স্কিনার** (Skinner) প্রভৃতি মনোবিদগণের বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার দৃঢ় ভত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে।

আলোচনা

শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য
[Aims of Educational Psychology]

শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা থেকে তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা শিক্ষা-

মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য, শুধু এইটুকু বললে, শিক্ষা-মনোবিদ্যা কি তাও যেমন সঠিকভাবে জানা যায় না, তেমনি তার বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য সম্পর্কেও ধারণা জন্মে না। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিকাশ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাচীন চিন্তাবিদগণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং সেই সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে সম্পূর্ণতার অভাব থাকার দরুন তার থেকে শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধা হয়।

সূচনা

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণও এ সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কেউ কিছু ভাবেন নি। প্রকৃত পক্ষে সামান্য কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের কর্ম পরিধিকে তাঁরা এত বিস্তৃত করেছেন যে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়বস্তু থেকে আমরা নতুন নতুন উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হ'ল এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যার সাহায্যে শিক্ষকরা তাদের পেশাগত (Profession) এবং সমাজগত উদ্দেশ্য সহজে চরিতার্থ করতে পারেন। এই সাধারণ ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা আরও ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি। স্কিনার (C.E. Skinner) শিক্ষা-মনোবিদ্যার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করে আটটি এরকম লক্ষ্যের নির্দেশ করেছেন। এই লক্ষ্যগুলো হ'ল—

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য

॥ এক ॥ শিক্ষার্থীর আচরণ, ও বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের বিকাশের প্রক্রিয়া (Growth process) সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা। এক কথায় শিক্ষার্থীর প্রকৃতি (Nature of the educand) বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

॥ দুই ॥ শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education) স্থাপনে সহায়তা করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার একটা প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাদর্শন (Educational philosophy) যে কোন ধরনের শিক্ষার আদর্শই গঠন করতে পারে, কিন্তু সে আদর্শ বাস্তবে রূপায়ন সম্ভব হবে কি না, শিক্ষা-মনোবিদ্যাই কেবল তার পরীক্ষা-মূলক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে। তাই শিক্ষার বাস্তবমুখী লক্ষ্য নিরূপণ করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের আচরণকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে (Objectively) অনুশীলন করাও শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য।

॥ চার ॥ শিক্ষা-মনোবিদ্যার একটা প্রধান লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীর সমাজ-জীবনের অভিযোজনকে (Social adjustment) কি করে সার্থক ও সুগম করে তোলা যায় সে সম্পর্কে পরীক্ষামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে, তাদের সাহায্য করা।

॥ **পাঁচ** ॥ শিক্ষককে তার কর্ম পরিস্থিতিতে নানা রকম সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সরবরাহ করাও শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য। কি ভাবে পাঠ্য বিষয়বস্তু সাজাতে হবে; কি ভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে, কি কি কৌশল অবলম্বন করলে শিখন সার্থক হবে, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তৈরী জ্ঞান দেওয়ার জন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যা সব সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

॥ **ছয়** ॥ শিক্ষক তাঁর নিজের কাজ এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার যাতে সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারে, সে দিক থেকে তাকে সহায়তা করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য হ'ল শিক্ষককে তার কাজ সম্পর্কে সচেতন করা; এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করা।

॥ **সাত** ॥ মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণের গতি; প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ণয় করে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করাও শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য। অর্থাৎ যে কেউ এই বিষয় সম্পর্কে জানলে, যাতে তার আচরণকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে সে রকম ধরনের তথ্য পরিবেশন করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

॥ **আট** ॥ সবশেষে বলা যায়, শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের হাতে এমন কিছু তথ্য দিতে চায় যার দ্বারা তাঁরা শিক্ষার সকল স্তরে উন্নতি সাধন করতে পারেন। সে পাঠদানের ব্যাপারে হ'তে পারে, কি বিদ্যালয়ের সংগঠনের (School organisation) ব্যাপারেও হ'তে পারে বা পরিচালনার (Administration) ব্যাপারেও হ'তে পারে।

শিক্ষা-মনোবিদ্যার এই সব বিশেষ লক্ষ্যের (Specific Aims) কথা মনে রেখে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠ করলে, তবেই তার আলোচনার তাৎপর্য বোঝা যাবে। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণ যে বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার কতটুকু শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রয়োগ করতে সক্ষম, আর কতটুকুর জন্য শিক্ষকের প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। তা উপলব্ধি করতে না পারলে, শিক্ষা-মনোবিদ্যা তার ব্যবহারিক উপযোগিতা হারাবে। তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের এবং সব শিক্ষাকর্মীদের এই লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে শিক্ষা-মনোবিদ্যা পাঠ করতে হবে। তবে যে উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তা সফল হবে।

শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু
[Subject matter of Educational Psychology]

শিক্ষা-মনোবিদ্যা প্রকৃতিগতভাবে শিশুদের নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষার্থী বা মানব শিশুই তার অধ্যয়নের বিষয়বস্তু (subject matter)। কারণ,

মনোবিদ্যার এই শাখার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করা। কিন্তু, মানব শিশু বা শিক্ষার্থী বললে, শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা হয় না। সমগ্র মানুষইতো মনোবিদ্যার আলোচনার বিষয় বস্তু। মনোবিদ্ স্টিফেন্স (stephens)[1] বলেছেন, শিক্ষাবিজ্ঞানের (Education) মত শিক্ষা-মনোবিদ্যারও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ শিশু (whole child)। অর্থাৎ, তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বার দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং শিক্ষা তাদের কি ভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কিত আলোচনাই শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তির বা শিশুর উপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করাই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া, প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব অনুশীলনের সীমা আছে। এবং সে সীমারেখা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যার ক্ষেত্র কতটুকু তা আরও বিশদভাবে বলার দরকার। সম্পূর্ণ শিশু (whole child) বলতে আমরা তার কোন কোন দিকের কথা বলছি? শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশেষভাবে শিশু বা শিক্ষার্থীদের কোন দিকটা নিয়ে আলোচনা করে, স্বভাবতঃ এর উত্তর "শিক্ষাগতদিক"। কিন্তু শিশুর এই শিক্ষাগত দিক আলোচনা করতে গিয়ে তার কি কি বিষয় সম্পর্কে অনুশীলন করার দরকার; এইভাবে বিশ্লেষণ করলেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষা-মনোবিদগণ তার একটা অনুশীলনের ক্ষেত্র স্থির করেছেন। তার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখতে পাই।

সূচনা

॥ এক ॥ শিক্ষামনোবিদ্যার প্রাথমিক অনুশীলনের বিষয় হ'ল শিক্ষার্থী বা শিশুর সহজাত কর্ম প্রবণতা, সহজাত বিভিন্ন কর্ম ধারা। এগুলোই হ'ল তার প্রাথমিক উপাদান (original tendencies), যার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে উঠ্‌বে, সহজাত ক্ষমতা, প্রবণতা এবং কর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষা-মনোবিদকে সচেষ্ট হ'তে হবে। কারণ, শিক্ষক এর উপর ভিত্তি করে তার পাঠ্যবিষয়, পদ্ধতি, ইত্যাদি, শিক্ষা সংক্রান্ত সব কিছু নির্ধারণ করবেন। ব্যক্তিসত্বার প্রাথমিক উপাদান কি কি, তা জানতে না পারলে, ব্যক্তিসত্বা বিকাশের জন্য কোন রকম বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টাই চালানো যাবে না। তাই শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর মধ্যে এই সব প্রাথমিক

প্রাথমিক মানসিক উপাদান

1. ......the province of Educational Psychology, like education itself, is the whole child, i. e., the major facets of his personality consisting of the mental, physical emotional and spiritual aspects and the impact of the school on them."—Stephens : Educational Psychology.

উপাদানের অনুশীলনের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সব প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে প্রবৃত্তি (Instinct), প্রবৃত্তিমূলক কর্ম (Instinctive action), তাৎক্ষণিক ক্রিয়া (Reflex action), প্রক্ষোভ (Emotion), বুদ্ধি (Intelligence), ইত্যাদিকে বিবেচনা করতে পারি। তাই এদের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

॥ দুই ॥ শুধুমাত্র, প্রাথমিক উপাদান শিশুদের মধ্যে কি কি আছে তাই জানলে চলবে না। সেই উপাদানের বিকাশ কি ভাবে হয়, সে সম্পর্কেও জানতে হবে। তাই সাধারণভাবে জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে অনুশীলন শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মধ্যে কি কি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন করা হয় শিক্ষা-মনোবিদ্যায়।

বিকাশের ধারা

॥ তিন ॥ স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে জানার পর শিক্ষা-মনোবিদগণ, সেই বিকাশের ধারাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রচেষ্টার দ্বারা তরান্বিত করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, শিখন প্রক্রিয়া (Learning process) সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। কারণ, এই শিখনের দ্বারাই ব্যক্তির জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে এই শিখন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের নিয়ম (Laws of Learning), কি ভাবে শিখনের পরিমাণকে বাড়ানো যায়, ইত্যাদি নানারকম সমস্যার সমাধান করার জন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যা সব সময় সচেষ্ট।

শিখন

॥ চার ॥ শিখনের প্রয়োগমূলক একটা সমস্যা নিয়েও শিক্ষা মনোবিদ্যায় আলোচনা করা হয়। এই সমস্যা হ'ল শিখন সঞ্চালনের (Transfer of learning)। কোন বিশেষ পরিস্থিতির শিখন, অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় কি না, সঞ্চালন হ'লে তা কি পরিমাণে হয় এবং কি ভাবে হয়, এবং এই সঞ্চালনের পরিমাণকে বাড়ানো যায় কি না, ইত্যাদি নানারকম সমস্যা নিয়ে শিক্ষা-মনোবিদগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। শিক্ষাবিদগণ জানেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত না করতে পারলে, শিক্ষার উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। তাই এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাঁরা শিক্ষা-মনোবিদগণের দিকে তাকিয়ে আছেন। শিক্ষা-মনোবিদ্যা এই সমস্যাকে তাই তার বিষয়বস্তুর অন্তভু ক্ত করেছে।

শিখন সঞ্চালন

॥ পাঁচ ॥ শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটা সমস্যা হ'ল প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমান গ্রহণাত্মক ক্ষমতা (Receptivity) নিয়ে জন্মায় না। তাছাড়া, মানসিকতা, আচরণ, সমস্ত দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। একে বলা হয় ব্যক্তিগত পার্থক্য বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

(Individual difference)। এই পার্থক্য কোন কোন দিক থেকে আসে ; এই পার্থক্যের প্রকৃতি কি, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সরবরাহ করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। তাই এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের (Individual difference) অনুশীলনকে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

॥ ছয় ॥ এমন কিছু কিছু অবস্থা আছে যা শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে। এরা স্বাভাবিক নিয়মে শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই

অবসাদ

এদের শিখন পরিস্থিতি থেকে যত দূর সম্ভব সরিয়ে রাখা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। যেমন—অবসাদ (Fatigue), একঘেঁয়েমি (Monotony), বিরক্তিকর অবস্থা (Boredom) ইত্যাদি। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করলে, এগুলো স্বাভাবিকভাবে আসবেই। কিন্তু, শিখন পরিস্থিতিতে এরা কতটা স্বাভাবিক কারণে এসেছে, বা কতটা অন্য কারণে এসেছে ; এবং কি ভাবে এই ধরনের অবস্থাকে দূর করা যায়, এ সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা মনোবিদ্যার মধ্যে করা হয়।

॥ সাত ॥ শিক্ষা-মনোবিদ্যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা (Guidance) সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও আলোচনা করা হয়। নিদ্দের্শনা বলতে আমরা শুধু

নির্দ্দেশনা

বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনাকে (vocational guidance) বুঝি তা নয়। শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনারও (Educational guidance) প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা (Learning experience) অর্জনের পথে কি ভাবে সহায়তা করতে হবে সে সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষকের ধারণা থাকা উচিত। শিখন পরিস্থিতি, বিদ্যালয় পরিস্থিতি, সামগ্রিকভাবে জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কি ভাবে সার্থক অভিযোজন করতে পারে, সে সম্পর্কে অনুশীলন করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ। তাই শিশুদের নিদ্দের্শনা (child guidance), সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যায় করা হ'য়ে থাকে।

॥ আট ॥ সবশেষে, শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষামূলক পরিসংখ্যানকে (Educational statistics) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজকাল

পরিসংখ্যান

প্রত্যেক সমাজ-বিজ্ঞানেই (Social science) পরিসংখ্যান বা রাশি বিজ্ঞান (statistics) ব্যবহার করা হচ্ছে। এর দু'টো দিক আছে। **প্রথমতঃ**, এই রাশি বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যকে (data) তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবেশন করতে পারি, এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারি। শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ফলাফলকে (experimental results), এই ভিত্তিতে বিচার করা হয়েছে। সুতরাং তাকে প্রয়োগ করতে হ'লে এই তাৎপর্য উপলব্ধি করার দরকার। এই কারণে রাশি বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা

শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ণ করা। রাশি বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া এই মূল্যায়ণ সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর তালিকায় রাশিবিজ্ঞানকে আমরা দেখতে পাই।

সাধারণভাবে, উপরোক্ত বিষয়গুলোই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে এই যদি শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হয়, তবে আমরা আলোচ্য বইয়ের মধ্যে আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি কেন। এ সম্পর্কে জানতে হ'লে আমাদের একটা কথা মনে রাখার দরকার, শিক্ষা-মনোবিদ্যা, মনোবিদ্যার (Psychology) একটা অংশ মাত্র। শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন তথ্য এবং সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে মনোবিদ্যার একটা দৃঢ় ভিত্তি দরকার। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান (Education) পড়তে এসে মনোবিদ্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এটা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তাই এই বইয়ের সূচী পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষরবস্তু নির্ধারণ করা যাবে না। শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology) একটা জ্ঞানের শাখা (Branch of knowledge) হিসেবে একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু যে শিক্ষা-মনোবিদ্যা আমরা পড়ছি, তাকে জ্ঞানের সুসামঞ্জস্যতার জন্য সাজানো হয়েছে মাত্র।

উপসংহার

তাছাড়া এর একটা অন্যদিকও আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা সতত পরিবর্তনশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আর সে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের জন্য শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপর নির্ভর করে আছেন। যে বিষয়বস্তুগুলোর আমরা উল্লেখ করলাম, এগুলো শিক্ষার কতকগুলো সার্বজনীন সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শিক্ষা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে, শিক্ষা-মনোবিদ্যাও তার অনুশীলনের পরিধিকে সেই মত বাড়িয়ে তুলছে। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু বা সীমা সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য স্থির নয়। কোন প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে তা হ'তে পারে না। তাই শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়, যেমন যেমন সমস্যা সৃষ্টি করছেন, তার সমাধানের জন্য মনোবিদ্যাও এগিয়ে আসছে। ফলে এই অনুশীলনের ক্ষেত্রেরও বিস্তৃতি বাড়ছে। এই বৃদ্ধি শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যেমন সাহায্য করছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকেও সহায়তা করছে।

আলোচনা

শিক্ষা-মনোবিদ্যার পদ্ধতি
[Methods of Educational Psychology]

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল সত্যকে আবিষ্কার করা। বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করাই হ'ল যে কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। মনোবিদ্যার উদ্দেশ্যও তাই। বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও বিভিন্ন আচরণকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম (general rule) আবিষ্কার করাই হ'ল মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। শিক্ষা মনোবিদ্যারও উদ্দেশ্য এক। তাই মনোবিদ্যায় বিষয়বস্তু অনুশীলনের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা অন্যান্য বিজ্ঞানের মত একই। যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করেন। একদিন বাজার থেকে আম কিনে আনলাম। আমটা সবুজ ছিল, খেতেও টক। আবার এ রকম ধরনের ঘটনা কয়েকদিন ঘটলো। এইভাবে সবুজ আম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করলাম। বস্তু সম্পর্কে এইভাবে জ্ঞান অর্জন করাকে বলে পর্যবেক্ষণ (observation)। এর পর বাজার থেকে সবুজ আর লাল, দু'ধরনের আম এনে খেয়ে দেখি। সেখান থেকে বুঝতে পারি লাল আমটা মিষ্টি আর সবুজ আমটা টক। এইভাবে তুলনামূলকভাবে বস্তু সম্পর্কে আমরা যে পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ করলাম তাকে বলা হয় পরীক্ষণ (Experimentation)। এই পরীক্ষণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত (Inference) করলাম "সবুজ আম টক"। এইভাবে যে কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করা হয়। তা'হলে বিজ্ঞান যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সত্যকে আবিষ্কার করে তা'হল—[এক] **পর্যবেক্ষণ** (observation), [দুই] **পরীক্ষণ** (Experimentation) এবং [তিন] **সিদ্ধান্ত** (Inference)। মনোবিদ্যায়ও এই পদ্ধতি গুলোর প্রয়োগ করা হয়। আর শিক্ষা-মনোবিদ্যা তার শাখা হিসেবে, এই পদ্ধতি গুলোকে মেনে নিয়েছে। তবে এছাড়াও, শিক্ষা-মনোবিদ্যার নিজস্ব কতকগুলো পদ্ধতি আছে, যার দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সে শিক্ষার্থীদের আচরণ অনুশীলন করে। আমরা শিক্ষা-মনোবিদ্যার পদ্ধতির মধ্যে সেগুলো সম্পর্কেও উল্লেখ করব।

পদ্ধতি কি ?

বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, তাহ'ল মনোবিদ্যার অনুশীলনের ক্ষেত্রের প্রকৃতি। সাধারণ মনোবিদ্যায় তিন ধরনের চলের (variable) অনুশীলন করা হয়। এই তিনটে চল হ'ল **উদ্দীপক সংক্রান্ত চল** (stimulus variable), **পরীক্ষার্থী বা ব্যক্তি সংক্রান্ত চল** (organismic variable) এবং **প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত চল** (Response variable)। যে কোন পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের চল একত্রে কাজ করে।

শিক্ষা-মনোবিদ্যায় অনুশীলনের ক্ষেত্রে চল

ফলে যে কোন দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করে তৃতীয়টার অনুশীলন খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই মনোবিদ্যার পরীক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করে এবং সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যতাকে (Reliability) কমিয়ে দেয়। তবে এই দিক নিয়ন্ত্রণ করারও ব্যবস্থা আধুনিক মনোবিদ্যায় হয়েছে। যাই হউক শিক্ষা মনোবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করব।

পর্যবেক্ষণ শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রাথমিক পদ্ধতি। অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বা পর্যবেক্ষকগণ প্রাকৃতিক উপসর্গগুলো নিজের চোখে বাইরে থেকে দেখতে পান বা সাধারণভাবে নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ আচরণের সময় কি ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা বাইরে থেকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। তাছাড়া বাইরে থেকে যদিও বা কিছু আচরণ দেখা যায়, তার মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সে উপলব্ধি করতে পারে। যেমন, কোন বিশেষ অংকের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কি ধরনের মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি নিজে অংকটা করে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। কিন্তু সেই মানসিক অবস্থার সঙ্গে ছাত্রের মানসিক অবস্থার কোন মিল নাও থাকতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন ছাত্রকেই জিজ্ঞেস করা ভাল, তার কি ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যায় দু'রকমের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আছে—

পর্যবেক্ষণ

[এক] **ব্যক্তি নির্ভর পর্যবেক্ষন** পদ্ধতি বা **অন্তর্দর্শন** (subjective method of observation) বা Introspection),

[দুই] **নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষন** পদ্ধতি (objective method of observation)।

॥ এক ॥ ব্যক্তি নিজে যখন নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, তখন তাকে বলা হয় অন্তর্দর্শন। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে মনকে নিজের মধ্যে অভিক্ষেপ করা হয় এবং তার দ্বারা সেখানে কি ঘটছে, তা জানার চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তি নিজেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে কাজ করে। এ পদ্ধতিতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত উপাদান থাকবে। একে যাচাই করে দেখাও মুশকিল। সুতরাং এই ধরনের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান সংগ্রহ হবে তা যে সব সময় ঠিক একথা সঠিকভাবে বলা যাবে না। এই সব কারণে অন্তর্দর্শনকে (introspection) অনেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেন না।

॥ দুই ॥ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ (objective observation) হ'ল অন্যের পরিবর্তন বাইরে থেকে লক্ষ্য করা। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা আচরণের অনুশীলন করা যায়। সাধারণভাবে ক্লাশে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের

নানা রকম আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এই ধরনের পর্যবেক্ষণকে বলা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ, পদ্ধতিতে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেন অপর একজন ব্যক্তি। এ ধরনের পর্যবেক্ষণে যদিও যে ব্যক্তির পরিবর্তন হচ্ছে সে জড়িত নয় তবু যে পর্যবেক্ষণ করছে তার ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে একে মুক্ত করা যায় না। তাই নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণেও নানা রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায়। নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি থাকলেও তাকে বাদ দিয়ে শিক্ষা-মনোবিদ্যা চলতে পারে না। তাই এই পদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন—**রেটিং স্কেল** (Rating scale), **টাইম স্যাম্পলস্** (time samples), **অ্যানেকৃডটেল রেকর্ড** (Anecdotal record), **ইন্টারভিউ** (Interview), **প্রশ্নাবলী** (Questionnaire), **অভীক্ষা** (test) ইত্যাদি আজকাল ব্যবহার করা হয় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য।

শিক্ষামনোবিদ্যার অন্য পদ্ধতি হ'ল পরীক্ষণ (Experimentation)। পরীক্ষণ বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ, প্রয়োজন মত কতকগুলো অবস্থা বা চলকে (variable) নিয়ন্ত্রণ করে যে কোন একটাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার নাম পরীক্ষণ।[1] পরীক্ষণের জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যায়

পরীক্ষণ

দু'জন ব্যক্তির প্রয়োজন। একজন পরীক্ষক (Experimenter) আর পরীক্ষার্থী (subject), অর্থাৎ, যার অভিজ্ঞতা বা আচরণ নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক সময় পরীক্ষার্থীর (subject) প্রকৃতি পরিবর্তন করা হয়। কোন কোন সময় মাত্র একজন পরীক্ষার্থী বা এক দল পরীক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। মনে করা যাক আমরা দেখতে চাই শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করলে তাদের শিখনের পরিমাণ বাড়ে কি না। এক্ষেত্রে আমরা একজন ছাত্রের উপর বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষা করতে পারি, বা সম্পূর্ণ শ্রেণীর উপর একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা চালাতে পারি। অর্থাৎ, কিছু দিন ধরে তাদের প্রশংসা করে শিক্ষণের পরিমাণ দেখা হবে; আবার কিছুদিন কোন রকম প্রশংসা না করে দেখা হবে। পরে তুলনামূলক আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আশা যাবে। এই ধরনের পরীক্ষণ পদ্ধতিকে বলা হয় **একই দলের উপর পরীক্ষণ** (single-group technique)। আবার একই পরীক্ষার জন্য দু'টো সমান ক্ষমতা সম্পন্ন দল বেছে নিতে পারি। তাদের একটার ক্ষেত্রে প্রশংসার দ্বারা পাঠ পরিচালনা করতে পারি। আর একটাকে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রেখে, তাদের প্রগতির

1. An experiment is a formal structured technique where by certain conditions are arranged and controlled for the purpose of refining observations verifying hypotheses and drawing inferences.

হার তুলনা করতে পারি। যে দলের উপর কোন বিশেষ অবস্থার প্রভাব আমরা দেখতে চাইছি, তাকে বলা হয় পরীক্ষামূলকদল (experimental group) আর অন্যদলটাকে বলে নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group)। এইভাবে দুটো দল নিয়ে পরীক্ষণের রীতিকে বলা হয় **সম-দল অনুশীলন পদ্ধতি** (Parallel-group technique)। এই পদ্ধতির আর একটু উন্নত সংস্করণ হ'ল **পরিবর্তিত দলের পদ্ধতি** (Rotation-group technique)। এখানেও দুটো দলই থাকে। তবে পর্যায়ক্রমে দু'টো দলকেই একবার করে পরীক্ষামূলক দল (experimental group) এবং নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group)-এর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে কোন দল যদি কোন ঘটনাকে গোপন করে তা'হলে অপর দলের ক্ষেত্রে তা ধরা পড়ে। এই জন্য শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ বিভিন্ন সমস্যা অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণতঃ শিক্ষা-মনোবিদ্যায় বিভিন্ন চলের (variable) মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিন ধরনের পরীক্ষা করা হয়।

[প্রথমতঃ] **কোন উদ্দীপক সংক্রান্ত চলের** (stimulus variable) **সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত চলের** (Response variable) **সম্পর্ক নির্ণয় সম্বন্ধীয় পরীক্ষা**। যেমন, আমরা দেখতে চাই পুনরাবৃত্তির দ্বারা মনের ধারণ প্রক্রিয়ার (Retention) উন্নতি হয় কি না। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার উপর কি প্রভাব আছে তা নির্ণয় করতে চাই। এ রকম ধরনের নানা রকম পরীক্ষা শিক্ষা-মনোবিদ্যায় করা হ'য়ে থাকে।

[দ্বিতীয়তঃ] **কোন ব্যক্তি সংক্রান্ত চলের** (organismic variable) **সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত চলের** (Response variable) **সম্পর্ক সম্বন্ধীয় পরীক্ষা**। যেমন, যখন আমরা দেখতে চাই শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য শিখনকে প্রভাবিত করে কি না, তখন মানসিক স্বাস্থ্য এই ব্যক্তি সংক্রান্ত অবস্থার সঙ্গে (organismic variable) প্রতিক্রিয়ামূলক চল (Response variable) শিখনের কি সম্পর্ক নির্ণয় করি। এই ধরনেরও অনেক রকম পরীক্ষা শিক্ষা-মনোবিদ্যায় করা হয়ে থাকে।

[তৃতীয়তঃ] **দু'ধরনের ব্যক্তিসংক্রান্ত** (organismic variable) **চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় সম্বন্ধীয় পরীক্ষা**। যেমন, যখন আমরা পরীক্ষা করি মানসিক ক্ষমতার (Mental ability) সঙ্গে সামাজিক অভিযোজনের সম্পর্কের উপর। শিক্ষা মনোবিদ্যায় এমনিভাবে নানা রকম পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু এই সব পরীক্ষা পরিচালনা করতে গেলে নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ, কৃত্রিম পরিস্থিতিতে মনের স্বাভাবিক অবস্থা অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়। ফলে আমরা যা অনুশীলন করতে চাই তার থেকে অনেক দূরে সরে যায়। যেমন ধরা যাক, আমরা দেখতে চাই ভয়ের প্রক্ষোভ কি ভাবে শিখনকে

প্রভাবিত করে। এই পরীক্ষা করার জন্য আমরা কৃত্রিম উপায়ে যদি শ্রেণী কক্ষে ভয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করি, তবে তা প্রকৃত পরিস্থিতি থেকে নিশ্চয়ই আলাদা হবে। ফলে স্বাভাবিক ভীতিমূলক পরিস্থিতিতে কি ভাবে শিখন হবে তা এই পরীক্ষার ফল থেকে আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না। কিন্তু এই ধরনের অসুবিধা আছে বলে পরীক্ষণকে শিক্ষা মনোবিদ্যার পদ্ধতি থেকে বাদ দিতে পারি না। বর্তমানে তার আরও সংস্কার করা হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা চলছে।

সাধারণভাবে পদ্ধতি পর্যায়ে সবশেষের স্তর হ'ল সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Inference)। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত শিক্ষা-মনোবিদ্যায়ও পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষণ (experimentation) লব্ধ ফলকে বিশ্লেষণ করে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ লব্ধ তথ্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আমরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকি। বিষয়বস্তু বা চলের (Variable) প্রকৃতি দেখে এ কৌশল নির্বাচন করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কারণ শিক্ষা-মনোবিদ্যায় এমন অনেক জটিল বিষয় আছে, যার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এইভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তাকে বলা হয় **যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত** (Logical inference)। আবার, অনেকক্ষেত্রে, দেখা যায় আমাদের কাছে, যথেষ্ট প্রমাণ নাই, বা সে সব বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুদিনের অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই পরীক্ষালব্ধ ফলের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হয়। এইভাবে সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাকে বলা হয় **অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত** (Inference based on experience)। আবার অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পরীক্ষালব্ধ ফলকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দিকের (different aspect) উপর পৃথক পৃথক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতিকে বলা হয় বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত (Analytical inference)। সবশেষে, আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে রাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের সিদ্ধান্তকে বলা হয় **রাশিবিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত** (Statistical inference)।

সিদ্ধান্ত

পূর্বেই বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত ছাড়া শিক্ষা-মনোবিদ্যার নিজস্ব কতকগুলো পদ্ধতি আছে যার সাহায্যে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার শিক্ষাগত তাৎপর্য অনুশীলন করে। এই সব পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল **ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি** (Genetic

Method)। এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ অবস্থাকে বহুদিন ধরে অনুশীলন করা হয়। সেই মানসিক অবস্থার বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ধরা যাক শিক্ষক দেখতে চান দৈহিক বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ কি ভাবে ঘটে থাকে। এই সমস্যা অনুশীলনের জন্য, জন্ম মুহূর্ত থেকে শিশুর দৈহিক বিকাশের ধারা ক্রমানুসারে অনুশীলন করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তার প্রাথমিক বুদ্ধির বিকাশ কি ভাবে হচ্ছে, তাও বিভিন্ন অভীক্ষার (Test) দ্বারা পরিমাণ করতে থাকেন। এইভাবে ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলন করে শিক্ষক এই সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে শিশু-মনোবিদ্যার (Child Psychology) এবং বিশেষভাবে শিশুদের জীবনবিকাশের ধারা অনুশীলন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। শিক্ষা-মনোবিদ্যায়ও এই পদ্ধতি অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়।

জেনেটিক্ পদ্ধতি

এছাড়া, শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশেষ **সমস্যাযুক্ত ব্যক্তির অনুশীলন** (Case-Study) **পদ্ধতি**। এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিবেশ অনুশীলন করে তার সমস্যার কারণ খুঁজে বাহির করার চেষ্টা করা হয়। যদি কোন শিক্ষার্থী বার বার কোন অসামাজিক আচরণ করতে থাকে, তবে তা দূর করার জন্য তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বাহির করতে হবে। এই কারণ খুঁজে বাহির করার জন্য, শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ জীবন পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তার সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে। তারপর, এই তথ্য বিশ্লেষণ করে তবেই অসামাজিক আচরণের কারণ নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

কেস স্টাডি

মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি (Clinical method) ব্যবহার হয়, অনেক সময় সে সব পদ্ধতিও শিক্ষা-মনোবিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। ফ্রয়েদ (Freud) প্রবর্তিত মুক্ত অনুষঙ্গ (Free-association) পদ্ধতি বিশেষভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের কোন আচরণমূলক অসঙ্গতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য। এছাড়া তাদের ব্যক্তি-সত্তার সামগ্রিক কাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Test), ও প্রশ্নাবলী (Questionnaire) ব্যবহার করা হয়, এই সব অভীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির আচরণ ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়।

মুক্ত অনুষঙ্গ

সবশেষে, বলা যায়, শিক্ষা-মনোবিদ্যায় তুলনামূলক পদ্ধতিও (Comparative method) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মানুষের আচরণকে পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ সাধ্য নয় বলে, শিক্ষা-মনোবিদ্গণ বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের পরীক্ষা বিভিন্ন পশু-পক্ষীর উপর করেছেন। এবং সেই সব পরীক্ষার জ্ঞানকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেন। এই তুলনামূলক পদ্ধতি শিক্ষা-মনোবিদগণকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছে, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

তুলনামূলক পদ্ধতি

এই আলোচনা থেকে একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষা-মনোবিদ্যা নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীরা যে সব আচরণ করে তা এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার সবগুলোকে কোন একটা বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা অনুশীলন করাও সম্ভব নয়। তাই সমস্যা ভেদে, আচরণের প্রকৃতি ভেদে শিক্ষামনোবিদগণ নিজস্ব পদ্ধতি নির্বাচন করেন। কোন পদ্ধতি আছে, যার দ্বারা ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য ভালভাবে সংগ্রহ করা যায়। আবার কোন পদ্ধতির দ্বারা উদ্দীপক বা পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য ভালভাবে সংগ্রহ করা যায়। তাই মনোবিদ্ স্কিনার (Skinner) মন্তব্য করেছেন কোন পদ্ধতি ঠিক ব্যবহার করা হবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তা নির্ভর করছে, পরিস্থিতি, পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, ইত্যাদি নানা দিকের উপর।[1]

আলোচনা

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃতি
[Nature of Modern Educational Psychology]

শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছি। সুতরাং নতুন কিছু তার সম্পর্কে বলার নেই। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, তারও বিকাশ হচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন শিক্ষা-মনোবিদ্যা কাজ শুরু করেছিল, সে উদ্দেশ্য থেকেও সে আজ অনেক দূর সরে গেছে। বর্তমানে তার কাজ শুধু মনোবিদ্যার জ্ঞানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নয়। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলে, এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সূচনা

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় (Educational Psychology) শুধুমাত্র মনোবিদ্যার জ্ঞানকে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় না। শিক্ষা-মনোবিদ্যা শ্রেণীকক্ষে

1. The particular method used is determined in part by the nature of the problem to be stadied, in part by the.........research worker, and in part by the availability of the materials and subjects or other limiting factors," C.E. Skinner : Educational psychology (Ed).

নানা পরীক্ষাও করে এবং শিশু মন ও শিখন সংক্রান্ত নানা রকম তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিদ্যা এখন আর শুধু প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান (Applied science) নয়; তার নিজস্ব পরীক্ষা-

বিস্তৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার

মূলকদিকও (Experimental aspect) গড়ে উঠেছে। শিখনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা, শিখন সঞ্চালনের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে দেখা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করা ইত্যাদি কাজ এখন শিক্ষা-মনোবিদ্যা এককভাবে করে থাকে। তাই এই শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে তার আধুনিক ক্রম-বিকাশের স্তরে, কোন বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র (Separate discipline) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। একথা আধুনিক মনোবিদগণও স্বীকার করেন।

শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করার আর একটা কারণ হ'ল যে এই বিজ্ঞান নিজস্ব অনুশীলনের পদ্ধতির (Method) প্রবর্তন করেছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা নিজস্ব পদ্ধতির দ্বারা

নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি

কোন বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণও সম্ভব। সুতরাং যার নিজস্ব অনুশীলনের পদ্ধতি আছে, সে জ্ঞানের জন্য অন্য কোন বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। এই কারণে, আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্গণ একে পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন।

শিক্ষা বিজ্ঞান তার নিজস্ব গবেষণা (Research) এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষের আচরণ সম্পর্কে যে সব জ্ঞান সংগ্রহ করেছে, শুধুমাত্র তার থেকেই মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত (General rule) গ্রহণ করা যায়। তাই বর্তমানে, মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

তথ্যের আশায় তাকে সাধারণ মনোবিদ্যার (General Psychology) অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। যে বিজ্ঞান নিজের গবেষণার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তাকে শুধুমাত্র প্রয়োগ-মূলক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে।

তাছাড়া, কোন প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, তার জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য অপর একটা বিজ্ঞানের সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্র হ'ল শিক্ষা-বিজ্ঞান (Education)।

শিক্ষা ও শিক্ষা-মনো-বিদ্যার সম্পর্ক

শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা মানুষের শিক্ষা-কালীন আচরণ সম্পর্কে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে তাকেই শিক্ষা বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয় মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে। তাই প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান যদি বলতে হয়, তবে শিক্ষা বিজ্ঞানকে বলা উচিত, শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে নয়।

তা'হলে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এই শাখা আর শুধুমাত্র প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের স্তরে নেই। শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ তাকে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেছেন। এখন প্রশ্ন হ'ল এই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আধুনিক পর্যায় কি ধরনের গবেষণা করছে, এবং কি ভাবে মানুষের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে? শিক্ষা-মনোবিদ্যার আধুনিক-কালে যে সময়ের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তাহ'ল—

আধুনিক মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্য

॥ এক ॥ আচরণের প্রেষণামূলক দিকের (Motivational aspect of behaviour) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ মনে করেন প্রেষণা কর্মের শক্তি জোগায়। যে কোন ধরনের কাজের পেছনে প্রেষণা শক্তি কাজ করে। তাই কর্মক্ষমতা বাড়াতে হ'লে যথাযথ প্রেষণা শক্তি জাগ্রত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের শিখন পরিস্থিতিতেও প্রেষণার গুরুত্বের কথা তারা উপলব্ধি করেছেন এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোন সমস্যাকে শিক্ষার্থীদের প্রেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

॥ দুই ॥ আচরণের মডেল (Behaviour Model) স্থাপন করার উপর আধুনিক শিক্ষা মনোবিদগণ বিশেষভাবে আগ্রহী। এই সব গাণিতিক মডেল (Mathematical model) শিক্ষার্থীদের আচরণ কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কি রূপ নেবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

॥ তিন ॥ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষমতাকে (Teaching efficiency) বাড়িয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করা হচ্ছে। শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা (Professional Competance) বাড়িয়ে তোলার জন্য এই জাতীয় গবেষণার প্রয়োজন। এই সব গবেষণা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের পাঠদান পদ্ধতি (Teaching method) আবিষ্কারে সহায়তা করেছে।

॥ চার ॥ শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং বিষয়-বস্তুর বোধগম্যতা (Understanding) বাড়িয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক কৌশল (Mechanical device) আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা চলছে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায়। শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণার ফলে, শিক্ষণের যন্ত্র (Teaching machine), ভাষা শিক্ষার জন্য পরীক্ষাগার (Language laboratory) ইত্যাদির মত আরও অনেক যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব যান্ত্রিক কৌশল দ্বারা মানুষ হিসেবে শিক্ষকের যে সীমিত ক্ষমতা তাকে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা মানুষের শিক্ষণকে সহজতর করার জন্যও মানব প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা

লব্ধজ্ঞানকে বিশেষভাবে কাজে লাগাচ্ছে। শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণের বর্তমানে বিশেষ একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, সমাজ বিদ্যা (Sociology), নৃতত্ব (Anthropology), এমন কি পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ণ বিদ্যা (Chemistry), জীববিদ্যা (Biology) প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণাকে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে আচরণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। তাই আধুনিক সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ফলে নতুন নতুন আন্তবিজ্ঞানতত্ত্ব (inter disciplinary concept) প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যাও এই প্রবণতা মুক্ত নয়।

॥ ছয় ॥ পরীক্ষামূলক জ্ঞানের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার আর একটা বৈশিষ্ট্য। কোন সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে পরীক্ষিত না হলে তাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় তাত্বিক আলোচনার আর কোন সুযোগ নাই। যে কোন সিদ্ধান্তই বিশদ পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরীক্ষামূলক গবেষণার (experimental research) প্রতি ঝোঁক আধুনিক মনোবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

॥ সাত ॥ শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা (Behavioural problems) বা সমস্যামূলক আচরণ (Problem behaviour) সম্পর্কে গবেষণাও আজকাল শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ করেছেন। কি ধরনের আচরণের অসঙ্গতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়, কি কি কারণে সে সব অসঙ্গতি আসে এবং কি ভাবে সেগুলোকে দূর করা যায়, এ সব সম্পর্কেই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচনা করা হচ্ছে।

॥ আট ॥ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণায় রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) উপর একটা বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সব কিছু গবেষণালব্ধ ফলকে রাশি বিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হ'চ্ছে। রাশি-বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রয়োগের প্রতি প্রবণতা সব সামাজিক বিজ্ঞানেই (Social science) বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

॥ নয় ॥ সবশেষে, বলা যেতে পারে মনোবিদ্যার অন্যান্য শাখার মত শিক্ষা-মনোবিদ্যাতেও শিক্ষার্থী বা ব্যক্তিকে একক কেন্দ্রিভূত সত্বা (Unified entity) হিসেবে বিবেচনা করে অনুশীলন করা হচ্ছে।

শিক্ষকের কাছে শিক্ষা মনোবিদ্যার উপযোগিতা
[Utility of Educational Psychology to teachers]

শিক্ষা মনোবিদ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে জ্ঞানের এই শাখা কি ভাবে শিক্ষককে বা অন্যান্য শিক্ষা কর্মীকে

সাহায্য করবে। কারণ প্রাথমিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্যই শিক্ষা-মনোবিদ্যার সৃষ্টি। আর তার আধুনিক অর্থ যদি গ্রহণ করি তা'হলে তা পাঠদান (Teaching), শিখন (Learning) উভয় প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবে। শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের পর শিক্ষকগণ নিজেরাই নির্ণয় করবেন, কি ভাবে তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। কারণ যে কোন তথ্যকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব প্রয়োগ কর্তার। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপযোগিতা বিশেষ শিক্ষকের কাছে কি, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব তাঁর। তবুও এখানে আমরা তার সাধারণ উপযোগিতার দিক সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। এই আলোচনা, বিশেষভাবে তাঁর জীবনের পেশাগত দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকের উপর এই বিজ্ঞান কি প্রভাব বিস্তার করবে তা তাঁর একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। যে কোন বৃত্তি বা পেশাতে (profession) সাফল্যের জন্য দু'টো জিনিস দরকার। একটা হ'ল পেশাগত দক্ষতা (Professional skill) এবং অপরটা হ'ল পেশার ক্ষেত্রে যথাযথ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা (exercise of professional Judgement)। এখন এই দক্ষতা (skill) এবং বিচার বিবেচনা (Judgement) দু'টোই নির্ভর করছে ব্যক্তির কতটা তার পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান সংগ্রহ করেছে তার উপর এবং যে সব আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা হচ্ছে তার অবগতির উপর। শিক্ষা-মনোবিদ্যার তাৎপর্য হ'ল সে শিক্ষককে তার পেশাগত উন্নতি সাধনের এই সকল রকম জ্ঞান সরবরাহ করে। অর্থাৎ. শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষককে তার পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞান (Professional knowledge), দক্ষতা (Professional skill) এবং বিচার বিবেচনার ক্ষমতা (Professional judgement) দান করে। কোন কোন দিক থেকে এবং কি ভাবে তা আসে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনার অবতারণা করছি।

প্রস্তাবনা

॥ এক ॥ শিক্ষার্থীর যে কোন উন্নতি বা বিকাশ নির্ভর করে, তার জন্মগত ক্ষমতার উপর। সে জন্মগতভাবে যে সব দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর ভিত্তি করেই তার বিকাশের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। শিক্ষকের দায়িত্ব যদি হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়তা করা, তবে তাঁকে শিক্ষার্থীর এই সব সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এই জ্ঞান তিনি শিক্ষা মনোবিদ্যার কাছ থেকে পাবেন। শিক্ষা মনোবিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হ'ল শিশুদের প্রাথমিক প্রবণতা ও কর্মক্ষমতা (original tendencies) ইত্যাদি। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষককে তার প্রাথমিক জ্ঞান আহরণে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জন্মমুহূর্তে,

প্রাথমিক প্রবণতার জ্ঞান সরবরাহ করা

কি ধরনের প্রবণতা আছে, কি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করবার ক্ষমতা আছে, কি পরিমাণ মানসিক ক্ষমতা আছে, শিক্ষা-মনোবিদ্যা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারা সব কিছু নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এর জ্ঞান স্বভাবতঃই শিক্ষককে তার কাজে সহায়তা করবে।

॥ **দুই** ॥ জন্মগতভাবে প্রাপ্ত সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ হয়। এই সম্ভাবনাগুলোর একদিকে যেমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার (Natural process) বিকাশ লাভ করে; অন্যদিকে, প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। অর্থাৎ, শিশুর ব্যক্তিসত্বা যে বিকাশধর্মী এককথা যেমন শিক্ষা মনোবিদ্যা জানিয়েছে, তেমনি সে বিকাশের গতিকে কৃত্রিম উপায়ে যে তরান্বিত করা যায় সে সম্পর্কেও তাঁদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার এই জ্ঞান শিক্ষককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম প্রক্রিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী হবেন তিনি। শিক্ষা-মনোবিদ্যার শিশুমনের বিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান (Knowledge of the nature of development), শিক্ষকের মধ্যে পেশাগত সচেতনতা (Professional consciousness) এবং পেশাগত আত্মপ্রত্যয় (Professional confidence) দুই আনতে সক্ষম।

বিকাশের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান

॥ **তিন** ॥ শুধুমাত্র, সচেতনতায় (Consciousness) কোন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে না। প্রচেষ্টার দরকার। শিক্ষক তাঁর প্রচেষ্টাকে কোন পথে চালিত করবেন তার নির্ধারণ করার জন্য বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান এবং তথ্যের প্রয়োজন। শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিখন প্রক্রিয়া (Learning process) সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সিদ্ধান্ত পরিবেশন করেছে, তা শিক্ষককে এ বিষয়ে সহায়তা করবে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কি রকম; কোন পরিস্থিতিতে শিখন হয়, কেন শিখন হয়, শিখন প্রক্রিয়াকে কি ভাবে বাড়ানো যায়; ইত্যাদি যে সব সমস্যার সমাধান শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ করেছেন, তাঁদের দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে, শিক্ষক তাকে তাঁর নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। শিখন সংক্রান্ত এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষনা লব্ধ ফলের প্রয়োগ, শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা (professional skill) বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করবে।

শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান

॥ **চার** ॥ সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার (Education) একটা নিজস্ব গুরুত্ব আছে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (Social Institution) মত বিদ্যালয়ও এক রকমের সমাজ প্রতিষ্ঠান। তার কাজ হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণে (social control) সহায়তা করা। শিক্ষার দ্বারা যদি আদর্শ সমাজ প্রবণতা (Social

inclination) বিকাশ না করা যায়, তা'হলে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) থাকবে না। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক থেকে সমস্যাটা একটু অন্যরকম। বিদ্যালয়ে শিক্ষা যদি বৃহত্তর সমাজ জীবনের সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা প্রয়োগ করতে না পারে, তবে শিক্ষা-ব্যবস্থারই কোন উপযোগিতা থাকবে না। শিক্ষা-বিজ্ঞানের এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology), তার শিখন সঞ্চালন (Transfer of learning) সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে। শিক্ষণ সঞ্চালন কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব, কি নিয়মে তা হয়, এবং কি কি শর্তের উপর তা নির্ভর করে এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান শিক্ষক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় পাবেন। এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে তাঁর আয়ত্বের মধ্যে যা আছে, সেই পাঠদান পদ্ধতিকে (Method of teaching) তিনি এমনভাবে রূপদান করতে পারেন যা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালনে সহায়তা করবে। এটা করতে পারলেই শিক্ষক তাঁর সামাজিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবেন।

শিক্ষা সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

॥ পাঁচ ॥ প্রকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচনে এবং তার সুপরিচালনার ব্যাপারে আর একদিক থেকে শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষককে সাহায্য করেছে। শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ তাদের গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক থেকে পার্থক্য আছে (Individual difference)। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে এবং বিকাশের ধারায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। শিক্ষক যদি তাদের একই যন্ত্রের মধ্যে ফেলে একই ছাঁচে গড়তে চান তা'হলে তিনি সে চেষ্টায় অকৃতকার্য হবেন। মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে, এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের উপযোগী শিক্ষণ কৌশল ও আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (Individual difference) সম্পর্কিত এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষক তাঁর বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করবেন, শ্রেণীকক্ষে কাজ পরিচালনার ব্যাপারে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে শিক্ষক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা। শিক্ষা মনোবিদ্যার এই জ্ঞান শিক্ষককে তার বিচার বিবেচনাকে (Professional judgement) সঠিক পথে প্রয়োগ করতে সহায়তা করবে।

শিক্ষা-পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়তা

॥ ছয় ॥ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক কতকগুলো ব্যবহারিক সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সব ব্যবহারিক সমস্যাগুলোর মধ্যে একটা হ'ল মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতার (work-efficiency) হ্রাস। এই কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণ হিসেবে শিক্ষা-মনোবিদগণ **অবসাদ** (Fatigue), **একঘেঁয়েমি** (Monotony) এবং

বিরক্তির (Boredom) এর উল্লেখ করেছেন। কর্মক্ষমতা হ্রাসের কিছু স্বাভাবিক দৈহিক কারণ আছে ; কিন্তু অনেক সময় মানসিক অবস্থার জন্যও অবসাদ দেখা দেয়। আর, এই অবসাদ, যদি যথাযোগ্য কারণে না হ'য়ে থাকে, তা'হলে তা শিক্ষার্থীর বিকাশকে শুধু ব্যাহতই করে না, শিক্ষকের উদ্যমও নষ্ট করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অপ্রোয়জনীয় অবসাদকে (Unnecessary fatigue) দূর করতে না পারলে শিক্ষক তাঁর উদ্দেশ্যে পৌছাতে বাধা পাবেন। শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষককে এই সব কৌশল সম্পর্কে অবগত করে।

অবসাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান

॥ **সাত** ॥ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental hygiene) সংক্রান্ত তথ্য। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তাদের মানসিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে, একথা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষা-মনোবিদগণ প্রমাণ করেছেন। মানসিক অসুস্থতার কারণ, নিবারণের উপায়, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষক সহজভাবে শিক্ষার্থীদের অনেক সাধারণ সমস্যারই সমাধান করতে পারেন। শিক্ষা-মনোবিদ্যা জানলে শিক্ষকের এ সম্পর্কে যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগী (scientific attitude) গড়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধান

॥ **আট** ॥ আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক অর্থ—শিক্ষাকে জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়ার সামিল করেছে। শিক্ষকের দায়িত্বেরও সীমা বেড়ে গেছে। এখন তাঁর কাজ শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয় জীবন ছাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর জীবনে সফলতা এনে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর উপর এসে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনকে যথাযোগ্য পথে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষা-মনোবিদ্যায় তাই আধুনিক কালে শিক্ষামূলক নির্দেশনার (Educational guidance) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং শিক্ষকগণও এই জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যবহার করতে পারেন।

নির্দেশনায় সহায়তা

॥ **নয়** ॥ সবশেষে বলা যায় শিক্ষকের কাজ শুধু শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে সহায়তা করাই নয় ; সেই বিকাশ তাঁর প্রচেষ্টা ও শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তায় কি পর্যায়ে এসে পৌছেছে তাও বিচার করে দেখার দায়িত্ব তাঁর। এ ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় সংযোজিত মূল্যায়ণের (Evaluation) ধারণা এবং শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণের আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের মানসিক অভীক্ষা (Psychological test) শিক্ষককে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

মূল্যায়ণে সহায়তা

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-মনোবিদ্যার জ্ঞান, শিক্ষককে তাঁর

দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে নানা দিক থেকে সাহায্য করে। এ কথা ঠিক কোন বিশেষ বিষয়ের বই পড়ে শিক্ষক তার ক্ষমতা বাড়াতে পারেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানের কৌশলকে তিনি উন্নত করতে পারেন শিক্ষা-মনোবিদ্যার জ্ঞানের দ্বারা। আর কিছু না হউক, শিক্ষা-মনোবিদ্গণের আলোচনা থেকে, শিক্ষা-পদ্ধতি (Teaching method), শিখন প্রক্রিয়া (Learning process) ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি কিছু গবেষণামূলক তথ্য জোগাড় করতে পারেন। তা যে তাঁর সব সময় কাজে লাগবে এমন কোন কথা নেই। শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য এই নয় যে সে শিক্ষকের সব রকম সমস্যার তৈরী উত্তর ঠিক করে রাখবে। এর উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষককে এমন কিছু তথ্য সরবরাহ করা যার দ্বারা তিনি নিজেই তাঁর নিজের সমস্যার উত্তর খুঁজে পান।[1] এই রকমের পেশাগত দক্ষতা এনে দেওয়াই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

আলোচনা

প্রশ্নাবলী

1. What is educational psychology? Discuss its role in the field of Education. Explain with examples. [পৃঃ ৬৫—৬৭ : ৭৫—৭৯ ; ৮৯—৯৪]
2. Discuss the nature and scope of Educational psychology. Why is it included in every teacher education programme? [C.U.B.T. '66] [পৃঃ ৫৫-৬৭ ; ৭৫-৭৯ ; ৮৯-৯৪]
3. Critically discuss the various methods of Educational psychology. [পৃঃ ৮০-৮৬]
4. Indicate the scope of Educational psychology. (K.U.B.T. '69) [পৃঃ ৭৫-৭৯ ; ৮৯-৯৪]
5. Write a short essay on the scope and methods of Educational psychology. [পৃঃ ৭৫-৮৬] [C.U.B.A. '62]
6. Trace the development of the science of Educational Psychology and discuss its educational utility. [পৃঃ ৬৭-৭৫ ; ৮৯-৯৪]
7. Why is Educational Psychology included in every training courses? Cite at least one instance when you found your knowledge of Psychology useful during your practice teaching. [পৃঃ ৭৩-৭৯] [C.U.B.T. 61]
8. Do you consider Educational Psychology as separate discipline? Give reasons for your answer. [পৃঃ ৮৬-৮৯]

---

1. "Its (Educational Psychology) purpose, rather, is to inform the prospective teacher of some of the facts, principles, generalization and theories which may help her in answering her own questions, reaching her own conclusions, and solving her own problems."—Kolesnik : Educational Psychology.

9. Indicate the scope of Educational psychology, should you include within it the psychology of unconscious ? Give reasons for your answer and illustrate your answer. [পৃঃ ৭৩-৭৯] (K. U. B. T' '69)
10. Is a scholarly knowledge of a subject an adequate equipment for the efficiency of teaching ? Discuss. [পৃঃ ৮৯-৯৪] (C.U.B.A. '58)
11. Briefly indicate the modern trends in Educational psychology [পৃঃ ৮৬-৮৯] (NBU. '69)
12. Discuss the practical use of Educational psychology with special reference to its bearing on curriculum and teaching [পৃ: ৮৬-৮৯ অংশ বিশেষ]
13. What is the subject matter of psychology ? Consider the place of psychology in Education, [পৃ: ৫৫-৫৬ ; ৯৬- পরবর্তী অধ্যায়] (C.U.B.T. '71,

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক [RELATION BETWEEN EDUCATION AND PSYCHOLOGY]

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক কি তা শিক্ষা-মনোবিদ্যার (Educational Psychology) বিষয়বস্তু অনুশীলন করলেই জানা যায়। তার জন্য পৃথক আর আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে অনেকে মনে করেন না। কিছু এখানে উল্লেখ করার দরকার। শিক্ষা-মনোবিদ্যা বর্তমানে নিজ গুণেই জ্ঞানের একটা পৃথক ক্ষেত্র। এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞান আমরা সেখান থেকে পেতে পারি। সুতরাং, শিক্ষার উপর তার প্রভাব স্বাভাবিক।

সূচনা

শিক্ষার (Education) কাজকে শিক্ষা-মনোবিদ্যা কি ভাবে সহায়তা করবে, তার আলোচনা আমরা অতিরিক্ত (additional) মনে করতে পারি। কিন্তু, অন্যদিকে মনোবিদ্যা (Psychology), মানুষের বিরাট কর্ম ক্ষেত্র জুড়ে তার জাল বিস্তার করেছে। মানুষের আচরণের সামগ্রিক দিক নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাও তার মধ্য থেকে বাদ যায় না। মানুষের আচরণ সম্পর্কে মনোবিদ্যা যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাছাড়া মানুষের আচরণকে কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। একটা আম খাওয়ার জন্য যে ছেলে গাছে ঢিল মারলো, তার সেই আচরণকে সাধারণ মনোবিদ্যার (General Psychology), শিক্ষা-মনোবিদ্যার (Educational Psychology), অপরাধমূলক মনোবিদ্যার (Criminology), যে কোন একটার দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা বলেছি, সেখানে অন্যান্য জ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছে। তাই শিক্ষা ও শিক্ষা-মনোবিদ্যার সম্পর্কের চেয়ে আমাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা (Eduction) এবং সামগ্রিকভাবে মনোবিদ্যার (Psychology) সম্পর্ক। এখানে মনোবিদ্যা বলতে আমরা সাধারণ মনোবিদ্যা (General Psychology) ও তার অন্যান্য শাখাকে একত্রে দেখছি।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের (Education) সঙ্গে মনোবিদ্যার (Psychology) সম্পর্ক খুবই নিবিড়। এই সম্পর্কের স্বরূপ প্রকাশ করতে হ'লে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বিষয়বস্তুকে দু'টো দিক থেকে

বিবেচনা করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে, মনোবিদ্যা, শিক্ষা-বিজ্ঞানকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞানের অন্য কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায় না। এই প্রভাবের ক্ষেত্র দু'টো। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দুটো দিক আছে তাত্ত্বিক দিক (Theoretical aspect) এবং ব্যবহারিক দিক (Practical aspect)। মনোবিদ্যাও শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐ দু'দিক থেকে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাকে প্রভাবিত করেছে। এখন পৃথক পৃথক ভাবে আমরা এই দু'টো দিকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের উপর মনোবিদ্যার প্রভাব [Influence of Psychology on the Theoretical Aspects of Education]

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মনোবিদ্যা

মূলগত উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই দুই বিজ্ঞানের শাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিমনের বিকাশ সাধন করা। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক বা যে কোন শিক্ষাকর্মী শিশুদের মানসিক বিকাশের নানা রকম প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। অপর দিকে, মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের 'মন' বা আচরণের অনুশীলন করা। সে সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার করা। সুতরাং, শিক্ষক এবং মনোবিদ্ এদের দুজনেরই অনুশীলনের বিষয়বস্তু এক (মন বা আচরণ), দু'জনের উদ্দেশ্যও এক (মানব কল্যাণ)। সুতরাং বলা যেতে পারে অধ্যয়নের বিষয়বস্তু (subject matter) এবং উদ্দেশ্যের (objective) দিক থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য ও মনোবিদ্যা

আধুনিক শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আধুনিক যুগে শিক্ষার্থীর (Educand) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'চ্ছে। এই গুরুত্বের তাৎপর্য হ'ল, শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনা করে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীকে ভাল করে জানার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে জানার অর্থ শিক্ষার্থীকে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে অনুশীলন করা। কোন মানুষকে বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিতে অনুশীলন করা মনোবিদ্যার নামান্তর মাত্র। বিশেষ করে শিশুদের অনুশীলনের জন্য মনোবিদ্যার যে শাখা আছে, শিশু-মনোবিদ্যা (Child Psychology) তার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা তাকে মনোবিদ্যার আরও কাছাকাছি নিয়ে চলে এসেছে।

এছাড়া, মনোবিদ্যার বিশেষ যে শাখা, শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করে (শিক্ষা-মনোবিদ্যা) তার সঙ্গে শিক্ষা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থাপনে, শিক্ষা-পদ্ধতির নির্বাচনে, শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুশীলনে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য সব রকম সমস্যা সমাধানে, শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষককে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের (Educationist) শিক্ষার সার্থক আদর্শ স্থাপনে সহায়তা করে। এক কথায় শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষার যে কোন রকম সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। মনোবিদ্যার এই শাখার মাধ্যমে শিক্ষা এবং মনোবিদ্যা বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

শিক্ষা পদ্ধতি ও মনোবিদ্যা

সবশেষে, বলা যেতে পারে আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় বিদ্যালয়ের (school) যে নতুন ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছে তাতেও আমরা মনোবিদ্যার একটা বিশেষ শাখার প্রভাব দেখতে পাই। এই আধুনিক ধারণা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, আদর্শ সমাজ পরিবেশের মধ্যেই সার্থক শিক্ষা সম্ভব। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়রূপ সমাজের মধ্যে, দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ ধারাগুলো গ্রহণ করবে, বিদ্যালয় সম্পর্কে এই প্রগতিশীল ধারণা, সমাজ মনোবিদ্যার (Social Psychology) জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যালয়ের ধারণা ও মনোবিদ্যা

আধুনিক শিক্ষার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণা হ'ল সক্রিয়তাবাদ (activity principle)। শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন আত্ম সক্রিয়তাই একমাত্র শিক্ষার পদ্ধতি। অর্থাৎ, শিশুকে কাজের মধ্য দিয়ে শেখাতে হবে। যে কাজ সে স্বাভাবিকভাবে করতে ভালবাসে, সেগুলোকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। খেলাভিত্তিক শিক্ষাও (Playway principle) এরই নামান্তর। শিক্ষার এই তত্ত্বও মনোবিদ্যার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরাও মনে করেন, শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাশকে ব্যহত করে কোন কাজ করা যায় না। তার ফলে নানা রকম মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সক্রিয়তাবাদ ও মনোবিদ্যা

সুতরাং, শিক্ষার মধ্যে যা কিছু আধুনিক তা সব কিছু মনোবিদ্যার প্রভাবে হয়। তাই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিকে তাকালে মনে হয় পেস্টালোৎসীর সেই স্বপ্ন—'I want to Psychologize Education' সার্থক হয়েছে। মনোবিদ্যা শিক্ষার সমস্ত আধুনিক তত্ত্বকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

আলোচনা

শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর মনোবিদ্যার প্রভাব
[Influence of Psychology on the Practical Aspects of Education]

শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর মনোবিদ্যার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে, প্রথম আমরা **পদ্ধতির** কথা উল্লেখ করব। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

পদ্ধতি

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করে জ্ঞান দিতে বলা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, একই সঙ্গে যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করা যাবে জ্ঞান তত সামগ্রিক হবে। এই তত্ত্ব মনোবিদ্‌গণের দ্বারা পরীক্ষিত। এই পরীক্ষিত জ্ঞানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাবিদ্‌গণ তাঁদের শিক্ষা দানের পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক পাঠদানের পদ্ধতির একটা নীতি কাজ করছে, তা হ'ল শিখনের কাজ জ্ঞান বিতরণ করা নয়, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা। তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক প্রশ্ন (Graded questions) করা হয় এবং তার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতিও মনোবিদ্যা সম্মত। তাই এর সাধারণ নাম হ'ল **মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি** (Psychological method)।

তৃতীয়তঃ, হার্বার্ত (Herbart) **পাঠ পরিকল্পনা** রচনার জন্য যে ধারা-গুলোর কথা বলেছিলেন, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে তাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। হার্বার্ত-এর পদ্ধতি মনোবিদ্যার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন, মন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঐ নীতি অনুসরণ করে জ্ঞান আহরণ করে। তাই এই পাঠ পরিকল্পনার পদ্ধতিও মনোবিদ্যার প্রভাবের পরিচায়ক।

চতুর্থতঃ, আধুনিক যে সব পাঠদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন **ডালটন প্ল্যান** (Dalton plan), **প্রজেক্ট পদ্ধতি** (Project method) ইত্যাদি, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা দু'টো মনোবিদ্যা সম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটা হ'ল **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি** (Individual difference), এবং অপরটা হ'ল **সক্রিয়তার নীতি** (Activity principle)। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতির প্রভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়ার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এবং তার ফলে এই ধরনের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার নীতিও এই পদ্ধতি গড়ে উঠার পেছনে কাজ করেছে। তবে তাও মনোবিদ্যার পরীক্ষিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, আধুনিক সব রকম শিক্ষাদানের পদ্ধতি মনোবিদ্যার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের (Curriculum) যে ধারণা নেওয়া হয়েছে, তাও মনোবিদ্যা ভিত্তিক। মনোবিদ্যার থেকে আমরা জানতে পারি, কোন বিষয়েরই বিশেষ কোন শৃঙ্খলামূল্য (disciplinary value) নেই। প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল, মাত্র কয়েকটা বিষয় পড়িয়ে দিতে পারলে, মনের শক্তি বাড়বে এবং তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে, এ ধারণা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাবিদ্গণও সেই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আধুনিক-কালে পাঠ্যক্রমকে অনেক বিস্তৃত করেছেন। মনোবিদ্গণ বলেছেন, পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যক্তিসত্বা বিকাশের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সুতরাং পাঠ্যক্রমের মধ্যে ব্যক্তিসত্বা বিকাশের সমস্ত উপাদান রাখতে হবে। পাঠ্যক্রমে তাই পাঠ্য বিষয় ছাড়াও আজকাল অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজের সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠ্যক্রম

মনোবিদ্যা বিদ্যালয় পরিচালনার (School Administration and Organisation) ক্ষেত্রেও নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। বিদ্যালয়ের পরিচালক বা প্রধান শিক্ষকের (Headmaster) কি কি মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, তবেই তিনি ছাত্র-শিক্ষক সকলের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, সে সম্পর্কে মনোবিদ্যা, শিক্ষা-বিজ্ঞানকে অবগত করেছে। তাছাড়া, বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন দিকেও আমরা মনোবিদ্যার প্রভাব দেখতে পাই। **যেমন, বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা (Time table)** তৈরী করার জন্য কি কি নীতি অনুসরণ করা উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষা-মনোবিদ্যা আমাদের ধারণা দেয়। কোন কোন বিষয় (School Subject) আছে যে গুলো আয়ত্ব করার জন্য খুব বেশী মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এ ধরনের বিষয়কে কোন সময়ে পড়ানো উচিত। প্রত্যেক শিক্ষকের স্বাভাবিক পাঠদানের ক্ষমতা যাতে ব্যহত না হয় সে কথা বিবেচনা করে, কখন তাদের বিরাম দেওয়া উচিত, সপ্তাহের কোন কোন দিন গুলোয় সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়, কোন কোন কাজ কম পাওয়া যায় তা বিবেচনা করে, বিভিন্ন বিষয় সময় তালিকায় স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া মানসিক অবসাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সময় তালিকায় বিরতিও (Recess) ঠিক করতে হবে। **সময় তালিকা (Time table)** বিদ্যালয় পরিচালনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ব্যাপারে মনোবিদ্যা পরিচালককে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করে। বিদ্যালয় পরিচালনার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল **শৃঙ্খলা (Discipline) স্থাপনের** দিক। আধুনিক মনোবিদ্যার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, শিক্ষা-বিজ্ঞানে মুক্ত শৃঙ্খলার (Free discipline) ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। মনোবিদ্গণ বলেছেন শৃঙ্খলা বাইরের থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; অন্তরের জিনিস। তাই শৃঙ্খলা স্থাপন করতে

বিদ্যালয় পরিচালনা

হ'লে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। আধুনিক এই শৃঙ্খলার ধারণা বিদ্যালয়ের পরিচালনার একটা দুরুহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সহায়তা করেছে। আরও একদিকে মনোবিদ্যা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে সহায়তা করেছে। আধুনিক মনোবিদ্‌গণের মতে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ম মেনে চলার পেছনে একটা নীতি কাজ করে। তা'হল-গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে একাত্মতার (Identification with the group)। বিদ্যালয়ও এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সেখানেও এই একাত্মতার ভাব জাগ্রত না করতে পারলে, বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা করা সম্ভব হবে না শুধুমাত্র শাস্তির ভয় দেখিয়ে। তাই আজকাল এই সমত্ববোধ বা একাত্মতাবোধ জাগানোর জন্য বিদ্যালয়ে নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সবশেষে, দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হন। মনোবিদ্যার জ্ঞান এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করতে তাঁদের সাহায্য করে। এই সব সমস্যার মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের **অপসঙ্গতি-মূলক আচরণ** (Maladjust behaviour) প্রধান। এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণকে শাসনের দ্বারা দূর করা যায়। এদের আসল কারণ খুঁজে বাহির করতে হবে, এবং সেই সব কারণ দূর করতে হবে। কোন ছেলে হয়তো খুব সঙ্গী সাথীদের মারধোর করে। তার এই আচরণ দূর করতে হ'লে তার মধ্যেকার আগ্রাসী মনোভাবের (Aggresive attitude) কারণকে দূর করতে না পারলে, তা কখনই সম্ভব হবে না। কোন ছাত্রের পেন্সিল বা কলম মুখে দেওয়ার অভ্যাস আছে। সেই অভ্যাসকে দূর করতে হ'লে তার মনোবিদ্যা সম্মত কারণ কি তা খুঁজে বাহির করতে হবে। এমনি নানা রকম আচরণমূলক সমস্যা শিক্ষককে সমাধান করতে হয় শ্রেণী কক্ষে, আর তার জন্য তিনি মনোবিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করেন। তাছাড়া, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন রকম মানসিক অসুস্থতা থাকলে তারা ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনের জন্য যে মনোবিদ্যা শাখা (Abnormal Psychology) তার জ্ঞান থাকলে, তাদের চিকিৎসার জন্য অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারেন। এই ধরনের ছাত্র শ্রেণীকক্ষের পড়াশুনার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। **পাঠদান করতে** গিয়ে শিক্ষকের, ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করা নিয়ে এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা নিয়ে অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়। মনোবিদ্যার জ্ঞান তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য যে সব কৌশলের কথা বলা হয়েছে তা মনোবিদ্যার পরীক্ষিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই নির্বাচন করা হয়েছে।

আচরণগত সমস্যা

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে আমরা সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে

পারি, মনোবিদ্যা শিক্ষা-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে সবদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ এক। শিক্ষার সমস্ত স্তরে মনোবিদ্যা পৌছাতে পারে না।

আলোচনা

বিশেষ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার কোন হাত নেই। শিক্ষা-দার্শনিকগণ (Educational Philosophers) যে ভাবে লক্ষ্য স্থাপন করবেন, সে লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় মাত্র মনোবিদ্যা দিতে পারে। সুতরাং আদর্শ-স্থাপনের ব্যাপারে মনোবিদ্যার ক্ষমতা সীমিত। সে ব্যাপারে তাঁকে শিক্ষাদর্শনের (Educational Philosophy) উপর নির্ভর করতে হয়। **শিক্ষাবিদ্** রায়বার্ণ (Ryburn) মন্তব্য করেছেন, "মনোবিদ্যা আমাদের চালক নয়, বরং তাকে আমাদের আজ্ঞাবাহক বলা যেতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তার কোন ক্ষমতা নেই। সে কাজ নীতি বিজ্ঞান বা দর্শন করে থাকে।" কিন্তু একবার বিশেষ কোন লক্ষ্য স্থাপন করলে, মনোবিদ্যা তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বলে দিতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা আদৌ পৌছাতে পারব কি না; বা সে লক্ষ্যে পৌছানোর পন্থা কি? তাছাড়া, মনোবিদ্যার জ্ঞানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগের আর একটা অসুবিধা হ'ল, তার সব তথ্য পরীক্ষিত নয়; বা সব তথ্য সামগ্রিকভাবে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিশু মনোবিদ্যার (Child Psychology) জ্ঞানকে অপরিবর্তিতভাবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। অস্বাভাবিক মনকে অনুশীলন করে যে জ্ঞান পাওয়া গেছে, তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অসুবিধায় পড়তে হবে। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার গুরুত্ব আছে ঠিকই, তার প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Pestalozzi has been regarded as the first modern school master to Psychologize education and instruction. In what sense have education and instruction been psychologized? Discuss. (C. U. B.T. '59)
[সম্পূর্ণ অংশ]
2. Show how the knowledge of Psychology helps us in solving the theoretical and practical problems of Education. (C. U. B. T. 1962)
[সম্পূর্ণ অংশ]
3. Discuss the relation between Psychology and education. Which topic in your course of educational psychology have you found most interesting and why? [সম্পূর্ণ অংশ] (C. U. B. T. 1963)
4. Is Knowledge of the fundamental concepts of Psychology of real value to teachers? [সম্পূর্ণ অংশ] (C. U. B. T. 1955)

জন্মগত প্রবণতা ও ক্রিয়া

[Innate tendencies & actions]

শিশু প্রথম যেদিন বিদ্যালয়ে আসে, সেদিন কি সঙ্গে নিয়ে আসে? শ্লেট, খাতা, বই, পেন্সিল। টিফিনও মা দিয়ে দেন। এতো মাধ্যম, আর কি কোথাও কিছু তার থাকে না? শিক্ষকের কাজ কি শুধু খাতা, কলম, বই নিয়েই চলবে? হ্যাঁ, আর একজনের কথা আমরা অতটা ভাবছি না। সে বাহক বলে। সে হ'ল শিশু। তার মধ্যে কি আছে? এ জিজ্ঞাসা মনোবিদ্‌গণের চিরকালের। শিক্ষার আধুনিক কালের। তার মধ্যে কি আছে না জানলে, তাকে লেখা পড়া কিছুই শিখানো যাবে না। তার জীবন বিকাশে কণামাত্র সাহায্য করা যাবে না।

মনোবিদগণ বলেছেন, তার মধ্যে জন্মগত সূত্রে পাওয়া কতকগুলো কর্মপ্রবণতা আর কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা থাকে। সেগুলো অনেক। তারমধ্যে কয়েকটার কথা আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করছি। **চাহিদা** (Need), **প্রবৃত্তি** (Instinct), **তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া** (Reflex action) এবং **প্রক্ষোভ** (Emotion)।

অষ্টম অধ্যায়

মানুষের চাহিদা
[HUMAN NEEDS]

মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের আচরণকে অনুশীলন। আচরণ মানে শুধুমাত্র তার জৈবিক দিক নয়। বিশেষভাবে মানসিক দিকেরই অনুশীলন মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। মানুষকে অনুশীলন করতে গিয়ে দেখা গেছে, তার মধ্যে একটা 'কর্ম প্রেরণা' (Inner urge to act) সব সময় বর্তমান। বিভিন্ন দার্শনিক এই প্রেরণার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson) একে 'বিশ্বপ্রাণের মৌল শক্তি' (Elan vital) নামে আখ্যা দিয়েছেন। ফ্রয়েদ্ (Freud) একেই বলেছেন 'লিবিডো' (libido); প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে 'কামঃ'। আধুনিক মনোবিদ্গণ নানারকম নামকরণ করেছেন, চাহিদা (Need), চালকশক্তি (Drive), আকাঙ্ক্ষা (Want), প্রেষণা (Motive) ইত্যাদি। নামও যেমন ভিন্ন তাদের প্রকৃতির মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। মোট কথা আধুনিক কালে প্রায় সব মনোবিদ্গণই বিশ্বাস করেন মানুষের সব আচরণই উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ, যা কিছু মানুষ করে, তা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই করে থাকে। এই উদ্দেশ্যমুখী আচরণে তাকে বাধ্য করে কে? এই প্রশ্ন নিয়ে তারা বহু গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফল থেকে জানতে পারা যায় এই উদ্দেশ্যমুখী আচরণের পেছনে একটা প্রধান কারণ হ'ল—চাহিদা (Need)।

সূচনা

চাহিদা (Need) বলতে আমরা কোন কিছু অভাবকে বুঝি। যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, যা আমাদের দরকার, যা আমাদের জীবন ধারণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন, তার অভাব বোধই হ'ল চাহিদা [A *need is the absence of something desired, required or useful or man's well being*]। খিদে পেলে আমাদের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা (Need for food) দেখা দেয়। বিপদে পড়লে নিরাপত্তার চাহিদার (Need for security) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, ক্ষুধার সময়ে খাদ্যের অভাব বোধ করি; বিপদের সময় নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। যখন আমরা এই ধরনের অভাববোধ করি, তখনি আমাদের মধ্যে চাহিদা জাগে। আবার সেই বস্তুকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাববোধ

চাহিদা কি ?

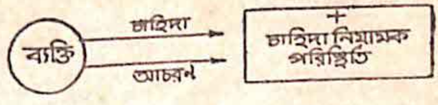
চলে যায়; চাহিদাও থাকে না। কিন্তু, এই চাহিদা মেটানোর মধ্যে আরও কতকগুলো প্রক্রিয়া হয়। কোন বস্তুর অভাববোধে আমাদের মধ্যে চাহিদা আসে। এখন এই চাহিদার দরুন আমাদের একটা অস্বস্তিকর মানসিক অনুভূতির (Mental tension) সৃষ্টি হয়। তখন আমরা ঐ অস্বস্তিকর অবস্থাকে দূর করার জন্য বস্তুমুখী বা উদ্দেশ্যমুখী আচরণ করি। যদি এই আচরণের ফলে আমাদের চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়, তা'হলে মানসিক অস্বস্তিও দূর হয়। **মনোবিদ্ রাগস্‌ডেল** (C.E. Ragsdale) তাই চাহিদার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"*It may be defined in terms of stresses, strains and movement in an enclosed rational field*"[1]. তাঁর এই সংজ্ঞায় 'Rational field' কথাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সব সময় অসন্তোষ প্রকাশ করে। অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিই তাকে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে মানসিক বিকারগ্রস্তদের মত সব সময় সে অভিযোগ করে (complain-type)। তার বিচার বুদ্ধি আছে। সেই বিচার বুদ্ধি দ্বারা মার্জিত যে অভাববোধ তাই হ'ল তার চাহিদা।

চাহিদার প্রকৃতি

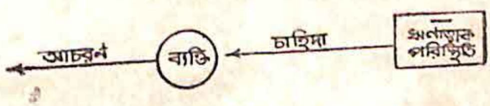
ব্যক্তিসত্তা এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই আচরণের সৃষ্টি হয়। শিশু তার নিজের আন্তরিক তাগিদ অনুযায়ী পরিবেশকে যে ভাবে গ্রহণ করে তার উপর নির্ভর করে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি। যে শিশু প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার সময় কাঁদে আর যে কাঁদে না তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করার। এবং এই প্রত্যক্ষ করার মধ্যে আছে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদার প্রভাব। এই যে মানুষের উদ্দেশ্যমুখী আচরণ, সেখানে শুধুমাত্র যে চাহিদা কাজ করে তাই নয়। মনোবিদ্ এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে চার ধরনের উপাদানের ক্রিয়ার কথা বলেছেন, (১) ব্যক্তির **ব্যক্তিসত্তা**; (২) তার **চাহিদা** (৩) একটা **লক্ষ্য** বা **উদ্দেশ্য** এবং উদ্দেশ্য সাধনের পথে (৪) **বাধা** (obstacle)। ব্যক্তির মধ্যে, স্বাভাবিক অবস্থায় দেহ-মনের একটা সাম্যতা (Homestasis) বজায় থাকে। কিন্তু তার আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাম্যতা নষ্ট হ'য়ে যায়। তখন সে বাধাকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আচরণ করে। ফল লাভ করলেই মনের সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। চাহিদারও পরিতৃপ্তি হয়। মনের অস্বস্তিকর অবস্থাও (Mental tension) দূরীভূত হয়। ব্যক্তির আচরণের গতি চাহিদার দিক এক শক্তির (Strength and direction of the need) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন অবস্থায় যে ভাবে প্রতিক্রিয়া হয় তা পরের পাতায় ছবির সাহায্যে তার কয়েকটা দেখানো হ'ল।

1. Motivation during childhood—C. E. Ragsdale

[এক] যখন পরিস্থিতিকে নিজের চাহিদা পূরণের উপযোগী মনে করে অর্থাৎ, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির যখন ধনাত্মক যোজ্যতা (Positive-Valance) আছে তখন সোজাসুজি বস্তুমুখী আচরণ করে।



[দুই] আবার পরিস্থিতি যখন চাহিদা তৃপ্তির পথে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করে, অর্থাৎ, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতিকে যখন ঋণাত্মক যোজ্যতা (Negative Valance) সম্পন্ন মনে হয় তখন তার আচরণ হয় বিপরীতমুখী। অর্থাৎ, পরিস্থিতির বিপরীতে—



[তিন] যখন পরিস্থিতিতে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দু'ধরনের উপাদান থাকে তখন ব্যক্তি তাদের মধ্যে পার্থক্য করে ধনাত্মক পরিস্থিতির দিকে আচরণ করে।



এমনিভাবে যে কোন রকম জটিল পরিস্থিতিতেও মানুষের আচরণের গতিকে তার চাহিদার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সব সময়েই চাহিদা মেটানোর জন্য আচরণের গতি হবে ধনাত্মক যোজ্যতা অভিমুখী। মনোবিদগণ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, মানুষের চাহিদা, তার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে চারটে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। **প্রথমতঃ**, তার আচরণ করবার তাগিদ, চাহিদার শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাহিদা যত তীব্র হবে, আচরণের প্রবণতাও তত শক্তিশালী হবে। **দ্বিতীয়তঃ**, চাহিদা যদি খুব বেশী সময় স্থায়ী হয়, তা'হলে বিরক্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এবং তা ক্রমেই তীব্রতর হ'তে থাকে। **তৃতীয়তঃ**, চাহিদার জন্য ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী আচরণে প্রবৃত্ত হয়। **চতুর্থতঃ**, লক্ষ্যে পৌছালে অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান হয়।

আলোচনা

মানব চাহিদার শ্রেণী বিভাগ
[Classification of Human Needs]

চাহিদার প্রকৃতি সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতঃই, চাহিদার সংখ্যা মনোবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা কি কি? বিভিন্ন মনোবিদ্, ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার (Needs) তালিকা তৈরী করেছেন। তাঁদের সেই চাহিদার তালিকা অনুশীলন করলে দেখা যায়, কোন কোন তালিকায় মানুষের বহু সংখ্যক চাহিদার কথা বলা হয়েছে। আবার কোন কোন তালিকায় তাদের সংখ্যা এতই কম যে মানুষের সব রকম আচরণকে বিশ্লেষণ করা যায় না। অনেকে মাত্র একটা চাহিদার কথা বলে তালিকা সংক্ষিপ্ত করেছেন। মানুষের একমাত্র চাহিদা হ'ল সুখ (Happiness)। কিন্তু সুখ কি? একে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক রকম চাহিদার পরিতৃপ্তিতে সুখ আসে। আবার, অনেকে মানুষের চাহিদাকে দুটো শ্রেণীভুক্ত করেছেন—

প্রস্তাবনা

॥ এক ॥ **প্রাথমিক চাহিদা** (Primary need), অর্থাৎ, যে গুলো না হ'লেই চলে না। যেগুলো মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। বিশেষ করে জৈবিক চাহিদা (Organic needs) গুলো। আর,

॥ দুই ॥ **অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা** (Secondary needs)। এগুলো জীবনের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজন নয়। তবে মানুষের সমাজজীবনের জন্য প্রয়োজন হয়। মানুষ শুধুমাত্র জৈবিকসত্বা নিয়ে বেঁচে থাকে একথা বললে, তাকে ভুল বিচার করা হবে। তাই আধুনিক কালে মনোবিদ্গণ এই ধরনের শ্রেণী বিভাগকে মেনে নেন না। মনোবিদ্ **কুম্বস্** এবং **স্নিগ্** (A.W. Combs and D. Snygg) তাঁদের 'Individual behaviour' নামক বইয়ে মানুষের চাহিদা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেছেন, তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছেন, মানুষের প্রধান চাহিদা হ'ল **আত্মরক্ষা** (Preservation) এবং **আত্মবিকাশ** (enhancement of self)। তাঁদের মতে মানুষ আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশে সব সময় সচেষ্ট। সুতরাং, তার সমস্ত রকম চাহিদাগুলোকে এই দুই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। পরে, **ক্যারল** (H.A. Carroll), কুম্বস্ এবং স্নিগ্ এর মতবাদকে বিস্তৃত করেন এবং মানুষের চাহিদাকে চারটে শ্রেণীভুক্ত করেন। তিনি আত্মরক্ষাকে (Preservation) দু'টো ভাগে ভাগ করেন—

॥ ক ॥ **দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা** (Need for Physical security) এবং

॥ খ ॥ **প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা** (Need for emo-

tional security)। অপর পক্ষে আত্মবিকাশকেও (Enhancement of self) দু'টো ভাগে ভাগ করেন—

॥ গ ॥ **কোন কিছুকে আয়ত্ব করার চাহিদা** (need for mastery) এবং

॥ ঘ ॥ **আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা** (need for status)।

এদের সম্পর্কে আমরা পৃথক পৃথক ভাবে এখন আলোচনা করব।

দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা
[Need for Physical security]

প্রত্যেক প্রাণী নিজেকে পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্ম প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। প্রাণীকুলে অভিব্যক্তির (evolution) মূলে এই নিয়ম কাজ করছে। মানুষ অভিব্যক্তির উচ্চতম পর্যায়ে পৌছে গেছে বলে, তার এই ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়, এ ধারণা ভুল। মানুষের মধ্যেও একই প্রচেষ্টা চলছে। সুতরাং, তার প্রাথমিক চাহিদা নিজের দৈহিক নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে। এই চাহিদাকে **জৈবিক চাহিদাও** (organic need) বলা যেতে পারে। **আহার** (food), **বস্ত্র** (clothing), **বাসস্থান** (shelter) এবং **বংশ-বিস্তার** (Reproduction) এই ধরনের চাহিদা। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনেই খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বস্ত্র (clothing) এবং বাসস্থানের (shelter) প্রয়োজন। তাই এই দু'য়ের চাহিদা তাদের মধ্যে সার্বজনীন। যৌন চাহিদা (sex-need) মানুষের বংশ রক্ষায় একান্তভাবে প্রয়োজন। মানুষের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদা শুধুমাত্র যৌন আকাজ্ক্ষার তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। তার পেছনে বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যই প্রধান। সে তার নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে চায় নিজের বংশধরদের মধ্যে।

প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা
[Need for Emotional security]

প্রত্যেক মানুষ চায় তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এমন কতকগুলো মানসিক প্রতিক্রিয়া যাদের বর্তমানে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। অর্থাৎ, পারস্পরিক ভাবমূলক অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে চায়। সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে চায় **স্নেহ** (Affection), **ভালবাসা** (love), **সংযুক্তির মনোভাব** (feeling of belongingness) বা আত্মীয়তাবোধ। এছাড়া তাদের কাছ থেকে চায় সেই মনোভাব যার দ্বারা সমস্ত ভীতি কেটে

যায় (freedom from fear), অর্থাৎ, আক্রমণ সম্পর্কে অভয় (freedom from threat)। প্রত্যেক মানুষই চায় অন্যে তাকে ভালবাসুক, স্নেহ করুক। ভালবাসা এবং স্নেহ তার জীবনে নিরাপত্তা আনে এবং মানসিক ভাব আদান-প্রদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মানুষ চায় দলভুক্তভাবে থাকতে। দলের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভেবে, নিরাপত্তা বোধ করে। তাই দলভুক্তির চাহিদা তার মধ্যে প্রবল। কারণ দলের মধ্যে না থাকলে তার প্রক্ষোভমূলক সন্তুষ্টি (emotional satisfactions) আসবে না। তাছাড়া অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ও তার মধ্যে প্রবল। তাই সে চায় ভয়ের নিবৃত্তি। ভয় নিবৃত্তির চাহিদা তাই তার মধ্যে কাজ করে।

আয়ত্ব করার চাহিদা
[Need for Mastery]

মানুষ চায় জীবনের সফলতা, সে চায় সব কিছুকে নিজের আয়ত্বে আনতে। তার ভীতরের এই চাহিদা সভ্যতার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাই আধুনিককালে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুকে নিজের আয়ত্বে আনার উন্মাদনায় মেতে আছে। **আত্মনির্ভরতার চাহিদা** (need for independence), **সফলতার চাহিদা** (Need for achievement), নতুনকে জানবার চাহিদা (Quest for the new), সবশেষে, প্রভুত্ব বিস্তারের চাহিদা (Need for assertion) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সব চাহিদার মূলে কাজ করছে, আত্ম প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক মানুষই চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। নিজের বৈশিষ্ট্যকে সবার উপরে তুলে ধরতে। এই ধরনের চাহিদার পরিতৃপ্তিতে ব্যক্তি-জীবনের উন্নতি হয়। যে কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির জীবনে এই সব চাহিদা-গুলো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা
[Need for Status]

আগে যে শ্রেণীর চাহিদার কথা উল্লেখ করা হ'ল, এই চাহিদা তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কারও আয়ত্বকরার তাগিদ আর আত্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদ পরস্পর নির্ভরশীল। এই চাহিদার মধ্যে পড়ে, **ক্ষমতার চাহিদা** (Need for power), **সম্মানের চাহিদা** (Need for honour), **ব্যক্তিগত সম্মানের চাহিদা** (Need for prestige), **অনুমোদনের এবং সমর্থনের চাহিদা** (Need for recognition)। এছাড়া মানুষের নিজের বৃত্তিকে কেন্দ্র করে যে সব চাহিদা (Professional needs) তাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় চাহিদাও ব্যক্তি জীবনের উন্নতিতে সহায়তা করে।

এই যে চার শ্রেণীর চাহিদা এবং তাদের অন্তর্গত বিভিন্ন চাহিদার কথা উল্লেখ করা হ'ল, এটাই মানুষের চাহিদার শেষ নয়। প্রকৃত পক্ষে, মানুষের চাহিদা অসংখ্য, বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা তার মূলগত দিক থেকে শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেছি মাত্র। এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে নমুনা হিসেবে কয়েকটা করে চাহিদার কথা উল্লেখ করেছি মাত্র। এখানে একটা কথা মনে রাখার দরকার কোন বিশেষ চাহিদা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলে অন্য চাহিদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই এই ধারণা ভুল। প্রকৃত পক্ষে মানুষের চাহিদা একটা আর একটার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাদের সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সব সময় সবগুলোকে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। কারণ কিছু কিছু চাহিদা জীবনের বিশেষ সময় দেখা দেয় এবং তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, আবার চলে যায়। মনোবিদ্ মাস্‌লো (Maslow) বলেছেন, যে পর্যন্ত না অপেক্ষাকৃত তীব্র চাহিদাগুলো পরিতৃপ্ত হয়, সে পর্যন্ত অন্যগুলোকে দেখা যায়। যাই হউক, মানুষের চাহিদার সাধারণ শ্রেণী বিভাগ নীচের ছকে দেওয়া হ'ল।

আলোচনা

মানুষের চাহিদা

- আত্ম রক্ষার চাহিদা
  - জৈবিক নিরাপত্তার চাহিদা [আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও যৌন চাহিদা ইত্যাদি]
  - প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা [স্নেহ, ভালবাসা, আত্মভুক্তি ভয়নিবৃত্তির চাহিদা ইত্যাদি]
- আত্ম বিকাশের চাহিদা
  - আয়ত্ব করার চাহিদা [আত্মনির্ভরতা, সফলতা, নতুনকে জানার চাহিদা ইত্যাদি]
  - আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা [ক্ষমতা, সম্মান, অনুমোদন ইত্যাদির চাহিদা]

শিক্ষা ও মানুষের চাহিদা
[Education and Human Needs]

চাহিদাই আচরণের মূল। চাহিদাই আচরণের জন্ম দেয়। চাহিদার দ্বারাই আচরণের বিকাশ হয়। তাই যে কোন আচরণ-বিজ্ঞান (Behavioural science) চাহিদার যথার্থ মূল্য না দিয়ে থাকতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ। সে বিকাশ সাধিত হবে, আচরণের পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধনের মাধ্যমে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও চাহিদার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। চাহিদা আচরণকে যে শক্তি যোগায় সেই শক্তিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারলে, শিক্ষার পথ সুগম হবে; শিক্ষার উদ্দেশ্যও সার্থক হবে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়, শিশুর

চাহিদা ও শিক্ষা

চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা ভিত্তিক করার প্রচেষ্টা শিক্ষা-বিজ্ঞানের সর্ব স্তরে চলছে। তার চাহিদা অনুযায়ী, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে ; তার চাহিদা অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন করতে ; তার চাহিদা অনুযায়ী, প্রয়োগ করার সুযোগ দিতে হবে। তাই আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে চাহিদার গুরুত্বের কথা আর নতুন করে কিছু বলার নেই। শিশুর চাহিদাই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে চাহিদার প্রয়োগ

সুতরাং, শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে হ'লে, শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদাকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো। **প্রথমতঃ**, আমাদের লক্ষ্য করতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কি কি চাহিদা আছে। চাহিদাগুলো অনুশীলন করার পর, এমন সব পরিস্থিতি তাদের সামনে আনতে হবে যেখানে তারা ঐ সব চাহিদার পরিতৃপ্তি পায়। এখানে মনে রাখার দরকার আমাদের উদ্দেশ্য চাহিদার পরিতৃপ্তি করা নয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা। তাই যদি হয়, শিক্ষার্থীরা যে পরিস্থিতিতে চাহিদার পরিতৃপ্তি করবে তা যেন জ্ঞানমূলক হয়। অর্থাৎ, শিক্ষক এমনভাবে বিষয়বস্তু বা সমস্যা নির্বাচন করবেন, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন করে আত্মতুষ্টি লাভ করবে এবং একই সময়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাও অর্জন করবে। আদর্শ শিক্ষক, তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, পাঠ পরিচালনা, ইত্যাদি সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

চাহিদার পরিবর্তন-শীলতা ও শিক্ষা

আর একটা দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। সে দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তি-জীবনের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান। ব্যক্তি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা সততই পরিবর্তনশীল। শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন চাহিদা পরিতৃপ্ত হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাহিদা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। মানব সভ্যতার প্রগতির মূলে এই নিয়ম কাজ করছে। সুতরাং শিক্ষাকে যদি সমান তালে শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে চলতে হয়, তা'হলে তার মধ্যেও পরিবর্তনশীলতার ধর্ম (Property of change) আনতে হবে। একমাত্র শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিক্ষাকে তাদের উপযোগী করে তুলতে পারেন। তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী, তার উপস্থাপনের ক্রম (order presentation) উপস্থাপনের রীতি পরিবর্তন করে শিক্ষণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদার পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষকের নিজস্ব কৌশলই এক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন।

শিক্ষকদের আর একটা কথা মনে রাখার দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু, শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া নয়। নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করাও শিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি পরবর্তী জ্ঞানের স্তরের কথা চিন্তা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি নতুন চাহিদার সৃষ্টি না করতে পারেন তা'হলে, তাঁর কাজে বাধা আসবে। শিক্ষার দ্বারাই নতুন চাহিদা আসবে; আবার সেই চাহিদা নতুন জ্ঞানের স্তরে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই শিক্ষাই শিক্ষার মধ্যে গতি এনে দেবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, নতুন নতুন সমস্যা উপস্থাপন করে, অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে অভাববোধ সৃষ্টি করবেন। তবে তারা নতুন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হবে। সমস্যা যত প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে জড়িত হবে, অভাববোধ তাদের তত বাড়বে। তাই সমস্যার উপস্থাপন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে করার চেষ্টা করবেন শিক্ষক।

চাহিদার উপর শিক্ষার প্রভাব

সবশেষে, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলো চরিতার্থ করার দায়িত্ব নিতে হবে। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা কাজের সঙ্গে যুক্ত না হ'লেও, পরোক্ষভাবে তাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যাতে অসহায় বোধ না করে সে দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। স্নেহ-ভালবাসা, ইত্যাদি কামনা চরিতার্থ করতে হবে, তা না করতে পারলে, শিক্ষার্থীরা যে নিরপত্তার অভাববোধ করবে, তার ফলে শিক্ষাদানের পরিবেশ নষ্ট হবে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণ, সহপাঠ্য-ক্রমিক কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতা, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

প্রক্ষোভমূলক চাহিদা ও শিক্ষা

প্রশ্নাবলী

1. What are human needs ? Draw a broad classification of human needs. Discuss the importance of needs in the education of the child. [সম্পূর্ণ অংশ]
2. What is a need ? Discuss its usefulness on the human behaviour. [পৃ. ১০৫ ; ১১১-১১২]
3. How can the school help in the satisfaction of basic human needs. [পৃ. ১১১-১১২]
4. How would you distinguish between human instinct and needs ? (C. U. B. A. 1962) [পৃ. ১০৫ ; পরবর্তী অধ্যায়]
5. What is a need ? Explain with diagram the various type of human behaviour in terms of need reduction. [পৃ. ১০৫-১০৭]

নবম অধ্যায়

প্রবৃত্তি
[INSTINCT]

মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের আচরণ অনুশীলন করা। এই আচরণ অনুশীলন করতে গিয়ে দেখা যায় মানুষের কিছু অচারণ, বিশেষ করে মনুষ্যতর প্রাণীর অনেক আচরণ একই ভাবে পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। মনে হয় এই ধরনের আচরণ বিভিন্ন জাতির প্রাণীর প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। যেমন, কুকুরের বাচ্চার চোখ ফোটার আগে দুধ খাওয়ার আচরণ; মানুষের চোখের পাতা নাড়ার (Eye blinking) আচরণ বা ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোওয়ার আচরণ; প্রত্যেকটিই একই ভাবে সম্পন্ন করতে দেখা যায়। এদের এই সমতার জন্য অনেক মনোবিদ্ এই সব আচরণকে **'প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া'** (Pattern reaction) আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই সব প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার কতকগুলো মানুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা জীবনধারণের মাধ্যমে অর্জন করে। এগুলো অর্জিত অভ্যাস মাত্র। কিন্তু কিছু আচরণ আছে বা আমরা শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই সমভাবে সম্পন্ন করে থাকি। যেমন, চোখের কাছে কোন শক্ত বস্তু এলে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা বন্ধ করে দিই। সব কুকুরের ছানাই চোখ ফোটার আগে একই ভাবে পূর্বশিক্ষা ছাড়াই মায়ের দুধ খেতে পারে। সব সূর্যমুখী ফুলই সূর্যের দিকে মুখ তুলে থাকে। তা'হলে, সাধারণভাবে প্রাণীর আচরণকে বা বিশেষভাবে এই সব প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়াকে (Pattern reaction) আমরা দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(ক) **অর্জিত** (Acquired or learned) বা (খ) **অনর্জিত বা সহজাত** (unlearned or innate) আচরণ। অনর্জিত প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়াগুলোর (innate pattern reaction) আবার গুণাগুণ বিচার করে, আমরা তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—॥ এক ॥ **ট্রপিজম্** (Tropism); ॥ দুই ॥ **তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া** বা **রিফ্লেক্স** (Reflex action) এবং ॥ তিন ॥ **সংস্কার গত প্রতিক্রিয়া** (Instinctive action)।

প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া কি?

॥ এক ॥ **ট্রপিজম্** (Tropism) হ'ল প্রাণী এবং উদ্ভিদের সরলতম অভিযোজনমূলক প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া (Tropism is the simpliest form of adaptive behaviour commonly found in plants and lower animals)। এই ধরনের আচরণ ভৌত এবং

ট্রপিজম্ কি

রাসায়নিক উদ্দীপকের (Physical or chemical stimulus) প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার অনেক ছোট ছোট প্রাণীর দেহ সঞ্চালনও এই প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোন কোন এককোষদেহী প্রাণী আলো ছাড়া বাঁচতে পারে না, তাই তাদের গতি সব সময় আলোর দিকে হয়। আবার, কিছু কিছু প্রাণী আছে, যারা আলো সহ্য করতে পারে না, তাদের গতি সব সময় আলোর বিপরীতে হয়। জেনিংস্ (Jennings, H. S.) বিভিন্ন প্রাণীর গতি অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাণীর এই ধরনের আচরণ যে কেবলমাত্র উদ্দীপকের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না ; এদের প্রত্যেকের পেছনে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সব সময় কাজ করে। অ্যামিবার (Amoeba) খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অনুশীলন করলে দেখা যায় তাদের এই আচরণ আপাতভাবে ট্রপিজম্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই আচরণ তাদের ক্ষেত্রে অনেক জটিল আকার ধারণ করে। তাই এই সব আচরণকে কেবলমাত্র, উদ্দীপক নিয়ন্ত্রিত আচরণ বললে, যথেষ্ট হয় না ; তার যান্ত্রিক সংব্যাখ্যান দেওয়া যায় মাত্র। যাই হউক, ট্রপিজম্ বিশেষভাবে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বর্তমান, তাই তার আর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন নাই।

রিফ্লেক্স কি ?

তাৎক্ষণিক আচরণ বা রিফ্লেক্সও (Reflex action) এক ধরনের সহজাত আচরণ, এবং জীবন বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ। এও এক রকম সরল জৈবিক আচরণ। তবে ট্রপিজমের সঙ্গে এর তফাত হ'ল যে এই জাতীয় আচরণের জন্য স্নায়বিক শক্তির খরচ হয়। কোন উদ্দীপকের উত্তেজনার দরুন আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে যে উত্তেজনা প্রবাহ হয় তারই ফল হ'ল রিফ্লেক্স (Reflex)। অর্থাৎ, জৈবিক প্রয়োজনে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। হাঁচি, কাশি, চোখের পাতা বন্ধ করা ইত্যাদি এ ধরনের আচরণ। তবে এই জাতীয় কাজের জন্য আমাদের কোন মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। বিখ্যাত শরীর বিজ্ঞানী (Physiologist) শেরিংটন (Sherrington, C. S.)[1] বলেছেন, এই সব প্রতিক্রিয়া উদ্দীপকের দ্বারা শুরু হয় এবং স্নায়বিক পরিবহনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। যদিও একথা সত্য যে কোন উত্তেজনা শুরু করা বা শেষ করার নিজস্ব ক্ষমতা কোন স্নায়ুর নেই। অর্থাৎ, রিফ্লেক্সের জন্য দরকার—

॥ এক ॥ সংগ্রাহক যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় (Rceptor) যা উদ্দিপককে গ্রহণ করবে ;

1. "Reactions in which there follows on an initiating reaction an end effect, reached through the mediation of conductor, a nerve itself in capable either of the end effect or under nature conditions, of the inception of the reaction".—Sherrnigton ; The integrative action of Nervous system.

॥ দুই ॥ স্নায়ু বা স্নায়বিক পথ (Nerve conductor) যা উত্তেজনা পরিবহন করবে ; এবং সবশেষে

॥ তিন ॥ কর্মেন্দ্রিয় (effector) যার মাধ্যমে কাজ হবে এবং যেখানে স্নায়বিক উত্তেজনা সবশেষে পৌছাবে।

অনেক মনোবিদ্ এদের সহজাত প্রকৃতি (innate nature) বুঝানোর জন্য এবং পরবর্তী জীবনে অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত জটিল আচরণের সঙ্গে তফাত করার জন্য এদের "Preportent reflex" আখ্যা দিয়েছেন। তবে এই মতবাদের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে।

প্রাণীর সহজাত আচরণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং যার সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা হয়েছে তা হ'ল প্রবৃত্তি বা সংস্কারগত আচরণ (Instinctive behaviour)। সহজাত প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই প্রবৃত্তি বা সংস্কারগত আচরণ সবচেয়ে জটিল। এই ধরনের জটিল প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা কোন রকম বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণী বিশেষ একভাবে কর্ম সম্পাদন করে, তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা বিভিন্ন মনোবিদ্ করেছেন। সব শেষে, এই সব জটিল প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মনোবিদ্‌গণ কোন জৈব মানসিক প্রবণতার (Psycho-physical disposition) অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই প্রবণতা একটা ধারণা ছাড়া কিছু নয়। বাইরে থেকে একে দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা হ'ল আচরণের পুনরাবৃত্তি। এবং এই সব প্রবণতা জন্মগত ভাবে প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের জন্মগত জৈব-মানসিক প্রবণতা যার দ্বারা মনোবিদগণ প্রাণীর জটিলতম প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার বাধ্যতামূলক দিকের সুষ্ঠু সংব্যাখ্যান দিয়েছেন তাকেই প্রবৃত্তি (Instinct) বলা হয়।

সহজাত প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তির সংজ্ঞা
[Definition of Instinct]

যদিও প্রাণীর বিশেষ এক ধরণের প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখা করার জন্য প্রবৃত্তি (Instinct) বা জৈব মানসিক প্রবণতার ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও প্রবৃত্তির প্রকৃতি এবং সংজ্ঞা নিয়ে মনোবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। তবে এ সম্পর্কে ইংরেজ মনোবিদ্ ম্যাকডুগ্যালের (W. Mcdougall) মতবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর মতে মানুষ কতকগুলো জৈব মানসিক প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। এই জৈব মানসিক প্রবণতাগুলো তার সব রকম প্রাথমিক কাজের উৎস। ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে, তাকে স্নান করায়, কাপড় পরায়, ঘুম পাড়ায়, এক কথায় তাকে ছোট শিশুর মত আদর যত্ন করে।

সহজাত প্রবৃত্তি কি ?

স্নেহ বা ভালবাসা তাদের কেউ শিখিয়ে দেয় নি। এই জাতীয় আচরণকে প্রবৃত্তিগত আচরণ বা সংস্কারগত আচরণ (Instinctive behaviour) বলা হয়। আবার, মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যেও এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়। এক ধরনের বোলতা আছে যারা মাটির মধ্যে গর্ত করে, তারপর একটা ফড়িংএর গায়ে হুল ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে টেনে গর্তের মধ্যে এনে ঢুকায়। এর পর ঐ ফড়িংএর গায়ে ডিম পেড়ে গর্ত বন্ধ করে দেয়। এই জাতীয় বোলতা প্রত্যেকেই এই রকম আচরণ করে এবং এই আচরণ তাদের কেউ শিখিয়ে দেয় না। বিভিন্ন প্রাণীর এই ধরনের আচরণ বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন মনোবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করে ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির এক পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁর মতে, **প্রবৃত্তি হ'ল জন্মগত জৈব মানসিক প্রবণতা বা আমাদের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে বা তার প্রতি মনযোগ দিতে বাধ্য করে এবং বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভ বা আবেগ (emotion) সৃষ্টি করে, যার ফল স্বরূপ এক কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করে ও আমাদের বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়া করতে বাধ্য করে।** ম্যাকডুগ্যালের (*Mcdougall*) নিজের ভাষায় "*An instinct is an innate Psychophysical disposition which determines the organism to perceive* (*to pay attention to*) *any object of a certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which finds expression in a specific mode of behaviour in relation to that object.*"[1] প্রবৃত্তি যেহেতু এক ধরনের জৈব মানসিক প্রবণতা, সেহেতু তাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। বাইরে থেকে আমরা যা পর্যবেক্ষন করতে পারি তা হ'ল, এই প্রবণতার ফলে প্রাণীর মধ্যে যে আচরণের সৃষ্টি হয় তাই। তাই মনোবিদ্ থুলেস (R. H. Thouless)[2] প্রবণতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাও প্রযোজ্য।

সহজাত প্রবৃত্তি মূলক কাজের স্তর

ম্যাকডুগালের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের (Instinctive behaviour) কয়েকটি বিশেষ পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে কতকগুলো সহজাত প্রবণতা অন্তর্নিহিত আছে। আর তা মনের **জ্ঞানমূলক** (Cognitive), **অনুভূতিমূলক** (Affective) এবং **প্রচেষ্টামূলক** (Conative)

1. An Outline of Psychology—William Mcdougall.

2. "The word disposition is used for something that cannot be itself observed. What we observe are behaviour and the pattern in which particular behaviour sequences occur"—Thouless : General & Social Psychology.

সত্বাকে ক্রিয়াশীল করে। ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির সংজ্ঞা মনের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই গড় উঠেছে, তাই তাকে সম্পূর্ণ বলতে পারি।

জ্ঞানমূলক স্তরে (Cognitive level) প্রবৃত্তির তাড়নায়, কোন বস্তুর বর্তমানে তার প্রতি আমরা মনযোগ দিই বা তাকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি। যেমন ধরা যাক, একটা সাপ রাস্তার উপর শুয়ে আছে। এখন আমাদের মধ্যেকার পলায়নরূপ প্রবৃত্তি বা আত্মরক্ষার প্রবণতা আমাদের বাধ্য করবে তাকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করতে। অর্থাৎ, সাপকে আমরা প্রত্যক্ষ করব, বা রাস্তার অন্যান্য বস্তুকে বাদ দিয়ে তার প্রতি মনযোগ দেব। এখন ঐ বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভমূলক অবস্থার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ, সাপটাকে শুয়ে থাকতে দেখে মনে ভয়ের (প্রক্ষোভ) সৃষ্টি হবে। এটা প্রবৃত্তিমূলক আচরণের **অনুভূতিমূলক স্তর** (affective level)। **ম্যাকডুগাল** বলেছেন, এই প্রক্ষোভ প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত থাকে এবং প্রবৃত্তি-মূলক আচরণ সম্পাদনে শক্তি যোগায়। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

এখন এই প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে একটা কাজ করার তাগিদ দেখা দেয়। অর্থাৎ, আত্মরক্ষার্থে আমাদের কিছু করার প্রবল ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আসে। এবং এই কর্মপ্রেরণা পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, আমরা আচরণ সম্পাদন করি। এক্ষেত্রে সাপের কাছ থেকে দূরে ছুটে পালাই বা সাপটাকে মারার চেষ্টা করি। প্রবৃত্তিমূলক আচরণের এই স্তরকে **প্রচেষ্টামূলক** বা **ক্রিয়ার স্তর** (Conative level) বলা হয়। আর সর্বশেষ পর্যায়ে এই যে আচরণ সম্পাদন হলে একে বলা হয় **প্রবৃত্তিমূলক আচরণ** (Instinctive behaviour)। এই জাতীয় আচরণের পেছনে যে এক বিশেষ মানসিক প্রবণতা কাজ করে এ কথা অনেক মনোবিদ্ স্বীকার করেছেন। কারণ, এ রকম আচরণকে আন্তরিক কোন প্রবণতার অস্তিত্বকে না স্বীকার করে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সবশেষ পর্যায়ে আচরণটাই বড় কথা নয়; তার প্রকৃতির পরিবর্তন হ'তে পারে। কিন্তু এই আচরণ করার যে তাগিদ (impulse to action) সেটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই তাগিদকে আন্তরিক প্রবণতার কথা অস্বীকার করলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই **রস্** (Ross)[1] এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য

1. "...there must be certain dispositions or engram-complex behind these mode of behaviour......in a dangerous situation, we instinctively seek safety, and we might, therefore, talk of instinct of escape. The chief objection to such a mode of definition is simply that the behaviour does not always take place. It would be better since we have the power of inhibiting the behaviour itself, to define an instinct as an impulse towards certain mode of bhaviour." —Ground work of education Psychology.—Ross.

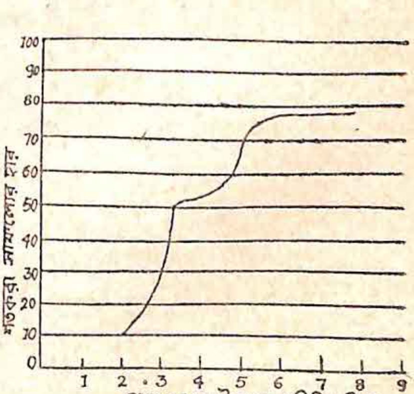
করেছেন, শেষ পর্যায়ের এই আচরণ শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত হ'তে পারে। ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমরা সকলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি, সুতরাং, এর পেছনে পলায়ন প্রবৃত্তি কাজ করছে, এ ধরনের সিদ্ধান্তের কিছুটা ত্রুটি থেকে যায়। তাই কাজটাকে বাদ দিলে আমাদের ধারণার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে না। খুব সহজভাবে যদি বলা যায়, প্রবৃত্তি হ'ল কোন কাজ করার প্রবণতা, তা'হলে বোধ হয় এই জটিলতা আসে না। প্রবৃত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ্ আরও নানা রকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আর এখানে করলাম না। প্রবৃত্তি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে সব মতবাদ গড়ে উঠেছে (anti-instinct movement) সে সম্পর্কে আলোচনা এখানে করব না। শুধুমাত্র ম্যাকডুগালের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য-মতবাদ কিছু কিছু যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

প্রবৃত্তিমূলক কর্মের বৈশিষ্ট্য
[Characteristics of Instinctive behaviour]

প্রবৃত্তিমূলক আচরণের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদের অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ থেকে পৃথক করে রেখেছে,। বিভিন্ন মনোবিদ্ এই প্রাণীর আচরণ বিশ্লেষণ করে যে সব বৈশিষ্ট্য গুলোর৹ কথা বলেছেন সে গুলোর উল্লেখ করব।

॥ এক ॥ প্রবৃত্তি হ'ল **সহজাত** (Innate)। তাই প্রবৃত্তি মূলক আচরণের সঙ্গে অন্যান্য অর্জিত আচরণের পার্থক্য তখনই উপলব্ধি করা যায়, যখন দেখা যায় প্রাণী কোন শিক্ষা ছাড়াই কোন বিশেষ কাজ করতে গিয়ে সহজে সম্পন্ন করতে পারে। যেমন, মানুষ কত কষ্ট করে সাঁতার শেখে ; কিন্তু হাঁসের বাচ্চা প্রথম জলে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার কাটতে পারে সুন্দরভাবে। মানুষের কাছে যে আচরণ অর্জিত, হাঁসের কাছে তা সহজাত প্রবণতামূলক কাজ। তবে সব রকম প্রবৃত্তিমূলক কাজ যে তাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশেই সুসম্পন্ন হয়, এ কথা ঠিক নয়। পাখীর উড়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রথম যেদিন পাখীর ছানা বাসা থেকে বেরোয় সেদিন সে উড়তে পারে ঠিকই কিন্তু কিছুদিন পরে সে যত সহজভাবে উড়তে পারে অত সহজভাবে

প্রবৃত্তি সহজাত



প্রথমদিন পারে না। যে পটুত্ব তার মধ্যে দেখা যায় তার দ্বারা সে তার জীবন রক্ষা করতে পারে। পরে সেই আচরণের সম্পূর্ণতা (Perfection) আসে। তবে এই সম্পূর্ণতা শিক্ষার জন্য কি দৈহিক পরিমনের জন্য সংগঠিত হয়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে এই দুটোরই সক্রিয় প্রভাবে এটা ঘটে থাকে। সেফার্ড এবং ব্রিড্ (Shephard & Breed), মুরগীর ছানার খাওয়ার সংগ্রহের আচরণ অনুশীলন করেন। এবং তাঁরা এই আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে একই সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁরা প্রায় ২০টি মুরগী ছানা খাবার খুঁটে খাওয়ার প্রকৃতি অনুশীলন করেন এবং দিনে দিনে তাদের দক্ষতা কি পরিমাণে বাড়ে তা নির্ণয় করেন। লেখ চিত্রের সাহায্যে তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল তাঁরা পরিবেশন করেন। এই লেখচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় পুনরাবৃত্তির ফলে তাদের দক্ষতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে দৈহিক পরিমনের যে সম্পর্ক আছে, একথা আরও অনেক মনোবিদ স্বীকার করেছেন।

॥ **দুই** ॥ সহজাত প্রবৃত্তির আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এগুলো যে শুধুমাত্র জন্মগত (innate) তাই নয়, **বংশানুক্রমিকও** (inherited) বটে। প্রবৃত্তিমূলক আচরণও তাই বংশানুক্রমিক (inherited)। মৌমাছির মধুসঞ্চয় করার আচরণ এবং বিশেষ পদ্ধতিতে চাক তৈরী করার আচরণ যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে বংশানুক্রমে বর্তে আসছে। এই বংশানুক্রমিক ধারা এবং এই ধরনের আচরণ কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে থাকে। কোন একটা প্রাণীকে যদি তার দল থেকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে দূরে পালন করা হলেও দেখা গেছে, কোন রূপ দলের প্রভাব ছাড়াই সে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ একই ভাবে সম্পন্ন করছে। যেমন মনোবিদ্ **মারাইস্** (E.N. Marais) দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ এক ধরনের পাখীর বাচ্চাকে নিয়ে দূরে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে তাকে পালন করেন। এবং পাঁচ পুরুষ তাদের এমনিভাবে পৃথক করে রাখেন। কিন্তু, তিনি লক্ষ্য করেন কোন রকম প্রভাব ছাড়াই পাঁচ পুরুষ পরেও তারা একইভাবে বাসা তৈরী করছে। এর থেকে তিনি প্রমাণ করলেন, প্রবৃত্তিমূলক কাজ সহজাতই (innate) শুধু নয়, বংশগতির ধারায় তা অপত্যের মধ্যে সঞ্চালিত হয় (Inherited)।

প্রবৃত্তি বংশানুক্রমিক

॥ তিন ॥ ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তার **উদ্দেশ্য** (purpose)। তিনি এই শক্তিকে 'Horme' অ্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রবৃত্তিমূলক আচরণও উদ্দেশ্য হীন ইতস্ততঃ প্রতিক্রিয়া নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আচরণগুলো সম্পাদিত হয়। পাখীর বাসা তৈরীর আচরণের পেছনে আছে তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্য। সুতরাং আপতদৃষ্টিতে সংস্কারকে উদ্দেশ্য বিহীন মনে হ'লেও প্রবৃত্তি জীবনের উদ্দেশ্যমুখী গতিরই সহায়ক। তাই ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিদ্যার সম্পূর্ণ

প্রবৃত্তি উদ্দেশ্যমুখী

সংব্যাখ্যানকে উদ্দেশ্যমুখী মনোবিদ্যা (Purposive Psychology) বা Hormic Psychology বলা হয়।

॥ চার ॥ প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করে তা সুদূর প্রসারী। বিশেষভাবে আত্ম-জীবন ও সমাজ-জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যগুলো বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ নাও হতে পারে। পাখী তার বাচ্চা হওয়ার পূর্বেই বাসা তৈরী করে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। এগুলো হ'ল প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র যার দ্বারা প্রাণী বেঁচে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তন্যপান, এবং অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য গ্রহণের আচরণ সবই জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে হ'য়ে থাকে। যৌন-প্রবৃত্তি সকল প্রাণীর মধ্যে বর্তমান। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা যে প্রজননমূলক আচরণ করে, তা তাদের পৃথিবীর বুকে বংশ রক্ষায় সহায়তা করে। তাই প্রবৃত্তিমূলক আচরণে আত্মরক্ষার এবং বংশ রক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রধান।

প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী

॥ পাঁচ ॥ অনেকে মনে করেন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একেবারে স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আধুনিককালে মনোবিদ্‌গণ একথা মানেন না। প্রবৃত্তিমূলক আচরণের কিছু **পরিবর্তন হয়।** প্রবৃত্তি সারাজীবন সক্রিয় থাকে ঠিকই, কিন্তু উন্নত ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রে সব প্রবৃত্তি সারাজীবন ধরে সক্রিয় থাকে না। অনেকের প্রয়োজন ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায়; আবার অনেকগুলো প্রয়োজনবোধে পরে বিকাশ লাভ করে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। আর তাই যদি না হ'ত তা'হলে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্তির ধারণার কোন প্রয়োজন হ'ত না। বিখ্যাত মনোবিদ্ **উইলিয়ম জেমস্** (William James) তাঁর "Law of trasitoriness of instinct" এ এই কথাই বলেছেন। মনোবিদ্ **থ্যুলেসও** (Thouless)[1] বলেছেন, প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পরিবর্তন সম্ভব। এবং এই পরিবর্তনের হার অভিব্যক্তির স্তরে সমতা রক্ষা করে ক্রমহারে বাড়ে। অর্থাৎ যে প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা তত বেশী। এর কারণ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী ক্রমশঃ জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমে অভিযোজন করতে শিখে যায়।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পরিবর্তন হয়

1. "The plasticity may be supposed to have increased in the course of evolution of the higher mammals because, organisms were becoming adopted to environmental conditions, so complex and varied that rigid and invariable responses would have been of no value"—Thouless: General & Social Psychology

॥ **ছয়** ॥ 'ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তির কেন্দ্রে একটা করে প্রক্ষোভ থাকে এবং এই প্রক্ষোভই কর্ম ক্ষমতা যোগায়। ম্যাকডুগাল মনে করেন, এই প্রক্ষোভ-প্রবৃত্তি সম্পর্ক (Instinct-Emotion relation) একেবারে স্থির। অর্থাৎ, একটা প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা প্রক্ষোভ যথাযোগ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। ম্যাকডুগাল, তাঁর মতবাদে এই প্রক্ষোভের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পেছনে প্রেষণা শক্তি যোগায় এই প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে আমাদের মনের যে ভারসাম্য (equillibrium) নষ্ট হয়, তাই প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করতে আমাদের বাধ্য করে। আর এই আচরণ সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত মনের অস্বস্তিকর অবস্থা দূর হয় না।

প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ সম্পর্ক

॥ **সাত** ॥ প্রবৃত্তিমূলক আচরণ বিশেষ বিশেষ প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে। যদিও একই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ ঘর তৈরী করে, আর পাখী বাসা বাঁধে, কিন্তু আচরণের দিক থেকে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার, শুধুমাত্র পাখীর কথা বিবেচনা করি সেখানেও দেখা যাবে বিভিন্ন পাখীর বাসা তৈরীর আচরণ বিভিন্ন রকম। মৌমাছি তার চাক তৈরী করে একভাবে ; আবার বাবুই পাখী তার বাসা তৈরী করে অন্য রকম ভাবে। অর্থাৎ, সব মৌমাছির বাসা তৈরীর রীতি এক ; সব বাবুই পাখীর বাসা তৈরীর পদ্ধতি এক। এর থেকে বলা যায় এক এক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সমতা (Uniformity) রক্ষা করে। কিন্তু অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তা'হলে বলা যেতে পারে, বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সমতা (Uniformity) বজায় রাখে।

প্রবৃত্তিমূলক কাজের সমতা

॥ **আট** ॥ সবশেষে, প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাজ বুদ্ধি (Intelligence) নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হয়। যদিও আধুনিককালে মনোবিদ্‌গণ প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক, অন্ধ আচরণ হিসেবে বিচার করেন না, তবুও এটা ঠিক যে এই ধরনের আচরণ যান্ত্রিক (Mechanical) নিয়মে সম্পাদিত হয়। এই ধরনের আচরণ প্রাণীকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনে সাহায্য করে না। এই ধরনের আচরণ নির্দিষ্ট গতানুগতিকতা মেনে চলে (Stereotyped)। ফেব্‌রি (Fabre) এক বিশেষ ধরনের শুঁয়ো পোকার যে আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে এই প্রবৃত্তিমূলক আচরণের যান্ত্রিকতা বুঝা যায়। এক ধরনের শুঁয়ো পোকা আছে, যারা চলার সময় একটার পেছনে আর একটা মুখ লাগিয়ে রাখে। এর ফলে তারা পথ হারায় না বা দল ছাড়া হয় না। এ রকম একটা শুঁয়ো পোকার দলকে একটা টবের উপর গোল করে জুড়ে দেন। দেখা যায় তারা সাত দিন

প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি

ধরে কোন খাবার ছাড়াই সমানে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তবুও গোল সারিটা ভাঙার চেষ্টা করে না। পরে যখন তিনি নিজে তাদের ভেঙে দিলেন, তখন দেখা গেল, তারা বাসায় ফিরে গেল। এর থেকে বুঝা যায় সাধারণভাবে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একেবারে অন্ধ, যান্ত্রিক এবং অপরিবর্তনীয়।

প্রবৃত্তির সংখ্যা
[Number of Instincts]

প্রবৃত্তির প্রকৃতি নিয়ে মনোবিদগণের মধ্যে যেমন মতভেদ আছে তেমনি তাদের সংখ্যা নিয়েও তাঁদের মধ্যে বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের কাছে মূল প্রশ্ন হ'ল প্রবৃত্তি যদি সহজাত প্রবণতা হয়, তা'হলে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী এ রকম কতকগুলো মানসিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। **ফ্রয়েড্** (S. Freud) বলেছেন—মাত্র দুটি প্রবণতা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। Eross এবং Thanatos. আবার উইলিয়ম **জেমস্** (James) বলেছেন প্রবৃত্তির সংখ্যা অনেক বেশী। তবে প্রাণীর আচরণ এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তাকে শুধুমাত্র দুটো প্রবৃত্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার অসংখ্য প্রবৃত্তির কথা যদি ভাবি, তা'হলে প্রবৃত্তির সীমিত ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা হয়। এ বিষয়ে **ম্যাকডুগাল** (Mcdougall) যে মতবাদ প্রচার করেছেন, একেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায়। তাঁর মতে প্রাণী বা মানুষের প্রবৃত্তির সংখ্যা হ'ল চৌদ্দটি। তিনি চৌদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত যোগ্য প্রক্ষোভগুলোরও নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরিপূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল।

প্রবৃত্তির সংখ্যা

প্রবৃত্তি	প্রক্ষোভ
পলায়ন প্রবৃত্তি (Instinct of escape)	ভয় (Fear)
যুযুৎসা প্রবৃত্তি (Instinct of Combat)	ক্রোধ (Anger)
বিকর্ষন (ঘৃণা) প্রবৃত্তি (Instinct of repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
বাৎসল্য (Parental Instinct)	স্নেহানুভূতি (Tender emotions)
যৌন প্রবৃত্তি (Sex-instinct)	কাম (Lust), ভালবাসা (Love)
বশ্যতার প্রবৃত্তি (Instinct of Submission)	হীনমন্যতা (Negative self-feeling)
আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি (Instinct of self-assertion)	আত্মগৌরব (Positive self-feeling)

প্রবৃত্তি	প্রক্ষোভ
কৌতূহল প্রবৃত্তি (Instinct of Curiosity)	বিস্ময় (Wonder)
অনুনয় প্রবৃত্তি (Instinct of appeal)	দুঃস্থভাব (Distress)
যৌথ প্রবৃত্তি (Instinct of gragariousness)	একাকীত্ববোধ (Feeling of lonliness)
সঞ্চয় প্রবৃত্তি (Instinct of acquisition)	স্বাধিকারবোধ (Feeling of ownership)
নির্মাণ প্রবৃত্তি (Instinct of Construction)	সৃজনীস্পৃহা (Creativeness)
খাদ্যান্বেষন প্রবৃত্তি (Instinct of food seeking)	ক্ষুধা (Guste)
হাস্য (Laughter)	আমোদ (Amusement)

১৪টি প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য

কোন বিশেষ পরিস্থিতি আমাদের জৈবিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করলে আমাদের মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে আচরণ করি তা হ'ল পলায়ন (escape behaviour)। এই পলায়নরূপ আচরণ হ'ল প্রবৃত্তি-মূলক আচরণ (Instinctive behaviour)। এর সঙ্গে পলায়ন-প্রবৃত্তি (Instinctive of escape) এর পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আসলে পলায়ন প্রবৃত্তির তাড়নায়ই পূর্বোক্ত পরিস্থিতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ রকম অসুবিধা নামকরণের জন্য আসছে। সুতরাং এ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দরকার। ম্যাকডুগাল নিজেও তাই তাঁর তালিকায় প্রবৃত্তি বুঝাতে প্রত্যেকটার বেলায় 'Instinct of' এ কথাটা ব্যবহার করেছেন। যাই হউক এখন আমরা তাঁর তালিকার অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলো সম্পর্কে অনুরূপভাবে আলোচনা করব। যদি কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ বাধা প্রাপ্ত হয়, বা কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হ'তে না পারে তখন আমাদের মধ্যে রাগ বা ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং বাধার কারণকে অতিক্রম করার জন্য যুযুৎসার আচরণ দেখা দেয়। এই আচরণও শুরু হয় যুযুৎসা প্রবৃত্তি থেকে। অপরিষ্কার কিছু বস্তু আমাদের বিরক্তি সৃষ্টি করে এবং তার ফলে তাকে আমরা ঘৃণা করি। অপরিষ্কার বস্তুর এই প্রত্যক্ষণ ঘৃণার প্রবৃত্তির দ্বারা হ'য়ে থাকে। বাৎসল্য প্রবৃত্তি আমাদের সন্তান সন্ততির বর্তমানে আমাদের মধ্যে আপত্য স্নেহের অনুভূতি জাগ্রত করে এবং তার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে তার প্রকাশ করি আচরণের মধ্য দিয়ে। কখনও কোলে তুলে; কখনও চুমু খেয়ে। সব নারী এবং পুরুষের মধ্যেই যৌন প্রবৃত্তি বর্তমান। এই

প্রবৃত্তি আমাদের বিভিন্ন যৌন বৈশিষ্ট্য বা যৌন চিহ্ন প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করায় এবং তার প্রত্যক্ষণের দরুন আমাদের মধ্যে যে প্রক্ষোভ বা মানসিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা হ'ল কাম (lust), এর চরিতার্থ হয় যৌন-সঙ্গম রূপ আচরণের মাধ্যমে। কোন অপরিচিত বা অদৃষ্টপূর্ব বস্তু আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। কৌতূহলের প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা এই জাতীয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি বা তার প্রতি মনোযোগ দিই। নিজের চেয়ে বড় তা আয়তনের দিক থেকে বা অন্য কোন দিক থেকে হউক, এ রকম প্রাণীর প্রতি আমরা বশ্যতার প্রবৃত্তির জন্য আকৃষ্ট হই এবং এর ফলে আমাদের মনে হীনমন্যতা আসে। তার কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করি। বশ্যতার ঠিক বিপরীত প্রবৃত্তি হ'ল আত্ম-প্রতিষ্ঠা। নিজের চেয়ে ছোট কোন ব্যক্তির সম্মুখীন হ'লে আমরা আত্মগৌরব অনুভব করি এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ করি। যখন প্রাণী দুঃস্থ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন নিজেকে সে অসহায় মনে করে এবং অনুনয় করে মুক্তি পেতে চায়। এই ধরনের আচরণ ও প্রক্ষোভ অনুনয়ের প্রবৃত্তির জন্য হ'য়ে থাকে। দলবদ্ধভাবে বাস করা প্রবণতা প্রাণীর একটা প্রবৃত্তি। দল ছাড়া হ'লে সে একাকিত্ব বোধ করে এবং স্বজাতির সঙ্গে দলবদ্ধভাবে বাস করার জন্য চেষ্টা করে। যে সব বস্তু প্রাণীর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সেই সব বস্তুকে সে নিজের অধিকারে আনতে চায়। সঞ্চয় প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রাণীর মধ্যে এই স্বাধিকার বোধ জাগ্রত হয় এবং সে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চয় করে। আবার প্রাণীর জীবন ধারনের জন্য খাদ্য একান্তভাবে প্রয়োজন। খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রাণী খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে। এই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভ হ'ল ক্ষুধার অনুভূতি। নির্মাণ করার প্রবৃত্তিও প্রাণীর মধ্যে প্রবল। গৃহ নির্মাণ করার প্রবৃত্তি থেকে এর শুরু। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এর অনেক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভের ম্যাকডুগাল নাম দিয়েছেন, সৃজনী স্পৃহা। সৃষ্টি করার এই অনুভূতি থেকে নির্মাণের আচরণ হয়। সব-শেষে ম্যাকডুগাল বলেছেন হাস্য আমাদের এক ধরনের প্রবৃত্তি। তিনি বলেছেন ক্রোধ এবং সহানুভূতির একটা মাঝামাঝি অবস্থা 'আমোদ' এই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত অনুভূতি। অর্থাৎ, যে অবস্থার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সমবেদনা বোধ নাই বা সম্পূর্ণরূপে রাগান্বিত নয়, সে বস্তুকে দেখে আমরা হাসি। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রবৃত্তি আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ম্যাকডুগালের পরবর্তী মতবাদ

ম্যাকডুগাল পরে তাঁর Energies of Man নামে বইয়ে আরও কতকগুলো প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর এই প্রাথমিক তালিকার সংস্কার করেন। পরবর্তীকালে, তিনি প্রবৃত্তি বা Instinct কথাটার পরিবর্তে প্রবণতা বা Propensity কথাটাই ব্যবহার করেন। তাই পরে তাঁর প্রবৃত্তির তালিকায় "instinct of" এই

কথার পরিবর্তে "Propensity of" এই ধরনের কথার উল্লেখ পাই। যাই হউক পরবর্তীকালে, তিনি যে তিনটি প্রবণতার কথা অতিরিক্ত বলেছেন তাহ'ল— ॥ এক ॥ **আরাম প্রবণতা** (Comfort propensity); ॥ দুই ॥ **বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রবণতা** (Rest or sleeping propensity) আর ॥ তিন ॥ **পরিব্রাজন প্রবণতা** (Migratory propensity)।

ম্যাকডুগালের এই সহজাত প্রবৃত্তি বা পরে যাকে তিনি প্রবণতা (Propensity) আখ্যা দিয়েছেন তার দ্বারা মানুষের সকল রকম আচরণকে প্রায় ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির জৈবিক মূল্যায়ন করে এই প্রবৃত্তিগুলোকে অনেক অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। জীবন ধারণের দিক থেকে প্রাণীর আচরণকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন—**জৈবিক-সত্বা বজায় রাখার জন্য আচরণ** (Behaviour contributing to the preservation of self), **পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য আচরণ** (Behaviour helping adjustment with the environment) এবং **সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য আচরণ** (Behaviour for social adjustment)। অর্থাৎ, প্রাণীর বা মানুষের আচরণকে এই তিন শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। তার যে কোন আচরণ এর একটা উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তির তালিকা বিশ্লেষণ করলেও তাঁর বিভিন্ন প্রবণতা বা প্রবৃত্তিগুলোকে (Propensity for Instinct) এই তিন শ্রেণীর যে কোন একটার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি তালিকার যাথার্থ্যতা

যে সব প্রবৃত্তি প্রাণীর জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে তা'হল—পলায়নের প্রবৃত্তি, যুযুৎসার প্রবৃত্তি, ঘৃণার প্রবৃত্তি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি, এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি।

যে সব প্রবৃত্তি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে—কৌতূহল প্রবৃত্তি, অনুনয়,

যে সব প্রবৃত্তি সামাজিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে—বশ্যতার প্রবৃত্তি, যুথচারিতার প্রবৃত্তি, হাস্য, গঠন প্রবৃত্তি, এবং বাৎসল্য প্রবৃত্তি।

ম্যাকডুগালের এই সব সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সব সময় মানুষের সব রকম আচরণ যে ব্যাখ্যা করা যাবে এমন কথা সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবুও তার অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তিকে যদি মেনে নিতে হয়, ম্যাকডুগালের এই তালিকাই গ্রহণযোগ্য। কারণ, এর দ্বারা মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীর আচরণের নানান দিক সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। ম্যাকডুগাল নিজেও এ সম্পর্কে যা বলেছেন, সংস্কার মুক্ত ভাবে তারই আমরা পুণরাবৃত্তি করতে পারি। তিনি বলেছেন—'*But inspite of these uncertainties and of difference*

of opinion among authorities, which require us to regard this list as subject to revision there is no doubt that such inborn propensities are the very foundation of all our mental life, that they provide the dirving force, the hormic energies, manifested in all our activities from the simpliest to the most Complex.' [1] প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে, রতিঃ, হাস্য, শোকঃ, ক্রোধঃ ইত্যাদি যে দশটি ভাবের উল্লেখ পাই, তার সঙ্গেও ম্যাকডুগালের এই তালিকার অনেক মিল আছে।

প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি
[Instincts & Intelligence]

প্রবৃত্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা গেল প্রবৃত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। প্রবৃত্তিমূলক আচরণও তাই। অনেকে তাই একে অন্ধ যান্ত্রিক (Blind mechanical) প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন। লোএব্ (Loeb, J.)[2] এর মতে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ট্রপিজম (Tropism) যেমন যান্ত্রিক, প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমূলক আচরণও তেমনি যান্ত্রিক। এই সব কাজের পেছনে কোন বিচার বুদ্ধি কাজ করে না। তাই অনেকে প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির বিপরীত হিসেবে কল্পনা করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন প্রবৃত্তি ইতর প্রাণীদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে; আর বুদ্ধি মানুষের আচরণকে পরিচালিত করে। এই সম্পর্কে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব। তবে যাঁরা এই মত পোষণ করেন তাদের যুক্তি হ'ল—বুদ্ধি পরিবর্তন ধর্মী। অর্থাৎ, বুদ্ধিমূলক আচরণ বৈচিত্রপূর্ণ, কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র নেই। তারা অপরিবর্তনশীল। নির্দিষ্ট বস্তুর অবস্থানে, নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে আচরণ করতে বাধ্য করে প্রবৃত্তি; কিন্তু বুদ্ধি পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অভিনব এবং উপযোগী আচরণে সাহায্য করে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি; কিন্তু প্রবৃত্তি শিক্ষার প্রভাব মুক্ত। উভয়েই জন্মগত তবে বুদ্ধি হ'ল মানসিক শক্তি, আর প্রবৃত্তি হ'ল কর্ম প্রবণতা তার শক্তি হ'ল অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ।

সূচনা

এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয় বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বৈপরীত্য বর্তমান। কিন্তু তাদের মধ্যে এই বিভেদের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। প্রাচীন পন্থীরা মনে করেন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাঁদের এ কথাও স্বীকার করা

প্রাচীন মতবাদ

1. The energies of Man – W. Mcdougall.
2. Forced movement. Tropism and animal conduct—J. Loeb.

যায় না। তবে এ কথাও ঠিক নয় যে মানুষ এবং ইতর প্রাণীর আচরণের যে পার্থক্য, তা অনেকাংশে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিরই পার্থক্য। অনেকের আরও ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনারই অবকাশ নেই, তার কারণ 'প্রবৃত্তি' এই কথার দ্বারা আমরা আচরণের সহজাত বৈশিষ্ট্যকেই (Innateness) বুঝাতে চাই আর 'বুদ্ধি' এই কথার দ্বারা আচরণের পরিবর্তনশীলতা (Variability) বুঝাতে চাই। মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তার কিছু আচরণ আছে যা সহজাত অথচ পরিবর্তনশীল (Innate Variable)। তাই লয়েড্ মরগ্যান (Lo. Morgan), স্টাউট্ (Stout), ভ্যালাণ্টাইন (Valentine) প্রভৃতি মনোবিদ্ মনে করেন যে প্রবৃত্তি একেবারে বুদ্ধিহীন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। স্টাউট্ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"*Instinctive activity essentially involves intelligent consciousness*" [1] **মরগ্যান** (Morgan) বলেছেন, প্রবৃত্তিমূলক কাজের প্রথম সম্পাদনে বুদ্ধির কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে তার মধ্যে পরিবর্তনশীলতা আসে এবং বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।" **উইলিয়ম জেমস্ও** (James) একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে যে মুরগী কখনও ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায় নি বা কাউকে ঐ আচরণ করতে দেখে নি, সে প্রথম যখন সেই কাজ সম্পাদন করে তখন তা অন্ধভাবে করে; কিন্তু যে মুরগীর একবার ঐ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, দ্বিতীয় বার কর্ম সম্পাদনের তাগিদ সে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে পায়। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তার কাজের মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু স্টাউট্ (Stout) এই ধরনের যুক্তিকে নাকচ্ করেছেন। তিনি মনে করেন সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে প্রথমবার যদি বুদ্ধির অস্তিত্ব না থাকে দ্বিতীয়বার তার কোন কারণেই প্রকাশ পেতে পারে না।

আধুনিক মতবাদ

বিবর্তনবাদীদের মতে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানই জীবনের ধর্ম। প্রাণী জগতের নিম্নস্তরে মস্তিষ্কের এবং পেশীর গঠন যখন জটিল হয় নি, সেই স্তরে প্রাণী তার জৈবিক প্রবণতার দ্বারাই পরিবেশের সঙ্গে সহজে সামঞ্জস্য বিধান করত। সরল অপরিপক্ক স্নায়ু-মণ্ডলীর মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনই যথেষ্ট ছিল। তখন এই অভি-যোজনের প্রকৃতি ছিল, অন্ধ এবং যান্ত্রিক। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল এই পদ্ধতি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হ'ল নতুন নতুন অভিযোজন কৌশল; প্রয়োজন হ'ল স্নায়ুমণ্ডলীর জটিলতর সংগঠন। এর ফলে আবির্ভূত হ'ল নতুন এক গুণ যাকে আমরা বলি বুদ্ধি (Intelligence)। **হেনরী বার্গসঁ** (Henry Bergson) একে নাম দিয়েছেন বিশ্বপ্রাণের মৌল শক্তি (Elan vital)। কিন্তু বুদ্ধির এই ক্রমিক বিবর্তনের ধারার আংশিক সত্যতা মেনে নিলেও প্রত্যক্ষ জীবনে দেখা

1. Mannual of Psychology—Stout.

যায় মানুষের সব আচরণ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না। তার উপর প্রবৃত্তিরও প্রভাব আছে। তাছাড়া, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একেবারে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ ক্রিয়া নয়। সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সব সময় সচেতন থাকি না। তবে উদ্দেশ্য-মুখী বলে তাকে আমরা সব সময় যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলতে পারি না। মানুষের আচরণে এই দু'য়েরই প্রভাব আছে। তাই মনোবিদ **থুলেস্** (Thouless)[1] বলেছেন, মানুষের আচরণকে আমরা চারটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। তার এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যেই বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তির আসল রূপ অন্তর্নিহিত আছে। তাঁর মতে মানুষের চার ধরনের আচরণ হ'ল **সহজাত অপরিবর্তনীয়** (innate invariable), **অর্জিত অপরিবর্তনীয়** (acquired invariable), **পরিবর্তনীয় সহজাত** (innate variable) এবং **পরিবর্তনিয় অর্জিত** (acquired variable)। কোন প্রাণীর সম্পূর্ণ আচরণ পরিবর্তনশীল নয়। মানুষের বেশীর ভাগ আচরণই অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত এবং বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই পরিবর্তনশীল। কিন্তু সেটাই সব নয়। তার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে সহজাত প্রবণতা তার মধ্যে আছে বলে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া
[Instinct and Reflexes]

সূচনা

জীব বিজ্ঞানীগণ প্রবৃত্তি সম্পর্কে বিরূপ মতবাদ পোষণ করেন। তাঁরা মানুষের আচরণের সঙ্গে ইতর প্রাণীর আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রবৃত্তি হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য কতকগুলো মৌলিক ক্রিয়া। এর ভেতর বৈচিত্র্যের কোন স্থান নেই। জীবন বিকাশের বিশেষ এক স্তরে এদের উন্মেষ ও বিকাশ। **উইলিয়ম জেমস্** এর লেখার মধ্যে অনেক সময় আমরা এই ইঙ্গিত পাই। তিনি বলেছেন সব রকম অনর্জিত দৈহিক প্রতিক্রিয়াই প্রবৃত্তি-মূলক আচরণের অন্তর্গত। যেমন, চোখের পাতা খোলা, বন্ধ করা ইত্যাদিও। **উডওয়ার্থও** (R. S. Woodworth) একই কথা বলেছেন এবং খুব সহজভাবে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, জন্মগতভাবে প্রাপ্ত আচরণ করার ক্ষমতাই হ'ল প্রবৃত্তি [Innate is a inherited mode of behaviour]। **হার্বার্ত স্পেন্সার** (Harbert Spencer), **লোএব** (Loeb), **জেমস্** (James),

1. "There clearly is a difference between the ways in which human and subhuman behaviour is directed ; but this difference cannot be so simply expressed as by a mere contrast between instinct and intelligence······behaviour may fall into any of the four possible classes : invariable innate, invariable acquired, variable innate or variable acquired."—General & Social Psychology —Thouless.

প্রভৃতি প্রত্যেকেই বলেছেন—প্রবৃত্তি হ'ল একই সূত্রে আবদ্ধ কতকগুলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মাত্র [an instinct is a series of chained reflexes]। একটি উদ্দীপক একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুরু করে এবং তার সম্পাদনই অপর একটি উদ্দীপকের কাজ করে এবং আর একটি ক্রিয়া সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। এমনিভাবে যে পর্যন্ত না প্রবৃত্তিজনিত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়, সে পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া হ'তে থাকে। তাঁদের মতে, বাঘ ক্ষুধার তাড়নায় শিকারে প্রবৃত্ত হয়। এই কর্মসম্পাদন করতে গিয়ে সে বহুদূরে শিকারের গন্ধ পায়; এর পরে সে শিকারকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে, শিকারের নিকটে গেলে পেছনের পা গুটিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এখন শিকার তার আয়ত্বের সীমার মধ্যে এলে ঝাঁপ দেয়। তারপর বিপুল শক্তি দিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে। এবং সবশেষে সে খাদ্য গ্রহণ করে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী প্রতিক্রিয়া পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। **ওয়াটসন্** (J. B. Watson), **থর্নডাইক** (Thorndike) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণও এই মতবাদকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। থর্নডাইক তাঁর শিখনতত্ত্বে মানুষের শিখন-প্রক্রিয়াকে এমনি উদ্দীপক এক প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক সংযোগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁরা, প্রবৃত্তিকে কতকগুলো শ্রেণীবদ্ধ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন, তাঁরা প্রবৃত্তি এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা উপলব্ধি করতে চান না। কিন্তু তাদের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক দিক থেকে পার্থক্য আছে। আর সেই পার্থক্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে, এই সমস্যার তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে।

॥ এক ॥ প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার (Reflex) মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে ঠিকই। উভয়ক্ষেত্রেই প্রাণী উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে না।

প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া ও তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার মিল।

॥ **দুই** ॥ দু ধরনের কাজের মূলেই স্নায়বিক গঠন ও স্নায়বিক উপাদান কাজ করে।

॥ **তিন** ॥ এই দুই ক্রিয়াইপ্রাণীর জীবন রক্ষার দিক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয়।

॥ **চার** ॥ এই প্রতিক্রিয়া দুটোই সহজাত।

॥ **পাঁচ** ॥ এবং, এই দু'ধরনের আচরণই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়।

কিন্তু এত সব মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের আমরা অভিন্ন হিসেবে কল্পনা করতে পারি না। বা, প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে শ্রেণীবদ্ধ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও বলতে পারি না। কারণ তাদের মধ্যে পার্থক্যকে উপেক্ষা করা যায় না। আর এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই প্রবৃত্তির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শুরু হয়েছে। তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো হ'ল—

॥ এক ॥ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় প্রবৃত্তিমূলক আচরণ অনেক জটিল এবং তাদের সম্পাদনে অনেক বেশী সময় লাগে। উদ্দীপকের অবস্থান উপলব্ধি করার আগেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ায় বস্তুর প্রত্যক্ষ একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই সম্পাদনের জন্যও বেশী সময় লাগে।

প্রবৃত্তিমূলক প্রতিক্রিয়া ও তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য।

॥ দুই ॥ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া একেবারে অপরিবর্তনীয় (invariable)। কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক কর্মের কিছু পরিবর্দ্ধন সম্ভব।

॥ তিন ॥ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য সব সময়ে বাইরের উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়; কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক আচরণ অনেক সময় আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক (Internal stimulus) থেকে শুরু হতে পারে।

॥ চার ॥ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দেহের যে কোন অংশ উত্তেজিত হয় এবং সেই অংশের নিরাপত্তার জন্য প্রতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক প্রতিক্রিয়ায় সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য কাজ করে এবং সেই উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে প্রাণীকে রক্ষা করে।

এই সব কারণে যাঁরা প্রবৃত্তিকে কেবলমাত্র শ্রেণীবদ্ধ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন তাঁদের মতবাদকে গ্রহণ করা যায় না। অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রাণীর ক্রিয়ারও পরিবর্তিত হতে পারে তার জন্য প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) নমনীয় (Plastic) উপাদান দিয়ে তৈরী। এই কারণে আচরণের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকে একেবারে যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মেনে নেওয়া যায় না আর তার সম্পূর্ণ জৈবিক ব্যাখ্যাকেও স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি
[Human Instincts]

যাঁরা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ও যান্ত্রিক মনে করেন, তাঁদের অনেকে এ ধারণা পোষন করেন যে মানুষের বিশেষ কোন প্রবৃত্তি (Instinct) নেই। তাঁরা বলেন, ইতর প্রাণীর সব আচরণই অন্ধভাবে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং মানুষের সব রকম আচরণ সচেতন ভাবে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। অনেক ব্রিটিশ মনোবিদ্ মনে করেন, ইতর প্রাণীর সব আচরণই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত এবং সেই কারণে তাদের আচরণধারার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন সম্ভব নয়। কিন্তু, মানুষ বুদ্ধির দ্বারা তার সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পরিবর্তন সাধন করে। এই ভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে অনেক মনোবিদ্ এমনও সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষের প্রবৃত্তি নেই। প্রবৃত্তি ইতর প্রাণীর একচেটিয়া। কিন্তু ১৯০৫

বিভিন্ন মনোবিদ্গণের মতবাদ

খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম **জেমস্** (James) ঠিক এর উল্টো কথা বললেন। তিনি বললেন, মানুষের যে প্রবৃত্তি আছে শুধু তাই নয়, তার সংখ্যা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী। তবে তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন তাঁর প্রবৃত্তি, যুক্তি শক্তি (Power of reasoning) এবং বুদ্ধির (Intelligence) দ্বারা পরিবর্তন সাপেক্ষ। এর পর ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি মতবাদে আমরা মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে উল্লেখ পাই। কিন্তু ঘোর আচরণবাদী **ওয়াটসন্** (J. B. Watson) এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি প্রবৃত্তির পরিবর্তে নতুন এক প্রবণতার কথা বলেন। এই প্রবণতা তাঁর মনোবিদ্যা সংক্রান্ত মূলতত্ত্বেরই অনুগামী। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে অন্য কোন প্রবৃত্তি নেই, যা আছে তা হ'ল অভ্যাস গঠনের প্রবণতা (Tendencies to form habit)। কিন্তু **ম্যাকডুগাল** (Mcdougall) এবং **ওয়াটসনের** (Watson) মতবাদ একত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে তফাত কিন্তু মানসিক সংগঠনের (Mental structure) দিক থেকে নয়, তফাত, হ'ল প্রবৃত্তি (Instinct) কথাটার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে মাত্র। প্রবৃত্তিকে (Instinct) যদি আমরা কেবলমাত্র সহজাত স্বয়ংক্রিয় অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসেবে বিবেচনা করি তা'হলে একথা বলতে হয় এধরনের আচরণ কেবলমাত্র ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে তার কোন অস্তিত্ব নেই। বিষয়টা আরও বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার, কি কি দিক থেকে মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণ, অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে তফাত হয়।

প্রবৃত্তিগত কাজের সম্পাদনার বিভিন্ন স্তরে, মানুষ এবং ইতর প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—

মানুষ ও ইতর প্রাণীর পার্থক্য

॥ **এক** ॥ ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমূলক কাজের জন্য বাস্তব কোন উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ভৌত কোন বস্তু নাও হ'তে পারে। শুধুমাত্র বস্তুর কল্পনা বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা তাকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে।

॥ **দুই** ॥ ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে একটা উদ্দীপক কেবলমাত্র এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, একই প্রবৃত্তির তাড়নায় সে বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তুকে প্রত্যক্ষ করবে। অন্য কোন বস্তুকে নয়। সুতরাং, তার ক্ষেত্রে বস্তু বা উদ্দীপক এবং প্রবৃত্তির মধ্যে সম্বন্ধ প্রকৃতিগতভাবে স্থির। কিন্তু, মানুষের ক্ষেত্রে এরকম হয় না। এই প্রবৃত্তির তাড়নায়, সে যে কোন ধরনের বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারে বা তার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। তাই এক্ষেত্রে প্রাণীদের মত স্থির কোন সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় না।

॥ **তিন** ॥ ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগত কাজ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে, সেই কাজ তার অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে অন্যরূপ ধারণ করে।

॥ চার ॥ ইতর প্রাণী পরিপূর্ণভাবে প্রবৃত্তিকে জন্মগতভাবে পায়। এমন কি কর্মসম্পাদনের কৌশলও। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রবৃত্তিমূলক কাজের কিছুটা জন্মগতভাবে পাওয়া আবার কিছু অংশ অর্জিত।

॥ পাঁচ ॥ ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রবৃত্তিগত কাজগুলো গতানুগতিক ধারা (Stereotype) বজায় রাখে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন সম্ভব।

॥ ছয় ॥ ইতর প্রাণীর সব আচরণই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু মানুষের সমস্ত রকম আচরণ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না।

বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষা।

এই সব পার্থক্য লক্ষ্য করে অনেক মনোবিদ্ বলেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কথা স্বীকার করা কল্পনা বিলাস ছাড়া কিছু নয়। এই সব মনোবিদ্ ও চিন্তাবিদগণ মানুষের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রবৃত্তিকে অন্য একদিক থেকেও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রবৃত্তি কোন বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে সার্বজনীন। অর্থাৎ, একই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রবৃত্তি সমভাবে বর্তমান থাকে। সব হরিণের মধ্যেই যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তি বর্তমান। তা তারা যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, মানুষ প্রবৃত্তির এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে না। যেমন, **রীভার্স** (W. H. R. Rivers) মারী দ্বীপপুঞ্জের (Marry Island) আদিম অধিবাসীদের আচরণ অনুশীলন করে দেখেছেন, তাদের মধ্যে বাৎসল্যের প্রবৃত্তি (Parental instinct) নেই। এই সমাজের নারীদের বহু বিবাহের রীতি আছে। একজন স্ত্রী যখন অপর কোন লোককে বিয়ে করে এবং তার দরুন তার ছেলে মেয়ে হয়, তখন তার লালন পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে পূর্বের স্বামীর উপর। অর্থাৎ দম্পতি তাদের সন্তানদের অন্যের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বাৎসল্য প্রবৃত্তি কাজ করে না। **লিণ্টনও** (Linton) অনুরূপভাবে, মাডাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের জীবন যাত্রা অনুশীলন করে একই সিদ্ধান্তে আসেন। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ **মার্গারেট মিড** (M. Mead) তাঁর এক অনুশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেন, কোন কোন আদিম মানুষের মধ্যে যুযুৎসার প্রবৃত্তি (instinct of combat) দেখা যায় না। **বোয়াজ্** (F. Boaz) একজন মনোবিদ্ কিউ কিন্টি ইণ্ডিয়ানদের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাদের সমাজে ঝগড়া মারামারির কোন প্রকাশ নেই। যে কোন রকম মতবিরোধ হ'লে তাদের ভোজ দেওয়ার রীতি আছে। **বেনেডিক্ট** (R. Benedict) তাঁর এক অনুশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, জুনি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি নেই। এ ছাড়া আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষার

দ্বারা চিন্তাবিদগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মানুষের প্রবৃত্তি সার্বজনীন নয়। এবং যেহেতু তা সার্বজনীন নয়, সেহেতু, মানুষের প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু সমস্যার নিষ্পত্তি এত সহজে হয় না। কারণ, এই সব পরীক্ষার ফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে মনোবিদগণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা মনে করেন, আদিম অধিবাসীরা বিশেষভাবে তাদের সমাজের রীতি নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের সমাজ প্রভাবমুক্ত আচরণকে অনুশীলন করতে না পারলে এই সমস্যার সমাধান সার্থকভাবে করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক তার মধ্যে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য কোথাও আছে কি না।

॥ **প্রথমতঃ** ॥ আমরা পূর্বেই বলেছি, মানুষের ক্ষেত্রে, প্রবৃত্তি-উদ্দীপক (Instinct Stimulus) সম্বন্ধ স্থির নয়। একই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ তার সামাজীকরণের (Socialization) জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। তার বস্তুর প্রতি মনোযোগ বা প্রত্যক্ষণ অন্যান্য নানা অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতামূলক স্তরে মানুষের জীবনে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে না।

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ বলা হয়েছে বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি—প্রক্ষোভ (Instinct Emotion) সম্বন্ধও স্থির। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের স্থির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। একই মানসিক তাড়নার বশবর্তী হ'য়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। একই বস্তু পরিস্থিতি ভেদে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে, এ অভিজ্ঞতার অভাব নেই। একই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোন সময় রাগ, কোন সময় আনন্দ হতে পারে। তাই একথাও ঠিকই যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনুভূতিমূলক স্তরেও (Affective aspect) সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে না।

মানুষের প্রবৃত্তিমূলক আচরণের বিশ্লেষণ

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ মানুষের আচরণের কথা বিবেচনা করলে, বলতে হয়, আচরণের প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইতর প্রাণীর মত প্রবৃত্তির তাড়নায়, সে গতানুগতিক পদ্ধতিতে একইভাবে আচরণ করে না। রাগের বশবর্তী হয়ে কেউ সঙ্গে সঙ্গে ঘুষাঘুষি করতে আরম্ভ করে, আবার কেউ বা শুধুমাত্র গালাগালি করে ক্ষান্ত হয়। তার এই আচরণ সামাজিক প্রভাব দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বহির্আচরণের ক্ষেত্রেই মানুষের প্রবৃত্তি সার্বজনীন নয়।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ একটা কথা লক্ষ্য করার দরকার, ম্যাকডুগাল, তাঁর প্রবৃত্তিতত্ত্বে আচরণ সম্পাদনের পূর্বে একটা কর্ম প্রবণতার (impulse to action) কথা বলেছেন। যে কর্ম প্রবণতা পরবর্তী পর্যায়ে দৈহিক আচরণের মধ্যে প্রকাশ

পায়। এই কাজ করবার তাগিদ (impulse to action) এটা কিন্তু সব মানুষের মধ্যে সমভাবে থাকে। কাজের প্রকৃতি ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু কাজ করার একটা তাগিদ মানুষের অন্তরে সার্বজনীন ভাবে বর্তমান। তাই এই কর্মমূলক স্তরের (Conative aspect) বিশেষ এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

তাই মানুষের প্রবৃত্তি নেই এ কথা বললে ভুল হবে। তবে অন্যান্য প্রাণীর পর্যায়ে ফেলে তাকে বিচার করলে, তার প্রতি অবিচারই করা হবে। প্রবৃত্তি যদি জন্মগত সার্বজনীন প্রবণতা হয়, তবে তা মানুষের মধ্যেও বর্তমান। তার সব আচরণকে প্রবৃত্তির গতানুগতিক ধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষ যে বিভিন্ন শ্রেণীর আচরণ করে, তার একটা মাত্র ক্ষেত্রে এধরনের সার্বজনীন প্রবণতাকে দেখতে পাই বা প্রবৃত্তিকে দেখতে পাই। অবশ্য যদি প্রবৃত্তি বলতে **মায়ার্স** (Myers) যা বলেছেন তা মেনে নি—"*An instinct is a tendency to act.*" মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে বহু মনোবিদ্ আলোচনা করেন। ফলে, মনোবিদ্যার মধ্যে প্রবৃত্তি আন্দোলন (Instinct movement) নামে বিশেষ একটা শাখা গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের অন্তর্গত বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, অনেক মনোবিদ্ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করেছেন। অনেকে করেন নি। অনেকে এর মাঝামাঝি মতবাদ প্রচার করেছেন। বিখ্যাত মনোবিদ্ **আলপোর্ট** (G. W. Allport) তাঁর 'ক্রিয়ার স্বতশ্চলতা' (Theory of functional autonomy) তত্ত্বে এমনি এক মাঝামাঝি মতবাদ প্রচার করেছেন, যা আধুনিক কালে অনেক মনোবিদ্ স্বীকার করেন। তাঁর মতে, প্রথম প্রথম মানুষের আচরণের পেছনে শক্তি যোগায় প্রবৃত্তি। কিন্তু যতই তার পুনরাবৃত্তি বাড়তে থাকে, ততই সেই কাজ প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে এবং কাজ নিজেই স্বয়ংক্রিয়তা লাভ করে। তাই পরবর্তী পর্যায়ে তার এই কাজের পেছনে কোন প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতার স্থান নেই। চারাগাছ বীজ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বা জীবনী শক্তি গ্রহণ করে, কিন্তু সেই চারা গাছ যখন বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়, তখন তার জীবন ধারণের জন্য বীজকে দায়ী করা যায় না। তেমনি প্রাপ্ত বয়সের আচরণের জন্য প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাকেও মানুষের ক্ষেত্রে দায়ী করা যায় না।

মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তি
[Human need and Instinct]

॥ **প্রথমতঃ** ॥ প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (Instinctive behaviour) এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) যেমন আমাদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি

করে, তেমনি, প্রবৃত্তি ও চাহিদা (Instinct and need) করে থাকে। প্রবৃত্তি এবং চাহিদা, দুই-ই মানুষের আচরণের উদ্দেশ্যমুখীতা ব্যাখ্যা করার জন্য দু'রকমের ধারণা। প্রবৃত্তি মানুষকে আচরণের উদ্দেশ্যমুখী আচরণে প্রবৃত্ত করে, চাহিদাও লক্ষ্যমুখী (goal) আচরণে প্রেষণা শক্তি জোগায়। কিন্তু, তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্যের রেখা বর্তমান। আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রবৃত্তি দিয়ে মানুষের আচরণের সব দিককে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার মধ্যে প্রধানতঃ যে চার শ্রেণীর আচরণ হয়,—**অনর্জিত অপরিবর্তনীয়** (innate invariable), **অনর্জিত পরিবর্তনীয়** (innate variable), **অর্জিত অপরিবর্তনীয়** (acquired invariable) এবং **অর্জিত পরিবর্তনীয়** (acquired variable), এর সব রকমের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রবৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তি তার সংজ্ঞা অনুযায়ী, কেবলমাত্র, অনর্জিত অপরিবর্তনীয় (innate invariable) আচরণের ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু মনোবিদ্যায় চাহিদার ধারণা (concept of need) মানুষের সব রকম আচরণকে তার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাই মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চাহিদা তত্ত্ব বিশেষ প্রযোজ্য।

প্রবৃত্তি ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ প্রবৃত্তি ও চাহিদা দুটোই উদ্দেশ্যমুখী আচরণের উৎস হ'লেও উদ্দেশ্যের প্রকৃতির দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা সুদূর প্রসারী এবং ব্যক্তি সব সময় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে না। কিন্তু চাহিদার বেলা লক্ষ্যটা (goal) চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই স্থাপন করা হয় এবং সে লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যক্তি সব সময় সচেতন থাকে। বিচার বুদ্ধির ক্রিয়া এখানে প্রবল। যদিও অনেক মনোবিদ্ প্রবৃত্তিমূলক কাজের পেছনেও বিচার বুদ্ধির অস্তিত্বের কথা বলেছেন, তাহলেও সে ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায়ই থাকে।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ প্রবৃত্তির সংখ্যা সীমিত। তার দ্বারা মানুষের সব রকম আচরণকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু চাহিদার সংখ্যাকে যত ইচ্ছা বাড়ানো সম্ভব। ফলে যে কোন পরিস্থিতির মানব আচরণকে চাহিদার দ্বারা সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ শিক্ষার দ্বারা নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি করা যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য উপযোগী চাহিদার সৃষ্টি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ফলে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদারও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা নতুন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করা যায় না। শিক্ষককে তার সীমার মধ্যেই কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে কিছু দিনের মধ্যে শিক্ষকের কাজের মধ্যেও একঘেঁয়েমি এসে যায়, যা তাঁর কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে।

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রবৃত্তি যদিও উভয়েই, মানুষের উদ্দেশ্যমুখী আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণে সচেষ্ট, তবুও তাদের মধ্যে মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। বিশেষভাবে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার। প্রবৃত্তির ধারণার দ্বারা আমরা ইতর প্রাণীর জন্মগত বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক আচরণের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারি। তার প্রমাণও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। কিন্তু মানুষের আচরণ অত স্থির (Rigid) নয়। অনেক পরিবর্তনশীল। তাকে সুষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য চাহিদার তত্ত্ব বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু, তার তাৎপর্য এই নয় যে মানুষের ক্ষেত্রে আমরা প্রবৃত্তির ধারণাকে একেবারে পরিত্যাগ করব। বরং, প্রবৃত্তির যে ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেই অর্থে তাকে মানুষের ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ এই ধরনের কোন মানসিক সংগঠনের (Mental structure) অস্তিত্ব ছাড়া মানুষের মনের অন্যান্য প্রকৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

সিদ্ধান্ত

শিক্ষা ও প্রবৃত্তি
[Education and Instincts]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর দেহ মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। ফ্রয়েবেল (Froebl) বলেছেন—"*The aim of eduction is development; the process of education is development.*" এখন এই বিকাশ বা বৃদ্ধি সাধন যেখানে উদ্দেশ্য, নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যের পেছনে এমন একটা ধারণা আছে, যা কোন অন্তর্নিহিত বিকাশধর্মী সত্ত্বাকে কল্পনা করছে। কোন কিছুকে বৃদ্ধি করতে গিয়ে, বা বিকাশ করতে গিয়ে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কাকে বাড়াবো? কি বাড়াবো? বীজ না থাকলে যেমন গাছ হয় না; চারাগাছ না থাকলে যেমন, বৃক্ষের কল্পনা করা যায় না, তেমনি, শিশুর মধ্যে কিছু বিকাশধর্মী সত্ত্বা না থাকলে, তাকে বাড়িয়ে তোলারও প্রশ্ন ওঠে না। শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন এই বিকাশধর্মী সত্ত্বা হ'ল প্রবৃত্তি। প্রত্যেক শিশু কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। এবং বিদ্যালয়ে তারা এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলো নিয়েই আসে। সুতরাং, শিক্ষককে ঐ বিকাশধর্মী সত্ত্বা নিয়েই কাজ করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অসংহত এই প্রবৃত্তিগুলোকে সুসংহত করা, মনোবিদ্ রস্ (Ross)[1] বলেছেন, বাড়ী তৈরী করার জন্য যেমন, ইট, মশলা ইত্যাদি দরকার হয়, তেমনি চরিত্র গঠনের জন্য এই প্রবৃত্তিগুলোর প্রয়োজন। প্রবৃত্তির সুসামঞ্জস

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তি

1. Educational Psychology—Ross.

সংহতির মাধ্যমেই চরিত্র গঠন হয়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি চরিত্র গঠন হয় তা'হলে প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে তা কোন মতে সম্ভব হবে না।

তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক। শিশুকে তার মানসিক আশার, আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ চরিতার্থের সুযোগ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার পদ্ধতি ও ও প্রবৃত্তি

শিশু স্বাভাবিকভাবে যা করতে চায়, তার সাহায্যেই তাকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক কাজ করার যে প্রাথমিক প্রবণতা তাই হ'ল প্রবৃত্তি। সুতরাং শিশুর প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে তার জন্য কোন শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching method) তৈরী করা যায় না। তাই শিক্ষককে সব সময় শিশুর প্রবৃত্তি অনুকূলে শিক্ষা দিতে হবে। তিনি যদি তার প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাকে বাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তা'হলে সে শিক্ষা ব্যর্থ হবে। তাই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়েই শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সার্থক সংগঠন (organisation) স্থাপনের জন্যও প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের কিছু কিছু প্রবণতা আছে,

বিদ্যালয় পরিচালনা প্রবৃত্তি

যা তাকে তার সুস্থ সমাজ জীবন-যাপনে সহায়তা করে। যেমন, যুথবদ্ধতা, বশ্যতা ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় হবে, এমন এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে শিশুরা সকল রকম সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ পাবে। তাই বিদ্যালয়ের মধ্যে এই নতুন সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে হ'লে শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যোগ্য মূল্য দিতে হবে। বিদ্যালয়ের মধ্যে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাভাবিক সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করতে পারে। বিদ্যালয়কে এইভাবে গড়ে তুলতে না পারলে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কাছে কৃত্রিম (artificial) মনে হবে, এবং তারা সেই পরিস্থিতিতে আনন্দ পাবে না।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবৃত্তিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য গুরুত্ব না দিলে শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হবে না। সহজাত প্রবৃত্তির গুরুত্ব, শিক্ষার

সিদ্ধান্ত

উদ্দেশ্য (aim of education), শিক্ষার পদ্ধতি (Methodology) এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন (organisation) সর্বক্ষেত্রেই আছে। তাই প্রবৃত্তিকে যথাযোগ্য অনুমোদন না দিয়ে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। শিক্ষা-মনোবিদ্যার (Educational Psychology) প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় তাই "প্রবৃত্তি" বা 'প্রাথমিক প্রবণতা' (Study of original tendencies)। প্রবৃত্তির যথাযথ অনুশীলন শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকেরও

দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর এই সহজাত প্রাথমিক প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত অনুশীলন। তবেই তিনি বিকাশমুখী প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে পারবেন।

প্রবৃত্তি ও শিক্ষকের দায়িত্ব

[Instinct and the Teachers responsibility]

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্ব আমরা যদি মেনে নিই, তা'হলে স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কি? অনেকে মনে করেন প্রবৃত্তি যেহেতু সহজাত প্রবণতা, তার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্ত্রণই খাটে না। সুতরাং, যার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই সে সম্পর্কে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ ধরনের ধারণা একেবারে ভুল। কারণ, প্রবৃত্তির প্রসঙ্গকে এড়িয়ে শিক্ষাদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষককে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তি দিয়ে দ্বিমুখী কাজ করতে হবে। তাঁর মনে রাখার দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করার জন্য যেমন প্রবৃত্তিকে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর কাছে যে সব শিশুরা এসেছে, তাহাদের স্বাভাবিক সহজাত কর্ম প্রেরণা কি কি আছে। অন্য দিকে তাকে বিবেচনা করতে হবে কি ভাবে শিক্ষার দ্বারা কিছু স্বাভাবিক প্রবণতাকে আদর্শ পথে পরিচালনা করা যায়। অর্থাৎ, একটা হ'ল প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা আর দ্বিতীয়টা হ'ল শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তিমূলক আচরণের আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রণ। বর্তমানে আমাদের সমস্যা হ'ল দ্বিতীয়টা। অর্থাৎ, শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তিকে কি ভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানো যায় এবং শিক্ষক হিসেবে সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি?

সূচনা ও প্রবৃত্তি পরিচালনার পদ্ধতি

বহু প্রাচীন কাল থেকে একটা ধারণা চলে আসছে, যে শিশুরা জন্মায় নানা খারাপ গুন নিয়ে। শিক্ষার দ্বারা তাদের সংস্কার করতে হয়। এই ধারণা অনুযায়ী প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সবই পরিপূর্ণ সামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শিক্ষা দিতে গিয়ে এই সব স্বাভাবিক প্রবণতা গুলোকে চেপে দিতে হবে। বা তাদের অবদমন করতে হবে। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় এই নীতিই প্রয়োগ করা হ'ত এবং সেই জন্য শিক্ষক বিদ্যালয়ে এক কৃত্রিম পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন। বিদ্যালয়কে একটা যান্ত্রিক সত্বা হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত যেখানে শিক্ষার্থীদের ঘসে মেজে সংস্কার করা হ'ত। শিক্ষক ছিলেন এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্রী। তাই তাঁর দায়িত্ব ছিল, জন্মগত প্রবণতাগুলোকে অবদমিত করে সমাজআদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সঞ্চারিত করা। অর্থাৎ এই মতবাদে সমাজের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই

অবদমন

দমনমূলক প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হয়, এ নিয়ে মতভেদ আছে। সে কথা বাদ দিলেও, এই তত্ত্বের আর একটা দিক আছে, সেটা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দরকার। সমাজের দিক থেকে যা আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির জীবনের দিক থেকে তা সব সময় কল্যাণকর নাও হতে পারে। তাই প্রবৃত্তিগত প্রবণতাগুলোকে চেপে দিলে, ব্যক্তির অকল্যাণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফ্রয়েদের (Freud) মতে খুব বেশী অবদমনের (Repression) ফলে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়। তাই শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রবৃত্তির অবদমন ব্যক্তি কল্যাণের সহায়ক নয়।

অবাধ প্রকাশ

অনেকে আবার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ পছন্দ করেন। তাঁদের মতে, শিশু তার স্বাভাবিক প্রবণতার দরুন যা করতে চাইবে তাকে তা করতে দিতে হবে। প্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তারা নিজেরা যা ভাল মনে করবে তা গ্রহণ করবে এবং যা খারাপ তা ত্যাগ করবে। এই মতবাদের সমর্থন আমরা স্পষ্ট ভাবে প্রথম রুশোর (Rousseu) বক্তব্যের মধ্যে দেখতে পাই। তিনি বলেছেন শিশুরা সব কিছু ভাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সমাজই তাকে কলুশিত করে। তাই শিক্ষার ব্যাপারে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে এই মতবাদের বিশেষ অসুবিধা আছে। এই ধরনের মতবাদের প্রয়োগ সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেবে। সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যদি শিক্ষার্থীদের যুযুৎসা প্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়, তা'হলে সমাজের মধ্যে, বিশেষভাবে বিদ্যালয় জীবনে গণ্ডগোল দেখা দেবে। বিদ্যালয়ের শান্তি বিঘ্নিত হবে। পাঠদানের আদর্শ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অবদমনও (Repression) যেমন ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের দিক থেকে কাম্য নয়, তেমনি, অবাধ প্রকাশের (Free play of instinct) মতবাদও সমাজ-জীবনের দিক থেকে কাম্য নয়। তাই শিক্ষককে এমন মধ্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে যার দ্বারা একই সঙ্গে ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজ-কল্যাণ সাধিত হয়।

উদ্গামন

আধুনিক কালে, মনবিদ্গণ এই মধ্যপন্থা হিসেবে উদ্গমনের (Sublimation) কথা বলেছেন। এই প্রক্রিয়ার কথা প্রথম ফ্রয়েদ্ (Freud) এবং তার অনুগামীরা উল্লেখ ফ্রয়েদ্ তাঁর 'Introduction to Psycho-analysis'-এ এই প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে যে অবচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা কোন বিশেষ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত যৌন কামনাকে অন্য কোন সমাজ রীতি সম্মত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করি, তাই হ'ল উদ্গমন (Sublimation)[1]। অর্থাৎ, মনঃসমীক্ষণবাদ (Psycho-

1. "It consists in the abondonment, on the part of the sexual impulse, of an aim previously either in the gratification of a component impulse or in the gratification identical to reproduction an adaptation of a new aim-which new aim though genetically to first. can no longer be regarded as sexual but must be call social in character."—Freud : Introduction to Psychoanalysis.

analytic school) অনুযায়ী শুধুমাত্র যৌন প্রবৃত্তিরই উদ্গমন সম্ভব। তাঁরা শুধু এই অর্থেই কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মনোবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ পরবর্তী কালে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপক অর্থে প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, **যে কোন সহজাত প্রবণতার শক্তিকে তার স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে অন্য পথে প্রবাহিত করার প্রক্রিয়াই উদ্গমন (Sublimation)।** যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রবণতা শক্তিকে সমাজ অনুমোদিত পথে পরিচালিত করা হয়, তখনই বলা হয় প্রবৃত্তির উদ্গমন হয়েছে। **ম্যাডুকগাল** (Mcdougall) এই অর্থে উদ্গমনের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"*The process by which the energies of our instinctive nature are utilized on higher plane of action than the instinctive.*" আর এই অর্থে বর্তমান শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন শিক্ষকের একমাত্র দায়িত্ব হ'ল শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবণতার শক্তিকে যথাযথ ভাবে উদ্গমন করা।

সুতরাং, এখন প্রশ্ন হ'ল শিক্ষক কি ভাবে বিভিন্ন প্রবৃত্তির উদ্গমনে সচেষ্ট হবেন। এখানে, আমরা সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। উদ্গমনের পদ্ধতি, শিক্ষকের নিজস্ব ক্ষমতা, ও পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র তার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। যেমন পলায়ন প্রবৃত্তি (Instinct of escape) প্রত্যেক শিশুর মধ্যে বর্তমান। এর সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভ হ'ল ভয় (Fear)। এই ধরনের প্রবৃত্তি সবক্ষেত্রে প্রকাশ ব্যক্তির পক্ষে কাম্য নয়। বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি থেকে পলায়নের প্রবণতা, শিক্ষকমশায়কে শ্রেণীতে দেখলেই ভয় পাওয়া, কোন বিশেষ কঠিন বিষয়কে এড়িয়ে চলা, কোন ভাবেই ব্যক্তির কল্যাণ আনতে পারে না। এখন শিশুর এই ধরনের সহজাত প্রবণতাকে শিক্ষক অন্য পথে চালিত করতে পারেন। যেমন কোন খারাপ পরিস্থিতি থেকে পলায়ন, খারাপ কিছু করার ভয়, গুরুজনদের অনুশাসনের ভয়, এগুলো ব্যক্তি-জীবনের বিকাশে সহায়তা করবে। অযথা পলায়ন প্রবণতাকে ত্যাগ করাতে হবে। কিন্তু খারাপ স্থান থেকে সে যাতে নিজেকে সরিয়ে রাখে, সেই ভাবে তার প্রবৃত্তির শক্তিকে প্রবাহিত করতে হবে।

ভয়ের উদ্গমন

যুযুৎসার প্রবৃত্তি সাধারণভাবে খুবই খারাপ। সব সময় মারমুখীভাবে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের দিক থেকে খারাপ। বিদ্যালয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি আদর্শ বিদ্যালয় জীবনের পরিচায়ক নয়। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের এই যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে তার চারিত্রিক বিকাশেও সমাজ কল্যাণের কাজে লাগানো। এই শক্তির প্রয়োগ যে সব ক্ষেত্রে ভাল সেখানে প্রয়োগ করাতে পারলে তা সম্ভব হবে। যেমন নিজের দলের প্রতিরক্ষায়, দুর্বল কোন ব্যক্তির রক্ষায়, সমাজের দুর্নীতি দূর করার ক্ষেত্রে যদি

যুযুৎসার উদ্গমন

এই প্রবণতার শক্তিকে উদ্গমন করানো যায়, তা'হলে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়বে এবং সমাজেরও কল্যাণ হবে।

যৌথ-প্রবৃত্তি (Gragariousness), **আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি** (Self-assertion) এবং **বশ্যতার প্রবৃত্তি** (Submission) গুলোকে শিক্ষার দ্বারা যথাযথভাবে গতিশীল করতে হবে। কারণ আদর্শ সমাজ জীবন যাপনের পক্ষে এগুলো একান্তভাবে প্রয়োজন।

যৌথ প্রবৃত্তির উদ্গামণ

যৌথ-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে শিশুরা যাতে অসৎ সঙ্গে না পড়ে সে দিকে শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের সমাজ-সম্মতভাবে বসবাসের সুযোগ দিতে হবে এবং তারা যাতে ভাল সঙ্গী লাভ করে সে বিষয়েও সচেষ্ট হতে হবে। আবার খারাপ সঙ্গীদের যাতে তারা ঘৃণা করতে শেখে এবং তাদের থেকে দূরে থাকে শিক্ষককে সে দিকেও নজর দিতে হবে। অযথা অযৌক্তিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অন্যের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রকাশকে ব্যহত করে তা সমাজ জীবনের পক্ষে একেবারে কাম্য নয়। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যের মনোভাব কে শ্রদ্ধা করে সুসংযতভাবে এই প্রবণতাকে প্রকাশ করতে পারে, শিক্ষককে সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। বশ্যতার প্রবণতা বা হীনমন্যতার বোধ শিক্ষার্থীদের মন থেকে দূর করার দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হবে। এর জন্য তাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের এমন ধরনের সমস্যা দিতে হবে যা তারা শিক্ষকের সামান্য সাহায্য নিয়েই সহজে সমাধান করতে পারে। এমনিভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং হীনমন্যতার ভাব কেটে যাবে।

শিশুদের মধ্যে **নির্মাণ প্রবৃত্তি** (Instinct of Construction) এবং **কৌতূহল প্রবৃত্তি** (Instinct of Curiosity) খুবই প্রবল। এদের কেন্দ্র করে তাদের শিক্ষা শুরু করার দরকার। তারা হাতে কলমে কিছু তৈরী করতে ভালবাসে। কাগজ কলম দিলে কিছু না কিছু এঁকে ফেলে, বিভিন্ন রকম লাইন টেনে। আবার একটু বয়স বাড়লেই তাদের 'কেন'র আর কোন অন্ত থাকে না। সব কিছু জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের এই প্রকৃতিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। আধুনিক কালে, কিণ্ডারগার্টেন বা নার্শারি স্কুলে, শিশুদের নির্মাণ প্রবৃত্তিকে কল্যাণময় পথে উদ্গামন করিয়ে তার শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা হচ্ছে। এই সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক খেলনার (educative toys) সাহায্যে তাদের সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে আকাঙ্ক্ষিত পথে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তির দরুন নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাই এই স্বাভাবিক কৌতূহলকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হলে শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। তার

কৌতূহল প্রবৃত্তির উদ্গামন

কৌতূহল নিবারণের জন্য তার বয়স উপযোগী সমাধান সে যাতে খুঁজে পায় সে ব্যাপারে শিক্ষককে সহায়তা করতে হবে।

যৌন প্রবৃত্তির উদ্গামন

একইভাবে যৌন প্রবৃত্তিরও উদ্গামন সম্ভব। এই যৌন প্রবৃত্তিকে সৃজনাত্মক পথে পরিচালিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর কল্যাণ হবে। যৌন প্রবৃত্তির মূলে আছে সৃষ্টির স্পৃহা। এই স্পৃহাকে ছবি আঁকা ইত্যাদি সৌন্দর্য বোধ ফুটিয়ে তোলার কাজে পরিচালিত করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের কৈশোরে যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত যে সব ভ্রান্ত ধারণা দেখা দেয়, সেগুলোকেও শিক্ষক যথা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করবেন।

উপসংহার

এমনিভাবে সব রকম প্রবৃত্তিকেই শিক্ষার কাজে লাগানো সম্ভব। সবগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব হ'ল না। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুশীলন এবং কি পদ্ধতিতে শিক্ষক সেই কাজে অগ্রসর হবেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তাঁর নিজের প্রতিভা এবং চিন্তার উপর। আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতাগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করা এবং প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো আদর্শ স্থাপন করা। পরে সেই আদর্শকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাগুলোকে সেই পথে পরিচালিত করাই হবে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। এক কথায়, প্রবৃত্তিগুলোই শিক্ষকের প্রাথমিক হাতিয়ার। এই প্রবণতার দরুন শিক্ষার্থীরা যা শিখতে চাইবে শিক্ষক তাকে তাই শেখার সুযোগ দেবেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। তাই মনোবিদ্ রস্ (Ross) এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "*The educator must work with the grain, not against it.*" [1]

প্রশ্নাবলী

1. What is an instinct? How would you reconcile the innateness of instinct with educability of human beings? (C. U. B. A. '63)
   [পৃঃ ১১৪-১১৯ ; ১৩১-১৩৫]
2. What according to Mcdougall, is the nature of instincts? Discuss the relation between instinct and emotion. (C. U. B. A. '64)
   [পৃঃ ১১৬-১২৭]
3. Write a short essay on the concept of instinct (C. U. B. A. '66)
   [সম্পূর্ণ অংশ]
4. Discuss the nature of instincts. Mention two important instincts and consider how energy of such instincts may be utilized for learning.
   [পৃঃ ১১৬-১২৩ ; ১২৯-১৪৩] (C. U. B T. '67)

1. Groundwork of Educational Psychology : Ross.

5. Describe the nature of instincts and indicate their educational significance. [পৃঃ ১১৬-১২৩ ; ১৩৯-১৪৩] (C. U. B. T. '70)
6. What is sublimation ? "The whole task of education is to sublimate the instincts." Explain. [পৃঃ ১৩৯-১৪৩] (C. U. B. T, '71)
7. What are instinct ? How should the educator tackle the various problems concerning human instinct ? Illustrate your answer. [পৃঃ ১১৪-১১৯ ; ১৩৯-১৪৩] (N. B. U. B. T,' 70)
8. Critically examine Mcdougalls theory of instinct. How is knowledge of childrens instincts important to educators ? (N. B. U, B, T, '66) [পৃঃ ১১৪-১৩৫ ; ১৩৯ ; ১৪৩]
9. What are instinct ? Are they universal in character ? Discuss how some of them are educationally important (K, U, B, T, '66 '68) [পৃঃ. ১১৪-১১৯ ; ১৩১-১৩৫ ; ১৩৯-১৪৩]
10. What are instincts and innate tendencies ? How is the knowledge about them helpful to an educator ? (K, U, B, T, '66 68) [পৃঃ.১১৪-১১৯ ; ১৩৯-১৪৩]
11. Distinguish between animal instinct and human instinct. Discuss the problem of human instinct. [পৃঃ ১৩১-১৩৫]
12. Write notes on the following :

(a) Instinct and Reflex [পৃঃ ১২৯-১৩১] (b) Instincts and needs, (C, U, B, A.) [পৃঃ ১৩৫-১৩৭]

দশম অধ্যায়

প্রক্ষোভ
[EMOTION]

মানুষের সহজাত জৈব মানসিক সত্তার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বিশেষ বস্তুর বর্তমানে মনের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। এই প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া (Pattern reaction) সৃষ্টি করে বিশেষ এক রকম মানসিক অনুভূতি যাকে আমরা সাধারণ অর্থে বলি **প্রক্ষোভ** (Emotion)। কিন্তু এই সাধারণ অর্থটাকে একটু বিশ্লেষণ করার দরকার এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য। কিন্তু এই বিশ্লেষণ খুব সহজ কাজ নয়। **ক্ল্যাপারীড্** (Claparede) ঠিকই বলেছেন প্রক্ষোভের সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। প্রক্ষোভ মনোবিদ্যার এক জটিল বিষয় বস্তু। অথচ, প্রক্ষোভের আলোচনাকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনাই সম্ভব নয়। মানুষের অনুভূতিও প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তার আচরণকে অনুশীলন করলে, রক্ত-মাংসের মানুষের পরিবর্তে কেবলমাত্র কংকালটাকেই অনুশীলন করা হয়। মানুষকে আমরা যতই চিন্তাশীল জীব হিসেবে বিবেচনা করি না কেন, তার আচরণের একটা বিরাট অংশ যে প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মন্তব্য করেছেন—"*We would like to belive that man's action is directed by thought process—that his behaviour is rational. But an examination of the evidence leads us inevitably to the conclusion that emotion is a dominating factor.*" প্রক্ষোভ মানুষের আচরণে কতটা প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আলোচনা পরে করা যাবে। এখন দেখা যাক, এই প্রক্ষোভ (Emotion) কি?

সূচনা

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা
[Definition of Emotion]

বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ, বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা জন্মে, তা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জন্য। কিন্তু প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যদি শুধুমাত্র বস্তুধর্মী জ্ঞানই হ'ত তাহ'লে প্রিয়জনকে দেখলে তাকে চিনতাম (Recognise) মাত্র, তাকে জড়িয়ে ধরতাম না আনন্দে। শত্রুকে দেখলে চিনতে পারতাম

প্রক্ষোভ কি?

রাগ হ'ত না। তাই বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে শুধুমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা হয় তা নয়, একটা আন্তরিক অবস্থারও সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির এই আন্তরিক অবস্থাকে (subjective state) বলা হয় অনুভূতি (feeling)। প্রক্ষোভ (emotion) আমাদের এই অনুভূতি উদ্ভূত। প্রক্ষোভ ও অনুভূতির মত একটা আন্তরিক অবস্থা (subjective state) কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ হয় দেহযন্ত্রের মাধ্যমে। প্রক্ষোভের পেছনে কোন রকম সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা কাজ করে না। তাই বলে প্রক্ষোভকে নিষ্ক্রিয় অবস্থা (Passive state) বলা যায় না। প্রক্ষোভ মনের এক বিচলিত অবস্থা (stirred up state)। আধুনিক কালে মনোবিদ্গণ মনে করেন, প্রক্ষোভ ব্যক্তির কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, সুতরাং, প্রক্ষোভ বলতে আমরা বুঝি মনের **সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থাকে যা ব্যক্তিকে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে।** ম্যাকডুগাল (Mcdougall) তার প্রবৃত্তির তত্ত্বে, প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানসিক অবস্থাকে বলেছেন, প্রক্ষোভ। তিনি বলেছেন—"*It is regarded as a mode of experience which accompanies the working within us of instinctive impulses.*" মনোবিদ্ **থ্যুলেস** (Thouless), কোন, বিশেষ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিমূলক অবস্থাকেই প্রক্ষোভ বলেছেন। এছাড়া, প্রক্ষোভ সম্পর্কে আরও অনেক ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা আছে। কিন্তু কোন একটি সংজ্ঞার দ্বারাই মনের এই জটিল অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। তাই প্রক্ষোভ কি তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ'লে তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি তা জানার দরকার।

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য
[Characteristics of Emotion]

প্রক্ষোভের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্যান্য মানসিক অবস্থা থেকে পৃথক করে রেখেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রক্ষোভ অনুভূতি (feeling) উদ্ভূত। কিন্তু, তা'হলেও অনুভূতির সঙ্গে তার যথেষ্ট তফাত আছে। অনুভূতি হ'ল খুব মৃদু অনুভূতি। সেই অনুভূতি যখন প্রবল আকারে প্রকাশ পায় এবং আমাদের দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তখন তাদের আমরা বলি প্রক্ষোভ। এছাড়া প্রক্ষোভের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল—

প্রক্ষোভ উদ্দীপক

॥ এক ॥ প্রত্যেক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য একটা উদ্দীপক প্রয়োজন। অর্থাৎ, উদ্দীপককে কেন্দ্র করেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই উদ্দীপক বাইরের কোন বস্তু হ'তে পারে, বা, ব্যক্তির বস্তু সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণা থেকে আসতে পারে। তাই মনোবিদ্গণ

মনে করেন প্রক্ষোভে দু'ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। **উপস্থাপন** (Presentation) ও **পুনরুত্থাপন** (Representation)। শেষের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ধারণাগত (due to percept or ideas)। বাঘ দেখলে আমরা ভয় পাই। বাঘের বর্তমানে, তার সম্পর্কে আমাদের যে অতীত ধারণা আছে তা পুনরুত্থাপিত হয় এবং তার জন্য আমরা ভয় পাই।

॥ **দুই** ॥ যদিও ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, প্রক্ষোভ প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে এবং তা প্রবৃত্তিমূলক কাজের একটা দিক, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই মত সঠিকভাবে খাটে না। প্রক্ষোভ এবং প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার মধ্যে সব সময় স্থির সম্পর্ক দেখা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে একই প্রক্ষোভ বিভিন্ন ধরনের আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ছাত্ররা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না পারলে ভয় পায়; বাড়ীতে কারও অসুখ করলেও ভয়-পায়; আবার অন্ধকার রাস্তায় একলা চলতে গিয়েও ভয় পায়। প্রিয়জনকে দেখলে আনন্দ হয়; আবার শত্রু বিপদে পড়লেও আনন্দ হয়। তাই প্রক্ষোভ, মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি বা উদ্দীপক বা প্রতিক্রিয়া কারুর সঙ্গে স্থির সম্পর্ক বজায় রাখে না।

প্রক্ষোভ—প্রবৃত্তি

॥ **তিন** ॥ প্রক্ষোভের সঙ্গে দেহযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের দিক থেকে আমরা প্রক্ষোভ এবং অনুভূতিতে তফাত করেছি। প্রত্যেক প্রক্ষোভের সঙ্গে কিছু না কিছু দৈহিক পরিবর্তন হয়। প্রক্ষোভের দুটো দিক আছে—**দৈহিক** (Physiological) দিক এবং **মানসিক** (Mental) দিক। যখন আমাদের খুব রাগ হয়, তখন জোরে জোরে হাত-পা নাড়া চাড়া করি, জোরে জোরে কথা বলি। প্রক্ষোভের সময় শারীরিক পরিবর্তনের ফলে দেহের অভ্যন্তরে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) হয়। **জেমস্** (James) এর মতে এই যান্ত্রিক সংবেদনগুলো প্রক্ষোভের মূল কারণ। জেম্‌সের এই মতবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু প্রক্ষোভের সঙ্গে যে দৈহিক পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে বর্তমানে কোন সন্দেহ নেই।

প্রক্ষোভ—দৈহিক পরিবর্তন

॥ **চার** ॥ প্রক্ষোভের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে মনের এই অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে কমে। আমরা সাধারণতঃ হঠাৎ রেগে যাই না। বা, রাগের বস্তু অপসারণের পর আমাদের রাগ (Anger) সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। আবার দিনের মধ্যে একবার যদি কারও উপর রাগ করি তার রেশ সারাদিন থাকে। তবে এই রেশটাকে প্রক্ষোভ বলা চলে না। একে বলা হয় চিত্তবৃত্তি বা ইংরাজীতে Mood। প্রক্ষোভের সঙ্গে চিত্তবৃত্তির (Mood) পার্থক্য হ'ল—এই চিত্তবৃত্তি (Mood) সব সময় বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না এবং দেহযন্ত্রের

প্রক্ষোভের স্থায়ীত্ব

উপরও তার বিশেষ কোন প্রভাব নাই। মনোবিদ্ থ্যুলেস (Thouless) খুব সুন্দরভাবে এই পার্থক্যকে ব্যক্ত করেছেন—"*Moods are feeling states more prolonged than emotions, less connected with external object or situation, and with less impulsion to any course of behaviour.*"[1]

॥ পাঁচ ॥ আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ারও (emotional reactions) পরিবর্তন হয়। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাজ সংস্কারের প্রভাবে, প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃই জটিল হ'তে থাকে। সমাজের প্রভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পৃথকীকরণও (differentiation) হয়।

প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন

ছোট শিশুদের মধ্যে আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া আমরা সামগ্রিকভাবে দেখতে পাই। আনন্দ হ'লে তারা যেন সম্পূর্ণ দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে, আনন্দ প্রকাশের প্রকৃতিও তত পরিবর্তিত হ'তে থাকে। ক্রমে দেহের বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে শিখে।

॥ ছয় ॥ প্রক্ষোভ বিশেষভাবে প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তির মানসিক আকাঙ্ক্ষার (desire) উপর নির্ভর করে। অনেক সময় কোন প্রবল ইচ্ছা বা অভিলাষকে জোর করে অবদমন করলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ড্রিভার (Drever) বলেন, "আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে আমরা বিষদভাবে পরে আলোচনা করব।

প্রক্ষোভ আকাঙ্ক্ষা

॥ সাত ॥ প্রক্ষোভের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে অনেক সময় প্রক্ষোভ দৈহিক অবস্থার দরুন সৃষ্টি হয়। সাময়িক দৈহিক অসুস্থতার দরুন আমাদের মধ্যে বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ প্রক্ষোভ দেখা দেয়। মাথার যন্ত্রণায় যখন কষ্ট পাচ্ছি তখন যদি কেউ বিরক্ত করে তখন খুব রাগ হয়। অপরদিকে চিরস্থায়ী দৈহিক অবস্থার দরুন আমাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনেক সময় স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। এই ধরনের অবস্থাকে আমরা সাধারণ অর্থে Temperament বলে থাকি।

দৈহিক অসুস্থতা ও প্রক্ষোভ

এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে প্রক্ষোভ কোন বিশেষ বস্তু বা অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের মানসিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 'রাগ', 'ভয়,' 'ভালবাসা' ইত্যাদি কথাগুলোকে আমরা এমনভাবে প্রয়োগ করি যেন তারা মনের এক একটা অনুভূতির পরিচায়ক। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হ'ল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূতিরও

উপসংহার

1. General and social Psychology—Thouless.

পরিবর্তন হয়। কারণ, যখন আমরা বলি 'ভয় পেয়েছি' বা বলি 'রাগ করেছি' তখন তার মধ্যে কতটুকু অনুভূতির পার্থক্য আছে তা আমরা নিজেরাও বলতে পারি না। এমন কি অন্তর্দর্শনের (Introspection), সাহায্যেও তা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা যায় না। তাদের আচরণ দেখে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করি। এক সময় দৌড়ে পালাই; এক সময় হয়ত মারামারি করি। সাধারণভাবে আমরা যেগুলোকে আবেগ বলে থাকি, সেগুলো কতকগুলো অনুভূতির সংমিশ্রণ এবং তার ফল লব্ধ আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। কোন্ হিংস্র জন্তু দেখলে আমরা ছুটে পালাই এবং একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াই। হিংস্র জন্তু দেখার পর থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে ক্রম পর্যায়ে বহু অনুভূতি কাজ করে এবং আমাদের দৈহিক ক্রিয়াও হ'য়ে থাকে। সামগ্রিক-ভাবে অবস্থাকে আমরা 'ভয়ের' প্রক্ষোভ বলে থাকি।

মৌলিক প্রক্ষোভ ও অন্যান্য প্রক্ষোভ
[Basic and other Emotions]

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জটিলতাও বাড়তে থাকে। কিন্তু, সেই জটিলতাটুকু বাদ দিয়ে, আসলে জন্মগতভাবে কি কি প্রক্ষোভ আমাদের মধ্যে থাকে, তাই খুঁজবার চেষ্টা করেছেন মনোবিদ্‌গণ বহুদিন ধরে। তাঁদের মতে বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রক্ষোভমূলক আচরণের যেমন পৃথকীকরণ (differentiation) হয়, তেমনি আবার কতকগুলো প্রক্ষোভ একত্রিত হয়ে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই মনোবিদ্‌গণ চেষ্টা করেছেন মানুষের আচরণের মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করতে। তাঁরা মনে করেন মানুষ সহজাতভাবে কতকগুলো প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এগুলোকে তাঁরা বলেছেন মৌলিক প্রক্ষোভ (Basic emotions)। এখন প্রশ্ন হ'ল এই মৌলিক প্রক্ষোভ কি কি? তাদের সংখ্যাই বা কত? এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। **ওয়াট্‌সন** (J. B. Watson) বলেছেন, "মানুষের মৌলিক প্রক্ষোভ মাত্র তিনটে—ভয় (Fear), ক্রোধ (Anger) এবং ভালবাসা (Love)।" **স্ট্যাগনার** (R. Stagner)-এর মতে চারটে মাত্র মৌলিক প্রক্ষোভ আছে, ভাললাগা "(pleasure), খারাপ লাগা (pain), উত্তেজনা (Elation) এবং বিমর্ষতা (Depression)।" আবার' **সেরম্যান** বলেছেন, "আমাদের মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে কিছুই নেই। প্রক্ষোভ বংশগতি হিসেবে আমরা পাই না। পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলো একটা নির্দিষ্টরূপ ধারণ করে," তাকেই তিনি বলেছেন-প্রক্ষোভ।

বিভিন্ন মতবাদ

এই মতবিরোধের মধ্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা খুবই মুশকিল। কিন্তু, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে **ম্যাকডুগালের** (Mcdougall) মতবাদ অনেক বিস্তৃত ও বিজ্ঞান সম্মত। ম্যাকডুগাল, মানুষের প্রক্ষোভকে প্রধানতঃ তিনটে ভাগে ভাগ করেছেন—॥ এক ॥ **প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভ** (Primary emotion), ॥ দুই ॥ **জটিল প্রক্ষোভ** (Secondary or Complex emotions) এবং ॥ তিন ॥ **অর্জিত প্রক্ষোভ** (Derived emotion)। প্রক্ষোভের এই শ্রেণী বিভাগ ম্যাকডুগাল তাঁর প্রবৃত্তিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই করেছেন।

ম্যাকডুগালের মতবাদ

সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভগুলোকে ম্যাকডুগাল **প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভ** (Primary or Basic emotion) বলেছেন। আমরা জানি প্রত্যেক প্রবৃত্তির এক একটা বিশেষ অনুভূতিমূলক দিক আছে। এগুলো প্রবৃত্তিমূলক আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। প্রবৃত্তিগুলো যেমন সহজাত প্রাথমিক প্রবণতা, তেমনি এদের সঙ্গে যুক্ত মানসিক অনুভূতিগুলোও প্রাথমিক। ম্যাকডুগাল[1] বলেছেন এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাগুলোর সক্রিয়তার নির্দেশক। তাঁর এই মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তির মত মৌলিকপ্রক্ষোভও চৌদ্দটি। এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো হ'ল—**ভয়** (Fear), **ক্রোধ** (Anger), **বিরক্তি** (Disgust), **স্নেহানুভূতি** (Tender emotion), **কাম** (Lust), **বিস্ময়** (Wonder), **হীনমন্যতা** (Negative self feeling), **আত্মগৌরব** (Positive self feeling), **একাকীত্ববোধ** (Feeling of lonliness), **স্বাধিকারবোধ** (Feeling of ownership), **সৃজনী স্পৃহা** (feeling of creativeness), **আমোদ** (amusement), **ক্ষুধা** (Guste), **দুস্থভাব** (Feeling of distress)। কতকগুলো প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে থাকে না, এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রায়, তেমনি কতকগুলো মৌলিক প্রক্ষোভও ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়।

প্রাথমিক প্রক্ষোভ

অনেক সময়, আমাদের দু'টো বা তার বেশী প্রবৃত্তি একত্রে জাগরূক হয়। এর ফলে, প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো একত্রে মিশে একটা মিশ্র অনুভূতি আমাদের

1. "Primary emotion is then an indicator of the instinctive impulse at work, its bodily expression serves to indicate the nature of impulses to our fellows and to evoke in them the same instinctive impulse attitude and emotional excitement, and the emotional quality serve also to indicate to the subject himself, the nature of his excitement and the kind of action to which he is impelled......the function they primarily subserve is cognition not of object, but of the subject or the state of activity of the organism"—Outline of Psychology : Mcdougall.

মধ্যে সৃষ্টি করে। কোন কোন প্রবৃত্তি পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যমুখী হয়, তাই তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলোও নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। আবার কতকগুলো একত্রে মিলে আমাদের মধ্যে মিশ্র আবেগের সৃষ্টি করে। দুটো বা তার বেশী প্রক্ষোভ একত্রিত হয়ে আমাদের মধ্যে যে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির সৃষ্টি করে তাকেই ম্যাকডুগাল বলেছেন, **জটিল মিশ্র প্রক্ষোভ** (Blended or secondary emotion)। কেউ কোন জঘন্য কাজ করলে, তা আমাদের মধ্যে যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে তা'হল রাগ (Anger) এবং বিরক্তির (Disgust) সমন্বয়। এই ধরনের প্রক্ষোভ পৃথক পৃথক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সাধারণতঃ জটিল পরিস্থিতিতে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসেবে এগুলো কাজ করে। ম্যাকডুগাল (Macdougall) নিজেও একই কথা বলেছেন—"*Such a complex emotional experience is not literally formed by the separate excitement, the coming together and blending the subsequent of the two emotions ;—rather it is the immediate response to complex situation*[1]. ম্যাকডুগাল এই ধরনের মিশ্র প্রক্ষোভ কতকগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—**অবমাননা** (Contempt), **বিভীষিকা** (Horror), **করুণা** (Awe), **প্রশংসা** (Admiration), **শ্রদ্ধা** (Reverence), **কৃতজ্ঞতা** (Gratitude), **ঈর্ষা** (Envy), **প্রতিশোধমূলক অনুভূতি** (Vengeful emotion), **হতাশা** (Embarrasment), **লজ্জা** (Shame), **পরশ্রীকাতরতা** (Jealousy), এবং এরকম আরও অনেক।

মিশ্র প্রক্ষোভ

এই ধরনের প্রক্ষোভ ছাড়া ম্যাকডুগাল আর এক ধরনের প্রক্ষোভের কথা বলেছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন অর্জিত প্রক্ষোভ (Derived emotion)। বিষাদ, উল্লাস, হতাশা, আশা, আশঙ্কা ইত্যাদি এমন অনেক প্রক্ষোভের কথা আমরা বলি, যাদের প্রাথমিক বা মিশ্র আবেগ কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। এই সব প্রক্ষোভগুলো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মনের কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত; এদের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তি নেই। মনের কোন অবস্থার তাৎক্ষণিক চিন্তা বা সেই অবস্থার বর্তমানে ক্রিয়া না করে, এই সব প্রক্ষোভ একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা বা অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। প্রাথমিক প্রক্ষোভের সঙ্গে প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতা যুক্ত থাকে বলে, তার মধ্যে একটা কর্ম প্রবণতার তাগিদ দেখা যায়। কিন্তু, এ জাতীয় প্রক্ষোভের সঙ্গে কোন প্রবৃত্তিমূলক শক্তি বা কর্মপ্রবণতা যুক্ত থাকে না। এই কারণে

অর্জিত প্রক্ষোভ

1. Out line of Psychology : Mcdougall.

(Secondary or Complex emotions) এবং ॥ তিন ॥ অর্জিত প্রক্ষোভ (Derived emotion)। প্রক্ষোভের এই শ্রেণী বিভাগ ম্যাকডুগাল তাঁর প্রবৃত্তিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই করেছেন।

সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভগুলোকে ম্যাকডুগাল **প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভ** (Primary or Basic emotion) বলেছেন। আমরা জানি প্রত্যেক প্রবৃত্তির এক একটা বিশেষ অনুভূতিমূলক দিক আছে। এগুলো প্রবৃত্তিমূলক আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। প্রবৃত্তিগুলো যেমন সহজাত প্রাথমিক প্রবণতা, তেমনি এদের সঙ্গে যুক্ত মানসিক অনুভূতিগুলোও প্রাথমিক। ম্যাকডুগাল[1] বলেছেন এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাগুলোর সক্রিয়তার নির্দেশক। তাঁর এই মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তির মত মৌলিকপ্রক্ষোভও চোদ্দটি। এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো হ'ল—**ভয়** (Fear), **ক্রোধ** (Anger), **বিরক্তি** (Disgust), **স্নেহানুভূতি** (Tender emotion), **কাম** (Lust), **বিস্ময়** (Wonder), **হীনমন্যতা** (Negative self feeling), **আত্মগৌরব** (Positive self feeling), **একাকীত্ববোধ** (Feeling of lonliness), **স্বাধিকারবোধ** (Feeling of ownership), **সৃজনী স্পৃহা** (feeling of creativeness), **আমোদ** (amusement), **ক্ষুধা** (Guste), **দুঃস্থভাব** (Feeling of distress)। কতকগুলো প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে থাকে না, এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রায়, তেমনি কতকগুলো মৌলিক প্রক্ষোভও ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়।

প্রাথমিক প্রক্ষোভ

অনেক সময়, আমাদের দু'টো বা তার বেশী প্রবৃত্তি একত্রে জাগরূক হয়। এর ফলে, প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো একত্রে মিশে একটা মিশ্র অনুভূতি আমাদের

1. "Primary emotion is then an indicator of the instinctive impulse at work, its bodily expression serves to indicate the nature of impulses to our fellows and to evoke in them the same instinctive impulse attitude and emotional excitement, and the emotional quality serve also to indicate to the subject himself, the nature of his excitement and the kind of action to which he is impelled......the function they primarily subserve is cognition not of object, but of the subject or the state of activity of the organism"—Outline of Psychology : Mcdougall.

করে তাকেই ম্যাকডুগাল বলেছেন, জটিল মিশ্র প্রক্ষোভ (Blended or secondary emotion)। কেউ কোন জঘন্য কাজ করলে, তা আমাদের মধ্যে যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে তা'হল রাগ (Anger) এবং বিরক্তির (Disgust) সমন্বয়। এই ধরনের প্রক্ষোভ পৃথক পৃথক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সাধারণতঃ জটিল পরিস্থিতিতে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসেবে এগুলো কাজ করে। ম্যাকডুগাল (Macdougall) নিজেও একই কথা বলেছেন— "*Such a complex emotional experience is not literally formed by the separate excitement, the coming together and blending the subsequent of the two emotions ;—rather it is the immediate response to complex situation*[1]. ম্যাকডুগাল এই ধরনের মিশ্র প্রক্ষোভ কতকগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—**অবমাননা** (Contempt), **বিভীষিকা** (Horror), **করুণা** (Awe), **প্রশংসা** (Admiration), **শ্রদ্ধা** (Reverence), **কৃতজ্ঞতা** (Gratitude), **ঈর্ষা** (Envy), **প্রতিশোধমূলক অনুভূতি** (Vengeful emotion), **হতাশা** (Embarrasment), **লজ্জা** (Shame), **পরশ্রীকাতরতা** (Jealousy), এবং এরকম আরও অনেক।

অর্জিত প্রক্ষোভ

এই ধরনের প্রক্ষোভ ছাড়া ম্যাকডুগাল আর এক ধরনের প্রক্ষোভের কথা বলেছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন অর্জিত প্রক্ষোভ (Derived emotion)। বিষাদ, উল্লাস, হতাশা, আশা, আশঙ্কা ইত্যাদি এমন অনেক প্রক্ষোভের কথা আমরা বলি, যাদের প্রাথমিক বা মিশ্র আবেগ কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। এই সব প্রক্ষোভগুলো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মনের কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত; এদের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তি নেই। মনের কোন অবস্থার তাৎক্ষণিক চিন্তা বা সেই অবস্থার বর্তমানে ক্রিয়া না করে, এই সব প্রক্ষোভ একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা বা অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। প্রাথমিক প্রক্ষোভের সঙ্গে প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতা যুক্ত থাকে বলে, তার মধ্যে একটা কর্ম প্রবণতার তাগিদ দেখা যায়। কিন্তু, এ জাতীয় প্রক্ষোভের সঙ্গে কোন প্রবৃত্তিমূলক শক্তি বা কর্মপ্রবণতা যুক্ত থাকে না। এই কারণে

1. Out line of Psychology : Mcdougall.

ম্যাকডুগাল (Mcdougall), এদের অর্জিত প্রক্ষোভ (Derived emotion) নাম দিয়েছেন।[1]

অনেকে প্রক্ষোভকে আরও নানাভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন, উডওয়ার্থ (Woodworth) প্রক্ষোভকে প্রায় বারোটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

উপসংহার

মনোবিদ্ ভুণ্ড (Wundt) তিনটে গুণ উল্লেখ করে প্রক্ষোভকে ত্রিমাত্রিক তলে (Three dimentional) ভাগ করেছেন। এগুলো হ'ল—ভাল-লাগা মন্দ-লাগা (Pleasant—unpleasant), উত্তেজনা ও প্রশান্তি (Excitement—calm), এবং প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষার অবসান (Expectation-release)। তাঁর মতে এই সব প্রাথমিক অনুভূতির সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভুণ্ডের এই শ্রেণী বিভাগ সন্তোষজনক হ'লেও পূর্ণাঙ্গ নয়। ম্যাকডুগালের শ্রেণী বিভাগ একদিক থেকে যেমন সন্তোষজনক এবং পূর্ণাঙ্গ অন্যদিক থেকে বিজ্ঞানসম্মতও বটে। তাই বর্তমান কালে, ম্যাকডুগালের শ্রেণী বিভাগকে প্রক্ষোভের অনুশীলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

প্রক্ষোভের দৈহিক পরিবর্তন
[Bodily changes in Emotion]

আমরা জানি, প্রক্ষোভের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিশুদ্ধ মানসিক অনুভূতির আচরণমূলক এবং তীব্রতর দিকই হ'ল প্রক্ষোভ।

সূচনা

প্রক্ষোভ আমাদের মধ্যে অনেক সময় অতিরিক্ত কাজ করার ক্ষমতা এনে দেয়। আবার অনেক সময় আমাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ দেহ যন্ত্রের কাজের মধ্যেও পরিবর্তন আনে। প্রত্যেক প্রক্ষোভেরই একটা নিজস্ব প্রকাশভংগী আছে। এই সব দৈহিক পরিবর্তনকে আমরা ছুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি —কতকগুলো **বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন** (change in expressive behaviour), আর কতগুলো হ'ল **দেহযন্ত্রের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন** (organic change or internal change)।

সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে যে সব অঙ্গভঙ্গী আমরা করে থাকি সেগুলোকে

বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন

আচরণের পর্যায়ে ধরা যায়। কিন্তু প্রক্ষোভমূলক অবস্থায় এই সব আচরণের পরিবর্তন হয়। মনোবিদ্গণ তাই এদের নাম দিয়েছেন প্রক্ষোভমূলক আচরণ (expressive

1. "The word derived is here used to denote the fact that an emotion of this class is not constantly correlated with any one impulses or tendency : but rather may arise in the course of the operation of any strong impulse or tendency ; the emotion being dependent upon on derived the working of the impulse under certain conditions."—Outline of Psychology , Mcdougall.

behaviour of emotion)। সাধারণতঃ যে সব বহির্আচরণের পরিবর্তন আমরা প্রক্ষোভের সময় দেখতে পাই, তা হ'ল—

॥ এক ॥ মুখের ভাবের পরিবর্তন (change in facial expression)। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'মুখই মুকুর' (Face is the index of mind)। আমরা কাউকে দেখে মন্তব্য করি 'মুখটা একেবারে শিশুর মত সরল'। আমাদের সাধারণ প্রচলিত কথা থেকে বুঝা যায়, মনের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাবেরও পরিবর্তন হয়, বা কোন বিশেষ মুহূর্তে মানসিক অবস্থা মুখের ভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ পায়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আচরণও ক্রমশঃ সাংকেতিক (Symbolic) হচ্ছে। মুখের ভাব আমাদের সাংকেতিক আচরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনোবিদ্ **বোরিং** এবং **টিচেনার** (Boring & Titchner) বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময় কি রকম মুখের অবয়ব হয় তা ফটোগ্রাফের সাহায্যে অনুশীলন করেছেন।

॥ দুই ॥ প্রক্ষোভের সময় আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়ার (Movement of the limbs) সাধারণ রীতির পরিবর্তন হয়। যখন রাগ হয় তখন জোরে জোরে হা-পা নাড়াচাড়া করি, আবার দুঃখ পেলে চুপচাপ বসে থাকি। অভিনেতারা মনের বিভিন্ন প্রক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করেন। **কার্মাইকেল** (Carmichael), **রবার্টস** (Robats), **ওয়েজেল** (Wessel) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার উপর পরীক্ষা করে বিভিন্ন প্রক্ষোভে কি ধরনের অঙ্গভঙ্গী হয় তা নির্ণয় করেছেন।

॥ তিন ॥ প্রক্ষোভের সময়ে অনেক সময় গলার স্বরের পরিবর্তন (change of voice) হয়। সাধারণভাবে কারও গলার স্বর শুনে আমরা বুঝতে পারি, সে হাসছে না কাঁদছে। মনোবিদ্ **স্কোয়েন** (Schoen) তাঁর পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গলার স্বরের সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক অবস্থার একটা ধনাত্মক সহগতি (Positive correlation) বর্তমান।

॥ চার ॥ চক্ষু গোলকের নড়াচড়ার পরিবর্তন (change in pupilary response) হয় বিভিন্ন প্রক্ষোভময় অবস্থায়। চক্ষু গোলকের নড়াচড়া এক ধরনের স্বতঃশ্চল পেশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময়ে দেখা যায় এই পেশীর টান (Mascular tension) কখনও বাড়ে, কখনও বা কমে। ফলে, প্রক্ষোভের সময় কোন সময় চোখ বড় বড় লাগে, আর কোন সময় দেখি চোখ ছোট হয়ে গেছে।

॥ পাঁচ ॥ প্রক্ষোভের সময় মুখের লালাক্ষরণের পরিমাণের তারতম্য হয় (oral secretion)।

॥ ছয় ॥ ত্বকের তাপমাত্রারও যথেষ্ট পরিবর্তন (change in skin temperature) হয় বিভিন্ন প্রক্ষোভের দরুন।

॥ সাত ॥ মুখের তাপমাত্রার (oral temperature) যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় প্রক্ষোভের সময়।

প্রক্ষোভের সময়, দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপেরও বিশেষ পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন অনেকাংশে বহিঃআচরণের পরিবর্তনের জন্য দায়ী। প্রক্ষোভের সময় সাধারণতঃ যে সব পরিবর্তন বিশেষভাবে ধরা পড়ে তা হ'ল—

যান্ত্রিক পরিবর্তন

॥ এক ॥ হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের পরিবর্তন (change in heart beat)। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের সংখ্যা মিনিটে ৮৪ বার। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভের সময় তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় মিনিটে ১০৪ বার।

॥ দুই ॥ হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির রক্তের চাপেরও (change in blood pressure) বৃদ্ধি হয়। বিশেষ করে দেখা গেছে রাগের সময় আমাদের রক্তের চাপ খুব বেশী পরিমাণে বাড়ে। এই কারণে যে সব ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের রাগারাগি করতে না বলা হয়।

॥ তিন ॥ প্রক্ষোভের সময় দেখা গেছে নাড়ীর বেগেরও পরিবর্তন হয় (change in Palse rate)। ভয় পেয়ে যখন আমরা নিরাপদ অবস্থা খুঁজি তখন আমাদের নাড়ীর বেগ দ্রুত হয়। আবার অনেক সময় খুব বেশী ভয়ের জন্য নাড়ীর বেগ খুব কমে যায়, গা-হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

॥ চার ॥ প্রক্ষোভ মনের একটা বিশেষ জরুরী অবস্থা। এই জরুরী অবস্থার চাহিদা মেটানোর জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ বিশেষভাবে বেড়ে যায়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশী পরিমাণে সঞ্চালনের জন্য এই শক্তি ব্যয়িত হয়।

॥ পাঁচ ॥ প্রক্ষোভের সময় ত্বকের পরিবহণ ক্ষমতার তারতম্য (change in the conductivity of the skin) লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ত্বকে তড়িৎ পরিবাহী ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাকে বলা হয় 'Galvanic skin reflex' বা সংক্ষেপে G. S. R., প্রক্ষোভের সময় দেখা গেছে, ত্বকের স্বাভাবিক পরিবহন ক্ষমতার পরিবর্তন হয় বা G. S. R. এর পরিবর্তন হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে রাশিয়ান মনোবিদ লুরীয়া (Luria) এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেছেন, যাকে বলা হয় মিথ্যা নিরূপক যন্ত্র (Lie difector)। এই যন্ত্র আজকাল বিভিন্ন উন্নত দেশে অপরাধীদের মিথ্যা সওয়াল নির্ণয়ে সহায়তা করে।

॥ ছয় ॥ প্রক্ষোভমূলক অবস্থায় মস্তিষ্কের ক্রিয়ারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। Electroencephatograph এর সাহায্যে দেখা গেছে, বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির encephatograph পাওয়া যায়।

॥ সাত ॥ সবশেষে, বলা যেতে পারে প্রক্ষোভের প্রভাবে শ্বাসকার্যেরও পরিবর্তন (change in respiration) হয়। শ্বাসকার্যের সূচক (index) হিসেবে বৈজ্ঞানিকগণ I-অনুপাত (I-ratio) ব্যবহার করেন। এটা হ'ল প্রশ্বাস (inspiration) এবং নিঃশ্বাস (expiration) এর সময়ের অনুপাত।

$$I = \frac{\text{প্রশ্বাসের সময় কাল (Time for inspiration)}}{\text{নিঃশ্বাসের সময় কাল (Time for expiration)}}$$

স্বাভাবিক অবস্থায় এই অনুপাত '৪০ থেকে '৪৫ এর মধ্যে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভয়ের সময় এই অনুপাত '৭৫ পর্যন্ত বাড়ে; খুব বেশী বিস্ময় প্রকাশের সময় এর পরিমাণ হয় '৭১ এবং উত্তেজনার সময় '৬০ হয়। এইভাবে এই সূচকের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্ষোভ নির্দেশ করে।

প্রক্ষোভের তত্ত্বাবলী
[Theories of Emotion]

সূচনা

প্রক্ষোভের সময় যে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক পরিবর্তন হয়, সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন হয়, এ নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মনোবিদগণ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই মতবাদকে প্রক্ষোভের তত্ত্ব (Theory of Emotion) বলা হয়। প্রক্ষোভের তত্ত্ব দ্বারা মনোবিদ্‌গণ সঠিক ভাবে এই মানসিক অবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেয়ে প্রক্ষোভের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের সম্পর্ক কি তাই নির্ণয়ে বেশী সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা সাধারণ ধারণা থেকে বলি প্রক্ষোভ হ'ল এক রকমের মানসিক অবস্থা। এই অবস্থার সৃষ্টি হ'লে আমাদের দৈহিক পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে আমরা বিশেষ একভাবে আচরণ করি। অর্থাৎ, বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অনুভূতির দরুন দৈহিক পরিবর্তন হয়। আর সব শেষে আসে আচরণ। অর্থাৎ, এই সাধারণ ধারণা অনুযায়ী (Commonsense view), প্রক্ষোভ ও দৈহিক পরিবর্তন, যে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় তা'হল (১) **বস্তুর প্রত্যক্ষণ** (Perception of object),→(২) **মানসিক অনুভূতি** (feeling or emotional state),→(৩) **যান্ত্রিক পরিবর্তন** (organic changes), →(৪) **আচরণ** (Behaviour)। অর্থাৎ, রাস্তায় সাপ দেখলে আমাদের মনে ভয়ের অনুভূতি জাগে। তার থেকে আমাদের দেহ যন্ত্রের পরিবর্তন হয়; কাঁপতে থাকি, গলা শুকিয়ে যায়; এবং তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে পালাই।

জেমস্ ও ল্যাং এর তত্ত্ব
[James-Lange Theory]

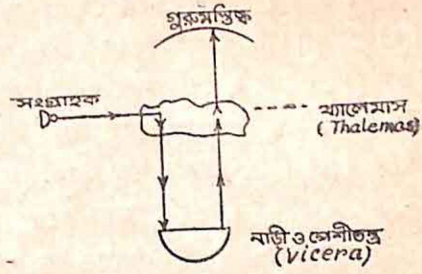
পূর্বোক্ত সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন **উইলিয়ম জেমস্** (William James) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এবং প্রায় একই সঙ্গে, পৃথকভাবে নানা পরীক্ষার পর ল্যাং (C. Lange) নামে একজন ডেনিস শরীরতত্ত্ববিদ্ অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন। তাই এই মতবাদ জেমস্-ল্যাং মতবাদ (James-Lange theory) নামে পরিচিত। এই ধারণা সাধারণ বিশ্বাসের ঠিক উল্টো। তাঁরা বললেন, বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Perception of the object) সঙ্গে আমাদের দৈহিক (Physiological) এবং যান্ত্রিক (organic) পরিবর্তন হয়। যান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে দেহের মধ্যে যে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) হয় তার সচেতনতাই হ'ল প্রক্ষোভ। জেমস্ তার মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এই মতবাদ সাধারণ ধারণার ঠিকই বিপরীত। তিনি বলেছেন "*My thesis on the contary is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting facts, and that our feeling of the same as they occur is the Emotion*"[1] উদ্দীপকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে যে অনুভূতি আসে তাই হ'ল আবেগ। সাধারণ অর্থে, শত্রুকে দেখলে আমাদের রাগ হয়, আমরা তাকে আক্রমণ করি। কিন্তু জেমস্ ল্যাং এর মতবাদ অনুযায়ী শত্রুকে দেখে আমরা আক্রমণ করি এবং এই আক্রমণ করার দরুন আমাদের রাগ হয়। আমরা দুঃখিত হ'লে কাঁদি না, কাঁদি বলে দুঃখিত হই। কোন কিছু ক্ষতি হ'য়ে গেলে আমরা প্রথম কাঁদি এবং পরে দুঃখিত হই। জেমস্ এর মত অনুযায়ী মানসিক প্রক্রিয়াগুলো অন্যরকম ক্রমে সংঘটিত হয়। (১) **বস্তুর প্রত্যক্ষণ** (Perception of the object)→(২) **দৈহিক পরিবর্তন বা আচরণ** (organic changes)→(৩) **যান্ত্রিক সংবেদন** (organic sensation)→(৪) **প্রক্ষোভ** (Emotion)। জেম্সের (James) বক্তব্য হ'ল দু'টো মানসিক প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে ঘটতে পারে না। কারণ প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ারই একটা ফল থাকবে। এবং কোন মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে (directly) অন্য কোন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। তার ফলই পারে, মানসিক প্রক্রিয়াকে শুরু করতে। সুতরাং বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Perception) পরে পরেই প্রক্ষোভ (Emotion) আসতে পারে না। তাদের মধ্যে একটা ফাঁক থাকার দরকার। এই ফাঁক পূরণ করে দৈহিক পরিবর্তন।

মূলভিত্তি

1. Principles of Psychology-Vol-II—James. W.

জেমস্ এর মতবাদকে শরীর বিজ্ঞানের পরীক্ষা লব্ধ ফল দ্বারা আরও দৃঢ়তর করে তোলেন ল্যাং (Lange)। তিনি বললেন, আমাদের সবরকম প্রক্ষোভ এবং অনুভূতির মূলে আছে নাড়ী ও পেশীর সক্রিয়তা (Veso-motor system)। বস্তুর প্রত্যক্ষণের ফলে আমাদের দেহের মধ্যে এই তন্ত্র (System) ক্রিয়া করে বলেই অনুভূতি হয়। তা না হলে প্রত্যক্ষণের দ্বারা শুধুমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা হ'ত। ল্যাং এই মতবাদের যে শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা করেছেন তা ছবির সাহায্যে দেখানো হচ্ছে।

শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা



কোন উদ্দীপক প্রথম যখন সংগ্রাহককে (Receptor) উত্তেজিত করে তখন সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু (Sensory nerve) দিয়ে মস্তিষ্কের (Brain) থ্যালেমাস (Thalamas) নামে অংশে যায়। এখন এই থ্যালেমাস প্রথম কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বা নাড়ি ও পেশী তন্ত্রের (Veso-motor system) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ফলে যান্ত্রিক পরিবর্তন হয়। এই যান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে মস্তিষ্কে ধারণা দেওয়ার জন্য অপর একটা উত্তেজনা বা স্নায়বিক প্রবাহ থ্যালেমাসের মধ্য দিয়ে গুরু মস্তিষ্কে (Cerebrum) যায়। তখন আমরা যান্ত্রিক পরিবর্তন (Organic change) সম্পর্কে সচেতন হই। এই সচেতনতা প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। জেমস্ এর মত ল্যাংও মনে করেন, আমাদের সব রকম প্রক্ষোভ ও অনুভূতির মূলে আছে এই সংবহন ও পেশীতন্ত্র (*"It is the veso-motor system that we have to think for the whole emotional aspect of our mental life, for our joys and sorrows, our happiness and misery" Lange*)।

স্বপক্ষে-যুক্তি

॥ এক ॥ জেমস্ তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেন। তাঁর মতে দৈহিক প্রকাশ থেকে আলাদা করে প্রক্ষোভকে ভাবা যায় না।[1] সুতরাং তাঁর মতে তারা অভিন্ন।

॥ দুই ॥ জেমস্ বলেছেন, কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক পরিবর্তনগুলো ঘটাতে পারলে প্রক্ষোভেরও উদ্ভব হয়। অভিনেতারা অনেক সময় সত্যি সত্যিই প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন। তাছাড়া দেখা গেছে, মদ খেয়ে অনেকে দুঃখ ভুলে থাকতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই করে বলা যায় দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের কারণ।

1. A Purely disembodied human emotion is a non entity'—James ; Principles of Psychology.

জেমস্ ও ল্যাং এর তত্ত্ব
[James-Lange Theory]

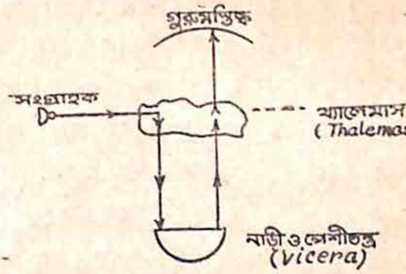
পূর্বোক্ত সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন **উইলিয়ম জেমস্** (William James) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এবং প্রায় একই সঙ্গে, পৃথকভাবে নানা পরীক্ষার পর ল্যাং (C. Lange) নামে একজন ডেনিস শরীরতত্ত্ববিদ্ অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন। তাই এই মতবাদ জেমস্-ল্যাং মতবাদ (James-Lange theory) নামে পরিচিত। এই ধারণা সাধারণ বিশ্বাসের ঠিক উল্টো। তাঁরা বললেন, বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Perception of the object) সঙ্গে আমাদের দৈহিক (Physiological) এবং যান্ত্রিক (organic) পরিবর্তন হয়। যান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে দেহের মধ্যে যে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) হয় তার সচেতনতাই হ'ল প্রক্ষোভ। জেমস্ তার মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এই মতবাদ সাধারণ ধারণার ঠিকই বিপরীত। তিনি বলেছেন "*My thesis on the contary is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting facts, and that our feeling of the same as they occur is the Emotion*"[1] উদ্দীপকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে যে অনুভূতি আসে তাই হ'ল আবেগ। সাধারণ অর্থে, শত্রুকে দেখলে আমাদের রাগ হয়, আমরা তাকে আক্রমণ করি। কিন্তু জেমস্ ল্যাং এর মতবাদ অনুযায়ী শত্রুকে দেখে আমরা আক্রমণ করি এবং এই আক্রমণ করার দরুন আমাদের রাগ হয়। আমরা দুঃখিত হ'লে কাঁদি না, কাঁদি বলে দুঃখিত হই। কোন কিছু ক্ষতি হ'য়ে গেলে আমরা প্রথম কাঁদি এবং পরে দুঃখিত হই। জেমস্ এর মত অনুযায়ী মানসিক প্রক্রিয়াগুলো অন্যরকম ক্রমে সংঘটিত হয়। (১) **বস্তুর প্রত্যক্ষণ** (Perception of the object)→(২) **দৈহিক পরিবর্তন বা আচরণ** (organic changes)→(৩) **যান্ত্রিক সংবেদন** (organic sensation)→(৪) **প্রক্ষোভ** (Emotion)। জেম্সের (James) বক্তব্য হ'ল দু'টো মানসিক প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে ঘটতে পারে না। কারণ প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ারই একটা ফল থাকবে। এবং কোন মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে (directly) অন্য কোন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। তার ফলই পারে, মানসিক প্রক্রিয়াকে শুরু করতে। সুতরাং বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Perception) পরে পরেই প্রক্ষোভ (Emotion) আসতে পারে না। তাদের মধ্যে একটা ফাঁক থাকার দরকার। এই ফাঁক পূরণ করে দৈহিক পরিবর্তন।

মূলভিত্তি

1. Principles of Psychology-Vol-II—James. W.

জেমস্ এর মতবাদকে শরীর বিজ্ঞানের পরীক্ষা লব্ধ ফল দ্বারা আরও দৃঢ়তর করে তোলেন ল্যাং (Lange)। তিনি বললেন, আমাদের সবরকম প্রক্ষোভ এবং অনুভূতির মূলে আছে নাড়ী ও পেশীর সক্রিয়তা (Veso-motor system)। বস্তুর প্রত্যক্ষণের ফলে আমাদের দেহের মধ্যে এই তন্ত্র (System) ক্রিয়া করে বলেই অনুভূতি হয়। তা না হলে প্রত্যক্ষণের দ্বারা শুধুমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা হ'ত। ল্যাং এই মতবাদের যে শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা করেছেন তা ছবির সাহায্যে দেখানো হচ্ছে। কোন উদ্দীপক প্রথম যখন সংগ্রাহককে (Receptor) উত্তেজিত করে তখন সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু (Sensory nerve) দিয়ে মস্তিষ্কের (Brain) থ্যালেমাস (Thalamas) নামে অংশে যায়। এখন এই থ্যালেমাস প্রথম কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বা নাড়ি ও পেশী তন্ত্রের (Veso-motor system) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ফলে যান্ত্রিক পরিবর্তন হয়। এই যান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে মস্তিষ্কে ধারণা দেওয়ার জন্য অপর একটা উত্তেজনা বা স্নায়বিক প্রবাহ থ্যালেমাসের মধ্য দিয়ে গুরু মস্তিষ্কে (Cerebrum) যায়। তখন আমরা যান্ত্রিক পরিবর্তন (Organic change) সম্পর্কে সচেতন হই। এই সচেতনতা প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। জেমস্ এর মত ল্যাংও মনে করেন, আমাদের সব রকম প্রক্ষোভ ও অনুভূতির মূলে আছে এই সংবহন ও পেশীতন্ত্র ("*It is the veso-motor system that we have to think for the whole emotional aspect of our mental life, for our joys and sorrows, our happiness and misery*" Lange)।

শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা



॥ এক ॥ জেমস্ তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেন। তাঁর মতে দৈহিক প্রকাশ থেকে আলাদা করে প্রক্ষোভকে ভাবা যায় না।[1] সুতরাং তাঁর মতে তারা অভিন্ন।

স্বপক্ষে-যুক্তি

॥ দুই ॥ জেমস্ বলেছেন, কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক পরিবর্তনগুলো ঘটাতে পারলে প্রক্ষোভেরও উদ্ভব হয়। অভিনেতারা অনেক সময় সত্যি সত্যিই প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন। তাছাড়া দেখা গেছে, মদ খেয়ে অনেকে দুঃখ ভুলে থাকতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই করে বলা যায় দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের কারণ।

1. A Purely disembodied human emotion is a non entity'—James ; Principles of Psychology.

॥ তিন ॥ প্রক্ষোভের পেছনে কোন ধারণা (Ideas) বা কল্পনা (Image) থাকে না। একটা বিশেষ অবস্থায় দেহের কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতাই প্রক্ষোভ। তাঁর মতে আমাদের দেহ একটা বাদ্যযন্ত্রের একই সুরে বাঁধা তারের মত। যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তন হবে, সেই রকম দৈহিক পরিবর্তনও হবে। ভয়ের চিন্তা থেকে ভয় আসে না। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই গলা শুকিয়ে যায়, গা শিউরে উঠে। এটাই হ'ল ভয়। কাজেই দৈহিক প্রকাশগুলোই প্রক্ষোভের কারণ।

॥ চার ॥ দেখা গেছে দৈহিক অবস্থার সৃষ্টি হ'তে না দিলে প্রক্ষোভ হয় না। আবার শারীরিক অসুস্থতার দরুন, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে ক্ষেত্রে, দৈহিক পরিবর্তনকে প্রক্ষোভের কারণ বলা ছাড়া উপায় নেই।

॥ এক ॥ জেমস্ এবং ল্যাং এর এই মতবাদ প্রকাশের পর মনোবিদ্গণের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তাই বিভিন্ন মনোবিদ্ তাকে বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

সমালোচনা

এই তত্ত্বের বহু সমালোচনা হয়েছে, এবং বর্তমানে তার উপর আর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে অনেকে তার সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন দার্শনিকগণ মনে করেন চেতনা-বিহীন দৈহিক আচরণ কি ভাবে চেতনাযুক্ত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করছে, তা এই মতবাদে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় নি? প্রক্ষোভ এবং দৈহিক পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একথা ঠিক। তা'বলে তাদের অভিন্ন (identical) বলার কোন যুক্তি নেই। মনোবিদ **স্টাউট্** (Stout)[1] বলেছেন, জলে ঢিল ছুঁড়লে, ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, তা'বলে ঢেউকে আমরা ঢিলের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে পারি না। জেমস্-ল্যাং তাঁদের তত্ত্বে তাই করেছেন।

॥ দুই ॥ তাছাড়া জেমস্ যে বলেছেন কেবলমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণ আমাদের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল (Mcdougall)। স্মৃতি (Memory) বা কল্পনার (Imagination) দরুনও আমাদের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক পরিবর্তন আনবেই এই ধারণা ভুল। বস্তুর প্রত্যক্ষণের ফলে মনে বিশেষ ভাব না জাগলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে না।

॥ তিন ॥ ম্যাকডুগালের কাছে জেমস এর প্রক্ষোভতত্ত্বের মূল ত্রুটি হ'ল, তিনি প্রক্ষোভের পেছনে যে সহজাত কর্ম প্রবণতা (conative tendency) কাজ করে, সে কথা স্বীকার করেন নি। কিন্তু কর্মপ্রবণতা ছাড়া প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত শক্তির যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া যায় না।

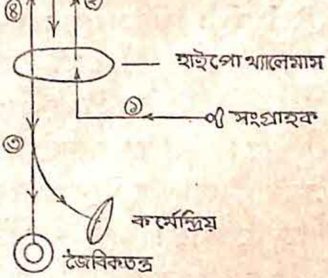
1. "A stone cannot fall into water without making ripples, but the ripples are not the stone"....Stout : Manual of Psychology.

॥ চার ॥ জেমস্ এবং ল্যাং এর মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি উপস্থাপন করে শেরিংটন (Sherrington), ক্যানন (cannon), বার্ড (Bird) প্রভৃতি মনোবিদ্ ও শরীর বিজ্ঞানীগণ। তাঁরা বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে দেহের নাড়ি ও পেশী তন্ত্রের (Vaso-motor system) কাজ বন্ধ করে দিলেও প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই বিশেষ দৈহিক তন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

ক্যানন এবং বার্ড এর তত্ত্ব
[Cannon-Bird Theory]

ক্যানন (Cannon) এবং বার্ড (Bird) তাঁদের নিজেদের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে প্রক্ষোভ সম্পর্কে নতুন এক মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদকে বলা হয় ক্যানন এবং বার্ডের তত্ত্ব (Cannon-Bird Theory)। এদের মতে প্রক্ষোভ (Emotion) এবং দৈহিক পরিবর্তন একই সঙ্গে হয়। এবং, প্রক্ষোভ ও দৈহিক পরিবর্তন (bodily change) এদের উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত হাইপোথ্যালেমাস্ (Hypothalamus)। এই মত অনুযায়ী, ইন্দ্রিয় কিংবা কোন সংগ্রাহক যন্ত্র থেকে উত্তেজনা সংজ্ঞাস্নায়ু (sensory nerve) দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মস্তিষ্কে (Brain) বা সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal cord) যায়। কিন্তু উত্তেজনাকে গুরুমস্তিষ্কে (cerebrum) যাওয়ার পথে মধ্য মস্তিষ্কে (Mid brain) অবস্থিত থ্যালেমাস (Thalamus) এবং হাইপোথ্যালেমাস (Hypothalamus) এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রক্ষোভের সময় হাইপোথ্যালেমাস তিন ভাবে কাজ করে। ছবির সাহায্যে তা বুঝানো হচ্ছে। প্রথমতঃ প্রক্ষোভ সৃষ্টিকারী উত্তেজনা সংগ্রাহক যন্ত্র থেকে সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে হাইপোথ্যালেমাসে গিয়ে পৌঁছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, হাইপোথ্যালেমাস ঐ উত্তেজনা পাওয়ার পর, অনুরূপ একটা উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্কে পাঠায়; এই সঙ্গে হাইপোথ্যালেমাস্ আর একটা উত্তেজনা আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ে ও দেহের অন্যান্য জৈবিক তন্ত্রে (viscera) পাঠায়; প্রথম উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছলে আমাদের অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এবং দ্বিতীয় উত্তেজনা কর্মেন্দ্রিয়ে এবং

মূল বক্তব্য ও শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা



॥ তিন ॥ প্রক্ষোভের পেছনে কোন ধারণা (Ideas) বা কল্পনা (Image) থাকে না। একটা বিশেষ অবস্থায় দেহের কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতাই প্রক্ষোভ। তাঁর মতে আমাদের দেহ একটা বাদ্যযন্ত্রের একই সুরে বাঁধা তারের মত। যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তন হবে, সেই রকম দৈহিক পরিবর্তনও হবে। ভয়ের চিন্তা থেকে ভয় আসে না। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই গলা শুকিয়ে যায়, গা শিউরে উঠে। এটাই হ'ল ভয়। কাজেই দৈহিক প্রকাশগুলোই প্রক্ষোভের কারণ।

॥ চার ॥ দেখা গেছে দৈহিক অবস্থার সৃষ্টি হ'তে না দিলে প্রক্ষোভ হয় না। আবার শারীরিক অসুস্থতার দরুন, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে ক্ষেত্রে, দৈহিক পরিবর্তনকে প্রক্ষোভের কারণ বলা ছাড়া উপায় নেই।

॥ এক ॥ জেমস্ এবং ল্যাং এর এই মতবাদ প্রকাশের পর মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তাই বিভিন্ন মনোবিদ্ তাকে বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

সমালোচনা

এই তত্ত্বের বহু সমালোচনা হয়েছে, এবং বর্তমানে তার উপর আর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে অনেকে তার সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন দার্শনিকগণ মনে করেন চেতনা-বিহীন দৈহিক আচরণ কি ভাবে চেতনাযুক্ত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করছে, তা এই মতবাদে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় নি? প্রক্ষোভ এবং দৈহিক পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একথা ঠিক। তা'বলে তাদের অভিন্ন (identical) বলার কোন যুক্তি নেই। মনোবিদ **স্টাউট্** (Stout)[1] বলেছেন, জলে ঢিল ছুঁড়লে, ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, তা'বলে ঢেউকে আমরা ঢিলের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে পারি না। জেমস্-ল্যাং তাঁদের তত্ত্বে তাই করেছেন।

॥ দুই ॥ তাছাড়া জেমস্ যে বলেছেন কেবলমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণ আমাদের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল (Mcdougall)। স্মৃতি (Memory) বা কল্পনার (Imagination) দরুনও আমাদের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক পরিবর্তন আনবেই এই ধারণা ভুল। বস্তুর প্রত্যক্ষণের ফলে মনে বিশেষ ভাব না জাগলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে না।

॥ তিন ॥ ম্যাকডুগালের কাছে জেমস এর প্রক্ষোভতত্ত্বের মূল ত্রুটি হ'ল, তিনি প্রক্ষোভের পেছনে যে সহজাত কর্ম প্রবণতা (conative tendency) কাজ করে, সে কথা স্বীকার করেন নি। কিন্তু কর্মপ্রবণতা ছাড়া প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত শক্তির যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া যায় না।

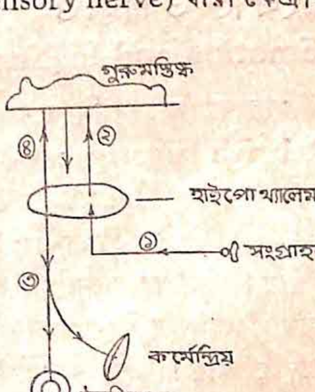
1. "A stone cannot fall into water without making ripples, but the ripples are not the stone"....Stout : Manual of Psychology.

॥ চার ॥ জেমস্ এবং ল্যাং এর মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি উপস্থাপন করে শেরিংটন (Sherrington), ক্যানন (cannon), বার্ড (Bird) প্রভৃতি মনোবিদ্ ও শরীর বিজ্ঞানীগণ। তাঁরা বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে দেহের নাড়ি ও পেশী তন্ত্রের (Vaso-motor system) কাজ বন্ধ করে দিলেও প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই বিশেষ দৈহিক তন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

ক্যানন এবং বার্ড এর তত্ত্ব
[Cannon-Bird Theory]

ক্যানন (Cannon) এবং বার্ড (Bird) তাঁদের নিজেদের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে প্রক্ষোভ সম্পর্কে নতুন এক মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদকে বলা হয় ক্যানন এবং বার্ডের তত্ত্ব (Cannon-Bird Theory)। এদের মতে প্রক্ষোভ (Emotion) এবং দৈহিক পরিবর্তন একই সঙ্গে হয়। এবং, প্রক্ষোভ ও দৈহিক পরিবর্তন (bodily change) এদের উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত হাইপোথ্যালেমাস্ (Hypothalamus)। এই মত অনুযায়ী, ইন্দ্রিয় কিংবা কোন সংগ্রাহক যন্ত্র থেকে উত্তেজনা সংজ্ঞাস্নায়ু (sensory nerve) দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মস্তিষ্কে (Brain) বা সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal cord) যায়। কিন্তু উত্তেজনাকে গুরুমস্তিষ্কে (cerebrum) যাওয়ার পথে মধ্য মস্তিষ্কে (Mid brain) অবস্থিত থ্যালেমাস (Thalamus) এবং হাইপোথ্যালেমাস (Hy-pothalamus) এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রক্ষোভের সময় হাইপোথ্যালেমাস তিন ভাবে কাজ করে। ছবির সাহায্যে তা বুঝানো হচ্ছে। প্রথমতঃ প্রক্ষোভ সৃষ্টিকারী উত্তেজনা সংগ্রাহক যন্ত্র থেকে সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে হাই-পোথ্যালেমাসে গিয়ে পৌঁছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, হাইপোথ্যালেমাস ঐ উত্তেজনা পাওয়ার পর, অনুরূপ একটা উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্কে পাঠায়; এই সঙ্গে হাইপোথ্যালেমাস্ আর একটা উত্তেজনা আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ে ও দেহের অন্যান্য জৈবিক তন্ত্রে (viscera) পাঠায়; প্রথম উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্কে গিয়ে পৌছলে আমাদের অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এবং দ্বিতীয় উত্তেজনা কর্মেন্দ্রিয়ে এবং

মূল বক্তব্য ও শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা



অন্যান্য জৈবিক তন্ত্রে গিয়ে পৌছালে আচরণ ও যান্ত্রিক পরিবর্তন হয়। এই যান্ত্রিক পরিবর্তনের খবরও হাইপোথ্যালেমাস গুরুমস্তিষ্কে পাঠায় আর একটা উত্তেজনার মাধ্যমে। এবং ঐ খবর গুরুমস্তিষ্কে গিয়ে পৌছালে আমরা বিভিন্ন যান্ত্রিক পরিবর্তন ও প্রক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন হই।

সুতরাং এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী প্রক্ষোভ এবং দৈহিক পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটে, কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়। প্রক্ষোভের সমস্ত ক্রিয়ার মূলে আছে হাইপোথ্যালেমাস্। শরীর বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, মস্তিষ্কের এই অংশ নষ্ট হয়ে গেলে, প্রক্ষোভ থাকে না। তবে প্রক্ষোভকালীন অবস্থার সব ক্রিয়াকে যে হাইপোথ্যালেমাস নিয়ন্ত্রণ করে তা আজও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। পরবর্তীকালে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা কোন প্রাণীর শুধুমাত্র হাইপো-থ্যালেমাস্‌কে উত্তেজিত করলে তার জৈবিক আচরণ হয় ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে কোন মানসিক ইচ্ছা বা মানসিক সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্যহীন আচরণ প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রক্ষোভের সময়ে যে আচরণ হয়, তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। তাই প্রক্ষোভ চলে যাওয়ার পরেও সে আচরণগুলো ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে বলা যেতে পারে প্রক্ষোভের কেন্দ্র হাইপোথ্যালেমাস হলেও তার প্রকৃতি অনেকাংশে গুরুমস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আলোচনা

প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি
[Emotion and Instinct]

মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ এবং প্রবৃত্তির আপেক্ষিত গুরুত্ব (Relative importance) নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তিগুলো আমাদের কর্মপ্রেরণার উৎস এবং আমাদের সকল রকম কাজের পেছনে শক্তি যোগায়। আবার অনেকে একথা বলেছেন যে প্রক্ষোভই মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রক্ষোভগুলো আমাদের কাজের পেছনে শক্তি যোগায়। এই মতপার্থক্য সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব এই অংশে।

সূচনা

ম্যাকডুগাল, তাঁর প্রবৃত্তি তত্ত্বে বলেছেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা বিশেষ বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করি বা তার প্রতি মনোযোগ দিই। বস্তুর প্রত্যক্ষণ আমাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা (Impulse to action) জাগিয়ে তোলে। এই কর্মপ্রেরণা আমাদের

প্রক্ষোভের গুরুত্ব

বিশেষভাবে আচরণ করতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং তাঁর মতে সহজাত প্রক্ষোভই হ'ল কাজের বা আচরণের উৎস। কারণ তার মধ্যেই উদ্দেশ্যমুখী (Purposive) কাজ করবার শক্তি আছে। অনুরূপ মতবাদে বিশ্বাস করেন, অনেক মনোবিদ্ যেমন **শ্যাণ্ড** এই প্রক্ষোভের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে তিনি মনে করেন ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসত্বা যা তার আচরণের দিক নির্ণয় করে, তা গঠিত হয় এই প্রক্ষোভের সমন্বয়ে (Emotions are the foundation of character—Shand)।

প্রবৃত্তির গুরুত্ব

আবার, অন্যদিকে মনোবিদ **ড্রিভার** (J. Drever) বলেছেন সংস্কারমূলক কাজের উৎস হ'ল প্রবৃত্তি (Instinct)। কারণ তিনি মনে করেন সব সময় আমাদের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় না। কোন প্রবৃত্তির ক্রিয়ার ফলে আমাদের মধ্যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে তিনি বলেছেন, অনুরাগ (Interest) বা 'Feeling of worthwhileness'। এখন এই অবস্থার সঙ্গে জড়িত বস্তুকে আমরা যদি পেয়ে যাই, তা'হলে প্রক্ষোভ আর জাগরিত হয় না, কিন্তু কোন কারণে যদি অনুরাগের বস্তু না পাওয়া যায় তা'হলেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কোন ভীতিপ্রদ বস্তু দেখলে আমরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার জন্য দৌড়ে পালাই। অর্থাৎ, প্রবৃত্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি আমরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে না পাই, তখনই ভয়ের বা প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মনোবিদ্ বার্ট (Burt) অন্যদিক থেকে এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বাভাবিক প্রক্ষোভ প্রবণতার (General emotionality) দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু, ক্ষীণ প্রক্ষোভ মানেই স্বল্প সংস্কারগত প্রবৃত্তি নয়, বা স্বল্প কর্মক্ষমতা নয়। মনোবিদ **রিভার্স**ও (Rivers) একই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, কোন বিশেষ ধরনের প্রবৃত্তি (Instinct) আমাদের বিশেষভাবে কর্মসম্পাদন করতে প্রবৃত্ত করে। যদি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেই কর্ম ব্যহত হয়, তা'হলে প্রক্ষোভ দেখা দেয়। আর তা সম্পাদনে যদি কোন অসুবিধা না থাকে, তবে প্রক্ষোভও দেখা যায় না। সুতরাং এঁরা মনে করেন আচরণের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিই প্রধান, প্রক্ষোভের কোন মূল্য নেই। এবং প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির মধ্যে ম্যাকডুগাল যে সম্পর্কের কথা বলেছেন, তাও তাঁরা মানতে রাজী নন।

প্রক্ষোভ-প্রবৃত্তির পারস্পরিক গুরুত্ব

শিক্ষাবিদ **নান্** (P. Nunn), এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য মনোবিদদের বলেছেন, যে আসল গণ্ডগোলটা তাদের সম্পর্কের মধ্যে নয়। সমস্যাটা আরও বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার। তিনি মোটামুটিভাবে এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রবৃত্তিমূলক কাজ (Instinctive action) তার পেছনে যে উদ্দেশ্য আছে, তা প্রবৃত্তির তাড়নায় সম্পাদিত হ'লেও প্রক্ষোভ

সাময়িকভাবে পরিস্থিতি বিচারে তার স্বরূপকে পরিবর্তন করে। অর্থাৎ, প্রবৃত্তিমূলক কর্মকে প্রক্ষোভ নিজস্বতা দান করে। এবং এই অর্থে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে বলা যায়, প্রবৃত্তিমূলক কাজের পেছনে যে বস্তুধর্মী জ্ঞান (Cognition) কাজ করে, তা পরিচালনা করে গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum) এবং প্রক্ষোভ পরিচালনা করে মধ্য-মস্তিষ্কের (Mid-brain) মধ্যে একটি কেন্দ্র। আবার পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, তাদের পৃথক পৃথক ভাবে বা একত্রে উত্তেজিত করা যায়। তাই সম্পর্কের দিক থেকে তাদের প্রকৃতি কি বলা মুশকিল। কোন সময় আমাদের কাজ এককভাবে প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; আবার কোন সময় শুধুমাত্র প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন কোন সময় দু'টোই ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং কোন একটাকে সব কাজের উৎস বলা যায় না। মানুষের কর্মজীবনে তাদের দু'জনের প্রভাবকেই অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষা ও প্রক্ষোভ
[Education & Emotion]

ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভের প্রভাব যে অনেক, সে বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। মনোবিদ রস্ (Ross) এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,

সূচনা

দু'টো বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা দেখে আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত প্রক্ষোভ মানুষের জীবনে কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে। তিনি শুধু খারাপ প্রভাবটার কথাই উল্লেখ করেন নি, প্রক্ষোভের ভাল দিকের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন—"—*emotion constantly Relighten the vitality and interest of life, especially of social life.*[1] অর্থাৎ, প্রক্ষোভ আমাদের সামাজিক জীবনের প্রাণশক্তি ও অনুরাগকে বাড়িয়ে তুলে। দার্শনিক **রাসেল** (B. Russel) তাঁর On Education বইয়ে বিশেষভাবে ভয়ের প্রক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অহেতুক ভয় দূর করার ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সামগ্রিকভাবে প্রক্ষোভের উপযোগিতাও এ সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে জারশীল্ড্ (A. T. Jersild)[2] এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া,

1. Educational Psychology—Ross.

2. "It has still greater importance in connection with the larger objective of education to help each learner, as much as possible, to realise his potentialities as a person, to help to learn face reality, accept himself, live comfortably with his own thoughts and feelings, and get along amicably with others." —Jersild : Educational Psychology (Skinner. ed.) chap. 3.

বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখানো, নিজের চিন্তা ও অনুভূতির দ্বারা নিজে সহজভাবে বাস করার কৌশল শিখানো, এবং অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে কি ভাবে থাকতে হয় তা শিখানো। এক কথায়, তার প্রক্ষোভমূলক জীবনের সুপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং, যে ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা উৎসর্গীকৃত, তারই একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে প্রক্ষোভ (Emotion)। প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার সময় আমরা বলেছি, প্রক্ষোভমূলক আচরণ অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। তাই প্রক্ষোভের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মধ্যে কিছু মৌলিক প্রক্ষোভ আছে, যেগুলোকে সামাজিক দিক থেকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এদের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে ব্যহত করে। এদের বলা হয় হানিকর প্রক্ষোভ (Disruptive emotions)। অন্যদিকে কতকগুলো প্রক্ষোভ আছে, যে গুলো সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন উভয়ের দিক থেকেই ভাল। এদের বিকাশ ও প্রকাশ ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে, জীবনের মূল্য নির্ণয়ে যে সব প্রক্ষোভ ঋণাত্মক (negative emotion) বা জীবনের পক্ষে যে গুলো হানিকর (Disruptive emotions), তাদের দূর করা বা যতদূর সম্ভব জীবনের উপর তাদের প্রভাব কমিয়ে আনা; আর যে সব প্রক্ষোভ চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা করে, তাদের যতটা বাড়িয়ে তোলা যায় তার চেষ্টা করা। এখানে আমরা কয়েকটা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভয়

বিভিন্ন ধরনের হানিকর প্রক্ষোভকে শিক্ষার্থীদের মত থেকে দূর করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এই সব পন্থা সার্বজনীনভাবে সব প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাই এরকম দু'একটা প্রক্ষোভের কথা উল্লেখ করে, বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথম ধরা যাক ভয় (fear)। সাধারণভাবে মানুষের জীবনে ভয় কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয় আবার চলেও যায়। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে যখন ব্যক্তিজীবন থেকে এই ভয় দূরীভূত হয় না তখনই সমস্যা দেখা দেয়। আবার অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অহেতুক ভয় দেখা দেয়। এই সব অবস্থাগুলো দূর করতে না পারলে ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হবে না। ছাত্রদের মধ্যে ভয় দূর করার জন্য শিক্ষক কতকগুলো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। যেমন—

॥ এক ॥ ছাত্রদের সামনে নির্ভীকতার আদর্শ তুলে ধরে। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী আলোচনার মাধ্যমেও এ কাজ করা যেতে পারে বা শিক্ষক নিজে তাঁর নির্ভীক আচরণ দিয়ে ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পারেন।

॥ **দুই** ॥ অনুবর্তনের (Conditioning) দ্বারা ছাত্রদের অযথা ভয়কে দূর করা যায়। যেমন ছাত্ররা পরীক্ষাকে ভয় পায়। কিন্তু বার বার পরীক্ষা নিয়ে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পুরস্কার দিয়ে এই ভয়কে দূর করা যায়। অভিজ্ঞতার ফলে তার ভীতি কমে যায়। সহজ প্রশ্ন দিয়ে, প্রয়োজন বোধে সাহায্য করে ধীরে ধীরে পরীক্ষার প্রতি এই অহেতুক ভয়কে কমিয়ে ফেলা যায়।

॥ **তিন** ॥ অকারণ ভয় অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য আসে। যে জিনিস ছাত্ররা জানে না বা যে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাকেই তারা ভয় পায়। যে ছাত্র অঙ্ক করতে পারে না, অঙ্কের কথা শুনলেই তার ভয় আসে। এই ধরনের ভয় দূর করতে হ'লে ছাত্রদের অভিজ্ঞতার পরিসর (Range of experience) বাড়িয়ে তুলতে হবে, এবং বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার (understanding) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

॥ **চার** ॥ ছাত্রদের অনেক সময় আত্মবিশ্বাস থাকে না বলে তারা ভীত হয়। শিক্ষক তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিয়ে, এবং প্রয়োজন বোধে সাহায্য করে, তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে না পারলে ভয় দূর করা যাবে না।

॥ **পাঁচ** ॥ সবশেষে, একটা কথা মনে রাখার দরকার কোন প্রক্ষোভকেই অবজ্ঞা বা উপহাস দ্বারা দূর করা যাবে না। আবার একথাও ঠিক সব সময়ে যুক্তির দ্বারাও তাদের দূর করা যায় না। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর অবস্থা বুঝে, বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মাধ্যমে ঐ সব প্রক্ষোভের প্রভাবকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

রাগও (Anger) এক ধরনের প্রক্ষোভ যার সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হ'তে হবে। রাগের অসংযত বহিঃপ্রকাশকে শিক্ষার দ্বারা কমাতে হবে।

রাগ

ছাত্রদের সামনে বিভিন্ন আদর্শ তুলে ধরে, অনুবর্তনের (Conditioning) সাহায্য নিয়ে, রাগের কারণ দূর করে, অর্থাৎ রাগের বস্তুকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে দিয়ে এবং অন্য ব্যক্তির মানসিকতাকে ধৈর্যের সঙ্গে বিচার করার বোধ জাগ্রত করে অহেতুক রাগকে (Anger) দূর করা যায়। রাগ ছাত্রদের মধ্যে তখনই হয় যখন তারা কোন কিছু করতে গিয়ে বাধা পায়। তাই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে বাধা পেলে যার সৃষ্টি, বাধা দিয়ে তাকে কমানো যাবে না। রাগের দ্বারা রাগকে কমানো যাবে না। এর ফলে প্রক্ষোভের বৃদ্ধিই পাবে। তাই ছাত্ররা যখন কোন কাজ করতে গিয়ে ভুল পথে যাচ্ছে, তখন যদি শিক্ষক তাকে সচেতন করে দেন, এবং তার ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা সঠিক পথে পরিচালিত করেন তা'হলে উভয় পক্ষেরই রাগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ঘৃণা (Hate) আর একরকম হানিকর প্রক্ষোভ। অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়।

শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তারা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘৃণা করে। খারাপ বস্তু বা অসৎ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা থাকা ভাল। কিন্তু তা যাতে ব্যক্তিজীবনকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথাযোগ্য বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য আবেগ প্রবণতা ব্যক্তিজীবনের পক্ষে একান্তভাবে কাম্য। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে শিক্ষককে অনুকরণ করে। তাই শিক্ষক নিজে, এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হবেন এবং তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে আদর্শকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। তবেই তারা বস্তু এবং ব্যক্তির প্রতি যথার্থ প্রতিক্রিয়া করতে শিখবে।

ঘৃণা

একদিকে, এমনিভাবে যেমন হানিকর প্রক্ষোভগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অন্যদিকে এ কথাও মনে রাখতে হবে, এই সব প্রক্ষোভগুলোর একটা ভাল দিকও আছে। কিছু জিনিস বা পরিস্থিতির ভয়, কোন পরিস্থিতিতে রাগের প্রকাশ, কোন কোন বস্তু বা ব্যক্তি ঘৃণা করা ব্যক্তিজীবনের সুষম বিকাশের-পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই সব প্রক্ষোভের সুসংহত প্রয়োগ।

আবার একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভাল প্রক্ষোভগুলোর উৎকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে। কারণ, শুধুমাত্র খারাপগুলোর প্রভাবমুক্ত হ'লে চলবে না, ভালগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই ব্যক্তিসত্বার সুষম বিকাশ হবে। ছাত্রদের মধ্যে গুরুজনদের প্রতি যাতে শ্রদ্ধার ভাব জাগে সেদিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। এছাড়া, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব, সমস্ত কিছুর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমেই তারা জীবনের আনন্দের সন্ধান পাবে। রসবোধ (sense of humour) জীবনের ক্ষেত্রে অনুভূতিকে যথাযথভাবে প্রকাশে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই রস বোধ জাগ্রত করতে হবে। রসিক শিক্ষকই তাঁর ছাত্রের মধ্যে এই বোধ সঞ্চার করতে পারেন।

ভাল প্রক্ষোভগুলোর উৎকর্ষণ

প্রক্ষোভের যথাযথ শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে চরিত্র। সুন্দরের প্রতি আসক্তি, মহৎ এর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিবেশীদের প্রতি সমমর্মিতাবোধ, এই সবই প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসবে। শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হবে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে শিখানো। তাই প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশ সাধন করা, শিক্ষার একটা অঙ্গ। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জীবনের সার্বিক বিকাশ হয়, তবে প্রক্ষোভের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রক্ষোভমূলক পরিপক্কতা (Emotional maturity) শিক্ষার্থীদের যাতে তাদের বয়সোপযোগী পরিপক্কতা আসে সে জন্য শিক্ষক নিম্ন লিখিত দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

প্রক্ষোভমূলক পরিমনন

॥ এক ॥ হানিকর, প্রক্ষোভগুলোর সংযত প্রকাশের জন্য প্রশিক্ষণ।
॥ দুই ॥ ব্যক্তিজীবনের পক্ষে সহকারী প্রক্ষোভগুলোর চর্চ্চার সুযোগ।
॥ তিন ॥ বিরুদ্ধ কোন মনভাবকে বা সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্যভাবে সহ্য করার অভ্যাস গঠন।
॥ চার ॥ সামাজিক রীতি নীতিকে দ্বিধাহীনভাবে মেনে চলার অভ্যাস।
॥ পাঁচ ॥ স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার বিকাশ।
॥ ছয় ॥ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য থেকে ভাল অংশকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন।
॥ সাত ॥ অহেতুক ভয় থেকে মুক্ত হওয়া।
॥ আট ॥ নিজের ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা।
॥ নয় ॥ অন্যের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতনতা।
॥ দশ ॥ কোন রকম দ্বিধা না করে নিজের ভুলকে স্বীকার করে নেওয়ার অভ্যাস।
॥ এগার ॥ জয় এবং পরাজয়কে জীবনে সহজ ও সংযতভাবে গ্রহণ করা।
॥ বার ॥ হতাশাকে প্রশ্রয় না দেওয়া ; এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কাটিয়ে উঠার চেষ্টা।
॥ তের ॥ সুস্থ-স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষমতা অর্জন করা।

প্রশ্নাবলী

1. What are emotions ? What can the home and the school do for the proper emotional development of the child (N. B. U. B. T, '66) [পৃঃ ১৪৫-১৫২ : ১৬২-১৬৬]
2. Differentiate emotion and feelings. How should emotions be educated ? [পৃঃ ১৪৫-১৪৯ ; ১৬২-১৬৬] (K. U. B. T. '69)
3. What are emotions ? How is their training important in an allround development of a child ? [পৃঃ ১৪৫-১৫২ ; ১৬২-১৬৬] (K. U. B. T. '63)
4. Discuss the place of instincts and emotions in the education of a child ? [পৃঃ ১৩৯-১৪৩ ; ১৬২-১৬৬] (C. U. B. T. '65)
5. Distinguish between instinct and emotion. Discuss the role of emotion in the education of the child. [পৃঃ ১৬০-১৬৬]
6. What is meant by emotional maturity. Discuss the role of the teacher in bringing about emotional maturity of the school children. [পৃঃ ১৬২-১৬৬]
7. Write notes on the following:
(a) Emotions (C. U. B. A.'66), [পৃঃ ১৪৫-১৪৯], (b) James—Lange theory of Emotion (N. B. U. B. T.'67) [পৃঃ ১৫৬-১৫৯]

একাদশ অধ্যায়

মানব জীবনের বিকাশ
[HUMAN DEVELOPMENT]

জীবনের প্রতিমুহূর্তে, ব্যক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তের প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন—**বৃদ্ধি** (Gtowth), **বিকাশ** (Development), **পরিমনন** (Maturation) ইত্যাদি।

বিকাশ বৃদ্ধি ও পরিবর্তন

তাই বিকাশ বলতে আমরা কি বুঝি তা প্রথমে পরিষ্কার হওয়ার দরকার। অনেকে বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশকে (Development) একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক থেকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। দু'টো প্রক্রিয়াই ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন (change) আনতে সক্ষম। কিন্তু বৃদ্ধি বলতে আমরা শুধুমাত্র আকার বা আয়তনের পরিবর্তনকে (change in size and volume) বুঝি ; আর বিকাশ (Development) বলতে বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন (change in shape) এবং কাজের উন্নতিকে (improved function) বুঝাতে চাই। বৃদ্ধি (Growth) কথাটার দ্বারা আমরা মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে খুব তাৎপর্যহীনভাবে (casual) বুঝাতে চাই। কিন্তু যখন বিকাশ (Development) কথাটা ব্যবহার করি তখন সেই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুঝাতে চাই। যখন বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তার হাত, পা, দেহের কাঠামো লম্বায় বেড়েছে, এইটুকুই বুঝাতে চাই। যখন বলি, শিশুটির দৈহিক বিকাশ হয়েছে, তখন শুধুমাত্র দৈর্ঘের বৃদ্ধিকে বুঝাই না ; সেগুলো পরিবর্তন হওয়ার ফলে তাদের কাজেরও পরিবর্তন হয়েছে, সেটা বুঝাতে চাই। তাছাড়া, বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে আর একটা পার্থক্যের দিক হ'ল—বৃদ্ধি (Growth) সাময়িক প্রক্রিয়া কিন্তু বিকাশ (Development) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Continues throughout life)। **জীবনব্যাপী ক্রম উন্নতিশীল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হ'ল বিকাশ** (Development is the continuous progressive change in the organisation)। যদি প্রক্রিয়াটা কি তা বুঝানোর জন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের মধ্যে তফাত করলাম, কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতিতে এই দুটো পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পৃথক করা যায় না। কারণ, পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া (Quantitative change) গুণগত পরিবর্তনকে (Qualitative change) উপলব্ধি করা যায় না ; বা, গুণগত পরিবর্তন ছাড়া, পরিমাণগত পরিবর্তনকে উপলব্ধি করা যায় না। তাই, এই দুই প্রক্রিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

বিকাশের প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য
[Characteristics of developmental process]

মানুষের বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে, এই বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু উল্লেখ করার দরকার। এই সাধারণ ধারণা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ এই বিকাশ প্রক্রিয়ার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর আমরা এখানে উল্লেখ করছি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই বিকাশের প্রকৃতি বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

॥ **প্রথমতঃ** ॥ বিকাশ হ'ল এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Development is a continuous process)। ভাল বা খারাপ যে দিকেই হউক মানুষ সতত পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি দিনে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে তার পরিবর্তন হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায় আবার কোন সময় তা আমাদের চোখে বা ব্যক্তির নিজের কাছেও ধরা পড়ে না। আর এই পরিবর্তনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল এই পরিবর্তন ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয়কে (Individual identity) কোন সময় লোপ করে দেয় না। আলোচনার সুবিধার জন্য মনোবিদগণ মানুষের এই বিকাশের ধারাকে কয়েকটা পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন **প্রাক্‌ভূমিষ্ঠ অবস্থা** (Prenatal period), **সদ্যজাত অবস্থা** (Neo-natal period), **আদি শৈশব** (early infancy), ইত্যাদি। কিন্তু মনোবিদগণ একথাও স্বীকার করেছেন, এক পর্যায় আর এক পর্যায়ে উপনীত হওয়াটা একটা আকস্মিক প্রক্রিয়া হয় না। বিকাশের প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই এগিয়ে চলে।

অবিচ্ছিন্নতা

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ বিকাশের প্রক্রিয়া ক্রমপরিবর্তনশীল (Development is Cumulative)। অর্থাৎ বিকাশের স্তরে যে কোন পর্যায় তার পূর্ববর্তী বিকাশের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ কোন বিশেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে আসে না। বিকাশের যে কোন পর্যায়ের অবস্থা ঠিক তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে এসেছে। এই মুহূর্তে মানুষ কি ভাবে আচরণ করবে, তা নির্ধারণ করবে, তার পূর্ব মুহূর্তের আচরণ। **হারলক** (Hurlock) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করেছেন যে, বাল্যকালের বিভিন্ন আচরণ ও অভিজ্ঞতা ব্যক্তির পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে।

পরিবর্তনশীলতা

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ বিকাশের ধারা সব সময় সামঞ্জস্য বজায় রাখে (Development is orderly)। মানুষের আচরণের বিকাশ বিশেষ নিয়ম মেনে হয়। কোন আচরণের পর কোন আচরণ হবে, তা মোটামুটিভাবে ঠিক আছে।

প্রত্যেক শিশু প্রথম চিৎ হবে, তারপর বসবে, তারপর হামাগুড়ি দেবে, তারপর হাঁটবে। এমনি ভাবে একটা বিশেষ নিয়ম মেনে চলবে। বিকাশের ধারা এই যে সবাইয়ের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, এর ফলে মনোবিদ্‌গণের অনুশীলনের সুবিধা হয়েছে, এবং মানুষের আচরণের বিকাশ সংক্রান্ত বহু তথ্য আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছে।

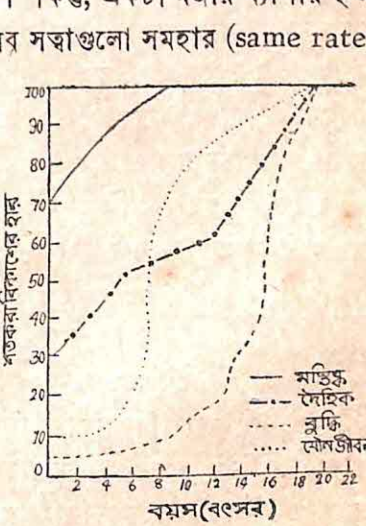
সামঞ্জস্যতা

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ মানুষের বিকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এটা সাধারণের দিক থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয় (Development proceed from general to the particular)। মানুষের প্রাথমিক আচরণগুলো থাকে সামগ্রিক (General mass action)। এর পর ধীরে ধীরে আচরণগুলোর পৃথকীকরণ হয় বিকাশের মাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশুরা ইতস্ততঃ হাত-পা ছোঁড়ে। কোন কিছু পাওয়ার জন্য, সম্পূর্ণ দেহ কাণ্ড, হাত, পা সব কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশঃ যত বড় হয় তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজের পৃথকীকরণ হয়। এখন কিছু পেতে হ'লে সে হাতটাই শুধুমাত্র ব্যবহার করে, সম্পূর্ণ দেহ নয়। **ক্যাথারিন ব্রিজেস** (K. Bridges) এক পরীক্ষার দ্বারা দেখেছেন প্রক্ষোভ বিকাশের ধারাও এই নিয়ম মেনে চলে।

অভিমুখীতা

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ মানুষের জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া খুবই জটিল (Development is Complex)। মানুষ নিজেই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নানান গতিশীল সত্বার এক জটিল সমন্বয়। কিন্তু, একটা মজার ব্যাপার হ'ল বিকাশের ব্যাপারে এই সব সত্বাগুলো সমহার (same rate) বজায় রাখে না। যেমন, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তার দৈহিক বিকাশের তুলনায় মানসিক বিকাশ বেশী হয়, আবার কোন সময় মানসিক বিকাশের তুলনায় দৈহিক বিকাশ অনেক বেশী পরিমাণে হয়। আবার একই ক্ষেত্রেই কোন কোন সময় এই বিকাশের হার বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন হারে হয়। মনোবিদ্ **বেলে** (N. Bayley)[1] ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে তার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বৎসরের ব্যবধানে কোন বিশেষ শিশুর

জটিলতা



1. In any given characteristics, such as height or inteligence, a child may, over a period of years, shift from heigh to average to low and back to average again, as compared with his age group"—N. Baley; Individual patterns of Development : Child development.

বিশেষ এক দিকের বিকাশ একটা নিয়ম মেনে চলে। প্রথম তার হার বেশী হয়, পরে তা বয়সানুপাতিক গড় হারে হয় এবং পরে তার হার আরও কমে এবং সবশেষে সেই হার আবার, গড় হারের পর্যায়ে ফিরে আসে। যাই হউক, একই বয়সে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশের হার কি রকম ভাবে পৃথক হয় তা আগের পাতায় ছবির সাহায্যে দেখানো হচ্ছে।

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ বিকাশের ধারা ব্যক্তিজীবনে ঐক্য বজায় রাখে (Development is Unified)। অর্থাৎ, মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের মধ্যে একটা ঐক্য বজায় থাকে এবং এক ধরনের বিকাশ আর একধরনের বিকাশে সহায়তা করে। অনেক সময় দৈহিক বিকাশ মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে; আবার কখনও মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশকে তরান্বিত করে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনে ঐক্য বজায় রাখে। সুতরাং, তার জীবন বিকাশকে অনুশীলন করতে হলে, সামগ্রিকভাবে করতে হবে। এবং যে কোন বিকাশের প্রচেষ্টা তার জীবনের সমস্ত দিককে যাতে স্পর্শ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঐক্য

॥ **সপ্তমতঃ** ॥ ব্যক্তিজীবনে বিকাশের ধারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে (Development pattern maintains individual difference)। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বয়সের একজন শিশুর বিকাশের ধারার সঙ্গে সেই বয়সের অন্য কোন শিশুর বিকাশের মিল থাকে না। সাধারণভাবে বিকাশ বিশেষ বয়সের ক্ষেত্রে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চললেও, ব্যক্তিজীবনে তা বিশেষ রূপ নেয়। তাই ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (Individual difference সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

স্বাতন্ত্র্য

॥ **অষ্টমতঃ** ॥ ব্যক্তিজীবনের বিকাশ তার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল (Development is the result of interaction between heredity and environment)। বিকাশ দুটো শর্তের উপর নির্ভর করে—বংশগতি (Heredity) এবং পরিবেশ (environment)। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন এই দুটো প্রক্রিয়াই বিকাশের কারণ। কোন ব্যক্তির বিকাশ তার জন্মগতভাবে পাওয়া বিভিন্ন ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এবং বিশেষ মুহূর্তে পরিবেশ তার উপর কি ভাবে প্রতিক্রিয়া করছে তার উপর নির্ভর করে।

বংশ গতি ও পরিবেশের প্রভাব

বিকাশ প্রক্রিয়া অনুশীলনের পদ্ধতি
[Methods of studying Development]

মানুষের জীবন বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল মনোবিদ্‌গণ ব্যবহার করেন। যেমন **পর্যবেক্ষন** (Observation),

ইন্টারভিউ (Interview), **প্রশ্নগুচ্ছ** (Questionnaire), **অভীক্ষা** (Test) এমন কি **পরীক্ষণও** (Experiment)। বিকাশের তাৎপর্য বিচার করে এই সব কৌশল (techniques) গুলোকে আমরা দু'টো সাধারণ পদ্ধতিতে শ্রেণীভুক্ত করতে পারি— [এক] **ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি (Cross sectional method)** এবং [দুই] **আলম্বিক পদ্ধতি (Longitudinal Method)**।

বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতিকে অনেক সময়, অনুভূমিক পদ্ধতি (Horizontal method) বা মাননির্ণায়ক পদ্ধতিও (normative method) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বিকাশ অনুশীলনের জন্য, একই বয়সের একদল ব্যক্তিকে পরীক্ষার্থী (Subject) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাদের কোন এক বিকাশের দিক থেকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষন বা পরিমাণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সেই বিশেষ বয়সের ঐ বিকাশের ক্ষেত্রের গড় (Average or Mean) নির্ণয় করা হয়। এই গড়কে ঐ বয়সের সব ছেলের বিকাশের হার বা মূল্যমাণ (Norm) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন ১৫ বছর বয়সের একদল ছেলের ওজন পরিমাপ করে আমরা বলতে পারি সাধারণতঃ, ঐ বয়সের ছেলের গড় ওজন কি রকম হয়। এই ধরনের পদ্ধতির দ্বারা বিকাশ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার প্রয়োগ খুবই সীমিত। কারণ এ পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যক্ষেত্রে কোন মূল্য নেই। যেমন ১৫ বছর বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন বিকাশের সিদ্ধান্ত, ১৬ বৎসর বয়সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার এই পদ্ধতির সিদ্ধান্তের ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন তাৎপর্য নেই। কোন বিশেষ ১৫ বৎসর বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন কত হবে তা এর থেকে বলা যায় না। এই সব অসুবিধা থাকার জন্য এর পরিবর্তে আলম্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

আলম্বিক পদ্ধতিকে (Longitudinal or vertical method) অনেক সময় বিকাশমূলক পদ্ধতিও (Genetic method) বলা হয়। এই পদ্ধতিকে ব্যক্তি বা দলকে নির্দিষ্ট রাখা হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের বিকাশের ধারা অনুশীলন করা হয়। দল হিসেবে নিলেও এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করা হয়। দৈহিক ওজনের বিকাশ সম্পর্কে অনুশীলন করার জন্য এক দল ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং বিভিন্ন বয়সে ওজনের তারতম্য লক্ষ্য করা হতে থাকে। এর ফলে, কোন বিশেষ বয়সের মূল্যমাণ (Norm), বা কোন বিশেষ ব্যক্তির বিকাশের রীতি বা সামগ্রিকভাবে বিকাশের ধারার প্রগতি, সব কিছু সম্পর্কেই জানা সম্ভব হয়। তাই আজকাল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ অনুশীলনের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

আলম্বিক পদ্ধতি

শিক্ষা ও জীবন বিকাশ
[Education and development]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। যে কোন শিক্ষা প্রচেষ্টাই ব্যক্তিজীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শিক্ষা প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিজীবনের কল্যাণে লাগাতে হলে শিক্ষকের এই বিকাশের ধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকার দরকার। তবে বিকাশ বলতে আমরা শুধুমাত্র মানসিক বিকাশকে (Mental development) বুঝি না। অনেকের ধারণা আছে, শিক্ষা কেবলমাত্র মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে, অন্য কোন বিকাশে নয়। কিন্তু, শিক্ষার উদ্দেশ্য (aim of education) বা বিকাশের নিয়ম (Law of development) সে কথা বলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। শুধুমাত্র মানসিক বিকাশকে সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলা যায় না। আবার ব্যক্তিজীবনের বিকাশের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ ঐক্যবদ্ধভাবে হয়। তাই দৈহিক বিকাশ বা সামাজিক বিকাশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানসিক বিকাশ করা সম্ভব নয়। তাই বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে **দৈহিক বিকাশ (Physical development), মানসিক বিকাশ (Mental development), বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development)** এবং **প্রক্ষোভিক বিকাশ (Emotional development)** সম্পর্কে উল্লেখ করার দরকার। কারণ, তারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে, তাই আমরা তাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি।

আলোচনা

বিকাশ যেমন ব্যক্তির জীবনে পৃথক পৃথক ভাবে হয়, তেমনি সকল ব্যক্তি একটা বিশেষ মানের (Standard) পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করে। এই মান বয়সের দিক থেকে হতে পারে বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্তরের দিক থেকে আসতে পারে। কোন বিশেষ শ্রেণীতে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকের যদি ধারণা না থাকে, তার শিক্ষার্থীদের বিকাশের মান (Development norm) কি, বা তিনি ঐ বিশেষ বয়সের জন্য কি গুণ বিকাশের চেষ্টা করবেন, তা'হলে তার সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই এই অংশে আমরা জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর (stages of development) সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

জীবন বিকাশের স্তর

বিকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি সম্পর্কে না জানলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান করতে অসুবিধা হয়। তিনি শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুশীলন করবেন এবং

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

সেই অনুযায়ী তাদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি রচনা করবেন। তাই এই অংশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতি (Individual difference) সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

বংশগতি ও পরিবেশ

সবশেষে, জীবন বিকাশের কারণ সম্পর্কে না জানলে বিকাশ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বিকাশের কারণ হিসেবে মনোবিদ্‌গণ **বংশ গতি (Heredity)** এবং **পরিবেশকে (Environment)** নির্দেশ করেছেন। তাই এই অংশ সেই আলোচনা দিয়ে শেষ করা হয়েছে, বিকাশের এই দুই শর্ত (condition) কি ভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

কম থাকে। রক্তবহা নালী (veins and arteries)গুলোও দেখা গেছে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত খুব দ্রুত হারে বাড়ে কিন্তু তারপরে তাদের বিকাশের হার কমে যায়। বিভিন্ন বয়সে ছেলেদের এবং মেয়েদের রক্তের চাপের পরিমাণেরও তারতম্য দেখা যায়। ফুস্‌ফুসের আয়তনও ধীরে ধীরে বাড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। পাচন নালীর বিকাশের ফলে খাদ্য হজমের জন্য অনেক বেশী সময় লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাশয় অনেকক্ষণ মূত্র ধারণ করতে সক্ষম হয়। এমনি প্রায় সমস্ত রকম দেহ যন্ত্রের আয়তন ও কাজের বিকাশ হয়। দেহযন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হ'ল গ্রন্থির (Gland)। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিগুলোর ক্রিয়া বাড়তে থাকে এবং তারা অন্যান্য দেহ যন্ত্রের বিকাশকে সহায়তা করে। যৌন গ্রন্থি (Gonads)এর বিকাশ অনেক পরে হয় কৈশোরের প্রারম্ভে।

এ ধরনের দেহ যন্ত্রের বিকাশ ছাড়াও, দেহযন্ত্রের কাজেরও বিকাশ হয় জন্মের পর থেকে। বিশেষভাবে কর্মেন্দ্রিয় বা পেশীর কাজের দক্ষতা বাড়ে। এই ধরনের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor development) বলা হয়। দেহের শক্তি, সমন্বয়, তৎপরতা, এবং কর্মেন্দ্রিয় সমূহের নিখুঁত ব্যবহারের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলা হয় [The development of strength, coordination, speed and precision in the use of muscle is called motor development)।

দেহ সঞ্চালনের বিকাশ

শিশুর জীবন বিকাশের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে পেশীর মধ্যে সমন্বয়ের কাজ এগিয়ে চলে। শিশুদের দু' মাস বয়সে ঘাড় শক্ত হয়, শুয়ে শুয়ে মাথাটা তুলতে পারে। চার মাস বয়সে কেউ সাহায্য করলে ঘাড় শক্ত করে সোজা হয়ে বসতে পারে। ছয় মাস বয়সে বসে থাকতে পারে। আট মাস বয়সে ধরে রাখলে দাঁড়াতে পারে, প্রায় ঐসময়ে হামাগুড়ি দিতে শিখে। দশ থেকে এগার মাসে অন্যের হাত ধরে হাঁটতে পারে। চৌদ্দ মাস বয়সে কোন সাহায্য ছাড়াই দাঁড়াতে পারে কিন্তু হাঁটতে গেলেই পড়ে যায়। সবশেষে প্রায় পনেরো মাস বয়সে একা একা হাঁটতে পারে। এমনিভাবে তার দেহের পেশীর ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয় এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, দাঁড়ানোর বা চলার কাজ করে। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, শিশুদের যে সময় লাগে, অন্যান্য পেশীর সমন্বয়মূলক কাজ শিখতে অত সময় লাগে না। একথাও অনেকে বলেছেন, হাঁটার বিকাশের অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে তারা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। নিজে খাওয়া, নিজে কাপড় পরা, দৌড়ানো, লাফানো, গাছে চড়া, ঢিল ছোঁড়া এই ধরনের সঞ্চালনমূলক বিকাশের ফলে হয়ে থাকে। সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিসত্বার বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাই

যে শুধু বাড়ে তাই না, এরা শিশুর সামাজিক জীবনের বিকাশেও সহায়তা করে। এই ধরনের সঞ্চালনমূলক বিকাশের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

॥ এক ॥ বিভিন্ন মানব ভ্রূণ এবং শিশুর ঠিক জন্মের পরের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (Mass action) করার ক্ষমতা থাকে মাত্র। যে কোন পরিস্থিতিতে তারা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ দেহের সাহায্যে প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু সঞ্চালনের ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজ পৃথক হয়। অর্থাৎ, সঞ্চালনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই বিকাশের প্রক্রিয়া সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে ক্রমশঃ বিশেষের দিকে (From mass action to specific action) যায়।

সঞ্চালনমূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

॥ দুই ॥ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে দেহের বড় বড় পেশীর সঞ্চালন ক্ষমতার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ছোট পেশীর চেয়ে আগে হয়।

॥ তিন ॥ দেহ সঞ্চালনের বিকাশ দেহের উপর থেকে নীচের দিকে হয়। হারলক (Hurlock) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। একে বলা হয় 'বিকাশের গতির নিয়ম' (Low of developmental direction)। বিকাশ মস্তিষ্কের সঞ্চালন থেকে শুরু হয় বলে একে **সেফালোকডেল্ প্রবণতা** (Cephalocaudal trend) বলা হয়।

॥ চার ॥ এই সঞ্চালনের বিকাশ দেহ কাণ্ডের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি অঙ্গে প্রথম হয়। পরে দূরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হয়। এই কারণে আঙুলের চেয়ে হাতের কাজের সমন্বয় আগে হয়। এই প্রবণতাকে বলা হয় **প্রক্সিমো-ডিস্ট্যাল প্রবণতা** (Proximodistal trend)।

॥ পাঁচ ॥ যুগ্ম অঙ্গগুলোর সঞ্চালন প্রথম স্তরে সমান থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ক্ষমতা একটা অঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ, শিশু অবস্থায় দুটো হাতই সমান চলে, কিন্তু পরে একটা হাতের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

॥ ছয় ॥ সঞ্চালনমূলক বিকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশী সঞ্চালনের পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশীয় শক্তির অপচয় কমে যায়। পেশী ঠিক প্রয়োজনীয় সঞ্চালন টুকুই করে। কোন ছোট্ট একটা জিনিসকে ধরার জন্য শিশুরা সম্পূর্ণ হাতের সঞ্চালন করে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে লক্ষ্য করা যায় হয়তো শুধু আঙ্গুল সঞ্চালন করে তাকে ধরা যায়।

॥ সাত ॥ সবশেষে, একথা বলা যায়, সঞ্চালনমূলক বিকাশ একই হারে হয়, দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশের মত তার হার কখনও বেশী বা কখনও কম হয় না। তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকতে পারে। কেউ হয়তো দেরীতে

কম থাকে। রক্তবহা নালী (veins and arteries)গুলোও দেখা গেছে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত খুব দ্রুত হারে বাড়ে কিন্তু তারপরে তাদের বিকাশের হার কমে যায়। বিভিন্ন বয়সে ছেলেদের এবং মেয়েদের রক্তের চাপের পরিমাণেরও তারতম্য দেখা যায়। ফুসফুসের আয়তনও ধীরে ধীরে বাড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। পাচন নালীর বিকাশের ফলে খাদ্য হজমের জন্য অনেক বেশী সময় লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাশয় অনেকক্ষণ মূত্র ধারণ করতে সক্ষম হয়। এমনি প্রায় সমস্ত রকম দেহ যন্ত্রের আয়তন ও কাজের বিকাশ হয়। দেহযন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হ'ল গ্রন্থির (Gland)। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিগুলোর ক্রিয়া বাড়তে থাকে এবং তারা অন্যান্য দেহ যন্ত্রের বিকাশকে সহায়তা করে। যৌন গ্রন্থি (Gonads)এর বিকাশ অনেক পরে হয় কৈশোরের প্রারম্ভে।

এ ধরনের দেহ যন্ত্রের বিকাশ ছাড়াও, দেহযন্ত্রের কাজেরও বিকাশ হয় জন্মের পর থেকে। বিশেষভাবে কর্মেন্দ্রিয় বা পেশীর কাজের দক্ষতা বাড়ে। এই ধরনের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor development) বলা হয়। দেহের শক্তি, সমন্বয়, তৎপরতা, এবং কর্মেন্দ্রিয় সমূহের নিখুঁত ব্যবহারের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলা হয় [The development of strength, coordination, speed and precision in the use of muscle is called motor development)। শিশুর জীবন বিকাশের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে পেশীর মধ্যে সমন্বয়ের কাজ এগিয়ে চলে। শিশুদের দু' মাস বয়সে ঘাড় শক্ত হয়, শুয়ে শুয়ে মাথাটা তুলতে পারে। চার মাস বয়সে কেউ সাহায্য করলে ঘাড় শক্ত করে সোজা হয়ে বসতে পারে। ছয় মাস বয়সে বসে থাকতে পারে। আট মাস বয়সে ধরে রাখলে দাঁড়াতে পারে, প্রায় ঐসময়ে হামাগুড়ি দিতে শিখে। দশ থেকে এগার মাসে অন্যের হাত ধরে হাঁটতে পারে। চৌদ্দ মাস বয়সে কোন সাহায্য ছাড়াই দাঁড়াতে পারে কিন্তু হাঁটতে গেলেই পড়ে যায়। সবশেষে প্রায় পনেরো মাস বয়সে একা একা হাঁটতে পারে। এমনিভাবে তার দেহের পেশীর ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয় এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, দাঁড়ানোর বা চলার কাজ করে। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, শিশুদের যে সময় লাগে, অন্যান্য পেশীর সমন্বয়মূলক কাজ শিখতে অত সময় লাগে না। একথাও অনেকে বলেছেন, হাঁটার বিকাশের অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে তারা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। নিজে খাওয়া, নিজে কাপড় পরা, দৌড়ানো, লাফানো, গাছে চড়া, ঢিল ছোঁড়া এই ধরনের সঞ্চালনমূলক বিকাশের ফলে হয়ে থাকে। সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিসত্বার বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাই

দেহ সঞ্চালনের বিকাশ

যে শুধু বাড়ে তাই না, এরা শিশুর সামাজিক জীবনের বিকাশেও সহায়তা করে। এই ধরনের সঞ্চালনমূলক বিকাশের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

সঞ্চালনমূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

॥ এক ॥ বিভিন্ন মানব ভ্রূণ এবং শিশুর ঠিক জন্মের পরের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (Mass action) করার ক্ষমতা থাকে মাত্র। যে কোন পরিস্থিতিতে তারা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ দেহের সাহায্যে প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু সঞ্চালনের ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজ পৃথক হয়। অর্থাৎ, সঞ্চালনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই বিকাশের প্রক্রিয়া সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে ক্রমশঃ বিশেষের দিকে (From mass action to specific action) যায়।

॥ দুই ॥ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে দেহের বড় বড় পেশীর সঞ্চালন ক্ষমতার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ছোট পেশীর চেয়ে আগে হয়।

॥ তিন ॥ দেহ সঞ্চালনের বিকাশ দেহের উপর থেকে নীচের দিকে হয়। **হারলক** (Hurlock) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। একে বলা হয় 'বিকাশের গতির নিয়ম' (Low of developmental direction)। বিকাশ মস্তিষ্কের সঞ্চালন থেকে শুরু হয় বলে একে **সেফালোকডেল্ প্রবণতা** (Cephalocaudal trend) বলা হয়।

॥ চার ॥ এই সঞ্চালনের বিকাশ দেহ কাণ্ডের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি অঙ্গে প্রথম হয়। পরে দূরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হয়। এই কারণে আঙুলের চেয়ে হাতের কাজের সমন্বয় আগে হয়। এই প্রবণতাকে বলা হয় **প্রক্সিমো-ডিস্ট্যাল প্রবণতা** (Proximodistal trend)।

॥ পাঁচ ॥ যুগ্ম অঙ্গগুলোর সঞ্চালন প্রথম স্তরে সমান থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ক্ষমতা একটা অঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ, শিশু অবস্থায় দুটো হাতই সমান চলে, কিন্তু পরে একটা হাতের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

॥ ছয় ॥ সঞ্চালনমূলক বিকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশী সঞ্চালনের পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশীয় শক্তির অপচয় কমে যায়। পেশী ঠিক প্রয়োজনীয় সঞ্চালন টুকুই করে। কোন ছোট্ট একটা জিনিসকে ধরার জন্য শিশুরা সম্পূর্ণ হাতের সঞ্চালন করে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে লক্ষ্য করা যায় হয়তো শুধু আঙ্গুল সঞ্চালন করে তাকে ধরা যায়।

॥ সাত ॥ সবশেষে, একথা বলা যায়, সঞ্চালনমূলক বিকাশ একই হারে হয়, দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশের মত তার হার কখনও বেশী বা কখনও কম হয় না। তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকতে পারে। কেউ হয়তো দেরীতে

হাঁটতে শিখে, আবার, কেউ হয়তো খুব কম বয়সে শিখে। কিন্তু প্রত্যেক শিশুর জীবনে হাঁটার জন্য যে পেশীয় সমন্বয় হয় তা একই পর্যায় মেনে চলে।

ব্যক্তিজীবনে দৈহিক বিকাশের গুরুত্ব
[Importance of Physical development in individual's life]

দৈহিক বিকাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহ সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সুস্থ স্বাভাবিক দেহ সুস্থ মনের পরিচায়ক। দৈহিক শক্তি, দৈহিক কর্মক্ষমতা, দৈহিক আয়তন, ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। সমাজের অন্য ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের ক্ষমতা কি আছে, সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাই দৈহিক বিকাশকে মনোবিদগণ ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের একটা অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মানসিক দিক থেকে, এই দৈহিক বিকাশ, একদিকে যেমন আত্মশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে, তেমনি অন্যদিকে অন্যকে শ্রদ্ধা করার মনোভাবও জাগিয়ে তোলে। দৈহিক বিকাশ মানুষের মধ্যে এক পরিপূর্ণতার অনুভূতি আনে, যা স্বাভাবিকভাবে তাকে শৃঙ্খলা মেনে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে দেহ সঞ্চালন-মূলক বিকাশ (Motor development) ব্যক্তির কর্মক্ষমতাকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে তোলে। যথার্থ বয়সে ব্যক্তির মধ্যে যদি যথার্থ সঞ্চালনমূলক ক্ষমতার বিকাশ না হয়, তা'হলে তার মধ্যে হীনমন্যতার ভাব জাগে। এই হীনমন্যতার ভাব তার জীবনের উন্নতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়, যে সব শিশুর বয়সোপযোগী দেহ সঞ্চালনের বিকাশ হয় নি, তারা এই হীনমন্যতার জন্য সাথীদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে চায় না। ফলে তাদের সামাজিক বিকাশও ব্যহত হয়। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে দেহ বিকাশ ও দেহ সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনে একান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে।

ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ও দৈহিক বিকাশ

শিক্ষা ও দৈহিক বিকাশ
[Education and Physical development]

শিক্ষার ক্ষেত্রে, দৈহিক বিকাশের গুরুত্বকে আর বর্তমানে অস্বীকার করা যায় না। কারণ শিক্ষার্থীর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তার জৈবিক সত্ত্বা। তাই সেই জৈবিক সত্ত্বাটাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দিকের বিকাশ সম্ভব নয়। তাছাড়া যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইদৈহিক বিকাশ তার মানসিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিকের বিকাশের সহায়তা করে। সুতরাং, প্রগতিশীল আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ

দৈহিক বিকাশ ও বিদ্যালয়

হবে, শিক্ষার্থীর এই দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু, এখানে একটা সমস্যা দেখা দেয়, তা'হল দৈহিক বিকাশ নিজস্ব নিয়মেই হয়ে থাকে। তাকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের দ্বারা আনা যায় না। তা'হলে বিদ্যালয় বা শিক্ষকের এ সম্পর্কে কি দায়িত্ব থাকতে পারে? দায়িত্ব কিছু নিশ্চয় আছে। সে দায়িত্ব শিক্ষক দু'দিক থেকে পালন করতে পারেন। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ ঠিক মত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক বিকাশের নীতি এবং পরিমাণকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাভিমুখী পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে।

দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা

ব্যক্তিজীবনের বিকাশ যেহেতু দৈহিক বিকাশের উপর নির্ভর করে, সেহেতু, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, সেই ধারাকে অনুশীলন করা। শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দায়িত্ব শিক্ষককে গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁরা প্রয়োজন হ'লে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। কোন বিশেষ শিক্ষার্থী যদি দৈহিক বিকাশের দিক থেকে ধীর গতি সম্পন্ন হয়, তা'হলে কি ভাবে তার বিকাশের হার বাড়ানো যায়, সে সম্পর্কে, শিক্ষককে অবগত হতে হবে, এবং সচেষ্ট হ'তে হবে। যদি কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর এই বিকাশের হার বেশী হয়, তা'হলে তাকেও তিনি দলের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সহায়তা করবেন। এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

দেহ-চর্চ্চার সুযোগ

শিক্ষকের কাজ বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ, শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশে অনেকাংশে সহায়তা করে। যদিও দৈহিক বিকাশের ধারা প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ, তবুও পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে তাকে কিছুটা তরান্বিত করা যায়। বা, অনেক সময় চর্চার দ্বারা দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালনের দক্ষতাকে বাড়ানো যায়; দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি সাধনও হয়। তাই খেলাধূলা, ব্যায়াম, অন্যান্য দেহ চর্চামূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম (exercise) আছে, যার দ্বারা দেহের কোন বিশেষ অঙ্গের শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। যদি, তিনি লক্ষ্য করেন কোন বিশেষ শিক্ষার্থী দৈহিক বিকাশের কোন একটা দিকে পিছিয়ে আছে, তারজন্য তিনি ঐ ধরনের বিশেষ ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে, বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে এমন সব সহপাঠক্রমিক কাজ (co-curricular activities) রাখবেন যার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা তাদের দেহ সঞ্চালনের সুযোগ পায় তার চেষ্টা সব সময় করতে হবে। বিশেষভাবে, খেলাধূলা, হাতের কাজ, দৈহিক শ্রমমূলক কাজকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অন্যদিকে, শিক্ষার্থীর ধারাকে শিক্ষার কাজে শিক্ষককে লাগাতে হবে। আমরা জেনেছি, বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের দৈহিক বিকাশ হয়। এই জ্ঞানকে শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদান কাজে লাগাবেন। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। শিক্ষককে এদিকে নজর দিতে হবে এবং তাদের এই সব চাহিদা যেন তারা সহজে মেটাতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে। বিশেষভাবে কৈশোরে শিক্ষার্থীদের যে যৌনজীবনের বিকাশ হয়, তারফলে, তাদের মধ্যে অনেক কিছু জানার কৌতূহল দেখা দেয়। শিক্ষার মধ্যে এই সংক্রান্ত জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা পায় শিক্ষককে সেদিকে নজর দিতে হবে। মস্তিষ্কের কোষের বিকাশের ফলে, শিক্ষার্থীদের গ্রহণাত্মক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ে। তার এই বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করে, তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে না পারলে, তার বিকাশে পরিপূর্ণ সহায়তা করা হবে না।

পাঠদানের কাজ ও দৈহিক বিকাশ

সবশেষে, একটা কথা মনে রাখার দরকার অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির বুদ্ধির (intelligence) সম্পর্ক আছে। সুতরাং, শিক্ষক চেষ্টা করলেও সব সময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ করতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের যে বৌদ্ধিক বিকাশ হয়, তার থেকে কিছু ফল, তিনি দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করতে পারেন। অনেক সময়, দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা, ঐ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, দেহের সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্ক জ্ঞান যদি শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়, তা'হলে তাদের দৈহিক বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। এই স্বাস্থ্য সম্মত জ্ঞান শিক্ষক ছাত্রদের দিবেন।

দৈহিক বিকাশ ও বুদ্ধি

প্রশ্নাবলী

1. Trace the physical development of a child from infancy to adolescents. [C. U. B. T. '65 part]

[সম্পূর্ণ অংশ]

2. Discuss the educational implication of the physical development of the children during infancy. [পৃঃ ১৮০-১৮২]
3. Write notes on :

(a) General characteristics of physical development. [পৃঃ ১৭৪-১৭৭]

(b) Motor development. [পৃঃ ১৭৮-১৭৯]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মানসিক বিকাশ
[MENTAL DEVELOPMENT]

মানসিক বিকাশ মানুষের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধির ধারাকে আমরা একত্রে বলি, **মানসিক বিকাশ** (Mental development)। জন্মের পর থেকে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। সদ্য-জাত শিশুর মধ্যে যে সব সরল মানসিক প্রক্রিয়া দেখা যায়, তা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে এবং ক্রমেই তারা জটিল হতে থাকে। তাদের এই জটিলতা বৃদ্ধির জন্য, অনেক ক্ষেত্রে যথার্থভাবে অনুশীলন করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। **জন্ম অবস্থা থেকে প্রত্যক্ষণ** (Perception), **স্মৃতি** (Memory), **চিন্তন** (Thinking), **কল্পনা** (imagination) **ইত্যাদির ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকাশ হয়। ব্যক্তির এই সমস্ত মানসিক ক্ষমতার বিকাশকেই মানসিক বিকাশ বলা হয়।** অনেকে এর নাম দিয়েছেন বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development)। তবে বৌদ্ধিক বিকাশ বলতে, শুধুমাত্র বুদ্ধির বিকাশকে বুঝায় না। মানুষের বিচার বিবেচনামূলক দিকের বিকাশ হয়, এই সব ক্ষমতার মাধ্যমে বলে, তাঁরা তাকে এই নাম দিয়েছেন। তাছাড়া বুদ্ধি মানুষের এমন একটা মানসিক ক্ষমতা যা অন্য সব রকম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাই মনোবিদগণের মধ্যে এই ধরনের নামকরণের প্রবণতা দেখা যায়।

মানসিক বিকাশ কি?

মানসিক বিকাশের বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ এখানে করা হ'ল।

মানসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

॥ এক ॥ মানসিক বিকাশ, অর্থাৎ, বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তন, বৃদ্ধি বা পরিমনন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের পর থেকে বাড়তে থাকে। কিন্তু, বৃদ্ধ বয়সে, তার এই সব ক্ষমতার হ্রাস পায়।

॥ দুই ॥ মানসিক বিকাশের হার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম থাকে। কোন মানসিক বৈশিষ্ট্য জন্মের পর থেকে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। আবার কোন মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অনেক দেরীতে শুরু হয়।

॥ তিন ॥ মানসিক বিকাশ, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় বিশেষ ধরনের কোন অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

॥ চার ॥ মানসিক বিকাশ ব্যক্তির, শিখন (Learning), পরিমনন (Maturation) এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এ গুলোও বিশেষ শ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অন্তর্গত।

॥ পাঁচ ॥ মানসিক বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও সাধারণভাবে মানসিক বিকাশ একটা বিশেষ নিয়ম মেনে চলে তবু পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে এই নিয়মের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়।

॥ ছয় ॥ মানসিক বিকাশ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জটিল রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার পরস্পর নির্ভরতার জন্ত তারা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে বিকশিত হয়। এই কারণে জটিলতা দেখা দেয়।

॥ সাত ॥ মানসিক বিকাশ দৈহিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে। বিশেষ-ভাবে স্নায়ুতন্ত্রের সংগঠনের উপর এর নির্ভরশীলতা বেশী। ব্যক্তির মানসিক বিকাশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসেই হয়। এই স্নায়ুতন্ত্র তার অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপন করে।

এই সব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা এক এক করে আলোচনা করব। আলোচনার সময়কালকেও আমরা সীমাবদ্ধ করব জন্ম থেকে কৈশোরের (adolescence) মধ্যে। তারপরেও মানসিক বিকাশ, প্রাপ্ত বয়সে ও বৃদ্ধ বয়সে হ'য়ে থাকে। সে সম্পর্কে আর আলোচনা আমরা বাড়াবো না।

॥ এক ॥ সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের বিকাশ [Development of Sensation and Perception]

সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ হ'ল আমাদের প্রাথমিক বস্তুধর্মী জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়ার জন্ম অবস্থায়, শিশুর কাছে, বিশ্বজগৎ ধোঁয়ার মত আবছা মনে হয়। তার ইন্দ্রিয়গুলোও থাকে অপরিপক্ক এবং অভিজ্ঞতা বর্জিত। তার প্রত্যক্ষণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় পটুত্বের অভাব, যার জন্ত সে কোন বস্তুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য এক সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে না। তার সংবেদনকে পার্থক্য করার (Sensory discrimination) ক্ষমতাও থাকে কম। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়গুলোর বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সংবেদনে আমরা পার্থক্যের ক্ষমতা লক্ষ্য করি। এর পেছনে তার জীবনের অভিজ্ঞতাও বিশেষভাবে কাজ করে। বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে, টক, ঝাল, নুন, তেতো ইত্যাদি স্বাদগুলোকে সে বুঝতে শিখে। লাল, নীল, সাদা, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রঙও বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে শিখতে আরম্ভ করে। ক্রমেই তার এই ধরনের সংবেদনগত পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা জন্মে। পরিমাণগত দিক থেকে বস্তুকে পার্থক্য করার ক্ষমতাও তার মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, জন্ম থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই এই ধরনের সংবেদনগত পার্থক্য নির্ণয় ক্ষমতার বিকাশ হয়। এবং পরবর্তীকালে, এই ক্ষমতার মধ্যে

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

আরও সূক্ষ্মতাবোধ জাগ্রত হয়। এই বোধ পরবর্তীকালে অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। প্রত্যক্ষণ এবং সংবেদন, পরস্পর সংযুক্ত বলে, সংবেদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষণেরও বিকাশ হয়। তবে দেখা গেছে, প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে শিশুর অভিজ্ঞতার প্রভাব আরও অনেক বেশী। তাছাড়া শিশুর মানসিক অবস্থা (Mental set) তার প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির বিশ্বাস (Beliefs), মতামত (Opinion) এবং আদর্শ (Ideals) তার প্রত্যক্ষণের বিকাশে সহায়তা করে। এই সব ক্রমবর্ধমান মানসিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে বলে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের বিকাশ সারা জীবনব্যাপী হয়ে থাকে। যে আদর্শ বা মানসিকতার বশবর্তী হয়ে কোন বস্তুকে সে কৈশোরে প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত বয়সে তার আদর্শ ও মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সেই প্রত্যক্ষণের বস্তুকে সে অন্যভাবে দেখে; আবার বৃদ্ধ বয়সে, তারও পরিবর্তন হয়। তাই সঠিক করে বলা মুশকিল প্রত্যক্ষণের বিকাশ ঠিক কত বয়স পর্যন্ত হয়। শুধু এই টুকু বলা যেতে পারে, যে পর্যন্ত না স্থায়ী জীবনাদর্শ গড়ে উঠছে, সে পর্যন্ত প্রত্যক্ষণেরও পরিবর্তন হতে থাকে।

॥ দুই ॥ ধারণার বিকাশ [Development of Concept]

আমরা অভিজ্ঞতার বস্তুর সঙ্গে যে সাধারণ অর্থ যুক্ত করি তাকেই বলা হয় ধারণা (concept)। ধারণা-উৎপত্তি ও বিকাশ মানুষের জীবন বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণতঃ, শিশুর ঘর, গাছ, গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ অর্থযুক্ত অভিজ্ঞতাকেই আমরা বলি ঘর সম্পর্কে ধারণা (concept of house), গাছ সম্পর্কে ধারণা (concept of tree), গরু সম্পর্কে ধারণা (concept of cow) ইত্যাদি। এই রকমের সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা বিশেষ কোন একটা বস্তুকে বুঝাই না। পাখী বলতে আমরা বিশেষ কোন পাখীকে বুঝাই না, সমগ্র পাখী জাতিকে বুঝাই। মানুষ বলতে কোন বিশেষ মানুষকে বুঝাই না, সমগ্র মানব জাতিকে বুঝাই। এই ধরনের সাধারণ অর্থযুক্ত ধারণা আমাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্টি হয়। তাই ধারণার বিকাশ (development of concept) মানসিক বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর জন্য দরকার হয় পৃথকীকরণ (discrimination) এবং সামান্যীকরণ (generalization)।

ধারণার স্বরূপ

জন্মাবস্থায় শিশুদের মধ্যে এ রকমের ধারণা তো থাকেই না, তাদের অভিজ্ঞতা বা পৃথকীকরণের ক্ষমতাও থাকে কম। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম সামগ্রিক ধারণার উৎপত্তি হয়। যেমন, পাখীর অভিজ্ঞতার জন্য তার প্রথম পাখী সম্পর্কে পৃথক

ধারণা বিকাশের পদ্ধতি

পৃথক অভিজ্ঞতার দরকার। অর্থাৎ, বিভিন্ন পাখীকে সে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যক্ষণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী পর্যায়ে, এই সব অভিজ্ঞতাকে সে বিশ্লেষণ করে পৃথক পৃথক অংশগুলোকে খুঁজে বাহির করে। অর্থাৎ, কাক দেখে সে বুঝতে শিখে, তার ডানা আছে, তার পা আছে, সে উড়তে পারে, ইত্যাদি। বাবুই পাখী দেখে, তারও ঐ রকম বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে, চড়ুই পাখী দেখেও ঐ ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্লেষণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে, এই সব বৈশিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলো সাধারণ অভিজ্ঞতা সে গুলোকে বেছে নেয়। অর্থাৎ, এক জোড়া ডানা আছে, উড়তে পারে এসব গুণগত দিক থেকে যে সব প্রাণী এক, তাদের এক জাতীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার নামকরণ করা হয় 'পাখী'। এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের মাধ্যমে ধারণার বিকাশ হয়। প্রথম প্রথম শিশুদের ধারণা (concept) তাদের অতি নিকটের বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। যেমন, বাবা, মা, বাড়ী, ঘর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। পরে, তার ধারণার আরও বিস্তৃতি হয়। পরবর্তীকালে বিমূর্ত (abstract) বস্তু সম্পর্কেও সে ধারণা করতে পারে।

এছাড়া ধারণা বিকাশের আরও কতকগুলো দিক আছে, যে গুলো সম্পর্কে আমাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এদের মধ্যে গভীরতা ও দূরত্বের ধারণা (concept of distance and depth), বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জন্মাবস্থায় এই গভীরতা ও দূরত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই থাকে না। পরে ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত বস্তুর দূরত্ব ও গভীরতা সম্পর্কে তাদের সামন্যই ধারণা থাকে। ঠিকমত ভাবে, তারা দৈর্ঘ্য বিচার করতে পারে না। তবে তাদের সাধারণভাবে উপর-নীচ, ভেতরে-উপরে, ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মায় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু, দেখা গেছে সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের গভীরতা ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। পরে শিক্ষার প্রভাবে নয়-দশ বৎসর বয়সের মধ্যে এ ধারণা বিমূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। যেমন, ম্যাপ দেখার ব্যাপারে যে রকমের ধারণা প্রয়োজন তার বিকাশ এই বয়সে হয়। সময় সম্পর্কে ধারণাও (Time concept) দেখা গেছে ধীরে ধীরে বিকাশ হয়। ব্র্যাড্লি (N.C. Bradley) এক পরীক্ষা থেকে দেখেন, এই সময়ের ধারণা শিশুদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। দেখা গেছে পাঁচ বৎসর বয়সে, তাদের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। কিন্তু আরও সূক্ষ্ম সময় জ্ঞান পরবর্তীকালে বিকশিত হয়। নয়-দশ বৎসরের মধ্যে দেখা গেছে, অনেক বেশী দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। বারো থেকে তেরো বৎসরের ছেলেদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তারা বিশেষ সময় কাল

ধারণা বিকাশের বিভিন্ন দিক

(Duration) সম্পর্কে সঠিকভাবে বলতে পারে। এই বয়সের পরেও সময় সম্পর্কে ধারণার আরও বিকাশ হয়। এই পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা না আসা পর্যন্ত তারা সূক্ষ্ম সময়কালের তফাত করতে পারে না। শিশুর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণাও (Number concept) ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। সংখ্যামূলক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা, স্মৃতির বিকাশ, প্রভৃতি শিশুর সংখ্যার ধারণায় সহায়তা করে। শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন মনোবিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন, প্রায় এগারো-বারো বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সাধারণ পাটিগাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা সুদৃঢ় হয়। বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণাও শিশুদের মধ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকাশ হয়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের বিকাশ নিয়ে এক পরীক্ষা করেন ডাৎস্যে (Dutsche)। তাঁর ঐ পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে আট থেকে পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত (Quantitative and qualitative) সম্পর্কের ধারণার বিকাশ হয়।

বিমূর্ত সম্পর্কে ও নিজের সম্পর্কে ধারণা

ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকেও অনেক ধারণা শিশুদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করে। যেমন—নিজের সম্পর্কে ধারণা (Concept of self), পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা (Concept of inter-personal relation), সৌন্দর্যবোধের ধারণা (Concept of beauty or aesthetic concept), ইত্যাদি ব্যক্তি জীবনের মানসিক বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজের সম্পর্কে ধারণা (Concept of self) প্রথম শুরু হয় নিজের দৈহিক অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে। প্রায় দেড় বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে এই দেহ সচেতনতা দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে তার বিকাশ হয়। পরে ধীরে ধীরে নিজের সঙ্গে অন্যের তফাত করতে শিখে। এই পার্থক্যের বোধ থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পারস্পরিক ধারণার (interpersonal relation) বোধ জাগে। বিশেষভাবে প্রতিবেশী এবং অন্যান্য দলের মধ্যে বাস করতে করতে এই ধারণার বিকাশ শিশুদের মধ্যে হয়। একইভাবে, সৌন্দর্য বোধের ধারণাও অভিজ্ঞতার দ্বারা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। সুস্থ জীবন পরিবেশ শিশুর সৌন্দর্যবোধের ধারণার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ধারণা বিকাশের স্তর

মনোবিদ্‌গণ মানুষের জীবনের ধারণার বিকাশ অনুশীলন করে, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সব রকমের ধারণা, ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। তাঁরা এই ধারণার বিকাশের কয়েকটা পর্যায়ও নির্দেশ করেছেন। যেমন, দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত সাধারণভাবে শিশুদের কোন ধারণার বিকাশ হয় না। তারপর দুই-চার বৎসর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণা জন্মে। পাঁচ-সাত

বৎসরের মধ্যে দেখা গেছে, তারা জটিল পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করতে পারে। আট-এগারো বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ বস্তুকে কেন্দ্র করে ধারণা পরিপূর্ণ হয়। বারো বৎসর থেকে বিমূর্ত চিন্তাকে কেন্দ্র করে ধারণা জন্মাতে থাকে।

॥ তিন ॥ ভাষার বিকাশ
[Development of Language]

ভাষার বিকাশ ও শব্দ ভাণ্ডারের বিকাশ

শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার করে আছে। ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে শুধু নয়, চিন্তন, ধারণা ইত্যাদি বিকাশেও সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অন্যের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করার জন্য ভাষা বিশেষভাবে সাহায্য করে। ভাষার বিকাশ প্রথমে শুরু হয় নাম দিয়ে। পরে, ধীরে ধীরে অন্যান্য শব্দ শিখে। প্রথম, তার শব্দের মধ্যে, বেশী বিশেষ্যের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণতঃ, দুই থেকে তিন বৎসরের মধ্যে মোটামুটিভাবে, মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য যেটুকু ভাষা জানার দরকার, তা শিক্ষা করে। **রোজেন্থাল** (F. Rosenthal), তার বিশেষ এক পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভাষার বিকাশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক (socio-economic) পরিবেশের উপর নির্ভর করে। **ব্রুড্‌বেক্‌** এবং **আরউইন** (Brodbeck and Irwin) আর এক পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, যে অন্যের ভাষার মধ্যেকার ভাবকে বুঝবার ক্ষমতা, চর্চ্চার উপর নির্ভর করে। যে শিশুরা বেশী বয়স্কদের সঙ্গে বেশী মেশার সুযোগ পায়, তাদের ভাষার প্রকাশভঙ্গীর বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়। শুধু প্রকাশ ভঙ্গীর বিকাশ নয়, শব্দ ভাণ্ডারের বিস্তৃতিও ভাষার বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মনোবিদ্‌ **সীসোর্‌** (R. Seashore) এক পরীক্ষা থেকে শিশুদের শব্দ ভাণ্ডারের (Vocabulary) বিকাশের সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত করেছেন। গড়ে, বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা কি পরিমাণ নতুন শব্দ আয়ত্ব করে তার তালিকা নিম্নরূপ :

$1\frac{1}{2}$ বৎসর বয়সের শিশুদের শব্দ ভাণ্ডারে থাকে		১০-১২ টা শব্দ
$2\frac{1}{2}$	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ৩০০ টা শব্দ
৪	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ৫৬০০ টা শব্দ
৫	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ৯৬০০ টা শব্দ
৬	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ১৪৭০০ টা শব্দ
৭	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ২১,২০০ টা শব্দ
৮	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ২৬,৩০০ টা শব্দ
১০	,, ,, ,, ,, ,, ,,	প্রায় ৩৪,৩০০ টা শব্দ

ভাষা বিকাশের আর একটা দিক হ'ল বাক্য (sentence) প্রকাশের দিক। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রায় ছয় বৎসরের মধ্যে বিকশিত হয়। এই বয়সে শিশুরা মোটামুটিভাবে সব রকম বাক্যই বলতে পারে। সার্থকভাবে শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতারও এই বয়সের মধ্যে বিকাশ হয়। এই দু'ধরনের ক্ষমতাই শিশুর পড়ার ক্ষমতা (Reading ability) বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

ভাষার বিকাশের সাধারণ নিয়ম

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ ভাষার শিক্ষা-সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রথমতঃ, ভাষার বিকাশ শিশুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের (socio economic condition), সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয়তঃ, ভাষা বিকাশ, তিন থেকে আট বৎসরের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে হয়। তৃতীয়তঃ ভাষার বিকাশের দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের থেকে সব সময়ে এগিয়ে থাকে। চতুর্থতঃ, ভাষার বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। পঞ্চমতঃ পড়তে শিখার পূর্বে কথা বলার বিকাশ হয়।

॥ চার ॥ চিন্তন ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতার বিকাশ [Development of Thinking and Problem solving]

চিন্তনের স্বরূপ ও বিকাশ

শিশুর চিন্তন ও সমস্যা-সমাধান ক্ষমতার বিকাশ বিশেষভাবে তার ধারণার বিকাশ ও ভাষার বিকাশের উপর নির্ভর করে। চিন্তন নির্ভর করে বিমূর্ত সঙ্কেত নিয়ে আলোচনা করার উপর। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, চিন্তন ও সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা অনেক বেশী বয়সে বিকাশ লাভ করে। শিশুদের যুক্তিশক্তি ক্ষমতা থাকে না বলে, তারা চিন্তা করতে পারে না বা সমস্যা সমাধান করতে পারে না। অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন সাত বৎসর বয়সের পূর্বে চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ হয় না। আবার, অনেকে মনে করেন সাত বৎসরের অনেক আগেই চিন্তাশক্তির বিকাশ শুরু হয়। তবে, সাধারণভাবে এগারো বৎসর বয়সের পর উন্নত ধরনের চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ হয়। চিন্তনের বিকাশ সরলতম পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে জটিল পর্যায়ে উপস্থিত হয়; শিশুর প্রাথমিক চিন্তা বিশেষভাবে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়। পরে তা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে। চিন্তনের বিকাশের আমরা তিনটে স্তর দেখতে পাই। প্রথম তার চিন্তন মূর্ত বিচ্ছিন্ন এক বস্তুকে (Concrete particular) কেন্দ্র করে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, তার ধারণার বিকাশের দরুন, চিন্তন, মূর্ত সাধারণ বস্তুকে (Concrete general) কেন্দ্র করে হ'তে থাকে। সবশেষ পর্যায়ে, চিন্তন, বিমূর্ত ধারণাকে (abstract ideas) কেন্দ্র করে হ'তে থাকে।

শুরু হয়। এই সময় তার স্মৃতি প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাজ করে। কিন্তু দুই বৎসর বয়স থেকে লক্ষ্য করা যায় শিশুরা বিভিন্ন ধরনের বিমূর্ত নির্দেশ (ideational instruction) তারা স্মরন করতে পারে। এই প্রথম দু'বৎসর শিশুর স্মরণ ক্রিয়া বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। সামগ্রিক কোন পরিস্থিতিকে স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু তিন থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে দেখা যায় তারা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে স্মরণ করতে পারে। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশকে পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করার ক্ষমতা আরও পরে বিকাশ লাভ করে। স্মৃতির এই বিকাশ ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

স্মৃতির বিকাশ

কল্পনা শক্তির বিকাশ ও মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে হয়। সাধারণতঃ ভাষা শিক্ষা ও স্মৃতির বিকাশের উপর কল্পনা শক্তির বিকাশ নির্ভর করে। দেড় থেকে দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কল্পনা শক্তির বিকাশ শুরু হয়। এবং এই বিকাশ প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত হয়। তবে ছোট ছেলের কল্পনার সঙ্গে বাল্যের বা কৈশোরের কল্পনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিশুদের মধ্যে বিশেষ ভাবে গ্রহণাত্মক কল্পনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাল্যকাল থেকে সৃজনাত্মক কল্পনা বা বৈজ্ঞানিক কল্পনার বিকাশ আরম্ভ হয়।

কল্পনার বিকাশ

ব্যক্তি-জীবনে মানসিক বিকাশের গুরুত্ব
[Importance of Mental development in Individual's life]

ব্যক্তিজীবনে, দৈহিক বিকাশের মত মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিজীবনের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব প্রকৃতিকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার জন্য দেহযন্ত্রের সঞ্চালনও যেমন প্রয়োজন, মানসিক বিকাশও তেমনি প্রয়োজন। বিশ্ব প্রকৃতির তাৎপর্য সার্থক ভাবে নির্ণয় করার জন্য যথাযথ মানসিক সংগঠন দরকার। এই তাৎপর্য নির্ণয় করার মত সার্থক মানসিক সংগঠন শিশুর জন্মাবস্থায় থাকে না। বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের বিকাশ, বিভিন্ন বস্তুধর্মী জ্ঞান সংগ্রহে তাকে সাহায্য করে। ধারণার বিকাশ (Concept) এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। অভিজ্ঞতার সমন্বয় ছাড়া অভিজ্ঞতার কোন তাৎপর্যই ব্যক্তিজীবনে থাকে না। এই ধারণার বিকাশ ব্যক্তি চিন্তনের বিকাশেও সহায়তা করে। স্মৃতির বিকাশ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ছাড়া ব্যক্তিজীবনের তার কোন প্রয়োগ থাকে না। তাই স্মরণ ক্রিয়ার বিকাশও ব্যক্তিজীবনের বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভাষার বিকাশ (Language develop-

ব্যক্তিজীবন ও মানসিক বিকাশ

ment), ব্যক্তিজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভাষার বিকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে **বার্ণাড** (Barnard)[1] বলেছেন, এই ক্ষমতা ব্যক্তির জীবনের সব কিছু ঘটনাকে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য নির্ণয় করতে সহায়তা করে। সুতরাং, সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে, দেখা যায় মানসিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা
[Mental development and Education]

শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানসিক বিকাশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানসিক বিকাশের গুরুত্বকে দু'দিক থেকে বিচার করতে হবে। **প্রথমতঃ, মানসিক বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে শিক্ষার কাজকে পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার দ্বারা মানসিক বিকাশের ধারাকে তরান্বিত করতে হবে।**

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর মানসিক প্রস্তুতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষককে শিক্ষাদানের জন্য একদিকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করতে হয়, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি তৈরী করতেও হবে। এই প্রস্তুতি স্বাভাবিকভাবে শিশুর মানসিক বিকাশের দিক থেকে।

শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ

শিক্ষককে শিক্ষার্থীর এই মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দিতে হবে। যখন তার মানসিক অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণের বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়, তখন তার শিক্ষাও মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে হওয়ার দরকার। তাই শৈশবের শিক্ষা বিশেষভাবে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক পরিচালনা করবেন। ভাষার বিকাশকে যথাযোগ্যভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে হলে শিক্ষককে বিশেষ বিশেষ বিকাশের স্তরকে পর্যালোচনা করতে হবে। পড়া বা লেখা শিখার পূর্বে, ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। ভাষার মাধ্যমে শিশুরা যাতে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যের মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সে দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু ভাষার বিকাশের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম অসুস্থতা দেখা দেয়। শিক্ষককে, এসব অসুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। অনেক সময়, এক রকম শব্দকে অন্য হিসেবে তার প্রত্যক্ষণ করে, অনেক সময় শব্দ বা বাক্য লিখতে লিখতে শব্দ বাদ দিয়ে চলে যায়, কোন সময় বর্ণ বিপর্যয়ও হয়। এই ধরনের অসুবিধা যাতে দূর করা যায়

1. "It permits him to behave more intelligently by trying together the past, present and future. It captures concepts which are useful in solving problems"—Psychology of learning and teaching—Barnard.

তার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে। সমস্যা সমাধানের বিকাশের ব্যাপারেও শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। শিক্ষককে মনে রাখার দরকার, ছোট ছেলেদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং বয়স্কদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এক নয়। সুতরাং, শিক্ষককে তাদের সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নির্বাচন করতে হবে। সমস্যা তাদের বিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচন না করলে, শিক্ষার্থীরা তা সমাধান করতে পারবে না এবং বার বার অকৃতকার্যতার ফলে তাদের মনে হতাশার ভাব সৃষ্টি হবে। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এ ব্যাপারে। বৌদ্ধিক বিকাশ বা সামগ্রিকভাবে মানসিক বিকাশ সম্পর্কে একটা কথা শিক্ষকের মনে রাখার দরকার, যে এই বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রেখে, মানসিক বিকাশ যে প্রস্তুতি তৈরী করে দেবে, তাই নিয়েই শিক্ষককে কাজ করতে হবে। এই জন্য শিক্ষকের এই বিকাশের ধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার দরকার।

মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা

অন্যদিক থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি, মানসিক বিকাশ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই অভিজ্ঞতা আসে শিক্ষার মাধ্যমে। তাই শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশেই সন্তুষ্ট থাকবেন না, তার মানসিক বিকাশের পরিমাণকে যাতে বাড়ানো যায় তার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের একটা দিক হ'ল মানসিক বিকাশের দিক। সেই মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে যেমন হয়, আবার প্রচেষ্টার দ্বারা তাকে বাড়ানো যায়। ভাষার বিকাশ চর্চ্চার দ্বারা বাড়িয়ে তোলা যায়। তাই শিশুকে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করা যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা চর্চ্চার সুযোগ পাবে এবং তাদের শব্দ ভাণ্ডারকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাবে। সংখ্যার ধারণাও (Number) শিক্ষার দ্বারা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। সংখ্যা তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বোধগম্যতা শিক্ষার সাহায্য ছাড়া বিকাশ করা যায় না। বিভিন্ন বস্তু বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা (concept) বিশ্লেষণ ছাড়া বিকাশ লাভ করে না। এই ক্ষমতার বিকাশের জন্য শিক্ষক পাঠ্য বস্তু উপস্থাপনের সময়, তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। এর ফলে তাদের সামান্যীকরণের অনেক সুবিধা হবে। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা ও মানসিক-বিকাশ পরস্পর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষকের মানসিক বিকাশ সম্পর্কে যেমন সাধারণ ধারণা থাকার দরকার, অন্যদিকে, শিক্ষার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তার সচেষ্ট হওয়ার দরকার।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. Trace the intellectual development of a child from infancy to adolescence. [পৃঃ ১৮৩-১৯২] [C. U. B. T. '65 Part]
2. Briefly discuss the mental growth of the child from infancy to adolescence. Discuss the educational implication of such growth. [সম্পূর্ণ অংশ]
3. Discuss the role of language development and concept formation in the mental development of the children. [পৃঃ ১৮৪-১৮৯]
4. Write notes on the following.
   (a Intellectual development. [পৃঃ ১৯০-১৯১]
   (b) Language development. [পৃঃ ১৮৮-১৮৯]
   (c) Development of concept. [পৃঃ ১৮৫-১৮৮]

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রক্ষোভিক বিকাশ
[EMOTIONAL DEVELOPMENT]

মানসিক বিকাশ বলতে আমরা মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতার বিকাশে বলেছি। কিন্তু, বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া ছাড়া মানব মনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। যাদের লক্ষ্য করা গেছে, তারাও জন্মের পর থেকে বিকাশ লাভ করে। এইসব মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার বিকাশ মানুষের আচরণকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভ (Emotion) মানুষের মনের এমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের আচরণ অনেকাংশে তার প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রক্ষোভ সব সময়ই কোন না কোন দৈহিক আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই আচরণকে বলা হয় প্রক্ষোভমূলক আচরণ (Emotional behaviour বা Emotional reaction)। ব্যক্তির জন্মের পর থেকে এই সব প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় প্রক্ষোভিক বিকাশ (emotional development)। কিন্তু এই প্রক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জন্মাবস্থায় শিশুর মধ্যে কি কি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া থাকে তাই নিয়ে। প্রক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই জন্মাবস্থায় এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি কি রকম থাকে? অনেক মনোবিদ্ মনে করেন, জন্মমুহূর্ত থেকেই মানব শিশু প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম। **সুসান্ আইজাকস্** (Susan Issacs) বলেছেন, মানব শিশুর মধ্যে জন্মাবস্থায় **চার ধরনের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। ভয়** (Fear), **রাগ** (Anger), **ভালবাসা** (Love) **এবং ঘৃণা** (Hate)। ওয়াট্‌সন (Watson) বলেছেন, সদ্যজাত শিশুদের মধ্যে, তিন রকম আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়—**ভয়** (Fear), **রাগ** (Anger) **এবং ভালবাসা** (Love)। **শেরম্যান** (Sherman) বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সদ্যজাত শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া থাকে ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃতি বয়স্কদের মত অত পরিষ্কার বা স্বচ্ছ নয়। পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিশুর প্রক্ষোভ জন্মাবস্থায় খুব আবছা থাকে এবং তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। শিশুর প্রক্ষোভ-কমূল জীবনের বিকাশের সপক্ষে মনোবিদ্ ব্রিজ (K. Bridge) দীর্ঘদিন ধরে

প্রক্ষোভিক বিকাশ কি?

পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর পরীক্ষা থেকে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাই উল্লেখ করলাম। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, সদ্যজাত শিশু উদ্দীপকের পৃথকীকরণ না করেই প্রতিক্রিয়া করে। ফলে অনুভূতিরও পৃথকীকরণ হয় না। তিনি বলেছেন, তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে থাকে **আনন্দ** (delight) এবং **দুঃস্থ** (distress) ভাব। পরবর্তীকালে, দেখা গেছে আনন্দ-বোধ, হর্ষ (elation), স্নেহ (affection) ইত্যাদি প্রক্ষোভের মধ্য দিয়ে পৃথকীকৃত হয়। আর দুঃস্থতাবোধ ও রাগ (Anger), ভয় (fear), বিরক্তি (Disgust) ইত্যাদি প্রক্ষোভের মাধ্যমে পৃথকীকৃত হয়। যাই হউক, বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, বয়স্কদের প্রক্ষোভও শিশুদের প্রক্ষোভের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে, প্রক্ষোভের বিকাশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিপূর্ণ হবে না। শিশুদের প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য হ'ল—

প্রক্ষোভিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

॥ **এক** ॥ শিশুদের প্রক্ষোভের তীব্রতা (Intensity) খুব বেশী থাকে। বয়স্করা, যেমন নিজেদের প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শিশুরা তা পারে না। সামান্য উদ্দীপনার প্রভাবে তারা যে ভাবে উত্তেজিত হয়, তীব্র উদ্দীপনার দরুনও সে ভাবে উত্তেজিত হয়।

॥ **দুই** ॥ শিশুদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থা খুব স্বল্পস্থায়ী হয়। এবং প্রক্ষোভ-মূলক অবস্থার রেশ (Mood) বয়স্কদের মত তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। হঠাৎই তারা খুব বেশী উত্তেজিত হয় এবং হঠাৎ আবার, ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

॥ **তিন** ॥ শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতা (shifting of emotion) একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা, বয়স্কদের মধ্যে একেবারে দেখা যায় না। এখুনি কোন বিষয়ে রাগ, বা দুঃখ, আবার পরমুহূর্তে আনন্দ। এ ধরনের হঠাৎ পরিবর্তন শিশুদের মধ্যেই কেবল লক্ষ্য করা যায়।

॥ **চার** ॥ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত আচরণই প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, তারা বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

॥ **পাঁচ** ॥ শিশুদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াকে শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে একটা স্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে।

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে আমরা তার প্রক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বিকাশের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে। তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করার দরকার। প্রক্ষোভের বিকাশ হয়, দু'দিক থেকে। প্রথমতঃ, এই বিকাশের ফলে, শিশুর প্রক্ষোভিক উদ্দীপকের (emotional excitant) পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, যে

সব অবস্থা শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে, তাদের পরবর্তীকালে পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিকাশের ফলে প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়া বা বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, শিশুরা প্রাথমিক স্তরে, যে ভাবে অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া করে। তারও পরিবর্তন হয়। আমরা এই দু'ধরনের বিকাশ সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

॥ এক ॥ প্রক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ
[Development of Emotional Excitation]

প্রথম অবস্থায় জন্মের পর থেকে প্রায় দু'বৎসর পর্যন্ত শিশুদের প্রক্ষোভ সাধারণতঃ তাদের প্রাথমিক চাহিদার (Basic needs) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, যে সব পরিস্থিতি বা উদ্দীপক তার নিজের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে না বা তার বিরুদ্ধাচরণ করে সেগুলোই শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বাড়তে থাকে ফলে, বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক তার মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ হয়। ফলে পূর্বে যে সব পরিস্থিতি বা উদ্দীপককে, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতো, তাদের তাৎপর্য নতুনভাবে তার কাছে প্রতিভাত হয়। উদ্দীপনার সীমাও স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত হয়। এখন যে সব উদ্দীপক শিশুর বা ব্যক্তির এই সব ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রকাশকে ব্যহত করে, তারাও তার মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। যে ভয়, শিশুর মধ্যে প্রাথমিকভাবে উচ্চ শব্দ (Loud Sound) বা অবলম্বনের মুক্ততা (Loss of support) থেকে আসতে পারে, তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানারকম উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্টি হ'তে পারে। সে কুকুর দেখে ভয় পেতে পারে, তার আত্মীয়-পরিজনের বিপদে তার ভয় আসে।

উদ্দীপনার বিকাশ—প্রাথমিক উদ্দিপনা

এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিকাশের ফলে, এবং স্মরণ ক্রিয়া ও সময় সম্পর্কে ধারণার বিকাশের ফলে, প্রক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ হয়। কল্পনার বিকাশও উদ্দীপনার বিস্তৃতিতে সাহায্য করে। শিশুর বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা এবং অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কোন বিশেষ উদ্দীপকের অবস্থান, তার মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে রাগের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারতো তার সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতার পূর্ব স্মৃতি তার মধ্যে রাগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পূর্বে হয়তো কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে রাগ হ'ত না। কিন্তু, তার আচরণ সম্পর্কে বিশেষ পূর্ব অভিজ্ঞতা শিশুর মধ্যে রাগের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে

ধারণা-নির্ভর উদ্দীপনা

পারে। কল্পনার বিকাশের ফলেও মানুষের প্রক্ষোভের উদ্দীপনার বিস্তৃতি হয়। কোন বিশেষ অবস্থার কাল্পনিক প্রত্যাশা (expectation) আমাদের মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। শিশুর মধ্যে, ভবিষ্যত ও অতীত সম্পর্কে ধারণা না থাকার দরুনও কল্পনা শক্তির বিকাশ না হওয়ার দরুন, তার প্রক্ষোভ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনার বিকাশের ফলে, কাল্পনিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের প্রক্ষোভের বিস্তৃতি কল্পনা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয়।

উদ্দীপনার পরিবর্তন।

অন্যদিকে বিপরীত ফলও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ শিশু-অবস্থায়, যে সব পরিস্থিতি পূর্বে তার অস্তিত্বের পরিপন্থী মনে হ'ত এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে তা আর মনে হয় না। ফলে যে উদ্দীপক পূর্বে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করত এখন আর তা করে না। যেমন, ছোট বেলা কুকুর দেখলে ভয় পায়, কিন্তু বড় হ'য়ে গেলে তার থেকে আর ভয়ের আশঙ্কা থাকে না বলে ভয়ও থাকে না। শিশু অবস্থায় জোর শব্দ শুনলেই ভয় পায়, কিন্তু প্রক্ষোভের বিকাশ হ'লে লক্ষ্য করা যায় সব সময় জোর শব্দে ভয় জাগে না। সুতরাং, প্রক্ষোভের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন নতুন নতুন উদ্দীপক, প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি কিছু কিছু পুরাতন উদ্দীপক প্রক্ষোভ জাগরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জারশিল্ড্ (Jersield) মন্তব্য করেছেন—"*As a child matures, as his activities and interest expand, and as he gains in understanding of the world about him, the circumstances arouse his emotions changes.*"[1]

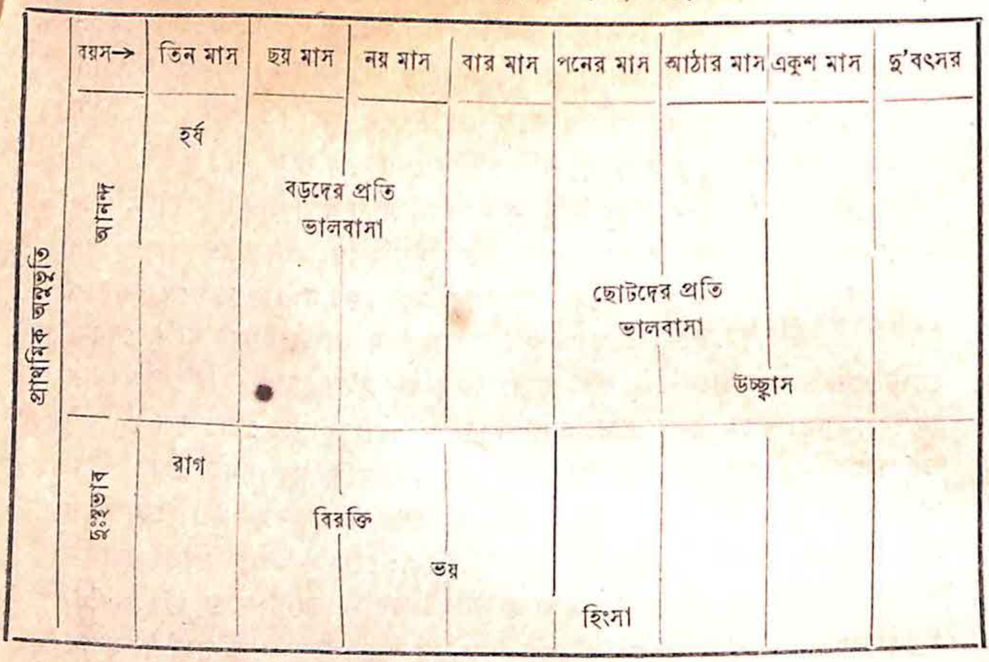
॥ দুই ॥ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ [Development of Emotional Reactions]

প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পৃথকীকরণ

প্রক্ষোভমূলক আচরণ বাল্যাবস্থা থেকে কৈশোর কাল পর্যন্ত বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। জন্মাবস্থায় শিশুদের প্রক্ষোভ বা অনুভূতি যেমন সামগ্রিক থাকে, তেমনি তার প্রতিক্রিয়াও সামগ্রিক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ব্রিজ্ (Bridge) বলেছেন, দু'ধরনের প্রাথমিক অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁর মতে তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভের এই পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া (differentiation) শুরু হয়। আনন্দ (delight) এবং দুঃস্বভাব (distress) এই দু'ধরনের অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভের বিকাশ হয় পৃথকীকরণের মাধ্যমে। প্রায় ছয় মাস বয়সে আনন্দ থেকেই হর্ষের (elation)

1. Emotional development: A. T. Jersield: Educational Psychology (ed. Skinner)

প্রক্ষোভের উৎপত্তি হয়। নয়-দশ মাস বয়সে এই প্রক্ষোভ থেকেই বড়দের প্রতি ভালবাসার প্রক্ষোভ জাগে। আরও পরে, প্রায় পনের মাস বয়সে, সমবয়সীদের প্রতি ভালবাসা দেখা দেয়। পরে, দেড় বৎসর বয়সের পর



শিশুদের মধ্যে উল্লাসের (joy) প্রক্ষোভ দেখা দেয়। অন্যদিকে দুঃস্থভাব (distress) থেকে চার মাস বয়সে রাগের (anger) পৃথকীকরণ হয়। পাঁচ মাসে বিরক্তির (disgust) এবং ছয় মাস বয়সে ভয়ের পৃথকীকরণ হয় এই দুঃস্থভাব থেকেই। পনের মাস বয়সের পর শিশুর মধ্যে হিংসা (Jealousy) দেখা দেয়। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের পৃথকীকরণ হয়ে থাকে।

প্রক্ষোভের যেমন পৃথকীকরণ হচ্ছে, তেমনি তার আচরণেরও পৃথকীকরণ হচ্ছে প্রক্ষোভিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। শৈশব অবস্থা থেকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশের ফলে, মানুষ অনেক সূক্ষ্মভাবে প্রক্ষোভকে প্রকাশ করতে পারে। যে রাগ (Anger) প্রকাশ করার জন্য সে ছোটবেলা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করতো, সঙ্গে সঙ্গে জামা ছিঁড়ে ফেলতো, মাথা ঠুকতো, সে আর বড় বয়সে এরকম আচরণ করে না। অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে রাগকে প্রকাশ করতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে দেখা যায়, সে রাগ হয়তো শুধুমাত্র গালাগালির দ্বারা প্রকাশ করছে; বা তার মধ্যে এমন কতকগুলো আচরণগত বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করেছে, যার দ্বারা সে রাগ প্রকাশ করে। যে শিশু ভয় পেলে কাঁদতো, আঁকড়ে ধরতো, বা দৌড়ে পালাতো, বড় বয়সে সেই ভয়কে

আচরণের পরিবর্তন

প্রকাশ করার জন্য আর এরকম আচরণ করে না। এমনও অবস্থা হয়, নিজের ভয়মূলক অনুভূতির কোন বাহ্যিক প্রকাশ ব্যক্তি নাও করতে পারে। এমনি ভাবে, বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভমূলক আচরণের বিকাশ হয়, এবং ক্রমে ব্যক্তির মধ্যে এই সব আচরণ, ব্যক্তিসত্বার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব রূপ ধারণ করে। এই ধরনের বিকশিত স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক আচরণ পরবর্তীকালে ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্যের একটা অঙ্গ হিসেবে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশের কতকগুলো কারণ আছে। তাঁরা মনে করেন প্রক্ষোভের এই আচরণগত এবং অনুভূতিমূলক বিকাশ কতকগুলো কারণে হয়।

প্রক্ষোভিক বিকাশের কারণ

এই সব কারণগুলো হ'ল—[**এক**] অনেক সময় প্রক্ষোভমূলক আচরণ ব্যক্তির মানসিক অবসাদ (mental fatigue) এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব বেশী অবসাদের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। [**দুই**] অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্য তার প্রক্ষোভের প্রকৃতি নির্ণয় করে। সুস্থ দেহ সুস্থ প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করে। [**তিন**] সামাজিক প্রভাবের দ্বারা প্রক্ষোভের বিকাশ হয়। অন্যের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া শিশুরা অনুকরণ করে। বিশেষভাবে শৈশবে লক্ষ্য করা যায়, শিশুরা ভাই-বোন, মা-বাবা ইত্যাদিদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। [**চার**] প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ পরিমননের (Maturation) উপর অনেক সময় নির্ভর করে, এই সব আচরণের যে নির্দিষ্ট গতি আমরা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করি, তার মূলে আছে দৈহিক পরিমনন। দৈহিক পরিমননের ফলে, শিশুর যখন দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে কাজের ক্ষমতার পৃথকীকরণ হয়, তখন তার প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াও বিশেষ অঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। [**পাঁচ**] প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ অনেক ক্ষেত্রে অনুবর্তনের জন্য হয়ে থাকে। ওয়াটসন তাঁর পিটার-আলবার্টের পরীক্ষায় (শিখনের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) কিছু শিশুদের মধ্যে প্রক্ষোভিক অনুবর্তন হয় তার বিবরণ দিয়েছেন। এই মতানুযায়ী, কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত প্রক্ষোভ অনুবর্তনের দ্বারা অন্য কোন বস্তু বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই ধরনের অনুবর্তন কোনরূপ সচেতন মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে থাকে। [**ছয়**] সবশেষে, প্রক্ষোভের বিকাশের উপর মানসিক বিকাশের প্রভাবও যথেষ্ট আছে। ভাষার বিকাশ, ধারণার বিকাশ, প্রত্যক্ষণের বিকাশ, সবই শৈশবের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষোভকে সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তির সামাজিক বিকাশও (Social development) তার আচরণকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভিক বিকাশের গুরুত্ব

[Importance of Emotional development in Individual's life]

ব্যক্তিজীবন ও প্রক্ষোভিক বিকাশ

মানুষকে আমরা বিচার বুদ্ধিশীল জীব বলে আখ্যা দিলেও, তার অনেক আচরণই যে প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়ে বর্তমানে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। মানুষের প্রক্ষোভিক জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে না জানলে, তার আচরণকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে না। কাজের অনুভূতির মূলটা অস্বীকার করলে, তার প্রকৃত তাৎপর্য জীবনে থাকবে না। তাছাড়া সমাজে সুস্থ জীবন যাপন করতে হ'লে প্রক্ষোভের সুষ্ঠু প্রকাশের প্রয়োজন আছে। সমাজ জীবনের সচেতন মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ না হ'লে জীবনের বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, তাকে কখনওই পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার অর্থ হ'ল, বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলোকে সমাজসম্মতভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন। এই ক্ষমতার বিকাশ ব্যক্তিজীবনে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। আর তাকেই আমরা বলছি প্রক্ষোভিক বিকাশ। এই কারণে প্রক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, ব্যক্তির প্রক্ষোভিক বিকাশ, ব্যক্তিসত্বার (Personality) বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তার শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভ, ব্যক্তিসত্বার বিকাশের দিক নিরূপন করে দেয়। এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্বায় তারা যে রূপ ধারণ করে, তা দিয়েই ব্যক্তিসত্বার স্বরূপ প্রকাশমান হয়।

শিক্ষা ও প্রক্ষোভিক বিকাশ

[Education and Emotional development]

সূচনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, শুধুমাত্র কোন একদিকের বিকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। অনেকের ধারণা, শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির বিচার বুদ্ধির বিকাশের চেষ্টা করা হয়, এবং প্রক্ষোভ সেই বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিচার বিবেচনা (Rationality) এবং প্রক্ষোভ (Emotion) পরস্পর বিপরীত ধর্মী। তাই মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে আচরণে প্রক্ষোভের প্রভাবকে দূর করার কথা এইসব চিন্তাবিদ বলেছেন। কিন্তু, আধুনিক কালে, মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, প্রক্ষোভ (Emotion) এবং

বিচার বিবেচনা (Rationality) বিপরীত ধর্মী নয়। বরং, তারা পরস্পরের পরিপূরক। তাঁরা মনে করেন, মানুষের যে কোন আচরণের পেছনে প্রেষণা-মূলক শক্তি যোগায় প্রক্ষোভ। আর এই প্রেষণামূলক শক্তি ছাড়া কোন উদ্দেশ্যমুখী কাজ হতে পারে না। উদ্দেশ্যমুখী বিজ্ঞান হিসেবে শিক্ষাকে বর্তমানে তাই প্রক্ষোভের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রক্ষোভিক বিকাশের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে আরও বিশদভাবে এখানে কিছু উল্লেখ করব।

প্রেষণা ও প্রক্ষোভ

॥ **প্রথমতঃ** ॥ শিশুরা প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন কতকগুলো প্রক্ষোভ ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। সেই সব প্রক্ষোভের বিকাশ হয় গৃহ পরিবেশে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে সেই সব প্রক্ষোভের যথার্থ সামাজীকরণ এবং অন্যান্য প্রক্ষোভিক শক্তিকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের পথে নিয়ন্ত্রণ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আধুনিক শিক্ষার মূল মন্ত্র হ'ল প্রেষণা। এই প্রেষণা প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই আসে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বজায় রাখতে হ'লে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে সব প্রক্ষোভগুলো আছে, সে গুলোর বহিঃপ্রকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, এমন ভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেগুলো শিশুরা সহজে সমাধান করতে পারে এবং তার দ্বারা আনন্দ পায়। আনন্দদায়ক পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুপ্রাণিত করবে। তাই শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবেন।

প্রক্ষোভ ওমনোভাব

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য মনোভাব (attitude) বিকাশ করার দরকার। শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি মনোভাব (attitude towards learning material), শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের মনোভাব (attitude towards other pupil), বিদ্যালয়ের প্রতি মনোভাব (attitude toward school) এবং শিক্ষকের প্রতি মনোভাব (attitude toward teacher), এ সব কিছুই তার শিক্ষার অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে। আর, এই ধরনের শিক্ষা উপযোগী মনোভাব শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার চরিতার্থের মাধ্যমে আসে। অর্থাৎ, বিদ্যালয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যাতে তার প্রক্ষোভগুলোকে সহজ-ভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেদিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষক এই দায়িত্ব কতটা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থী কি কি গ্রহণ করবে এবং কি কি ত্যাগ করবে।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করতে হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রক্ষোভিক বিকাশ দুই স্তরে হয়। প্রথমতঃ, বিভিন্ন প্রক্ষোভের বা অনুভূতির পৃথকীকরণের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন

প্রক্ষোভমূলক আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই দু'দিক থেকে শিক্ষককে কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, বিভিন্ন ধরনের দলগত কাজের ব্যবস্থা করে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক জীবনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির সঞ্চারে সহায়তা করবেন। যেমন,—ভালবাসা, সমবেদনা, ঘৃণা, করুণাবোধ ইত্যাদি। বিভিন্ন রকমের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ, যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে, সেই সব পরিস্থিতিতে এই সব অনুভূতির বিকাশ সম্ভব হবে। অন্যদিকে শিক্ষার দ্বারা প্রক্ষোভের বাহ্যিক আচরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলো প্রক্ষোভ আছে, যেগুলোর অবাধ বহিঃপ্রকাশ সুস্থ জীবনের পরিচায়ক নয়। যেমন, ভয়, রাগ, ঘৃণা, ইত্যাদি। রাগের বশবর্তী হয়ে শিক্ষার্থীরা যখন তখন মারামারি করবে, এটা বিদ্যালয়ের দিক থেকে কাম্য নয়। তাই আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে, এই সব প্রক্ষোভগুলোর নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে হবে। শিক্ষক এজন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। এ সম্পর্কে আমরা প্রক্ষোভ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

শিক্ষার দ্বারা প্রক্ষোভিক বিকাশ

সবশেষে, একটা কথা মনে রাখার দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সাধন। আর সেই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে, শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক পরিমনন যাতে আসে তার চেষ্টা করা। প্রক্ষোভমূলক পরিমনন (Emotional maturity) বলতে আমরা সব বয়সের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থির মানের কথা বলছি না। বিশেষ বয়সের উপযোগী যে পরিমাণ প্রক্ষোভের বিকাশ হওয়া উচিত, তাই আনার চেষ্টা করতে হবে শিক্ষার দ্বারা। অর্থাৎ, পরিমনন কথাটাতে আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। হারলক (Hurlock)[1] প্রক্ষোভমূলক পরিমনন বলতে জীবন বিকাশের স্তরে সর্বোচ্চ মাত্রায় পরিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের ক্ষমতাকে বুঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বয়সানুযায়ী পরিপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়তা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। এরজন্য তিনি দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে, খারাপ প্রক্ষোভগুলোর সংযত প্রকাশের শিক্ষণ দিবেন, ভাল প্রক্ষোভগুলোর প্রকাশের সুযোগ করে দিবেন; নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন; অন্যান্য সহশিক্ষার্থীদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করবেন; হতাশামূলক পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থীরা যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, সে দিকে নজর

প্রক্ষোভমূলক পরিমনন ও শিক্ষা

1. "Emotional maturity involves the kind of living that most richly and fully expresses what a person has in him at any level of his development."—Hurlock: Educational Psychology: Skinner (ed).

দিবেন ; সফল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উল্লাসকেও যাতে সংযতভাবে প্রকাশ করতে শিখে সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। অন্যের প্রতি ঈর্ষাবোধ যাতে জাগ্রত না হয়, সে বিষয়েও অভ্যাস গঠন করার দরকার। সবশেষে, বয়স উপযোগী মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক বিকাশ পরিপূর্ণ হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the general nature of emotional development of the children. [পৃ: ১৯৬-২০১]
2. Discuss the role of emotional development in the education of the children. [পৃঃ ২০২-২০৫]
3. What is meant by emotional maturation? Discuss the role of the teacher in bringing about emotional maturity of the School children. [প্রক্ষোভ অধ্যায় ; এবং পৃঃ ২০৪-২০৫]
4. Write notes on the following :

(a) Development of emotional excitation. [পৃঃ ১৯৮-১৯৯]

(b) Emotional maturity. [পৃঃ ২০৪-২০৫]

(c) Development of emotional reaction. [পৃঃ ১৯৯-২০১]

পঞ্চদশ অধ্যায়

সামাজিক বিকাশ
[SOCIAL DEVELOPMENT]

জন্মাবস্থায় শিশুকে আমরা না সামাজিক বলতে পারি না পারি তাকে অসামাজিক বলতে। তাকে কেবলমাত্র সজীব সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই সজীব সত্তার বৈশিষ্ট্য হ'ল, খুব সীমিত পরিবেশে নিজের দেহ-সংগঠনের মাধ্যমে সে অভিযোজন করতে পারে। কিন্তু, মানুষের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, জন্ম মুহূর্ত থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য, এমন কি, অনেক প্রয়োজনীয় জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। দেখা গেছে, অভিব্যক্তির স্তরে যে প্রাণী যত উন্নত, তার নির্ভরতার কাল তত বেশী। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে, তার শৈশবকালও (Infancy) সব চেয়ে বেশী। অন্য কোন প্রাণীই এত বেশী সময় ধরে বাবা-মা, বা অন্য বয়স্কদের উপর নির্ভর করে থাকে না। কিন্তু, এই নির্ভরতা শুধুমাত্র, তার জৈবিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ার অপেক্ষায় নয়। এই অসহায় জীবনাবস্থায় সে নানা রকম বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। এই অবস্থায়, তার একদিকে যেমন, দৈহিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও বিকাশ হয়। তার এই অসহায় অবস্থার জৈবিক প্রয়োজন যারা মেটাচ্ছে, তাদের প্রতি সে প্রতিক্রিয়া করে এবং এর মাধ্যমে অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। শিশুর এই স্তরের বিকাশ এতই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে ঠিক ভাবে পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেমন ভাষার বিকাশ যাকে আমরা মানসিক বিকাশের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করি, তার অনেকখানিই সামাজিক বিকাশের অন্তর্গত। কারণ, ভাষার বিকাশ পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং তার মাধ্যমেই বিকাশ হয়। আবার দেহ-সঞ্চালনের বিকাশের ফলে অনেক রকম সামাজিক আচরণের বিকাশ হয়। ঈর্ষা (Jealousy), স্নেহ (affection), সমবেদনা (sympathy) ইত্যাদি প্রক্ষোভের বিকাশকে সামাজিক বিকাশের অন্তর্গত করতে পারি। মনোবিদ্ পাওয়ার্স (E. F. Powers) সামাজিক বৃদ্ধির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, **সামাজিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সার্থক উত্তরাধিকারী করায় এবং সামাজিক রীতি নীতির অনুকূল আচরণ ধারার অধিকারী করায়, ব্যক্তিজীবনে যে বিকাশের ধারা সতত ক্রিয়াশীল,**

সামাজিক বিকাশ কি?

তাই হ'ল সামাজিক বিকাশ (social development)[1] অর্থাৎ, সমাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিজীবনে সব সময়ে যে সচেতন প্রচেষ্টা চলছে, তারই ফলস্বরূপই তার সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে।

ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করতে পারলে, তার বিকাশের ধারাকে সার্থকভাবে অনুশীলন করা যাবে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল—

॥ এক ॥ জন্মাবস্থায় শিশুর মধ্যে কোন সামাজিক বৈশিষ্ট্যই থাকে না। তার মধ্যে কোন রকম সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না বলে, তাকে আমরা অসামাজিকও বলতে পারি না।

॥ **দুই** ॥ পরবর্তীকালে বিকাশের অন্যান্য দিকের প্রতি সমতা রেখে, ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিকাশও শুরু হয়। ক্রমে সাধারণ ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে সার্থক-ভাবে অভিযোজনের সব রকম কৌশলই সে আয়ত্ব করে।

॥ **তিন** ॥ এই সামাজিক বিকাশের ধারা সতত উন্নতশীল (Progressive)

॥ **চার** ॥ সামাজিক বিকাশ সমাজ পরিবেশেই সম্ভব। আদর্শ সমাজ পরিবেশে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিক বিকাশ ঘটে থাকে। পৃথক, কৃত্রিম পরিস্থিতিতে তার বিকাশ সম্ভব নয়।

॥ **পাঁচ** ॥ সামাজিক বিকাশের পেছনে ব্যক্তির সচেতন মানসিক প্রচেষ্টা বেশীর ভাগ সময়ে কাজ করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য শিশুরা শুধুমাত্র অনুকরণের সাহায্যে গ্রহণ করে।

॥ **ছয়** ॥ সামাজিক বিকাশ, দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের উপর নির্ভর করে।

॥ **সাত** ॥ সামাজিক বিকাশ ব্যক্তির সামাজিক আদর্শকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার (Comprehension of social heritage) নির্ভর করে।

॥ **আট** ॥ সামাজিক বিকাশ বিভিন্ন বয়সে ধীরে ধীরে হয় এবং প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সামাজিক বিকাশের এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যক্তির জীবন বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সামাজিক বিকাশকে আমরা দু'দিক থেকে বিবেচনা করব। প্রথমতঃ, তার **সামাজিকী-ভবন** (socialization) প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়তঃ তার **সামাজিক পরিমনলের** (social

---

1. "Social growth can be defined as the progressive improvement through directed activity, of the individual in the comprehension of social heritage and the formation of flexible conduct patterns of reasonable conformity with this heritage"—Powers : Educational Psychology (Skinner. ed.).

maturity) বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। সামাজিকী-ভবন (socialization) এবং সামাজিক পরিমনন দু'টো কথাই বিশেষভাবে সামাজিক বিকাশকে বুঝায়।

॥ এক ॥ সামাজিকীভবন
[Socialization]

জন্মাবস্থায় শিশু একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক থাকে। সব কিছুকে নিজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করে। লিউইন (K. Leuin) শিশুর এই অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বন্ধ একটা তন্ত্রের (closed system) সঙ্গে তুলনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে শিশুদের এই অবস্থায়। আত্মকেন্দ্রিক এই পরিধির বাইরে সে কোন প্রতিক্রিয়াই করতে পারে না। শিশুর এই অবস্থাকে মনোবিদগণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একে আমরা প্রাক্-সামাজিক আচরণ (Pre-social behaviour) বলতে পারি। এই অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় শিশুদের অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই, এমন কি, প্রাণী ও অন্যান্য নির্জীব পদার্থের মধ্যেও তার কাছে কোন তফাত নেই। কেবলমাত্র কতকগুলো উদ্দীপক হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সকলের প্রতি সে প্রতিক্রিয়া করে থাকে। মনোবিদ্ বুলার (Buhler)[1] তাঁর বিভিন্ন অনুশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, যে সদ্যজাত শিশু এবং জন্মের পর প্রায় দুই মাস বয়স পর্যন্ত কেবলমাত্র কতকগুলো তীক্ষ্ণ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু, এই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বিকাশ বা সামাজিকীভবন শুরু হয়। মনোবিদ্ ক্রো এবং ক্রো (Crow & Crow) বলেছেন, শিশুদের খেলার মধ্যে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আচরণ থেকে সামাজিক আচরণ সম্পাদনের দিকে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।[2] এই বিকাশ হয় ধীরে ধীরে।

সামাজিকীভবন কি?

শিশু প্রথম এক মাস বয়সে তার পাশাপাশি বয়স্কদের সম্পর্কে সচেতন হয়। দ্বিতীয় মাসে লক্ষ্য করা যায় যে বয়স্কদের প্রতি হাসির দ্বারা প্রতিক্রিয়া করে। মা-কে চিনতে শিখে। তিন মাস বয়সে সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে, দেখা যায়, শিশুরা কেউ পাশে কথা বললে কান্না বন্ধ করে দেয়। কাছ থেকে কেউ চলে গেলে কাঁদতে আরম্ভ করে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়সে আদর করা বা বকাবকি করার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নতুন কোন

জন্ম থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত

1. From birth to Maturity'—Buhlar.
2. "Child's play activities illustrate a progressive change from individualization toward socialization"—Educational Psychology ; Crow & Crow.

লোককে চিনতে পারে এবং তার কাছে যেতে চায় না। আট থেকে নয় মাসের মধ্যে বয়স্কদের কথা অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এমন কি কিছু কিছু আচরণ ও অঙ্গ-ভঙ্গী অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এক বৎসর বয়সে সে 'না' বুঝতে শিখে এবং না করলে, সে কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রায় দেড় বৎসর বয়সে তার মধ্যে বয়স্কদের মত অনীহা (Negativism) দেখা যায়। কিন্তু এই বয়সের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এই বয়সে শিশুরা সম-বয়সীদের চেয়ে বয়স্কদের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পছন্দ করে। এর থেকে বুঝা যায় তাদের সামাজিক প্রতিক্রিয়া করার প্রতি একটা প্রবণতার বিকাশ হয়েছে। এই বয়সে সে নিজে নিজেই খেলতে ভালবাসে বা মায়ের সঙ্গে খেলা করে। অন্য সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা পছন্দ করে না।

দুই বৎসর বয়সের পর শিশুদের মধ্যে সত্যিকারের সমাজ চেতনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রথম প্রথম সে সমবয়সীদের সঙ্গে বেশীক্ষণ মানিয়ে খেলা করতে পারে না। তখনও সব কিছুকে নিজের অধিকারে পেতে

দুই-ছয় বৎসর পর্যন্ত

চায়। কিন্তু তিন বৎসর বয়সের পর তার মধ্যে সহযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজের খেলনা সম্পর্কে গর্ববোধও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সহযোগিতার (Co-operation), ও আত্মগর্ববোধের (Self Pride) মত প্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সামাজিক বিকাশের পরিচায়ক। এছাড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Rivalry), সমবেদনা (Sympathy), কলহ (Quarreling) ইত্যাদির মত সামাজিক প্রবণতা (social inclination) এই সময়ে শিশুর মধ্যে বিকাশ হয়।

ছয় বৎসর বয়স থেকে, তার মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য আরও বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে শিশু দলবদ্ধভাবে খেলা করতে ভালবাসে। এই দলবদ্ধভাবে খেলার সময়, নিয়ম কানুন মেনে চলার একটা

ছয়-বার বৎসর পর্যন্ত

প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিশুর এই বয়সের আচরণ তার দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বার বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে এই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। দলের প্রতি আনুগত্য (Group loyality) এই সময়কার সামাজিক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে এই বয়সে ছেলেরা, মেয়েদের সঙ্গে খেলতে লজ্জা পায় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রেও এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

বার বৎসর বয়সের পর তারা যখন কৈশোরে এসে পৌছায়, তখন তাদের সামাজিক বিকাশও একটা সুনির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা

বার বৎসর পর

যায়। দলের প্রতি আনুগত্য আরও বেশী বেড়ে যায়। সহযোগিতাও খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। সমবেদনাবোধও চরমভাবে

বিকাশ লাভ করে। সামাজিক দিক থেকে ন্যায় বিচারের প্রতি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে তারা যে দল গঠন করে তা অনেক বেশী দিন স্থায়ী হয়। এমনিভাবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ হ'তে থাকে। কিন্তু, এই সামাজিক বিকাশের শেষ উদ্দেশ্য কি? কোন লক্ষ্যে ব্যক্তি পৌছুতে চায় সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে? সে সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব।

॥ দুই ॥ সামাজিক পরিমনন
[Social Maturity]

সামাজিক পরিমনন কি

সামাজিক বিকাশের চরম উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক পরিমনন (Social maturity)। আমরা সাধারণ কথায় বলি 'ছেলেমানুষী কর না।' এর দ্বারা আমরা কি বুঝাতে চাই? কোন আচরণ যা ছোট ছেলেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, তা করতে না করা হয়। অর্থাৎ, যে আচরণকে আমরা শিশুদের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিমননমূলক আচরণ বলে থাকি, তা বয়স্করা করলে তাকে সামাজিক অপরিপক্কতার পরিচায়ক হিসেবে বিবেচনা করি। সুতরাং পরিমনন কথাটা এখানে আমরা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করছি। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বয়সের বা পর্যায়ের সামাজিক পরিমনন বলতে আমরা সেই বয়সের উপযোগী সব সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝাই। একটি তিন বৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে ছয় বৎসর বয়সের ছেলের সামাজিক পরিমননের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু তাদের প্রত্যককেই আমরা সামাজিক বিকাশের দিক থেকে পরিণত বলব, যদি তারা তাদের বয়সের উপযোগী সব বৈশিষ্ট্যগুলো সার্থকভাবে আয়ত্ব করতে পারে। বিশেষ বিশেষ বয়সের সামাজিক পরিমনন পরিমাপ করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এই সব অভীক্ষার মধ্যে ভাইনল্যাণ্ড সোস্যাল ম্যাচুরিটী স্কেল (Vineland social maturity scale) খুবই উপযোগী। এই অভীক্ষায় প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে (Age group) কতকগুলো করে নির্দেশ বা আচরণ আছে, যে গুলোকে ব্যক্তির আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ বয়সের পরিমনন ছাড়া আচরণগত সামাজিক বিকাশের একটা আদর্শগত লক্ষ্য আছে। পরিণত বয়সে তার স্বরূপ কি সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকার দরকার। পরিণত জীবনে সামাজিক পরিমননের বৈশিষ্ট্য হ'ল—

সামাজিক পরিমননের বৈশিষ্ট্য

॥ এক ॥ সহকর্মীদের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার ক্ষমতা।

॥ দুই ॥ সকলের প্রতি সমবেদনা বোধ।

॥ তিন ॥ উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া।

॥ চার ॥ প্রক্ষোভিক পরিমনন।

॥ পাঁচ ॥ সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য আচরণ।

॥ ছয় ॥ অন্যের প্রতি সৌজন্য বোধ।

॥ সাত ॥ নম্রতা, আত্ম বিশ্বাস, সহযোগিতা ইত্যাদি সামাজিক প্রবণতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

॥ আট ॥ অন্যের সম ইচ্ছাকে ব্যহত না করে নিজের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা।

॥ নয় ॥ সামাজিক কর্তব্য যথাযোগ্যভাবে পালন করার ক্ষমতা।

॥ দশ ॥ সামাজিক আদর্শকে সামনে রেখে আত্মত্যাগ করার ক্ষমতা।

॥ এগার ॥ পরশ্রীকাতরতা মুক্ত হওয়া।

এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিলে, তবেই তাকে আমরা বলবো সামাজিক জীবনের দিক থেকে সে পরিণত। এই পরিণতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একদিকে ব্যক্তিকে সচেষ্ট হ'তে হবে অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে তার উপর যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে।

সামাজিক বিকাশের সহায়ক শর্ত
[Factors Affecting Social Development]

॥ প্রথমতঃ ॥ সামাজিক বিকাশের জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন, তেমনি কিছু বাহ্যিক উপাদানও তার এই বিকাশে সহায়তা করে। এই সব বিকাশ সহায়ক শর্তের মধ্যে, গৃহ পরিবেশের প্রভাব (influence of Home) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সামাজিক বিকাশ গৃহ পরিবেশের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্বেই আমরা বলেছি, সামাজিক বিকাশের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই বিকাশ সমাজ পরিবেশেই সম্ভব। শিশুর কাছে প্রাথমিক সমাজ পরিবেশ হ'ল তার গৃহ পরিবেশ, তাই সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার প্রভাব এত গুরুত্বপূর্ণ। এই গৃহ পরিবেশে, বাবা, মা, ছোট বড় সব ভাই বোনদের প্রভাব শিশুর সামাজিক বিকাশের ধারাকে প্রথম স্তরে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়েই শিশুর আচরণের প্রথম সামাজিকীভবন হয়।

গৃহ

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religion institution) শিশুর আচরণ ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বয়স্কদের অনেক আচরণ, এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অনেক রীতি নীতিই ধর্মবিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শিশুর সামাজিক আচরণ বিকাশে, এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কোন আচরণ করা উচিত, কোন আচরণ করা উচিত নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয়

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

মনোভাবের দ্বারা। মনোবিদ্ **পাওয়ার্স** (Powers) বলেছেন, "…*religion play a dominant part in the determination of the direction of social functioning of the individual*".

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ রাষ্ট্র বা সরকার (Government) সমাজের এক ধরনের প্রতিষ্ঠান যার দ্বারা সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকার বিভিন্ন রকম আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সরকার বা রাষ্ট্রের এই দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশেও সে প্রভাব বিস্তার করে। যে রাষ্ট্রের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, সেই রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলার প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র শিশুর সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। যে দেশে কোন বিশেষ আচরণ করা নিষিদ্ধ, সেই দেশের শিশুদের আচরণ সেইভাবে গড়ে উঠে।

রাষ্ট্র

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ ভাষা শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভাষাই ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম। ভাষার মধ্য দিয়েই এক ব্যক্তি তার নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করে। সামাজিক বিকাশ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। তাই ভাষা শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ভাষা

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ শিক্ষাও (Education) ব্যক্তির সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিকীভবন হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ধারার অবিচ্ছিন্নতাকে বজায় রাখা এবং সমাজ উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পাবে, তার দ্বারা সমাজ কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। সুতরাং তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ ব্যক্তির বুদ্ধি, অনেকাংশে তার সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক বিকাশ, ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশের যথাযথ প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি কি ভাবে কোন বিশেষ সামাজিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবে, তার উপর নির্ভর করে তার সামাজিক বিকাশের প্রকৃতি। ব্যক্তির এই প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে, তার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রাধীন। যে যত বেশী বুদ্ধিমান, সে তত বেশী পরিমাণ সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে। অভিযোজনের প্রকৃতিও তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সামাজিক বিকাশের হারও প্রকৃতির উপর বুদ্ধির প্রভাব আছে। তাছাড়া, শিশুদের বুদ্ধির পরিমাণের কথা বিবেচনা করে আমরা তাদের প্রশংসা করি। এই ধরনের প্রশংসা বা তিরস্কার সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মানসিক বিকাশ

॥ **সপ্তমতঃ** ॥ ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ (socio-economic environment) তার সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর তার সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে শিশু খারাপ অবস্থার মধ্যে থেকে বড় হয়, তার সামাজিক বিকাশের ধারা তার জীবন পরিবেশ অনুযায়ী হয়, আবার যে শিশু ভাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়, তার পক্ষে সহজে সমাজ-সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর (socio-economic status), অনেক সময় শিশুদের মধ্যে বিশেষ ধরনের ভাবজট (complex) সৃষ্টি করে, এবং এই ভাবজট তার সামাজিক মনোভাব (social attitude) বিকাশে সহায়তা করে; এই অবস্থা শিশুর নৈতিক মান নির্ধারণেও কাজ করে। ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের (socio-economic status) প্রতি সন্তুষ্টি দ্বারা তার সামাজিক অভিযোজন নিয়ন্ত্রিত হয়। **কু-লীন্** এবং **লী** (Kuhlen and Lee) তাঁদের এক পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ

সবশেষে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতি (Individual difference) সাধারণভাবে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ নিয়মানুসারে বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সামাজিক বিকাশ ব্যক্তির নানা রকম দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তির মধ্যে যে সব ক্ষমতা, যে পরিমাণে আছে, তার উপর তার সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। এই পার্থক্যের দরুন কারও মধ্যে কোন বিশেষ সামাজিক গুণ, বেশী পরিমাণে দেখা যায় আবার কোন গুণ কম পরিমাণে দেখা যায়।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের নীতি

ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিকাশের গুরুত্ব
[Importance of Social Development on Individual's life]

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সার্থক সমাজ জীবন যাপনের মধ্যেই তার জীবনের চরম অভিব্যক্তি সম্ভব হবে। এই সমাজ জীবন কেবলমাত্র তার যুথবদ্ধতার প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কেবলমাত্র যুথবদ্ধতার তাড়নায় দলবদ্ধভাবে বাস করাই তার কাম্য নয়। যে দলের মধ্যে সে বাস করবে, তার আদর্শকে গ্রহণ করার, তার সঙ্গে অভিন্নতা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার ও দলের সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে তার

ব্যক্তিজীবন ও সমাজ চেতনা

জীবনের সার্থকতা সে উপলব্ধি করবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্যই ব্যক্তির যথাযোগ্য সামাজিক বিকাশ প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে না, সে যতই জ্ঞানী হউক না কেন, তাকে আমরা আদর্শ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না। তাই, সামাজিক অভিযোজন (social adjustment) ব্যক্তিজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সামাজিক অভিযোজন নির্ভর করে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের স্তরের (level of social maturity) উপর। সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন করাও সুস্থ সামাজিক জীবন যাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থের প্রভাব বিমুক্ত হ'য়ে সামাজিক ঘটনাগুলোকে বিচার করতে হবে। এই ক্ষমতাও ব্যক্তির মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আসবে। আবার, সমাজ একটা গতিশীল (dynamic) সত্ত্বা। তার এই গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টা একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তির মধ্যে সমাজ-চেতনা যদি সঠিকভাবে না জাগে তা'হলে সে কখনও-ই সক্রিয়ভাবে সমাজ-জীবনের প্রগতিতে অংশগ্রহণ করবে না। ব্যক্তির মধ্যে এই সমাজ চেতনা তার স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশের ফলেই আসবে। মানুষের জীবনের, সব গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়; তার উপর সামাজিক বিকাশের প্রভাব অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। সুতরাং, সামাজিক বিকাশের কথা বাদ দিয়ে ব্যক্তিজীবনের বিকাশের কথাকে কল্পনা করাই যায় না। এক কথায়, তার দৈহিক, মানসিক প্রক্ষোভিক, বিকাশের সুফল সবই ব্যর্থ হবে যদি না তার যথাযথ সামাজিক বিকাশ হয়। ব্যক্তির সব কিছু শক্তিকে, সব কিছু বৃদ্ধিকেই তার সামাজিক উপযোগিতার দ্বারা সবশেষে বিচার করা হবে, সামাজিক সাফল্য দিয়ে বিচার করা হবে তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্ত্বার।

শিক্ষা ও সামাজিক বিকাশ
[Education and Social Development]

মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, শিশুর এই সব দিকের বিকাশ তার শিক্ষাকে (education) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তবে এর বিপরীত প্রভাবও আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাবই বেশী গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ, শিক্ষার দ্বারা সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করা যায়। তাই শিশুর সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। শিক্ষার দ্বারা কি ভাবে শিশুদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করা যায়, সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

সূচনা

সহানুভূতি (sympathy) ব্যক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্য। সমাজ জীবনের মূলে এই সহানুভূতি বিশেষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সহানুভূতির পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তা হ'ল মমত্ববোধ (identification)। এই মমত্ববোধ যত বাড়বে সহানুভূতির পরিমাণও তত বাড়বে। এই মমত্ববোধ শিশুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আসবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা যাতে শিক্ষার্থীরা পায়, তার সুযোগ করে দেওয়া। দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ বিদ্যালয়ে করে দিতে পারলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সহানুভূতির বিকাশ হয়। তা'ছাড়া, শিক্ষার্থীরা সব সময় বয়স্কদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষক যে পরিমাণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারবেন, শিক্ষার্থীরা তত বেশী পরিমাণে এই গুণের অধিকারী হবে। তাই সহানুভূতি বিকাশে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বও অনেকখানি আছে। তা'ছাড়া, এই সহানুভূতির বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশের উপর। সুতরাং এই গুণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও প্রয়োগ করতে হবে।

সহানুভূতির গুরুত্ব ও বিকাশ

সহযোগিতাও (co-operation) এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট। সমাজজীবনে ব্যক্তি যদি পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করতে না পারে তা'হলে সে কখনই তৃপ্তি পাবে না। তাই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে এই সহযোগিতামূলক মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা। বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের উপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব জাগ্রত হয়। তা'ছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমেও শিশুদের মধ্যে এই সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করা যায়। সহযোগিতার বিরুদ্ধে কাজ করে, এরকম সব প্রক্ষোভের বিকাশকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেমন—ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদির অনুভূতিগুলো যাতে যথেচ্ছ প্রকাশের সুযোগ না পায় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

সহযোগিতার বিকাশ

প্রতিযোগিতামূলক (competitive) মনোভাব, সামাজিক বিকাশের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন উভয়েরই উন্নতি হয়। তাই বিদ্যালয়ে, এই ধরনের মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত না হয় সে দিকেও নজর রাখার দরকার। প্রতিযোগিতা যদি সহযোগিতাকে ব্যহত করে, তা'হলে সে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিজীবনের সহায়ক হবে না।

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের বিকাশ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন কাজে উৎসাহিত করে এই মনোভাব জাগ্রত করতে পারেন।

এছাড়া, আরও অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমরা শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি। যেমন, বন্ধুত্বভাব, নেতৃত্ব ইত্যাদি।

হানিকর প্রক্ষোভের দমন

কিন্তু কিছু কিছু প্রবণতা আছে যারা সুস্থ সামাজিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—নিয়মানুবর্তীতার অভাব, আক্রমণ ধর্মীতা, সব কিছুর প্রতি অনীহা ইত্যাদি। এই সব প্রবণতাগুলোকে শিশুর মধ্য থেকে দূর করতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। প্ররোচনা, আলোচনা, এবং প্রকাশের সুযোগের অভাব ঘটিয়ে শিক্ষক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দূর করতে পারেন।

সবশেষে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষককে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সামাজিক বিকাশ সমাজ পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। তাই

বিদ্যালয়ের সংগঠন ও সামাজিক বিকাশ

সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা সমাজ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। যে সব কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয় সেগুলোকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সেগুলোর চর্চার সুযোগ পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the general trend of social development from childhood to adolescence. [পৃঃ ২০৬-২১১] (B. U. B. A. '69)
2. Indicate the stages of social development of young educands. Can their social development be helped? Discuss. [পৃঃ ২০৬-২১১ ; ২১৩-২১৬] (C. U. B. T. '69)
3. What are the various factors which contribute to the social development of the children. [পৃঃ ২১১-২১৩]
4. Discuss the role of the school and the teachers in bringing about social maturity of the school children [পৃঃ ২১৩-২১৬]
5. What is meant by social maturity? How the teacher can halp in bringing about social maturity. [পৃঃ ২১০-২১১ ; ২১৪-২১৬]
6. What is meant by socialization? Discuss the various stages of sacialization in the life of the children. [পৃঃ ২০৮-২১০]
7. Write notes on the following ;
   (a) Social maturity. [পৃঃ ২১০-২১১]
   (b) Characteristics of social development [পৃঃ ২২০-২২১]

ষোড়শ অধ্যায়

জীবন বিকাশের স্তর

[STAGES OF DEVELOPMENT]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি, মানুষের জীবনে বিকাশের ধারা এক অবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলে। আমরা তার জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি।

সূচনা

কিন্তু, মানুষের জীবনে তার স্বরূপ কি রকম, সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করার দরকার। তার দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশ, কি ভাবে ব্যক্তিজীবনে সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করে, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিজীবনে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিজীবনের অনুশীলন প্রয়োজন। কিন্তু এই ধরনের আলোচনা এত দীর্ঘ হবে যে তার থেকে বিকাশের ধারা সম্পর্কে একটা সর্বাঙ্গীন ধারণা পেতে অসুবিধা হবে। তাই মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিজীবনের বিকাশকে অনুশীলন করার জন্য বয়স ও বিকাশ-মূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাকে কয়েকটা স্তরে (stage) ভাগ করেছেন। শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য বলে, এই স্তর বিভাগের মধ্যে মনোবিদ্‌গণের মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ তার জীবনকে বয়সক্রম অনুযায়ী ভাগ করেছেন, আবার কেউ তার জীবনকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ভাগ করেছেন। মনোবিদ **পিকুনাস্‌** (J. Pikunas) যে স্তর বিভাগ করেছেন তা যেমন পরিপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণও বটে। তিনি মানুষের জীবন বিকাশের ধারাকে দশটি স্তরে ভাগ করেছেন, বয়সানুযায়ী। যেমন—

॥ এক ॥ **প্রাক্‌ জন্মস্তর (Prenatal Stage)**—প্রথম গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের যে অবস্থা ও বিকাশ তাকে এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

॥ দুই ॥ **সদ্যজাত স্তর (Neonatal stage)**—জন্মের পর থেকে প্রথম চার সপ্তাহকে এই স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

॥ তিন ॥ **প্রথম শৈশবের স্তর (Early infancy)**—এক মাস বয়স থেকে দেড় বৎসর বয়স কাল পর্যন্ত অবস্থা।

॥ চার ॥ **শৈশবের শেষ স্তর (Late infancy)**—দেড় বৎসর বয়স থেকে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত বিকাশ কালকে এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥ **প্রাথমিক বাল্য স্তর** (Early childhood)—আড়াই বৎসর বয়স থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

॥ ছয় ॥ **মাধ্যমিক বাল্য স্তর** (Middle childhood)—পাঁচ বৎসর থেকে নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত।

॥ সাত ॥ **প্রান্তীয় বাল্যস্তর** (Late childhood)—নয় থেকে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত।

॥ আট ॥ **যৌবনাগমের স্তর** (Adolescence)—বার থেকে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

॥ নয় ॥ **বয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক স্তর** (Adulthood)—একুশ থেকে সত্তর বৎসর বয়স কালকে এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

॥ দশ ॥ **বার্দ্ধক্য** (Senescence)—সত্তর বৎসরের পরের অবস্থাকে। **পিকুনাস্** (Pikunas) এই সব স্তরের মধ্যেও আরও কিছু কিছু ভাগ করেছেন। কিন্তু এত বিশদভাগ আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রয়োজনে আসবে না। বিখ্যাত, শিক্ষাবিদ্ **আর্নেস্ট জোনস্** (Ernest Jones) জীবন বিকাশের ধারাকে চারটে স্তরে ভাগ করেছেন—॥ এক ॥ **শৈশব** (Infancy)—পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ॥ দুই ॥ **বাল্য** (Childhood) বার বৎসর বয়স পর্যন্ত, ॥ তিন ॥ **যৌবনাগম** (Adolescence)—আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ॥ চার ॥ **প্রাপ্ত বয়স** (Maturity)—আঠার বৎসর বয়স থেকে পরবর্তীকাল।

আরও বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্নভাবে এই স্তর বিভাগ করেছেন। তাঁদের এই স্তর বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকে আবার শিক্ষাস্তর অনুযায়ী জীবন বিকাশের স্তর বিভাগ করেছেন। যেমন—॥ এক ॥ প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর [Pre-School stage]—জন্ম থেকে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত অবস্থা; ॥ দুই ॥ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর (Stage of Primary grade)—ছয় থেকে আট বৎসর বয়স পর্যন্ত। অর্থাৎ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। ॥ তিন ॥ উচ্চ প্রাথমিক স্তর (Stage of higher primary grade)—নয় থেকে এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। ॥ চার ॥ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (Stage of Lower primary grade)—বার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এর মধ্যে পড়ে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণী। এবং ॥ পাঁচ ॥ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর (Stage of Higher Secondary grade)—পনের থেকে সতের বৎসর পর্যন্ত। বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কাল।

যাই হউক, এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও মতভেদ আছে। তাই আমাদের এই আলোচনার মধ্যে কোন বিশেষ মতবাদকে মেনে নেওয়া

যায় না। তবে আলোচনার স্থবিধার জন্য আমরা মোটামুটিভাবে জোন্‌সের (Jones) যে শ্রেণী বিভাগ, তার পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর হ'ব। কারণ, যে কোন শ্রেণীবিভাগই আমরা বিচার করি না কেন, দেখা যাবে সেখানে ব্যক্তিজীবনের বিকাশের অবিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। স্থতরাং, আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয়, ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক বিকাশের ধারা অনুশীলন করা, তা আমরা যে কোন শ্রেণী বিভাগের সাহায্যে করতে পারি। এই সঙ্গে আমরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা পর্যায়ের কথাও উল্লেখ করব, যাতে দু'রকমের শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্যই বজায় থাকে। আমরা এখানে শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত স্তর সম্পর্কে আলোচনা করব। অন্য স্তরগুলো আমাদের আলোচনার বহির্ভুক্ত।

শৈশব কাল
[Infancy]

শৈশবে শিশুর বিকাশের হার খুব বেশী থাকে। সাধারণতঃ প্রথম পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স কালকে এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিশুর শিক্ষার কথা বিবেচনা করে, একে প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) বলা যেতে পারে। এই বয়স কালের বিকাশের হারের দ্রুততার জন্য অনেকে এই স্তরকে দুটো ভাগে ভাগ করে থাকেন। একটাকে বলা হয় প্রাথমিক শৈশব কাল (Early Infancy) এবং প্রান্তীয় শৈশবকাল (Late infancy)। স্থতরাং, এই দুই স্তরের বিকাশ আমরা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব। প্রাথমিক শৈশবকে আমরা তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত বিবেচনা করব এবং পরবর্তী পর্যায়ে ছয় বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত আলোচনা করা হবে।

প্রাথমিক শৈশবের স্তর
[Early Infancy]

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

(এক বৎসর থেকে তিন বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত দৈহিক বিকাশের হার খুব দ্রুত থাকে। তার দেহের আয়তনের বৃদ্ধি খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় এই বয়সে।) প্রথম দু'বছরে লম্বায় শিশুরা দশ ইঞ্চি থেকে পনেরো ইঞ্চি বাড়ে। কাঁধ চওড়া হয়। মাথার তুলনায় দেহ কাণ্ডের বিকাশই বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। স্নায়ুতন্ত্রেরও (Nervous system) দ্রুত বিকাশ হয় এই স্তরে। স্নায়ুকোষের (Nerve cell) বৃদ্ধি হয়। এবং বিভিন্ন ধরনের স্নায়বিক উপাদান পরিপূর্ণতা লাভ করে ইন্দ্রিয়গুলো বাড়ে এবং তাদের কাজের উন্নতি হয়। (বিশেষ সংবেদনের (special sensation) বিকাশ হয়। শব্দ, আলো, ব্যথা, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদিকে তারা পৃথক পৃথক

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে শিখে। এই সময়ের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ের কাজের পরিপূর্ণতা আসে একথা বলা যেতে পারে। দেহ সঞ্চালনের (Motor development) দিক থেকেও শিশুর বিকাশ এই বয়সে খুব দ্রুত হারে হয়। জন্মাবস্থায় তার মধ্যে দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিতা (Mass action) লক্ষ্য করা যায়। জন্মের পর তার দেহযন্ত্রের কাজের মধ্যে পৃথকীকরণ (differentiation) লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ক্রমে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে ক্রমে সে বসতে শিখে, হামাগুড়ি দিয়ে স্থান পরিবর্তন করতে শিখে, দাঁড়াতে শিখে, হাঁটতে শিখে। কোন বিশেষ বস্তুকে উপযুক্ত অঙ্গের দ্বারা ধরতে শিখে। মোটামুটি ভাবে এই বয়সের মধ্যেই শিশুর দেহ তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রাধীনে এসে যায়।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

মানসিক বিকাশের দিক থেকে প্রাথমিক শৈশব স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে তার আত্ম সচেতনতার বিকাশ হয়। এই স্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক বিকাশ হ'ল ভাষার বিকাশ (Language development)। জন্মাবস্থায় তার এক মাত্র ভাষা শুধু কান্না (crying) ছাড়া কিছুই থাকে না। কিন্তু এই কান্না ধীরে ধীরে একটা ভাব প্রকাশের রূপ নেয়। ছয় মাস বয়সে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সে এই বয়সে শুধু শুধু কাঁদে না বা দুঃখ, আনন্দ সব কিছু প্রকাশের জন্য কাঁদে না। কোন বিশেষ অসুবিধা বুঝানোর জন্য কাঁদে। কোন নতুন লোক দেখলে কাঁদে। এই ভাবে তার কান্না তার মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়। পরে, তার দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভাষার বিকাশ শুরু হয়। জন্মের পর প্রথম বৎসরে ভাষার বিকাশ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তবে নয় বা দশ মাস বয়স থেকে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য সে কিছু কিছু ভাষা ব্যবহার করে। এক বৎসর বয়সে সে মা-বাবা, ইত্যাদি চার পাঁচটা শব্দ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু, এর পরেই প্রায় দেড় বৎসর বয়স থেকে তার ভাষার বিকাশ দ্রুততর হয় এবং দুই বৎসরের শেষে সে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ শব্দ আয়ত্ব করে। এবং তিন বৎসরের মধ্যে তার শব্দ ভাণ্ডার বেড়ে প্রায় ৯০০ এর কাছাকাছি যায়। তবে এই তথ্য আমাদের দেশের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে বিকাশের হারের প্রকৃতি একই রকম থাকে। এই বয়সে শিশুরা মোটামুটি ভাবে ভাষার সাহায্যে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে। মানসিক বিকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল কৌতূহল। এই বয়সে শিশুদের মধ্যে আশে-পাশের বস্তুর প্রতি কৌতূহল দেখা দেয়। তবে এই কৌতূহলের কাল কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে বেশী সময় স্থায়ী হয় না। মনোযোগেরও পরিবর্তন হয় খুব দ্রুত।

জীবনের এই স্তরে প্রক্ষোভিক বিকাশও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রিজেস্ (Bridges) এর মতবাদ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তাঁর এই মতবাদ অনুযায়ী প্রায় দুই বৎসর কালের মধ্যে শিশুর প্রক্ষোভগুলোর পৃথকীকরণ (differentiation) হয়। প্রাথমিক আনন্দ ও দুঃস্থ মনোভাব থেকে ধীরে ধীরে রাগ, ভয়, উল্লাস, ভালবাসা ইত্যাদি প্রক্ষোভের বিকাশ শিশুর মধ্যে হয়ে থাকে। তার প্রাথমিক প্রক্ষোভ-মূলক প্রতিক্রিয়াগুলো মায়ের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে থাকে। এবং এই স্তরের শেষের দিকে শিশু অন্য ব্যক্তির প্রতিও প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। শিশুর যৌন জীবনের প্রাথমিক বিকাশও এই স্তরে হয়ে থাকে। এই স্তরে শিশুর যৌন শক্তি (Libido বা, Sex-energy), নিজের দেহের মধ্যেই চরিতার্থ হয়। তার এই যৌন শক্তির বিকাশের স্তরকে ফ্রয়েদ্ (Freud) বলেছেন আত্মরতির স্তর (Auto-erotic stage)। এই পর্যায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা, নিজের দেহের মধ্যে যৌন উত্তেজক কেন্দ্রের (erotic zones) মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয়। ফ্রয়েদীয়দের মতে, মায়ের দুধ খাওয়ার সময়, বা মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় তার দেহের বিভিন্ন অংশে যে উত্তেজনা হয় তার মাধ্যমেই শিশু এই অবস্থায় যৌন পরিতৃপ্তি লাভ করে।

প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বিকাশের দিক থেকেও এই বয়সে শিশুর মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মাবস্থায়, শিশুর মধ্যে কোন রকম সামাজিক আচরণই লক্ষ্য করা যায় না। তাকে সামাজিক বা অসামাজিক কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তার প্রাথমিক সামাজিক আচরণ, হাঁসা, বা সমবেদনা মাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে, বাবা, ভাই, বোনদের কেন্দ্র করেও তার বিকাশ হয়। অনেক সময় প্রতিবেশী সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই বয়সে শিশুরা খুব বেশী আত্মকেন্দ্রিক থাকে বলে, সব কিছুকে নিজের অধিকারে রাখতে চায়। ফলে সমবয়সীদের সঙ্গে সার্থক সামাজিক প্রতিক্রিয়া করে, খুব বেশী সময় মানিয়ে চলতে পারে না।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

প্রান্তীয় শৈশব কাল
[Late Infancy]

তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এই কালকে অনেকে প্রথম বাল্যের স্তর (Early childhood) হিসেবেও বিবেচনা করে থাকেন। পরবর্তী-কালে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠার পেছনে এই স্তরের বিকাশ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

এই স্তরেও দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হয়। এই স্তরে পেশীর বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। শিশু এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের দেহ সঞ্চালন-মূলক খেলাধূলা করে এবং তার ফলে তার পেশী মজবুত হয়। দেহ সঞ্চালনের ক্ষমতাও বাড়ে। বিভিন্ন দিক থেকে সে সঞ্চালনমূলক দক্ষতাও অর্জন করে। কোন কিছুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা, বল ছোঁড়া বা কোন কিছু জিনিস ছোঁড়া, দৌড়ানো, লাফানো, উঁচু জায়গায় চড়া, সাহায্য ছাড়াই সিঁড়িতে ওঠা, ইত্যাদি কাজগুলো সহজে করতে পারে। দৈহিক বিকাশের ফলে এই সব ক্ষমতা সে অর্জন করে। তা'ছাড়া, ছোট-খাট যন্ত্রপাতিও শিশুরা ব্যবহার করতে শিখে, হাত-সঞ্চালনের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

মানসিক বিকাশও এই স্তরে খুব দ্রুত হারে হয়ে থাকে। পূর্বস্তরে যে ভাষার বিকাশ শুরু হয়েছিল তা আরও বাড়ে। মনোবিদ্ স্মিথ্ (Smith) বলেছেন, এই স্তরের শেষে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার প্রায় ২০০০ মত গিয়ে দাঁড়ায়। তা'ছাড়া শব্দের সমন্বয় করতে সে শিখে। পরিপূর্ণ বাক্যের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে। এই অবস্থা কৌতুহল (Curiosity) এবং অনুসন্ধান করার ইচ্ছা প্রবল হয়। পারিপার্শ্বিকের সব কিছু সম্পর্কে সে প্রশ্ন করে। সব কিছু নাড়াচাড়া করে দেখতে চায়। যে খেলনা নিয়ে সে খেলে, তার কলকব্জা সম্পর্কে জানবার ইচ্ছা দেখা যায়। এই স্তরে তার ধারণাও জন্মাতে (concept formation) আরম্ভ করে। সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে তার সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা গ্রহণ করে। আত্ম নির্ভরতার ভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। এই বয়সে শিশুর মনের উপর সব কিছু ঘটনাই বিশেষভাবে দাগ কেটে যায়। তাই তার বৌদ্ধিক বিকাশও (Intellectual development) এই স্তরে হয়। জ্ঞান সঞ্চয়ের ক্ষমতা জন্মায়। কল্পনা শক্তির বিকাশ হয়। কল্পনামূলক আজগুবি গল্প শুনতে ভালবাসে। কল্পনা বিলাস (Fantasy) এই বয়সে খুব বেশী রকম দেখা যায়। শিশু তার নিজের কাল্পনিক রাজত্বে বিচরণ করে। তবে বাস্তব পরিবেশের সংঘাতে তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণের ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, শিখন (Learning) শুরু হয়। অনুকরণ করার প্রবণতাও তাদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দেয়। তারা বয়স্কদের আচরণ অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। তবে এই অনুকরণ শুধুমাত্র অনুবর্তনের (conditioning) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিছুটা বিচার বুদ্ধিও কাজ করে।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

এই স্তরে প্রক্ষোভিক বিকাশের ফলে, শিশুর প্রক্ষোভের আরও পৃথকীকরণ হয়। পরিবারকে ছাড়িয়ে, তার স্নেহ-ভালবাসা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়। তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ভালবাসা দেখা যায়, অন্য গুরুজনদের প্রতি

ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়। তা'ছাড়া, আশঙ্কা (anxiety), লজ্জা (shame), ঘৃণা (hate), ঈর্ষা (jealousy) ইত্যাদি মনোভাবের বিকাশ হয়। তার প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া দ্রুত পরিবর্তন হয়। একটুতে খুব রেগে যায় আবার পর মুহূর্তেই ভুলে যায়। এই স্তরেই তার প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে সুসংবদ্ধ হয়ে সেন্টিমেন্টের (sentiment) বিকাশ শুরু করে। বিশেষভাবে এই স্তরে পৃথক পৃথক বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর সেন্টিমেন্ট গঠন আরম্ভ হয় (sentiment in respect of concrete-particular object)। যৌন জীবনের বিকাশের দিক থেকেও এই স্তরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বস্তরের আত্মরতি-মূলক যৌনতা (auto-erotic stage) থেকে শিশুর যৌন আকাঙ্ক্ষা বাইরের ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় ছেলেরা মায়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়; এবং মেয়েরা বাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফ্রয়েদ মনে করেন শিশুদের এই যে বিপরীত লিঙ্গের বাবা বা মায়ের প্রতি আকর্ষণ, তা তাদের যৌন শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই হয়ে থাকে। ফ্রয়েদ (Freud) ছেলেদের মায়ের প্রতি ভালবাসাকে নাম দিয়েছেন **ঈদিপাস কমপ্লেক্স** (Oedipus Complex) এবং মেয়েদের বাবার প্রতি আকর্ষণকে বলেছেন **ইলেকত্রা কমপ্লেক্স** (Elektra Complex)। এই দু'টো নামই প্রাচীন গ্রীক কাহিনী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ধরনের যৌনতা বিকাশের ফলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভয় দেখা দেয়। তারা ভাবে এই যে মার প্রতি আশক্তি, এর জন্য বাবা তাকে শাস্তি দিবেন; বা বাবার প্রতি যে আসক্তি তার জন্য মা মেয়েদের শাস্তি দিবেন। একে ফ্রয়েদ্ বলেছেন **ক্যাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স** (Castration Complex)। এ সম্পর্কে অন্যত্র আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব। যাই হউক এই ভয় থেকে ছেলেমেয়েরা আবার তাদের ভালবাসার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে নেয়, অর্থাৎ, ছেলেরা বাবাকে মায়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে বাবাকেই ভালবাসতে আরম্ভ করে এবং মেয়েদেরও মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা যায়। এই অবস্থাকে সমকামিতা পর্যায় (Stage of homo-sexuality) বলা যায়। এমনিভাবে যৌন জীবনের বৈশিষ্ট্য এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে কিছু কিছু নীতি-বোধও জাগ্রত হয়।

প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বিকাশের দিক থেকেও শিশু এই স্তরে পূর্বস্তরের চেয়ে অনেক পরিণত হয়। তার সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র বাড়ে। এই বয়সে তার সমাজ শুধুমাত্র পরিবারের কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিবেশীরাও তার সমাজজীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়; তা'ছাড়া খেলার সাথীরাও আছে। **সহযোগিতা** (co-operation), **সহানুভূতি** (sympathy), ইত্যাদি সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে লক্ষ্য করা

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

যায়। তা'ছাড়া সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা মনোভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যদি তার নিজের খেলনা বা অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে তার অহংকার থাকে তবুও সব কিছুকে নিজের অধিকারে পাওয়ার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূর্বে ছিল তা অনেকখানি কমে যায়। বন্ধুত্বের বিকাশ হয়, এবং যাদের সে ভালবাসে তাদের নিজের জিনিস দিতে বিশেষ কোন আপত্তি করে না। ঝগড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণও এই বয়সে লক্ষ্য করা যায়। সমবয়সীদের নিয়ে দল গঠনের প্রবণতাও এই বয়সে লক্ষ্য করা যায়।

শৈশবের শিক্ষা
[Education in Infancy]

শিক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করে শৈশবকালকে প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর (Pre school stage) বলা হয়। সুতরাং এর থেকে ধারণা হ'তে পারে, জীবন বিকাশের এই স্তরের কোন গুরুত্বই শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই। কিন্তু এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বরং উল্টো কথাটাই ঠিক। মানোবিদ্যার জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাকে পরিচালনা করতে হলে এই স্তরের বিকাশের গুরুত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ, জীবন বিকাশের এই স্তরে, শিশুরা পরিবারের মধ্যে থেকে জীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে, দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক দিক থেকে তাই পরবর্তীকালে তাদের ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের ভিত্তি ভূমি হিসেবে কাজ করে। তাই পিতামাতাকে শিশুর বিভিন্ন দৈহিক-মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশের প্রতি বিশেষ-ভাবে নজর দিতে হবে। বিশেষভাবে দৈহিক বিকাশের ফলে শিশুদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অভ্যাস (Habit) গঠিত হয়। পিতামাতাকে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তারা সু-অভ্যাস গঠন করে। কু-অভ্যাস গঠন করলে পরে তার থেকে শিশুকে মুক্ত করার জন্য অনেক বেগ পেতে হয়। মানসিক বিকাশের স্তরে, তার ভাষার বিকাশ হয়। যাতে শিশু অস্বাভাবিক কোন উচ্চারণ না শিখে সে দিকেও পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের কল্পনার বিকাশ যাতে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়, তার জন্য ছড়া, গল্প, খেলনা নির্বাচনের ব্যাপারে পিতামাতাকে বিশেষভাবে সচেতন হ'তে হবে। ছন্দ ও গানের প্রতি এই বয়সের শিশুদের ঝোঁক দেখা যায়। এটা তাদের প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই এই প্রবণতা যাতে বজায় থাকে সে দিকেও লক্ষ্য রাখার দরকার। প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এই স্তরে হয়। শিশুরা যাতে তাদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ করতে পারে তার প্রাথমিক শিক্ষা গৃহ পরিবেশেই হবে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, পিতামাতা শিশুর প্রক্ষোভিক

পিতা-মাতার দায়িত্ব

বিকাশকে যদি যথাযথ দিকে এই বয়সে পরিচালিত করতে পারেন, তা হ'লে পরবর্তীস্তরে তার প্রক্ষোভমূলক পরিমনন (emotional maturity) ত্বরান্বিত হয়। শিশুর সামাজিক বিকাশ যাতে আদর্শস্থানীয় হয় সে ব্যাপারেও পিতা-মাতা সাহায্য করবেন। তাঁরা নিজেদের আচরণ দিয়ে শিশুকে প্রভাবিত করবেন। সুতরাং, তাঁদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হওয়ার দরকার। তাছাড়া, শিশুরা দল গঠন করতে গিয়ে যাতে খারাপ সঙ্গীর মধ্যে না পড়ে, এবং দলের মধ্যে কু-অভ্যাস গঠন না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এক কথায় আমরা বলতে পারি, শৈশবের সব কিছুর শিক্ষার দায়িত্ব পিতা-মাতাকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে পিতা-মাতাগণ শিক্ষার ব্যাপারটাকে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু গৃহ পরিবেশে এই প্রাথমিক স্তরে যথাযথ শিক্ষা না হ'লে পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষককে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যদিও এই স্তরকে প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) বলা হচ্ছে তা'হলেও কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে, যেখানে আমরা এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা দিতে পারি। নার্শারী বা কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে এই স্তরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, এবং পরবর্তী স্তরে প্রয়োজনীয় দিকের কথা চিন্তা করে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে বিকাশ করার জন্য, নানা ধরনের খেলনা দেওয়া হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সজাগ করে তোলার জন্যও বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। **মন্তেস্বরী** পদ্ধতিতে ডিডাকটিক্ যন্ত্র (Deductic apparatus) এবং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে গিফট্স এবং অকুপেশন (Gifts and occupation) এই কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এছাড়া বিভিন্ন দলগত খেলার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক বিকাশেরও চেষ্টা করা হয়। ছড়া, গান, ছবি আঁকা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টাও করা হয়। যেহেতু, এই বয়সের শিশুদের মায়ের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি থাকে, সেহেতু এই সব বিদ্যালয়ে, শিক্ষয়িত্রীরাই পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এর ফলে শিশুরা শিক্ষিকাকে মায়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে, এবং স্বাভাবিক গৃহ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার আনন্দ লাভ করে।

প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাল্যকাল
[Childhood]

বাল্যকালের বিকাশের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী স্তরের বিকাশের বিশেষ কোন মিল নেই। আচরণ, মানসিকতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য

সব দিক থেকেই এর সঙ্গে শৈশবের পার্থক্য আছে। শৈশবের বৈশিষ্ট্য হ'ল অস্থিরতা। কিন্তু বাল্যে এসে দেখা যায় শিশুরা যেন অনেক পরিপূর্ণ। সাধারণতঃ ছয় বৎসর থেকে এগার বৎসর পর্যন্ত বয়সকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে এর তারতম্য কিছুটা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই স্তরকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। **প্রাথমিক বাল্যকাল** (Early childhood) এবং **প্রান্তীয় বাল্যকাল** (Late childhood)। এই প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা পৃথক পৃথক ভাবে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রাথমিক বাল্যকাল
[Early-Childhood)

এই স্তরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্যের কিছু মিল আছে। আর তা থাকা স্বাভাবিক। কারণ জীবনের বিকাশের ধারার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। সাধারণতঃ ছয় বৎসর থেকে আট বৎসর পর্যন্ত কালকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষাগত দিক থেকে বলা যেতে পারে এটা নিম্ন প্রাথমিক (Lower primary grade) স্তর। অর্থাৎ, প্রথম নিয়ম-মাফিক শিক্ষা শুরু করার স্তর। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করব।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

জীবন বিকাশের এই স্তরে, দৈহিক বিকাশের হার আগের চেয়ে অনেক কমে যায়। এই সময়ে শিশুরা বৎসরে গড়ে দুই থেকে তিন ইঞ্চি করে লম্বায় বাড়ে। এবং ওজনের দিক থেকেও গড় বৃদ্ধির হার তিন থেকে ছয় পাউণ্ডের মধ্যে থাকে। যখন সে স্কুলে আসে তখন দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে তিন ফুট এবং ওজনে প্রায় আটচল্লিশ পাউণ্ড মত হয়। তবে ব্যক্তিবিশেষে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় তাদের পূর্ণ বয়সের ওজন এবং উচ্চতার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তারা এই স্তরে পৌছানোর সময় অর্জন করে। তবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দৈহিক বিকাশ একটু বেশী হয়। তবে এই বয়সে বালক বালিকারা, নিজেদের দেহ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকে না। দেহ-সঞ্চালনের দিক থেকে এদের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দৌড়ানোর ক্ষমতা, লাফানোর ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। দেহকে বেশীক্ষণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখতে পারে না। বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। দাঁত পড়তে থাকে এবং তার বদলে স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে। দেহের অঙ্গ ভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ কোন ত্রুটি থাকে না। চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়। মস্তিষ্কের বিকাশও একটা মোটামুটি উন্নত স্তরে এসে

পৌঁছায়। ছয় থেকে আট বৎসরের মধ্যে তার মস্তিষ্ক প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মানসিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট উন্নত হয়। ভাষার দিক থেকে দেখা যায়, তাদের শব্দ ভাণ্ডার যথেষ্ট বাড়ে। স্মৃতি শক্তিও এই বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রখর থাকে। এই সময়ে সে যে সব অভিজ্ঞতা শিখে তা অনেক দিন মনে রাখতে পারে। লেখা এবং পড়া শিখার প্রতি বিশেষভাবে ঝোঁক এই বয়সে দেখা যায় এবং এ বিষয়ে কিছু উন্নতি হ'লেই তার মধ্যে গর্ববোধ লক্ষ্য করা যায়। জীবন বিকাশের এই স্তরেও বালক-বালিকাদের মনোযোগ খুব চঞ্চল থাকে। এবং মনোযোগের পরিসরও কম থাকে। এক সঙ্গে অনেক জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। সব সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি চায়। এই মনোযোগ বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না বলে, এবং অভিজ্ঞতাও কম থাকে বলে, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কোন কাজ সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে করতে পারে না। এই বয়সে তাদের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে ধারণাও (concept) অনেক বাড়ে। বিশেষভাবে বস্তুর উপযোগিতার কথা বিবেচনা করেই বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণা হয় এই স্তরে। যেমন চেয়ার সম্পর্কে তাদের ধারণা হ'ল এটা বসার জন্য একটা বস্তু। কিন্তু এই বয়সের ধারণা তার বেশীদূর আর অগ্রসর হয় না। কল্পনা বিলাস এ বয়সেও লক্ষ্য করা যায়। এবং কাল্পনিক ঘটনা এবং বাস্তব ঘটনার মধ্যে সব সময় সঠিকভাবে পার্থক্য করতে পারে না। পাঠ্য পুস্তকে যে সব গল্প বা কাহিনী পড়ে তাদের সবকে সে সত্যি ঘটনা বলে মেনে নেয়। তবে কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় এই বয়সে। বিশেষ ভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনার সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সে বুঝতে পারে। প্রায় সাত থেকে আট বৎসর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছু যুক্তিশক্তির (Reasoning) বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই সময়ে স্থান-কাল সম্পর্কে জ্ঞান খুবই অপরিণত থাকে। সময়ের পরিমাপ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান এতই কম থাকে যে, তাদের যদি বলা হয় 'আসছে রবিবার মামা বাড়ী যাবো' তার অর্থও যা 'এক বছর পরে কোথাও যাবো' তাও বলা একই ব্যাপার। অবশ্য এই স্তরের শেষের দিকে তাদের মধ্যে সঠিকভাবে সময় সম্পর্কে ধারণা জন্মে। তবে তা খুব বেশী দূরের হ'লে তারা বুঝতে পারে না। দূরত্ব সম্পর্কেও তাদের ধারণা খুব আবছা থাকে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ দেখা যায় না। খুব স্থূল বিষয় নিয়ে রসিকতা করে। এমনকি, তাদের রসিকতার ফলে, অনেক সময় অন্যের দৈহিক ক্ষতিও হয়। এই বয়সে সংখ্যা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশও এই স্তরে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম কিছু প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাববোধ করে। এই বয়সে নতুন পরিবেশে মেলামেশা শুরু করে বলে তাদের মধ্যে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রক্ষোভ প্রকাশ কিছুটা প্রথম প্রথম নিয়ন্ত্রীত হয়। তবে এই স্তরে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের স্বাভাবিক প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। ভয়, বিশেষ ভাবে এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে দেখা যায়। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, এমনকি বিদ্যুৎ চমকালেও তারা ভয় পায়। ভয় বিশেষভাবে বিপদের আশঙ্কা থেকেই দেখা দেয়। অনেক সময় স্নেহের অভাব বোধ থেকে এই ধরনের ভয় দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যৌন চেতনা এই স্তরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন রকম বহিঃপ্রকাশই তার দেখা যায় না। একে ফ্রয়েদ্ বলেছেন সুপ্তকাম অবস্থা (Latency period)। এই বয়সে ছেলেরা দলের মধ্যে থাকার দরুন, প্রক্ষোভমূলক আচরণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে। পূর্বে রাগ হ'লেই রাগের বিষয় বস্তুকে আক্রমণ করতো বা জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিত, সে রকম আর দেখা যায় না। নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যভাবে সে রাগকে প্রকাশ করে। বয়স্কদের সমর্থন (approval) করা বা না করার দ্বারা তাদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

জীবন বিকাশের এই স্তরে যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, তা তাদের পরবর্তী জীবন বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই অবস্থায়ই শিশুরা তাদের প্রাথমিক আত্মকেন্দ্রিকভাব কাটিয়ে উঠে পরিপূর্ণভাবে সমাজ-জীবনে অংশ গ্রহণ করে। দলবদ্ধভাবে খেলাধূলা করার ঝোঁক এই বয়সে খুব প্রবল থাকে। যে দলের মধ্যে সে বাস করে তার নিয়ম কানুন সে মেনে চলে। এই দলের নেতার নির্দেশ মেনে চলার প্রবণতাও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, এই দল খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ, শিশু খুব বেশীদিন কোন বিশেষ দলের সভ্য থাকে না। এক দল ছেড়ে অন্য দলের সভ্য হয়। কেউ যদি সমালোচনা করে তাদের আচরণ সম্পর্কে, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা তা খুব সহজভাবেই গ্রহণ করে। জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক স্তর নিয়ে কোন গোঁড়ামী এই বয়সে লক্ষ্য করা যায় না। তারা একেবারে মুক্তভাবে মেলামেশা করে। এই স্তরে শিশুর নৈতিক মূল্যবোধেরও বিকাশ হয়। উপদেশমূলক কাহিনী শুনতে ভালবাসে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিজের আচরণকে নীতি বোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

প্রান্তীয় বাল্যকাল
[Late-Childhood]

নয় থেকে এগার বৎসরের বয়স কালকে এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালের বিচারে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। অনেকে একে উচ্চ প্রাথমিক স্তর (upper primary grade) হিসেবেও বিবেচনা করেন। অনেক মনোবিদ্ জীবন বিকাশের স্তরের দিক থেকে একে প্রাক্ কৈশোর বা প্রাক্ যৌবনাগম স্তর (Pre-adolescence stage) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

দৈহিক বিকাশের দিক থেকে এই স্তরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্তরের বিশেষ কিছু পার্থক্য থাকে না। বিকাশের হারও পূর্ববর্তী স্তরের মত খুব মন্থর থাকে। আগের স্তরের চেয়ে ছেলেমেয়েরা গড়ে দুই ইঞ্চি লম্বায় বাড়ে। ওজনও বছরে গড়ে ছয়-সাত পাউণ্ডের বেশী বাড়ে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিকাশের হার সবচেয়ে কম থাকে নয় থেকে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে দশ থেকে এগার বৎসর বয়সের মধ্যে। তবে সাধারণভাবে এই স্তরে ওজনও দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকে। এই বয়সে দেহের নিচের দিকের অঙ্গের বৃদ্ধি বেশী হয়। ফলে ছেলেমেয়েদের পা-গুলো দেহের তুলনায় বেশী লম্বা মনে হয়। দেহের অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। হৃদ্‌যন্ত্র এবং ফুসফুস্ সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। এই বয়সের ছেলেরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নিতে পারে। দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম পেশীগুলোও এই স্তরে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। দশ বৎসর বয়সের মধ্যেই শিশুদের মস্তিষ্কের পরিমনন হয়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মানসিক বিকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের আগ্রহের বস্তুর পরিধি অনেক বেড়ে যায়। নানারকম বস্তুর প্রতি তারা আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক মনোবিদ্ বলেছেন, এই স্তরে ছেলেমেয়েদের যত বেশী পরিমাণ বস্তুর প্রতি আগ্রহ থাকে জীবনের অন্য কোন স্তরে তা থাকে না। সব কিছু জানার জন্য তার কৌতূহলও দেখা যায়। ঐতিহাসিক ঘটনা, বৈজ্ঞানিক তথ্য, প্রাকৃতিক ঘটনা সমস্ত কিছু সম্পর্কে তার কৌতূহল প্রবল থাকে। বই পড়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কোন কিছু জানার জন্য তার মধ্যে আত্ম সক্রিয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজে হাতে কলমে কাজ করতে ভাল বাসে। এই স্তরে কল্পনা বিলাস একেবারে চলে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি বেশী ঝোঁক দেখা যায়। এমন কি কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাযুক্ত গল্প শুনতে পছন্দ করে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের

মনোযোগের পরিসর (Span of attentions) অনেক বিস্তৃত হয়। কোন বিশেষ সমস্যার প্রতি অনেক বেশী সময় মনোনিবেশ করতে পারে। তবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মনোযোগের মাত্রা একটু বেশী লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তারা কাজ করতে পারে। চিন্তন শক্তির যথেষ্ট বিকাশ হয়। স্মৃতি শক্তি প্রায় প্রাপ্ত বয়সের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়; কিন্তু যুক্তি করার ক্ষমতার (Reasoning) বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষমতার বিকাশ হয় এই স্তরে। ফলে বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তু সম্পর্কে বিচার করার ক্ষমতারও (Judgement) বিকাশ হয়। ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে এই সব বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়সের সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। খুব সুন্দর ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তাদের প্রকাশ ভঙ্গী এতই পরিপক্ক হয় যে বয়স্কদের কথাবার্তার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তাই আর্নেস্ট জোনস্ (A. Jones) বলেছেন যে এই স্তরে শিশু তার বয়স্ক জীবনের সব কিছু বৈশিষ্টই প্রকাশ করে। মানসিক ধারণার দিক থেকে এই স্তরের ছেলেমেয়েরা তখনও অপরিপক্ক থাকে। তবে প্রত্যক্ষণের (Perception) পরিপক্কতা এই স্তরেই আসে। কোন বস্তুকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে জন্মায়। বৌদ্ধিক বিকাশের দিক থেকে একটা স্থায়ীভাব লক্ষ্য করা যায়, এই স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

প্রক্ষোভিক দিক থেকে অনেকে এই বয়সকালকে চিন্তা-ভাবনামুক্ত কাল হিসেবে বিবেচনা করেন। এবং তাঁদের ধারণা এই বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আনন্দ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভানুভূতির অত্যধিক প্রকাশ দেখা যায়। এ কথা ঠিক যে এই বয়সের ছেলেরা চিন্তা ভাবনা মুক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছলতা খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু, তাদের মধ্যে আশঙ্কা, ভয়, রাগ ইত্যাদি থাকে না একথা ঠিক নয়। শিশুসুলভ ভয়ের বদলে তাদের মধ্যে যথাযথ প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা দেয়। ছোট ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষা দেখা দেয়, বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তাদের মনে দেখা দেয়। বাবা-মায়ের প্রতি তাদের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় ভুল বুঝার দরুন তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

এই বয়সে শিশুরা অনেক বেশী দলগত আনুগত্য দেখায়। ফলে সামাজিক বিকাশের স্তরে অনেকখানি এগিয়ে থাকে। একা একা খেলার চেয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে খেলাধূলা করতে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা ভালবাসে। পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ক্লাব গড়ে তোলার প্রতি একটা ঝোক লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে যে

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা বহুদিন স্থায়ী হয়। দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই বয়সে দলে দলে মারা মারি করতে দেখা যায়। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের অনেক আচরণই তাদের দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিজের দলের সমর্থন পাওয়ার জন্যই সে অনেক কাজ করে। তার নৈতিক চরিত্রের মান বেশ উন্নত হয়। কিন্তু এই মান সব সময় স্থির থাকে না। কখন সে খুব উচ্চ নৈতিক মান সম্পন্ন কাজ করে, আবার এমন কাজ করে বসে যা নৈতিক মূল্য বিচারে একেবারে জঘন্য। সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি সামাজিক প্রবণতা এই বয়সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এক কথায়, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রায় বয়স্ক ব্যক্তিদের মত সামাজিক আচরণ করে থাকে। এমন কি বাড়ীর নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

বাল্যের শিক্ষা
[Education in Childhood]

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হয়। সুতরাং, শিক্ষাগত দিক থেকে জীবন বিকাশের স্তর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা বিশেষ কোন সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না, তবুও তাদের শিক্ষা দানের ব্যাপারে, শিক্ষককে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর জ্ঞান এবং আগ্রহ ও মানসিক বিকাশ যদি যথাযথভাবে না হয়, তার পরবর্তী কালের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষক এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন।

॥ প্রথমতঃ ॥ এই বয়সে শিশুদের দৈহিক বিকাশ প্রায় পরিপূর্ণতার স্তরে গিয়ে পৌছায়। দেহের বিভিন্ন পেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু কাজ করতে চায়। তাই বিদ্যালয়ে তাদের দৈহিক বিভিন্ন ধরনের দৈহিক কাজ দিতে হবে। এই কাজের মাধ্যমে তারা দেহ সঞ্চালনের সুযোগ পাবে এবং তার দ্বারা তাদের দক্ষতা বাড়বে। এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য কারা যায়। শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং যে কোন ধরনের কু-অভ্যাস দূর করতে হবে। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়ার দরকার। তাছাড়া এই সব রোগকে কি ভাবে স্বাস্থ্যাভ্যাসের দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান ছাত্রদের দিতে হবে।

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ মানসিক বিকাশের দিক থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে এই স্তরে এগিয়ে যেতে পারে, সে দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। এই বয়সের ছেলে-মেয়ের অনুরাগের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। তাদের অনুরাগের বিষয়বস্তুর

পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। তাদের এই স্বাভাবিক অনুরাগকে যদি এই বয়সে যথাযথভাবে কাজে লাগানো না যায় তা'হলে শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে না, যে সব জিনিস সম্পর্কে জানতে তারা আগ্রহী, সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে তাদের সহায়তা করতে হবে। এই সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়ার (Reading) খুব আগ্রহ দেখা যায়। এই স্বাভাবিক আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরবর্তীকালের জন্য পড়ার অভ্যাস (Reading habit) গঠন করবেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি ছাত্রদের যে ঝোঁক দেখা যায়, তাকেও শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণী কক্ষে এমন সব সমস্যার উপস্থাপন করতে হবে যার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মিল আছে। তা না হ'লে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় আগ্রহ পাবে না। এই সমস্যা তাদের যুক্তিশক্তি বিকাশেও সহায়তা করবে। এই বয়সের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ থেকে উৎসাহ প্রত্যাশা করে। তাই শিক্ষক বিভিন্ন কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করবেন। এই সময় মিথ্যা কথা বলা, ঈর্ষা করা ইত্যাদি নানা ধরনের কু-অভ্যাসও খুব সহজে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গঠিত হয়। এগুলো যাতে বিকাশের সুযোগ না পায় সে দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিশুরা এই সময় আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শিক্ষক তাদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে পারেন। কোন কিছু সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজ করতে দিবেন। মাটি দিয়ে খেলনা তৈরী করার বা ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে সামান্য কোন জিনিস তৈরী করার মাধ্যমে, তাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ না করে দিলে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে না।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথাযথভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে এবং শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রণও করতে হবে। ভয়, রাগ, ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলোকে ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংযত করার দরকার। অযথা কোন বস্তুর প্রতি ভয় যাতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয় সে দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুরা অনেক সময় প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে বিদ্যালয়ে। এবং এর থেকে তাদের মধ্যে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। এরকম অবস্থার যাতে সৃষ্টি না হয়, সে দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পরিবেশ ও গৃহ পরিবেশের মধ্যে কোন পার্থক্য উপলব্ধি না করতে পারে, সে দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাঁরা যদি নিজেদের সুমধুর স্বভাবের দ্বারা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে

না পারেন, তা'হলে শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে বিদ্যালয় সম্পর্কে ভীতি দেখা দেবে। শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষ-ভাবে সচেতন হতে হবে। এই বয়সে শিক্ষার্থীদের দলের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, এই প্রবণতার বশবর্তী হয়ে তারা যাতে না বদ্‌ সঙ্গে মেশে সে দিকে নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করে, এই দলগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার শিক্ষকদের নিতে হবে। দলের প্রভাবে তারা যাতে কিছু অন্যায় কাজ না করে, দলের প্রভাবে তাদের মধ্যে ঈর্ষা ভাব যাতে না জাগে এবং অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মনোভাব না জাগে সে দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। সহযোগিতা, সহানুভূতি, ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় সেদিকে শিক্ষক নজর দিবেন।

সবশেষে, এই বয়সের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তার আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন রকম বিচার বিবেচনা না করেই অনুকরণ করে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের সামনে আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরা। তা তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে যেমন করবেন, অন্যদিকে, বিভিন্ন আদর্শ চরিত্রের মহাপুরুষ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমেও করবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

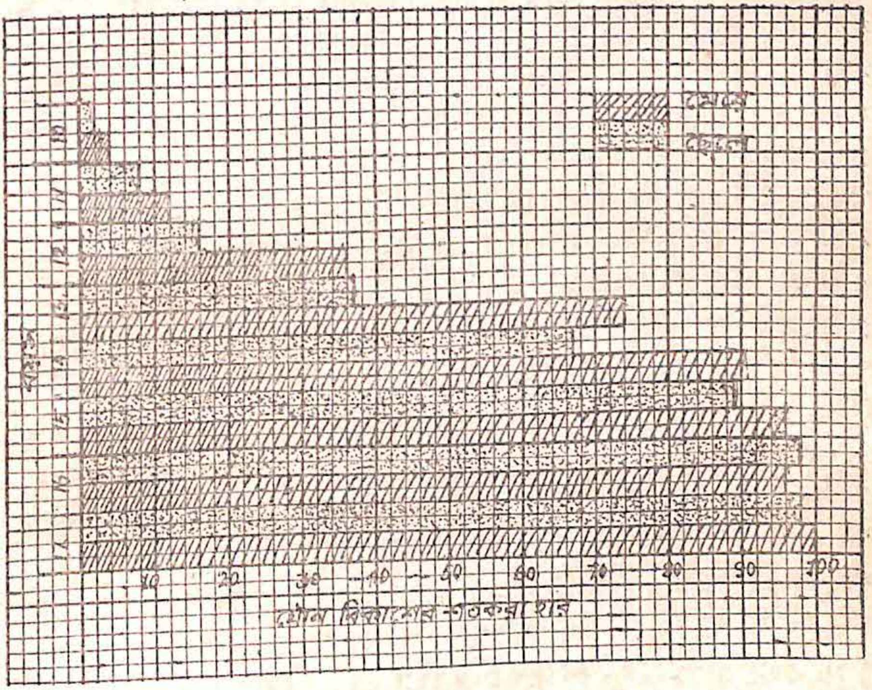
কৈশোর বা যৌবনাগম কাল
[Adolescence]

মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল হ'ল কৈশোর। এই সময়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় যে, তারা দিশে হারা হ'য়ে পড়ে। কেউ একে জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝার কাল (Stage of storm & stresses) বা উৎকণ্ঠা-দ্বন্দ্বের (strain and strife) কাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইংলণ্ডে, **হ্যাডো কমিটি** (Hadow Committee) কৈশোরের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সময়কার যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বলেছেন, এগার থেকে বার বৎসর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েদের দেহ-মনে এক নতুন জোয়ার আসে। একেই আমরা কৈশোর বলি, এই জোয়ারের মুখে যদি জীবনের তরী ঠিকমত পরিচালনা করা যায় তা'হলে তারা জীবনে ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারে। এই স্তর এগার-বার বৎসর থেকে প্রায় একুশ বৎসর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আসলে কৈশোর (adolescence) কথাটার দ্বারা কি বুঝায়? এই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্নভাবে একে প্রকাশ করেছেন। মনোবিদ্‌ **স্ট্যানলী হল্‌** (Stanley Hall) এই বয়সের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য

বুঝানোর জন্য একটা সুন্দর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেছেন—'ফ্ল্যাপার' ('Flapper')। অর্থাৎ যে পাখীর পাখার তখনও পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি, তবুও বাসার মধ্যে থেকে ওড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এরকম নানা বিশেষণে এদের ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু কৈশোর বলতে ঠিক কি বুঝায় তার থেকে পরিষ্কারভাবে আন্দাজ পাওয়া যায় না। ইংরাজী 'adolescence' কথাটা ল্যাটিন ধাতু 'adolescere' থেকে এসেছে। এর অর্থ হ'ল পরিমনের পথে বিকাশ (to grow into maturity), এই অর্থে কৈশোর (adolescence) এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজে উপযুক্ত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল আমরা আয়ত্ব করি। অনেকে কৈশোরকে দৈহিক বিকাশের একটা স্তর হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যৌন পরিণতির (Puberty) স্তরকেই অনেকে কৈশোর হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অনেকে আবার, কৈশোরকে বিশেষ বয়সকাল (age span) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন **হারলক্** (E. Hurlock)[1] বার থেকে একুশ বৎসরের বয়সকালকে কৈশোর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে তের থেকে ষোল পর্যন্ত কাল হ'ল প্রাথমিক কৈশোর এবং সতের থেকে একুশ বৎসর পর্যন্ত কাল হ'ল প্রান্তীয় কৈশোর। আধুনিককালে, কৈশোরের তাৎপর্য সামাজিক দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। কৈশোরকে এই অর্থে একটা সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক (socio-cultural) উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবনের একটা স্তর যে অবস্থায় ব্যক্তির আচরণকে শিশু সুলভও বলা চলে না, আবার পরিপূর্ণ বয়স্কদের মর্যাদাও দেওয়া যায় না। যেমন, **ডরোথি রোজার্স** (Dorothy Rogers) বলেছেন—"*Adolescence, thus viewed as a sociocultural phenomenon, is the period in his life when society ceases to regard a person as a child but does not yet accord him full adult status, role and function*"[2]। এই রকম বিভিন্ন ধরনের মতবাদ থেকে কৈশোর বলতে আসলে কি বুঝায় তা বুঝা খুবই মুশকিল। তবে আমাদের অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে সমতা রেখে, এবং সমাজ ব্যবস্থার নিয়মের কথা চিন্তা করে আমরা কৈশোরকে হারলক (Hurlock) যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেই অর্থেই বিচার করব। অর্থাৎ, বিশেষ বয়সকাল হিসেবে বিবেচনা করব। তবে তিনি যে বয়সকাল নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করার দরকার। তার কারণ, তের বৎসরের পূর্বে থেকেই অনেক সময় এই কাল শুরু হয়। তা'ছাড়া মেয়েদের এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এই দিক থেকে পার্থক্য দেখা দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন পরিণতি (Puberty) এগার-বার বৎসর বয়সে এসে

1. Child Development—E. Hurlock.
2. The Psychology of Adolescence—D. Rogers.

যায় এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে তের থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে আসে। সুতরাং এই কালকে আমরা বার বৎসর থেকে শুরু ধরবো এবং শেষ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আঠার বৎসর বয়সে প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশী দিন থাকে। মনোবিদ্ কোলেস্নিক (Kolesnik) ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন বয়সের যৌন পরিণতির যে আপেক্ষিক তুলনা করেছেন তার মধ্যে, এ বিষয়ে আমাদের ধারণারই সমর্থন মেলে।



সুতরাং, এই কাল বিচারে আমরা কৈশোরকে দু'টো ভাগে ভাগ করতে পারি। **বার থেকে চৌদ্দ বৎসর কাল পর্যন্ত প্রাথমিক কৈশোরের স্তর** (early adolescence) এবং **পনের থেকে আঠার বৎসর পর্যন্ত বা তারপর পর্যন্ত প্রান্তীয় কৈশোরের স্তর** (Late adolescence)। এখন আমরা এদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

প্রাথমিক কৈশোরের স্তর
[Eary Adolescence]

বাল্যের শান্ত অবস্থার পর শিশুর মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই এই স্তরের শুরু। বার বৎসর থেকে প্রায় চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত এই স্তর

বিস্তৃত। শিক্ষার দিক থেকে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্ররা এই স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরে দৈহিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক দিক থেকে ব্যক্তিদের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

দৈহিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই স্তরে যে সব পরিবর্তন হয়, তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যৌন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় বার থেকে তের বৎসরের মধ্যে মেয়েদের রজঃ সৃষ্টির ক্ষমতার বিকাশ হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রেও বীর্যোৎপাদনের ক্ষমতা তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণতা ঘটে। দেহের মধ্যে অন্যান্য যৌন চিহ্ন (secondary sex character) ফুটে উঠতে আরম্ভ করে, এই স্তরের শেষের দিকে, অর্থাৎ, তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও যৌন লোম (Pubic hair) দেখা দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তার বিকাশ শুরু হয়, স্তনের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এই যৌন অঙ্গের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহের পেশী (muscle) এবং হাড়ের বৃদ্ধি হয়। বিশেষভাবে বড় বড় হাড় ও পেশীর দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। লম্বায়ও তারা বেড়ে ওঠে। ওজনও বৃদ্ধি পায়। তবে এই স্তরে, মেয়েদের বিকাশ ছেলেদের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন এই বয়সের ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দৈহিক বিকাশের দিক থেকে গড়ে এক বছর পিছিয়ে থাকে। এই বয়সে দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হয় বলে, এবং দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হারে হয় বলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেহ সঞ্চালনগত সমন্বয়ের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেহের অঙ্গভঙ্গীও অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ হয়। খুব বেশী ঘাম হয়। মুখে ব্রন দেখা দেয়। দেহের বিভিন্ন যান্ত্রিক কাজও বেড়ে যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের সক্রিয়তার দরুন দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ বেড়ে যায়। পাচনতন্ত্রের সক্রিয়তার দরুন খুব বেশী খিদে হয়। গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়। সম্পূর্ণ মুখের অবয়বেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

এই স্তরে দৈহিক বিকাশ যত দ্রুত হয়, মানসিক বিকাশ এত দ্রুত হয় না। বুদ্ধির বিকাশ যা প্রাক্‌কৈশোর স্তর পর্যন্ত সমহারে এগিয়ে আসছিল, তাতে যেন কিছু হঠাৎ ভাঁটা পড়ে। তবে ধীর হ'লেও শিশুরা ধীরে ধীরে মানসিক পরিমননের দিকে অগ্রসর হয়। তার ধারণার (concept) বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। এই অবস্থায় কোন বস্তুর, তাৎপর্য সে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করতে শিখে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে সাধারণ সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তার অনুরাগের ক্ষেত্র বাল্যকালে যা ছিল তার থেকে কমে যায়। এই অবস্থা থেকে তার অনুরাগ বিশেষ বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে বিকশিত হ'তে আরম্ভ করে। এখন

মানসিক বৈশিষ্ট্য

আর ছেলেমেয়েরা সব কিছু বস্তুর প্রতি আগ্রহ দেখায় না। তবে, বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ এই বয়সে বাড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছেলেরা এই বয়সে, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখায়। আর মেয়েদের মধ্যে ভাষা, আঁকা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বেশী আগ্রহ দেখা যায়। এই বয়সে চিন্তা শক্তির যথেষ্ট বিকাশ হয় ফলে ছেলেমেয়েরা চিন্তার সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই বয়সে চিন্তার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে কোন সিদ্ধান্তের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা-ধারার সমন্বয়ের প্রবণতা। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় করতে চায়। এই স্তরে ছেলেমেয়েদের যুক্তি শক্তিরও যথেষ্ট বিকাশ হয়। যে কোন আচরণকে তারা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যদিও তাদের যুক্তি সব সময় যে ঠিক এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তবুও এই প্রবণতা তাদের পরবর্তীকালের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন বিশেষ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখার মনোভাবও এদের মধ্যে জাগ্রত হয়। বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সমালোচনায় তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। মনোযোগের চঞ্চলতা অনেক কমে যায়। কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি তারা অনেক বেশী সময় মনোযোগ দিতে পারে। বিমূর্ত চিন্তনের (abstract thinking) ক্ষমতা এই বয়সে বিকশিত হ'তে আরম্ভ হয়।

প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

প্রক্ষোভমূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অন্য বয়সের ছেলেমেয়েদের থেকে অনেক দিক থেকে পার্থক্য দেখায়। সব দিক থেকে প্রক্ষোভের বৃদ্ধি হয়। প্রক্ষোভমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ কোন সময় খুব বেশী হয়, আবার, কোন সময়ে একেবারে হয় না। এই স্তরে ছেলেমেয়েরা কখনও খুবই তীব্রভাবে আনন্দানুভূতি প্রকাশ করে, আবার, কোন সময় এমনভাবে বিমর্ষ হয় যে তারা কোন সময়ে আনন্দিত হয়েছিল বা ভবিষ্যতে কোন দিন হবে এ কল্পনাই করা যায় না। হীনমন্যতার অনুভূতি (inferiority feeling) এই সময় শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। লজ্জাভাব (shyness), অপরাধ বোধ (sense of guilt), ভয় (fear) ইত্যাদি প্রক্ষোভ-গুলো তার যৌন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে নতুনরূপ ধারণ করে এবং প্রকট সমস্যা হিসেবে দেখা যায়। কোন সময়ে আক্রমণাত্মকভাব (aggressive) বা কোন সময়ে ভীষণ মন মরা (morbid state) ভাব লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

সামাজিক দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের খুব বেশী রকম অসামাজিক মনে হয়। নিজের দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতা তার মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। তাদের দৈহিক বিকাশকে তারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তাদের ধারণা হয়, তাদের সমবয়সীদের মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তন হয় নি। এই ধারণার বশবর্তী

হয়ে তারা সামাজিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৈশবের কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে তারা আবার বেশী করে বাবা মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে এই স্তরের শেষের দিকে তাদের দলের প্রতি আকর্ষণ হঠাৎ করে আবার বেড়ে ওঠে। এবং দলের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলের কাজে নিজের ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া সব কিছু সমর্পণ করে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে দেখা যায় বাবা মায়ের চেয়ে দলই তাদের আচরণকে বেশী রকম নিয়ন্ত্রণ করে। এই সময় মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বেশী আগ্রহী হয়। কিন্তু ছেলেরা একটু লাজুক হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছেলেরা প্রথম প্রথম মেয়েদের খুব ভাল চোখে দেখে না, এবং তাদের প্রতি একটা আক্রোশ দেখা যায়। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তি পূজার (Hero worship) প্রবণতা দেখা দেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেকটা শিষ্টভাবে প্রকাশলাভ করে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রকাশে অনেক সময় শিষ্ঠতার অভাব দেখা যায়।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ খুব প্রবল থাকে। তাদের নৈতিক বিকাশ হয় ঠিকই। কিন্তু, নৈতিক আচরণের মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য থাকে না। কখনও নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খুব ভাল কাজ করে। আবার অনেক সময় এমন অনেক কাজ করে, যাকে কোন নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে আদর্শস্থানীয় বলে বিবেচনা করা যায় না।

প্রান্তীয় কৈশোর কাল
[Late Adolescence]

পনের বৎসর বয়স থেকে এই স্তরের আরম্ভ হয়। কারও মতে এর শেষ সতের বৎসর বয়সে আবার কেউ কেউ বলেছেন, আঠার বা একুশ বৎসর বয়সে। বা, তারও পরে। শিক্ষার মানের দিক থেকে বলা যেতে পারে দশম, একাদশ ও কলেজের ২টি শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এই স্তরের অন্তর্গত।

পনের বৎসরের পর দৈহিক বিকাশের হার কমতে থাকে। আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য চাঞ্চল্য পূর্বস্তরে সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। দৈহিক বিকাশ ক্রমে ক্রমেই এই স্তরের শেষের দিকে মন্থর হয়ে আসতে থাকে। উচ্চতার দিক থেকে ছেলেরা প্রায় পরিণত হয়ে যায়। এরপর সামস্থ্য একটু বাড়ে। মেয়েরা সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। পূর্বস্তরে, মেয়েরা ছেলেদের থেকে দৈহিক বিকাশে কিছুটা এগিয়ে থাকে। কিন্তু এই স্তরে ছেলেরা মেয়েদের থেকে এগিয়ে যায়। দৈর্ঘ্য এবং ওজনে তারা মেয়েদের থেকে বেশী হয়, এই পার্থক্য তাদের সারা জীবন থাকে। এই স্তরেও ছেলেদের দৈহিক বিকাশ বিশেষভাবে পেশীর শক্তি,

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

ভিন্ন পেশীর কাজে সমন্বয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজে ক্ষমতার উৎকর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কাঁধ ছেলেদের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মত চওড়া হয়। বুকের চুল উঠতে শুরু করে। লিঙ্গমূলে বা দেহের অন্যান্য অংশে যে চুল ওঠে তার পরিমাণ প্রায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মত হয়, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে। মেয়েদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ হয়। এবং এই স্তরেই তাদের পরিপূর্ণতা আসে। প্রথম প্রথম এই দৈহিক বিকাশের জন্য ছেলে এবং মেয়েরা সংকোচ বোধ করে। কিন্তু সতের-আঠার বৎসর বয়সে তাদের আর দেহ নিয়ে এই সংকোচ থাকে না। তখন স্বাভাবিক অনুভব করে। ছেলে এবং মেয়েরা এই বয়সে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়। ছেলেরা সব সময় শক্ত সবল হওয়ার চেষ্টা করে এবং মেয়েরা যাতে সুন্দর কমনীয় দেহের অধিকারিণী হতে পারে সে দিকে নজর দেয়। মুখের ব্রন এই বয়সেও থাকে। যৌন অঙ্গের বিকাশ এই স্তরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। যৌন গ্রন্থি নিয়মিতভাবে কাজ করতে আরম্ভ করে। ছেলে এবং মেয়েরা এই যৌন বিকাশের পরিপূর্ণতার ফলে, পুরুষ এবং নারীতে রূপান্তরিত হয়। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। এটাই হ'ল যৌন শক্তির (Libido) স্বাভাবিক পরিপূর্ণ বিকাশের স্তর।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

ষোল থেকে সতের বৎসর বয়সের মধ্যে মানসিক বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। বুদ্ধির বিকাশ এই বয়সে সম্পূর্ণ হয়। তাই এই বয়সে ছেলেমেয়ের বৌদ্ধিক কাজ করার ক্ষমতা প্রায় বয়স্কদের মত হয়। তবে এ বয়সের পর অভিজ্ঞতার বিকাশ হ'তে থাকে। এবং এই অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যক্তি তার বুদ্ধিকে প্রয়োগ করতে শিখে। অর্থাৎ, এর পরে প্রয়োগ ক্ষমতার উন্নতি হয়। বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতার (capacity for abstract thinking) বিকাশ হয়। দয়া (kindness), সততা (honesty) ইত্যাদি বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মে। ধারণার (concept) বিকাশও যথেষ্ট হয়। বিভিন্ন বস্তু মধ্যে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। যুক্তি শক্তিরও যথেষ্ট বিকাশ হয়। এক কথায়, পরবর্তী জীবনের উন্নত ধরনের বৌদ্ধিক কাজ করার জন্য সমস্ত রকম মানসিক বিকাশই এই বয়সে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কৌতূহল প্রবৃত্তি একদিকে যেমন বিকশিত হয় অন্যদিকে তার গভীরতাও বৃদ্ধি পায়। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যে বস্তুর সম্পর্কে তারা অনুসন্ধান করে, তা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখে। অর্থাৎ, জ্ঞানের গভীরতার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায়। তাদের আগ্রহের বিষয় বস্তুর ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে আসে। তাদের আর খুব বেশী বস্তুর প্রতি আগ্রহ দেখা যায় না। যে সব বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়, তাদের সম্পর্কে বিশদভাবে জানার প্রবল ইচ্ছা দেখা

যায়। এই বয়সে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রতি আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যায়। নিজেদের ক্ষমতাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এবং এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বাস্তবধর্মী জীবনাদর্শ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা গড়ে তোলে। মেয়েরা বিয়ের কথা চিন্তা করে এবং তাদের ভাবী স্বামীর এক প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে তৈরী করে। ছেলেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই সব বিষয় সম্পর্কে তারা তাদের মতামত গঠন করতে সক্ষম হয়। অন্যের মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। শিক্ষক বা বাবা-মায়ের মতামতকে নির্বিচারে গ্রহণ করে না। তাদের এই স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা বিকাশ হওয়ার দরুন, তারা অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির যাথার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। এবং অনেক রীতি নীতি, আচরণ, যা তারা এতদিন মেনে চলতো। সে সবগুলোকে যুক্তির দ্বারা পুনর্বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা বর্জন করে। এর ফলে, পরবর্তী জীবনে অনেক পরিণত বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। অন্যদিক থেকে এই নিরপেক্ষ চিন্তার দ্বারা তারা নিজেদের এমন জীবনাদর্শ গড়ে তোলে যা পরবর্তী জীবনে চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়। মনোবিদ্ রস্ (Ross) এই স্তরের মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সামগ্রিক মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, এই বয়সে কল্পনা বিলাস (Fantasy) চলে যায়, পরিবর্তে বাস্তবকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে। আঠার বৎসরের একজন ব্যক্তিকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তার জীবনে অনেক ব্যবহারিক সমস্যা থাকে ; এবং সে সব সমস্যা সম্পর্কে সে গর্ববোধ করে।[1]

প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

প্রক্ষোভিক কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে আশঙ্কা (anxiety) এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব (conflict) দেখা যায়। এই ধরনের প্রক্ষোভ-মূলক সংঘাতের জন্য সে নিজেও যেমন দায়ী, তেমনি, বয়স্করাও দায়ী। তাদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, এই ধরনের প্রক্ষোভিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বয়স্করা কোন সময় তাদের ছেলেমানুষ হিসেবে বিবেচনা করে, আবার কোন সময় পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। এর জন্য তারা বুঝতে পারে না, আসলে তাদের অবস্থাটা কি। এর ফলে তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই বয়সে আত্মসচেতনার ফলে, গর্ববোধও দেখা যায়। নিজেদের সম্পত্তি এবং বৈশিষ্ট্য জাহির করার

1. "...fantasies fade and reality is faced. The young of eighteen is a man of the world pre-occupied with practical problems and proud of his Knowledge of affairs and his practical efficiency"—Ground Work of Ed. Psy—Ross.

চেষ্টা করে। বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় হয়। ফলে, সেন্টিমেন্ট বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। নৈতিক সেন্টমেন্টেরও (Moral sentiment) বিকাশ হয় এই স্তরে। কৈশোরের এই স্তরে প্রক্ষোভের প্রকাশের ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা খুব বেশীরকম অন্তর্মুখী (introvert) হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ, সবাইয়ের সামনে তারা প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে চায় না। সম্পূর্ণ জগতকে তাদের কাছে বিরূপ মনে হয়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তির এই বয়সে খুব প্রবল হয়। এই বয়সে তারা যে দল গঠন করে তা অনেকদিন স্থায়ী হয়। বাল্যকালে যে সব বন্ধু ছিল, তাদের অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই বয়সে তারা যে সামাজিক দল গঠন করে, তা শুধুমাত্র নৈকট্যের জন্য করে না। এই দলের গঠন বিশেষভাবে অনুরাগ (interest), মূল্যবোধ (values) এবং মনোভাব (attitude) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক চেতনা বিশেষভাবে এই বয়সে সমবয়সীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সহানুভূতি, সহযোগিতা ইত্যাদি অনুভূতিগুলো নিজের দলের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই বেশীভাবে দেখা যায়। কিন্তু বয়স্কদের প্রতি তারা বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক বিকাশের দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকে। মেয়েরা খুব বেশী পরিমাণে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্বও গভীর হয়। তারা গোপনে নিজেদের গোপন বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করে। ছেলেদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এই বয়সে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ছেলেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। ফলে পোষাক পরিচ্ছদ, হাব-ভাব সব দিক থেকে দলের অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তারা অন্ধভাবে সঙ্গী-সাথীদের অনুভূতি-গুলোকেও অনুকরণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক বিকাশের দিক থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, তা হ'ল মানবতা বোধ ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি ঝোঁক। মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা এবং তার কল্যাণ করার আকাঙ্ক্ষা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। এর থেকে বুঝা যায় এই বয়সে সামাজিক বিকাশ অনেক পরিণত স্তরে উপনীত হয়েছে।

কৈশোর কালের বিভিন্ন ধরনের মানসিক, দৈহিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কিছু উল্লেখ করলাম। কিন্তু এই সব দৈহিক মানসিক প্রক্ষোভিক বিকাশ, কৈশোরকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে। শৈশবে বা বাল্যে তাদের চাহিদাগুলো বিশেষভাবে জৈবিক অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে দেখা যেতো, কিন্তু কৈশোরে শুধুমাত্র জৈবিক

অস্তিত্বই তার কাছে বড় কথা নয়, মানসিক, প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু প্রকাশও তার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে, তাদের মধ্যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। এবং কৈশোরে বালক-বালিকারা তাদের এই সব চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য নতুন নতুন অভিযোজনের কৌশল খুঁজে বেড়ায়। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাহিদা সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করব।

কৈশোরের চাহিদা
[Needs of the Adolescents]

যৌন চাহিদা

কৈশোরের বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যৌন চাহিদা (sex-need)। এই সময়ে যৌন জীবনের বা যৌন শক্তির (Libids) পরিপূর্ণ পরিমনন হয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক যৌন চেতনা (Hetro sexuality) দেখা যায়। দেহের যৌন অঙ্গের পরিবর্তন তাদের মনোজগতে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। তারা একদিকে এই সব পরিবর্তন সম্পর্কে যেমন সচেতন হয়, যৌন কৌতূহলও তাদের বেড়ে যায়। এই যৌন চেতনার ফলে, মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গ চায় এবং ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়। যৌন কৌতূহল থেকে যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অনেক সময় এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কিশোর-কিশোরীরা যৌন সম্পর্কও স্থাপন করে। কিন্তু দেখা যায়, পরে এরজন্য তাদের অনুশোচনা আসে। এই অনুশোচনা পরবর্তীকালে ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে, বিজ্ঞান ভিত্তিক যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা এই সময়ে করার দরকার। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিষদভাবে আলোচনা করব। যথাযথ যৌন শিক্ষার অভাবে, যৌন জীবন সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যৌন জীবন প্রসঙ্গে একটা অপরাধ বোধ যেন সারাজীবন থেকে যায়।

স্বাধীনতার চাহিদা

কৈশোরের আর একটা চাহিদা হ'ল মুক্তি পাওয়ার চাহিদা বা স্বাধীনতার চাহিদা। শৈশব থেকে শুরু করে, বাল্য পর্যন্ত তারা পিতা-মাতা, শিক্ষক বা অন্যান্য বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু কৈশোরে এসে যখন তাদের দৈহিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ পরিণত হয় তখন তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার একটা ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। সে নিজেকে সমাজের অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে চায়। তাদের উপর কোন কাজের ভার দিলে আনন্দ পায়। এক কথায় বয়স্কদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা বা মতামত ব্যক্ত করার একটা প্রবল ইচ্ছা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এই বয়সে আত্ম

নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস, আসে বলেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই চাহিদা আসে। বাবা, মায়েরা এই মনোভাবকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাল চোখে দেখেন না। ফলে, দমন করার চেষ্টা করেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা ঠিক নয়।

সমাজ জীবনের চাহিদা (social need) কৈশোরের আর একটা বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে, তাদের বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এই চাহিদা কিশোর কিশোরীদের মধ্যে দু'রকম রূপ নেয়।

সামাজিক চাহিদা

প্রথমতঃ, তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন অংশে অংশ গ্রহণ করতে চায়। বিভিন্ন সামাজিক দলের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ, একই আদর্শযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসে। ক্লাব, যাত্রাদল ইত্যাদি গঠন করে ; অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দলবদ্ধভাবে বাস করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের চাহিদাকে আমরা সমাজজীবনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার চাহিদা (need for social participation) বলতে পারি। **দ্বিতীয়তঃ** এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা বয়স্কদের কাছ থেকে বা সমবয়সীদের নিয়ে তারা যে দল গঠন করেছে, তাদের স্বীকৃতি চায়। অর্থাৎ, সমাজের বয়স্করা তাদের মতামতের স্বীকৃতি দিক, বা দলের অন্যান্য সভ্যেরা তার অভিমতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করুক, এ ধরনের একটা চাহিদা কৈশোরে কাজ করে। একে আমরা সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা (need for social approval) বলতে পারি। এই দু'ধরনের চাহিদা সামাজিক দিক থেকে কৈশোরে লক্ষ্য করা যায়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির অভাব ঘটলে ছেলেমেয়েরা পরবর্তী জীবনে অসঙ্গতি (Maladjusted) মূলক আচরণ করে।

স্বাধীনতার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতমুখী অপর একটা চাহিদা এই বয়সে কাজ করে। একে নিরাপত্তার চাহিদা (need for security) বলা যায়। কৈশোরে নানা দিক থেকে নানা রকম আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।

নিরাপত্তার চাহিদা

বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের সামাজিক অবস্থাটা (social status) কি, তা নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। বয়স্কেরা কোন কোন সময় তাদের সঙ্গে বয়স্কদের মত আচরণ করেন। আবার, কোন সময় তাদের ছেলেমানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। এই রকম পরস্পর বিরোধী আচরণের জন্য কিশোর কিশোরীদের মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। তারা মনে করে এই বুঝি বয়স্কেরা তাদের কোন কাজের জন্য তিরস্কার করবেন। ফলে, তারা দল গঠন করে। দলের দিক থেকেও তাদের মধ্যে নিরাপত্তার আশঙ্কা দেখা দেয় মাঝে মাঝে। এছাড়া, যদিও এই বয়সে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয়, তবুও তারা বাবা-মায়ের উপর আর্থিক দিক থেকে নির্ভর করে থাকে। সুতরাং, তাদের মনে, পিতা-মাতার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়।

তাই স্বাধীনতার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও মানসিক নিরাপত্তার চাহিদা কৈশোরে লক্ষ্য করা যায়।

আত্মপ্রকাশের চাহিদা

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদার দরুন এবং যৌন চাহিদার দরুন, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম প্রকাশের (self-expression) তাগিদ প্রবল আকারে দেখা দেয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজের প্রকাশ করতে। লেখা পড়া, খেলাধূলা, ছবিআঁকা, গান, নাচ, অভিনয়, ইত্যাদি নানা রকম কাজের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর উদ্দেশ্য হ'ল সমাজে বয়স্কদের সামনে বা দলের অন্যান্য সভ্যদের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সকলে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করুক এটা তারা বিশেষভাবে চায়। একে আমরা কৈশোরের আত্মপ্রকাশের চাহিদা (need for self expression) বলতে পারি।

জ্ঞানের চাহিদা

এই বয়সে মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণ হওয়ার দরুন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি কৌতূহল গভীরতা লাভ করে। বাল্যকালে যেমন, পরিবেশের যে কোন বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা যেতো, এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। কিন্তু, তাদের আগ্রহের বিষয়বস্তুর প্রতি কৌতূহল বাড়ে। এবং এর ফলে, সেই বস্তুকে জানবার প্রবল ইচ্ছা তাদের মধ্যে দেখা যায়। ফলে বিভিন্ন দিক থেকে এই সব বস্তুকে বিশ্লেষণ করে তাদের সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার চাহিদা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। বিজ্ঞান, বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন দিক, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তাদের ঝোঁক দেখা যায়। এবং এই সব বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা যা তাদের মনকে আলোড়িত করে, তাদের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। তাদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ-ভাবে আত্ম সক্রিয়তামূলক। অন্যের উপর তারা বিশেষ নির্ভর করে না, বা তাদের আস্থাও থাকে না। নিজেরাই পড়াশুনা করে বা পর্যবেক্ষণ করে সব কিছু জানার তাগিদ অন্তর থেকে অনুভব করে। কৈশোরের এই চাহিদা হ'ল জ্ঞানের চাহিদা (need for knowledge)।

দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা

জ্ঞানের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের আকাঙ্ক্ষা (need for adventure) দেখা যায়। বয়স্কদের সামনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বা দলের অন্যান্য সদস্যদের কাছে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য, এই সময়ে ছেলে-মেয়েরা এমন অনেক ঝুঁকি নেয়, যা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বিবেচনার দ্বারা এড়িয়ে চলে। এই দুঃসাহসিক কাজ করার প্রবণতা প্রবল ভাবে এই বয়সে দেখা যায়, এবং এর বশবর্তী হয়ে, তারা অনেক সময় এমন কিছু করে বসে, যার ফলে, তাদের দৈহিক ক্ষতিও হয়ে থাকে। এমন কি,

যৌন আচরণকেও এই বয়সে দুঃসাহসিক কাজ বলে মনে হয়, এবং এই চাহিদার তাগিদে তারা যৌন অপরাধ করে থাকে।

কৈশোরে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতি বোধ (moral sentiment) জাগ্রত হয়। উচিত অনুচিত বোধও তাদের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। তারা নিজেদের কাজ এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজ এই নীতি বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। এমন কি, নানা রকম সামাজিক রীতি নীতির যাথার্থ্য সম্পর্কে তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। সব কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে। এমনকি তাদের নিজেদের কোন পূর্ব অপকীর্তির জন্য মনঃকষ্ট পায়। কৈশোরের এই চাহিদাকে নীতিবোধের চাহিদা (Need for moral security) বলা যেতে পারে।

নৈতিক চাহিদা

নৈতিক বিকাশের ফলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবন দর্শনের চাহিদা (Need for a Philosophy of life) দেখা দেয়। জীবন সম্পর্কে নানা রকম জিজ্ঞাসা তাদের মনে দেখা দেয়। এই সময়ে অহম্ সত্তার (self) বিকাশ হয়। এবং এই অহম্‌সত্তা আর শৈশবের মত আত্মকেন্দ্রিক থাকে না। অহম্ সত্তা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে (extension of self)। এর ফলে এই অহম্ সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সেন্টিমেণ্টের বিকাশ হয়। এই যে অহম্ সত্তাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রবণতার বিকাশ হয় তা পরিতৃপ্তির জন্য ধীরে ধীরে নতুন জীবন দর্শন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের সব কিছু ঘটনার তারা তাৎপর্য নির্ণয় করার চেষ্টা করে।

জীবন দর্শনের চাহিদা

এই সব চাহিদা ছাড়াও নানা রকমের নতুন নতুন চাহিদা কৈশোরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয়। এবং এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি না করতে পারলে, তাদের মধ্যে নানা রকম আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয়। তাদের জীবনে এই সব চাহিদাগুলোকে কেন্দ্র করে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে তাদের জীবন বিকাশের ধারার অগ্রগতি ব্যহত হয়।

কৈশোরের সমস্যা
[Problems of the Adolescents]

কৈশোরের যৌন চাহিদাকে কেন্দ্র করে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। তাদের স্বাভাবিক চাহিদার দরুন, তারা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী সাথীর সঙ্গে মেলামেশা করার তাগিদ বোধ করে। কিন্তু, তাদের মনে ভয় থাকে, তারা যদি তা করে তা'হলে বয়স্কেরা তাদের তিরস্কার করবেন। তাছাড়া যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের ফলে তাদের মনে

যৌন চাহিদার সমস্যা

অনেক প্রশ্ন জাগে। যেগুলো তারা সমাজের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকাশ্যভাবে জানতে পারে না। ফলে তাদের এই ইচ্ছাকে অবদমিত করতে হয়। এই অবদমনের দরুন ও অত্যধিক কৌতূহলের দরুন, তাদের পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে খুবই অসুবিধা হয়। সমস্ত যৌন জীবন যেন তাদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা নিয়ে আসে।

কৈশোরের মুক্তির চাহিদার সঙ্গে, সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের একটা সংঘাত দেখা দেয়। তাদের স্বাধীন চিন্তা করার ইচ্ছা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছাকে বয়স্কেরা অনেক সময় বাধা দেন। ফলে সব সময় তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না। এর ফলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতার (negative self feeling) বোধ জাগে। তাই এই বয়সের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের সংঘাতকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে।

স্বাধীনতার চাহিদার সমস্যা

সামাজিক যে সব চাহিদা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, সেগুলোর সার্থক তৃপ্তিও তারা সব সময় সমাজজীবনের মধ্যে পায় না। তারা সমাজে বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে চায়। তাদের মনে যে আত্মবিশ্বাস আসে, তার ফলেই তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সমাজ তার উপর এতটা আস্থা রাখতে পারে না। ফলে সমাজের প্রতি এই সব ছেলেমেয়েদের বিরূপ মনোভাব দেখা দেয়। সমাজজীবনে তারা যে স্বীকৃতি চায়, সে স্বীকৃতি না পেলে, অন্য কোন জায়গায় তাকে তৃপ্তি করার চেষ্টা করে। ফলে, দেখা যায়, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দলের মধ্যে থেকে অসামাজিক আচরণ করতে থাকে।

সামাজিক চাহিদার সমস্যা

পিতামাতা বা বয়স্কদের আচরণে তারা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয় এবং নিজেদের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাববোধ করে। এই নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে নানারকম আচরণমূলক বৈষম্য দেখা দেয়। অনেক সময় এই ধরনের পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্য তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। সুতরাং এই বয়সে গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করা, তার কাছে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

নিরাপত্তার চাহিদার সমস্যা

গৃহ পরিবেশ যথাযথ না হওয়ার দরুন, তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদাও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না। সাধারণ সমাজ পরিবেশে ও গৃহ পরিবেশে, অনেক সময় ছেলেমেয়েরা তাদের স্বাভাবিক সৃজণাত্মক প্রবণতাকে চরিতার্থ করতে পারে না। অনেকে এই বয়সে মেয়েদের বাড়ীর বাইরে যেতে দেন না। ছেলেদেরও

আত্মপ্রকাশের চাহিদার সমস্যা

নিজেদের নজরের মধ্যে রাখেন, যাতে তারা খারাপ কিছু না করে বসে। কিন্তু, বাড়ীতে আটকে রেখে, তাদের আত্মপ্রকাশের কোনরকম ব্যবস্থাও তাঁরা করতে পারেন না। ফলে, এই সব ছেলেমেয়েরা অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ খোঁজে। এবং সকলের আড়ালে এমন সব কাজ করে, যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

জ্ঞানের চাহিদার সমস্যা

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা কৈশোরে বিশেষভাবে দেখা যায়। ছেলেমেয়েরা পড়া-শুনা করতে ভালবাসে। তাদের এই প্রবণতার দরুন, তারা নানারকম বিষয়ের বই পড়তে চায়। কিন্তু ভাল মন্দ বিচার করার সূক্ষ্মবোধ তাদের তখনও হয় না বলে, অনেক সময় বাজে বই পড়ে এবং তার প্রভাবে অনেক রকম কু-অভ্যাস তাদের মধ্যে আসে। সুতরাং জ্ঞান আহরণের এই চাহিদা কৈশোরে ছেলেমেয়েদের কাছে তাই এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

দুঃসাহসিকতার চাহিদার সমস্যা

সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় দুঃসাহসিক কর্ম করে। সব ক্ষেত্রে, তারা যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে তা নয়। অনেক সময় ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে এমন সব কাজ করে বসে যার প্রভাবে তার পরবর্তী জীবনের বিকাশের ধারা ব্যহত হয়। এমনও হ'তে পারে, গাছের খুব সরু ডালে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়, তার ফলে হাত পা ভেঙে যায়। সুতরাং আত্মপ্রকাশের জন্য এই দুঃসাহসিক অভিযানের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তা'ছাড়া, সব সময় তাদের ইচ্ছামত তারা কাজ করতে পায় না বলে, মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগে। ঐ ধরনের সমস্যা কৈশোরে খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

নৈতিক চাহিদার সমস্যা

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে নৈতিক চাহিদা দেখা দেয়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার সংঘর্ষ-বাধে। তারা আসেপাশের সব বয়স্কদের দেখে, তার নৈতিক মান অনুযায়ী কেউ চলছে না। এর ফলে, তাদের মনে সংশয় দেখা দেয়। এমন কি, বয়স্কদের সম্পর্কে তাদের যে ধারণা ছিল তা বদলে যায়। অভিযোজনের দিক থেকে, এই সমস্যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরে ছেলেমেয়েরা বাস্তবের সঙ্গে নিজের অন্তর্জগতের সার্থক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না বলেই নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাদের সে এতদিন আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে মনে মনে প্রশংসা করতো, তাঁদের সম্পর্কে এই ধারণা পরিবর্তন তাকে ব্যথিত করে।

সবশেষে, জীবনদর্শনের চাহিদার ফলে, অহম্ সত্তাকে কেন্দ্র করে যে সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায় তার থেকে নানা রকম সমস্যা ছেলেমেয়েদের জীবনে দেখা দেয়। অনেক সময় যে আদর্শকে মূল্যবান বলে

গ্রহণ করে, তা প্রত্যক্ষ জীবনে বাস্তব পরিস্থিতিতে ঠিক মত কার্যকরী হয় না। এই অবস্থায় তারা যথাযোগ্য নির্দেশনার অভাবে অসহায় বোধ করে। তা'ছাড়া, জীবনাদর্শ হিসেবে কোন কিছুকে তারা যখন গ্রহণ করছে; তখনই পাশাপাশি দেখা যায়, তাদের মধ্যে, এমন অনেক চাহিদা থেকে যাচ্ছে, যেগুলো তার ঐ জীবনাদর্শের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য। তখন, ছেলেমেয়েরা অনুভব করে একটাকে ত্যাগ করে, আর একটাকে গ্রহণ করতে হবে। এই যে নির্বাচন, তাদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়।

জীবনদর্শনের চাহিদার সমস্যা

কৈশোরের, এই সব সমস্যা ছেলেমেয়েদের নানারকম চাহিদাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। এবং সমস্যার সঙ্গে নানারকম দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক চাহিদা, যুক্ত হয়ে তার জীবনকে এক কথায় দুর্বিসহ করে তোলে। তাই প্রত্যেক মনোবিদ্, শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদ্ এই কৈশোরকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ঝড়-ঝঞ্ঝা যেমন স্থায়ী ঘটনা নয়, সাময়িক, তেমনি, কৈশোরও মানব জীবনের একটা অস্থায়ী পর্যায় মাত্র। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তারাই এই জীবনের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তবে এ ধারণা করলে ভুল হবে যে, কৈশোরে ছেলেমেয়েরা সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আচরণের অসঙ্গতি তখনই দেখা দেয়, যখন, তারা তাদের নতুন নতুন চাহিদাগুলো প্রত্যক্ষভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তাই ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল মানে যদি খারাপ অর্থে মনে করা হয়, তা'হলে কৈশোর তা নয়। কৈশোরের কোন ধ্বংসাত্মক দিক নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন নিশ্চয়ভাবে জীবনে দুঃখ আনে, কৈশোর কিন্তু তা আনে না। বরং, তার উদ্দেশ্য গঠনমূলক। যে শিশু অসহায় জীব হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, যার জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একদিন বয়স্কদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, সেই জৈবিক সত্বাকে মানবিক অধিকার দেওয়ার জন্যই যেন, এই কৈশোরের আবির্ভাব। তাই তার এই প্রয়োজনীয় দিকের কথা বিবেচনা করে, কৈশোরকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলা যায় না। যদিও বা কোন অসঙ্গতি আচরণের মধ্যে দেখা যায়, তা খুবই সাময়িক এবং সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলো বিবেচনা করে, সেগুলো দূর করা সম্ভব হয়।

আলোচনা

কৈশোরের শিক্ষা

[Education of the Adolescents]

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে তাদের সব চেয়ে বেশী অংশই কৈশোরের স্তরের অন্তর্গত। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-

বিশেষভাবে এই স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা যাতে কোন রকম কারণে ব্যহত না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিশোর কিশোরীরা যাতে তাদের সকল রকম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে, সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষার দ্বারা আমরা এই সব ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ সমস্যার সমাধানে যদি সাহায্য করতে না পারি, তা হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন তাৎপর্যই থাকবে না। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষক (teacher), পরিচালক (administrator), এবং সকল শিক্ষা কর্মীকে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের জীবন বিকাশে সহায়তা করার জন্য এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কতকগুলো বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। যেমন—

প্রস্তাবনা

॥ এক ॥ কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ প্রচুর পরিমাণে হয়। এই দৈহিক বিকাশ তাদের মধ্যে দু'রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির ফলে, অনেক সময় লজ্জার ভাব দেখা যায়। তাদের দৈহিক পরিবর্তনকে তারা অনেক সময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এদিকে সচেতন হতে হবে। তাঁরা যেন, এই ধরনের আচরণকে প্রশ্রয় না দেন। তারা যেন উন্মুক্ত মন নিয়ে, তাদের এই পরিবর্তনগুলোকে গ্রহণ করেন। তাদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করবেন, যাতে করে তারা এই সব দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে কম সচেতন হয়। অন্যদিকে, এই সব দৈহিক পরিবর্তন হওয়ার দরুন শিক্ষার্থীদের বেশী পরিমাণে দেহ-সঞ্চালনের তাগিদ দেখা যায়। তাদের এই বৃদ্ধির ধারার অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময় দৈহিক বিকাশের ফলে, বিভিন্ন দেহ-যন্ত্রের কাজের পরিবর্তন হয়। পুষ্টিকর খাদ্য এই সময় একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষক এবং পিতামাতার সকলের এদিকে নজর রাখা উচিত।

দৈহিক বিকাশের প্রতি সহানুভূতি

॥ **দুই** ॥ কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রক্ষোভিক দিক থেকে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই সব প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা করা শিক্ষকের কর্তব্য। তিনি যেন অযথা, শিক্ষার্থীদের মানসিক দিক থেকে আঘাত না করেন। শিক্ষকের উচিত তাদের সব রকম প্রক্ষোভিক প্রবণতা-গুলোকে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং বিভিন্ন প্রক্ষোভিক শক্তির প্রবাহকে সমাজ নির্দেশিত পথে পরিচালন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

প্রক্ষোভিক অবস্থার প্রতি সহানুভূতি

॥ **তিন** ॥ এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদা

আসে। তাদের সেই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হ'তে হবে। ছোটখাটো কাজের দায়ীত্ব দিয়ে তাদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। প্রয়োজন বোধে তাদের উপর কাজের ভার দিয়ে শিক্ষক সাহায্য করবেন এই দায়িত্ব পালনে। এর ফলে তাদের চাহিদার তৃপ্তি হবে এবং আত্ম বিশ্বাস বাড়বে।

স্বাধীনতার চাহিদার তৃপ্তি

॥ **চার** ॥ জ্ঞানের চাহিদাকে চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সব রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী থাকবেন। কৌতূহলের দরুন তারা অনেক কিছু বিশদভাবে জানতে চায়। কোন বিষয়ে আবছা ধারণা গ্রহণে তারা ইচ্ছুক থাকে না। তাই বিশেষ কোন সমস্যা তাদের সামনে এলে, শিক্ষক সমাধানের সময় সে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন। সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে, তাদের সামনে উপস্থাপন করেন। এই বয়সে বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ার দরুন, শিক্ষার্থীদের বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা বাড়ে, ফলে তারাও খুব বেশী সমালোচনা প্রবণ (critrical) হয়ে পড়ে। তাদের এই মনোভাবের যোগ্য মর্যাদা বিদ্যালয়ে দিতে হবে।

জ্ঞানের চাহিদার তৃপ্তি

॥ **পাঁচ** ॥ কৈশোরে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনা করতে চায়। তাদের এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য শিক্ষক তাদের নানা বিষয়ের বই পড়তে উৎসাহিত করবেন। তবে বই নির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষককে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোন বিশেষ বইয়ের জ্ঞান তাদের মধ্যে খারাপ অভ্যাস এনে দিতে পারে। সেব বই যাতে তারা না পায় সে দিকে নজর রাখতে হবে। তাছাড়া তাদের এই পড়ার (Reading) প্রতি অনুরাগ যাতে পরবর্তী জীবনে বজায় থাকে, তার জন্য তাদের অনুরাগের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার নির্দেশ তিনি শিক্ষার্থীদের দিবেন। বহুমুখী পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তিতে সাহায্য করে।

পড়াশুনার সুযোগ

॥ **ছয়** ॥ এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চাহিদা দেখা দেয়। এই সব নৈতিক মূল্যবোধকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। শিক্ষক যেন কোন সময়ে এর বিরুদ্ধাচরণ না করেন। তিনি যদি এর বিরুদ্ধাচরণ করেন তা'হলে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে এবং শিক্ষকের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব দেখা দেবে। শিক্ষকের নিজস্ব মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সহায়তা করবে। তিনি যদি নৈতিক আদর্শের অধিকারী হন তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতিবোধ জাগাতে পারবেন।

নৈতিক চাহিদার বিকাশ

॥ **সাত** ॥ এই সময়ে শিক্ষার্থীদের জীবনাদর্শ গড়ে তোলার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা

করা। প্রকৃত জীবনাদর্শ গঠন চরিত্র বিকাশের অঙ্গ। জীবনাদর্শ যাতে বাস্তবের সংঘাতে ভেঙে না পড়ে শিক্ষককে সে দিকে নজর দিতে হবে।

জীবনাদর্শের বিকাশ

শিক্ষার্থীদের অহম্ সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে যে জীবনাদর্শ গড়ে উঠবে তার সঙ্গে কোন বাস্তবের কোন সংঘাত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এই অহম্ সত্তার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

॥ **আট** ॥ কৈশোরে ছেলেমেয়েরা যৌথ প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং তাদের বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার তাড়নায় দল গঠন করে। তারা এই চাহিদার বশবর্তী হয়ে যাতে খারাপ সঙ্গে না মিশে সে দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে এবং খেলা করতেও ভালবাসে। তাদের এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদানের কাজকেও সহজতর করে তুলতে পারেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার তাদের উপর দলগতভাবে দিলে, তারা এই চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে পারে এবং সেই সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার কাজও পরিচালনা করা যায়।

যূথবদ্ধতার নিয়ন্ত্রণ

॥ **নয়** ॥ যৌন জীবনের বিকাশ এই বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যৌন চাহিদার মূলে আছে সৃজনী স্পৃহা। তাদের এই যৌন চাহিদার যাতে যথাযথ উদ্‌গমন (sublimation) হয় তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা শিক্ষককে অবলম্বন করতে হবে। তিনি যৌন চাহিদার সঙ্গে যুক্ত সৃজনী স্পৃহাকে যে কোন ধরনের সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে প্রয়োগ করার সুযোগ করে দেবেন। যেমন, ছবি আঁকা, সাহিত্য রচনা, অভিনয় ইত্যাদি কাজের সুযোগ দিয়ে এই চাহিদার পরিতৃপ্তি আনতে পারেন। যৌন চাহিদার সঙ্গে যৌন কৌতূহলও আসে। এবং সাধারণতঃ এই কৌতূহলকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বিদ্যালয়ে। কিন্তু তাতে খারাপই হয়। তাই এই যৌন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত যৌন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এ সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

যৌন শিক্ষা

এমনি ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কৈশোরের ছেলে-মেয়েদের জীবন বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। কৈশোরের শিক্ষার মূল কথা হ'ল সহানুভূতি। কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই এই বয়সের উপযোগী হবে না, যদি তা তাদের প্রতি যথাযথ সহানু-ভূতির পরিচায়ক না হয়। সহানুভূতির অভাব ও চাহিদার অবদমনের দরুন এই বয়সে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তাই সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাদের প্রকৃত চাহিদাভিত্তিক করে রচনা করতে হবে। এই সব বয়সের ছেলে-মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে শ্রেণীকক্ষে অনেক সময় নানা রকম

আলোচনা

অসামাজিক আচরণ করে থাকে। এই সব আচরণ তিরস্কার দ্বারা দূর করা যাবে না। তিরস্কার করলে, তারা শিক্ষকের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে। তাই আলোচনা ও প্ররোচনার দ্বারা তাদের এই সব কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা যুক্তিপ্রবণ হয়। নানা সমস্যার বা বিষয়বস্তুর উপর তারা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে। এই সব যুক্তি অনেক সময় প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে যেতে পারে। শিক্ষককে তাদের মতামতের যোগ্য দাম দিতে হবে। তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তবে যাতে তাদের ধারণা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে, ধীরে ধীরে যুক্তির দ্বারা তাদের মত পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের যুক্তিকে হাস্যস্পদ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে খারাপ ফল হবে।

যৌন শিক্ষা
[Sex Education]

মনোবিদ্ **শ্লটার** (Slaughter) যৌন আকাঙ্ক্ষার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "*Like the overflow of a great river, it irrigates and fertilizes great tracts of life's territory*"

সূচনা

যৌন চাহিদাকে জীবনের কেন্দ্র বিন্দু বলা যেতে পারে। মানুষের সকল রকম প্রচেষ্টার মূলে, এই চাহিদার পীড়ণ কাজ করছে। এ কথা **ফ্রয়েড্** (Frued) এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবিদ্গণ বলেছেন। তবে সব মনোবিদ্ বা শিক্ষাবিদ্গণ এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে না মেনে নিলেও একথা সকলে স্বীকার করেন যে যৌন চাহিদা মানুষের জীবনের প্রাথমিক সব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার অন্যতম। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টায় মানুষ তার সভ্যতাকে অনেক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই চাহিদার একমাত্র উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন বা যৌন আচরণ নয়। এই চাহিদার সার্থক পরিতৃপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। মানুষের মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশ এই যৌনজীবনের বিকাশের উপর নির্ভর করে। তাই যৌন জীবনের এত গুরুত্ব।

ব্যক্তির এই যৌন জীবন প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী হঠাৎ কৈশোরে এসে শুরু হয় না, জন্ম অবস্থা থেকে তার মধ্যে যৌন শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। এ সম্পর্কে **ফ্রয়েড্** (Freud), যৌন শক্তি বিকাশের যে মতবাদ (Theory of Libido development) প্রচার করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর এই ধারণা আমাদের যৌন শক্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে মন থেকে দূর করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেছেন মানুষের যৌন শক্তির জন্মাবস্থাতেই থাকে। মনোবিদ্ ম্যাকডুগালও যৌন

যৌন জীবনের বিকাশ

প্রবৃত্তিকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমাদের ধারণার সংকীর্ণতার জন্য তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। শিশুদের মধ্যে বয়স্কদের মত যৌন আচরণ দেখি না বলে। কিন্তু ফ্রয়েদ্ বলেছেন, শৈশবেও এই যৌনশক্তির প্রকাশ হয়, এবং এই চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়। এবং এই যৌন চেতনা নিজের দেহের মধ্যেই পরিতৃপ্ত হয়। পরবর্তী স্তরে এই যৌন শক্তির সঙ্গে যুক্ত আকাঙ্ক্ষা পিতা মাতাকে কেন্দ্র করে চরিতার্থ হয়। প্রথমে বিষম লিঙ্গের পিতা মাতার প্রতি ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট হয় এবং পরে ক্যাসট্রেসন কমপ্লেক্স্ (Castration complex) এর দরুন তারা সমলিঙ্গের পিতামাতাকে ভালবাসতে আরম্ভ করে। এর পর কিছু দিন, যৌন জীবনের কোন বহিঃ প্রকাশ থাকে না। কিন্তু কৈশোরের প্রথমে, যৌন অঙ্গের কাজ ও গঠনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যৌনতার লক্ষণ দেখা দেয় এবং এই সময় থেকে তারা পরিপূর্ণ বয়স্কদের মত যৌন জীবন যাপনের জন্য সমস্ত রকম গুণের অধিকারী হয়। সুতরাং জন্ম থেকে যে প্রবণতা আমাদের সঙ্গী তার গুরুত্বকে জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

যৌন জ্ঞানের অভাব দরুন অসুবিধা

কিন্তু, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, যৌনতাকে সব সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা করা হয়। ফলে, যৌনতা সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে একটা লজ্জার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে, মানুষের যৌন জীবনের প্রকৃতরূপ সম্পর্কে অনেকেরই কিছুই ধারণা থাকে না। আবার যাদেরও বা কিছু থাকে, তাও বিজ্ঞান সম্মত নয়। সবই গোপনে শোনা। আর যার কাছ থেকে শোনা, তারও জ্ঞান ঐ প্রকৃতির। এ ধরনের লুকোচুরির জন্য যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন রহস্য জালের সৃষ্টি হয়েছে, যা সমাজ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। যথাযথ যৌন শিক্ষার (sex aducation) অভাব ব্যক্তি ও সমাজ জীবন উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক। যৌন জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, নানা দিক থেকে ক্ষতি করতে পারে। যেমন—

॥ এক ॥ যৌন জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা না থাকার জন্য আমাদের জীবনে ঐ চাহিদাকে কেন্দ্র করে এমন একটা চাপা মনোভাব দেখা যায় যা সুষ্ঠু যৌন জীবন যাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে অনেক সময় যৌন জীবন যাপনের পর ব্যক্তির মনে পাপ বোধ দেখা দেয়, এবং তারা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে।

॥ **দুই** ॥ বিজ্ঞান সম্মতভাবে যৌন জীবন যাপনের ধারণা না থাকা, অনেকে অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে তা করে থাকে। এই ধরনের ক্রিয়া তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

॥ তিন ॥ যৌন জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা থাকে না বলে, যৌন

জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না। ব্যক্তির মনে ধারণা থেকে যায়, যৌন জীবনকে অবদমন না করলে, জীবনের উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায়। কিন্তু এরকম ধারণা একেবারেই ভুল। যৌনতা জীবনেরই অঙ্গ। তাকে বাদ দিয়ে জীবন বিকাশ পরিপূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং, তারও বিকাশ প্রয়োজন। এবং তাকেও সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের অন্তর্ভুক্ত না করতে পারলে, জীবনের পরিপূর্ণতা আসবে না।

॥ **চার** ॥ বিবাহিত জীবনে সার্থকভাবে অভিযোজনের জন্য যৌন-জ্ঞান থাকা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যৌন-জ্ঞানের অভাব বিবাহিত জীবনে অপ্রতিযোজনের (Maladjustment) জন্য অনেকখানি দায়ী।

॥ **পাঁচ** ॥ স্বাস্থ্য সম্মত যৌন জীবন যাপনের জ্ঞানের অভাবে বিবাহিত জীবনে, যে সব অসুবিধা দেখা দেয়, তা সন্তান সন্ততিদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় পিতামাতার যৌন জ্ঞানের অভাবের দরুন বিকলাঙ্গ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। অপরিপক্ক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাও একে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

॥ **ছয়** ॥ যৌন শিক্ষার সামাজিক গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত যৌন শিক্ষার অভাবের দরুন বহু ব্যক্তি নানা রকমের যৌন অসুস্থতায় সংক্রামিত হয়। অনিয়ন্ত্রিত যৌন আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে মানুষ সমাজ জীবনের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই ধরনের সামাজিক লক্ষণ, যৌন অজ্ঞতা থেকেই আসে।

॥ **সাত** ॥ যৌন জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন ছেলেমেয়েরা এমনকি প্রাপ্ত বয়স্কেরা এমন দায়িত্বহীনতার কাজ করে যার ফলে বহু অবৈধ সন্তান ও অবৈধ মাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। এরা সমাজ জীবনের একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে।

॥ **আট** ॥ যৌন্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণার অভাব, লোক সংখ্যার অগ্রগতির হারকে নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রয়োগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

॥ **নয়** ॥ যৌনতা শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালনের কাজও যৌন-জীবনের দায়িত্বের অন্তর্গত। যৌন-জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে পিতা মাতা একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। ফলে শিশুদের নানা রকম অসুস্থতা দেখা দেয়।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান সম্মত যৌন জ্ঞানের অভাব ব্যক্তির জীবনকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করে। তাই বর্তমান কালে, শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে এই যৌন শিক্ষার প্রতি সচেতনা দেখা যাচ্ছে। যদিও, এখনও পর্যন্ত অনেক শিক্ষাবিদ্ আছেন, যাঁরা এই যৌন শিক্ষার (sex education) বিরুদ্ধে মতামত

প্রকাশ করেন, তবুও বিভিন্ন ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টায় যৌন শিক্ষা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

যৌন শিক্ষা কি
[What is Sex-Education]

যদিও যৌন শিক্ষা (sex-education) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা অঙ্গ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তবুও এই যৌন-শিক্ষা-সম্পর্কে ভুল ধারণা আজও আমাদের মন থেকে দূর হয় নি। এই যৌন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত পিতা মাতার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাই যৌন-শিক্ষা বলতে প্রকৃত পক্ষে কি বুঝায়, তা প্রথমেই জানার দরকার। অনেকের ধারণা আছে, যৌন-শিক্ষা কেবলমাত্র, যৌন জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা। কিন্তু, এত সীমিত অর্থে যৌন-শিক্ষা কথাটা ব্যবহার করা হয় না। মানুষের মধ্যে প্রাপ্ত-বয়সের উপযোগী পরিবার জীবনযাপনের জন্য যথাযোগ্য মনোভাব ও আচরণ গড়ে তোলা যায় যে শিক্ষার দ্বারা তাই হ'ল—যৌন শিক্ষা। **ফ্রেডারিক কিলাণ্ডার**[1] (Frederick Kilander) বিভিন্ন মতবাদ বিচার করে, যৌন-শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে, যৌন-শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জৈবিক জ্ঞান দেওয়া নয়। যৌন শিক্ষা এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া, এই শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির সামাজিকীভবন হয়। যৌন জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা যেমন, ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দিকের বিকাশকে ব্যহত করে, তেমনি যৌন শিক্ষা, ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দিককে প্রভাবিত করে। এই যৌন-শিক্ষা, চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষার একটা অঙ্গ। প্রাপ্ত জীবনের জন্য যথাযোগ্য মনোভাব, আদর্শ এবং মূল্যবোধ, যৌনজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলাই হ'ল যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার (General education) যা উদ্দেশ্য, যৌন-শিক্ষারও তাই উদ্দেশ্য। তাই সাধারণ শিক্ষাও জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া, যৌন-শিক্ষাও তার পাশাপাশি একই ভাবে চলবে। যৌন শিক্ষা কোন বিশেষ বয়সের জন্য শিক্ষা নয়। যৌন জীবন এই বিস্তৃতির কথা চিন্তা করে, এবং যৌন শিক্ষার এই সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে আধুনিককালে অনেক মনোবিদ্ একে যৌন-শিক্ষা (Sex-education) না বলে, **পরিবার জীবনের শিক্ষা** (Family life education) বলে থাকেন। এর ফলে, যাদের যৌন কথাটার উপর আপত্তি

যৌন শিক্ষা ও পরিবার জীবনের শিক্ষা

---

1. "...an education calculated to bring about adult attitudes and behaviour that assure desirable home making the establishing and building of families."—Sex-education in elementary & Secondary schools : Kilander.

আছে, তাদের সমালোচনাকে এড়ানো যায়। তাছাড়া, যৌন-শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্যেরও ইঙ্গিত দেওয়া যায়। 'পরিবার জীবনের শিক্ষা' এই কথা থেকে বুঝা যায়, যৌন শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যৌন শিক্ষা (Sex-education) কথাটা প্রথম ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কংগ্রেস যৌন স্বাস্থ্য (Sex-hygiene) কথার পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যৌন স্বাস্থ্যের আলোচনার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা। কিন্তু সেই যৌন শিক্ষাও বর্তমানে, তার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে পরিবার জীবনের শিক্ষার (Family life-education) মধ্যে নতুন তাৎপর্য নিয়ে মানুষের শিক্ষাকে পরিপূর্ণতার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থা (American School Health Association) তাই বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষার প্রকৃতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"*It includes more than anatomical and reproductive information……It implies that a man's sexuality is integrated into his total life development as a health entity and a source of creative energy.*" [1]

যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য
[Objectives of Sex-education] :

যৌন শিক্ষা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, আমরা যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছি। কিন্তু, যৌন-শিক্ষা কোন পরিকল্পনা রচনার পূর্বে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন হওয়ার দরকার। যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আলোচনার থেকে বুঝা গেছে, সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের থেকে পৃথক কিছু নয়। তবে এ ধরনের সাধারণ ধারণা, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই যৌন শিক্ষার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করব। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রথম যে সমস্যা দেখা দেবে তা'হল, যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য সব স্তরের জন্য একই নয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যের অনেক পার্থক্য আছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে শিশুর সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়ায় সহায়তা করা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, এই বয়সে যৌন জীবনের কোন প্রক্ষোভিক গুরুত্ব নেই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে এই সমস্যা অনেক গুরুতর। তাই মাধ্যমিক স্তরের যৌন শিক্ষা অনেক ব্যাপক হওয়ার দরকার।

যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে

1. Journal of sohool health, 1967, 136pp,

বিশেষভাবে কৈশোরে যৌন চেতনা জাগার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয় যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে। তারা যাতে এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে এবং যৌন বিকাশকে সহজ ও সুস্থভাবে গ্রহণ করে সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে, তাই যৌন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য। যেহেতু আমরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত, আমরা বিশেষভাবে এই স্তরের যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করব। এই স্তরের যৌন শিক্ষা নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

॥ এক ॥ সমাজ জীবনে, বিবাহ (Marriage), পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব (Parenthood) এবং পরিবারে (Family) প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত করা যৌন শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই উপলব্ধির মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

॥ **দুই** ॥ যৌনতা (sexuality), স্নেহ (Affection), ভালবাসা (Love) ইত্যাদি মানব চরিত্রের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য (Constructive characteristics) এই চেতনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এনে দেওয়া যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য।

॥ **তিন** ॥ যৌন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশের সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য। এই চারিত্রিক বিকাশের ফলে, তারা যাতে বিবাহিত জীবনে স্বামী অথবা স্ত্রী, পিতা অথবা মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, যৌন শিক্ষার পরিকল্পনা সেই উদ্দেশ্যেই রচিত।

॥ **চার** ॥ মানুষের যৌন প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধিতে সহায়তা করা, এবং শিক্ষার্থীদের যৌন জীবনের বিকাশে যাতে কোন রকম অসৌজন্য, বা অপরাধবোধ না আসে, সে দিকে লক্ষ্য রাখাও যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য।

॥ **পাঁচ** ॥ যৌন জীবন যে ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তার যে সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্য আছে সে সম্পর্কে অবগত করার জন্য যৌন শিক্ষার প্রবর্তন প্রয়োজন।

॥ **ছয়** ॥ শোষন (exploitation) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ঘৃণ্য নীতি। অন্যকে শুধুমাত্র যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির বস্তু হিসেবে গ্রহণ করাও এক ধরনের শোষণ। তাই প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় তার কোন স্থান নেই। এই বোধ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত করা যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য।

॥ **সাত** ॥ অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিপদ সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদের অবগত করাও যৌন-শিক্ষার কাজ।

॥ **আট** ॥ আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি অনুযায়ী মেয়ে এবং ছেলেদের বিবাহের পূর্বে সতীত্ব ও বহ্মচর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সামাজিক মানকে

শিক্ষার্থীরা যাতে গ্রহণ করে এবং সহজ-সরলভাবে গ্রহণ করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখাও যৌন শিক্ষার কাজ।

॥ নয় ॥ পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গুরুজনদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকাশ্যভাবে যৌন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে, তার সুযোগ করে দেওয়া যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য। যৌন শিক্ষাকে যদি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হয়। তখন, পিতা-মাতা-শিক্ষক কারুরই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা আসবে না এবং শিক্ষার্থীরাও যৌন প্রশ্ন করার জন্য লজ্জা বোধ করবে না। মুক্ত মন নিয়ে আলোচনার সুযোগ এলে, যৌন জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে।

॥ দশ ॥ যৌন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ আনবে যে, আদর্শ ছেলে-মেয়ে সম্পর্ক (Boy-Girls relation), বা নারী-পুরুষ সম্পর্ক (man-woman relation) সমাজজীবনের পক্ষে একান্ত কাম্য। ব্যক্তিজীবনের জন্য এই আদর্শ সম্পর্কের প্রয়োজন।

॥ এগার ॥ শিক্ষার্থীদের পুরুষ ও নারী যৌন অঙ্গ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা দেওয়া এবং যৌন অঙ্গের সঙ্গে যৌন সঙ্গমের সম্পর্ক কি, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে। এই যৌন মিলনের সঙ্গে স্নেহ, ভালবাসা, এবং পরিবার জীবনের যে সম্পর্ক আছে তা শিক্ষার্থীদের অবগত করাও যৌন শিক্ষার আদর্শ।

॥ বার ॥ বিবাহিত জীবনের যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক আদর্শ মনোভাব গঠন করা এবং অন্য পুরুষ বা স্ত্রীর দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধার মনোভাব গঠন করা যৌনশিক্ষার আর একটা উদ্দেশ্য।

॥ তের ॥ সমাজ জীবনে পুরুষ এবং নারীর উপযোগিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে সহায়তা করাও মাধ্যমিক স্তরে যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য।

॥ চৌদ্দ ॥ যৌন জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষা বা শব্দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা, নিজের যৌন জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা অর্জনের সহায়তা করা, যৌন শিক্ষার লক্ষ্য।

॥ পনের ॥ যৌন জীবনের বিভিন্ন দিকের আইন সম্মত তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেমন গর্ভপাত, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধ সন্তান ইত্যাদির আইন সঙ্গত তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা এই শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ ষোল ॥ বিভিন্ন ধরনের যৌন অসুস্থতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা এবং সেই রোগ সংক্রামনে সংক্রমন নিবারণে যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করা যৌন শিক্ষার লক্ষ্য।

॥ সতের ॥ মেয়েদের গর্ভাবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা এবং সেই

অবস্থায় করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয় যৌন শিক্ষার মাধ্যমে। গর্ভাবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা না থাকার দরুন, অনেক সময় সন্তানের ক্ষতি হয়।

॥ **আঠার** ॥ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে অবগত করা এবং বিবাহিত জীবনে নাগরিক হিসেবে এ সম্পর্কে তার দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

॥ **উনিশ** ॥ বিবাহিত জীবনের শান্তি অনেকাংশে যথার্থ পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। নিজের মানসিক, প্রক্ষোভিক ও যৌন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ পাত্র বা পাত্রী কি ভাবে নির্বাচন করতে হয়, সে সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যৌন শিক্ষার লক্ষ্য। কারণ এই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের উপর বিবাহিত জীবনের অভিযোজন নির্ভর করে।

॥ **কুড়ি** ॥ মানুষের যৌন জীবনের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর যৌন জীবনের যে পার্থক্য আছে, তা বুঝতে সহায়তা করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

॥ **একুশ** ॥ মানুষের সমাজ ভেদে, যৌন আচরণের যে পার্থক্য হয় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এই যৌন শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ **বাইশ** ॥ সবশেষে, যৌন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক চেতনা এনে দেওয়া। যে নৈতিক চেতনা তার যৌনজীবন সম্পর্কে সুবিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত নিতে তাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তুলবে।

যৌন শিক্ষার এই আদর্শের তালিকা থেকে বুঝা যায়, এই শিক্ষা কোন সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যের মতই তার আদর্শ ব্যাপক। জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে জড়িত যে সব সমস্যা শিক্ষার্থীর জীবনকে আলোড়িত করে এবং প্রায় তার সকল রকম আচরণকে প্রভাবিত করে, তাদের সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত সমাধানের পথের নির্দেশ দেওয়াই যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের যৌন জীবন, তার অসামাজিক মনের পরিচায়ক, এরকমের ধারণা ত্যাগ করে যৌন জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে উন্মুক্ত মন নিয়ে আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই যৌন শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। তা'ছাড়া যৌন জীবন যে নিছক ব্যক্তিগত দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার সামাজিক, প্রক্ষোভিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্যও যে আছে সে সম্পর্কে ব্যক্তিকে অবগত করে এই যৌন-শিক্ষা। যৌন শিক্ষা শুধু যে যৌন জীবনকে বুঝতে সহায়তা করে তাই না, তার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। এই সব উদ্দেশ্যের কথা বিচার করলে যৌন শিক্ষাকে কোন মতেই, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পন্ন বলা যায় না। মানুষের ব্যক্তিসত্বার বিকাশে, তার চারিত্রিক বিকাশে তার প্রয়োজনীয়তাকে আর অস্বীকার করা যায় না।

আলোচনা

যৌন শিক্ষার সংস্থা
[Agencies of Sex-Education]

যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে তার ভার কোন বিশেষ এক সমাজ সংস্থার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। যৌন জীবনের তাৎপর্যকে আমরা চারটে দিক থেকে বিবেচনা করতে পারি। তার **পারিবারিক দিক** (**Family aspect**) আছে, **সামাজিক দিক** আছে (Social aspect), তার **ধর্মীয় দিক** (Religious aspect) এবং তার **ব্যক্তিগত দিক** (Individual aspect) আছে। এখন এই সমস্ত দিকের শিক্ষার ভার কোন এক বিশেষ সমাজ সংস্থার (social agency) পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। তা'ছাড়া ব্যক্তির যৌন জীবন শৈশব থেকে শুরু হয়। তার এই দীর্ঘ পথে যে কোন সংস্থা তার সুষ্ঠু বিকাশের ভার নিতে পারে। মনোবিদগণ মোটামুটিভাবে চার ধরনের সংস্থার উপর এই শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন—[এক] **পরিবার বা গৃহ পরিবেশ** (**Family or Home**), [**দুই**] **গোষ্ঠীজীবন** (**Community**), [তিন] **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান** (**Religious Institution**) **এবং সবশেষে** [চার] **বিদ্যালয়** (**School**)। যদি যৌন জীবনের চারদিকের (four aspect) এর উপর শিক্ষা দেওয়ার জন্য চার ধরনের সংস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু, প্রকৃত ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং দেখা গেছে, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তির পরিপূর্ণ যৌন-শিক্ষা হতে পারে না। তাই **কিলাণ্ডার** (Kilander)[1] মন্তব্য করেছেন, অঙ্ক, লেখা, পড়া ইত্যাদি শিক্ষার ভার আমরা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের উপর ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু যৌন শিক্ষার ভার বিদ্যালয় কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না যদি না সে বিভিন্ন সমাজ সংস্থার (social institutions) কাছ থেকে সাহায্য পায়। যাই হউক, আমরা বিদ্যালয়ের এক্ষেত্রে কর্তব্য কি সে সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার পূর্বে এই সব সংস্থার দায়িত্ব সম্পর্কে দু-চার কথা বলবো।

বিভিন্ন সংস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক

॥ এক ॥ **গৃহ বা পরিবার [Home or Family]:** সাধারণভাবে শিক্ষার প্রাথমিক সংস্থা হ'ল গৃহ পরিবেশ। যৌন-শিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্বও

1. "We may safely leave mathematics, writing, reading almost exclusively, to the schools. But sex-education for family living will fail or fall short in its potential unless the school can also get such co-operation from the homes, churches, the boys and girl's clubs and all other organisations that reach young people socially, religiously, ethically, educationally and recreationally."—Sea. edc, in the ele. & Secondary schools : Kilander.

এই সংস্থাকে নিতে হবে। যৌন-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তার প্রক্ষোভিক কেন্দ্র। গৃহ পরিবেশেই এই প্রক্ষোভের পরিপূর্ণ বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তাই যৌন-শিক্ষার ব্যাপারে গৃহ পরিবেশের দায়িত্ব কম নয়। এই পরিবেশেই শিশুদের যৌন জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহলকে উদাহরণ ও উপদেশের সাহায্যে নিবৃত্ত করা যায়। গৃহ পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে শিশুর মনে নানা প্রশ্ন জাগে। আর সমাধান, ঐ স্বাভাবিক পরিবেশেই সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। বিদ্যালয়ের কৃত্রিম পরিবেশে এই সব বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা সব সঠিকভাবে করা যায় না। কিন্তু, আমাদের দেশে, পিতা-মাতাদের এ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব দেখা যায়। তাদের মধ্যে এই সচেতনতা না এলে যৌন-শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

গৃহ

॥ **দুই** ॥ **গোষ্ঠী জীবন** [**Community**] : সমাজের মধ্যে ছোট ছোট অনেক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই সব গোষ্ঠী, মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। স্কাউট, এন. সি. সি. প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির যৌন জীবনের বিকাশকে সহায়তা করা যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন যৌন পত্রিকা, যার মধ্যে যৌন-জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা দেওয়া হয়, তাদের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে যৌন শিক্ষা হ'তে পারে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চক্রের সাহায্য নিয়েও সমাজজীবনের মধ্যেই যৌন শিক্ষা দেওয়া যায়।

গোষ্ঠী জীবন

॥ **তিন** ॥ **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান** [**Religious Institution**] : বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যক্তির যৌন জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে নানা-রকম আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। একমাত্র, বিবাহকে কেন্দ্র করেই আমাদের সমাজে নানারকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যৌন শিক্ষা হয়ে থাকে। সমাজ স্বাভাবিক পরিবেশে এই শিক্ষা দেয় বলে, এই শিক্ষার প্রভাব ব্যক্তিজীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবে, অনেকের ধারণা আছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যৌন-জীবনের নিয়ন্ত্রের শিক্ষা হয়। কিন্তু, তা ঠিক নয়। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে, যাদের মাধ্যমে যৌন জ্ঞানও হয়ে থাকে। যৌন জীবনের নৈতিক দিক সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

॥ **চার** ॥ **বিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান** [**School or Educational Institution**] : দৈনন্দিন জীবনের অনেকটা সময় শিশুদের বিদ্যালয়ের মধ্যে কাটে। তাই যৌন শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কিছু কম নয়। সমাজের অন্যান্য সংস্থা (agency) যে সব বিষয়ের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে না, বিদ্যালয়কে সে সব ক্ষেত্রে

বিদ্যালয়

বিশেষভাবে সক্রিয় হতে হয়। ব্যক্তিজীবনের কোন শিক্ষাকেই আজ আর সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার বাইরে ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিশুর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই আসে। যৌন শিক্ষাক্ষেত্রে, তার ব্যতিক্রম হ'লে চলবে না। তাই বিদ্যালয়কে যৌন শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। তা'ছাড়া সমাজের অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে শিশুরা যে জ্ঞান আহরণ করে, তা সব সময় পরিপূর্ণ হয় না। তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য বিদ্যালয়ের সাহায্য প্রয়োজন। অন্যদিকে যৌন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা দেওয়া বিদ্যালয়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ সমাজজীবনে শিশুরা বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান নাও পেতে পারে। আবার, মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে, শিক্ষার্থীদের কৈশোর জীবনে, যৌন সচেতনতা দেখা দেয়। এই যৌন সচেতনতাকে কেন্দ্র করে তাদের মনে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। যৌন জীবন সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন জাগে তাদের মধ্যে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাওয়ার জন্য, মাধ্যমিক স্তরে যৌন শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার পাঠ্যক্রম (curriculum) কি হবে, এই যৌন শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি কি হবে, সে বিষয়ে আমরা এখন কিছু উল্লেখ করব। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, সমাজজীবনের নৈতিক মান, সব কিছু নির্ভর করবে বিদ্যালয়ে কত সার্থকভাবে এই যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে তার উপর।

যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রম
[Sex-education Curriculum]

যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের বয়সের কথা ও তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে রচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে চারটে স্তরে রচনা করতে হবে। (১) **শৈশবের জন্য পাঠ্যক্রম** (Sex-education Curriculum in Infancy); (২) **বাল্যকালের জন্য পাঠ্যক্রম** (Sex-education Curriculum for Childhood); (৩) **কৈশোরের জন্য পাঠ্যক্রম** (Sex-education Curriculum for Adolescence) এবং (৪) **বয়স্ক জীবনের জন্য পাঠ্যক্রম** (Sex-education Curriculum for Adults)। এই চার স্তরের মধ্যে প্রথম ও শেষ স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নয়। ঐ স্তরের শিক্ষা বিশেষভাবে সমাজের অন্যান্য সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শৈশব ও বয়স্কদের শিক্ষার এই ব্যবস্থাকে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তবু জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিচার করে এই সব স্তরের সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব।

বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রম

॥ এক ॥ শৈশবে যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম
[Sex-Education Curriculum in Infancy]

শৈশবের যৌন শিক্ষা দানের গুরুত্বের কথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন, যৌন-শিক্ষা একটা বিশেষ দৈহিক পরিমননের পর থেকে শুরু হওয়া উচিত অর্থাৎ, শিশুর যৌন জীবনের বিকাশের পর হওয়া উচিত। কিন্তু, আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন, যৌন শিক্ষা-শৈশব থেকেই শুরু করা উচিত। তবে যৌন-শিক্ষা মানেই যৌন-অঙ্গ ও যৌন ক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা নয়। পরবর্তী যৌন-জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানারকম প্রশ্ন শিশুদের মনে জাগে। সে গুলোর সদুত্তর সে পেতে চায়। যে দুটো প্রশ্ন তাদের মধ্যে জাগে, তা হ'ল,—ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এবং কি ভাবে ভায়ের বা বোনের জন্ম হ'ল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শৈশবের যৌন-শিক্ষা তাই এ দুটো প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এবং এর দায়িত্ব নেবে পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্করা।

শৈশব

॥ দুই ॥ বাল্যে যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম
[Sex-Education Curriculum in Childhood]

এই স্তরে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার (General education) সঙ্গে সঙ্গে যৌন-শিক্ষার দায়িত্বও বিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ে। এই সময় অর্থাৎ, ছয় থেকে দশ-এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মনে নানা-রকম প্রশ্ন জাগে। শিশুরা কোথা থেকে আসে, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কি, পুরুষদের সন্তান হয় কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে শুরু করে যৌন অঙ্গ সম্পর্কেও নানারকম প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। সুতরাং, এই স্তরের যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রম, এই সব প্রশ্ন ও কৌতূহলকে কেন্দ্র করে রচনা করতে হবে। এই স্তরের পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয় থাকা উচিত—

বাল্য

॥ এক ॥ ছেলে এবং মেয়েদের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা।
॥ দুই ॥ পুরুষ এবং নারীর সমাজ জীবনে দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা।
॥ তিন ॥ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামের সঙ্গে পরিচিতি।
॥ চার ॥ নিজের দেহের যত্ন সম্পর্কে ধারণা।
॥ পাঁচ ॥ সমাজ ও পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতি।
॥ ছয় ॥ গ্রন্থি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও জীবন বিকাশে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা।
॥ সাত ॥ প্রক্ষোভ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

॥ আট ॥ বংশ গতি সম্পর্কে ধারণা।

॥ নয় ॥ জীবনের গোপনীয়তার গুরুত্ব।

॥ দশ ॥ সবশেষে, যৌন-জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দ বা ভাষার সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিতি।

বাল্যকালে, যৌন শিক্ষায় খুব বেশী গভীরতা না থাকাই ভাল। শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রক্ষোভিক বিকাশের পরিমানের কথা চিন্তা করে তার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে এবং তার কৌতূহলের পরিসর বিবেচনা করে, তাকে পরিমিত জ্ঞান দিতে হবে।

॥ তিন ॥ কৈশোরের যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম [Sex-Education Curriculum in Adolescence]

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের যৌন অঙ্গের বিকাশ হয়। এই বিকাশ তার জীবনে নানারকম দৈহিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই এই বয়সের যৌন-শিক্ষা পাঠ্যক্রম রচনা বিশেষভাবে তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে রচনা করতে হবে। এই স্তরের যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরকার। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার দরকার।

কৈশোর

॥ এক ॥ যৌন গ্রন্থি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ;

॥ দুই ॥ দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা ;

॥ তিন ॥ পুরুষ এবং নারীর যৌন ইন্দ্রিয়ের গঠন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ;

॥ চার ॥ পুরুষ এবং নারীর যৌন-জীবনে কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা ;

॥ পাঁচ ॥ যৌন জীবনে যৌন-ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা ;

॥ ছয় ॥ স্বাস্থ্যের উপর যৌন-জীবনের প্রভাব ;

॥ সাত ॥ কৈশোরে যৌন-পরিবর্তন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত ধারণা ;

॥ আট ॥ সামাজিক জীবনে যৌনতার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা ;

॥ নয় ॥ যৌন জীবন সংক্রান্ত প্রচলিত রীতি নীতির সঙ্গে পরিচিতি ;

॥ দশ ॥ সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সম্পর্কে ধারণা ;

॥ এগার ॥ বিবাহিত জীবনের পুরুষ এবং পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতি ;

॥ বার ॥ যৌন-জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দ বা ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ;

॥ তের ॥ যৌন-জীবনের প্রক্ষোভিক দিক সম্পর্কে অবগতি ;

॥ চৌদ্দ ॥ যৌন অসুস্থতা সম্পর্কে ধারণা ;

কৈশোরের যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করতে গিয়ে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই স্তরের যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান সরবরাহ করা নয়। যৌন-জীবনের প্রতি প্রকৃত মনোভাবের (attitude) বিকাশ গড়ে তোলাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার এই স্তরে, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আমরা যৌন-জীবনের প্রতি বিজ্ঞান সম্মত এবং সমাজ সম্মত মনোভাব গঠন করতে না পারি তা'হলে জীবনে নানা রকম সমস্যা দেখা দেবে। এই স্তরের শিক্ষাই তাদের পরবর্তী জীবনে নানারকম যৌন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে এবং যৌন জীবন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আরও তথ্য সংগ্রহ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

॥ চার ॥ বয়স্ক জীবনে যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম
[Sex-Education Curriculum in Adult life]

বয়স্ক জীবনের যৌন শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা ও আগ্রহের উপর নির্ভর করে। তবে এর কিছুটা দায়িত্ব কলেজের উপর এসে পড়ে। এই স্তরের যৌন-শিক্ষা পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে বিবাহের পরবর্তী জীবনে যৌন কর্তব্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উচিত। তাই, এই স্তরের যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে—

প্রাপ্তবয়স

॥ এক ॥ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যৌনতার ও প্রক্ষোভের দিক সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ;

॥ দুই ॥ বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন যৌন ব্যধি সম্পর্কে ধারণা ;

॥ তিন ॥ বিবাহিত জীবনে নির্দেশনায় (Counselling) গুরুত্ব ;

॥ চার ॥ যৌন জীবনের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ;

॥ পাঁচ ॥ সন্তান পালন সম্পর্কে ধারণা ;

॥ ছয় ॥ যৌন জীবন সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণা।

যৌন শিক্ষার পদ্ধতি
[Method of Sex-education]

যৌন-শিক্ষার পদ্ধতি ও সাধারণ শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোন তফাত নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা ভাল ফল পাওয়া যায়। যৌন-শিক্ষার তিনটে দিক আছে—জ্ঞান (Knowledge), মনোভাব (attitude) এবং আচরণ (Behaviour) এই তিন দিক থেকে পরিপূর্ণতা আনার জন্য তিন ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক (Text book), পত্রিকা (Journal), মডেল (Model), চার্ট

যৌন-শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

(Chart), ছবি (Diagram) ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌন জীবন সংক্রান্ত আদর্শ মনোভাব (attitude) বিকাশ করার জন্য, দলগত ভাবে আলোচনা (Group discussion), মতামত বিনিময় (opinion exchage) ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। যথাযোগ্য আচরণ (Behaviour) বিকাশের জন্য শিক্ষকের বিশেষ কিছু করার নেই ; তবে জ্ঞান এবং মনোভাব জাগ্রত হ'লে তার প্রভাব স্বাভাবিক ভাবে আচরণকে প্রভাবিত করবে। তবে শিক্ষক এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের আচরণের মূল্যায়ণ (evaluation) করে দেখাবেন, তারা সঠিক পথে যাচ্ছে কি না। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে বলা যায় যৌন শিক্ষার বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। সাধারণভাবে শিক্ষার যা পদ্ধতি, যৌন-শিক্ষার পদ্ধতিও এক। শিক্ষক উদ্দেশ্য, বিষয় বস্তুর প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে, তাঁর পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

যৌন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য
[Responsibilities of the teacher in respect of Sex-Education]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। যৌন-জীবনের বিকাশও এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের অন্তর্গত। সুতরাং এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের দায়িত্ব যেমন শিক্ষকের উপর এসে পড়ে, তেমনি, যৌন-জীবন বিকাশের দায়িত্বও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাঁর উপর এসে পড়ে। শিক্ষককে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হ'লে, কতকগুলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তাঁর থাকার দরকার।

॥ প্রথমতঃ ॥ শিক্ষকের যৌন বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান থাকার দরকার। যৌন বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া তিনি যৌন শিক্ষা দিতে পারবেন না।

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে আস্থাবান হ'তে হবে। যে শিক্ষক যৌন-শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন তাঁর দ্বারা এই শিক্ষাদানের কাজ সার্থকভাবে হ'তে পারে না।

॥ তৃতীয়তঃ ॥ শিক্ষক সব কিছু সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠে, যাতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন সে রকমের মানসিক প্রস্তুতি তাঁর থাকা চাই।

॥ চতুর্থতঃ ॥ যৌন শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে, শিক্ষকের মানসিক চাহিদা সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার। শিক্ষার্থীদের মনে কি কি প্রশ্ন আছে, তা না জানলে, তিনি যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি না হওয়াও যেমন খারাপ, অন্যদিকে মানসিক চাহিদার বেশী জানাও সব সময় ভাল নয়। তাই শিক্ষককে যৌন শিক্ষা দিতে

গেলে, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারেন। সেই জন্য তাঁকে সচেতন থাকতে হবে।

॥ পঞ্চমতঃ ॥ যৌন জীবনের বিকাশের ফলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব সমস্যা বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলোকে শিক্ষক সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে দেখবেন। তিনি যদি কৈশোরের ছেলেমেয়েদের সমস্যাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না করেন, তা হ'লে, শিক্ষার্থীরা তার উপর আস্থা হারাবে। ফলে যৌন শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের প্রয়োজন, সেখানে তারা খোলা মন নিয়ে করবে না।

॥ ষষ্ঠতঃ ॥ শিক্ষক ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হওয়ার দরকার। তিনি নিজে যদি বিবাহিত জীবনে আনন্দ না পান, তা'হলে শিক্ষার্থীদের কখনওই আদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারবেন না। সব সময় তাঁর আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ থেকে যাবে। তাই শিক্ষককে হ'তে হবে যৌন জীবনের দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়।

॥সপ্তমতঃ॥ যৌন জীবনের কতকগুলো বাহ্যিক আচরণগত দিকও আছে। যেমন, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব। এই মনোভাব শিক্ষক যদি তাঁর নিজের আচরণের মধ্যে প্রকাশ না করতে পারেন তা'হলে শিক্ষার্থীরা সে মনোভাবের অধিকারী কখনও হ'তে পারবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে ও বিবাহিত জীবনে পুরুষের যে গুরুত্ব আছে, তা শিক্ষিকা যদি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারেন, ছাত্রীদের মনে তিনি কখনই এ ধরনের আদর্শ গড়ে তুলতে পারবেন না।

॥ অষ্টমতঃ ॥ যৌনতার একটা নৈতিক ও সামাজিক দিক আছে। শিক্ষককে নিজের জীবনে তা উপলব্ধি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মনোভাব সঞ্চার করতে হবে। এই মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষক যদি জাগ্রত করতে না পারেন, তা'হলে সম্পূর্ণ যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। যৌনতার নিয়ন্ত্রণ সমাজজীবনে একটা বিরাট সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে।

॥ নবমতঃ ॥ শিক্ষার্থীদের যৌন স্বাস্থ্য (sex hygiene) সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যৌন শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। দৈহিক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ আনার চেষ্টা করবেন।

॥ দশমতঃ ॥ যৌন জীবনের সঙ্গে অনেক সময় অপরাধ বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের অযথা ভয়, তাদের মন থেকে দূর করায় শিক্ষককে সচেষ্ট হ'তে হবে। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, শিক্ষক তাদের মন থেকে এই অহেতুক ভয় দূর করতে পারেন।

প্রশ্নাবলী

1. Bring out the chief characteristics of the different stages in the development of the child. [পৃঃ ২১৯-২৫২] [C. U. B. A. '62]
2. Adolescence is described as an ackward stage—a period of 'storm and stress', 'strife and strain'. Do you agree? Give reasons for your answer. [পৃঃ ২৪৫-২৪৮] [C. U. B. A. '63]
3. Discuss the physical and mental changes that occur during adolescence and their educational implications. [C.U.B.A. '64, C.U.B.T. '66] [২৩৩-২৫২ পৃঃ]
4. Give a brief account of the special needs of the Adolescent and their educational implication. [পৃঃ ২৪২-২৫২] [C.U.B.A. '68, C. U. B. T. '69]
5. Describe the changes in the thinking and feeling life of the adolescent. How would you educate the adolescents? [পৃঃ ২৪২-২৫২] [N.B.U.B.T. '67]
6. Discuss with reference to their fundamental psychological needs, how are adolescents should be disciplined for good life in society. [পৃঃ ২৪২-২৫২] [N.B.U.B.T. '70]
7. Discuss the psychological needs and urges of the adolescents. [পৃঃ ২৪২-২৫২] [N.B.U.B.T. '69]
8. Write an essay on the place of sex-education in schools, [C.U.B.T. '67] [পৃঃ ২৫২-২৬৭]
9. Discuss the psychological problems of the adolescence. How can an adolescent be helped. [পৃঃ ২৪২-২৫২] [C.U.B.T. '70]
10. Discuss the nature and needs of adolescence and the importance of sex-education at secondary stage. [পৃঃ ২৪২-২৫২] [K.U.B.T. '65]
11. How does a child develop physically, socially, mentally and emotionally in the first five years of life? [পৃঃ ২১৯-২২৫] [K.U.B.T. '66]
12. Describe the physical and mental development of a child during the first five years. [পৃঃ ২১৯-২২৫] [K.U.B.T. '66]
13. Write notes on the following :—
    (a) Needs of the adolescence. [পৃঃ ২৪২-২৪৫] (b) Sex-education. [পৃঃ ২৫২-২৬৭]
14. Discuss in brief the nature of development in pre-adolescence stage. [২২৯-২৩৩ পৃঃ]
15. Discuss the mental, physical, social and emotional characteristics of a child of 11 years. [২২৯-২৩৩ পৃঃ]

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যক্তিগত বৈষম্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য [INDIVIDUAL DIFFERENCE]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জীবনী শক্তির একটা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। একই রকম বীজ থেকে, একই বাগানে একই রকম সার দিয়ে দু'টো গাছ তৈরী করলে, তাদের বিকাশ এবং আকারে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একই কুকুরের বাচ্চা, তাদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য থাকে এবং তাদের পৃথক করা যায়। একই বাবা-মায়ের বিভিন্ন সন্তানের মধ্যেও দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রাণী এই পৃথিবীতে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে আছে। এই পার্থক্য থেকে শ্রেণী বিভাগ করা হচ্ছে, উদ্ভিদ, পাখী, স্তন্যপায়ী জন্তু, মানুষ, আরও কত কি। আবার, স্বধুই কি পাখী? বাবুই, চড়ুই, কাক, শালিক, ময়না, টিয়া, আরও অনেক। আরও বিশ্লেষণে, প্রত্যেক পাখীর মধ্যেই আবার স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। মানুষের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব একক সত্বা নিয়ে জীবন ধারণ করে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বহু প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনোবিদ প্রত্যেকের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। প্রথম শতকে যখন পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ কোটি মত, সে অবস্থা থেকে আজ পৃথিবীর লোক সংখ্যা যখন ৩০০ কোটিকে ছাড়িয়ে গেছে, এই সময়কালের মধ্যে এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব একটুও কমে নি বরং বেড়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাই, সেখানে নানারকম চরিত্র নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। চিত্র-কলার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই, সেখানে এক পুরুষ এবং নারীকে বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্য আরোপ করে উপস্থাপন করেছেন শিল্পীরা। সুতরাং, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে আছে সে বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মনে আর দ্বিধা নেই। তবে এই জটিল প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে আধুনিক মনোবিদগণ বিশেষভাবে সচেষ্ট। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক পার্থক্যকে মনোবিদ্যায় **ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি** (Psychology of individual differences) বলা হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত বৈষম্য কি?

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বিশেষ বয়সের শিশুরা মানসিক, সামাজিক, দৈহিক এবং প্রক্ষোভিক দিক থেকে একইভাবে বিকশিত হয় বা, তাদের মধ্যে বিকাশগত দিক থেকে মিল আছে, সে কথা বিবেচনা করেই আমরা জীবন

বিকাশের স্তর (stages of human development) ভাগ করেছি। স্বভাবতঃই এখন প্রশ্ন জাগতে পারে—বিকাশের ধারা যদি এক হয় পার্থক্য কি করে আসে, বা পার্থক্য কি করে থাকে? মানব জীবনের বিকাশের ধারার মিল দেখে তাদের কয়েকটা স্তরে ভাগ করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় মানবজীবনের বিকাশের যে কোন স্তরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিল থাকলেও, পার্থক্য অনেক থেকে যায়। তাই কতকগুলো দিক থেকে মানুষে মানুষে মিল আছে ঠিকই কিন্তু পার্থক্যও তাদের মধ্যে বর্তমান। এই পার্থক্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। **তাই মনোবিদ আলপোর্ট** (Allport) **বলেছেন**, পৃথিবীতে যতজন মানুষ আছে, মনোবিদগণের অনুশীলনের পদ্ধতিও তত রকম। কারণ, প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করে যাচ্ছে। তাকে সামগ্রিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে অনুশীলন করলে তাকে ভুল বিবেচনা করা হবে। প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে তার—যে নিজস্ব ভঙ্গী সে প্রকাশ করছে, তাকে যদি যথাযথভাবে অনুশীলন না করা যায়, তা'হলে তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব

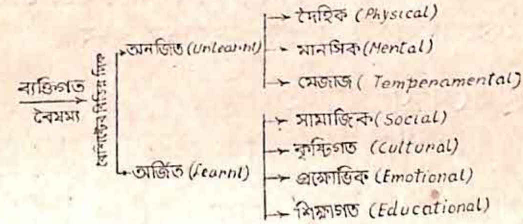
আবার, মনোবিদ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, মনোবিদ্যা বিজ্ঞান। তার মূল উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে অনুশীলন করা। তাই মনোবিদ্যা যদি ব্যক্তির পার্থক্য নিয়ে এত বেশী আলোচনা করে, তা'হলে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে সে অনেক দূরে সরে যাবে। কিন্তু মনোবিদ্গণ এই সমালোচনার বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। **তারা মনে করেন পার্থক্য** (difference) **মানব প্রকৃতির ধর্ম। সুতরাং, তাকে অস্বীকার করে যে মনোবিদ্যা গড়ে উঠবে, তা হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত।** আর বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত জ্ঞান, বিজ্ঞান হ'তে পারে না। তাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা। কিন্তু সে সাধারণ নিয়ম পার্থক্যের নিয়মও (Law of differences) হ'তে পারে। কি ভাবে পার্থক্য হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সে সম্পর্কে জানাও হবে মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই পার্থক্যের অনুশীলনের জন্যই মনোবিদ্যায় এক বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় **পার্থক্য অনুশীলনকারী মনোবিদ্যা** (Differential Psychology)। মানুষের পার্থক্য সম্পর্কে অনুশীলন বহু প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ্গণ করে আসছেন। কিন্তু পার্থক্যমূলক মনোবিদ্যা (Differential Psychology) আধুনিককালে এই পার্থক্যকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করছে। ভুণ্ড্ (Wundt), ক্যাটেল (Cattell), জ্যাস্ট্র (Jastrow), ক্রেপ্লিন (Kraepelin), এবিংহস্ (Ebbinghaus) প্রভৃতি মনোবিদগণের প্রচেষ্টায় বর্তমানে পার্থক্যমূলক

পার্থক্যমূলক মনোবিদ্যা

মনোবিত্যায় (Differential Psychology) বিজ্ঞান সম্মতভাবে এই পার্থক্য অনুশীলন করছে। এই সব অনুশীলনের বিভিন্ন ফলাফল সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের শ্রেণী বিভাগ
[Classification of Human differences]

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নানা দিক থেকে আসে। এই পার্থক্য দৈহিক দিক থেকে হ'তে পারে, মানসিক, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হ'তে পারে আবার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হ'তে পারে। কেউ বা লম্বা, আবার কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ রোগা। কেউ বেশী বুদ্ধিমান কেউ স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ বা খুবই সহানুভূতিশীল কেউ বা নিষ্ঠুর। এরকম বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মনোবিদগণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সব গুণগত দিক থেকে পার্থক্য হয়, তাকে ছ'টো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। মানুষ জন্মগতভাবে যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্থক্যকে **অনর্জিত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য** (differences in inherited traits)। আবার মানুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণ অর্জন করে, তাদের মধ্যেও পার্থক্য



হ'তে পারে। এই ধরনের পার্থক্যকে **অর্জিত গুণগত পার্থক্য** (differences in acquired traits) বলা হয়। আবার অনর্জিত জন্মসূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে আমরা কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। মানুষ জন্মসূত্রে যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তাদের মধ্যে কতকগুলো দৈহিক বৈশিষ্ট্য, কতকগুলো মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং কতকগুলো জৈব-মানসিক সংগঠন-গত বা মেজাজগত বৈশিষ্ট্য থাকে। সুতরাং, জন্মগত বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত বৈষম্যকেও এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **দৈহিক পার্থক্য** (differences in physical traits), **মানসিক পার্থক্য** (differences in mental traits) এবং **মেজাজগত পার্থক্য** (Differences in temparamental traits)। আবার অর্জিত বৈশিষ্ট্যও মানুষের

বিভিন্ন দিক থেকে আসতে পারে। যেমন সমাজগত বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, প্রক্ষোভমূলক আচরণগত বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য এই সমস্ত দিক থেকেও হয়ে থাকে। তা'হলে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে আমরা কয়েকটি পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি (চিত্র ২৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের একটা অসুবিধা হ'ল যে মানুষের কোন গুণকেই সম্পূর্ণভাবে অনর্জিত বা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত বলা যায় না। পরিবেশের প্রভাবে অর্জিত গুণেরও পরিবর্তন হয়। অন্যদিকে অর্জিত গুণও অনেক সময় অনর্জিত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কারণে মানুষের বৈষম্য আলোচনার জন্য অনেক মনোবিদ্ এ রকম শ্রেণী বিভাগ পছন্দ করেন না। **মনোবিদ গেটস** (Gates) সাধারণভাবে পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোকে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন—[এক] **দৈহিক গঠনের পার্থক্য**, [দুই] **মানসিক গঠনের পার্থক্য**, [তিন] **সহজাত দক্ষতার পার্থক্য**, [চার] **অর্জিত দক্ষতার পার্থক্য**, [পাঁচ] **প্রক্ষোভিক পার্থক্য**, [ছয়] **ঐচ্ছিক শক্তিগত পার্থক্য** এবং [সাত] **নীতিবোধের পার্থক্য**। তবে এই ধরনের শ্রেণী বিভাগেরও অসুবিধা আছে। এখানে এক একটা শ্রেণী অত্যন্ত বেশী বিস্তৃত করা হয়েছে, আবার, কোন কোনটাকে খুবই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আমরা পূর্বোক্ত শ্রেণী বিভাগের উপর ভিত্তি করে এই বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই বৈষম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

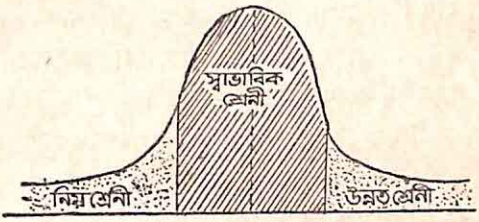
ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি
[Nature of Individual Differences]

মনোবিদ্যায় পরিমাপের (Measurement) পদ্ধতির উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। মনোবিদ্যার পরিমাপের ক্ষেত্রে আধুনিককালে বিশেষভাবে রাশিবিজ্ঞানে (statistics) জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ করার পর মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই পার্থক্য দু'দিক থেকে আসতে পারে—**গুণগত পার্থক্য** (Qualitative difference), এবং **পরিমাণগত পার্থক্য** (Quantitative difference)। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবনে যে কোন বৈশিষ্ট্য তার নিজস্বতা গুণগত দিক থেকে বজায় রাখতে পারে আবার পরিমাণগত দিক থেকেও বজায় রাখতে পারে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানুষের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে তার

গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য

গুণগত দিকের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। আবার অনেক সময় কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে গুণগতভাবে সঠিকভাবে বিচার করা যায় না, বা, বিচার করলেও, তা সঠিকভাবে করা যায় না। তাই ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করার সময়, কোন কোন সময় আমরা তার গুণগত মূল্যের কথা উল্লেখ করব, আবার যেখানে সম্ভব পরিমাণগত বৈষম্যের কথা বলবো। তবে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে কোন বৈশিষ্ট্য, সাধারণের মধ্যে (population) একটা বিশেষ নিয়মে বিস্তৃত থাকে। এই নিয়মকে রাশি বিজ্ঞানে সাধারণ বণ্টনের নিয়ম (Normal distribution) বলা হয়। অর্থাৎ, বহু ব্যক্তির কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আমরা যদি পরিমাপ করি, তা'হলে দেখবো যে তা সাধারণ স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে। অর্থাৎ, পরিমাপের অন্তর্গত বেশীর ভাগ ব্যক্তি একটা বিশেষ সীমার মধ্যে থাকে। তাদের বলা হয় স্বাভাবিক (Normal or average) বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। বাকী কিছু ব্যক্তি থাকে যারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণে সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলা হয়। আর কিছু থাকে তারা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম পরিমাণে সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের বলা হয় নিম্ন বৈশিষ্টের

পার্থক্যের স্বাভাবিক বণ্টন।



স্বাভাবিক বণ্টনের লেখ
(Normal Distribution curve)

অধিকারী। স্বাভাবিক বণ্টনের লেখ (Normal distribution curve) ছবিতে দেখানো হ'ল। সাধারণতঃ শতকরা ষাট জন থাকে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। আর শতকরা কুড়ি জন থাকে উপরের দিকে এবং শতকরা কুড়ি জন থাকে নীচের দিকে। এটা হ'ল সাধারণ হিসেব। মনোবিদ্ গ্যাল্টন (Galton) প্রথম ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে এই বণ্টনের প্রয়োগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর বংশগতির তত্ত্বেও এই নীতির প্রয়োগ করেন। তবে আধুনিককালে প্রায় প্রত্যেক মনোবিদ পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে কোন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষ এই বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ীই প্রায় বিস্তৃত থাকে। সুতরাং, আধুনিক মনোবিদ্যায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের পরীক্ষার ফলাফল সাধারণতঃ এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক
[Different Aspects of Individual difference]

এখন আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। মানুষ কি ভাবে দৈহিক, মানসিক, মেজাজ, সামাজিক, কৃষ্টিগত, প্রক্ষোভিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, সে সম্পর্কে এক এক করে উল্লেখ করব।

॥ এক ॥ দৈহিক পার্থক্য
[Physical difference]

যদিও প্রত্যেক মানুষেরই দু'টো হাত, দু'টো পা, দুটো কান, ইত্যাদি সব কিছুই এক রকম, তা হ'লেও দেখা গেছে, কোন না কোন দৈহিক দিক থেকে তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। যেমন, ওজনগত দিক থেকে (weight) একই শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র, ওজনের পরিমাণগত পার্থক্যই যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় তা নয়, ওজনের বিকাশের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ শিশুর দৈহিক বিকাশের হার পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করলে লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন বয়সে তাদের দৈহিক ওজনের বৃদ্ধির হার নিজস্ব নিয়মে পরিবর্তিত হয়।

ওজনের পার্থক্য

এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উচ্চতাগত (Height) পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা সাধারণ উচ্চতার চেয়ে লম্বা কেউ আবার বেঁটে। আবার প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিমাপের কিছু কিছু পার্থক্যও থাকে। উচ্চতা বিকাশের হারেও ব্যক্তিজীবনে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওজনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি যমজ সন্তানদের মধ্যেও উচ্চতাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

উচ্চতার পার্থক্য

দেহের ওজন ও উচ্চতা ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাপের দিক (size of the bodily organ) থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। কারও হাতটা লম্বা, নাকটা চেপ্টা, আবার কারও হাতটা ছোট, নাকটা সুঁচালো, কারও পা-গুলো লম্বা, ইত্যাদি। নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ (Anthropologist) মানুষের শ্রেণী বিভাগের জন্য এই সব দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাপকেই বিবেচনা করেন। মাথার খুলির (Skull) পরিমাপ অনুযায়ী মানুষের বৈষম্য নির্ণয় করেন। ক্যালিপার্স (Callipers) এর সাহায্যে মাথার খুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করে তাঁরা এক সূচকের (Index) এর সাহায্যে প্রকাশ করেন। এই মস্তিষ্কের পরিমাপের সূচক (Index),

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পার্থক্য

$\left(\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{প্রস্থ}} \times 100\right)$ এই সূত্রের দ্বারা নির্ণয় করা হয় এবং এর সাহায্যে মানুষের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

দৈহিক শক্তির (Physical strength) দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়। একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শক্তিগত পার্থক্য থাকে। কারও হাতের জোর বেশী কারও কম। কারও শারিরীক শক্তি বেশী কারও আবার কম। দেহের বিভিন্ন অংশের শক্তি পরিমাপ করার জন্য শক্তিমাপক যন্ত্র (Dynamometer) পাওয়া যায়। এসব যন্ত্রের সাহায্যে দেহের শক্তি পরিমাপ করা যায়। মনোবিদগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই শক্তির দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে।

দৈহিক শক্তির পার্থক্য

দৈহিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আর একটা দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। তা'হল কর্মক্ষমতার (Work-ability) দিক। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কর্মক্ষমতা আছে। সবাই সমান দৈহিক কাজ করতে পারে না। কেউ দশ কিলোগ্রাম জিনিস সহজে তুলতে পারে, আবার কেউ পাঁচ কিলোগ্রামও তুলতে পারে না। কেউ এক নাগাড়ে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে যেতে পারে, আবার, কেউ একটু হাঁটতে হ'লে হাঁপিয়ে উঠে। মনোবিদগণ পরীক্ষাগারে, আরগো গ্রাফের (Ergo-graph) সাহায্যে মানুষের কর্মক্ষমতার পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত করেছেন, এই দিক থেকে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বিভিন্ন মানুষের কর্মক্ষমতার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অবসাদের সূচক (Fatigue Index) ব্যবহার করেন।

কর্মক্ষমতার পার্থক্য

শুধুমাত্র দৈহিক পরিমাপের দিক থেকে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়, তাই নয়, দেহ-সঞ্চালনগত সমন্বয়ের দিক থেকেও পার্থক্য দেখা যায়। দেহ-সঞ্চালনের সমন্বয়ের উপর দৈহিক স্থৈর্য্য (Steadiness) নির্ভর করে। এই স্থৈর্য্যের দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কে কত সূক্ষ্ম-কাজ করতে পারে তা নির্ভর করে তার বিশেষ অঙ্গের স্থৈর্য্যের উপর।

স্থৈর্য্যের পার্থক্য

এই সব দৈহিক দিক থেকে বৈষম্য ছাড়াও আমরা মানুষে মানুষে সাধারণ অবয়বের পার্থক্য দেখতে পাই। মানুষের বিচ্ছিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর একত্রিত সমন্বয়ে, ব্যক্তির মধ্যে এক স্বতন্ত্র ভাব ফুটে ওঠে। সবকিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই তার সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে। গায়ের রং, গলার স্বর, অঙ্গ ভঙ্গী সব কিছু মিলিয়ে একত্রে মানুষের মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে, যা দেখে আমরা তাকে চিনতে পারি। এই দেহ গঠনের দিক থেকে মানুষকে পার্থক্য করার রীতি

সাধারণ অবয়বের পার্থক্য

বহুদিন থেকে চলে আসছে। তাই বহু প্রাচীন কালেও মানুষকে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি (Typology) আমরা দেখতে পাই। যেমন, যারা বেঁটে এবং মোটা তাদের পিকনিক (Pyknic) বলা হয়। যারা লম্বা, রোগা তাদের বলা হয় লেপ্‌টোসোম্ (Leptosome), এরকম বহু ধরনের শ্রেণী বিভাগ আছে।

॥ দুই ॥ মানসিক বৈষম্য
[Mental Difference]

মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ারও যেমন পার্থক্য দেখা যায় ব্যক্তিজীবনে, তেমনি বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতারও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার (Perception) কি ভাবে ব্যক্তিজীবনে পার্থক্য হয়, তার উপর বিভিন্ন মনোবিদ পরীক্ষা করেছেন। মনোবিদ গ্যাল্টন (Galton), ব্যক্তির মধ্যে যে সংবেদনগত পার্থক্য হয় তার উপর পরীক্ষা করেছেন। একই শক্তি সম্পন্ন শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন তীব্রতায় প্রত্যক্ষ করে। বিভিন্ন ব্যক্তি একই বস্তুর কিরকম ভাবমূর্তি (imagery) তৈরী করে তার উপর তিনি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানুষকে শ্রেণী-বিভাগ করার রীতিও প্রচলিত আছে। যেমন কাউকে **বিশ্লেষক প্রকৃতির** (analyser) আবার কাউকে বলা হয় **সংশ্লেষক প্রকৃতির** (Synthesizer)। বিশ্লেষক প্রকৃতির ব্যক্তিরা সব কিছুর অংশ গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখে, আর সংশ্লেষক প্রকৃতির ব্যক্তিরা সব কিছুকে একত্রে প্রত্যক্ষ করে একক জ্ঞান আহরণ করে। আবার, কেউ কেউ প্রত্যক্ষণের সময় শুধুমাত্র বস্তুকেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ করে। অর্থাৎ, বস্তু ঠিক যেমন, তাই প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ খুব নিখুঁত হয়। এদের বলা হয় **বাস্তব প্রকৃতির** (Objective)। অনেককে দেখা যায়, বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে তার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে। এদের বলা হয় ব্যক্তিগত প্রকৃতির (Subjective)। এমনিভাবে আরও বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যক্ষণের দিক থেকে ভাগ করা হয় যেমন **জেনস্** (Jaensch) দু'রকম শ্রেণীর কথা বলেছেন—J-প্রকৃতির, T-প্রকৃতির। আবার কেউ বলেছেন, সক্রিয় প্রকৃতির (active) এবং নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির (Passive)। মানুষকে প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে ভাগ করার রীতি আধুনিক মনোবিদগণ স্বীকার করেন না। তাঁরা আরও বিশদভাবে এই সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এবং এই সব পরীক্ষায় তাঁরা উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতি (Factor analysis) ব্যবহার করেছেন। তাঁদের এই উন্নত ধরনের বিশ্লেষণ

প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

থেকেও আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, প্রত্যক্ষণের দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য বর্তমান থাকে।

প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আর এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন বস্তু প্রত্যক্ষণের ফলে, তার ভাবমূর্তি (Image) আমাদের মনে সৃষ্টি হয়। এই ভাবমূর্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। দেখা গেছে, এই ভাবমূর্তি গঠনে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। কেউ চোখকে কেন্দ্র করে বা দর্শনের সংবেদনকে কেন্দ্র করে খুব সহজে ভাবমূর্তি গঠন করতে পারে, আবার অন্য কেউ হয়তো শ্রবন ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে ভাবমূর্তি (Image) গঠন করতে পারে। শ্রেণীতে অনেক শিক্ষার্থী থাকে যারা না দেখলে করতে পারে না। এবং দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খুব ভালভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে বেশী কার্যকরী দেখা যায়। এই ভাবমূর্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন দর্শনধর্মী (Visile), শ্রবণধর্মী (Audile), স্পর্শধর্মী (Tactile) ইত্যাদি।

ভাবমূর্তির পার্থক্য

প্রত্যক্ষণের সঙ্গে আর এক ধরনের অবস্থার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। এটা হ'ল প্রতিক্রিয়া সময় (Reaction time)। কোন উদ্দীপক (Stimulus) প্রয়োগ আর উত্তেজনা জনিত প্রতিক্রিয়ার করার মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া (Reaction time)। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সময়ের যে পার্থক্য হয়, এটা প্রথম ধরা পড়ে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীনিচ্ পর্যবেক্ষণাগারে। এই প্রতিক্রিয়া সময় নিয়ে তারপর থেকে বহু গবেষণা হয়েছে। মনোবিদগণ তাঁদের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, এই প্রতিক্রিয়া সময় (Reaction time) স্বাভাবিক দেহগত কারণ ছাড়া, মানসিক অবস্থার (mental condition) উপর নির্ভর করে। প্রতিক্রিয়া সময় বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। যখন আমরা একটা মাত্র উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করি তখন যে সময় লাগে তাকে বলা হয় **সরল প্রতিক্রিয়া সময়** (Simple reaction time)। আবার, যখন অনেকগুলো উদ্দীপকের মধ্যে যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে আমরা প্রতিক্রিয়া করি, তখন যে সময় লাগে তাকে বলা হয় **জটিল প্রতিক্রিয়া সময়** (Compound reaction time)। এই প্রতিক্রিয়া সময়ের দিক থেকে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য হয়, এ বিষয়ে মনোবিদগণের মধ্যে বর্তমান কোন মতভেদ নেই। একজন মোটর চালক, রাস্তায় হঠাৎ গাড়ীর সামনে, কোন লোক পড়লে, খুব তাড়াতাড়ি ব্রেক্ করতে পারে; আবার, কেউ অনেক চেষ্টা করেও ব্রেক করার আগেই চাপা দিয়ে দেয়। এ ধরনের ঘটনা প্রতিক্রিয়া সময়ের

প্রতিক্রিয়া সময়ের পার্থক্য

পার্থক্যের জন্য ঘটে। পরীক্ষাগারে প্রতিক্রিয়া সময় পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বলে **ক্রনোস্কোপ** (Chronoscope)। ক্রনোস্কোপ বিভিন্ন রকমের আছে, ভার্ণিয়ার ক্রনোস্কোপ (Vernier Chronoscope) দিয়ে আমরা সেকেণ্ডের $\frac{১}{১০০}$ ভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারি। আবার, হিপস্ ক্রনোস্কোপ (Hipps Chronoscope) দিয়ে সেকেণ্ডের $\frac{১}{১০০০}$ ভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়।

স্মরণক্রিয়ার পার্থক্য

স্মরণ প্রক্রিয়ার (Memory) দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। স্মরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক আছে। যেমন—শিখন (Learning), সংরক্ষণ (Retention), পুনরুদ্রেক (Recall) বা প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)। এই সব প্রক্রিয়ার দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিখন ক্ষমতার দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারে আবার কেউ একই জিনিস শিখতে অনেক দেরী করে। সংরক্ষণের দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ বিষয়বস্তু অনেক সময় ধারণ করতে পারে আবার কেউ বেশী সময় ধারণ করতে পারে না। সংরক্ষণ ও শিখনের কথা বিবেচনা করে অনেক মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। অনেক শিক্ষার্থী তাড়াতাড়ি শিখে আবার তাড়াতাড়ি ভুলে যায়; আবার কেউ কেউ, তাড়াতাড়ি শিখে অনেক বেশী সময় সংরক্ষণ করতে পারে; কেউ দেরীতে শিখে সংরক্ষণ করে অনেক বেশী; আবার এমনও দেখা যায় দেরীতে শিখে, অথচ খুব বেশী সময় সংরক্ষণ করতে পারে না। আবার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেকেও (Recall) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যাভিজ্ঞাও এক ধরনের পুনরুদ্রেকের প্রক্রিয়া। পুনরুদ্রেক হয় বস্তুর অবর্তমানে, কিন্তু প্রত্যাভিজ্ঞা হয় বস্তুর বর্তমানে। অনেক সময় দেখা যায় কারও পুনরুদ্রেকের ক্ষমতা বেশী। আবার কারও প্রত্যাভিজ্ঞার (Recognition) ক্ষমতা বেশী। তা'হলে দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে স্মরণ করার ক্ষমতার (Capacity of memorization) দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে।

ধারণার পার্থক্য

ধারণা (Concept) গঠনের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধারণা হ'ল বস্তু সম্পর্কে সাধারণ সামগ্রিক জ্ঞান। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ধারণা গঠনের ক্ষমতার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধারণা গঠন, অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ শিক্ষার্থী খুব সহজে, পাঠ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে সাধারণ জ্ঞান খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী তা পারে না। ধারণা গঠনের জন্য যে বিশ্লেষণাত্মক

(analytical) এবং সংশ্লেষণাত্মক (synthetic) প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তার দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়।

শিক্ষার্থীদের অনুরাগের (Interest) দিক থেকে পার্থক্য খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। এই অনুরাগ মানুষের যে কোন্ কাজকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

অনুরাগের পার্থক্য

মানুষের অনুরাগকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিমাপ করার পদ্ধতি পূর্বে জানা ছিল না। তাই অনুরাগের পার্থক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বে বিশেষ ধারণা ছিল না। তবে সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা ব্যক্তির অনুরাগের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারতাম। কিন্তু, বর্তমানে মনোবিদগণ ব্যক্তির অনুরাগের ক্ষেত্র পরিমাপ করার জন্য নানা ধরনের অনুরাগ অনুসন্ধানী অভীক্ষা (Interest inventories) তৈরী করেছেন। এই সব অভীক্ষার দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ছেলে এবং মেয়েদের অনুরাগের পার্থক্য থাকে। তা'ছাড়া বিভিন্ন ছেলেদের মধ্যেও অনুরাগের পার্থক্য থাকে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, কোন শিক্ষার্থীর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আছে, আবার, কারও অঙ্কের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। আবার, এও দেখা গেছে, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, ইত্যাদির অনুরাগের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

কল্পন প্রক্রিয়ার (Imagination) দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারও মধ্যে দেখা যায় **সৃজনাত্মক কল্পনা** (Creative imagination) বেশী হয়, আবার কেউ শুধুমাত্র **গ্রহণাত্মক কল্পনাই** (Receptive imagination) করতে পারে। কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে **বৈজ্ঞানিক কল্পনার** (Scientific imagination) ক্ষমতা দেখা যায় আবার কারও মধ্যে **ঐতিহাসিক কল্পনার** (Historical imagination) ক্ষমতা প্রবল থাকে। অতীত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে ভাবমূর্তি (image) সৃষ্টি করার যে প্রক্রিয়া তাকেই বলা হয় **কল্পন** (imagination)। এখন, অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ নির্বাচনে এবং তাদের গ্রন্থনে, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। ব্যক্তিজীবনে কল্পনার বিকাশের হারেরও পরিবর্তন হয়।

কল্পন এর পার্থক্য

মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য, যে ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে তা হ'ল ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (General mental ability) বা যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি বুদ্ধি (Intelligence)। এই বুদ্ধির উপর অন্যান্য ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া নির্ভর করে। মনোবিদগণ বুদ্ধিকে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে এই বুদ্ধিগত দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, কিছু মানুষ তারা জন্মগতভাবে

বুদ্ধির পার্থক্য

উন্নত ধরনের মানসিক চিন্তা করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত জীবনে তার প্রভাব একই রকম থাকে। আবার কিছু লোককে লক্ষ্য করা যায়, যারা কোন রকম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজ করতে পারে না। এবং এও দেখা গেছে, এই সব লোক শত চেষ্টা করেও স্বাভাবিক বিচার জ্ঞানসম্পন্ন বলা যায় না। তাই মনোবিদগণ মনে করেন, বুদ্ধি হ'ল জন্মগত মানসিক ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে দেখা যায়। মনোবিদগণ বুদ্ধি পরিমাপক বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Intelligence test) তৈরী করেছেন। এই সব অভীক্ষার সাহায্যে সব শ্রেণীর লোকদেরই বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। বর্তমানে বুদ্ধির পরিমাণ বুঝানোর জন্য এই সব অভীক্ষার ফলাফলকে একটা সূচকের (index) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এই সূচককে বলা হয় বুদ্ধাঙ্ক (Intelligence Quotient ; I. Q.)। মানসিক বয়স (Mental age) এবং সাধারণ বয়সের (chronological age) অনুপাতকে বুদ্ধাঙ্ক বলা হয়। অর্থাৎ,

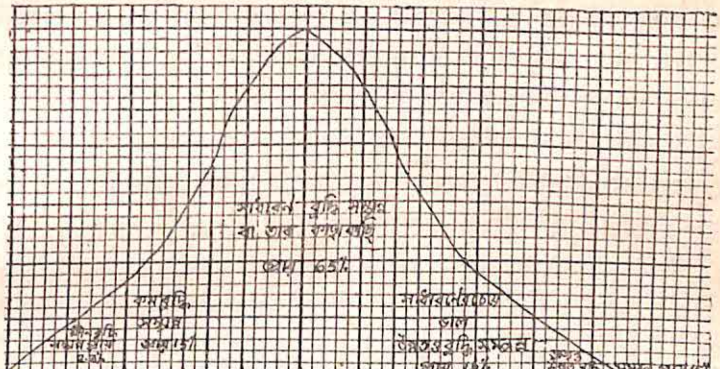
$$\text{বুদ্ধাঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স (Mental age)}}{\text{সাধারণ বয়স (Chronological age)}} \times 100,$$

এই সূত্র থেকে একটা জিনিস বুঝা যায় যাদের মানসিক ও সাধারণ বয়স সমান, বা যাদের স্বাভাবিক বয়স বাড়ার সঙ্গে সমানুপাতে মানসিক বিকাশ হচ্ছে, তাদের বুদ্ধাঙ্ক হবে ১০০। বহু ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে, তার ফলাফল থেকে মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, বুদ্ধির দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য, স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম (Normal distribution) মেনে চলে। বিভিন্ন মনোবিদগণের পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে, মনোবিদ **গ্যারেট** (H. Garrett) বুদ্ধাঙ্কের বণ্টনের এক তালিকা করেছেন, তা নিম্নরূপ—

বুদ্ধাঙ্ক	শ্রেণী বিভাগ	ব্যক্তির শতকরা হার
১৪০ এর উপরে	অত্যন্ত উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন	১'৫%
১২০-১৩৯	উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন	১১'০%
১১০-১১৯	সাধারণের চেয়ে ভাল	১৮'০%
৯০-১০৯	সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন	৪৮'০%
৮০- ৮৯	সাধারণের চেয়ে খারাপ	১৪'০%
৭০- ৭৯	অত্যন্ত কম বুদ্ধি সম্পন্ন	৫'০%
০- ৬৯	ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন	২'৫%

এই বণ্টনের হারকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাও খুব কম এবং ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাও কম। প্রায় সব পরীক্ষায়ই দেখা গেছে উন্নত বুদ্ধি (Gifted) সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অনুশীলিত ব্যক্তিদের শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ থাকে এবং ক্ষীণবুদ্ধি (Feeble minded) সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ২-৩ ভাগ থাকে। তবে আধুনিক কালে,

মনোবিদগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন ৭০ এর নীচে যাদের বুদ্ধাঙ্ক তারাই ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং তাদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। তাঁরা এই ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যাদের বুদ্ধাঙ্ক ২৫ এর মধ্যে, তাদের **জড় বুদ্ধি সম্পন্ন** (Idiot) বলা হয়। যাদের বুদ্ধাঙ্ক ২৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে তাদের বলা হয় বোধহীন (Imbecile)। আর যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৫০ এর উপরে এবং ৭০ এর নীচে তাদের বলা হয় স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন (Moron)। বুদ্ধির পার্থক্যের বণ্টন নিচের ছবির সাহায্যে দেখানো হ'ল।



বুদ্ধির দিক থেকে এই পার্থক্য ব্যক্তিজীবনের অন্য দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধির বিকাশের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা গেছে। যারা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের বিকাশের হারও বেশী হয়। যারা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের বিকাশের হারও অল্প হয়। বুদ্ধাঙ্কের দিক থেকে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যেও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। আবার, সামাজিক প্রভাবের দরুনও বুদ্ধির পরিমাণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ছাড়াও ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম বিশেষ ক্ষমতা (special ability) থাকে। এই সব বিশেষ ক্ষমতার দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ ক্ষমতা, ব্যক্তির কোন বিশেষ কাজের দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারও মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষমতা (Musical ability) থাকে, কারও মধ্যে যান্ত্রিক ক্ষমতা (Mechanical ability) থাকে। এমনিভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা থাকে। আবার যাদের মধ্যে একই বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাদের পরিমাণগত দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একই যান্ত্রিক ক্ষমতা (mechanical ability) কারও মধ্যে বেশী থাকে, আবার কারও মধ্যে থাকে কম। বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য বর্তমানে

বিশেষ ক্ষমতার পার্থক্য

অভীক্ষা (Test) পাওয়া যায়। বিশেষ ক্ষমতার (special ability) এই পার্থক্য ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সবশেষে আর একটা মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই মানসিক প্রক্রিয়া হ'ল মনোযোগ (Attention)। মনোযোগের ক্ষেত্রে, দু'দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ** মনোযোগের পরিসরের (span of attention) দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে যত একক বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে তাকে তার মনোযোগের পরিসর বলে। মনোবিদগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই মনোযোগের পরিসর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়। **দ্বিতীয়তঃ** মনোযোগের চঞ্চলতার (fluctuation of attention) দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। চঞ্চলতা, মনোযোগের ধর্ম। কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমরা অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারি না। মনোযোগ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। মনোযোগের এই কাল (Duration of attention) ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়। মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মনোযোগের পার্থক্য

॥ তিন ॥ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বা মেজাজগত পার্থক্য
[Personality difference or Temperamental difference]

কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি তার সমস্ত রকম মানসিক গুণ মিলে সে যা তাই। অবশ্য ব্যক্তিত্ব শব্দের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত আছে। মনোবিদ আলপোর্ট (Allport, G. W.) বলেছেন "যে কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝি তার সেই সব সতত পরিবর্তনশীল জৈব-মানসিক ক্রিয়ার সমবায়কে যা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে।"[1] সুতরাং, এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব তার স্বাতন্ত্র্যেরই প্রতীক। মেজাজ (Temperament) কথাটা সাধারণভাবে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। এমনকি অনেক মনোবিদ ব্যক্তিত্বের (personality) পরিবর্তে মেজাজ (Temperament) কথাটা ব্যবহার করেন। বিশেষভাবে ইংরেজ মনোবিদগণ (British psychologists) সাধারণভাবে মেজাজ কথাটা ব্যবহার করেন। কিন্তু, প্রকৃত বিচারে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়

ব্যক্তিত্ব ও মেজাজ

1. "Personality is the dynamic organisation of those Psycho-physical system within the individual which determines his unique adjustment with the environment"—Alport : Personality : Psychological.

তাকেই মেজাজ বলা হয়। কিন্তু মনোবিদ্যায়, সব সময় এই পার্থক্য মেনে চলা হয় না। ব্যক্তির একই বৈশিষ্ট্যকে কোন সময় ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Personality trait) বলা হয়। আবার কোন সময় তাকেই মেজাজগত বৈশিষ্ট্য (Temperamental trait) বলা হয়ে থাকে। তবে স্থূক্ষ্ম বিচারে ব্যক্তিত্বের সব সংলক্ষণকে মেজাজগত বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। যাই হউক, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বা, মেজাজগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের পার্থক্য

মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের যে সব বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণের (Personality traits) কথা বলেছেন, তা সবই দ্বিপ্রান্তিক (Bi-polar)। এবং দুই প্রান্ত বিন্দুর মধ্যে ব্যক্তি অবস্থান যে কোন স্থানে হ'তে পারে। যেমন অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতা (Extroversion-Introversion) ব্যক্তি সত্তার একটা সংলক্ষণ। কোন বিশেষ ব্যক্তি চরমভাবে অন্তর্মুখী হ'তে পারে বা চরম প্রকৃতির বহির্মুখী হ'তে পারে, অথবা এর মধ্যে যে কোন প্রকৃতির হ'তে পারে। এই দু'ই প্রান্ত বিন্দুর কেন্দ্রের অবস্থা বলা হয় উভয়মুখী (ambivert)। ঠিক এমনিভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা বশ্যতা (ascendance submission) ব্যক্তি সত্তার আর একটা বৈশিষ্ট্য। এবং এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত বৈষম্য দুই প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে ঘটে থাকে। এমনিভাবে প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিত্বের বা মেজাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। কোন কোন অভীক্ষা (test) আছে প্রশ্ন পত্রের আকারে। এগুলো দিয়ে সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়। যেমন—মনের অস্বাভাবিকতা পরিমাপক অভীক্ষা (Neurotic Questionnaire), অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতার অভীক্ষা (Extroversion-Introversion test), আত্মপ্রতিষ্ঠা বশ্যতার অভীক্ষা (Test for ascendance submission), ইত্যাদি। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা পাওয়া যায়। এই সব অভীক্ষার দ্বারা আমরা ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক সংগঠন পরিমাপ করতে পারি। এদের সাধারণ নাম হ'ল প্রজেকটিভ্ অভীক্ষা (Projective test)। যেমন শব্দ-সংযোগমূলক অভীক্ষা (Word-association test), রসাকের ইঙ্করটের অভীক্ষা (Rorschach Ink-blot test), থিমাটিক অ্যাপার-সেপ্সান টেস্ট্ (Thematic apperception test) ইত্যাদি। এই সব অভীক্ষায় কিভাবে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা হয়, সে সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অধ্যায় আলোচনা করেছি।

এই সব অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বিচার করে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অনুযায়ী মনোবিদগণ মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্যের সঙ্গের

মিশবার ক্ষমতার দিক থেকে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—আত্মকেন্দ্রিক (introvert), অপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক (extrovert) এবং উভয়মুখী (Ambivert)। আবার অনেকে তাদের মানসিক অস্বাভাবিকতার দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন, যাদের হিষ্টিরিয়া রোগীর মত কিছু কিছু উপসর্গ দেখা যায় তাদের বলা হয় হিষ্টিরয়েড্ (Hystroid), যারা সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মত কিছু কিছু আচরণ করে তাদের বলা হয় সিজয়েড (Schizoid)। এমনি, আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে। তবে ব্যক্তিগত এই পার্থক্য ব্যক্তি জীবনে এক স্থায়ী সংগঠনের দরুন হয়ে থাকে। এই কারণে এদের পরিবর্তন কম হয়, এবং এদের সামঞ্জস্যতা সব সময় লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ

এতক্ষণ আমরা মানুষের অনর্জিত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তবে ঐ সব বৈশিষ্ট্য যে সম্পূর্ণভাবে অনর্জিত (unlearnt) একথা বলা যায় না। শিক্ষা বা জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক সময়, এই সব দৈহিক, মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই সম্পূর্ণভাবে অনর্জিত ও অর্জিত এই দু'ভাবে মানুষের বৈশিষ্ট্যকে পৃথক করা যায় না। এই ধরনের বিস্তৃত শ্রেণী বিভাগকে বাদ দিয়ে পর পর, তার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। এখন আমরা যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব, তাদের অনেক মনোবিদ অর্জিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

॥ চার ॥ সামাজিক বৈষম্য

[Social difference]

মানব শিশু সমাজ পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর থেকেই সমাজ তার আচরণ ধারাকে প্রভাবিত করতে থাকে। ফলে, ব্যক্তিজীবনের নানা রকম আচরণ, সমাজের নিয়ম দ্বারা সব সময়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশু যেমন পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করে, ঠিক তেমনিভাবে তার আচরণ ধারা গড়ে ওঠে। জন্মের পর থেকে যে সমাজের মধ্যে সে বাস করে তা'হল পরিবার (family)। বিদ্যালয়ের জীবনের পূর্ব অবস্থা পর্যন্ত এই পরিবারই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারের মধ্যে বয়স্কদের আচার, আচরণ, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদির দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এবং এই পারিবারিক, প্রভাব শিশুদের মধ্যে বৈষম্য আনে। বিভিন্ন পরিবারের শিশুর আচার, আচরণ, আদর্শ, মনোভাব ভিন্ন প্রকৃতির হয়। তাই দৈহিক বিকাশের দিক থেকে মিল থাকলেও, দু'জন দুই পরিবার থেকে

পরিবার, বিদ্যালয় ও গোষ্ঠীর প্রভাব

আসার জন্য, তাদের সামাজিক আচরণগত পার্থক্য হয়। এর পর শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে। এই বিদ্যালয়ের প্রভাব তাদের আচরণের মধ্যে দেখা যায়। একজন শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে একই বয়সের একই শ্রেণীর গ্রামের ছাত্রের মধ্যে অনেক তফাত থাকে। বিদ্যালয়ের সামাজিক বিকাশ দু'দিক থেকে হয়। কিছুটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনার প্রভাবে আর কিছুটা সহপাঠীদের প্রভাবে। তাই শিশুদের মধ্যে এই সময়ে যে আচরণ দেখা দেয়, তার বৈষম্য এই দল বা বিদ্যালয় সমাজ এর উপর নির্ভরশীল। এর পরে আসে কর্ম পরিবেশ ও বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ। প্রাপ্ত বয়সে মানুষের সামাজিক আচরণের বৈষম্য এই দুই পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের কাজের অভ্যাসের পার্থক্য (difference in work habit), অবসর যাপনের পার্থক্য (difference in leisure time activities), বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি মনোভাবের পার্থক্য (difference in attitude toward social functions) এ সব কিছু তার নিজস্ব সামাজিক অন্তর্ভুক্তির (social-belongingness) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনি সমাজের দ্বারা ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ (values of) নিয়ন্ত্রিত হয় বলে, ব্যক্তিগত দিক থেকে এই মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা যায়।

॥ পাঁচ ॥ কৃষ্টিমূলক বৈষম্য [Cultural difference]

সমাজ পরিবেশের পার্থক্যের জন্য যেমন ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা দেয়, তেমনি বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কৃষ্টিমূলক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী, কৃষ্টিমূলক জীবন (Cultural life) গড়ে ওঠে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষের পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, ইত্যাদি শীত প্রধান দেশের লোকের থেকে পৃথক। অবশ্য এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক জীবনও প্রভাবিত করে। প্রত্যেক সমাজই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আচরণ বিধির কিছু মৌলিক উপাদান সঞ্চয় করে রাখে। একে বলা হচ্ছে কৃষ্টি। এই মৌলিক উপাদান দলভেদে বা জাতিভেদে ভিন্ন হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকতার যুগেও যদিও মানুষ এই জাতিগত ও স্থানগত গণ্ডীকে অতিক্রম করে, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়েছে, তা সত্ত্বেও দেখা যায়, জাতির (Racial influence) প্রভাব ব্যক্তি মাত্রেরই আচরণে প্রকাশ পায় এবং তা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যকে পরিস্ফুটিত করে। নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) ও মনোবিদগণের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, দৈহিক গঠন, আচরণ ও নানা রকম মানসিক প্রক্রিয়ার ও ক্ষমতার উপর এই জাতিগত পার্থক্যের প্রভাব

জাতিগত পার্থক্য

আছে। তাই অনেকে জাতিগত পার্থক্যকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ হিসেবেও বিবেচনা করেন।

॥ ছয় ॥ প্রক্ষোভিক বৈষম্য
[Emotional difference]

প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার (emotional reaction) দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। পরিণত বয়সে দু'জন ব্যক্তির প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। খুব সাধারণ ব্যাপারেই কেউ কাঁদতে আরম্ভ করেন, আবার কেউ গভীর দুঃখেও কাঁদেন না। কেউ খুব সামান্য কারণেই রাগ করেন আবার কেউ কেউ অত সহজে রাগ করেন না। আবার প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সামাজিকীভবন হয় বলে, সে দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ রাগ করলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে মারতে যান। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র তর্কের মধ্যে আচরণকে সীমাবদ্ধ রাখেন। অনেকে রাগ হ'লে রাগের পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে যান। এ ছাড়া প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, শিশুর জীবনে প্রক্ষোভগুলো ধীরে ধীরে কোন বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয় এবং সেন্টিমেণ্ট (sentiment) তৈরী করে। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে দেখা গেছে, এই সব সেন্টিমেণ্টের প্রকৃতি ভিন্ন হয়। সেন্টিমেণ্ট যে সব বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তার পার্থক্যের দরুন, সেন্টিমেণ্টেরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে একজনের আনন্দ হ'তে পারে অন্য একজনের রাগ বা দুঃখ হ'তে পারে। প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বৈষম্য অনেক সময় অনুবর্তনের (conditioning) জন্যও হয়ে থাকে।

প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া ও সেন্টিমেণ্টের পার্থক্য

॥ সাত ॥ শিক্ষাগত বৈষম্য
[Educational difference]

এই বৈষম্যকে শিক্ষাগত বৈষম্য না বলে শিক্ষালয়ের পারদর্শিতামূলক বৈষম্য (difference in school achievement) বলাই ভাল। কারও শিক্ষা ব্যাপক অর্থে সব রকম অর্জিত আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই সে অর্থে সামাজিক, প্রক্ষোভিক, কৃষ্টিমূলক সব বৈষম্যই শিক্ষামূলক। কিন্তু আমরা এখানে শিক্ষামূলক বৈষম্য বলতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছে, সে দিকের বৈষম্যকে বুঝাতে চাই। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই কোন শিক্ষার্থী খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু শিখে আবার কেউ কেউ তা

শিক্ষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য

পারে না। অনেক শিক্ষার্থী একই পাঠ্যক্রমের মধ্যে, একই শিক্ষকের পরিচালনায় অনেক বেশী শিক্ষা করে, আবার কেউ কেউ তা পারে না। শিক্ষাগত পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে, সুযোগের সমতার অভাবের জন্য হয়, কিন্তু, দেখা গেছে, শিক্ষার সমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগত মান সকলের সমান হয় না। এছাড়া দেখা গেছে সমান সুযোগের মধ্যেই ব্যক্তির অভ্যাসগত বৈষম্য (Difference in habit), মনোভাবের বৈষম্য (Difference in attitude) শিক্ষাগত পার্থক্যের জন্য হয়ে থাকে। এও দেখা গেছে, শিক্ষাগত বৈষম্যের দরুন, বিভিন্ন ব্যক্তির অনুরাগেরও (interest) পার্থক্য হয়।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ
[Causes of Individual difference]

কেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হয়, বা ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ কি এ নিয়ে দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মনোবিদগণের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকে মতভেদ লক্ষ্য করা-যায়। এই মতভেদ বিশেষভাবে বংশগতি (Heredity) এবং পরিবেশকে (En vironment) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেছেন, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য বংশগতি (Heredity) দায়ী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ধারণ করে যে পরিবেশে (Environment) শিক্ষার্থী বাস করে সেই পরিবেশে। এই তর্ক প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব। তবে, বর্তমানে সমস্যাটা তত প্রকট নয়, বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে, মনোবিদ-গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, মানুষের পার্থক্য এই দু'ই প্রক্রিয়ার পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবেই হয়ে থাকে। জীব বিজ্ঞানী, এবং মনোবিদগণের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মানুষের খুব কম বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বংশগতির উপর নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে, মনোবিদগণ মনে করেন অনর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তির বংশগতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবেশের নিয়ন্ত্রাধীন। তবে এ ধরনের ধারণাও সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত নয়। শুধুমাত্র, কতকগুলো দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বংশগতির প্রাথমিক উপাদান জীন্ (Gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু কিছু মেজাজগত বৈশিষ্ট্যও বংশগতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে ব্যক্তির সামাজিক, কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এই দুই মৌলিক উপাদানও ব্যক্তিজীবনে নিজস্ব রূপ গ্রহণ করে। তাই মানুষকে অনুশীলন করতে গিয়ে কোন একটা কারণকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। তার সামগ্রিক অনুশীলনের জন্য এই দুই প্রক্রিয়ার প্রভাব অনুশীলন করার প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে পরিবেশের প্রভাব দ্বারা ব্যাখ্যা

বংশগতি ও পরিবেশ

করা যায় না। অন্যদিকে একই বংশগতির অধিকারীদের মধ্যে পার্থক্যকে বংশগতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের শিক্ষামূলক তাৎপর্য
[Significance of Individual difference in Education]

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ব্যক্তিগত বৈষম্য বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মনোবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যকে অনুশীলনের জন্যই পার্থক্যভিত্তিক মনোবিদ্যার (Differential psychology) সৃষ্টি হয়েছে। মনোবিদ্যার এই শাখার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের পার্থক্যের বা বৈষম্যের নীতি অনুশীলন করা। মনোবিদ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা-বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছে। আমরা যদি শিক্ষার উদ্দেশ্যের (aim of education) কথা চিন্তা করি তা'হলে দেখা যাবে আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী জীবনবিকাশে সহায়তা করা শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং, শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন না করতে পারলে, তার বিকাশের জন্য কোন রকম পরিকল্পনাই রচনা করা যাবে না। তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন, তার মধ্যে থাকে কতকগুলো অর্জিত ও অনর্জিত বৈশিষ্ট্য। অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো, পারিবারিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রথম যদি শিক্ষক অনুশীলন করতে না পারেন, তিনি সার্থকভাবে তাদের শিক্ষা দিতে পারবেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, রচনা করতে হবে। তা না করতে পারলে, শিক্ষকের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির বহুল প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

আধুনিককালে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে, বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হ'ল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজস্ব অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া, এর ফলে ব্যক্তিজীবনের বিকাশও যেমন হয়, অন্যদিকে শিক্ষার কাজও সহজতর হয়। পূর্বে পাঠ্যক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র সাধারণ কয়েকটা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে তা করা হয় না। পূর্বে ধারণা ছিল শ্রেণী কক্ষে যত

পাঠক্রম ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

শিক্ষার্থী আছে, তারা মানসিক দিক থেকে সমান। কিন্তু এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি আবিষ্কারের ফলে এ ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে (Teaching method) আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রয়োগ দেখতে পাই। আধুনিক সব পদ্ধতিতেই এই নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায়। যেমন, ডাল্টন পরিকল্পনায় (Dalton plan) শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে, পাঠ্য বিষয়বস্তু এবং পাঠ সংক্রান্ত অন্যান্য অংশ নির্বাচনের সুযোগ শিক্ষার্থীদেরই দেওয়া হয়। এক কথায়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদানের পদ্ধতির (Individualised instruction) রীতি ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষণ-পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে, সহ পাঠক্রমিক (Co-curricular) কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সব সহ পাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ পায় এবং তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায়। খেলাধূলা, গান-বাজনা, আবৃত্তি, সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এবং এর ফলে শিক্ষা তাদের কাছে আনন্দ দায়ক হয়।

সহপাঠক্রমিক কাজ ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেবলমাত্র, ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের পথে তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করাও শিক্ষালয়ের দায়িত্ব। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (educational and vocational guidance) দেওয়া। শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলন একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তিকে তার নিজস্ব ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচনে সাহায্য করতে না পারলে, তার বৌদ্ধিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে না। অন্যদিকে, স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী যদি ব্যক্তিকে বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা না যায়, তা'হলে সে কর্মজীবনে আনন্দ পাবে না। তাই আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনাকে (Guidance) এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনা ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে অবসরের প্রয়োজনীয়তা যেমন বেড়েছে, অবসরের সুযোগও বেড়েছে। যন্ত্রযুগের বাধ্যতা-মূলক কাজের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন হাঁপিয়ে ওঠে। তাই

নিয়ন্ত্রিত অবসরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু, এই অবসর ব্যক্তিরা কি ভাবে যাপন করবে তার জন্য চাই যথাযোগ্য শিক্ষা। অবসর যাপনের জন্য (Education for leisure) শিক্ষা দেওয়া আধুনিক কালে বিদ্যালয়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে নিজের নিজের আগ্রহ অনুযায়ী সুস্থভাবে অবসর যাপন করতে পারে তার প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে দিতে হবে। এই শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে, ব্যক্তি বৈষম্যের নীতিকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা অল্প বয়স থেকে যাতে নিজস্ব আগ্রহ ভিত্তিক কাজে পারদর্শিতা অর্জন করে, এবং অবসর কালে তার মাধ্যমে আনন্দ পায় তার চেষ্টা করতে হবে বিদ্যালয়ে।

অবসর যাপনের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

এমনিভাবে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রয়োগ করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে একটা কথা মনে রাখার দরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ করে যেমন ভাল ফল পাওয়া যায়, তেমনি আদর্শ শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ করা যায়। আর, এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশই শিক্ষার আদর্শ।

প্রশ্নাবলী

1. In what respects do children in a class-room differ from one another ? [পৃঃ ২৬৯-২৮৭] [C.U.B.T. '65 ; C.U.B.A. '69]
2. Explain the problem of individual differences in the light of the individual abilities. [পৃঃ ২৭৮-২৮২] [C. U. B. A, '62]
3. Write a short essay on individual differences and their educational implications. [সম্পূর্ণ অংশ] [C.U. B.A. '64, N.B.U.B.T. '66]
4. How do an individuals differ mentally and physically ? Why should the educator take note of individual differences ? [K.U.B.T. '69] [সম্পূর্ণ অংশ]
5. In what respects do children in a class differ from one another ? Discuss briefly how far these differences are due to heredity or/and environment. [সম্পূর্ণ অংশ] [K.U.B.T. '67]
6. What is meant by individual differences ? Discuss the major characteristics in which individuals differ. [পৃঃ ২৬৯-২৮৭]

অষ্টাদশ অধ্যায়

বংশগতি ও পরিবেশ
[HEREDITY & ENVIRONMENT]

মানুষের জীবনের বিকাশ কেন হয়? কেন ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়? এই সব প্রশ্ন নিয়ে বহুদিন থেকে মনোবিদগণের জল্পনা-কল্পনা, পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই। আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেক মানুষ, কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও প্রবনতা নিয়ে জন্মায়। এবং জীবন বিকাশের ধারা অনুশীলন করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি, যে, মানুষের জীবনের বিকাশ হয় এবং সে বিকাশ বিভিন্ন দিক থেকে হয়। আবার এই বিকাশের ধারার মধ্যে পার্থক্যও থাকে। মনোবিদগণের কাছে প্রাথমিক প্রশ্ন হ'ল মানুষের জীবনের এই বিকাশের প্রকৃতি কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্ম অবস্থায় তার মধ্যে এমন কি প্রবণতা থাকে যা তার এই বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে? না, সে যে পরিবেশে জীবনযাপন করে, তার প্রভাবে জীবন বিকাশের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়? এই প্রশ্ন নিয়ে মনোবিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ইত্যাদি প্রত্যেকেই অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাই গত তিন দশক ধরে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই বংশগতি (Heredity) এবং পরিবেশের (environment) গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক সমাজ বিজ্ঞানে, মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য এই দুই উপাদানকে কেন্দ্র করে বহু তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বংশগতির প্রভাবই বেশী, আবার কেউ কেউ বলেছেন কেবলমাত্র, পরিবেশই তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। তবে বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, কোন একটা উপাদানকে একক-ভাবে মানুষের বিকাশের মূল কারণ বলা যায় না। এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিসত্বার বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত হয়। যাই হউক, এই সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বংশগতি এবং পরিবেশের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনার দরকার।

সূচনা

বংশগতি
[Heredity]

মনোবিদ্যার তাৎপর্যের দিক থেকে, মানুষ জন্মের সময় পূর্বপুরুষদের যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, তার সমবায়কেই সেই ব্যক্তির বংশগতি বলা হয়। প্রত্যেক শিশুই, তার বাবা, মা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, দাদু, দিদিমা ইত্যাদিদের কিছু কিছু

বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই বৈশিষ্ট্য দু'ধরনের হ'তে পারে—জৈবিক (Boilogical) এবং মানসিক (Psychological)। তাই মানুষের বংশগতিকে অনেকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। জৈবিক বংশগতি বলতে যে সব দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো শিশু তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পায়, তার সমবায়কে বলা হয় [*Biological heredity is sum total of all the biological traits, the child receives from his ancestors*]। আর মানসিক বংশগতি বলতে বুঝায় শিশুর সেই সব মানসিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং প্রবণতার সমন্বয় যা জন্ম মুহূর্তে তার মধ্যে থাকে। [*Psychological heredity is the sum total of those mental traits, potentialities and tendencies which are present at birth*].

বংশগতি কি ?

উডওয়ার্থ এবং মার্কুইস্‌ (Woodworth & Marquis)[1], সাধারণভাবে বংশগতি কি তা আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, জীবনের প্রারম্ভে মানুষের মধ্যে যা কিছু উপাদান বর্তমান থাকে, তাই তার বংশগতি।

জীববিজ্ঞানীগণ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বংশগতির সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। বহুদিন ধরে জীববিজ্ঞানীগণ সাধারণভাবে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আমরা জীববিজ্ঞানীগণের এই সাধারণ ধারণাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। প্রথমতঃ বংশগতির প্রাথমিক নিয়ম হ'ল **প্রত্যেক প্রাণী তার নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণীরই জন্মদানে সক্ষম** (Like tends to beget like)। অর্থাৎ, সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে লক্ষ্য করা যায়, মানুষের সন্তান মানুষেরই আকার ধারণ করে; কুকুরের ছানা কুকুরের আকার ধারণ করে। আবার 'মানুষের ক্ষেত্রে, সন্তান বা তাদের বাবা মায়ের আকার, আকৃতি, রঙ, বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তবে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এর সবটা ঠিক নয়। সব সময়, ফর্সা বাবা মায়ের ছেলে ফর্সা হয় না; সব সময় বুদ্ধিমান বাবার ছেলে বুদ্ধিমান হয় না। তাই বংশগতির দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, যদিও সাধারণভাবে, সন্তানরা বাবা-মায়ের মতই হয়, তার ব্যতিক্রম আছে। একে বলা হয় **পার্থক্যের সূত্র** (Law of variation)। বংশগতির তৃতীয় সূত্রকে বলা হয় **ল-অফ্-ফাইনাল-রিগ্রেসন** (Law of final regression)। এই সূত্রে বলা হচ্ছে, মানুষের পিতামাতার সঙ্গে পার্থক্যেরও একটা নিয়ম আছে। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের প্রবণতা হ'ল গড়ের (average) দিকে যাওয়া। অর্থাৎ, কোন লম্বা বাবা-মায়ের ছেলেরা বাবা-মায়ের মত লম্বা হবে না, তারা বাবা-মায়ের চেয়ে বেঁটেই হবে।

বংশগতির সূত্র

1. "Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life".—Woodworth & Marquis—Psychology.

তারা মানুষের গড় উচ্চতার দিকে কিছুটা নেমে আসবে। আবার বেঁটে বাবা মায়ের ছেলেরা বাবা-মায়ের মত বেঁটে হবে না। মানুষের গড়র উচ্চতার দিকে কিছুটা এগিয়ে যাবে এবং বাবা-মায়ের চেয়ে কিছুটা লম্বা হবে। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায়, বংশগতির ধারার ঝোঁক সব সময় গড়ের (average) দিকে। বংশগতির চতুর্থ নিয়ম হ'ল—**মানুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্যেরও বংশানুক্রমিক সঞ্চালন হয়।** যদিও এই নীতি সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা হ'লেও, **ল্যামার্ক** (Lamark) ও **ডারউইন** (Darwin) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। মনোবিদ **ম্যাকডুগালও** (Mcdogall) অর্জিত অভ্যাসের (acquired habits) সঞ্চালন সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, এবং তাঁর এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, যদিও অর্জিত অভ্যাস পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সমহারে সঞ্চালিত হয় না, কিন্তু, বেশ বেশী পরিমাণেই সঞ্চালিত হয়। সুতরাং বংশগতির এই সব সূত্র অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, বংশগতির ধারায় প্রত্যেক প্রাণী তার পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কিন্তু এই সঞ্চালনের নিয়ম সার্বজনীন নয়, তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমেরও নিয়ম আছে। এই ব্যতিক্রমে প্রত্যেক প্রাণী যে কোন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গড় হারের দিকে এগিয়ে আসার ঝোঁক দেখায়। এবং সবশেষে, অর্জিত কিছু বৈশিষ্ট্য সমহারে না হ'লেও, আংশিকভাবে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

বংশগতির তত্ত্ব

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা আমরা বলতে পারি, মানুষ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছু কিছু দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। কিন্তু, কি পদ্ধতিতে এই সব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী বিভিন্ন দিক থেকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ফলে বংশগতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব জীব বিকাশকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করে। এই সব তত্ত্ব সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আমরা কিছু উল্লেখ করব। এই সব তত্ত্বগুলো বিশেষভাবে বংশগতির কৌশল (Mechanism of heredity) সংক্রান্ত।

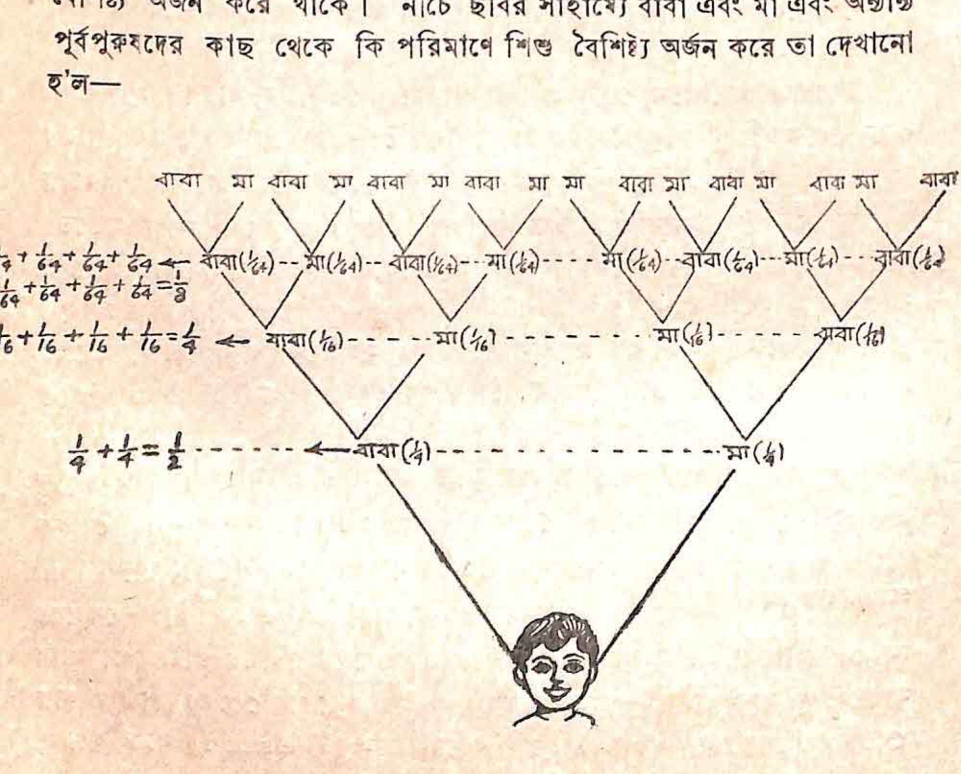
ওয়েজম্যানের তত্ত্ব

ওয়েজম্যান (Weisman) এর মতে বংশগতি একমাত্র বাহক হ'ল বীজ পঙ্ক (Germ plasm)। বীজ কোষ (Germ cell) থেকেই মানুষের দৈহিক বিকাশ হয় অবিচ্ছিন্ন কোষ বিভাজনের (Cell division) মাধ্যমে। পিতা ও মাতার এক একটি বীজ কোষের মিলনে জীবনের সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, পূর্ণ দেহ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই বীজ কোষ যেহেতু পিতামাতার থেকে সন্তানের দেহে সঞ্চালিত হয়। ওয়েজম্যান (Weisman) মনে করেন,

এই বীজ কোষই বংশগতির বাহক। সুতরাং ওয়েজম্যানের (Weisman) মতে পিতামাতা হ'ল এই বীজ কোষের ধারক ; এবং যেহেতু এই বীজপঙ্ক পর পর প্রত্যেক বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেহেতু, বংশানুক্রমে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চরণ অব্যাহত থাকে। ওয়েজম্যান, তাঁর তত্ত্বে একথাও বলেছেন যে, মানুষের অর্জিত যে সব গুণ, তার বৈশিষ্ট্য বীজ পঙ্কের মধ্যে থাকে না বলে, এই সব অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

স্যার ফ্রান্সিস্ গ্যালটন (Francis Galton), অন্য একদিক থেকে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর Law of Ancestral inheritance এ বংশগতির পরিমাণ গত দিক সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। বংশগতির ধারায় আমরা যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করি, তার কিছু অংশ আসে প্রত্যক্ষভাবে পিতা মাতার কাছ থেকে এবং কিছু অংশ আসে পরোক্ষভাবে অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। গ্যান্টন বলেছেন, কোন শিশু তার বৈশিষ্ট্যের অর্দ্ধেক ($\frac{1}{2}$) অংশ পায় পিতা-মাতার কাছ থেকে; এক চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) পায় দাদু-দিদিমা শ্রেণীর পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে ; এক অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) পায় তার পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে ; এমনি ভাবে ক্রমানুসারে পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে সে আংশিকভাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। নীচে ছবির সাহায্যে বাবা এবং মা এবং অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কি পরিমাণে শিশু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা দেখানো হ'ল—

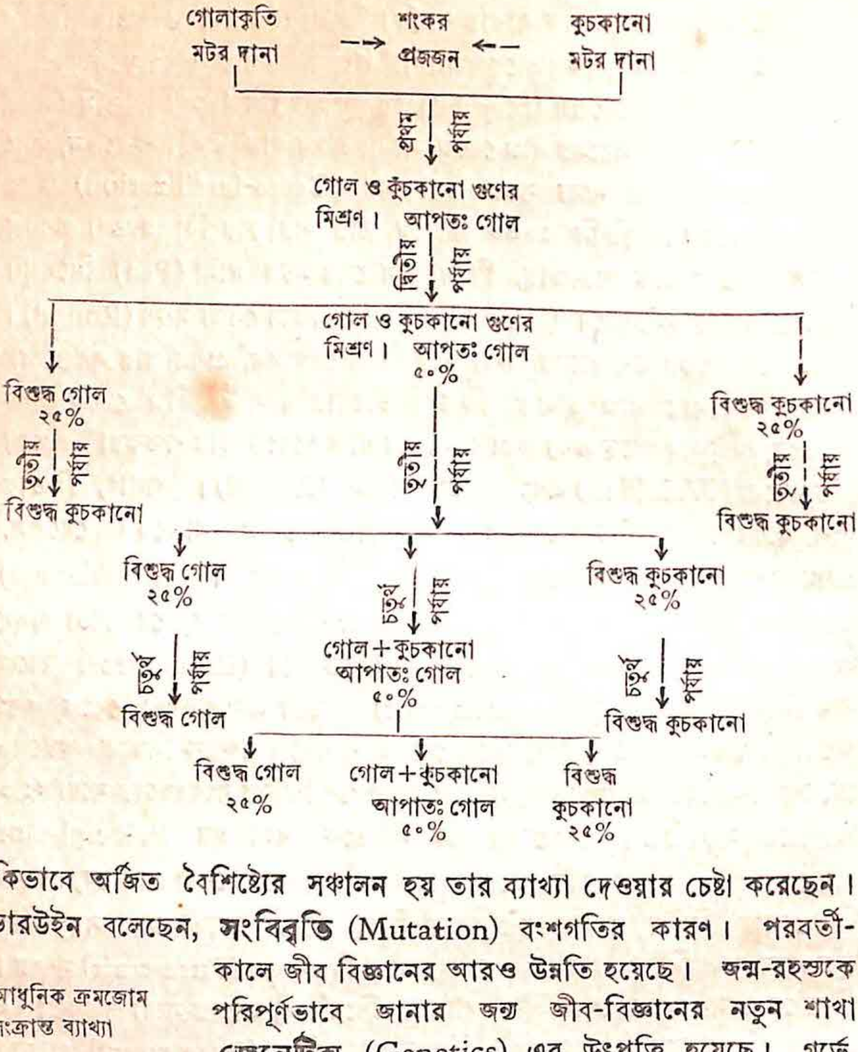
গ্যান্টনের তত্ত্ব



মেণ্ডেল, বংশানুক্রমিক ধারায় পার্থক্য কিভাবে আসে, তা তাঁর নিজের পরীক্ষা থেকে একটু পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। গাছ এবং ফুলের প্রতি মেণ্ডেল (Mendal) এর খুব অনুরাগ ছিল। তিনি বিভিন্ন ধরনের বীজ থেকে নানা রকম গাছ তৈরী করতেন, এবং মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে সঙ্কর উপাদনের (Cross-fertilization) উপর পরীক্ষাও করেন। তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেন। তাঁর এক পরীক্ষায়, তিনি দু'ধরনের মটর দানা (Pea) নিলেন। একটার ওপরটা কুঁচকানো (Wrinkled) আর একটা গোল মসৃণ (Round)। এদের মধ্যে সংকর উপাদানের ক্রিয়া করে তিনি দেখলেন, প্রথম বার সবগুলোই গোল মটর দানার বীজ হ'ল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ঐ বীজ থেকে গাছ করলেন, সেই সব গাছে লক্ষ্য করা গেল, যে বীজ হয়েছে তার শতকরা ২৫ ভাগ কুঁচ্‌কানো (Wrinkled) এবং ৭৫ ভাগ গোল (Round)। অর্থাৎ, দ্বিতীয় বংশ ধরের মধ্যে দু'টো গুণ ৩ : ১ অনুপাতে বর্তমান থাকছে। মেণ্ডেল, প্রথম বংশ ধারায় যে গুণটা সুপ্ত ছিল, অর্থাৎ, কুঁচ্‌কানো ভাব (Wrinkleness) একে নাম দিলেন **গৌণ গুণ** (Recessive trait)। আর, যে গুণটা প্রথম বংশধরদের মধ্যে বর্তমান ছিল, অর্থাৎ গোলাকৃতি ভাব (Roundness) তাকে নাম দিলেন **মুখ্য গুণ** (Dominant trait)। তাঁর এই পরীক্ষা থেকে এবং অন্যান্য এ রকম আরও পরীক্ষা থেকে মেণ্ডেল বংশগতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করলেন যে, পিতা-মাতার মধ্যেকার মুখ্য এবং গৌণ গুণ দ্বিতীয় বংশধরদের মধ্যে ৩ঃ ১ অনুপাতে সঞ্চারিত। মেণ্ডেলের এই নীতিকে বলা হয় Principle of seggregation। পরবর্তী স্তরে আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, যে সব বীজগুলোর দ্বিতীয় পর্যায়ে কুঁচ্‌কানো ছিল, তারা পরবর্তী স্তরে সব সময়ই কুঁচকানো ফল দিতে লাগলো। অর্থাৎ, তারা বিশুদ্ধ গুণ (Pure trait) সম্পন্ন। কিন্তু যে গুলো থেকে গোল বীজ পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগের ক্ষেত্রে পরবর্তী সব স্তরেই বিশুদ্ধ গোল বীজ (Pure round) পাওয়া যেতে লাগলো। কিন্তু বাকী শতকরা ৫০ ভাগের ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে ঠিক একই নিয়মে ৩ : ১ অনুপাতে গোল ও কুঁচকানো বীজ পাওয়া গেল। এবং এই গোলাকৃতি বীজ গুলোর পরবর্তী পর্যায়েও একই নিয়মে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন করতে লাগলো। মেণ্ডেলের এই তত্ত্বের আধুনিক কালে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং আধুনিক জীববিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে মেণ্ডেলের তত্ত্ব দ্বারা কিভাবে বংশধরের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা ছবির সাহায্যে পর পৃষ্ঠায় দেখানো হ'ল।

মেণ্ডেলের তত্ত্ব

বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী বংশগতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছেন। **ল্যামার্ক** (Lamark) তাঁর তত্ত্বে,



কিভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ডারউইন বলেছেন, **সংবিবৃত্তি** (Mutation) বংশগতির কারণ। পরবর্তী-কালে জীব বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হয়েছে। জন্ম-রহস্যকে পরিপূর্ণভাবে জানার জন্য জীব-বিজ্ঞানের নতুন শাখা **জেনেটিক্স্** (Genetics) এর উৎপত্তি হয়েছে। গর্ভে, মায়ের ডিম্বকোষ (Ovum) এবং বাবার শুক্রবীজ (Sparmatozoa) পারস্পরিক সংযোগের ফলে, প্রথম জীবনের সূত্র পাত হয়। এই সংযোগের ফলে এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ১ ভাগের চেয়ে ছোট যে জীবকোষ বা ভ্রূণের (Zygot) উৎপত্তি হয়, তা কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে বিভাজিত হ'তে আরম্ভ করে এবং নতুন নতুন কোষের জন্ম দেয়। আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এই প্রথম নিষিক্ত বীজের মধ্যেই বংশগতির সম্পূর্ণ উপাদান থাকে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শুক্রকোষ এবং ডিম্বকোষের কেন্দ্রে থাকে একটা করে কোষ কেন্দ্র (Nucleus)। এই কোষ কেন্দ্রে সূক্ষ্ম সূতার মত এক রকম পদার্থ থাকে যাদের বলা হয় **ক্রমজোম** (Chromosome)। প্রত্যেক কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টা এরকম

আধুনিক ক্রমজোম সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

ক্রমজোম থাকে।[1] পুরুষের শুক্রকোষে এই ক্রমজোমগুলো ৪৬টাই একই রকম। এদের বলা হয় X-ক্রমজোম (X-Chromosome)। আর মেয়েদের ডিম্বকোষে ৪৫টা একই রকম X-ক্রমজোম এবং একটা ভিন্ন রূপের, তাকে বলা হয় Y-ক্রমজোম (Y-Chromosome)। এই দুই কোষের মিলনে যখন ভ্রূণ তৈরী হয় তখন মা এবং বাবার কোষের অনুরূপ ক্রমজোম গুলো জোড়া বাঁধে। এবং কোষ বিভাজনের সময়ও এই নীতি বজায় থাকে। কোন ক্রমজোমের সঙ্গে কোন ক্রমজোম জোড়া বাঁধবে তা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্যতার উপর। জীববিজ্ঞানীগণের ধারণা অনুযায়ী এই সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, প্রত্যেক ভ্রূণের মধ্যে ক্রমজোমের ১৬,৭৭৭,২১৬ রকমের সমন্বয় হ'তে পারে, এবং এর দু'গুণ ধরনের ব্যক্তি সত্বা গঠনের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই কারণে একই বাবা-মায়ের সন্তান হ'লেও তাদের মধ্যে পার্থক্য (difference) লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এই প্রত্যেক ক্রমজোমের মধ্যে অসংখ্য দানার মত পদার্থ সুবিন্যস্তভাবে মালার মত গাঁথা থাকে। এদের বলা হয় **জীন** (Gene)। এই জীনগুলো জটিল রাসায়নিক যৌগ (Chemical compound) দিয়ে তৈরী। জীব-

জীন তত্ত্ব

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, এই জটিল রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন পদার্থের সাহায্যে কৃত্রিম পদ্ধতিতে জীন তৈরী সম্ভব হয়েছে। এবং জীনকে (Gene) পৃথক ভাবে অনুশীলন করাও কিছু কিছু সম্ভব হয়েছে। এই সব গবেষণার ফলাফল থেকে জীববিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, এই জীনই হ'ল বংশগতির বাহক। এবং এদেরই পুনর্বিন্যাসের জন্য ব্যক্তি জীবনে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে জীনের এই পুনর্বিন্যাসও সম্ভাব্যতার (Chance) উপর নির্ভর করে। কাজেই ব্যক্তি কি ধরনের বংশগতি পাবে এবং কি ধরনের বৈষম্যের অধিকারী হবে তা নির্ভর করবে সে কি ধরনের জীনের সমন্বয়ের অধিকারী তার উপর। এই জীন তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক কালে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, এবং এ পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথক পৃথক জীন সমন্বয়কে খুঁজে বাহির করা সম্ভব হয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন। বিগত দশকে **ডঃ খোরানার** জীন বিশ্লেষণ ও কৃত্রিম জীন উৎপাদনের আবিষ্কার জীববিজ্ঞানের তথা বংশগতির বিশ্লেষণের নতুন এক পথের সন্ধান দিয়েছে। পরবর্তীকালে, এর প্রয়োগ নিশ্চয়ই মানুষের বংশগতির স্বরূপ নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে। জীববিজ্ঞানের এই তথ্য, মনোবিদগণেরও মানসিক বৈশিষ্ট্যের

১। বহুদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল এই ক্রমজোমের সংখ্যা ২৪ জোড়া। কিন্তু আধুনিক কালে কিছু জীববিজ্ঞানী এদের সংখ্যা বলেছেন, ২৩ জোড়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই সংখ্যা এক কোষ থেকে আর এক কোষে পরিবর্তিত হয়। এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় নি।

স্বরূপ উদ্ঘাটনে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। তবে আজ পর্যন্ত বহু মনোবিদ মানুষের বৈশিষ্ট্যের উপর বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে অনুশীলন করেছেন। সে সম্পর্কে আমরা এখন কিছু উল্লেখ করব।

মানসিক বৈশিষ্ট্য ও বংশগতি
[Mental Characteristics & Heredity]

বহু মনোবিদ আছেন, যাঁরা মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র বংশগতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরকম ধরনের একপক্ষীয় ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের বলা হয় বংশগতিবাদী (Hereditarian)। যে সব চিন্তাবিদগণদের এই দল ভুক্ত করা যায়, তাঁদের মধ্যে **গ্যাল্টনের** (Galton) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে মানুষকে শিক্ষার দ্বারা সংস্কার করার পূর্বে তাকে আদর্শ বংশগতির অধিকারী করতে হবে। চলতি ভাষায় একটা আমাদের কথা আছে "গাধা পিটিয়ে মানুষ করা যায় না।" এই প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে বংশগতিবাদীগণ বিশ্বাসী। গ্যাল্টন (Galton) এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁদের এই মতবাদের সপক্ষে নানা রকম যুক্তি ও পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন। এই সব যুক্তি সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু উল্লেখ করব।

গ্যাল্টন (Galton) তাঁর যুক্তির সপক্ষে বিভিন্ন পরিবার সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Hereditary Genius নামক বইয়ে তিনি ৯৭৭ জন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের জীবন পর্যালোচনা করে দেখেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি লক্ষ্য করেন। এদের মধ্যে ৫৩৬ জনের আত্মীয়স্বজন, জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে খুব সাধারণ ৯৭৭ জন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জনের আত্মীয়রা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর থেকে গ্যাল্টন (Galton) সিদ্ধান্ত করলেন যে মানুষের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তাদের বংশগতি। এবং এই কারণেই প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে যাদের রক্তের সম্পর্ক (Blood relation) আছে, তাদের বেশীর ভাগই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

গ্যাল্টনের পর্যবেক্ষণ

গ্যাল্টনের পদ্ধতি অনুসরণ করে **কার্ল পিয়ারসন** (K. Pearson), গ্যাল্টন পরিবারেরই কুলপঞ্জী (Famity history) অনুশীলন করেন। তিনি ওয়েজউড্ ডারউইন গ্যাল্টন (Wedgewood-Daruin-Galton) পরিবারের এক হাজার বছরের বংশ তালিকা তৈরী

পিয়ারসনের পর্যবেক্ষণ

করেন এবং তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ ধরে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংলণ্ডের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এই পরিবারের অপরিসীম দান আছে। এছাড়া কার্ল পিয়ারসন, ভাই-বোন, ভাই-ভাই ইত্যাদিদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমতা পর্যবেক্ষণ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রায় ২০০০ ভাই বোনকে বিভিন্ন দিক থেকে অনুশীলন করেন। এই সব পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য উভয়েই একই হারে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়।[1] পিয়ারসনের এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব হ'ল এই যে তিনি মানসিক এবং দৈহিক দু'রকম বৈশিষ্ট্যেরই বংশানুক্রমিক সঞ্চালনের কথা বলেছেন। এবং একথাও তার সিদ্ধান্তের মধ্যে পরিষ্কার যে তাহা সমহারে হয়।

ডাগডেলের পর্যবেক্ষণ

একই ধরনের এক সিদ্ধান্ত করেন **ডাগডেল** (R. L. Dugdale) কিন্তু বিপরীত ধরনের এক পরিস্থিতির অনুশীলন করে। তিনি নিউ ইয়র্ক-এ জেলের অধিকর্তা ছিলেন। এই কর্মজীবনে, তিনি লক্ষ্য করেন, জেলখানায় যে সব কয়েদীরা আসে তাদের অনেকের পদবী একই রকম। তিনি অনুসন্ধান করে জানলেন তারা সকলে প্রায় একই বংশের এবং তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। তিনি জিউক্ (Juke) ছদ্মনাম ব্যবহার করে এই পরিবারের কুলপঞ্জী প্রকাশ করেন। এই পরিবারের প্রধান হিসেবে একজন ভবঘুরে দুশ্চরিত্র লোককে খুঁজে বাহির করেন। তার থেকে এই বংশের উদ্ভব ধরে নিয়ে তিনি পাঁচ পুরুষে ১৬৬৭ জন ব্যক্তিকে খুঁজে বাহির করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। এদের মধ্যে দেখা যায় ৩০০ জন শৈশবেই মারা গিয়েছে; ৩১০ জন খুব দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে; ৪৪০ জন খুব খারাপ রোগে মারা গেছে; ৪০০ জন, নিজেদের কু-কর্মের জন্য মারা গেছে; ৭ জন খুনী হিসেবে আসামী হয়েছে; ৬০ জন চুরি করে অন্তত পক্ষে প্রত্যেকে ১২ বছর করে জেল খেটেছে। ১৩০ জনকে সমাজ বিরোধী হিসেবে কোন না কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে; এবং মাত্র ২০ জনকে দেখা গেছে, তারা কোন রকম হাতের কাজ শিখে সুস্থ জীবন যাপন করছে। এর থেকে ডাগডেল, একই সিদ্ধান্ত করলেন যে বংশগতির প্রভাবেই একই পরিবারের ব্যক্তির মধ্যে সমাজ বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছে।

অনুরূপভাবে **গডার্ড** (Goddard), **কালিকক্**, এই নামে এক পরিবারের

---

1. "We are forced, I think literally forced, to the conclusion that the physical and psychical characters in man are inherited within broadlines in the same manner and with the same intensity."—K. Pearson. Biometrika, vol, 3, 1904, 156pp.

হয়। কিন্তু, সে সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে, জল, আলো, তাপ ইত্যাদি। অর্থাৎ, এক কথায় পরিবেশ। ঠিক তেমনিভাবে, মানুষের জীবনের সব রকম সম্ভাবনাই বংশগতির কাছ থেকে এলেও, যথাযোগ্য পরিবেশের মধ্যে তার বিকাশের সুযোগ না পেলে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মনোবিদ্ টাইলার (L. E. Tyler)[1] মন্তব্য করেছেন, বংশগতি মানুষের জীবনের একটা পরিসর নির্ধারণ করে দেয়। এই পরিসরকে তিনি বলেছেন প্রতিক্রিয়া পরিসর (Reaction range)। মানুষের মধ্যে বিশেষ বিকাশের নীতি নির্ধারণ করার তার ক্ষমতা নেই। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি জীবনে কতটা বিকশিত হবে তা সব সময় নির্ভর করবে, তার পরিবেশের কোন অংশ তাকে প্রভাবিত করছে তার উপর। এজন্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জানতে হ'লে তার পরিবেশ অনুশীলনও একান্তভাবে প্রয়োজন।

পরিবেশ
[Environment]

সাধারণ অর্থে পরিবেশ বলতে বিশ্বপ্রকৃতির যে অংশের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত তাকেই বুঝি। মনোবিদ্যায়, আমরা পরিবেশকে নিষ্ক্রিয় সত্বা হিসেবে কল্পনা করি না। আধুনিক মনোবিদ্যায় পরিবেশের সক্রিয় সংব্যাখ্যান দেওয়া হয়েছে। নিষ্ক্রিয় বিশ্ব-প্রকৃতির এই সংব্যাখ্যানে কোন স্থান নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে যে সব উদ্দীপক উত্তেজিত করে তার সমবায়ই হ'ল পরিবেশ। এই ধারণা অনুযায়ী পরিবেশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কোন বিশেষ বস্তু একজনকে উত্তেজিত করতে পারে, অন্যকে নাও করতে পারে। সুতরাং, তা একজনের পরিবেশের অন্তর্গত কিন্তু অপরের নয়। ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনার মধ্যেই পরিবেশের অস্তিত্ব। অর্থাৎ, ব্যক্তি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই তার পরিবেশ সক্রিয়। ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবেশেরও পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং, পরিবেশ এই অর্থে ব্যক্তিজীবনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ; ব্যক্তির সজীবতায় তার সক্রিয়তা। এখানে জন্ম কথাটাকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। জন্ম বলতে ঠিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণকে বলছি না। মায়ের গর্ভে প্রথম জীবনের সঞ্চার মুহূর্তেকে আমরা জন্মক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করছি। এই হিসেবে মনোবিদগণ পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ (Pre-netal environment) এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার

পরিবেশ কি?

1. We are beginning to realise that a person's Genotype establishes for him a reaction range rather than a single line of development, with regard to any desirable trait, how much of it he develops will depend upon which of many possible environment surounds him during his growing years."—Tyler: Psychology of Human difference.

পরের পরিবেশ (Post-netal environment)। গর্ভাবস্থায়, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উত্তেজনা ভ্রূণকে প্রভাবিত করে। এই মায়ের আঘাত লাগলে, মা খুব জোরালো ওষুধ খেলে, বা মায়ের কোন অসুখ করলে, শিশুকে তা নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই ধরনের প্রভাবকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ বলা হয়। এই পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিজীবনের উপর পরোক্ষভাবে পড়ে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং মনোবিদগণ বর্তমানে, ব্যক্তিজীবনের বিকাশে এই পরিবেশের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে যে সব প্রাকৃতিক শক্তি ব্যক্তিজীবনে মৃত্যু পর্যন্ত সক্রিয় থাকে তাদের বলা হচ্ছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ। ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী আমরা এই পরিবেশকেও বিভিন্ন অংশে ভাগ করতে পারি। যেমন পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্দীপকের সমবায়কেও আমরা বলতে পারি পরিবারের পরিবেশ (Family environment); বিদ্যালয়ে ব্যক্তি যে সব উত্তেজনা পায় তার সমবায়কে বলতে পারি বিদ্যালয় পরিবেশ (school environment), বৃহত্তর সমাজের যে অংশ তাকে প্রভাবিত করে তাকে বলা যেতে পারে সমাজ পরিবেশ (social environment)। ব্যক্তির কর্মজীবনের যে সব অংশ তাকে সক্রিয়ভাবে উত্তেজিত করে তাকে বলা হয় কর্ম-পরিবেশ (work environment)। এরকম আরও নানা অংশে ব্যক্তির পরিবেশকে ভাগ করা যায়।

মানসিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ
[Mental characteristics & Environment]

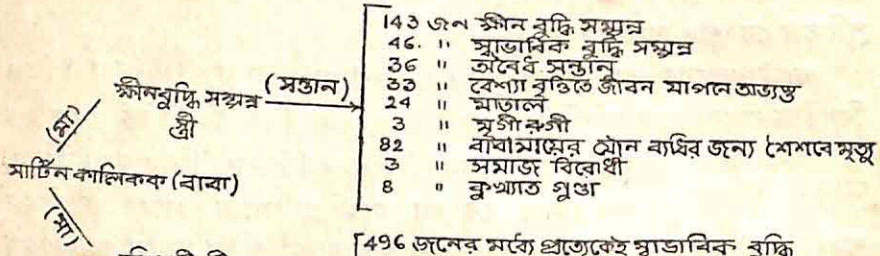
বহু মনোবিদ আছেন যাঁরা বংশগতির গুরুত্বকে একেবারে স্বীকার করেন না। তাঁদের ধারণা ব্যক্তিজীবনের বিকাশ (development) এবং বৈষম্য (difference) তাদের পরিবেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। মনোবিদ্ **ওয়াটসন** (S. B. Watson)[1], বংশগতি-বাদীদের বলেছেন, আমাকে এক ডজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশু দেন, আমি তাদের ইচ্ছে মত যে কোন দিকে তাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রন করে পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারি। এরা মনে করেন, নির্দিষ্ট সংখ্যক হাত-পা, ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকলে যে কোন শিশুকে ইচ্ছামত পরিবেশের প্রভাবে গঠন করা যেতে পারে। ফরাসী দার্শনিক **হেলভিসিয়াসও** (Helvetius) এই মতবাদে বিশ্বাসী। **জন্ লকও** (J. Locke) এই মতবাদকে সমর্থন করে গেছেন।

পরিবেশবাদীদের অভিমত

1. Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own specified world to bring them up in and I will guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialized, I might select."...Watson.

দ্বি-মুখী কুলপঞ্জী অনুশীলন করেন। মার্টিন কালিকক্ (Martin kalikak) নামে এক ব্যক্তি দু'বার বিবাহ করেন। তাঁর এক স্ত্রী ছিল ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং একজন ছিল বুদ্ধিমতী। এই দুই স্ত্রীর দরুন তার যে সন্তান হয় তাদের অনুশীলন করে গডার্ড লক্ষ্য করেন, বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দরুন যে পরিবারের শাখা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তারা সবাই বুদ্ধিমান ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। কিন্তু অন্য স্ত্রীর দরুন পরিবারের যে শাখা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সকলেই হয় ক্ষীনবুদ্ধি সম্পন্ন বা অসামাজিক। এর থেকে গডার্ডও বংশ গতির পক্ষেই সিদ্ধান্ত করেন। গডার্ড (Goddard)এর এই অনুশীলনের ফলাফল নীচে ছবির সাহায্যে দেখানো হ'ল।

গডার্ডের পর্যবেক্ষণ



মনোবিদ্ **উইন্‌সিপ্** (A. E. Winship) গডার্ডের মত অনুরূপ এক পরিবারের অনুশীলন করেন। এই পরিবারে প্রধান এড্‌ওয়ার্ড (Edward) দু'বার বিবাহের দরুন, কিভাবে বংশগতির ধারা দু'দিকে প্রবাহিত তা তিনি আলোচনা করেন। তিনিও তাঁর অনুশীলন থেকে বংশগতির পক্ষে মতামত দেন।

কুলপঞ্জী (Family history) অনুশীলন ছাড়াও অন্যভাবে বংশগতির প্রভাব অনুশীলন করেছেন। **টারম্যান** (Terman) ক্যালিফোর্নিয়ার এক হাজার উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের (Gifted children) বুদ্ধির পরিমাপ করেন। এবং পরে তাদের বুদ্ধির পরিমাপের সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের বুদ্ধির পরিমাপের তুলনা করে দেখেন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে টারম্যান (Terman) সিদ্ধান্ত করেন যে বাবা-মায়ের বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির সম্পর্ক যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই সম্পর্কের জন্য তিনি বংশগতিকেই দায়ী করেছেন।

টারম্যানের পর্যবেক্ষণ

বংশগতির প্রভাব অনুশীলনে যমজ সন্তান (Twin) পর্যবেক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যমজ সন্তান দু'রকমের হ'তে পারে—সমকোষী যমজ (Identical twins) এবং ভিন্নকোষী যমজ (Fraternal twins)। যখন এক এবং অভিন্ন বাবা-মায়ের জনন কোষ থেকে যমজ সন্তানের সৃষ্টি

হয় তখন তাদের বলে সমকোষী যমজ (Identical twins)। আর, যদি ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষ থেকে যমজ সন্তানের সৃষ্টি হয় তাকে বলে ভিন্ন কোষী যমজ (Fraternal twins)। মনোবিদ্ **নিউম্যান** (Newman), **ফ্রেড** (Fred) এবং **এডুইন** (Edwin) নামে দু'জন সমকোষী যমজের সন্ধান পান। এরা শৈশব থেকেই পৃথক পরিবারের মধ্যে মানুষ হ'তে থাকে। নিউম্যান তাদের ২৬ বছর বয়সের সময় খুঁজে পান। এদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় দৈহিক-মানসিক সমস্ত দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে। গায়ের রঙ, চুলের রং ওজন প্রায় একই রকম। বুদ্ধাঙ্কও প্রায় এক। দু'জনে একই ধরনের বৃত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। দু'জনে বিয়ে করেছে প্রায় একই সময়ে। এমনকি নিজেদের কুকুরেরও নাম একই রেখেছে। পরিবেশের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এরকম মিল দেখে নিউম্যান সিদ্ধান্ত করলেন, তাদের এই মিল বংশগতির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।

যমজ পর্যবেক্ষণ
—নিউম্যান

এই ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মত মানসিক বৈশিষ্ট্যও আমরা বংশগতি হিসেবে অর্জন করি। অর্থাৎ, মানুষের জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ এবং বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি তার বংশগতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে, কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, তা তার জন্মমুহূর্তে নির্ধারিত হয়ে যায়, তার জীন (Gene) সংগঠনের মাধ্যমে। ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্য পরিবেশের প্রভাব বা বাইরের কোন প্রচেষ্টার দ্বারা আনা সম্ভব নয়। মাতৃ গর্ভে যে সম্ভাবনা নিয়ে তার যে জীবনের সঞ্চার হয়, তাই পরবর্তীকালে ধীরে প্রকাশিত হয়। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে, এই বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। কারণ জন্মগত সম্ভাবনা ছাড়া জীবন বিকাশের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বিকাশধর্মী কিছু সত্তা যদি মানুষের মধ্যে না থাকতো, পরবর্তী জীবনে আমরা তার পরিবর্তন দেখতে পেতাম না। তাই বংশগতিবাদীগণ মানুষের জীবনের বিকাশের এবং বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে বংশগতিকে নির্ধারণ করেছেন। **উইগাম** (Wiggam)[1] বলেছেন, বংশগতিই মানুষের স্রষ্টা। পরিবেশের কোন স্থান সেখানে নেই। মানুষের সব সুখ-শান্তি, দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে তার বংশগতি। এমনকি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অসুস্থতাও বংশগতির ধারায় সন্তান সন্ততির মধ্যে আসে। কিন্তু, এখানে একটা কথা মনে রাখার দরকার, বীজের মধ্যে জীবনের সম্ভাবনা থাকে বলেই তার থেকে গাছ

জীবন বিকাশে
বংশগতির গুরুত্ব

1. "Heredity not environment is the chief maker of men. Nearly all the misery and nearly all the happiness in world are due not to the environment."

রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) এই মতবাদ প্রয়োগ করে স্কটল্যাণ্ডের এক গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। আধুনিক কালে বিভিন্ন মনোবিদ, এই মতবাদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এই সব পরীক্ষার দ্বারা তাঁরা প্রমান করতে চেয়েছেন, মানুষের জীবনে পরিবেশের গুরুত্বই সব চেয়ে বেশী; বংশগতির নয়। এই সব চিন্তাবিদ এবং মনোবিদগণদের বলা হয় পরিবেশবাদী (Environmentalists)।

ক্যাটল এর পরীক্ষা

আমেরিকান মনোবিদ্ **ক্যাটেল** (J. M. Cattel) গ্যাল্টনের পথ অনুসরণ করে আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কুলপঞ্জী অনুশীলন করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, "A Statistical study of American man of science" নাম নিয়ে প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ, লোক বসতি, সুযোগ, আর্থিক সঙ্গতি, আদর্শ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ক্যাটেলের এই সিদ্ধান্ত গ্যাল্টন ও পিয়ারসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়।

ইষ্টার ব্রুক এর পরীক্ষা

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে **ইস্টার ব্রুক** (A. H. Easter Brook), ডাগডেলের জিউক পরিবার সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করেন। তাতে তিনি দেখালেন, জিউকদের অনেকেরই সামাজিক পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি হয়েছে। তিনি তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকায় বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ডাগ্‌ডেল তাঁর অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে, বংশগতির পক্ষে মতবাদ প্রচার করেছিলেন। আসলে পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে দেখা গেছে ব্যক্তিত্বের উন্নতি হয়েছে। তাই ইস্টার ব্রুক্ বংশগতির প্রভাবকে স্বীকার করে নি। তিনি বলেছেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে, পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বার্কস এর পরীক্ষা

আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত অনুশীলন সংস্থা (National Society for the study of Education) ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের **বারবারা বার্কস** (Barbara Burks) এক অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করেন। বার্কস্ এই পরীক্ষায় শিশুদের উপর পালিত পিতামাতার গৃহ পরিবেশের (Foster Home) প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখেন। একবছর বয়সে পোষ্য নেওয়া হয়েছে এরকম ২০৪ জন ছেলে মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি শিশুদের বুদ্ধির পরিমাপ করেন। তাদের প্রকৃত বাবা-মায়ের বুদ্ধির পরিমাপ করেন, এবং পালিত বাবা মায়ের বুদ্ধির পরিমাপ করেন। এই সব পরিমাপের তুলনামূলক বিচার করে তিনি দেখেন, পালক পিতামাতার প্রভাবে শিশুর বুদ্ধাঙ্কের (I. Q) পরিবর্তন ৭ থেকে

২০ পয়েন্ট পর্যন্ত হয়। তিনি আরও বলেছেন, শিশুদের সামগ্রিক পার্থক্যের জন্য বিশেষভাবে পরিবেশই দায়ী। তিনি বংশগতিকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। তবে বলেছেন বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ণয় করে। বার্কস এর পদ্ধতি অনুসরণ করে মনোবিদ লীহি (Leahy) মিনেসোটা (Minnesota) বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর এক পরীক্ষা করেন। তিনিও বার্কসের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন।

ফ্রীম্যান (Freeman), **হোলৎজিঙ্গার** (Holzinger), **মীচেল** (Mitchell), প্রভৃতি মনোবিদগণ যমজ সন্তানদের (Twins) উপর পরীক্ষা করেন। তাঁরা এরকম বিভিন্ন শ্রেণীর যমজ সম্পর্কে অনুশীলন করেন এবং তাদের দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিশেষভাবে পার্থক্য লক্ষ্য করেন। এই পার্থক্য তাঁরা মনে করেন, বিশেষভাবে পরিবেশের জন্য হয়েছে। তাঁরা সমকোষী যমজ ও ভিন্ন কোষী যমজ উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করেন। তাঁদের এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করে সমকোষী যমজ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পালিত হওয়ার জন্য বুদ্ধাঙ্কের ২৪ পয়েন্টের তফাত হয়। শিক্ষাগত দিক থেকে সব চেয়ে বেশী ৩৭ পয়েন্টের তফাত লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ৩২ পয়েন্টের তফাত দেখা গেছে। এই সব পার্থক্য লক্ষ্য করে মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করেন, পরিবেশ একই বংশগতির অধিকারীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। যে সব ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় নি, সে সব ক্ষেত্রে তাঁরা বলেছেন, পালিত গৃহ পরিবেশ এবং আসল পরিবেশের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পরবর্তীকালে, **নিউম্যান** (Newman), **সুইসিন্‌জার** (Schwesinger), **গার্ডনার** (Gardner) প্রভৃতি মনোবিদও পরবর্তীকালে একই রকমের সিদ্ধান্ত করেছেন।

যমজ পর্যবেক্ষণ

পরিবেশের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রায়ই **গ্ল্যাডিস** এবং **হেলেন** (Gladys and Helen) নামে দুই সমকোষী সন্তানের জীবন যাত্রা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। এরা দু'বছর বয়সে ঘটনা চক্রে পরস্পর থেকে দূরে চলে যায়। হেলেন পালিতা মায়ের কাছে পড়াশুনা করে বি. এ. পাস করে। পরে এক ধনবান লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং ভালভাবে ঘর সংসার করতে থাকে। তার মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে গ্ল্যাডিস সুযোগের

গ্ল্যাডিস্ ও হেলেনের জীবন ইতিহাস

অভাবে পড়াশুনা করতে পারে নি। রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কল-কারখানায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। ৩৫ বৎসর পরে তাদের যখন খুঁজে পাওয়া যায়, তখন দেখা যায় দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভিক বিকাশের দিক থেকে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য গড়ে উঠেছে। এর থেকে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়, এই পার্থ্যক্যের জন্য এবং বিকাশের তারতম্যের জন্য নিশ্চয় সুযোগের পার্থক্য বা পরিবেশ দায়ী।

পরিবেশের প্রভাবে বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন কি ভাবে হয় তা নিয়ে বহু পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম ফল পাওয়া গেছে। কোন কোন মনোবিদ বুদ্ধাঙ্কের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন আবার কেউ কেউ তা পান নি। এ বিষয়ে আমরা ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে **নিউম্যান** (Newman), **ফ্রিম্যান** (Freeman) **হোলৎজিঙ্গার** (Holzinger) সমকোষী যমজ সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা আংশিক ভাবে উপস্থাপন করছি। এর থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় পরিবেশের পার্থক্যের জন্য মানুষের বুদ্ধিরও তারতম্য হয়ে থাকে।

বুদ্ধির পার্থক্য

যমজের সংখ্যা	যে বয়সে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে	যে বয়সে পরীক্ষা করা হয়	বুদ্ধাঙ্কের পার্থক্য
১১ জন	১৮ মাস	৩৫ বৎসর	২৪
২ জন	১৮ মাস	২৭ বৎসর	১২
১৮ জন	১ বৎসর	২৭ বৎসর	১৯
৪ জন	৫ মাস	২৯ বৎসর	১৭
১২ জন	১৮ মাস	২৯ বৎসর	৭

এই সব পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে পরিবেশবাদীগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে মানুষের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল পরিবেশ। তাঁরা মনে করেন, অঙ্কুরোদগম করার জন্য যেমন উপযুক্ত জল, বায়ু ও তাপের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর জীবন বিকাশের জন্যও উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। মাতৃ গর্ভে প্রথম জীবন সঞ্চারের মুহূর্ত থেকে পরিবেশ যদি তাকে উপযুক্ত ভাবে

জীবন বিকাশে পরিবেশের গুরুত্ব

উদ্দীপ্ত না করে, তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। যথাযোগ্য পরিবেশের অভাবে তার জীবনের সব সম্ভাবনাই শুকিয়ে যেতে পারে। জন্মের পরেও তার জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তাকে দিতে না পারলে, তার মধ্যেকার অনেক সম্ভাবনাই সুপ্ত অবস্থায় থেকে যাবে। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ বা শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, মানুষের জীবন বিকাশ ও বৈষম্য কারণ সম্পর্কে এটাই শেষ কথা নয়।

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

[Modern concept about the relative importance of heredity and environment]

বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

বংশগতি ও পরিবেশের পক্ষে বিভিন্ন মনোবিদ ও চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে তথ্য সরবরাহ করেছেন। বংশগতিবাদীগণ সমস্ত তথ্যকে তাদের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিগত বৈষম্য (individual difference) এবং ব্যক্তিজীবনের বিকাশ (Individual's development) কেবলমাত্র বংশগতির ধারায়ই স্বাভাবিক নিয়মে নির্ধারিত হয়। অপর পক্ষে, পরিবেশবাদীগণ তাঁদের তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিজীবনের বিকাশের জন্য দায়ী একমাত্র পরিবেশ। এই ধরনের পরস্পর বিরোধী মতবাদের বেড়া জাল থেকে আধুনিক মনোবিদগণ এই সমস্যাকে টেনে বাহির করে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কোন একপক্ষীয় মনোভাবকে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা চরম বংশগতি-বাদকে যেমন বিশ্বাস করেন না, তেমনি চরম পরিবেশবাদেও তাঁদের আস্থা নেই। তাই আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন, তাঁদের কাছে প্রাথমিক সমস্যা হ'ল ব্যক্তিজীবনের বিকাশের হারকে কিভাবে বাড়ানো যায়, এবং তা করার জন্য এই দু'উপাদানকে কতটা সক্রিয় করা সম্ভব। আধুনিক চিন্তাবিদগণের মনোভাবকে **স্যার পার্সী নান** (Nunn) সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন—"*…the actual problem is not to choose one of the horns of a dilemna but to decide how much two distinct influences contribute to human development.*[1]

1. Education : 'its data and first principle—Nunn.

যমজ সন্তানদের উপর পরীক্ষা, একই বাবা মায়ের বিভিন্ন সন্তানের উপর পরীক্ষা, কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা মনোবিদগণ যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই সব তথ্যকে যে কোন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক পরীক্ষায়ই আংশিক প্রভাবের দিকটাই তাঁরা দেখেছেন। এবং যখন একটার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন অপরটাকে অস্বীকার করেছেন। শিশুর মধ্যে জন্ম মুহূর্তে যে সব সম্ভাবনা আছে, তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পরিবেশের প্রয়োজন আছে। তেমনি, অন্যদিকে পরিবেশ যতই ভাল হউক না কেন, শিশুর মধ্যে যদি বিকাশধর্মী উপাদান না থাকে, তার জীবনবিকাশ কোন রকমেই সম্ভব হয় না। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ বংশগতি এবং পরিবেশ এই দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। মনোবিদ **স্যাণ্ডিফোর্ড** (Sandiford) বলেছেন—"*Heredity and environment are correlative factors.*"[1] ব্যক্তি বংশগতির জন্য যে সব সম্ভাবনাগুলো নিয়ে জন্মেছে, তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করে দেবে তার পরিবেশ। আবার, অন্যদিকে, ব্যক্তির জীবন পরিবেশ তার জীবনের বিকাশে কতটা সহায়তা করবে, তা নির্ধারণ করে দেবে তার বংশগতি। সুতরাং, বংশগতি ও পরিবেশ ব্যক্তিজীবনের উপর কিভাবে কাজ করছে তার দ্বারা নির্ধারিত হবে তার বিকাশের ধারা। মনোবিদ **আলপোর্ট** (Allport)[2] ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর বংশগতির ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই একই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব (Personality) তার বংশগতি এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। গাণিতিক অর্থে, তিনি বলেছেন ব্যক্তিত্ব = $\int$ বংশগতি × পরিবেশ (Personality = $\int$ Heredity × Environment).

বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া

---

1. Educational Psychology : Sandiford.

2. "Since every quality is probably influenced by the original determinants interest in the genetic system, and at the same time by the course of life in an actively stimulating environments, it becomes impossible to ascribe with finality any single feature of personality either to heredity or to experience".—Allport : Personality : A Psychological interpretation.

শিক্ষায় বংশগতি ও পরিবেশ
[Heredity & Environment in Education]

শিক্ষার উদ্দেশ্য আমরা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি, ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা। অন্যদিকে, আমরা বলেছি, শিশুর জীবন বিকাশের মূলে আছে তার বংশগতি ও পরিবেশ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিজীবনের বিকাশে, এই পরিবেশ ও বংশগতি যখন একত্রে কাজ করে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের সমন্বিত প্রয়োগ করতে না পারলে শিক্ষা সার্থক হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে, শুধুমাত্র বংশগতির কথা বিবেচনা করলে, আমাদের স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা বা শিক্ষকের গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাহায্য করে, তাদের জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণতা দান করা। কিন্তু, এই শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন কিছু জন্মগত ক্ষমতাই নিয়ে আসে, যার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। বিদ্যালয় বা শিক্ষক কেবলমাত্র পরিবেশই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাই বংশগতি সম্পর্কে শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় হ'লেও পরিবেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক কত সার্থকভাবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন, তার দ্বারাই নির্ধারিত হবে, তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য। বংশগতি সূত্রে পাওয়া সব সম্ভাবনাকেই প্রকৃত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে পরিস্ফুটিত করা যায়। তাই সব রকম শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার মূলে আছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, শিশু জৈবিক পরিবেশ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে [*child in born with a biological heritage, he is born into a social heritage.*]। পরিবেশই হ'ল এই সামাজিক বংশগতি (social heredity)। এই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও প্রাথমিক স্তরে শিশুর মধ্যে থাকে না। সমাজের বা পারিপার্শ্বিকের বয়স্কেরা যেভাবে তাকে পরিবেশ প্রদান করেন শিশু তার মধ্যেই জীবনধারণ করে। তাই শিশুর দুটোই আয়ত্বের বাইরে, তাই মনোবিদ স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) একে সামাজিক বংশগতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু, শিক্ষকের দিক থেকে অবস্থা অন্য রকম। তিনি জৈবিক বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে

শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ—সামাজিক বংশগতি

পারেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। এই পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতি রচনা করতে গিয়ে শিক্ষককে একটা কথা মনে রাখতে হবে এর প্রভাব স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয় না। প্রত্যেক বংশধরদের জন্য নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। বিদ্যালয়ে সুপরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বংশগতি ও পরিবেশের নীতিকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক কি করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব।

॥ এক ॥ বংশগতির দরুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে। শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার পূর্বে তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীরা কি ধরনের সম্ভাবনার অধিকারী। শিক্ষার্থীদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা যদি তাঁর না থাকে, তা'হলে তিনি প্রত্যেক পর্যায়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হবেন। তাই যথাযোগ্য মানসিক অভীক্ষা (Psychological test) প্রয়োগ করে প্রথম শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিমাপ করার প্রয়োজন। এই ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শিক্ষক শুরু করবেন।

॥ দুই ॥ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি করতে হবে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, বসার ব্যবস্থা, আলো, বাতাস, সব দিক থেকে বিদ্যালয়ের মধ্যে যাতে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠাগার (Library) বিদ্যালয় পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এদিকেও শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠাগার ব্যবহার করে, সে দিকেই তাঁকে সচেষ্ট হতে হবে।

॥ তিন ॥ শিখন পরিবেশের একটা প্রধান অঙ্গ হ'ল মানবীয়-সম্পর্ক (Human relation) স্থাপন। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারেন, তা'হলে কখনই যোগ্য শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। এই পরিবেশ গঠনের উপর নির্ভর করবে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবনকে কতটা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে।

॥ চার ॥ জ্ঞানের সামগ্রীও সামাজিক বংশগতি বা পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং শিক্ষক কি ধরনের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের দিতে পেরেছেন, তা নির্ধারিত হবে, তিনি কি ধরনের বিষয়বস্তু তাদের জন্য সংগ্রহ করেছেন, তার উপর। অর্থাৎ শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণে ছাত্রদের সহায়তা করা। তিনি নিজে যদি জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকেন, তা'হলে শিক্ষার্থীদের কখনওই যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবেন না।

॥ **পাঁচ** ॥ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে অবসর সময়ে, সুস্থভাবে শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে সময় কাটাতে পারে সে দিকেও শিক্ষককে নজর দিতে হবে। খেলাধূলার ব্যবস্থা, সাহিত্য চর্চ্চার ব্যবস্থা, সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে করলে, শিক্ষার্থীরা তার মধ্যে দিয়ে যেমন অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তেমনি বিদ্যালয়ের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পায়।

॥ **ছয়** ॥ বিদ্যালয়ে সুপরিবেশ গড়ে তুলতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করারও সুযোগ দিতে হবে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ভার শিক্ষকের উপর থাকলেও, তাঁকে একথা মনে রাখতে হবে, শিক্ষর্থীরা যে পরিবেশে নিজেদের বংশগতির ধারা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না, তা তাদের কাছে কৃত্রিম মনে হয়। এবং ঐ ধরনের পরিবেশের প্রভাব শিক্ষার উপর বিশেষ কিছুই নেই। ব্যক্তিজীবনে পরিবেশের প্রভাব আসে সক্রিয়তার মাধ্যমে। সেই সক্রিয়তাকে বাদ দিয়ে পরিবেশের পুণর্গঠনের কোন তাৎপর্যই থাকে না। তাই পরিবেশ রচনায় শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা না দিলে, তার জীবন বিকাশ কখনও সম্ভব হবে না।

॥ **সাত** ॥ সব শেষে, শিক্ষার্থীর বংশগতির ধারা অনুশীলন করে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দ্দেশনা (Guidance) দিতে না পারলে, পরিপূর্ণ জীবন বিকাশ কখনওই সম্ভব হবে না। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তার প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করতে না পারেন, তা'হলে পরবর্তী জীবনে তার হতাশা আসবে। তাই শিক্ষার্থীদের বর্তমান সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্দ্দেশনার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তাদের বংশগতির কথা ও পরিবেশের তাগিদের কথা বিবেচনা করে।

এই ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, শিক্ষক যদি পরিবেশকে সার্থক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন এবং শিক্ষার্থীদের বংশগতিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারেন তা'হলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁর নিজের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে কোনদিনই সক্ষম হবেন না। যে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের উপযোগী পরিবেশ দিতে পারে না সে বিদ্যালয়ের কোন মূল্যই সমাজ-জীবনে থাকতে পারে না। তাই শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ প্রয়োজন। আর ব্যক্তিজীবনের বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশের সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন। বংশগতি শিক্ষার্থীদের জীবনবিকাশের প্রারম্ভিক

পরিচয় পত্র মাত্র, আর পরিবেশ তার বিকাশের গতি নির্ণায়ক। এদের যুগপৎ ক্রিয়া ছাড়া জীবনের বিকাশ সম্ভব হবে না। একথা মনে রেখেই শিক্ষককে এগিয়ে যেতে হবে।

অনুশীলনী

1. What do you understand by nature and nurture? Develop the idea that nature is a great factor which moulds human lives in various ways. [পৃঃ ২৯৮-৩০৬] (C. U. B.A. '60'68)
2. Estimate the importance of heredity and environment on the education of the child. [পৃঃ ৩০৬-৩১১] (C. U. B. T. '62,'63')
3. "Children are born with biological heritage they are born into a Social heritage"—Discuss. [পৃঃ ৩০৬-৩১১] (C. U. B. T. '61)
4. Discuss with a brief reference to relevant research findings, the influence of environment on the child's mental development. [পৃঃ ৩০৩-৩০৬] (N. B. U. B. T. '64)
5. Discuss the influence of environment on the child's mental development and illustrate your point [পৃঃ ৩০৩-৩০৬] (N. B. U. B. T. '66)
6. Discuss the relative influence of heredity and environment on the mental development of children [পৃঃ ৩০৩-৩১১] (C. U. B. T. '68, N. B. U. B. T. '67)
7. Write notes on :
   (a) Heredity [পৃঃ ২৯১-৩০২] (K. U. B. T. 66)
   (b) Social heredity [পৃঃ ৩০৮-৩১১]
8. Examine the roles of heredity and environment in the development of a child and show their relation to each other. [পৃঃ ৩০৮-৩১১] (C. U. B. T. '71)

দ্বিতীয় পর্ব

মানব জীবনের বিকাশের কৌশল

মানব জীবনের বিকাশ শুধুমাত্র স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। জীবন-বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সব সময়েই সে সক্রিয়। এই আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে সে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সীমিত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে আত্মবিকাশের পথে। এ ব্যাপারে, তাকে সাহায্য করছে সমাজের বয়স্কেরা, সাহায্য করছে শিক্ষালয়। আত্ম সক্রিয়তা, বয়স্কদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষালয়ের সহযোগিতা যে মানসিক প্রক্রিয়তার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করছে, তা হ'ল শিখন (Learning)। মানুষের জীবন বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে। প্রথমত ঃ শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ প্রাথমিক শিখনের কৌশল হিসাবে অনুসরণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে শিক্ষালয় ও শিখন সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

শিখন

[LEARNING]

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের (Educational Psychology) আলোচনার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে যে সমস্যা আছে, তাহ'ল শিখন (Learning)। শিখন প্রক্রিয়া এমনি এক জটিল প্রক্রিয়া যে তাকে খুব সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ অর্থে শিক্ষা (Education) এবং শিখন (Learning) এই দুটো প্রক্রিয়াকে আমরা পৃথকভাবে দেখতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু শিক্ষা এবং শিখনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিখন প্রক্রিয়ার জটিলতা মনোবিদ্‌দের বহু শতাব্দী ধরে চিন্তান্বিত করেছে, বর্তমান শতাব্দীতে শিখন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ের স্বল্প পরিসর অংশে তার সব কিছু সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও কিছু কিছু আধুনিক ধারণা সম্পর্কে উল্লেখ করার চেষ্টা করব। এবং আধুনিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করব।

শিখনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Learning) :—

ব্যক্তিসত্বার (Personality) বিকাশ দু'টো শক্তির উপর নির্ভর করে। একটা হ'ল **বংশগতি** (Heredity); অপরটা হ'ল **পরিবেশ** (Environment)। ব্যক্তিমানসের যে কোন অগ্রগতিকেই এই দুই এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন বিশেষ অবস্থায়, বংশগতি কতটা ব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করবে, তা নির্ভর করে পরিবেশ তার উপর কতটা ক্রিয়াশীল। আবার পরিবেশ ব্যক্তির উপর কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ণয় করে দেবে তার বংশগতি। এইভাবে ব্যক্তি জীবনে নিয়তই এক সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম ব্যক্তির জন্মগত গুণাবলীর সঙ্গে চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশের। অর্থাৎ, জীবন ধারণের তাগিদে আমরা পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি। কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন বিশেষ আচরণ (Behaviour), এই সংগ্রামেরই ফল। আচরণের প্রকাশ এক ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, এই যে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে আমরা অভিযোজন করছি, এর ফলে আমাদের জন্মগত আচরণ ধারার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সহজাত প্রবণতা (Original tendencies) ও জন্মগত আচরণগুলোর (Inborn

শিখন কি?

behaviours) পরিবর্তিত হ'য়ে নূতন আচরণ ধারা আমাদের মধ্যে এনে দিচ্ছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ (Training) এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ, সব কিছু বাধ্য করছে নূতন আচরণ করতে। এই ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে শিখন (Learning)। অর্থাৎ, অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণধারা পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই শিখন বলে (Learning is the modification of behaviour through experience and training)। **ম্যাক্গক্** এবং **আইরায়ন** (Mc Geoch and Irion) শিখনের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে যে কার্য্যকরী সংজ্ঞা নিরূপন করেছেন তাও অনুরূপ। তাঁরা বলেছেন—"We may define learning as Change in performance through Conditions of activity, practice and experience" **হিলাগার্ডও** (Hilgard) অনুরূপভাবে শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"a process by which activity originates or is changed through training procedures······as distinguished from changes by factors not attributable to training".

শিখন ও পরিবেশ

[**এক**] পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি, শিখন এমন এক জটিল প্রক্রিয়া যে তাকে কোন একটি মাত্র সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই শিখনকে সঠিক-ভাবে বুঝতে হ'লে, এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা'ছাড়া, অন্যান্য সমপর্য্যায়ভুক্ত মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এর পার্থক্য করার দরকার। শিখনের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সাম্য রাখার জন্যই শিখনের প্রয়োজন। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, বাইরের জগতের তাগিদ থাকলেই শিখন হয়। পরিবেশ যদি স্থবির হ'ত তাহ'লে আমাদের নূতন আচরণ করার প্রয়োজন হ'ত না। আর শিখনও প্রয়োজন হ'ত না। তাই শিখন প্রক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে বাইরের জগতের বা পরিবেশের তাগিদেই অনেক সময় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়।

শিখন ও আত্ম সক্রিয়তা

[**দুই**] আবার, যখন কোন শিখন, বাইরের বা পরিবেশের তাগিদে একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, তখন ঐ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে, ব্যক্তি আত্মপ্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তীত পরিবেশে ব্যক্তি কি ভাবে আচরণ করবে, তা সে নিজেই ঠিক করে। সুতরাং শিখন প্রক্রিয়া ব্যক্তির আত্ম-সক্রিয়তা (Self activity) জাগিয়ে তোলে।

[তিন] শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Aim of Education) দিক থেকে আমরা যদি শিখন প্রক্রিয়ার এই দুটো বৈশিষ্ট্যকে বিচার করি, তাহ'লে বলতে হয় যে শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের এই তাগিদ এবং সুযোগ দুটোই গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এমন এক উদ্দেশ্য এবং সমস্যা স্থাপন করবেন, যার জন্য বহুবিধ অভিযোজনের প্রয়োজন হবে।

শিখনের চাহিদা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

আর এই প্রয়োজন বোধেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে শিখনের তাগিদ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছে, তার অনেক কিছুই এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন-"The duration of a favourable environment for learning is the basic function of our system of formal education".

বর্হিজগতের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ যেমন শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তেমনি অন্তর্জগতের তাগিদ তাকে শক্তি জোগায়। অন্তর্জগতের এই তাগিদকে মনোবিদ্যার পরিভাষায় বলা হয় **প্রেষণা** (Motivation)। প্রেষণা হ'ল ব্যক্তির অন্তরের এমন এক অবস্থা যা তাকে কোন বিষয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ এক ধরনের আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে (A motive is a set or a state of the individual which disposes him for certain behaviour and for reaching certain goal)। অর্থাৎ এটা হ'ল বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থা। এই আন্তরিক অবস্থা বা তাগিদকে উদ্দেশ্যমুখী বাহ্যিক বস্তু সামগ্রীর দ্বারা জাগিয়ে তোলা যায়। অর্থাৎ, বস্তু জগতে কোন কিছুকে পাওয়ার আগ্রহই প্রেষণাকে জাগ্রত করে এবং তখনই তা শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজনে (adjustment) প্রবুদ্ধ করে। এই ভাবে বর্হিজগতের তাগিদ অন্তর্জগতের ইচ্ছাকে সক্রিয় করার মাধ্যমে আমাদের নূতন আচরণ ধারা গ্রহণে প্রবুদ্ধ করছে; এবং এর ফলে শিখন সম্ভব হচ্ছে। যে বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় উদ্‌বোধক (Incentive)। এই উদ্‌বোধক এবং প্রেষণার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শিখন। **মনোবিদ্ গ্যারেট** (Garrett) বলেছেন,—"Learning is a function of motive incentive Condition" অর্থাৎ, গাণিতিক সংব্যাখ্যানে, শিখন = "f" প্রেষণা × উদ্‌বোধক। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করার দরকার যে, প্রেষণার দ্বারা শিখন হয় ঠিকই, কিন্তু এ কথাও সত্য যে শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে নূতন নূতন তাগিদ বা প্রেষণারও সৃষ্টি করা

শিখন ও প্রেষণা

যায়। সুতরাং শিক্ষকের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত করাই শুধু নয়, তাদের মধ্যে নূতন প্রেষণার সৃষ্টি করা যাতে ক'রে তারা পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও নানা জিনিস জানার আগ্রহ বোধ করে। শিখন এবং প্রেষণা সম্পর্কে আমরা পৃথকভাকে আলোচনা করব। এখানে আমরা এইটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে শিখন প্রকৃতিগত ভাবে ব্যক্তির প্রেষণার সঙ্গে সংযুক্ত।

[চার] শিখনের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল—এটা একটা মানসিক প্রক্রিয়া (Mental process)। অর্থাৎ, শিখন হ'ল বিকাশের ধারা। বিকাশের ফল নয়। সাধারণ অর্থে, আমরা ফলটাকে (Result or Product) মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহার করি। জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) ইত্যাদি যে কথা গুলো আমরা সাধারণতঃ শিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, তা হ'ল শিখনের ফল (Result)। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা এগুলো অর্জন করি মনোবিদরা তাকেই বলেন শিখন। কোন বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময়ের পরিসর তার মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তাই হ'ল শিখন। সুতরাং একে আমরা অনুশীলন নির্ভর প্রক্রিয়াও বলতে পারি। যদিও সব রকম শিখনের ক্ষেত্রে অনুশীলন প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও শিখন এক ধরনের প্রক্রিয়া (Process) এবং তার ফল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তবুও শিক্ষকের দায়িত্ব হবে ঐ ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা।

শিখন ও ফল

[পাঁচ] শিখন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে অনুশীলনের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে শিখন কি ভাবে হয়। বিভিন্ন মনোবিদের বিশ্লেষন থেকে আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তি যখন কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সে সমস্যার সমাধানের জন্য তার প্রচলিত আচরণধারার মধ্যে পরিবর্তন আনে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে। প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সে সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক পর্যায়ে তার শিখন বা আচরণের পরিবর্তন হয়। প্রতি পর্যায়ের এই উন্নতিকে আমরা লেখ চিত্রে (Graph) পরিবেশন করি তাহ'লে দেখব যে এই লেখ ক্রমশঃ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একে বলে শিখনের লেখ (Learning Curve)। লেখ চিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় শিখন হ'ল ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া (Gradual developing process)। তবে প্রত্যেক প্রচেষ্টায় যে শিখন হবে এমন

শিখনের ক্রমবিকাশ

কোন নিশ্চয়তা নাই। এই লেখচিত্রেও দেখা যায়, কয়েকবার অনুশীলনের পর, শিখনের বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং এক সময় প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়।

[ছয়] সবশেষে বলা যায় শিখন সব সময় কোন না কোন চাহিদা (need) তৃপ্তি করে। সে চাহিদা ব্যক্তির নিজস্ব হতে পারে, বা সমাজেরও হতে পারে। শিখনের দ্বারা যে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন হয়, তা উন্নতিকামী। আপত দৃষ্টিতে যে আচরণ সমাজের কোন চাহিদা মেটাচ্ছে না বা অসামাজিক মনে হচ্ছে, অন্যদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা ব্যক্তির নিজস্ব কোন চাহিদাকে চরিতার্থ করছে। তবে এটাও ঠিক নয় যে, সব আচরণের পরিবর্তনই শিখন। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে উল্লেখ করব। শিখন সব সময় যে সমাজিক মূল্যবোধের (Social value) পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি সাধন করে একথা ঠিক নয়। অপর দিকে ব্যক্তি জীবনের কোন চাহিদা ছাড়াই সমাজ চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য অনেক সময় শিখন হয়। সুতরাং, এই দুই ধরনের চাহিদা—ব্যক্তিগত (Individual) এবং সামাজিক (Social) পরিতৃপ্তি করে ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই শিখন একান্ত প্রয়োজন। এবং শিখনের মূলে এই দু'ধরনের চাহিদা কোন ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করে। সুতরাং, যে কোন শিখনের পেছনে এই চাহিদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্লেষণ করলে।

শিখন ও ব্যক্তি জীবনের ভারসাম্য

[সাত] শিখনের প্রকৃত বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি শিখনের সঙ্গে অন্যান্য অনুরূপ প্রক্রিয়ার পার্থক্য নির্ধারণ না করতে পারি। বিশেষভাবে পরিমননের (Maturation) সঙ্গে। শিখন এক ধরনের বিকাশ বা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া (Growth or developmental process)। কিন্তু পূর্বে আমরা ঈঙ্গিত করেছি, সব রকম বৃদ্ধি বা আচরণের পরিবর্তনকে আমরা শিখন বলতে পারি না। কোন রকম শিখন ছাড়াই, শিশুর পেশী শক্ত হ'লে, সে অধিকতর ভারী ওজনের জিনিস তুলতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর আয়তন বাড়ে এবং তার জন্য সে বেশী খাদ্য বস্তু গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের আচরণকে আমরা শিখন বলতে পারি না। কারণ কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই ধরনের আচরণের পরিবর্তন হয়। তাহ'লে পরিমনন (Maturation) বলতে আমরা সব আচরণের পরিবর্তনকে বুঝি যা কোন রকম অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে হয়। এর জন্য উদ্দীপক পরিস্থিতির বিশেষ কোন সর্তের প্রয়োজন হয় না। (it is a growth process which does not require any special Condition

শিখন ও পরিমনন

of Stimulation)। **কোলেস্‌নিক** (Kolesnik) বলেছেন—জন্মগত প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আচরণের গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা জন্মগত সম্ভাবনাগুলোর পরিবর্তনতার প্রক্রিয়া হ'ল পরিমনন (Maturation refers to the changes quantitative or qualitative—which result from the natural unfolding of inherited tendencies or actualisation of innate potentialities)। বিশেষ বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পেশী সংগঠন ও স্নায়বিক বিকাশ একটা বিশেষ স্তরে পৌছালে তারা হাঁটতে পারে। একেই আমরা বলছি পরিমনন। হাতে ধরে হাঁটতে না শিখালেও, বিশেষ বয়োঃপ্রাপ্তিতে সে হাঁটতে পারবে। কিন্তু, শিখনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আমরা একটা সর্ত আরোপ করি। এই সর্ত হ'ল প্রশিক্ষণ, অতীত অভিজ্ঞতা বা পরিবেশের প্রভাব। এদের সহায়তায় আচরণ ধারা পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই আমরা বলছি শিখন। সুতরাং, এই দু'ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, যদিও তারা উভয়ে ব্যক্তির বিকাশে (Individual-development) সহায়তা করে। আরও একদিক থেকে পরিমনন এবং শিখনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অনেকে বলেন, পরিমনন সাধারণতঃ দৈহিক কারণ নির্ভর, কিন্তু শিখন অনেকাংশে মানসিক কারণ নির্ভর। অর্থাৎ পরিমনন বলতে অমরা যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বোঝাই যা দৈহিক কোন পরিবর্তনের জন্য ঘটে থাকে। কিন্তু শিখনের জন্য সব সময় দৈহিক কোন কারণ থাকে না। **বার্নার্ড** (Barnard) বলেছেন-"Maturation is biological, as constrasted to a psychological or learning phenomenon," কিন্তু, এই পার্থক্য আছে বলে আমরা পরিমনন এবং শিখনকে পরস্পর নিরপেক্ষ (Mutually independent) প্রক্রিয়া হিসাবে যেন বিবেচনা না করি। বরং তারা পরস্পর নির্ভরশীল। বিশেষ পরিমননের অভাব থাকলে, অনেক সময় শিখন সম্ভব হয় না। আবার, অনেক সময় শিখন নির্ধারণ করে দেয় কি ধরনের পরিমনন হবে। স্বাভাবিক নিয়মে জিহ্বার জড়তা না কাটলে শিশুরা অনেক শব্দই উচ্চারণ করতে পারে না। (পরিমনন নির্ভর শিখন)। অন্যদিকে, বিশেষ ধরনের পাঠ্য বস্তু (Reading material) অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিশুদের ইন্দ্রিয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় (Co-ordination of sense organ) শিখন নির্ভর পরিমনন দ্বারা। সুতরাং শিখন এবং পরিমনন পরস্পর বিরোধী বা পরস্পর নিরপেক্ষ ও ধারণা নয়। শিক্ষকের কাজ হবে, এই দু'ধরনের প্রক্রিয়াকে যথাযোগ্য কাজে লাগিয়ে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ সাধন করা। আধুনিকশিক্ষাতত্ত্বে পরিমননের গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া

হয়েছে এবং এই শিক্ষাতত্ত্বের একটা মূলনীতি হ'ল স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের শিক্ষা দানের কাজে এগুতে হবে ; তার বিরুদ্ধে কাজ করে নয় (We must learn to work in accord with natural growth principles rather than in opposition to them)।

শিখনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিখন হ'ল এক ধরনের বিকাশের প্রক্রিয়া (Development process)। এই প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট গুলো হ'ল—(১) **ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তা** (self activity)এবং ঐ আত্মসক্রিয়তার দরুণ (২) **উদবোধক ও তার প্রেষণার পারস্পরিক ক্রিয়ার** (Interaction between Incentives and motives) ফল স্বরূপ (৩) **আচরণের পরিবর্তন** (Change in behaviour)। শিখনের ফলে আচরণের যে পরিবর্তন হয়, তা (৪) **ক্রম পরিবর্তনশীল** (Gradual development), এবং (৫) **কৃত্রিম** (Artificial), কারণ, এর জন্য প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। পরিমননের মত স্বাভাবিক (Natural) প্রক্রিয়া নয়।

শিখনের প্রকৃতি

বিভিন্ন প্রকারের শিখন (Forms of Learning) :—

"বিভিন্ন প্রকারের শিখন" এ ধরনের কথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। 'শিখন' যদি এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া হয়, তবে তার শ্রেণীবিভাগ কি ভাবে সম্ভব। বিভিন্ন প্রকারের শিখন বলতে আমরা শিখন প্রক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ করছি না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিখন এক ধরনের অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। বিশেষ করে মানুষের শিখন (Human Learning) জটিলতম। এই জটিলতা পরিস্ফুট হবে, যদি আমরা মানুষের শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করি। অর্থাৎ এই অংশে আমরা মানুষ কি কি ধরনের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করে, বা কোন কোন পর্য্যায়ে তার আচরণ ধারার পরিবর্তন হয় শিখনের মাধ্যমে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। তাই 'বিভিন্ন প্রকারের শিখন' বলতে আমরা প্রক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগকে না বুঝিয়ে, মানুষের শিখনের ক্ষেত্রকে মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করব।

[এক] ইন্দ্রিয় ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা [Sensori-motor skills] :—

আমাদের দেহে কতকগুলো যন্ত্র আছে যেগুলোকে বলা হয় সংগ্রাহক (Receptor) বা সাধারণ ভাষায় ইন্দ্রিয়। এবং আর কতকগুলো যন্ত্র আছে তাদের বলা হয় চালক যন্ত্র (Motor organ)। সংগ্রাহকের কাজ

হ'ল বাইরের খবর গ্রহণ করা আর চালক যন্ত্রের কাজ হ'ল সেই অনুযায়ী কাজ করা। সুতরাং যে কোন সাধারণ কাজের জন্য এই দু'ই ধরনের যন্ত্রের সমন্বয় প্রয়োজন হয়। কিছু কাজে এই সমন্বয় এত স্বতশ্চল হয় যে, এই সব কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্য কাজও করতে পারি। যেমন হাঁটা (walking), কাপড় চোপড় পরা (Getting Dressed), নাচা (dancing) ইত্যাদি। এই ধরনের কাজের জন্য পুনরাবৃত্তি বা শিখন (learning) প্রয়োজন হয়। এই ধরনের কাজ সম্পাদনের তাগিদ (impulse) সাধারণতঃ পেশী বা দেহ সন্ধি থেকে আসে। অনেক সময় দেখা গেছে পরিবেশের প্রভাব এই সব কাজ সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। এই ধরনের দক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে যাতে করে শিক্ষার্থীরা খারাপ কিছু অংগভংগী গ্রহণ না করে। কোন কিছু খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করলে সে গুলোকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

দৈহিক দক্ষতা

[দুই] প্রত্যক্ষণ ও চালক যন্ত্রের সমন্বয় মূলক দক্ষতা [Perceptual motor skill]:—

এই ধরনের শিখনে কোন বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণের (perception) সঙ্গে কোন চালক যন্ত্রের ক্রিয়ার বা আচরণের সমন্বয় ঘটে। যেমন টাইপ করার সময় আঙ্গুলগুলো স্বতশ্চলভাবে মেশিনের বিভিন্ন অক্ষর গুলোর উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু কোন অক্ষরের উপর হাত পড়বে, তা নির্ভর করছে, যিনি টাইপ করছেন, তিনি খসড়াটি (Manuscript) কি ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন তার উপর। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যক্ষণ (perception) এবং আঙ্গুল সঞ্চালনমূলক কাজের সমন্বয়ের উপর এ ধরনের শিখন নির্ভর করে। এই ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এই সমন্বয়ের বিভিন্ন দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

প্রত্যক্ষণ মূলক দক্ষতা

[তিন] প্রত্যক্ষণমূলক শিখন [Perceptual Learning]:—

আমরা যা দেখি বা শুনি, তা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উদ্দীপকের (physical stimulation) জন্যই যে শুনি বা দেখি তা নয়। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা মানে আমরা তার দরুণ উদ্দীপনাকে মানসিক পর্য্যায়ে পরিবর্তন করে বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জন করা। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ তার শিখনের (learning) উপর নির্ভর করে। তাই বিশ্বজগতের বিভিন্ন ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য ব্যক্তির শিখন প্রয়োজন। এই ধরনের প্রত্যক্ষণের শিখনের উপর নানা পাঠ্যবস্তু শিখনও নির্ভর করে। বিশেষ

প্রত্যক্ষণমূলক শিখন

করে ভাষা শিক্ষা বা উচ্চারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের আদর্শ প্রত্যক্ষণ প্রয়োজন। মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের গুরুত্বের কথা **স্নিগ** (Snygg), **হেব** (Hebb) প্রভৃতি মনোবিদ্ বিশেষভাবে বলেছেন। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে প্রথম থেকে আদর্শ প্রত্যক্ষণের অভ্যাস গঠন করা, যে প্রত্যক্ষণ অন্যান্য শিখনকে সহায়তা করবে এবং শিক্ষার্থীকে আত্ম-প্রত্যক্ষণে (Self perception) সহায়তা করবে।

[চার] সংযোগমূলক শিখন [Associational Learning] :—

মানুষের শিখনের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে বিভিন্ন বস্তু, ধারণা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ (Association) স্থাপনের ক্ষমতা অর্জন। পূর্বে জানা কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সার্থক সংযোগ স্থাপনের দ্বারা আমরা অনেক নূতন ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করি। সাধারণ ভাবে শ্রেণীতে পড়াতে গিয়ে আমরা যখন কোন শব্দার্থ জিজ্ঞেস করি, তখন শিক্ষার্থীর অনুরূপ কোন শব্দ বা ধারণার সঙ্গে যথার্থ সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে কি না তাই পরীক্ষা করি। এই ধরনের শিখনকে তরান্বিত করতে হ'লে সব সময় আমাদের জানা জিনিস থেকে অজানা জিনিসের দিকে যেতে হবে (From known to unknown। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সার্থক সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

সংযোগমূলক শিখন

[পাঁচ] ধারণামূলক শিখন [Conceptual Learning] :—

ধারণা (concept) বলতে আমরা বস্তু বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ মানসিক পরিস্ফুটনকে বুঝি (concept are general mental representations of situations or condition)। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই ধারণা (concept) গঠন করা হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ চিন্তাশীল জীব, সেহেতু এই ধরনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এই রকম সামগ্রিক ধারণার বিকাশ সাধন করা যা দ্বারা শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন পরিস্থিতিতে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পারে। এবং এই ধারণা সুষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে হ'লে পাঠ্য বিষয় বস্তুকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে, তার বিভিন্ন তাৎপর্য্যপূর্ণ দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে এবং সবশেষে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যেকার সমবৈশিষ্ট্যকে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

ধারণার শিখন

[ছয়] আদর্শের শিখন (Learning of Ideals) :—

আদর্শ (Ideal) হ'ল বিশেষ এক রকমের ধারণা (Concept)। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংঘাত ও ব্যক্তির সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তিসত্বার (Personality) বিকাশ হয়। ব্যক্তিসত্বার বিকাশের পথে ব্যক্তির মধ্যে ছোট ছোট কিছু মানসিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। যা তার আচরণধারাকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, এই সব মানসিক সংগঠনকে বলা হয় আদর্শ (Ideal)। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই এবং বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, শিখনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন করতে হ'লে শিক্ষাথাদের মধ্যে আদর্শ গড়ে তুলতে হবে। কারণ, আদর্শের ভিন্নতার জন্য একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। যেমন, আদর্শের ভিন্নতার জন্য কোন এক ব্যক্তি অবসর সময় ভাল ভাল বই পড়ে ব্যয় করেন আবার অন্য কোন ব্যক্তি জুয়া খেলে কাটান। এই কারণে আদর্শের শিখন (Learning of ideals) মানুষের শিখনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ছোট ছোট জীবনাদর্শ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযোগী আদর্শ গড়ে তুলতে হ'লে শিক্ষককে সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ নয়, জীবন আদর্শ গঠনই একমাত্র চরম উদ্দেশ্য।

আদর্শের শিখন

[সাত] সমস্যা সমাধানের শিখন [Problems solving learning] :—

মানুষের জীবন পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল। এবং কোন পরিবর্তনকে আমরা সঠিক ভাবে প্রত্যাশা (anticipate) করতে পারি না। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করে আমরা জীবন পথে এগিয়ে যাই। কোন নূতন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'লে আমরা বাধা (obstacle) অতিক্রম করে সমস্যার সমাধানে পৌছি। এর ফলে আমাদের আচরণ ধারায় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, বা, শিখন হয়। এই ধরনের শিখনকে বলা হয় সমস্যা সমাধানের শিখন (Problem solving learning)। মনোবিদদের মতে এই ধরনের শিখন সবচেয়ে জটিল (complex)। উন্নত প্রাণী হিসাবে মানুষের জীবনে এই ধরনের শিখন প্রায়ই হ'য়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে এমন সমস্যার আকারে তুলে ধরা যা তারা তাদের মানসিক ক্ষমতা ও দৈহিক ও মানসিক পরিমনের দ্বারা সহজে সমাধান করতে পারে। এর দ্বারা তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

সমস্যা সমাধানের শিখন

বিভিন্ন প্রকার শিখনের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটা সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি যে মানুষের শিখন সরলতম যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জন থেকে শুরু করে জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাতৃ জঠোরের গভীর অন্ধকার ভেদ করে আলোময় জগতে আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে যে অভিযোজন সে শুরু করে, আর যার সমাপ্তি হয় জীবনের শেষ স্পন্দনের চরম মুহূর্তে, তার প্রতি পর্য্যায়ে শিখন অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবনব্যাপী এই প্রক্রিয়ার জটিলতাকে বিশ্লেষণ করায় মনোবিদ্‌দের চেষ্টার অন্ত নাই। এই প্রক্রিয়ার সঠিক বিশ্লেষণ আজও কি সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরবর্তী অংশে দেওয়ার চেষ্টা করব।

শিখনের তত্ত্বাবলী (Theories of Learning) :—

শিখন প্রক্রিয়ার স্বরূপ নিরূপণে অতি প্রাচীন কাল থেকে মনোবিদ্ ও দার্শনিকরা সচেষ্ট। সম্ভবতঃ এই প্রক্রিয়ার জটিলতার জন্য মনোবিদ্‌রা কেউই সামগ্রিক ভাবে তার স্বরূপ নিরূপণে সক্ষম হন নি। ফলে আমরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। কিন্তু শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সঠিকভাবে জানতে হ'লে, ঐ সময়কার মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার। অর্থাৎ, আমরা যখন কোন নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যেখানে আচরণের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন, তখন আমাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন। এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু তার বেশীরভাগ পরীক্ষাই ইতর প্রাণীদের দিয়ে। মনোবিদ্‌দের ধারণা পরীক্ষাগারে সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষা করতে হ'লে পশুদের উপরেই পরীক্ষা করা বেশী সহজ সাধ্য এবং তা নির্ভুলও হবে। বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। এই সব মতবাদ গুলোকেই শিখনের তত্ত্ব (Theory of Learning) বলা হয়। এই সব তত্ত্বের আমরা কিছুটা ধারাবাহিক আলোচনা করার চেষ্টা করব। সাধারণ বিভিন্ন শিখনের তত্ত্বগুলোকে আমরা সাধারণ দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(1) **সংযোগমূলক তত্ত্ব** (Associationistic Theory) এবং (2) **সমগ্রতাবাদ** (Molar theory or Field theory)। সংযোগবাদরা এবং সমগ্রতাবাদরা উভয়েই মানুষের একক সত্তায় (Monistic Concept of human nature) বিশ্বাসী। কিন্তু মূলগত তত্ত্বে তাদের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও মানুষের শিখন সম্পর্কে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। তাই শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে মনোবিদ্ **ব্লেয়ার** (Blair, G. M.) মন্তব্য

শিখনের তত্ত্ব কি ?

করেছেন, "Psychology has never presented in any one place a Complete, Unified, Coherent and Universally agreed upon account of the nature of learning," সুতরাং, শিখনের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে হ'লে, সেই সব তত্ত্বের কিছু কিছু উল্লেখ করার দরকার।

শিখনের সংযোগমূলক তত্ত্ব (Associationistic Theory of Learning) :—

প্রস্তাবনা

সংযোগ (Association) এর সমস্যা দার্শনিকদের বহু প্রাচীন কাল থেকে চিন্তাকে আকর্ষন করেছিল। দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle বলেছিলেন, সমকালীন বা সহাবস্থিত ঘটনা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে (Association by Contiguity in time and space)। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিকরা, স্মৃতি (Memory ', প্রত্যক্ষণ (Perception), ইত্যাদি প্রায় সব রকম মানসিক প্রক্রিয়াকে সংযোগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। মনোবিদ্ **হবস্** (Hobbes), **লক্** (Locke), **হিউম** (Hume), **হার্টলে** (Hartley) এঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মনোবিদ্‌রা শিখনকে শুধুমাত্র ধারণার সংযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁরা শিখনকে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের সংযোগের তত্ত্বকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—[**এক**] **সংযোজনবাদ** (Connectionism), [**দুই**] **অনুবর্তন** (Conditioning)। তবে আধুনিক কালে এই মতবাদের আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে দেখা যায়, যে এই সব নূতন তত্ত্বের মধ্যে এই দুই রকম সংযোগেরই উপাদান আছে। এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা কিছু উল্লেখ করব।

সংযোজনবাদ (Connectionism) :—

1899 সালে "Animal Intelligence" নামে একটা বই প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের লেখক হ'লেন বিখ্যাত আমেরিকান **মনোবিদ থর্নডাইক** (Thorndike, E. L.)। এই বইয়ের মধ্যে থর্নডাইক যে মতবাদ প্রচার করেন, তা পরবর্তীকালে শিখন (Learning) সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। থর্নডাইক বিভিন্ন প্রাণীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে, শিখনের সরলতম কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শিখন অনেক কারণে জটিল হয়ে পড়ে। তাই তিনি শিখনের উন্নত পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা না করে, তার সরলতম অবস্থা থেকে শুরু করলেন।

তাঁর মতে শিখনের সরলতম ক্ষেত্র হ'ল একটি উদ্দীপকের (stimulus,S), এর সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়ার (Response, R) বন্ধন বা সংযোজন (Connection)। অর্থাৎ, তাঁর মতে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনই হ'ল শিখন (Learning is due to the formation of bond between stimulus and Response)। একটি উদ্দীপক 'উঃ' এর সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়া 'প্রঃ' এর সংযোজনের অর্থ, যখনই উদ্দীপক 'উঃ' আমাদের সামনে আসবে, আমরা এইভাবে 'প্রঃ' প্রতিক্রিয়া করব। থর্নডাইক নিজেই বলেছেন—"That a Connection S।→R। exists in a Certain organism means······simply that there is a probability greater than infinitesimal that if S। occurs, R। will occur" সুতরাং, এই মতানুযায়ী শিখন কোন ইতস্ততঃ কোন কাজ নয়। উদ্দীপক এক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আচরণ ধারার নিয়ন্ত্রণ করাই হ'ল শিখন। থর্নডাইক, এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে (Bond) শরীর বৃত্তীয় তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এই বন্ধন ঘটে স্নায়ুর (Nerve) মাধ্যমে। উত্তেজনা আসা-যাওয়ার পথে স্নায়বিক (synapse) রোধশক্তি (Resistance) কমে যাওয়ার ফলেই এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উপর পরীক্ষা করে তাঁর এই মতবাদ প্রচার করেন।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদ

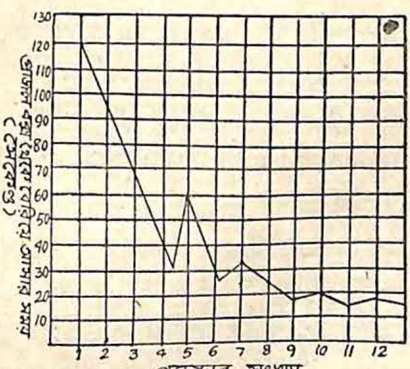
থর্নডাইক বিশেষ ভাবে মাছ, মুরগী, বিড়াল, কুকুর, বানর ইত্যাদি লইয়া বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন। তবে তাঁর যে পরীক্ষার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তা হ'ল বিড়ালের উপর পরীক্ষা। এই ধরনের পরীক্ষায় তিনিএক রকম জিনিস ব্যবহার করেন যাকে বলা হয় পাজল বক্স (Puzzle box)। এই সব বাক্স এরূপ ভাবে তৈরী যে তা থেকে বেরিয়ে আসার একটা মাত্র পথ আছে। আবার কোন কোনটায় বোতাম টিপলে, কোনটায় একটা দড়ি টানলে। এই অবস্থায় থর্নডাইক একটা ক্ষুধার্ত বিড়ালকে ঢুকিয়ে দিলেন এবং বাইরে কিছু খাবার রাখলেন। এটাই হ'ল তাঁর পরীক্ষা মূলক পরিস্থিত (Experimental set up)। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি বিড়ালের বাইরে বেরিয়ে আসার প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করলেন। এবং যখনই বিড়ালটা বেরিয়ে আসতে পারল, তখনই আবার তাকে ভেতরে রেখে আগের দরজা বন্ধ করে দিতে লাগলেন। এই অবস্থায় থর্নডাইক বিড়ালের আচরণের তিনটে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন—

থর্নডাইকের পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত

[**এক**] প্রথম যখন বিড়ালকে ঐ পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হ'ল, তখন সে এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। কখনও বা বাক্সের কাঠের ফাঁকগুলো দিয়ে, কখনও বা উপরে লাফ দিয়ে। এই ভাবে ইতস্ততঃ চেষ্টা করতে করতে এক অবস্থায় হঠাৎ, দড়ির উপর চাপ পড়ায় ছিট্‌কিনিটা খুলে গেল। এবং বিড়ালটা প্রথমবারের মত বেরিয়ে আসতে পারল।

[**দুই**] ঐ অবস্থার পুণরাবৃত্তিতে দেখা গেল, বিড়ালের ভুল প্রচেষ্টার পরিমাণ ক্রমে কমে আসছে এবং সে সঠিক পদ্ধতিটা ক্রমশঃ নির্ভুলভাবে আয়ত্ব করছে। বা ক্রমে কৃতকার্য্যতামূলক প্রচেষ্টাগুলো তার স্থায়ী আচরণের অংশ হিসাবে গৃহীত হচ্ছে আর ভ্রান্তিমূলক আচরণ বা প্রচেষ্টা-গুলোকে সে ত্যাগ করছে।

[**তিন**] যতই পুণরাবৃত্তি করা হ'তে লাগলো, ততই লক্ষ্য করা গেল, বিড়ালের 'পাজল্ বক্স' থেকে বেরিয়ে আসতে কম সময় লাগছে। **থর্নডাইক** পুণরাবৃত্তির সময়কে লেখচিত্রের সাহায্যে পরিবেশন করলেন। পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লেখ (Curve) ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল। একে বলা হয়-'**Time Curve**'.



টাইম কার্ভ (TIME CURVE)

প্রায় প্রতি পরীক্ষাতেই থর্নডাইক এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন। এবং তাঁর এই পর্য্যবেক্ষন (Observation) থেকে **থর্নডাইক** যে সিদ্ধান্ত করলেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ শিখন সংক্রান্ত গবেষণার মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। তাঁর মতে, প্রাণীর ক্ষেত্রে ভুল প্রচেষ্টাকে বাদ দেওয়া (Elimination of Unsuccessful movement) এবং সঠিক প্রচেষ্টার গ্রহণ (Fixation of Successful movement) উভয় প্রক্রিয়াই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাণীরা শিখনের জন্য চিন্তন (Thinking , যুক্তি (Reasoning) বা

অনুকরণ (Imitation) কোন কিছুর সাহায্য গ্রহণ করে না। তারা প্রত্যক্ষ ভাবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শেখে। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তারা প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গুলোকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে, আর প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাগুলো গ্রহণ করতে থাকে। আত্ম প্রচেষ্টায় ভুল পথ গুলোকে ত্যাগ করে সঠিক পথকে গ্রহণ করার মাধ্যমে যে শিখন হয়, তাকে **থর্নডাইক** নাম দিয়েছেন **ট্রায়েল এণ্ড এরার লার্নিং** (Trial and Error learning) বা প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখন। আর শিখনের এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error Learning)। খাদ্য পাওয়ার জন্য যে অন্তরের তাগিদ তাই বিড়ালকে এই প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শিখনে সাহায্য করেছে। থর্নডাইকের মতবাদ প্রচারের পর বহু মনোবিদ্ তাঁর সমালোচনা করেছেন এবং পরীক্ষার দ্বারা তাঁর ভুল প্রমাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব। তবে এই তত্ত্বের মধ্যে যে সত্যতা নেই এ কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারি না। বরং থর্নডাইকের

প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি

শিখন সম্পর্কে মতবাদ বহুদিন ধরে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। একজন বিশিষ্ট মনোবিদ্ **স্প্রিণ্টহল** (Sprinthall, R. C.) শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, এক সরস মন্তব্য করেছেন, যা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন "যদি থর্নডাইকের কোন একটা বিড়াল অন্য রকম আচরণ ক'রত তাহ'লে সে আমেরিকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-সূচীকে বদলে দিত If one of those Cats acted at all unpredictably it would Change educational Curricula throughout the nation)। যাই হউক, এই তত্ত্বের মূল কথা হ'ল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভুল শুধরে নিয়ে প্রাণী শিখে। উদ্দেশ্য বা ফল-লাভ এই তত্ত্বের একটা গুরুত্বপুর্ণ দিক। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে **মনোবিদ্ ম্যক্ কোনেল** (Mc Connell) বলেছেন-"The salient point is that the trial error method of learning is not senseless process—it is a process of approximation and correction." তাই বিদ্যালয়ে, এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। শিক্ষক হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে, সমস্যা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা, তার সমাধান বলে দেওয়া নয়। যথাযথ ভাবে সমস্যা উপস্থাপন করে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে, তারা আত্ম প্রচেষ্টায় শিখবে। এ ছাড়া, শিখনকে সার্থক করতে হ'লে, ছাত্ররা যাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে পারে সেদিকেও শিক্ষককে নজর দিতে হবে।

শিখনের সূত্রাবলী (Laws of Learning) :

থর্নডাইক কেবলমাত্র শিখনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেই শেষ করেন নি। তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তার আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কি করে এবং কেন ভুল প্রচেষ্টাগুলো পরিত্যক্ত হয় এবং সফল প্রচেষ্টাগুলো আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা ব্যাখ্যা করার জন্য থর্নডাইক কতকগুলো সূত্রের অবতারণা করেছেন। এই গুলোকে শিখনের সূত্র Laws of Learning) বলা হয়। অনেকে শিখনের সূত্রগুলোকে (Laws of Learning) শিখনের তত্ত্ব (Principle of Learning) মনে করে থাকেন।

সূচনা

কিন্তু আসলে তা নয়। শিখনের মূল একটা তত্ত্বের কথাই থর্নডাইক বলেছেন। তা'হল প্রচেষ্টা ভুলের নীতি (Principle of trial and error) বা আরও ব্যাপক অর্থে সংযোজন বাদ (Connectionism)। প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শেখার কারণগুলোই হ'ল শিখনের সূত্র। থর্নডাইক মোট আটটা সূত্রের কথা বলেছেন। তবে তার মধ্যে মুখ্য সূত্র হ'ল তিনটে— **[এক] ফললাভের সূত্র (Law of effect**), **[দুই] অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise)**, **[তিন] প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness**)।

[এক] ফল লাভের সূত্রে, কাজের ফল লাভের উপর যে শিখন নির্ভর করে, সে কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, থর্নডাইকের পরীক্ষায়, বিড়াল খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলে প্রত্যেকবারই খাদ্য পায় ; তাই প্রত্যেকবার যতদূর সম্ভব সহজ পথে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে।

ফললাভের সূত্র

যদি খাদ্য পাওয়ার তৃপ্তি না থাকত তাহলে সে সঠিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে গ্রহণ করত না। থর্নডাইকের নিজের ভাষায় সূত্রটি এইরূপ—"When a modifiable connection between a situation and a response is made and accompanied or followed by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased ; when made and accompanied or followed by an annoying state of affairs, its strength is decreased." অর্থাৎ, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সংযোগের মাধ্যমে যদি সুখকর বা তৃপ্তিদায়ক ফল পাওয়া যায়, তবে ঐ সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হবে ; আর যদি ঐ সংযোগের মাধ্যমে বিরক্তিকর ফল পাওয়া যায়, তবে ঐ সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হবে। থর্নডাইকের এই সূত্রে "পরিবর্তনীয় সংযোগ" (Modifiable Connection) কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'পরিবর্তনীয় সংযোগ' বলতে থর্নডাইক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার (উঃ→প্র) মধ্যে সেই ধরনের সংযোগের কথা বলেছেন,

বা শিখনের দ্বারা সংস্কার করা যায়। যেহেতু, তৃপ্তিদায়ক বা বিরক্তিকর অবস্থা (Satisfying or annoying state of affair) আংশিকভাবে প্রাণীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। তাই তাঁর মতে, এই প্রান্তিক অবস্থা কোন প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ধারণ করে দেয়।

[দুই] **থর্নডাইকের** মতে ফলই (effect) একমাত্র শিখনের সর্ত নয়। শিখনকে দৃঢ়তর করতে হবে। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে তাকে দৃঢ়তর করতে না পারলে, পরে তা কার্যকরী হবে না। তাই কি ভাবে তা দৃঢ় হয়, সে কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থর্নডাইক তাঁর দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করেছেন। একে বলা হয় **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise)। এই সূত্রের দুটো অংশ আছে। প্রথম অংশে তিনি বলেছেন—"When a modifiable connection is made between a situation and a response, that connection's strength is, other things being equal, increased." অর্থাৎ, অন্য সব অবস্থা ঠিক থাকলে, একটা উদ্দীপক এবং একটা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্পর্ক স্থাপনের পর যদি তাকে বার বার চর্চা করা হয় তাহলে সেই সংযোগের শক্তি বাড়বে। অনুশীলনের সূত্রের এই অংশকে বলা হয় **অভ্যাসের সূত্র** (Law of use)। অপর অংশে থর্নডাইক বলেছেন—"When a modifiable connection is not made between a situation and a response during a length of time, that connections strength is decreased." মূলসূত্রের এই অংশকে বলা হয় **অনভ্যাসের সূত্র** (Law of disuse)। কোন পরিবর্তনীয় উদ্দীপক—প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বহুদিন চর্চা না করলে তাদের মধ্যেকার বন্ধন ক্রমে শিথিল হতে থাকে। এই সূত্রের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নাই, প্রাচীন সংযোগের সূত্রের (Law of association) বা অভ্যাসের সূত্রেরই (Law of habit formation) পুনরাবৃত্তি মাত্র। থর্নডাইকের এই সূত্রে "অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে" (Other things being equal) কথাটা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। 'অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে' বলতে থর্নডাইক ফল প্রাপ্তির কথাটাকেই স্মরণ করাতে চেয়েছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, তিনি অনুশীলনের চেয়ে ফললাভের সূত্রের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

অনুশীলনের সূত্র

[তিন] শিখনের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, তার কথা থর্নডাইক উল্লেখ করেছেন **প্রস্তুতির সূত্রে** (Law of Readiness)। তাঁর মতে কোন উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে ব্যক্তির উন্মুখতা দরকার। তবে এই প্রস্তুতি বলতে তিনি

কেবল মাত্র দৈহিক প্রস্তুতির কথাই বলতে চেয়েছেন। তাই তাঁর সূত্রে শরীর বৃত্তীয় প্রস্তুতির উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি বলেছেন—

প্রস্তুতির সূত্র

"When any conduction unit is ready to conduct, for it to do so is satisfying. When any conduction unit is not in readiness to conduct, for it to conduct is annoying. When any conduction unit is in readiness to conduct, for it not to do so is annoying." আগেই উল্লেখ করেছি, থর্নডাইক শরীর বৃত্তীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্নায়ু তন্তুর (Nerve) মাধ্যমে হয়। এই সূত্রে থর্নডাইক এই দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে প্রস্তুত, তাকে তা বহন করতে দিলে, ব্যক্তির তৃপ্তি আসবে। যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে রাজী নয়, তা জোর করে বহন করালে বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সবশেষে যে কাজ করার জন্য দেহ উদগ্রীব তা করতে না দিলেও বিরক্তি সৃষ্টি হবে। এই সূত্রকে বিশ্লেষণ করলে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। থর্নডাইক অনুশীলনের সূত্রে (Law of exercise) যেমন ফলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি প্রস্তুতির বেলায়ও সেই ফলটার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন।

[**চার**] উপরিউক্ত তিনটে মুখ্য সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও পাঁচটা সূত্রের কথা বলেছেন। তাদের **গৌণসূত্র** (Minor Law) বলা হয়। এগুলো ঠিক

গৌণসূত্র

অর্থে সূত্র বলা যায় না। তবে প্রাণীর শিখনের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে থর্নডাইক এ সব সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আবার, আমরা যদি বিশেষভাবে বিবেচনা করি তা'হলে দেখব যে শিখনের এই গৌণ সূত্রগুলো পূর্বোক্ত সূত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তাই এদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণী যখন কোন নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন তারা সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে তার সমাধান করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ,

বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র

সঠিক প্রতিক্রিয়াটি করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার যত রকম অর্জিত ও অনর্জিত আচরণ ধারা আছে তার দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে চায়। এই ভাবে চেষ্টার মাধ্যমে সফলতা আসে। এই যে একই উদ্দীপকের দরুন প্রাণীর বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়ার রীতি তাকে **থর্নডাইক** বলেছেন বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা। তাই থর্নডাইকের এই সূত্রকে বলা হয়, **বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple response)**। তবে এটা তাঁর প্রচেষ্টা-ভুলের পদ্ধতির নামান্তর মাত্র। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা হ'ল শিক্ষার্থীদের নিজেদের

চেষ্টার দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করার সুযোগ দিতে হবে। তার ফলে তারা নিজেদের ভুলও বুঝতে পারে এবং যথাযথভাবে শুধরে নিতে পারে। তাছাড়া, ভুল করলেও, সেই ভুল শিক্ষার্থীকে নতুন আচরণ বা শিক্ষার পথে আগ্রহান্বিত করবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন ভুল অভিজ্ঞতারও শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে।

মানসিক অবস্থার সূত্র

[পাঁচ] থর্নডাইক তাঁর প্রস্তুতির সূত্রে (Law of readiness), বিশেষভাবে দৈহিক প্রস্তুতির গুরুত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিখনের জন্য দৈহিক প্রস্তুতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে। থর্নডাইক, এ প্রসঙ্গে যে সূত্রের অবতারণা করেছেন তা'হল- **মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Mental set, attitude or disposition)**। মানসিক অবস্থা হ'ল ব্যক্তির আন্তরিক এক ক্রিয়াশীল তন্ত্র যা তাকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে অনুপ্রাণিত করে বিশেষ এক ভংগীতে প্রতিক্রিয়া করতে। এই মানসিক অবস্থা শিখনের সহায়ক। থর্নডাইকের পরীক্ষায়, বিড়ালটা ক্ষুধার্ত ছিল বলেই বাইরে খাদ্যবস্তু দেখে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। পেট ভর্তি থাকলে তার বেরিয়ে আসার কোন তাগিদ থাকত না, শিখনও সম্ভব হ'ত না। তাই যে কোন শিখনের জন্য উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি চাই। আমাদের শিক্ষালয়ে শিখনকে সার্থক করে তুলতে হলে ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত মানসিক অবস্থার (Mental set) সৃষ্টি করার দরকার। বিভিন্নভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। এর মধ্যে প্রধান হ'ল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের পাঠ্য বস্তুর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক খুঁজে পায় তবে তারা জ্ঞান আহরণে আগ্রহান্বিত হবে। এ ছাড়া শিক্ষাপোযোগী মানসিক অবস্থা সৃষ্টির পেছনে শিক্ষকের কর্মদক্ষতারও প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি শিক্ষক তাঁর শ্রেণীতে আনন্দকর ও সুখদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তবেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আসবে। ছাত্র ছাত্রীরা যদি শিক্ষককে ভয় পায় তাহলে তাদের অন্তরে মানসিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার ফলে শিখন সম্ভব হয় না।

আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র

[ছয়] **থর্নডাইকের** আর একটি গৌণ সূত্র হ'ল, **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity)**। এই সূত্রের মূল কথা হ'ল প্রাণীরা সামগ্রিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া করে না। অর্থাৎ তারা ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, প্রচেষ্টা ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা করে। এর ফলে শিখনের জন্য শক্তির অপচয় কম হয়। কারণ

সব সময় অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের জন্য সমস্ত অবস্থায় পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। যেহেতু, কোন একটা অবস্থার যে কোন একটা অংশ বা উপাদানের অবস্থান, পূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম, সেহেতু, শিক্ষালয়ে যদি বিভিন্ন অবস্থায় পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তা'হলে শিক্ষার্থীদের কাজ সহজ সাধ্য হবে এবং সম্পূর্ণ হবে।

উপমানের সূত্র

[সাত] প্রাণীর শিখনের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা **থর্নডাইক** উল্লেখ করেছেন তাঁর **আত্মীকরণ বা উপমানের সূত্রে (Law of assimilation or analogy)**। যে অবস্থায় অভিযোজন করার মত আমাদের কোন অর্জিত বা অনর্জিত প্রতিক্রিয়া জানা নেই, সে রকম কোন অবস্থার সম্মুখীন হলে আমরা পূর্বের কোন অবস্থার সঙ্গে কোন আংশিক মিল খুঁজে বের করি, এবং পূর্বে ঠিক যে ভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিলাম, সেই ভাবে প্রতিক্রিয়া করে থাকি। অর্থাৎ, সমজাতীয় অবস্থায় আমরা বিশেষ বিবেচনা না করে, পূর্বে অর্জিত কোন উপায়ে প্রতিক্রিয়া করে থাকি। তাই শিক্ষালয়ে শিখনকে সহজ সাধ্য করতে হলে নূতন পাঠ্য বিষয়ের বা সমস্যার সঙ্গে আগের শেখা কোন পাঠের কি মিল আছে, তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এক কথায়, তাকে জানা বিষয় বস্তু থেকে অজানা জ্ঞানের ভাণ্ডারের দিকে (From known to unknown) এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইতিহাস পড়াতে গিয়ে যে শিক্ষক ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান জীবনের ঘটনার মিলটুকু ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম তিনিই শিখনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিকতার শিক্ষা দিতে পারবেন।

অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র

[আট] সবশেষে থর্নডাইক তাঁর **অনুষঙ্গ মূলক সঞ্চালনের সূত্রে (Law of associative shifting)** শিখনের সময় উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন হয়, তার এক বিশেষ প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কোন উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত কোন প্রতিক্রিয়াকে অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোজিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী যে সব প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম, সে গুলোকে শিখনের দ্বারা যে কোন অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব (Any response of which the learner is capable may be attached to any stimulation to which he is sensitive)। এই প্রক্রিয়াকে অনুবর্তনও (Conditioning) বলা যেতে পারে। শিশুরা বিদ্যালয়ে যে সব অভ্যাস (habit), অনুরাগ (Interest) বা অন্যান্য মানসিক ধর্ম (Mental properties) অর্জন করে, তা তারা পরবর্তী বৃহত্তর

জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। এটাই হল এই সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য। সুতরাং শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হ'ল শিক্ষালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বস্তুর মাধ্যমে ছাত্রদের যোগ্য অভ্যাস ও মানসিক সংগঠন তৈরী করা যা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে।

থর্নডাইকের শিখন সূত্রাবলীর শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব [Educational Importance of Thorndike's Laws of Learning]ঃ

সূচনা

যদিও থর্নডাইকের শিখনের তত্ত্ব এবং সেই সংক্রান্ত সূত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল নয়, তবুও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই তত্ত্ব নির্ভুল নয় মানে, যে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যজ তাও নয়। তবে **স্প্রিণ্ট হল্** (Sprint hall) যা বলেছেন—"If one of these cats acted at all unpredictably, it would change educational curricula throughout the nation."[1] এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাই কোন রকম সংস্কার ছাড়াই বলা যায়, থর্নডাইকের শিখনের সূত্রের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। তাঁর গৌণ সূত্র-গুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে, আমরা পূর্বেই কিছু উল্লেখ করেছি। এখন আমরা তাঁর মূখ্য সূত্র গুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফললাভের সূত্রের তাৎপর্য

ফললাভের সূত্রে বলা হয়েছে ফল তৃপ্তিদায়ক হলে শিখন সম্ভব হয় এবং স্থায়ী হয়। অপরদিকে ফল বিরক্তিকর হলে শিখন স্থায়ী হয় না। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিখনকে স্থায়ী করতে হলে পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যার দ্বারা পাঠ্য বস্তু এবং ফলাফল দুই-ই তাদের কাছে তৃপ্তিদায়ক হয়। সাফল্যের আনন্দেই শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিক্ষা করবে, তাই সাফল্যের আনন্দ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষকেরও কতকগুলি দায়িত্ব আছে। **প্রথমতঃ** শিক্ষক যদি নিজের কাজে তৃপ্তি পান এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তবে সেই শিক্ষকের কাছ থেকে আনন্দের সঙ্গে তারা শিক্ষা করতে পারে। এক কথায় শিক্ষক তাঁর বৃত্তিতে যে পরিমাণ তৃপ্তি পাবেন তিনি সেই পরিমাণে তৃপ্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনতে সক্ষম হবেন। **দ্বিতীয়তঃ**, বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়-গুলো যদি ছাত্রদের বোধগম্য হয় এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের

1. Sprint hall & Sprint hall : Educational Psychology.

ঘটনাবলীর মিল খুঁজে পায়, তা'হলে তারা শিখনের আগ্রহ প্রকাশ করবে। সুতরাং, বিষয় উপস্থাপনে শিক্ষককে এদিকে নজর রাখতে হবে। বিষয় ছাত্রদের অবোধ্য ও অর্থহীন হলে তারা তৃপ্তি পাবে না। **তৃতীয়তঃ,** শিক্ষকের নজর রাখার দরকার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীরা তাদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে। তাদের এমন সব সমস্যা দিতে হবে যা তারা নিজেরা বা অল্প সাহায্যে সমাধান করতে পারে। বিষয় যদি তাদের আয়ত্তের বাইরে হয় তবে তারা কোন রকম উৎসাহ বোধ করবে না শিক্ষায়। **চতুর্থতঃ,** বিষয়বস্তুকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে (According to difficulty) সাজিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি প্রথম প্রচেষ্টায় একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা সমাধান না করতে পেরে হতাশা আসে, তা'হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কখনই তৃপ্তি আসবে'না। তাই সহজ সমস্যা দিয়ে শুরু করতে হবে এবং ধীরে ধীরে কঠিন সমস্যা উপস্থাপন করতে হবে। **পঞ্চমতঃ,** একই বিষয়বস্তু যদি বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতে পারলে ছাত্ররা আগ্রহান্বিত হয়, এর দ্বারা সব রকম ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। **ষষ্ঠতঃ,** শিখনের সময়, শিক্ষক যদি মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য করেন বা প্রশংসা বা উৎসাহ দেন, তা হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে তারা ঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে তাদের পাঠে আগ্রহ আসে। শিক্ষক কোন সময় শিক্ষার্থীদের যেন হতাশ না করেন। সামান্যতম সাফল্যকে যেন তিনি যথাযোগ্যভাবে পুরস্কৃত করেন। তবেই শিখন সার্থক হবে।

অনুশীলনের সূত্রের (Law of Exercise) মূল কথা হ'ল অনুশীলন শিখনকে পরিপূর্ণতা দান করে। অনুশীলনের ফলে নতুন প্রতিক্রিয়া বা শিখন মনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। কিন্তু, এই অনুশীলনের সূত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে আমাদের একটা কথা মনে রাখার দরকার, অনুশীলন মানে তোতা পাখীর মত মুখস্থ করা নয়, বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী শুধুমাত্র অনুশীলনের দ্বারা দৃঢ় হয় না, বা হলেও তা খুবই যান্ত্রিক হয়। সুতরাং নূতন আচরণের অনুশীলন প্রয়োগের মাধ্যমে হওয়ার দরকার। নবলব্ধ জ্ঞানকে জীবন পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগের মাধ্যমে চর্চা করতে হবে। তবেই তা কার্যকরী হবে। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে যে ভাবে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করবে, সেইভাবে তাদের চর্চা করার সুযোগ দেওয়া। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রয়োগমূলক কাজের মধ্য দিয়ে চর্চার সুযোগ করে দিলে,শিখন সার্থক এবং তৃপ্তিদায়ক হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীকে জীবনোপযোগী করে গড়ে তোলা, জীবনের সব রকম সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত

অনুশীলনের সূত্রের তাৎপর্য

করে তোলা। আর এই ধরনের প্রয়োগমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করে। তাই অনুশীলনের সূত্র **শিক্ষা-তত্ত্ব মূলক মনোবিদ্যা**(Educational Psychology) এবং **শিক্ষাদর্শনের** (Educational Philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রস্তুতির সূত্রের (Law of Readiness) মূল কথা হ'ল—শিখন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বিষয় বস্তু গ্রহণের উন্মুখতার উপর। প্রস্তুতি বলতে শিক্ষার্থীর দেহ মনের সকল রকম প্রস্তুতিকে বুঝায়। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর দেহ মনের উপযোগী নয়, সে শিক্ষা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে এই প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার বাইরের কিছু অভিজ্ঞতাকে তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে। আবার শুধুমাত্র স্বাভাবিক উন্মুখতার বা পরিমণনের জন্য অপেক্ষা করে বসে না থেকে, শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি আনার জন্য শিক্ষকদের আয়োজন করতে হবে। যদিও দৈহিক পরিমণনের জন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার (Natural process) উপর নির্ভর করতে হয়, তবুও মানসিক প্রস্তুতি শিক্ষক শ্রেণীতে সৃষ্টি করতে পারেন। পাঠদানের আগে শিক্ষক পাঠসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন। এবং যথোপযুক্ত সময়ে বিষয় বস্তু উপস্থাপন করে শিখন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেন।

প্রস্তুতির সূত্রের তাৎপর্য

থর্নডাইকের শিখন-তত্ত্বের সমালোচনা [Ciritical Evaluation of Thorndike's theory of Learning]:

অনেক মনোবিদ্ থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Connectionism) এবং তাঁর শিখনের সূত্রগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং সে গুলোকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে থর্নডাইকের সূত্রগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুল প্রযোজ্য তবুও একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, সে গুলো সবই অসম্পূর্ণ। থর্নডাইকের সংযোজনবাদের মূলে আছে এক শরীরতত্ত্বমূলক বা স্নায়বিক উপাদান ঘটিত ব্যাখ্যা। তিনি উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধন বলতে স্নায়বিক বন্ধনের (Neural connection) কথাই বলেছেন। দুই স্নায়ুকোষের (Neurone) সন্ধি স্থলে (Synapse) যে সংযোগ হয় তার দ্বারা শিখন সম্পন্ন হয়। কিন্তু **ল্যাস্লে** (Lashley), **ফ্রাঞ্জ** (Franz) প্রভৃতি শরীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে এ ধরনের সংযোগের দ্বারা শিখন হয় না; **মনোবিদ্ গেট্‌স** (Gates),

স্নায়বিক ভিত্তির সমালোচনা

সংযোজনবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ (উঃ→প্রঃ) নিছক শরীর-বৃত্তীয় সম্পর্ক নয়। মানসিক প্রক্রিয়া উদ্ভূতও বটে ("While Thorndike,······Others have attempted to translate their psychology into neural theories prevailing at various times, their success in doing so is of no importance to the basic scheme. Stimulus response is a psychological mechanism not a neurological theory.")[1] এছাড়া, থর্নডাইকের প্রধান সূত্র, **ফললাভের সূত্রেরও** (Law of effect) অনেক সমালোচনা হয়েছে। **গাথ্‌রি ও হর্টন** (Guthrie & Horton) থর্নডাইকের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তার থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন অন্যরকম। তাঁদের মনে প্রাণী নিজে কাজ করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পুরস্কার (Reward) অথবা ফল (effect) দরকার হয়, তার কারণ, তা না পেলে শিক্ষার্থী তার কাজ বন্ধ করে দেবে। বা ফলের দ্বারা সেই কাজের পুনরাবৃত্তি বা অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হবে। কিন্তু, শিখন তার পূর্বে সম্পন্ন হয়, প্রথম উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সার্থক সংযোগের মাধ্যমে। কারণ উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্পর্ক স্থাপন হলেই ফল প্রাপ্তির প্রশ্ন ওঠে। এই সংযোগ স্থাপন কোন মতেই ফলের ওপর নির্ভর করে না। **মনোবিদ্ টলম্যান** (Tolman) থর্নডাইকের পরীক্ষার কিছু পরিবর্তন করে লক্ষ্য করলেন যে বাইরে খাবার না দিলেও পাজল্ বক্সের মধ্যে ইঁদুরে শিখন হয়। তাঁর মতে পুরস্কার ছাড়াই আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্ত-শিখন (Laten Learning) সম্ভব, যদিও এই আচরণের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য না করতে পারি। তাই তাঁর মতে ফললাভের সূত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্‌রা (Gestalt Psychologists) মনে করেন, থর্নডাইক তাঁর ফললাভের সূত্র দিয়ে শিখনের একটা অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন মাত্র, তার দ্বারা শিখনের ব্যাখ্যা করা যায় না। শিখন অনেক বেশী সুসমঞ্জস সামগ্রিক প্রক্রিয়া, তাকে শুধুমাত্র ফললাভের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া, ফললাভের সূত্রের বিরুদ্ধে বড় বক্তব্য হ'ল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কিছুই শিখি যা আমাদের কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয়। সুতরাং কেবল মাত্র ফলই যে শিখনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা ঠিক নয়।

ফললাভের সূত্রের সমালোচনা

থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রকেও (Law of exercise) সব ক্ষেত্রে অপরিবর্তিতভাবে মেনে নেওয়া যায় না। শিখন সম্পর্কে এই ধারণা সম্পূর্ণ-

1. Gates & others : Educational Psychology.

রূপে **যান্ত্রিক** (Mechanical)। শিখনের জন্য **মনযোগ** (Attention), **আগ্রহ** (Interest), **চাহিদা** (Need) ইত্যাদিরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে কথা থর্নডাইক তাঁর তত্ত্বের প্রাথমিক সংব্যাখ্যানে স্বীকার করেন নি। আগ্রহ, মনযোগ বর্জিত অনুশীলন থেকে আমরা কোন সময়ে ভাল ফল পেতে পারি না। আবার, অন্যদিকে আগ্রহ থাকলে অনুশীলন ছাড়াই শিখন দৃঢ়তর হয়। তাই অনেক মনোবিদ্ অনুশীলনকে শিখনের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করেন না, কিন্তু চরম আচরণবাদীরা এটাকেই একমাত্র শিখনের সূত্র হিসেবে, বিবেচনা করেন। মনোবিদ্ গ্যারেট (Garrett) বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল বিশ্লেষণ করে, এ সম্পর্কে আধুনিক মনোবিদ্দের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন—অনুশীলনের সূত্র দ্বারা পারদর্শিতা বা দক্ষতা (Skill) অর্জনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না (Exercise is now best regarded as a principle which describes how skill is acquired under certain conditions rather than a cause of learning)।

অনুশীলনের সূত্রের সমালোচনা

প্রস্তুতির সূত্রের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও থর্নডাইক তাকে যে অর্থে বলেছেন, তার বিশেষ কোন তাৎপর্য নাই। তিনি বিশেষভাবে দৈহিক প্রস্তুতি (Physiological readiness condition) কথা বলেছেন। দৈহিক প্রস্তুতি বা পরিমণনের উপর শিখন নির্ভর করে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী নির্ভর করে মানসিক প্রস্তুতির ওপর।

প্রস্তুতির সূত্রের সমালোচনা

এই সব সমালোচনার ফলে এবং পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ থেকে থর্নডাইক তাঁর শিখনের সূত্রগুলোর অনেক পরিবর্তন করেন। পরবর্তী যুগে তিনি বিশেষ করে মানুষের শিখনের উপর পরীক্ষা করেন। এর থেকে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি (Trial & Error method) এবং সেই সংক্রান্ত সূত্রগুলোর অনেক পরিবর্তন করলেন এবং কিছু কিছু নতুন ধারণার সংযোজন করলেন। এই সব ধারণার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল **'সংযুক্তি'র** (Belongingness) ধারণা। এই ধারণা গ্রহণ করে তিনি তাঁর তত্ত্বের যান্ত্রিকতা অনেক অংশে ঘুচিয়ে দিলেন। 'সংযুক্তির' ধারণার দ্বারা তিনি উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার (উঃ→প্রঃ) সম্পর্কের যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করেন। থর্নডাইক বললেন, কোন উদ্দীপক তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বিষয়বস্তুর খণ্ডাংশের সঙ্গে সমগ্রের যে সম্পর্ক আছে (Whole-part relation) এ কথা তিনি স্বীকার করে নিলেন।

থর্নডাইকের সূত্রের পরিবর্তন

এই ধারণা গ্রহণ করার অর্থ হল প্রকারান্তরে **সমগ্রতাবাদকে** (Gestalt theory) মেনে নেওয়া। এছাড়া, পরবর্তীকালে থর্নডাইক শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার (Motivation) গুরুত্বের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Psychology of wants, interest and attitude' বইয়ে তিনি বলেছেন বাইরের পরিবেশের চেয়ে প্রাণীর মনযোগ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন, অভাববোধ ইত্যাদি তার আচরণ নির্ধারণে অনেক বেশী দায়ী। তিনি মন্তব্য করেছেন—"Motives are the basis of selection and confirmation".

এই রূপান্তরের ফলে, থর্নডাইকের শিখনতত্ত্বের অভিনবত্ব আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এত সমালোচনা সত্ত্বেও থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। আর তাদের যথাযোগ্য প্রয়োগ শিখনের হারকে তরান্বিত করে। বিশেষ করে তাঁর ফললাভ ও অনুশীলনের সূত্র বিদ্যালয়ের শিখন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগ্য প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা জাগিয়ে তোলা। আর তা সম্ভব বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে সম্পর্কে বর্তমান বা ভবিষ্যত সুফল লাভের ভাব জাগ্রত করে। শিখনের মূল কথা হ'ল আচরণের পরিবর্তন আর এই পরিবর্তন আনতে হলে অনুশীলন ও ফললাভ দুটোই প্রয়োজন।

আলোচনা

অনুবর্তন (Conditioning):

অনুবর্তন (Conditioning) কথাটা বহু অর্থে ব্যবহার হয়। যে কোন ধরনের অভ্যাস (Habit) বা অর্জিত মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই আমরা অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response) হিসেবে বিবেচনা করি। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক **প্যাভলভের** পর থেকে অনুবর্তনের উপরে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা আজও চলছে। ফলে অনুবর্তন বলতে আমরা বর্তমানে সঠিকভাবে কি বুঝি তা এখনই বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলা যেতে পারে অনুবর্তন (Conditioning) বলতে আমরা বিশেষ এক ধরনের পরীক্ষণের রীতিকেও বলে থাকি এবং এই সব পরীক্ষার ফলে আচরণ সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই তাকেও বলতে পারি। পদ্ধতি হিসেবে অনুবর্তন (Conditioning as a method) সরলতম পরিস্থিতিতে প্রাণীর আচরণের প্রকৃতি অনুশীলন করে। অর্থাৎ, এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন করে। অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপক-পরিস্থিতির (Relatively controlled stimulus situation) মধ্যে প্রাণী কি ভাবে শিক্ষা করে তারই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে অনুবর্তনের তত্ত্বের মধ্যে, তবে একথা বললেও বর্তমানে ভুল

অনুবর্তন কি?

হবে, কারণ অনুবর্তন তত্ত্বের বহু পরিবর্তন হয়েছে। প্যাভলভের পরবর্তীকালে **হল**, (Hull), **স্কিনার** (Skinner) প্রভৃতি এই নীতির অনেক পরিবর্তন করে শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তাই অনুবর্তনকে (Conditioning) **হিল্‌গার্ড** এবং **মার্কুইস্‌** (Hillgard and Marquis) দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্যাভলভের পদ্ধতিকে তাঁরা বলেছেন, অনুবর্তনের প্রাচীন পদ্ধতি (Classical conditioning) এবং তাঁরা পরবর্তী পদ্ধতিগুলোকে বলেছেন, **সক্রিয় অনুবর্তন** (Instrumental conditioing)। **মার্কস্‌** (Marx, Melvin) এই দু'ধরনের অনুবর্তন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"In both cases the adequate stimulus is referred to as a reinforcer but in classical conditioning it is made contingent on another stimulus, which is independent of S's behaviour in instrumental conditioning it is made contingent on a designated response "অর্থাৎ, প্রাচীন অনুবর্তন পদ্ধতিতে শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন (reinforcer) নির্ভর করে অপর উদ্দীপকের উপর। কিন্তু সক্রিয় অনুবর্তনে (Instrumental conditioning) শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন নির্ভর করে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর আচরণের উপর। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে, যদি বিভিন্ন ধরনের অনুবর্তন সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করি।

প্যাভলভ প্রবর্তিত অনুবর্তিত প্রক্রিয়া বা প্রাচীন অনুবর্তনের মতবাদ (Pavlovian condition response or Classical conditioning):

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রথম করেন রাশিয়ান শরীর বিজ্ঞানী **আইভান প্যাভলভ** (Ivan Pavlov)। এই পরীক্ষণের কাজ শুরু হয় প্রায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ঐ বছর প্যাভলভকে চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তবে এই পরীক্ষার সূত্র তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বিভিন্ন পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন। প্যাভলভ প্রথম প্রথম তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন, এবং বাইরে তার প্রচারও খুব কম হয়। কিন্তু ক্রমে তাঁর কাজের ইংরেজী অনুবাদ যখন প্রকাশ পায় তখন পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে আমেরিকান মনোবিদরা তখন অন্তর্দর্শনভিত্তিক মনোবিদ্যার (Introspective Psychology) পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তাঁরা ভাবলেন, এই অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার (Conditioned response) মাধ্যমে অন্ততঃ

সূচনা

মানুষের আচরণের নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অনুশীলন সম্ভব হবে। ঠিক এই সময় মনোবিদ্যায় যে নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছিল, যাকে বলা হয় আচরণবাদ (Behaviourism) প্যাভলভের অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার এক সুযোগ এনে দিল।

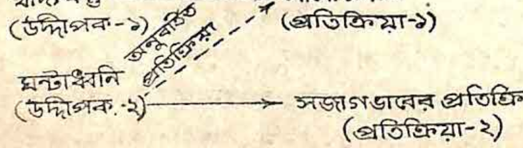
অনুবর্তনের শরীর-তত্ত্বমূলক ভিত্তি

প্যাভলভের অনুবর্তিত প্রক্রিয়া (Condition response mechanism) সম্পূর্ণভাবে শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ প্যাভলভ নিজে ছিলেন শরীর বিজ্ঞানী (Physiologist)। প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা আছে। কোন উদ্দীপক (Stimulus) ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে তার একটা প্রতিক্রিয়া (Response) হয়। সব প্রাণীর ক্ষেত্রে এক একটা উদ্দীপকের জন্য এক একটা স্বভাবজ প্রতিক্রিয়া (Natural response) নির্দিষ্ট আছে। বিশেষভাবে ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার স্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। তারা কোন বিশেষ উদ্দীপকের, বর্তমানে ঠিক একই ভাবে প্রতিক্রিয়া করে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি প্রত্যেক উদ্দীপকের একটা করে নির্দিষ্ট 'আচরণ মূল্য' (Behaviour value) আছে। কারণ যে কোন প্রতিক্রিয়াকে মনোবিদরা আচরণ হিসেবেই বিবেচনা করেন। এ রকম কতকগুলো স্বভাবজ আচরণ নিয়ে মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করে। এগুলোকেই বলা হয় সহজাত আচরণ (Innate behaviour)।

প্যাভলভের পরীক্ষা

প্যাভলভ তাঁর অনুবর্তিত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখালেন, এই সব স্বভাবজ প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণও করলেন। তাঁর যে পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় তা তিনি কুকুরের লালাক্ষরণের উপর করেছিলেন। পরীক্ষাটি খুবই সাধারণ ভাবে আমরা এখানে বিবৃত করব। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে কোনখাদ্যবস্তু রাখলে, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে লালাক্ষরণ (Salivation)। এই লালাক্ষরণ খাদ্যবস্তু জিহ্বার সংস্পর্শে এলে হতে পারে বা বস্তুর গন্ধ বা দর্শন জনিত সংবেদন (Olfactory or visual sensation) থেকে হ'তে পারে। তা'হলে লালাক্ষরণ (Salivation) হ'ল খাদ্যবস্তুর (উদ্দীপক) স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural response)। প্যাভলভ পরীক্ষাগারে কুকুরের লালাক্ষরণ পরিমাপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে, একটা কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু রাখলেন এবং তার লালাক্ষরণের পরিমাণ নির্ণয় করলেন। এরপর, প্রত্যেক দিন এই পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কুকুরের সামনে খাবার দেওয়ার আগে একটা ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। অর্থাৎ, তিনি কুকুরের পরীক্ষাগারে আনার পর

কিছুক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি করলেন এবং সেই ঘণ্টার ধ্বনি শেষ হওয়ার আগেই খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করলেন। কিছু দিন এই ভাবে পুনরাবৃত্তি করার পর দেখা গেল, খাবার দেওয়ার পূর্বেই ঘণ্টাধ্বনি করাতেই কুকুরের লালাক্ষরণ হচ্ছে। প্রথম প্রথম খাবার দেওয়ার পূর্বে ঘণ্টাধ্বনি করলে কুকুরের লালাক্ষরণ হ'ত না, শব্দের দরুন যে স্বাভাবিক সজাগভাবের প্রতিক্রিয়া (Response of alertness) তাই দেখা যেত। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করার ফলে একটা উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এ অবস্থায় কুকুর খাদ্য ছাড়াই শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনিতে লালাক্ষরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। একেই প্যাভলভ বললেন অনুবর্তিত আবর্ত প্রতিক্রিয়া (Conditioned reflex)। কিন্তু এই শিক্ষা লব্ধ প্রতিক্রিয়াকে একেবারে আবর্ত প্রতিক্রিয়া (Reflex action) বলা যায় না। তাই বর্তমানে মনোবিদগণ একে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response) বলে থাকেন বা সংক্ষেপে CR.ও বলা হয়। যেমন, এখানে লালাক্ষরণ হ'ল অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response CR.)। আর যে উদ্দীপকের (Stimulus) সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত ছিল তাকে বলা হয় Unconditioned Stimulus বা সংক্ষেপে US. যেমন এখানে খাদ্যবস্তু এই ধরনের উদ্দীপক। যে কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা বর্তমানে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তাকে বলা হয় অনুবর্তিত উদ্দীপক (Conditioned Stimulus, CS.)। আর এই উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় Unconditioned Response বা UR. এখানে, ঘণ্টাধ্বনি হ'ল অনুবর্তিত উদ্দীপক (CS) এবং সজাগভাবের প্রতিক্রিয়া (Alertness) হ'ল UR. যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তাকেই বলা হয় অনুবর্তিত প্রক্রিয়া বা অনুবর্তন (Conditioned response mechanism or conditioning)। **ড্রিভার** (Drever) তাঁর মনোবিদ্যার অভিধানে এই প্রক্রিয়ার এক সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন—"Conditioning" : a process by which a response comes to be elicited by a stimulus, object or situation, other than that, to which it is the normal or natural response." এই অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নীচের এই ছবির সাহায্যে খুব সহজে বিশ্লেষণ করা যায়।



মনোবিদ **সাইমণ্ড** (Symond) বলেছেন, অনুবর্তন (Conditioning) ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়াও কতকগুলো উদ্দীপক এবং তার উপস্থাপনগত কারণের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, একটি উদ্দীপকের সঙ্গে একটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সংযোগ কতকগুলো সর্ত সাপেক্ষে ঘটে থাকে। এই সর্তগুলো তিনি প্যাভলভ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে নির্দেশ করেছেন।

অনুবর্তনের সর্তাবলী

[এক] যে উদ্দীপকের অনুবর্তন করতে হবে (Conditioned stimulus) সেটা অপর স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditiond stimulus) পূর্বে উপস্থাপন করার দরকার। অর্থাৎ, এখানে ঘণ্টাধ্বনিকে (Sound of the bell) আমরা অনুবর্তন করতে চাই, সুতরাং খাদ্য দেওয়ার আগেই ঘণ্টাধ্বনি করতে হবে।

[দুই] অনুবর্তিত উদ্দীপকের (Conditioned stimulus) অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অপর উদ্দীপককে (Unconditioned stimulus) উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ, ঘণ্টাধ্বনি থাকতে থাকতেই খাদ্য উপস্থাপন করতে হবে। তা নাহলে অনুবর্তন সম্ভব হবে না।

[তিন] অপর উদ্দীপক (Unconditioned stimulus) অনুবর্তিত উদ্দীপকের (Conditioned stimulus) চেয়ে বেশী শক্তিশালী হওয়ার দরকার। তা নাহলে অনুবর্তন সম্ভব হবে না। ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছে, ঘণ্টাধ্বনির চেয়ে খাদ্য বস্তু অনেক বেশী শক্তিশালী উদ্দীপক, তাই ঘণ্টাধ্বনি অনুবর্তিত হয়ে ছিল।

[চার] যে পর্যন্ত না অনুবর্তন ঘটে, সে পর্যন্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় উদ্দীপক একই ক্রমে বার বার উপস্থাপন করতে হবে। পুনরাবৃত্তি অনুবর্তনের একান্ত প্রয়োজনীয় সর্ত।

আমরা প্যাভলভের যে পরীক্ষার বর্ণনা দিলাম, সেই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দীপকের মধ্যে যে কৃত্রিম সংযোগ স্থাপন হয়, সেই অনুবর্তনকে বলা হয় সংযোগাত্মক অনুবর্তন (Positive conditioning)। অর্থাৎ, এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করতে শেখানো হয়। আবার অনুবর্তনের দ্বারা বিপরীত ফলও লাভ করা যায়। বার বার পুনরাবৃত্তিতে বিরূপ ফল লাভ করলে প্রাণী উত্তেজককে উপেক্ষা করতে শেখে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিয়োগাত্মক অনুবর্তন (Negative conditioning)। প্যাভলভ কুকুরের সাহায্যে বিয়োগাত্মক অনুবর্তনও স্থাপন করেন। এই পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটা গোলাকৃতি আলোর মালার এবং আর একটা ডিম্বাকৃতি আলোর মালা ব্যবহার করেন। প্রত্যেকবার গোলাকৃতি আলোর

সংযোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক অনুবর্তন

মালা জ্বলার পর কুকুরকে খাদ্য দিতে লাগলেন। ডিম্বাকৃতি আলোর মালা জ্বালার পর কোন খাবার দেওয়া হ'ল না। এই ভাবে কিছুদিন পুনরাবৃত্তির পর দেখা গেল ডিম্বাকৃতি আলোর মালা জ্বললে কুকুরের লালাক্ষরণ হয় না। এই ভাবে, ডিম্বাকৃতি আলোর মালার প্রতি কুকুরের বিয়োগাত্মক অনুবর্তন হয়।

সংযোগাত্মক বা বিয়োগাত্মক দু'ধরনের অনুবর্তনই চিরস্থায়ী হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ কুকুরকে যদি বার বার ঘণ্টাধ্বনি করার পর খাবার দেওয়া না হয় তাহলে কিছুদিন পর তার আর লালাক্ষরণ হয় না। এই ভাবে অনুবর্তনের বিলোপ ঘটে। এই ধরনের অনুবর্তনের লোপ পাওয়াকে বলা হয় **অপানুবর্তন** (Deconditioning)। তাই অনুবর্তনকে সজীব রাখতে হলে যেই মাত্র তার শক্তি কমে আসছে মনে হবে, তখনই তাকে আবার পূর্ব পরীক্ষামত পুনরাবৃত্তি করার দরকার হয়। অর্থাৎ, অনুবর্তন সক্রিয় থাকা অবস্থায়ই যদি মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হয় তাহলে অপানুবর্তন ঘটে না। এই ভাবে মাঝে মাঝে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াকে সজীব রাখার প্রক্রিয়াকে প্যাভলভ নাম দিয়েছেন **পুনঃসংযোজন (Reinforcement)**।

অপানুবর্তন

প্যাভলভের অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর বহু মনোবিদ তাঁর এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আচরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার প্রয়োগ করেন। এই পরীক্ষার পরিধি এককোষ দেহী প্রোটজোয়া (**Protozoa**) থেকে শুরু করে জটিলতম দেহ যন্ত্রের অধিকারী মানুষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের বিশদভাবে প্রয়োগ করেন আমেরিকান মনোবিদ্ **জে. বি. ওয়াটসন** (J. B. Watson), ওয়াটসনের আগে প্যাভলভের এক ছাত্র **ক্রাসনোগর্স্কি** (Krasnogorski) মানুষের আচরণের অনুবর্তন সম্পর্কে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ওয়াটসনের (Watson) পরীক্ষার পেছনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল। চরম আচরণবাদী ওয়াটসন মানুষের আচরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্যাভলভ প্রবর্তিত অনুবর্তিত প্রক্রিয়াকে কাজে লাগালেন। তিনি বিশেষ ভাবে মানুষের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার (Emotional reaction) কি ভাবে অনুবর্তন হয়, তা পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁর বিখ্যাত **পিটার আলবার্টের পরীক্ষায়** (Peter Albert experiment) তিনি আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার অনুবর্তনের মাধ্যমে কি ভাবে প্রতিস্থাপিত হয়, তা বিশ্লেষণ করে দেখান। তিনি আলবার্ট নামে এক ১১ মাসের ছেলের মধ্যে অনুবর্তনের দ্বারা ভয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। প্রথম পরীক্ষা করে দেখা যায় আলবার্ট বিড়াল,

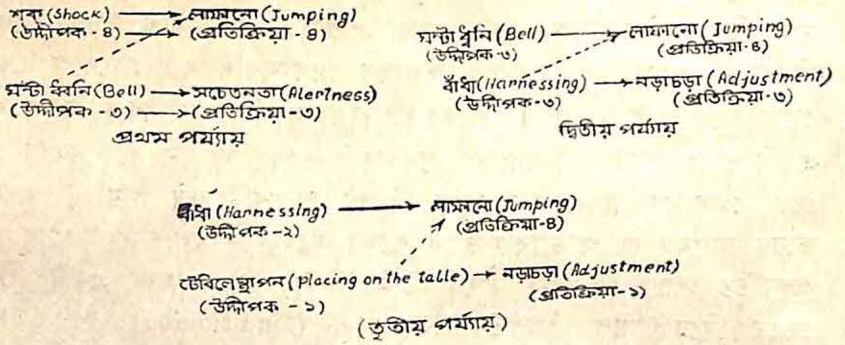
প্রক্ষোভের অনুবর্তন.

ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীকে ভয় করে না। এবং তার সামনে ঐ প্রাণী উপস্থাপন করলে, সে তাদের ধরতে যায়। তাঁর ধারণা ছিল, ছোট শিশুদের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি জোর শব্দের (Loud Sound) দ্বারা জাগিয়ে তোলা যায়। তাই তিনি আলবার্টকে একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে রেখে ইঁদুরটা ছেড়ে দিলেন। আর যখন সে সেটাকে ধরতে গেল অমনি বাইরে থেকে একটা জোর শব্দের সৃষ্টি করলেন। শব্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আলবার্ট ভয় পেল। এমনি ভাবে দু'টো উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি বেশ কিছুদিন ধরে করার পর দেখা গেল যে, ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিলেই আলবার্ট ভয় পায়। অর্থাৎ, ভয়ের আবেগ যা স্বাভাবিক ভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা ইঁদুরের সঙ্গে অনুবর্তিত হয়েছে। একই ভাবে তিনি পিটার নামে আর একটি শিশুর ক্ষেত্রে বিয়োগাত্মক অনুবর্তন (Negative Conditioning) করে তাকে ভয় মুক্ত করেন।

প্রাচীন বা প্যাভলভীয় অনুবর্তনের (**Classical or Pavlovian Conditioning**) উপর নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, এই সব পরীক্ষার মধ্যে শিখনের দিক থেকে **হোলিংওয়ার্থ** (**Holling Worth**) এর একটা পরীক্ষা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটা বিশেষ অভিজ্ঞতার বা প্রতিক্রিয়ার অনুবর্তন বিভিন্ন স্তরের জটিল পরিস্থিতিতে কি ভাবে হয়, তা এর থেকে বোঝা যায়, হোলিংওয়ার্থ মনে করেন যে, অনুবর্তন প্রক্রিয়া জটিল পরিস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে হয়। তিনি এই ধরনের অনুবর্তনের নাম দিয়েছেন '**Telescoping Conditioning**'। হোলিংওয়ার্থ তাঁর **Educational Psychology**' বইয়ে একটা পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি একটা ভেড়াকে ধরে পরীক্ষাগারে টেবিলের উপর রাখলেন (উদ্দীপক-১), তারপর তাকে বাঁধলেন (উদ্দীপক-২), এর পর একটা ঘণ্টা বাজালেন (উদ্দীপক-৩) এবং সবশেষে তাকে একটা বৈদ্যুতিক শক্ (উদ্দীপক-৪) দিলেন। টেবিলে তুলতে ভেড়াটা নড়াচড়া করতে লাগল, (প্রতিক্রিয়া-১), বাঁধার সময় আরও নড়াচড়া করল (প্রতিক্রিয়া-২), এর পর ঘণ্টা বাজাতে সে সচেতন হ'ল (প্রতিক্রিয়া-৩), এবং সবশেষে বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠল (প্রতিক্রিয়া-৪)। তা'হলে এখানে প্র-১, প্র-২, প্র-৩ এবং প্র-৪ যথাক্রমে উ-১, উ-২, উ-৩, উ-৪ উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিছুদিন একই ভাবে করবার পর দেখা গেল, ভেড়াটা ঘণ্টা বাজালেই (উ-৩) লাফায় (প্র-৪)। আরও কিছুদিন পর দেখা গেল তাকে বাঁধতে আরম্ভ করলেই (উ-২), লাফায় (প্র-৪); এবং সবশেষে লক্ষ্য করা যায় ভেড়াটাকে টেবিলে তুললেই (উ-১) লাফাতে আরম্ভ করে (প্র-৪)। এই

টেলিস্কোপিক অনুবর্তন

প্রতিক্রিয়ার অনুবর্তন কি ভাবে হ'চ্ছে তা নীচে ছবিতে দেখানো হ'ল—



এর থেকে দেখা যাচ্ছে সব শেষ পর্যায়ে সুধুমাত্র টেবিলে রাখা মাত্র ভেড়াটা লাফাচ্ছে। অর্থাৎ, বাঁধা, ঘণ্টাধ্বনী, এবং শক্ ইত্যাদি উদ্দীপক এবং লাফানো ছাড়া অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলো আর পরিস্থিতি বা আচরণের অংশ নয়। প্রথম উদ্দীপক এবং শেষ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়েছে। দূরবীণ ফোকাস করলে, তা যে বস্তুর উপর ফোকাস্ করা হয়, তা ছাড়া অন্য গুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তেমনি এই ভেড়ার আচরণের বেলায় অন্যান্য সব প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দীপক সরে গিয়ে সংযোগ প্রথম উদ্দীপক এবং শেষ প্রতিক্রিয়ার (উ-১→ প্র-৪) মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এই অর্থে হোলিংওয়ার্থ এর নাম দিয়েছেন Telescoping conditioning.

প্রাচীন অনুবর্তন বা প্যাভলভের অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব

[Educational Implication of classical conditioning or Pavlov's condition response Theory] :—

প্যাভলভের পর অনুবর্তনের উপর যথেষ্ট পরীক্ষা হয়েছে। প্রাণী, শিশু এমন কি বয়স্কদের আচরণ শিখনের ক্ষেত্রে। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন, যেহেতু অনুবর্তনের দ্বারা কোন উদ্দীপকের সাহায্যে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায় সেহেতু এই তত্ত্ব দ্বারা মানুষের শিখনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্যাভলভ নিজেই বলেছেন, শিক্ষালব্ধ বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস (Habit),

প্যাভলভীয় অনুবর্তনের গুরুত্ব

শিক্ষা (education), শৃঙ্খলাবোধ (discipline), সব কিছুই অবিচ্ছিন্ন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয় ("Different kinds of habits based on training, education and discipline of any sort are nothing but a long chain of conditioned reflexes.")। তবে আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ এই প্রক্রিয়ার উপর এতটা আস্থা প্রকাশ করেন না। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আছে ঠিকই, তবে তা যান্ত্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র। যেমন, শিশুর ভাষা শিক্ষার (Learning of language) প্রথম স্তরের আচরণকে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এবং এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ভাষা শিক্ষাকে সহায়তা করে। তবে, বিদ্যালয়ে, পাঠদানের ক্ষেত্রে আমরা সুসংযত ভাবে অনুবর্তনের ব্যবস্থা না করলেও কিছু শিক্ষা অনুবর্তনের দ্বারা ঘটে থাকে। শিশুর ভুল সংশোধনের মাধ্যমেও অনুবর্তন কাজ করে। তাছাড়া; কিছু অভ্যাসগত কাজ, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, মুখ-হাত ধোয়া, নির্দিষ্ট সময়ে পড়া, খাওয়া ইত্যাদি শিশুরা অনুবর্তনের ফলে শিক্ষা করে। আবার ওয়াট্‌সন যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার অনুবর্তনের কথা বলেছেন, তারও প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, ভয়মূলক আচরণের অনুবর্তনের জন্য কোন কোন সময়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিষয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জাগে এবং তার থেকে দেখা যায় বিশেষ চেষ্টা করলেও সে বিষয়ে আর উন্নতি সম্ভব হয় না। দেখা যায় অনেকে সব বিষয়ে ভাল, কিন্তু অংকে খুব কাঁচা। তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ভয়ের অনুবর্তনই হয়তো তার জন্য দায়ী। ছোটবেলা অংক ঠিক মত কষতে না পারাতে হয়তো মাষ্টারমশায় মারধোর করেছেন, সেই থেকে ভয় অংকের সঙ্গে অনুবর্তিত হয়েছে।

জটিল পরিস্থিতিতে যে পর্যায়ক্রমে অনুবর্তনের কথা হোলিংওয়ার্থ বলেছেন, তারও বিশেষ গুরুত্ব আছে বিদ্যালয়ে। এই ধরনের ক্রমানুবর্তী অনুবর্তন বিদ্যালয়ের কাজেও অনেক সাহায্য করে। শিক্ষার জন্য মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই মনযোগ আনতে হলে, শিক্ষককে প্রথমপ্রথম জোর করে নানা কৌশলের সাহায্যে তা আনতে হয়। শ্রেণীতে ঢুকেই শিক্ষক বিভিন্ন কথার অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন এবং ধীরে ধীরে পাঠোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এমন ভাবে দিনের পর দিন করবার পর লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষকমশায় শ্রেণীতে এলেই ছাত্ররা পাঠে মনযোগী হয়। এই ধরনের শিখন পরিবেশে, শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে যথাযথ উদ্দেশ্য স্থির করে, সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত উদ্দীপকের সাহায্যে তার অনুবর্তন করা। মধ্যবর্তী যে সব উদ্দীপক

টেলিস্কোপিক অনুবর্তনের তাৎপর্য

আর প্রতিক্রিয়া, সর্বশেষ আচরণে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে না তাদের প্রয়োজনের কথাকে অস্বীকার করলে চলবে না। তাদের প্রয়োজন উদ্দেশ্যানুযায়ী অনুবর্তনে সহায়তা করা। এই মধ্যবর্তী উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া শিক্ষক যদি ঠিকমত নির্ধারণ করতে না পারেন তা হলে সার্থক অনুবর্তন সম্ভব হবে না। যেমন, কোন ছাত্র পড়া না পারলে, তাকে যদি ছুটির পর কিছুক্ষণ আটকে রাখা যায়, তাহলে তার কোনদিন পড়া তৈরীর প্রতি আগ্রহ জন্মাবে না। কারণ তাকে যদি কিছুক্ষণ, এমনি আটকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা'হলে তার কাছে সময়টাই হবে গুরুত্বপূর্ণ, পড়া নয়। কিন্তু তাকে যদি বলা হয়, যতক্ষণ পড়া তৈরী না হয় ততক্ষণ থাকতে হবে, তা'হলে তার পড়া তৈরী অভ্যাস হবে এবং সে পড়া তৈরী না করে বিদ্যালয়ে আসবে না। সুতরাং শিক্ষককে অনুবর্তনের জন্য যথাযোগ্য উদ্দীপক বেছে নিতে হবে। তা না পারলে ফল বিপরীত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্যাভলভ প্রবর্তিত অনুবর্তন প্রক্রিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু বিভিন্ন মনোবিদ্ প্যাভলভের এই তত্ত্বকে শিখনের সম্পূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিতে রাজী নয়।

আলোচনা

তাঁরা মনে করেন, অনুবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর শিখন এবং মানুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কিছু যান্ত্রিক অভ্যাস (Mechanical habit) আয়ত্বীকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের সম্পূর্ণ শিখন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা সম্ভব নয়। প্যাভলভের মতবাদ অনুযায়ী উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অনুবর্তন হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কিছু আমরা শিখি যার জন্য পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন হয় না। একবার মাত্র দেখে, সেটা আমরা শিখতে পারি। আবার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, যা চর্চা ছাড়াই বহুদিন মনে রাখতে পারি ; এবং বহুদিন পরে তার প্রয়োগ করতে পারি, তার জন্য মাঝে মাঝে পুনঃসংযোজন (Reinforcement) প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মানুষের শিখন ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কোন ব্যাখ্যা আমরা এই প্রাচীন অনুবর্তনের তত্ত্বের মধ্যে পাই না। তাছাড়া মানুষের প্রত্যেক আচরণই উদ্দেশ্যমুখী এবং তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুধুমাত্র অনুশীলন বা পুনরাবৃত্তির দ্বারা শিখন হতে পারে না। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরও তা নির্ভর করে। কিন্তু অনুবর্তনের মতবাদে তার কোন স্থান নেই। তাই, এই টুকুই আমরা বলতে পারি, মানুষের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক শিখন (Mechanical learning) যেমন—লেখা (Writing), কথা বলা (Speech), টাইপ করা (Typing) ইত্যাদি এই ধরনের অনুবর্তনের দ্বারা হয়ে থাকে। এছাড়াও মানুষের শিখনের আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, এবং সেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের দেহ-মন সামগ্রিক সত্ত্বায় কাজ করে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে

মনোবিদ গ্যারেট (Garrett) যে মন্তব্য করেছেন, তাই উদ্ধৃত করে এই আলোচনা শেষ করছি—"Faith in pavlovian conditioned reflex as fundamental unit of learning is now largely a matter of historical interest. Learning is not as Pavlov thought simply a long chain of conditioned reflexes but it is a co-operative and organising enterprise in which the whole organism takes part."

গাথরির সাযুজ্যের তত্ত্ব
[Guthries Theory of Contiguity] :—

গাথরির প্যাভলভের পথ অনুসরণকে শিখনের যে মতবাদ প্রচার করেন তাকেও আমরা প্রাচীন পন্থী অনুবর্তনের (Classical conditioning) অন্তর্গত বলে বিবেচনা করতে পারি। তাঁর তত্ত্বের মধ্যে পুনঃসংযোজনের (Reinforcement) কোন স্থান নেই। এ দিক থেকে বিচার

সাযুজ্যের তত্ত্ব

করতে গেলে গাথরির তত্ত্ব প্যাভলভের চেয়েও অনেক সহজ এবং সরল। তাঁর মতে শিখন উদ্দীপকের সাযুজ্যের (Contiguity) জন্য যে অনুবর্তন হয় তার দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁর মতে সাযুজ্যের জন্য সংযোগই (Association due to Contiguity) শিখনের একমাত্র কারণ। এবং তার দ্বারা সব রকম শিখনকে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি বলেছেন "A combination of stimuli which has accompanied a movement will on its occurance tend to be followed by that movement." অর্থাৎ গাথরির মতে প্রাণী যখন বিশেষ এক ভাবে প্রতিক্রিয়া করছে, সেই অবস্থায় যদি কোন উদ্দীপক তার উপর প্রতিক্রিয়া করে তবে, পরবর্তীকালে ঐ উদ্দীপকের দ্বারা একই প্রতিক্রিয়া হবে। অর্থাৎ, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সহ অবস্থানের জন্য তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে (Association by contiguity)। প্রথম উদ্দীপক যাই হউক না কেন দ্বিতীয় উদ্দীপকের মধ্যে একই প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। কুকুরের যখন লালাক্ষরণ (Salivation) হচ্ছে (প্রতিক্রিয়া-১), সে যে কারণেই হউক না কেন, সে সময় ঘণ্টাধ্বনি বা অন্য যে কোন উদ্দীপক তাকে উত্তেজিত করলে (উদ্দীপক-২), এই ঘণ্টাধ্বনি বা উদ্দীপক পরবর্তীকালে একই লালাক্ষরণ (প্রতিক্রিয়া-১) করাতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, কুকুরের খাবার পাওয়ার সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দীপকের সংযোগের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেষণা, পুরস্কার ইত্যাদির সঙ্গে শিখনের কোন সম্পর্ক নেই।

গাথরির (Guthrie) এই তত্ত্বকে পরে এস্টেস (Estes) আরও বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং এর মধ্যে কিছু পরিবর্তনও করেন। তিনি মনে করেন কোন জটিল শিখন পরিস্থিতিতে সব উদ্দীপকগুলোই পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শেষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অনুবর্তিত হয়। এস্টেস (Estes) শিখনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে তার গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওয়ায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাই তিনি শিখনের সম্ভাব্যতার (Probability) বা কোন উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগের সম্ভাব্যতা কি হতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে অনুশীলনে তার ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সূত্র (Mathematical Model or Statistical Model) তৈরী করেন। মনে করি কোন সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা একটা উদ্দীপক 'S_1' কে বেছে নিয়েছি অনুবর্তনের জন্য; তাহলে যে কোন পুনরাবৃত্তিতে তার ঈপ্সিত অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া R_1 করার সম্ভাব্যতা হবে $Pn+1 = (1+\theta)\ Pn+\theta$; এখানে, Pn and Pn+1 যথাক্রমে প্রতিক্রিয়া R_1 করার সম্ভাব্যতা n এবং n+1 পুনরাবৃত্তিতে; এবং θ হ'ল শিখনের প্যারামিটার (Parameter) যার মান O থেকে 1-এর মধ্যে। এই ধরনের গাণিতিক মডেল বিশদভাবে আলোচনা না করলে, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে, কিন্তু স্থানের সংকুলানের জন্য এবং আপাততঃ প্রয়োজন নাই বিবেচনা করে বিশদ আলোচনা করলাম না। যদিও এস্টেস, গাথরির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিখনের সম্ভাব্যতার সূত্র (Probability Model) তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন, পরে কিন্তু তিনি গাথরির তত্ত্ব থেকে দূরে সরে যান।

এস্টেস্ এর শিখনের গাণিতিক মডেল

যাই হউক, গাথরির এই তত্ত্বে শিখনকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। মানুষের শিখনকে শুধুমাত্র সাযুজ্যের সংযোগ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রেষণা, ইচ্ছা, অনুরাগ, ইত্যাদি মানসিক অবস্থাগুলোকে বাদ দিয়ে শিখনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাছাড়া যে সাযুজ্যের কথা তিনি বলেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর নিজেরও সন্দেহ ছিল। কারণ, বিভিন্ন পুনরাবৃত্তিতে আমরা সব সময় সামগ্রিক উদ্দীপক পরিস্থিতিকে ঠিক রাখতে পারি নি। পারিপার্শ্বিকের কিছু পরিবর্তন হবেই। এবং এই পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন শিক্ষার্থীর বিশেষ উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণকেও (Perception) পরিবর্তন করতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় তিনি তাঁর সাযুজ্যের তত্ত্বের (Contiguity theory) মূল বক্তব্যে "Tend to be followed" বা 'অনুসরণ করার প্রবণতা' দেখা যাবে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আলোচনা

মৌলিক দিক থেকে প্যাভলভের তত্ত্বের সঙ্গে গাথরির তত্ত্বের বিশেষ কোন তফাত নাই। সে হিসেবে এই তত্ত্বকে প্যাভলভের তত্ত্বেরই সরলতম রূপ বলা যায় এবং মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে তার সীমিত প্রয়োগ সম্ভাবনা আছে।

সক্রিয় অনুবর্তন
[Instrumental Conditioning] :—

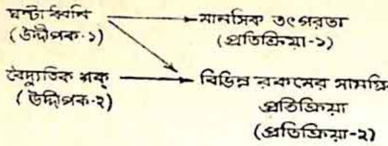
সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হ'ল অনুবর্তনের জন্য প্রাণীর সক্রিয়তা। প্রাচীন বা প্যাভলভীয় অনুবর্তনের (Classical or Pavlovian conditioning) চেয়ে সক্রিয় অনুবর্তনের তত্ত্বে ফলপ্রাপ্তি (Reward), পুনঃ সংযোজকের (reinforcer) উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন বিশেষ চাহিদার পরিতৃপ্তি (need satisfaction), বিরক্তিকর পরিস্থিতির পরিত্যাগ (avoidance of annoying affairs), বিশেষভাবে সক্রিয় অনুবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে থর্নডাইকের সংযোজনবাদকেও সক্রিয় অনুবর্তনের তত্ত্বের অন্তর্গত করা যায়। অবশ্য থর্নডাইক পরবর্তীকালে প্যাভলভের অনুবর্তনের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটা তাঁর অনুসঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রে (Law of associative shifting) দেখতে পাই। সাক্রিয় অনুবর্তনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে অনুবর্তনের জন্য কেবলমাত্র উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগ (Stimulus response association) বা উদ্দীপকের সাযুজ্যই প্রধান নয়। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগের পেছনে যে শক্তি যোগায়, সেই ক্রিয়াশীল উপাদান হ'ল শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা।

সক্রিয় অনুবর্তন কি?

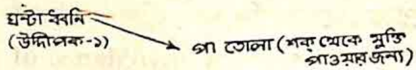
একটা কুকুরকে খাঁচার মধ্যে রেখে তার পায়ে বৈদ্যুতিক শক্ দিলে সে পা-নাড়ে, বা লেজটা পেছনের পা দুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, বা বাইরে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। এখন প্রতিবার বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়ার পূর্বে যদি ঘণ্টা বাজানো হয়, তা হলে দেখা গেছে, কুকুরটা সামগ্রিক ভাবে পূর্ববৎ ঘণ্টার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। কিন্তু আরও পুনরাবৃত্তি করলে লক্ষ্য করা যায়, অপ্রয়োজনীয় সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে চলে যায় এবং তখন কুকুরটা ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে শক্ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পা তুলে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে

সক্রিয় অনুবর্তনের পরীক্ষা

শক্ (Shock)-এর প্রত্যাশা করে (anticipates) এবং সেটার থেকে মুক্তি পেয়ে পুরস্কৃত হয়। সক্রিয় অনুবর্তনকে আমরা নিম্নরূপে পরিবেশন করতে পারি।



[এই পর্যন্ত প্যাভলভের অনুবর্তনে বলা হয়েছে, কিন্তু সক্রিয় অনুবর্তনের আর একটা স্তর আছে, যেখানে, মানসিক সক্রিয়তায় যথাযথ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অনুবর্তনের ফলে, ফল প্রাপ্তি হচ্ছে। সুতরাং আরও পুনরাবৃত্তির ফলে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার অনুবর্তন হ'চ্ছে]



সক্রিয় অনুবর্তনকে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দু-একজনের তত্ত্বের কথা আমরা উল্লেখ করব। যাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মানাসিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হ'লেন—স্কিনার (Skinner), হাল (Hull) এবং ডোলার্ড ও মিলার (Dollard & Miller) প্রধান।

স্কিনারের রি-ইনফোর্সমেণ্টের তত্ত্ব
[Re-inforcement Theory of Skinner] :—

স্কিনারের মতবাদ

স্কিনার (Skinner, B. F,) থর্নডাইকের মত এক ধরনের পাজল বক্স (Puzzle Box) নিয়ে ইঁদুর, পায়রা প্রভৃতি প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁর যান্ত্রিক ব্যবস্থা (Mechanical device) থর্নডাইকের চেয়ে অনেক সরল ছিল। তাঁর বাক্সের মধ্যে একটা মাত্র সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ ছিল, যেটা করলে প্রাণী পুরস্কার পাবে। স্কিনারের বাক্সে (Skinner's Box) একটা লিভার বা বোতাম ছিল যা টিপলে বা চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী তার ইপ্সিত বস্তু তার সামনে এসে পড়ে। তিনি থর্নডাইকের মত

ইঁদুরকে ভেতরে রেখে তার শিখন প্রক্রিয়া অনুশীলন করেন। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত থর্নডাইক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। থর্নডাইক বলেছিলেন, যে প্রত্যেক পুনরাবৃত্তিতে পাজল বক্স থেকে বেরিয়ে আসতে বিড়ালের সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগছিল। কিন্তু স্কিনার দেখলেন, একবার ইঁদুর ঠিকভাবে লিভারটায় চাপ দিতে পারলে, পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে তার দক্ষতার উন্নতি হয় না। এর থেকে তিনি অনুবর্তন সম্পর্কে এক নতুন ধারণা দিলেন। যদিও অনেকদিন ধরে তিনি পরীক্ষা করে ছিলেন, তবু ১৯৩৮-এর অনুবর্তন সংক্রান্ত তাঁর নতুন তথ্য প্রকাশ করেন।

অপারেন্ট ও রেস্পনডেন্ট

তাঁর মতে আচরণ (Behaviour) দু'ধরনের। কতকগুলো আচরণ, যার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপক সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে (it includes all those involuntary responses that depend on a known stimulus for their occurance) এদের তিনি নাম দিলেন রেসপন্‌ডেণ্ট (Respondent)। আর এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ আছে, যাকে আমরা নির্দিষ্টভাবে কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না (the remaining are responses that cannot be correlated with any definite stimulus) এদের স্কিনার নাম দিয়েছেন অপারেণ্ট (operant)। স্কিনার বলেছেন, প্রাচীন অনুবর্তনে বিশেষ ভাবে রেসপনডেণ্টের (Respondent) গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এখানে একটা উদ্দীপক শক্তি জোগায় (Re-inforcer) অর্থাৎ, উদ্দীপকই শক্তিদায়ক সত্বা (re-inforcer) হিসেবে কাজ করে। যেমন—প্যাভলভের পরীক্ষায় খাদ্য (উদ্দীপক-২) হ'ল শক্তিদায়ক বস্তু যা লালাক্ষরণের সঙ্গে ঘণ্টা ধ্বনির সংযোগ স্থাপন করেছে। কিন্তু স্কিনারের মতে সক্রিয় অনুবর্তনে উদ্দীপক শক্তি জোগায় না। এখানে শক্তিদায়ক সত্বাকেই (Re-inforcer) প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অথাৎ, স্কিনারের মতে অনুবর্তন হয় একটা উদ্দীপক এবং বিশেষ ভাবে আচরণ করার প্রবণতার মধ্যে; উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নয়। প্রতিক্রিয়া এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফলের মধ্যে সম্পর্ক থাকে, যাকে স্কিনার বলেছেন 'Contingencies of re-inforcement'। তার দ্বারাই অনুবর্তনের প্রকৃতি নির্ণীত হয়। কোন আচরণ বা প্রতিক্রিয়াকে অনুবর্তন করার জন্য উদ্দীপকের প্রকৃতি জানার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, জানা দরকার সেই আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার ফলের প্রকৃতিকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের এই মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মত

অনুযায়ী শিক্ষক্ষেত্রে ফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কোন আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই হবে, যখন, তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠ্যবস্তু শিখনের বেলায় আমাদের এই শক্তি-দায়ক সত্বা (Reinforcer) প্রত্যেক শিখনের পর শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। কিন্তু গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতিতে তার বিশেষ সুযোগ নাই। তাই স্কিনার প্রোগ্রাম পদ্ধতি (Programmed instruction) বা স্বয়ং শিক্ষার (auto instruction) কথা বলেছেন। এবং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন (Teaching Machine), ফলে স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন কৌশল গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় শিক্ষা-শিল্প (Instructional Technology)। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার এখানে আর সুযোগ নাই।

স্কিনারের তত্ত্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎপর্য

হালের সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের তত্ত্ব [Hull's Systematic Behaviour Theory] :—

হালের তত্ত্ব, একদিকে প্যাভলভ এবং অন্যদিকে থর্নডাইকের মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। তিনি বিশেষ করে প্রাচীন অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তাঁর মতে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ তাদের সঙ্গে প্রাণীর গরজের (drive) সম্পর্কের দ্বারা নির্ণীত হয়। এই সংযোগের (Connection) পুরস্কার বা ফলের (Reward) সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। গরজ (Drive) বলতে আমরা বুঝি, প্রাণীর কোন বিশেষ দৈহিক বা মানসিক চাহিদার (Biological or Psychological need) দরুন যে আভ্যন্তরীণ অসাম্য অবস্থাকে (A drive is a state of tension arising from a person's biological or psychological needs), আর পুরস্কার (Reward) বলতে তাকেই বুঝি যা কোন চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে বা তাড়নাকে নিবৃত্তি করে (Reduces the derive)। হালের (Hall) মতে, প্রাণীর মধ্যে যখন গরজের দরুন অসাম্য অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তখন অনেক উদ্দীপক তাকে উত্তেজিত করে এবং তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কিছু কিছু উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোগ, প্রাণীর তাড়না নিবৃত্তিতে সহায়তা করে এবং তার চাহিদা চরিতার্থ হয়। এবং এই ভাবে সেই সব উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সংযোগ পুরস্কৃত হয় চাহিদার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে। ফলে ঐ সব সংযোগগুলো দৃঢ়তর হয়। হালের এই মতবাদ বিশ্লেষণ করলে

হালের তত্ত্বের মূল ভিত্তি

আমরা লক্ষ্য করি, থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের (Law of effect) সঙ্গে এর কোন তফাত নাই। অন্যদিকে হাল (Hull) বলেছেন, চাহিদা পরিতৃপ্তির মাধ্যমে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ দৃঢ়তর হয়, সে সংযোগ সব সময় যে স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘটে থাকবে তা নয়, অস্বাভাবিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগও হ'তে পারে। এবং ঐ ধরনের সংযোগ প্রাণীর শিখন, প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। সুতরাং, যেহেতু, তিনি কৃত্রিম উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক সম্পর্কে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেহেতু বলা যেতে পারে, প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তনের তত্ত্বের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ নেই। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, আমেরিকার মনোবিজ্ঞান সমিতির (American Psychological Association) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন "(The Pavlovian conditioned reaction and the Thorndikian associative reaction are special cases of the operation of the same principle of learning." হাল (Hall) শিখনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণীর আচরণ ও শিখন সংক্রান্ত আটটি সংজ্ঞা এবং ছয়টি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করেছিলেন। এবং এইগুলোর দ্বারা তিনি শিখন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছেন।

হালের তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্য

যাই হউক, হালের (Hull's) এই তত্ত্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তিনি অনুবর্তনকে শিখনের কৌশল হিসেবে মেনে নিলেও, শিক্ষার্থীর চাহিদা (Need), তাড়না (Drive) বা পুরস্কার (Reward) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে, পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সেই চাহিদা পূরণে আগ্রহী করা। শুধুমাত্র যথাযোগ্য উদ্দীপক বা পাঠ্যবস্তু উপস্থাপন করে চর্চার দ্বারা অনুবর্তন করতে পারলে শিক্ষা হবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র যান্ত্রিক অভ্যাস (Mechanical Habit) তৈরী করা নয়। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন চাহিদা পরিতৃপ্তি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আরও নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় সে দিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। তবেই শিখন হবে গতিশীল। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সার্থক।

মোওরারের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
[Mowrer's Two-factor theory] :—

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মোওরার (Mowrer) দু-ধরনের অনুবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য

বিধান করে এক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অবশ্য সামঞ্জস্য বিধান বলা চলে না। তিনি প্রাচীন পদ্ধতির অনুবর্তন (classical . conditioning) এবং সক্রিয় অনুবর্তন (Instrumental conditioning) উভয়কেই মেনে নিয়েছেন এবং আচরণের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। তিনি এই দু-ধরনের অনুবর্তনকে দু-পদ্ধতিতে শিখনের প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্রাচীন অনুবর্তন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system) কাজ করে এবং চাহিদা পরিতৃপ্তির মাধ্যমে অনুবর্তন হয়। সাধারণতঃ কোন প্রাথমিক চাহিদা (Primary need) বা অর্জিত চাহিদা (acquired need) চরিতার্থের জন্য এ ধরনের শিখন হ'য়ে থাকে। অপরদিকে সক্রিয় অনুবর্তনে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system) কাজ করে এবং বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভমূলক অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ, সক্রিয় অনুবর্তনে প্রাণীর কোন আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার শিখন হয় না। সে শেখে ফলের প্রত্যাশা।

মোওরারের সামঞ্জস্যপূর্ণতত্ত্ব

মোওরারের তত্ত্বের দ্বারা আমরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে কেন শিক্ষা করি, তা অনেকাংশে ব্যাখ্যা করতে পারি। যদিও প্রেষণা এবং তৃপ্তিদায়ক পরিস্থিতিকে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও দেখা গেছে, আমরা অনেক কিছু শিক্ষা করি যা সব সময়ে আনন্দদায়ক নয়। অনেক সময় বাধ্য হয়ে ভয়ে বিদ্যালয়ের শিশুরা শিক্ষা করে। এই ধরনের শিক্ষাকে আমরা এই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। কারণ ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিকে দূর করার জন্যও অনুবর্তন হয়ে থাকে এবং তার ফলে শিখন হয়।

মোওরারের তত্ত্বের গুরুত্ব

অনুবর্তন সম্পর্কে প্যাভলভের পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু শিখনের সমস্যার সমাধান আজও সম্পূর্ণ ভাবে হয় নি। যান্ত্রিক প্রাচীন অনুবর্তন (Mechnical classical conditioning) থেকে শুরু করে সক্রিয় অনুবর্তন পর্যন্ত যত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনটাই সম্পূর্ণভাবে মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোবিদ অনেক আশা নিয়ে তাদের মতবাদ প্রচার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আবার তা পরিত্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তনের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষা

অনুবর্তন সম্পর্কে আলোচনা

ব্যাবস্থাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই তত্ত্বের সম্ভাব্যতার উপর স্কিনার নিজেই এত আস্থাবান ছিলেন যে তিনি এক সময়ে বলেছেন—"A programme of cultural design in the broadest sense is now within reach. ...The new principles (principle of reinforcement) and methods of analysis (programmed learning) which are emerging from the study of reinforcement may prove to be among the most productive social instruments of the twentieth century." কিন্তু সেও অতীতের ঘটনা। এই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ আজও আমরা দেখতে পাই নি।

সমগ্রতাবাদ
[Field theory of Learning] :—

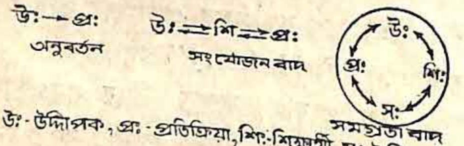
সমগ্রতাবাদ কি?

সাধারণতঃ সমগ্রতাবাদ (Field theory) বলতে গেস্টাল্ট (Gestalt) মতবাদ এবং তার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মতবাদকে বলা হয়। সমগ্রতাবাদ (Field theory) আধুনিক মনোবিদ্যায় এক উল্লেখ-যোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্‌গণ বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গীতে। এই মতবাদের মূল কথা হ'ল—প্রত্যক্ষণের (Perception) বিষয়বস্তু আমাদের সামনে এক সামগ্রিক রূপ নিয়ে আসে। তার বিভিন্ন অংশকে বিশ্লেষন করলে আমরা সেই সামগ্রিক সত্ত্বার অস্তিত্ব খুঁজে পাব না। কোন একটা বিশেষ ফুলের অভিজ্ঞতা পেতে হ'লে তার বিভিন্ন অংশগুলো খুলে খুলে দেখলে পাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ টা এক সঙ্গে দেখতে হবে। আর তার সামগ্রিক রূপ নির্ভর করছে বিভিন্ন অংশগুলোর সংগঠনের (Organisation) উপর। এই মনোবিদ্‌গণের মতে বস্তুর সমগ্রতার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা তার অংশ-গুলোর মধ্যেই নেই। এবং কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ তার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই একে "Field theory" বলা হয়।

শিখন ও সমগ্রতাবাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে সমগ্রতাবাদীগণ শিখন পরিস্থিতিকে একটা ঘেরা মাঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং এই মাঠের বিভিন্ন অংশগুলো—(ক) বিভিন্ন উদ্দীপকের অবস্থিতি; (খ) ঐ সব উদ্দীপকের অর্থপূর্ণ সমন্বয় (Meaningful organisation of those stimuli); (গ) শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া যা শিখন পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীর উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন

আনতে পারে, এবং (ঘ) শিক্ষার্থীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। এই অংশগুলো পরস্পরের উপর পরস্পর নির্ভরশীল। পরিস্থিতির মধ্যেকার যে বিভিন্ন উদ্দীপক আছে, শিক্ষার্থী যখনই প্রতিক্রিয়া করার জন্য বিশেষ কয়েকটা বেছে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে তা তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনে, এব সমগ্র পরিস্থিতির ভারসাম্য (Equilibrium) নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে প্রতিক্রিয়া (Response) অবসম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া করতে হয়। এই প্রতিক্রিয়া নিছক একটা ফল (Product) নয়। কারণ এই নতুন প্রতিক্রিয়া শিখন পরিস্থিতির মধ্যে আবার পরিবর্তন আনে; আর তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য আবার প্রতিক্রিয়া করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে চক্রাকারে চিরন্তন পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে এই মতবাদ অনুযায়ী, চির পরিবর্তনশীল পরিবেশে পরস্পর ক্রিয়াশীল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে আচরণের যে সংগঠন ও পুনর্সংগঠন সাধিত হচ্ছে তাই হ'ল শিখন (Learning is the organisation and re-organisation of behaviour which results from the many interacting influences on the developing organism acting in its shifting environment)। এই মতবাদ অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার মতবাদ বা সংযোজনবাদের ঠিক বিপরীত। ঐ সব মতবাদে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই সমগ্রতাবাদী মনোবিদগণ ঐ সব মতবাদকে আনবিক মতবাদ (Molecular view) হিসেবে সমালোচনা করেছেন। মনোবিদ বার্ণার্ড (Barnard) এই তিনটি মতবাদের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনুবর্তনে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; সংযোজনবাদে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যক্তির অবস্থার দ্বারা নির্ণীত হয়, আর সমগ্রতাবাদে, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি-সকলের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বার্ণার্ড নীচে আঁকা ছবির অনুরূপ ছবির সাহায্যে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।



উ:-উদ্দীপক, প্র:-প্রতিক্রিয়া, শি:-শিক্ষার্থী, স:-উদ্দীপনার সমন্বয়

এই সমগ্রবাদের তত্ত্বগুলোর মধ্যে প্রধান এবং আদি তত্ত্ব হ'ল গেস্টাল্ট মতবাদ। পরবর্তীকালে এই মতবাদের কিছু পরিবর্তন হয়েছে, ফলে কিন্তু নতুন নতুন তত্ত্বেরও অবতারণা করা হয়েছে। তাই সমগ্রতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, প্রথম গেস্টাল্ট মতবাদীদের কথা উল্লেখ করতে হয়।

পরে আমরা এর কিছু পরিবর্তন যেমন—কার্ট লিউইন এর তত্ত্ব এবং টলম্যানের তত্ত্ব সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করব।

শিখনের গেস্টাল্ট মতবাদ
[Gestalt theory of Learning] :—

গেস্টাল্ট (Gestalt) শব্দের অর্থ হ'ল প্যাটার্ণ বা অবয়ব। এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি অনুশীলন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্দিমার (Wertheimer), কফ্কা (Koffka), কোহলার (Kohler), এই তিনজন জার্ম্মান মনোবিদের পরীক্ষার ফলে এই মতবাদ গড়ে ওঠে। শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন কোহলার। বিশেষভাবে তাঁরই পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে গেস্টাল্টবাদীদের শিখনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সেই সব পরীক্ষার কয়েকটা উল্লেখ করলে গেস্টাল্টবাদীদের শিখন সম্পর্কে বক্তব্য বুঝা যাবে। শিখন যে পরিস্থিতির অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় না। সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্ণীত হয়, তাই প্রমাণিত হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায়।

সূচনা

কোহলার মুরগীর (Chiken) নতুন আচরণ শিখনের উপর সুন্দর পরীক্ষা করেন। তিনি দুটো একই আকারের দুটো কাঠের বাক্স নিয়ে একটার উপর হালকা কালো কাগজ (Black Paper) লাগালেন (ক বাক্স) এবং অপরটায় ধূসর রঙের কাগজ (Grey Paper) লাগালেন (খ বাক্স)। এইরকম দুটো বাক্স একটা তারের জালের সামনে রেখে তার উপর কিছু খাবার ছিটিয়ে দিলেন। তারের জালের অপরদিকে মুরগীগুলোকে রাখলেন। বাক্সগুলো এমন ভাবে রাখা হ'ল যাতে মুরগীগুলো তারের জালের মধ্য দিয়ে ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবারগুলো খেতে পারে। এরকম অবস্থায় মুরগীগুলো যখনই অপেক্ষাকৃত কালো বাক্সটায় (ক-বাক্স) খেতে যায় তখনই তাদের একটু খেতে দিলেন, কিন্তু ধূসর বাক্সটায় (খ-বাক্স) খেতে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তাদের সরিয়ে দেওয়া হ'ত। বাক্স দুটোর অবস্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন মুরগীর ক্ষেত্রে ৪০০ থেকে ৬০০ বার পুনরাবৃত্তি করার পর দেখা গেল মুরগীগুলো কালো বাক্সকে (ক-বাক্স) থেকে খাবার গ্রহণ করতে শিখেছে। অর্থাৎ এখন তারা খ বাক্সের দিকে যায় না। এরপর কোহলার, খ-বাক্সটা বা ধূসর রঙের কাগজে মোড়া বাক্সটার বদলে ঘন কালো কাগজ মোড়া কাঠের বাক্স দিলেন।

কোহলার-এর মুরগী নিয়ে পরীক্ষা

এই বাক্সের কাগজটা ক-বাক্সের কাগজের চেয়ে বেশী কালো (গ-বাক্স)। এই নতুন পরিস্থিতিতে ঐ সব মুরগীগুলোর আচরণ কোহলার পর্যবেক্ষন করলেন। তিনি দেখলেন মুরগীগুলো অপেক্ষাকৃত কাগজ লাগানো নতুন বাক্সের (গ-বাক্স) থেকে শতকরা ৭০ বার যাওয়ার চেষ্টা করছে। মুরগীর এই আচরণ লক্ষ্য করে কোহলার বললেন মুরগীর মত বিচারবুদ্ধিহীন প্রাণীও শিখন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে এবং তারা 'অপেক্ষাকৃত কালো (Darker of the two) সম্পর্কযুক্ত বাক্সের দিকে যেতে শিখেছে। তিনি তাঁর এই পরীক্ষা শিম্পাঞ্জী এবং দু'বছরের শিশুদেরও নিয়ে করেন এবং একই ফল পান। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সকল প্রাণী এমন কি মানুষও পরিবেশের প্রতি সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং পরিস্থিতির সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার করে প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করে বা শেখে (Some structural functions in the Chimpangee and in chiken—Kohler)।

এ ছাড়া কোহলারের বিখ্যাত পরীক্ষা হ'ল শিম্পাঞ্জীদের উপর। তিনি এইসব পরীক্ষা করেন ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। স্থান ছিল আফ্রিকার উপকূলে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত তেনিরিফ (Tenerife) নামে ছোট এক দ্বীপে। একটা পরীক্ষায় তিনি একটা শিম্পাঞ্জীকে সকালবেলা কোন কিছু খেতে না দিয়ে একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকালেন। তার খাঁচার মধ্যে ওপর থেকে খাদ্যবস্তুটা ঝুলিয়ে রাখা হ'ল এবং খাঁচার মধ্যে খাদ্যবস্তু থেকে দূরে এক কোণে একটা কাঠের বাক্স ফেলে রাখা হ'ল। এই বাক্সটা এমন উঁচু ছিল যে সেটাকে খাদ্যবস্তুর ঠিক নীচে এনে রেখে শিম্পাঞ্জীটা তার উপর দাঁড়ায় তা হ'লে খাদ্যবস্তুটা পাড়তে পারে। এ রকম পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কোহলার শিম্পাঞ্জীটার আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেন। শিম্পাঞ্জীটা প্রথম অনেক চেষ্টা করল, লাফিয়ে খাদ্যটাকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুতেই তার কাছে পৌছাতে পারলো না। বাক্সটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তার উপরে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই যখন খাদ্যবস্তুর কাছে পৌছতে পারলো না, তখন হতাশ হ'য়ে শিম্পাঞ্জীটা বসে রইল। তখন কোহলার নিজে খাঁচার মধ্যে ঢুকলেন। বাক্সটা খাদ্যবস্তুর কাছে টেনে আনলেন এবং তার উপর দাঁড়িয়ে খাদ্যবস্তুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। পরে বাক্সটাকে আবার যথাস্থানে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শিম্পাঞ্জীটাও বাক্স টেনে নিয়ে অনুরূপ-ভাবে খাদ্যবস্তুটা পেড়ে নিল। যখন শিম্পাঞ্জীটা এইভাবে খাদ্য পাড়ার চেষ্টা করছিল, তখন অন্যান্য শিম্পাঞ্জীগুলোকে এনে কোহলার খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখাতেন তার কাজ। এবং পরপর এক একদিন, একটা করে

কোহলার এর শিম্পাঞ্জীর পরীক্ষা

শিম্পাঞ্জীকে ঐ ভাবে ভেতরে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, তারা কোন ঈঙ্গিত ছাড়াই নিজেরা সমস্যার সমাধান করতে পারে। এর পর তিনি এক দিন অপেক্ষাকৃত বোকা একটা শিম্পাঞ্জীকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঐ শিম্পাঞ্জী বহুদিন ধরে, তার সংগীদের সমস্যা সমাধান করতে দেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিম্পাঞ্জীটা কিছুই শেখে নি, বাক্সটা যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকেই লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। এই সব পরীক্ষা থেকে, কোহলার সিদ্ধান্ত করলেন যে শিখনের জন্য পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীন সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করার দরকার। প্রথম ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জীকে তিনি না দেখিয়ে দেওয়া পর্যন্ত, সে বুঝতে পারে নি, খাদ্য বস্তুর পাওয়ার সঙ্গে বাক্সের কি সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু একবার দেখিয়ে দেওয়ার পর তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বোকা শিম্পাঞ্জীটা তার নিজের বুদ্ধির দ্বারা বাক্স এবং লাফানো ছাড়া, অন্য কোন কিছুকেই সামগ্রিক আচরণের অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারে নি। তার সামগ্রিকতার বোধ আসে নি বলে, সে সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

কোহলার এর শিম্পাঞ্জীর পরীক্ষা

কোহলার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেন 'সুলতান' নামে এক বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে। তিনি সুলতানকে খাঁচার মধ্যে রাখেন এবং দুটো বাঁশের লাঠিও তার সঙ্গে রাখেন। লাঠি দুটোর একটা মোটা আর একটা সরু। এবং একটার ভেতর আর একটা ঢুকিয়ে দুটোকে জোড়া দেওয়া যায়। খাঁচার বাইরে এমন দূরত্বে খাদ্যবস্তু রাখা হ'ল যাতে করে দুটো লাঠি জোড়া দিলে তবেই খাদ্যবস্তুকে কাছে টেনে আনা যায়। এমত অবস্থায়, সুলতান প্রথমে পর পর আলাদাভাবে দুটো লাঠি দিয়ে খাদ্যটা টানার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন লাঠিই খাদ্যবস্তুর কাছ পর্যন্ত পৌছাল না। পরে একটা লাঠি দিয়ে আর একটাকে ঠেলা দিল তাতে করে লাঠিটা খাদ্যবস্তুর কাছে পৌছাল বটে কিন্তু খাদ্য টানা গেল না। এভাবে বহুবার চেষ্টা করার পর যখন কিছুই ফল হ'ল না তখন শিম্পাঞ্জীটা খাদ্যের আশা ছেড়ে দিল। তখন কোহলার বড় লাঠিটা নিজে নিয়ে তার তলার দিকটায় আঙুল ঢুকিয়ে সুলতানকে একটা সংকেত দিলেন। কিন্তু, সে সংকেত সুলতান বুঝতে পারে নি। সে লাঠি দুটো নিয়ে খেলা করতে লাগল। কিন্তু, খেলতে খেলতে হঠাৎ, সে সরু লাঠিটা বড় লাঠির মধ্যে হঠাৎ একবার ঢুকিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ঐ জোড়া লাঠি দিয়ে খাবারটা টেনে নিল। এর পরবর্তী পরীক্ষায় সুলতান আর বিশেষ কোন চেষ্টা না করেই সমস্যার সমাধান করতে পারল (Kohler—The mental.ty of apes)।

এই সব পরীক্ষার ফল থেকে সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করলেন যে

প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাণীরা ভুল প্রচেষ্টার পদ্ধতির মাধ্যমে শেখে না। শিখন বিচার বিবেচনাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকরূপ উপলব্ধি হওয়ার ফলেই প্রাণীরা সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই উপলব্ধি হঠাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যে আসে। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকতার হঠাৎ এই প্রত্যক্ষণকে গেস্টাল্ট মনোবিদগণ বলেছেন অন্তর্দৃষ্টি (Insight)। অন্তর্দৃষ্টিকে এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। যখন সমস্যামূলক পরিস্থিতির পূর্ণরূপ মনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং খণ্ডাংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমস্যার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় তখন তাকে বলে অন্তর্দৃষ্টির (Insight)। **হার্টম্যান** Hartmann বলেছেন "*Insight is really a kind of sight⋯a mode of perception. ⋯it is the internally apprehended correlate of the closing of an incomplete configuration whose very incompleteness has produced the problem initially be keeping the learner in a state of tension.*" অবশ্য আদি গেস্টাল্ট পন্থীরা বলেছিলেন, সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে, এবং সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে অংশের সম্পর্কের হঠাৎ প্রত্যক্ষণকে (Sudden perception) অন্তর্দৃষ্টি বলেছিলেন। কিন্তু আধুনিককালে মনোবিদগণ যেমন, **হিলগার্ড** (Hillgard), **বার্ণাড** (Barnard) প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অন্তর্দৃষ্টি, হঠাৎ প্রত্যক্ষণ নয়, এটা ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যমুখী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এর বিকাশ হয়। বার্ণাড (Barnard) বলেছেন—"*The perception of a functional relationship between various factors or phenomena in a problem situation. Often thought to be sudden, but actually the result of a continuous growth and development.*"

অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিখন

গেস্টাল্ট মনোবিদগণ বলেছেন, অন্তর্দৃষ্টিই শিখনের মূল কথা। অন্তর্দৃষ্টির জন্য সামান্যীকরণ (generalization) এবং পৃথকীকরণ (differentiation) এই দুই প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে পৃথকীকরণের ক্ষমতা যেমন নতুন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণও দরকার। কোন কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে শিক্ষার্থীর মধ্যে এক অতৃপ্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন শিক্ষার্থী তার এই অস্বস্তিকর অবস্থার সমাধানের জন্য পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশকে বিশ্লেষণ করে, তার মধ্যেকার সমধর্মী গুণকে গ্রহণ করে। এর ফলে তার সামনে সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জীবন বিকাশের মূলেও একই ধর্ম কাজ করছে। তাই এই সংব্যাখ্যানে শিখন হ'ল জীবন বিকাশের একটা

অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের বৈশিষ্ট্য

অঙ্গ। কার্ট লিউইন (Kurt Lewin) বলেছেন—"*Learning is not a matter of construction or 'building up'—it also involves stages where analysis occurs. Those two are complementary phases of the more fundamental process of growth and maturation. The life cycle of all organisms including man reveals a progression from a relatively undifferentiated homogenous stage to a more elaborate and internally differentiated condition, When this activity occurs with the preceptual controls of conduct, we call it learning*" (*Lewin—field theory and experiments in Social Psychology.*)

এখানেই গেস্টাল্ট মনোবিদগণের তত্ত্বের অভিনবত্ব। তাঁরা শিখনকে জীব ধর্মের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জীবন বিকাশের বা জীবনের অভিব্যক্তির বিশেষ ক্ষেত্র হ'ল বিদ্যালয়ের শিখন। এই শিখন শুরু হয় অবিভাজ্য সামান্যীকরণের মাধ্যমে এবং শেষ হয় সূক্ষ্ম পৃথকীকরণের মাধ্যমে। যেমন, শিশু যখন প্রথম গুণ (Multiplication) শিখে, ২×২=৪, ৩×২=৬, তখন এই সব ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে তার সাধারণ ধারণা হয়, গুণফল সব সময় গুণ্য ও গুণকের চেয়ে বড় হয়। তার শিখনের পরিধি আরও বাড়লে, সে বিচার করতে শেখে, এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে পৃথক ভাবে বিবেচনা করতে শিখে। সে শিখে ঐ নিয়ম, সব সময় সত্য নয়। যেমন—২×½=১। এই ধরনের পৃথকীকরণের দ্বারা শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতাকে আরও বিশ্লেষণ করে, এবং তখন আরও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দ্বারা বৃহত্তর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুকে বিচার করে তার ধারণাকে সামগ্রিক রূপ দান করে। পৃথকীকরণের গুরুত্বের কথা বুঝাতে গিয়ে **ওয়াসবার্ন** (Washburn) মন্তব্য করেছেন—"*without the process of differentiation all cats are tame, al boys are noisy, all women are frickle*'। সুতরাং গেস্টাল্ট মনোবিদগণের মতবাদ অনুযায়ী শিখনে নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। তা'হল—(১) **পরিবর্তিত প্রত্যক্ষণ,** (২) **উন্নততর প্রতিক্রিয়া,** (৩) **উদ্দীপক এবং প্রাতক্রিয়া, দুইয়ের পৃথকীকরণ,** (৪) **উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া সমন্বয় এবং সবশেষে,** (৫) **একটা সামগ্রিক বোধ** (*Learning is characterised by changed perception, improved reactions, differentiation of stimuli and responses, integration of stimuli and responses and lastly achievement of understanding*)। আর এই শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ, সামগ্রিক বোধের পর্যায়েই অন্তর্দৃষ্টি (Insight) কাজ করে।

লিউইনের টপলজিক্যাল তত্ত্ব
[Lewin's Topological Theory]

গেস্টাল্ট মতবাদ থেকে পরবর্তীকালে যে সব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে জার্মান গণিতজ্ঞ কার্ট লিউইনের মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্র তৈরী করার জন্য যে গাণিতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা, তার উপর ভিত্তি করে কার্ট লিউইন এই তত্ত্ব প্রতিস্থাপন করেছেন। তাই একে টপলজিক্যাল তত্ত্ব (Topological theory) বলা হয়। লিউইন মনে করেন, কোন ব্যক্তির আচরণের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে হ'লে, এক ধরনের মানচিত্রে ব্যক্তির অবস্থান কোথায়, বিশেষভাবে তার লক্ষ্যের (goal) পরিপ্রেক্ষিতে, তা নির্ধারণ করতে হবে (*To understand a person's behaviour one must recognise his position on a kind of map in relation to goals he is trying to attain*)। এই মানচিত্রকে লিউইন বলেছেন, "লাইফ্ স্পেস্" (Life Space)। কোন ব্যক্তির লাইফ্ স্পেস্ বলতে বুঝায়, কোন বিশেষ মুহূর্তে যে সব বল (Force) তার উপর ক্রিয়াশীল, তার সমবায়কে। ব্যক্তি এই সব বলের সমবায়ের (Pattern of Forces) প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। বাহ্যিক উদ্দীপক (External stimulus) ছাড়াও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক (Internal stimulus) বা তাড়নার (Drive) দ্বারা সৃষ্টি হ'তে পারে। লিউইন বলেছেন, লক্ষ্যের (Goal) ধনাত্মক যোজ্যতা (Positive valence) আছে বা আকর্ষণ বল আছে। অর্থাৎ ব্যক্তি লাইফ্ স্পেসে যে অঞ্চলে পরিতৃপ্তি প্রত্যাশা করে, সে দিকেই এগিয়ে যায়। আবার, 'লাইফ্ স্পেসের' যে সব উদ্দীপকের দিক থেকে ব্যক্তি দূরে সরে আসতে চায় তারা লিউইনের মতে ঋণাত্মক যোজ্যতা সম্পূর্ণ (Negative valence) বা তাদের বিকর্ষণ বল বর্তমান। এছাড়া 'লাইফ স্পেসের' মধ্যে কিছু অবরোধ বা বাধা (Barrier or Obstrucle) আছে, যা ব্যক্তির আকর্ষণ-মূলক বা বিকর্ষণমূলক গতিকে বাধা দেয়। স্বাভাবিকভাবে এদের কোন যোজ্যতা নেই। মানুষের আচরণ তার 'লাইফ স্পেসের' বিভিন্ন বলের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল দ্বারা নির্ণীত হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে কি ভাবে প্রতিক্রিয়া করবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, সে কি ভাবে, 'লাইফ্ স্পেসের' মধ্যে লক্ষ্য এবং বাধার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষমতার উপর। লিউইনের মতে শিখন এই তাৎপর্য নির্ণয়ে ব্যক্তিকে সহায়তা করে। তাঁর মতে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার লাইফ স্পেসকে নতুন ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ করতে পারে তাই হ'ল শিখন (*Learuing is*

লিউইনের তত্ত্ব ও তাৎপর্য

the process by which one comes to perceive his life space in a new way)। লিউইন বলেছেন—"*It is a change in one's cognitive structure of his field*" ব্যক্তির নিজস্ব 'লাইফ্ স্পেস্' বা কর্মপরিস্থিতির অভিজ্ঞতাভিত্তিক সাংগঠনিক পরিবর্তনই হ'ল শিখন। অর্থাৎ, শিখনের ফলে, শিক্ষার্থীর কাছে, কোন লক্ষ্য পূর্বে যা আকর্ষণীয় ছিল, তা বর্তমানে আকর্ষণীয় না মনে হ'তে পারে; বা যা পূর্বে আকর্ষণীয় ছিল না তাকে বর্তমানে আকর্ষণীয় মনে হ'তে পারে। লিউইনের তত্ত্বের মূল কথা হ'ল ব্যক্তির লক্ষ্যাভিমুখী গতি বা তার প্রেষণা (Motivation)। শিখনের মূল ভিত্তি তাড়নার (Drive) বশবর্তী হয়ে, উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য বাধাকে অতিক্রম করা। তাই শিক্ষালয়ে আমাদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের সামনে বাস্তব উপযোগী লক্ষ্য স্থাপন করা এবং সব বাধাকে অতিক্রম করে সেই লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করা।

টলম্যানের চিহ্ন গেস্টাল্ট তত্ত্ব
[Tolman's Sign-Gestalt Theory]

টলম্যানের শিখন সম্পর্কে মতবাদও গেস্টাল্ট তত্ত্বের মূল ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। লিউইনের মত টলম্যানও বলেছেন, মানুষের আচরণ সব সময় উদ্দেশ্যমুখী। কিন্তু আদি গেস্টাল্ট পন্থী ও লিউইনের সঙ্গে তাঁর মতবাদের তফাত হ'ল এই যে তিনি নতুন আচরণের ক্ষেত্রে, 'চিহ্ণ' (Signs) বা প্রত্যাশার (expectation) শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। টলম্যান বলেছেন, যে কোন উদ্দীপক ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়। কোন উদ্দীপক বিশেষ লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করবে কি করবে না, সে বিবেচনা করেই ব্যক্তি তাকে প্রত্যক্ষ করে। তাঁর মতে শিখন হ'ল উদ্দীপকের চিহ্ন নির্ণয় করা। অর্থাৎ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পৌছানোর পথেরই কেবল শিখন হয়। কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন উদ্দীপকগুলোকে বিচার করে দেখে কোনটা তার সমস্যা সমাধানে বা তার লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করবে। তা'হলে বলা যেতে পারে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে—(১) **উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষণ** (Perception of the goal), (২) **উদ্দীপকের চিহ্ণ** (Signs), এবং (৩) **বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রত্যাশার উপর**। শিখনের মূল কথা হ'ল—চিহ্ন নির্দেশ করা, এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করা। টলম্যান বলেছেন—ফল লাভ (Reward or effect), এই সম্পর্ক বিশেষ সহায়তা করে। অর্থাৎ, লক্ষ্য এবং চিহ্নিত উদ্দীপকের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে তোলে।

টলম্যানের তত্ত্বের স্বরূপ

এই জন্য টলম্যানের এই তত্ত্বকে থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের এবং গেস্টাল্ট সূত্রের সমন্বয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সমগ্রতাবাদের তাৎপর্য

[Educational Implication of Field Theory]

॥ এক ॥ সমগ্রতাবাদী মনোবিদগণের দেওয়া শিখনের এই মতবাদ আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বিদ্যালয়ের শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে এই মতবাদ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের শিখন পরিস্থিতির সামগ্রিক বোধের উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় মনে রাখতে হবে যে ছাত্রদের কাছে সমস্যা বা বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে উপস্থাপন না করে সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করতে হবে। যেমন, বীজগণিতের অঙ্ক করানোর সময় শুধুমাত্র মান নির্ণয় করা : x+৫=৮ এই ধরনের সাংকেতিক সমস্যা দিলে চলবে না, সমস্যাকে তার প্রকৃত তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ, যদি বল হয়, কোন সংখ্যার সঙ্গে ৩ যোগ করলে, যোগফল ৮ হয়, তা'হলে ছাত্ররা সমস্যার সামগ্রিকতা উপলব্ধি করতে পারে এবং সমীকরণের উপযোগিতাও বুঝতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা তার অন্তর্দৃষ্টিমূলক সমাধানের পরেই আসবে, তার আগে নয় (*The development of skill should never preceed the Insight*)। অর্থাৎ, আগে সমস্যার সামগ্রিক সমাধান তারপরে খণ্ড খণ্ড অংশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দেওয়াই হবে শিক্ষকের কর্তব্য। আজকাল বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার দু'টো মূলনীতি—'সমগ্র থেকে অংশের দিকে" (from general to particular), ও "মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে" (from concrete to abstract), সমগ্রতাবাদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

সামগ্রিকতা বোধ ও শিক্ষা

॥ দুই ॥ আবার এই মতবাদ অনুযায়ী শিখন হয় অন্তর্দৃষ্টির জন্য ঠিকই, কিন্তু সেই অন্তর্দৃষ্টি আসে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অংশগুলোর মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে। সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য হবে এই সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া। অর্থাৎ বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যার ফলে ছাত্রেরা নিজেরাই সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা জন্মে। সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার উপর

সম্পর্ক স্থাপন ও শিক্ষা

নির্ভরশীল ঠিকই। কিন্তু সেই ক্ষমতাকে (General mental ability) কি ভাবে কাজে লাগাতে হবে, তার অভ্যাস গঠন করানোর দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন যদি যথাযথ না হয়, বা, সমস্যা যদি ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতার আয়ত্বের বাইরে হয়, তা'হলে অন্তর্দৃষ্টি কোন সময়েই জাগতে পারে না। তাই শিক্ষককে বিষয়বস্তু নির্বাচনে, এবং তার উপস্থাপনে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে।

॥ তিন ॥ সমগ্রতাবাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল—শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও আগ্রহ। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেও শিখন পরিস্থিতির সক্রিয় অঙ্গ। তাই তাকে সমস্যাভিমুখী করা শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানে আগ্রহী করতে না পারলে তার শিখন সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষকের বিষয়বস্তুর পরিবেশন এমন হবে যার ফলে, শিক্ষার্থীরা তা আয়ত্ব না করা পর্যন্ত একটা অস্বস্তিকর অবস্থা অনুভব করে। তবেই তাদের নিজেদের প্রয়োজন বোধে তারা শিক্ষায় বা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হবে। সমস্যা সমাধানে আগ্রহী করতে হ'লে বিষয়বস্তুকে জীবন পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে উপস্থাপন করার দরকার।

শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও শিক্ষা

॥ চার ॥ সমগ্রতাবাদীগণ, শিখনের ক্ষেত্রে সামান্যীকরণ (generalization) এবং পৃথকীকরণের (differentiation) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিখন যদি জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া হয়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই কৌশলকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন সমস্যমূলক পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করে দেখা এবং সাধারণ ধারণা গ্রহণ করার অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে গঠন করতে হবে।

সামান্যীকরণ ও পৃথকীকরণের শিক্ষাগত তাৎপর্য

সমগ্রতাবাদের সমালোচনা
[Critical Evaluation of Field theory]

সমগ্রতবাদের মধ্যে অনেক অভিনবত্ব আছে। শিখন সম্পর্কে সমগ্রতাবাদীগণের পরীক্ষণ এবং আলোচনা, শিখনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তা'হলেও অনেক মনোবিদ্, কতকগুলো দিক থেকে একে সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের মতবাদকে। কারণ, তাঁরা অন্তর্দৃষ্টি বলতে যে ঠিক কি বুঝাতে চান, তা সব সময় পরিষ্কার নয়। কোন সময় তারা কাজের ফলটাকে বিচার করতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টি কথাটা ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁরা বলেছেন-Insightful

'অন্তর্দৃষ্টি' কথার প্রয়োগ

learning'। আবার কোন কোন সময় অন্তর্দৃষ্টিকে শিখনের কৌশল (Mechanism of learning) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যখন তাঁরা বলেছেন, 'learning by insight' তখন এই অর্থে কথাটাকে ব্যবহার করেছেন।

তাছাড়া অন্তর্দৃষ্টিকে অনেকে, শিখনের নতুন কিছু কৌশল বলে মনে করেন না। অন্তর্দৃষ্টির পেছনে সব সময় প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error) কাজ করে। এই প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতিতে এগোতে এগোতে তবেই হঠাৎ অন্তর্দৃষ্টি কাজ করে। তাই, একে আমরা প্রচেষ্টা ভুলের শেষ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। শুধুমাত্র এখানে প্রচেষ্টা ভুল সুপ্ত অবস্থায় (Implicit trial and error) থাকে মাত্র। সুতরাং, এই কৌশলের সঙ্গে থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ভুলের কৌশলের বিশেষ কোন তফাত নেই।

অন্তর্দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি

সবশেষে একথা বলা যেতে পারে, সমগ্রতাবাদ দিয়ে আমরা মানুষের সব রকম শিখনের ব্যাখ্যা দিতে পারি না। তাড়নার (Drive) বশবর্তী হ'য়ে 'লাইফ স্পেসে' মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত স্থানের দিকে সরে যেতে চায় ঠিকই, কিন্তু সে তো বিচার বিবেচনাশীল সামাজিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু বোধশক্তিহীন শিশু অনেক আচরণই যান্ত্রিক ভাবে শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারাই শিখে; কোন রকম প্রয়োজনের তাড়নায় নয়। এই তত্ত্বের দ্বারা মানুষের অনেক জটিল শিখনকে ব্যাখ্যা দেওয়া গেলেও সম্পূর্ণভাবে মানুষের শিখনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মতবাদের মধ্যে অনেক কিছু সত্য হ'লেও, শিখনের তত্ত্ব হিসেবে তাকে আমরা সম্পূর্ণ বলতে পারি না।

তত্ত্বের আংশিকতা

শিখন তত্ত্ব সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা
[General discussion On Learning Theories]

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। অনেক তত্ত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। অনেক করা সম্ভব হয় নি। অনেক তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে; অনেকের উল্লেখ মাত্র হয়েছে বলা যায়। এটা আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে; বিষয়ের গুরুত্বের কথা ভাবলে হয়তো যে গুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয় নি, তাদেরই বিশদ আলোচনা হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ, তারা আধুনিক মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিকাশের বর্তমানের স্তরের। সে যাই হউক, যা আলোচনা হয়েছে, তার থেকে একটা প্রশ্ন আমাদের কাছে প্রধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'হল – কোন তত্ত্বটি ঠিক। কোনটা গ্রহণযোগ্য। আমরা যখন পৃথক পৃথক ভাবে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তখন তাদের

সূচনা

প্রত্যেকের দোষক্রটির উল্লেখ করেছি। আবার প্রত্যেকের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছি। সুতরাং, কোনটা বাদও যেমন দেওয়া যায় না, আবার কোন একটাকে গ্রহণও করা যায় না। কারণ প্রত্যেকেই অসম্পূর্ণ।

বিভিন্ন তত্ত্বের মিল

বিভিন্ন তত্ত্বের মূল বক্তব্যের মধ্যে তফাত থাকলেও একদিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে। সে মিল হ'ল তাদের পরিক্ষণের বিষয় বস্তু। প্রত্যেক তত্ত্বই প্রথমে প্রাণীর উপর পরীক্ষার পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্যাভলভ কুকুরের উপর পরীক্ষা করেছেন, থর্নডাইক, বিড়াল, মুরগী ইত্যাদির উপর আর গেস্টাল্ট্‌বাদীগণ শিম্পাঞ্জীর উপর। এই সব প্রাণীর উপর পরীক্ষা লব্ধ ফলকে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এই কথাও ঠিক আমরা অনুবর্তনের দ্বারা শিখি, প্রচেষ্টা ভুলের দ্বারাও শিখি আবার অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেও শিখি। কিন্তু কোন অবস্থায় কোন পদ্ধতি ব্যবহার করব তা নির্ভর করছে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, পরিস্থিতি এবং আমাদের মানসিক অবস্থার উপর। আমরা প্রাথমিক কিছু আচরণের পরিবর্তন বা কিছু অভ্যাসমূলক কাজ অনুবর্তনের দ্বারা শিখি; আবার যে সব পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, সেখানে প্রচেষ্টা ভুলের মাধ্যমে শিখি; আর যেখানে সমস্যামূলক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত, সেখানে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা শিখি। তাই মানুষের শিখনের প্রকৃতিকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে, এইসব তত্ত্বগুলোর সমন্বয় করার প্রয়োজন। কোন একটাকে দিয়ে হবে না। মানুষের শিখন এতই জটিল যে, বিভিন্ন মনোবিদ্‌ তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, তার এক একটা দিক মাত্র লক্ষ্য করেছেন। অপর দিকটা তারা ঠিকমত দেখতে পান নি। এ যেন 'সেই অন্ধ লোকদের হাতির বিবরণ দেওয়ার মত'। যে, যে অংশটা স্পর্শ করেছে, সে সেইভাবে হাতির আকৃতি বর্ণনা করেছে। হাতির আকৃতি সম্পর্কে জানতে হ'লে যেমন তাদের বিচ্ছিন্ন বিবরণের মধ্যে সমন্বয় দরকার, ঠিক তেমনি মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে গেলে, ঐ সব তত্ত্বগুলোর সমন্বয় দরকার।

ওয়াসবার্ণ ও মেগ্রোথ-এর তত্ত্ব

ওয়াসবার্ণ এবং **মেগ্রোথ্‌** (Washburn and Megroth), শিখনের মূল তত্ত্বগুলোর মধ্যে এক সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে শিখনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই একে তত্ত্ব না বলে Genetic description of Learning বলা হয়। তাঁরা শিখনকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। এই পর্যায়গুলো—(১) **অভিমুখীতা** (Orientation), (২) **অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান** (Exploration), (৩) **সম্প্র-**

সারণ (Elaboration), (৪) **সরিস্ফূটন** (Articulation), (৫) **সরলীকরণ** (Simplif cation). (৬) **স্বয়ংক্রিয়করণ** (Automatization), ও (৭) **পুনঃ সংস্থাপন** (Re-orientation)। অর্থাৎ, কোন সমস্যা সম্মুখীন হ'লে আমরা এইসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তার সমাধান করে থাকি।

॥ **এক** ॥ যে কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটে অংশ দেখতে পাই। **উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য** (goa'), উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা (obstrucle) আর **শিক্ষার্থী** নিজে (Ind vidual or Learner)। এখন কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'লে শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ হ'ল লক্ষ্য (goal) এবং লক্ষ্যে পৌছানোর পথে যে বাধা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এ ইহ'ল সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে শিখনের প্রথম ধাপ। সমস্যার এই বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ধারণা এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এই পর্যায়কে ওয়াসবার্ণ ও মেগ্রোথ বলেছেন—**অভিমুখীতা** বা **সমস্যাভিমুখীতা** (Orientation is the perception of the general nature of the problem)। এই প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করছে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি বা ব্যক্তির শিখন।

শিখন পরিস্থিতির স্বরূপ ও সমস্যাভিমুখীতা

॥ **দুই** ॥ পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে বাধাকে (Obstrucle) অতিক্রম করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, এবং এই প্রচেষ্টা মানসিক পর্যায়ে হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে খুঁজে বাহির করার চেষ্টা করবে, সেখানে অনুরূপ কোন ঘটনা আছে কি না। যদি ঐ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন পূর্বে সে হ'য়ে থাকে তা'হলে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে পূর্বের প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। এক্ষেত্রে নতুন আচরণ হয় না বলে শিখনও হয় না। কিন্তু যেহেতু জীবন পরিস্থিতিতে সমস্যার পুনরাবৃত্তি বিশেষ ঘটে না, শিক্ষার্থী নতুন পরিস্থিতিতে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য খুঁজে পেতে চায়। এবং যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির বেশী মিল আছে, সেটাকে বেছে নেয়, বর্তমান সমস্যাকে সমাধান করার জন্য। শিখনের এই পর্যায়কে বলা হয় **অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান** (Exploration)। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমস্যার বিভিন্ন অংশ বিশ্লিষ্ট হয় এবং সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়।

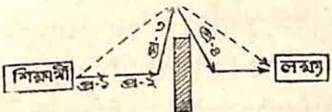
অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান

॥ **তিন** ॥ অতীত অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানের ফলে শিক্ষার্থী যে প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেয় তার দ্বারা বর্তমান সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, পূর্ববর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে এই সমস্যার সম্পূর্ণ মিল নাই। সুতরাং, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐ প্রতিক্রিয়াকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে বাধা অতিক্রম করতে হ'লে, তার সম্প্রসারণ বা পুনর্বিন্যাস দরকার।

পরিস্ফূটন

এই ভাবে অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে কাজে লাগানোর জন্য তার পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়াকে বলা হয় **পরিস্ফুটন** (Elaboration)। এই প্রক্রিয়ার ফলে, শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানের নিশ্চিত ধারণা পায়।

॥ **চার** ॥ এইভাবে অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার্থী যখন তৈরী হয় তখনই সে সমস্যা সমাধানের জন্য বা বাধাকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছানোর সক্রিয় প্রচেষ্টা করে। এবং তার সম্প্রসারিত অভিজ্ঞতার দ্বারা লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয় এবং সমস্যার সমাধান করে। নীচে ছবিতে এই ধরনের প্রক্রিয়াকে পরিবেশন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিস্ফূটন (Articulation)। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থী আপাতভাবে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়।



[শিক্ষার্থীর ব'ধাকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছানোর পাঁচটি প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। ঐ প্রতিক্রিয়াগুলোকে→চিত্র দ্বারা দেখানো হ'য়েছে। এই সব প্রতিক্রিয়া আপাতঃভাবে শিক্ষার্থীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে পরিস্ফূটনের পর্যায়ে, পরবর্তী পর্যায়ে সরলতম প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সমস্যা সমাধান করে সে। সেইপথ——→ দ্বারা দেখানো হয়েছে]

॥ **পাঁচ** ॥ এইভাবে সমস্যা সমাধানের পর শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে কিছু প্রতিক্রিয়া সমস্যা সমাধানের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তখন সে অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলোকে বাদ দিয়ে সহজতম পথে বাধাকে অতিক্রম করার জন্য চেষ্টা করে। এবং শেষে সমস্যা সমাধানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলোকেই কেবল গ্রহণ করে। শিখন প্রতিক্রিয়ার এই পর্যায়কে বলা হয় সরলীকরণ (Simplification)।

সরলীকরণ

॥ **ছয়** ॥ এমনিভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়। একবার সার্থকভাবে প্রতিক্রিয়া করাকেই যদি শিখন, বলি তা'হলে শিখন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এই পর্যায়েই হ'য়ে থাকে। কিন্তু মানুষের সাধারণ প্রবণতা হ'ল পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে গিয়ে যতটা সম্ভব কম জৈবিক ও মানসিক শক্তি খরচ করা। সুতরাং পরবর্তীকালে যদি ঐ ধরনের সমস্যার আমরা সম্মুখীন হই তা'হলে অল্প মানসিক শক্তি ব্যয়ে যাতে সার্থকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারি তার জন্য এই নতুন প্রতিক্রিয়াকে স্বতশ্চল বা যান্ত্রিক (Spontaneous) করার দরকার। এবং সেজন্য চাই পুনরাবৃত্তি বা অনুশীলন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে সরলীকৃত প্রতিক্রিয়াকে আমরা অনুশীলনের দ্বারা স্বতশ্চল করে তুলি। এর ফলে

স্বতশ্চলতা

আমাদের দক্ষতা বাড়ে। শিখনের এই পর্যায়কে বলা হয় স্বয়ংক্রিয়করণ (Automatization)। অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন।

॥ সাত॥ সবশেষে, নব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আমাদের ভাবজট(Apperceptive Mass) অঙ্গীভূত করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ভবিষ্যতে তার প্রয়োগ সম্ভব হবে না। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ দরকার। এবং সবশেষ, শিক্ষার্থী অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতাকে বিচার করে, তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পুঞ্জের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে। শিখনের এই শেষ ধাপকে বলা হয়েছে পুনঃসংস্থাপন (Reorientation)।

পুনঃসংস্থাপন

ওয়াসবার্ণ এবং মেগ্রোথ্‌ বলেছেন, এই সাতটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিখন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। তাঁরা একথাও বলেছেন, বিভিন্ন শিখনের তত্ত্বের মধ্যে যে বিরোধ, তা তাদের আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এসেছে। যে সব মনোবিদগণ শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শুধুমাত্র সরলীকরণ (Simplification) এবং স্বয়ংক্রিয়করণের (Automatization) উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁরা অনুবর্তনে (conditioning) বিশ্বাসী। আবার যে সব মনোবিদগণ কেবলমাত্র অনুসন্ধান (Exploration), সম্প্রসারণ (Elaboration) এবং পরিস্ফূটনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁরা সংযোজনবাদে (connectionism) বিশ্বাস করেন। আর যাঁরা শিখনকে শুধুমাত্র অভিমুখীতা Orientation) এবং পুনঃস্থাপনের (reorientation) দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা হলেন সমগ্রতাবাদী (field theorists)। সুতরাং এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, প্রত্যেক তত্ত্বই শিখন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে আংশিকভাবে সহায়তা করেছে। কোন প্রাচীন মতবাদ, কি আধুনিক মতবাদ সম্পূর্ণভাবে শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তাই পরিশেষেও **ব্লেয়ারের** কথার পুনরাবৃত্তি করছি—"*Psychology has never presented in any one place a complete unified, coherent and universally agreed upon acount of the nature of learning.*" সুতরাং পরিপূর্ণ একক শিখনের তত্ত্বের জন্য আমাদের এখনও প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

আলোচনা

সার্থক শিখনের শর্তাবলী

[Conditions of effective Learning]

মানুষ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করে আসছে কি করে অল্প আয়াসে কাজ করা যায়। কি ভাবে অল্প শক্তি অপচয় করে পরিবেশকে আয়ত্বে আনা যায়। তার এই স্বাভাবিক প্রবণতা শিখনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। শিক্ষার্থী এই

প্রবণতার তাড়নায় স্বাভাবিকভাবেই স্বল্পায়াসে লক্ষ্যে পৌছতে চায়। শিখনের বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি সব শিখন প্রচেষ্টা সব সময় কার্যকরী হয় না। সুতরাং স্বল্প আয়াসে, সার্থক শিখনের জন্য কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন। এগুলোকেই সার্থক শিখনের শর্ত (con litions of e'f ctive learning) বলা হয়ে থাকে। এই সব শর্ত সম্পর্কে কিছু কিছু আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। তা'হলেও ধারাবাহিকভাবে আমরা এখানে তাদের উল্লেখ করব সংক্ষিপ্ত আকারে। শিখন সহায়ক এই শর্তাবলীকে আমরা দুটো সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। কতকগুলো শিখনের বিষয়বস্তু বা শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনা সংক্রান্ত কৌশল। এগুলোকে আমরা শিখনের কৌশল সংক্রান্ত শর্ত conditions rela:ed to techn q:es of l arning) বলতে পারি। আর কতকগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থাজনিত শর্ত (Subjective conditions)।

সূচনা

শিখনের কৌশল সংক্রান্ত শর্ত

[Conditions related to Techniques of Learning]

শিখনের বিভিন্ন কৌশল, শিখন প্রক্রিয়ার প্রগতিতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়বস্তুর সম্মুখীন হলে, তাকে আয়ত্ব করবার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে। এই সব কৌশলের পার্থক্য ভেদে শিখন প্রক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব কৌশল সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

॥ এক ॥ শিক্ষার্থীরা, যখন কোন পাঠ্যবস্তু শিখার চেষ্টা করে, তখন তারা দু'ভাবে বিষয়বস্তুকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করে। তারা সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে আয়ত্ব করতে পারে অথবা, বিষয়বস্তুকে কতকগুলো অংশে ভাগ করে নিয়ে আয়ত্ব করতে পারে। যখন কোন বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণটা বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিখন হয় তখন তাকে বলে সামগ্রিক পদ্ধতি (Whole method of learning); এবং যখন, বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে শিখা হয় তখন তাকে বলে আংশিক পদ্ধতি (Part method of learning)। মনোবিদগণ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, সাধারণভাবে আংশিক পদ্ধতির চেয়ে সামগ্রিক শিখন পদ্ধতি শিখনের বিশেষ সহায়ক। সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখলে শিখন গতি এবং বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ (association) স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয় এবং উদ্দেশ্যমুখী হয়।

সামগ্রিক ও আংশিক পদ্ধতি

বিষয়বস্তুর মধ্যে সুসংহত বিন্যাসের ধারা এই পদ্ধতিতে বজায় থাকে। সামগ্রিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব শিক্ষার্থীদের কাছে পরিস্ফুট হয় বলে; শিখন তাড়াতাড়ি হয়। তাছাড়া সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখলে, শিখনের শ্রম কমে যায়। কারণ, আংশিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অংশগুলোর মধ্যে সংযোগ (association) স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু, সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখন হ'লে তার আর দরকার হয় না। তবে, সামগ্রিক পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর (M:aningful materials) ক্ষেত্রে সামগ্রিক শিখন পদ্ধতি থেকে কার্যকরী ফল পাওয়া যায়।

॥ **দুই** ॥ যে সব শিক্ষার্থীদের সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (intelligence) বেশী, তাদের পক্ষে সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখলে ভাল ফল পাওয়া যায় কিন্তু যারা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তারা যদি সামগ্রিক পদ্ধতিতে শেখে তা'হলে তাদের ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায় না। এই সব শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশী বড় বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হ'য়ে পড়ে, তাই এই সব শিক্ষার্থীদের পক্ষে আংশিক পদ্ধতি সুবিধাজনক।

॥ **তিন** ॥ সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখনের একটা সীমা আছে। এ রকম ধারণা করা ভুল হবে যে, সামগ্রিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বুই বা যে কোন দৈর্ঘ্যের বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ব করা যায়। মনোবিদ্ **হভ্‌ল্যাণ্ড** (Hovland) ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে এক পরীক্ষা করেন। তার থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখনের সীমা ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

এই কারণে, যারা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন এবং যারা ধীরে ধীরে শিখে, তাদের শিখনের ক্ষেত্রে আংশিক পদ্ধতি প্রযোজ্য এবং যে কোন ধরনের বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে আংশিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথম সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধির পর, বিশেষ অংশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণের জন্য তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়ে পড়লে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে অংশ ভাগের সময় বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার প্রত্যেক অংশ যেন অর্থপূর্ণ হয়।

সবিরাম ও অবিরাম পদ্ধতি

শিখনের আর এক ধরনের কৌশল হ'ল সময়ের ব্যবহারের দিক থেকে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়বস্তু আয়ত্ব করার জন্য এক নাগাড়ে বসে বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অর্থাৎ, কোন বিষয়বস্তু শেখার জন্য তাদের যদি ৩০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়, তারা সে সম্পূর্ণ সময়টা এক সঙ্গে ব্যবহার করে। এই ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় শিখনের **অবিরাম পদ্ধতি** (Massed

Learning)। আবার যদি এই সময়টাকে কতকগুলো ছোট ছোট অংশে ভেঙে নেওয়া যায় এবং কিছুক্ষণ অন্তর ১০ মিনিট সময় এইজন্য ব্যয় করা যায়, তা'হলে ঐ ধরনের শিখনের পদ্ধতিকে **সবিরাম পদ্ধতি** (Spaced Learning) বলা হয়। এই অবিরাম এবং সবিরাম পদ্ধতির আপেক্ষিক উপযোগিতা নিয়ে **ডিক্সন** (Dixon), **লেজিয়ার** (Lazier), **আণ্ডারউড** (Underwood) প্রভৃতি মনোবিদ্ আধুনিককালে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। মনোবিদ্ **এবিংহসও** (Ebbinghaus) এই পদ্ধতির উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সাধারণভাবে অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে সবিরাম পদ্ধতি শিখনের সহায়ক। সবিরাম পদ্ধতিতে শিখলে, একই সময় ব্যবহার করে অনেক বেশী শিখা যায়। এর কারণ হিসেবে মনোবিদগণ বলেছেন—

॥ **এক** ॥ মানুষের মনোযোগ স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তনশীল। শিক্ষার্থীরা খুব বেশী সময় ধরে কোন বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। তাই অবিরাম পদ্ধতিতে শিখার চেষ্টা করলে, মনোযোগ ধরে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং, পড়লেই যে শিখন হবে এমন কোন কথা নেই। মনোযোগ না থাকার দরুন সময় এবং প্রচেষ্টা উভয়েরই অপব্যয় হবে।

॥ **দুই** ॥ সংযোগ সংক্রান্ত **জোস্ট** (Jost) এর নিয়ম বিশেষভাবে কার্যকরী হয় সবিরাম পদ্ধতিতে। এই নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবৃত্তির ফলে পুরাতন সংযোগ (association) অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী হয়। তাই, সবিরাম পদ্ধতিতে শিখলে পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে অতীত শিখন অনেক বেশী শক্তিশালী হয়।

॥ **তিন** ॥ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, মানুষ ভুল প্রচেষ্টাগুলো, সঠিক প্রচেষ্টার চেয়ে তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। তাই সবিরাম পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের ভুল সংযোগগুলো (wrong association) দূর করতে সাহায্য করে।

॥ **চার** ॥ মনোবিদ্ **হিলগার্ড** (Hilgard), ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই শিখন কৌশলের উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে শিক্ষার্থীরা প্রথম পর্যায়ে পুনরাবৃত্তি (Repetition) পছন্দ করে না, এবং পুনরাবৃত্তিতে বাধা দেয়। তাই সবিরাম পদ্ধতিতে শিখন হ'লে শিক্ষার্থীদের মন থেকে এই বাধা আসে না। তবে, এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলো দিক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার দরকার।

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে শিখনের বিভিন্ন প্রচেষ্টার পরিবর্তন যেন খুব দ্রুত না হয়। তার ফলে ভাল হওয়ার চেয়ে খারাপই হয়। শিখনের সময় যেমন খুব কম না হয় আবার, খুব বেশী যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ**, **স্ট্যাগনার** (Stagner) বলেছেন, যেখানে শিখনের ক্ষেত্রে

সমস্যা সমাধান করতে হয়, সেখানে যদি সবিরাম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা'হলে মানসিক ধৈর্য নষ্ট হয় এবং সমস্যার সমাধানের পথে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে সবিরাম পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু খুব সহজ সেখানে সবিরাম পদ্ধতিতে ভাল ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দক্ষতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে (skill-learning) সবিরাম পদ্ধতি খুবই ভাল।

শিখনের কৌশলকে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এদের বলা হয় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি (Active and passive method of learning)। যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তির সুযোগ নেয়, তাকে বলা হয় **সক্রিয় পদ্ধতি** (Active method) আর যে পদ্ধতিতে কোন সচেতন প্রচেষ্টা বা আবৃত্তি ছাড়াই বার বার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির দ্বারা শিখার চেষ্টা করে, তাকে বলা হয় **নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি** (Passive method)। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সক্রিয় শিখন, শিখনের হারকে বাড়িয়ে তোলে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যদি দু'একবার পুনরাবৃত্তি করার পর নিজেরা নিজেরা বিষয় বস্তুর আবৃত্তি করার চেষ্টা করে, তা'হলে দেখা গেছে, তার ফলে শিখনের পরিমাণ বেশী হয় এবং শিখন অনেক তাড়াতাড়ি হয়। এই ধরনের শিখন পদ্ধতি শিখনকে বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা করে। **প্রথমতঃ**, এই পদ্ধতিতে শিখলে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটি নিজেরাই বুঝতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, পাঠ্য বিষয়বস্তুর কোন জায়গাটা কঠিন এবং কোথায় বেশী মনোযোগ দেওয়ার দরকার তাও তাদের সামনে ধরা পড়ে। **তৃতীয়তঃ**, এই পদ্ধতিতে শিখন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা জ্ঞানকে পরবর্তীকালে যে ভাবে প্রয়োগ করবে, সেই ভাবেই শিখে। এর ফলে দু'দিক থেকেই ভাল ফল পাওয়া যায়। **চতুর্থতঃ**, সক্রিয় শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীকে শিখনের ক্ষেত্রে সক্রিয় রাখে, ফলে শিক্ষা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি

শিখন কৌশলের দিক থেকে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে শিখন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। তা'হল অতি শিখন (over-learning)। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ঠিকমত ভাবে শিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে পারে না তার এক মাত্র কারণ, তাদের এই অতি শিখনের প্রতি প্রবণতা নেই। প্রত্যেক শিখনের বা শিখনমূলক প্রচেষ্টার পেছনে একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। শিক্ষার্থী সেই উদ্দেশ্যে পৌছালেই আমরা বলি তার শিখন হয়েছে। অর্থাৎ, একটা কবিতা যখন আমরা শিখতে চাই, তখন আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল, একবার না দেখে আবৃত্তি করতে পারা। এখন এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য আমরা বার বার চেষ্টা করি। যখনই,

অতি শিখন

আমরা বই না দেখে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে পারি, তখনই বলি শিখন সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু, তারপরেও যদি আবার পুনরাবৃত্তি করি, তাকেই বলা হবে অতি-শিখন (overlearing) অর্থাৎ, শিখনের পরবর্তী শিখনকে অতি শিখন বলে। এই অতি শিখনের অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে না থাকলে শিখন কার্যকরী হয় না।

তা'হলে, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিখনের কার্যকরী শর্ত হিসেবে আমরা সামগ্রিক পদ্ধতি (whole method), সবিরাম পদ্ধতি (Distributed method) এবং সক্রিয় পদ্ধতিকে (active method) বিবেচনা করতে পারি। তবে এই সব কৌশলের প্রত্যেকের ক্ষমতা সীমিত। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, শিখনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এই সব শিখনের কৌশল সংক্রান্ত শর্তগুলোকে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ব্যবহার করবে। এই সব পদ্ধতির প্রত্যেকের মূল কথা হ'ল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা (activity)। আত্ম-সক্রিয়তা ছাড়া এই সব কৌশলকে বাইরে থেকে শিক্ষক পরিচালিত করতে পারেন না। তাই এগুলোকে শিখনের শিক্ষার্থী নির্ভর কৌশল বা শর্ত (condition) বলা হয়। অনেক সময় এ গুলোকে বস্তুনির্ভর শর্ত (objective condition) বলা হয়ে থাকে। শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে যে সব শর্তগুলো আরও বেশী প্রয়োজনীয় তা হ'ল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা জনিত শর্ত (subjective condition) গুলো। এগুলো সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব।

শিখনের ব্যক্তিগত শর্তাবলী
[Subjective Condition of Learning]

শিখনের ব্যক্তিগত শর্তাবলী বলতে আমরা সেই সব শর্তের কথা বলছি, যেগুলো বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। এই সব শর্তগুলোকে শিখনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে

প্রেষণা

প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী। অর্থাৎ শিক্ষক, যদি যথাযোগ্য মানসিক অবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পারেন, তা'হলে শিখন প্রক্রিয়ার গতি ব্যহত হবে। এই সব মানসিক অবস্থা গুলোর মধ্যে **প্রেষণা** (motivation), **মনোযোগ** (attention) এবং **অনুরাগ** (interest) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিখন এবং প্রেষণার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আধুনিক কালে সব শিক্ষা মনোবিদ্ এ কথা স্বীকার করেন যে এই প্রেষণাকে জাগ্রত করতে পারলে শিখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে। মনোবিদ **থম্‌সন** (M. K. Thomson)

বলেছেন—"Motivation is super highway to learning"[1] শিখন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষার্থীর আত্ম সক্রিয়তা (self activity)। এই আত্ম সক্রিয়তা ছাড়া শিখন হ'তে পারে না। অন্যদিকে সক্রিয়তার জন্য চাই প্রেষণা (Motivation)। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেষণা জাগাতে না পারলে, শিখন কখনও সম্ভব হবে না।

মনোযোগ- **মনোযোগ** (attention) শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীরা যথাযোগ্য ভাবে মানোনিবেশ করতে না পারে, তা'হলে বিষয়বস্তুর সামগ্রিকরূপ তাদের সামনে পরিস্ফুট হবে না। মনোযোগ হ'ল বিশেষ এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোন বিষয়বস্তুকে আমরা চেতনার কেন্দ্র স্থলে উপস্থাপিত করি। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়ার ফলে, আমরা বিশেষ মুহূর্তে বস্তু সম্পর্কে একান্তভাবে সচেতন হই এবং তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে সক্ষম হই। তাই মনোযোগ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আনতে না পারি, তা'হলে আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে কোনদিন পালন করতে পারব না। তাই আমাদের সব সময় চেষ্টা হবে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই কারণে মনোযোগ সার্থক শিখনের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

অনুরাগ মনোযোগের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল নির্বাচনী ক্ষমতা অর্থাৎ, আমরা বস্তু নির্বাচন করে তার প্রতি মনোযোগ দিই। সব জিনিস বা বিষয় বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ থাকে না। পরিবেশের বিশেষ বস্তুকে বেছে নিয়ে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিই। এই নির্বাচনী ক্ষমতার পেছনে নানা শর্ত কাজ করে। এই সব শর্তের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল **অনুরাগ** (interest)। যে সব বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে তার প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগ দিই। অনুরাগের ও মনোযোগের এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করব। তবে শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, অনুরাগ শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে না পারলে, শিক্ষাদানের কাজ সার্থক এবং সহজ করা যাবে না। যে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ আছে, সেই সব বস্তু শিখনে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহী হবে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃষ্টি করা।

এখন, শিখনের এই সব শর্ত অর্থাৎ প্রেষণা, মনোযোগ এবং অনুরাগ জাগ্রত

1. Motivation in school learning; Thomson, Educational Psychology (ed.: Skinner).

করার জন্য শিক্ষক নানা কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। এই সব কৌশল গুলোকেও আমরা আপাতভাবে সার্থক শিখনের শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। যেমন—

॥ এক ॥ শিক্ষার্থীরা যদি শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়, তা'হলে তার শিক্ষায় অনুরাগ দেখা যাবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়বস্তু শিখনের তাৎপর্য কি তা বুঝতে পারে না বলেই, শিখন তাদের কাছে অর্থহীন বোঝা স্বরূপ মনে হয়। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন উপযোগী প্রেষণা তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে, শিখনের উদ্দেশ্য বা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা। প্রয়োজন হ'লে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিস্থাপন করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সাহায্য করবেন।

উদ্দেশ্যের সচেতনতা

॥ **দুই** ॥ কোন বিষয়বস্তু শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার সময় শিক্ষককে আর একটা দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উদ্দেশ্যকে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে যদি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন না করা যায়, তা'হলে তারা সেই শিখনে আগ্রহী হবে না। শিখন হ'ল উদ্দেশ্যমুখী। শিখন ব্যক্তিকে অভিযোজনে সাহায্য করে। যে বিষয়বস্তু ব্যক্তির অনুভূত অভাবের (felt need) সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তার শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন গরজ বা তাগিদ দেখা যাবে না। তাই কেবলমাত্র জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত বিষয়বস্তুই শিখনের জন্য বেছে নিতে হবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য ছাড়া শিক্ষার্থীর প্রেষণা বা অনুরাগ সৃষ্টি করা যাবে না। বাস্তব-মুখী উদ্দেশ্য স্থাপনকে সার্থক শিখনের শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য

॥ **তিন** ॥ শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তাদের শিখনের প্রেষণা শক্তি যোগায়। মানুষ এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সব প্রচেষ্টা তাদের ফল লাভে সাহায্য করে, সে গুলো তারা দৃঢ় করার চেষ্টা করে। সফলতা সম্পর্কে সচেতনতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সন্তুষ্টির ভাব জাগ্রত করে এবং এই সন্তুষ্টি তাদের পরবর্তী শিখনে প্রেষণা শক্তি জাগায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সচেতনা আনতে হ'লে, এমন বিষয়বস্তু এবং সমস্যা তাদের জন্য নির্বাচন করতে হবে, যা তারা তাদের মানসিক ক্ষমতার দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে বা সমাধান করতে পারে। তাছাড়া, বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে পারে। পরোক্ষ দূরবর্তী সফলতা (remote success)

সফলতার ধারণা

এত বেশী পরিমাণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহান্বিত করতে পারে না। মনোবিদ্ **হুইট্** (H. G. Wheat),[1] বলেছেন, নিজের অকৃতকার্যতা সম্পর্কে সচেতনতা কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে. কিন্তু কৃতকার্যতা সম্পর্কে সচেতনতা তাদের আরও কাজে অনুপ্রাণিত করে।

॥ **চার** ॥ পরিপূর্ণ সফলতা আসার পূর্বের প্রচেষ্টাও শিক্ষার্থীকে কাজে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষার্থীর প্রত্যেক পর্যায়ে নিজের অগ্রগতি (Progress) সম্পর্কে ধারণা তাকে তার শিখনে অনুপ্রাণিত করে। মনোবিদ্ **নাইট্** (Knight) এক পরীক্ষায় দু'দল সমান ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্র নিয়ে তাদের এক দলকে কিছুদিন অন্তর অন্তর তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেন। অন্যদলকে সাধারণভাবে শিক্ষা দিতে থাকেন। পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন, যে, যে দলকে অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছিল তাদের তাদের শিখন শতকরা বার ভাগ বেশী হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা কেন শিখনকে সহায়তা করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মনোবিদগণ বলেছেন—**প্রথমতঃ**, এই অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান, তাদের সফলতামূলক প্রচেষ্টা (Successful movements) গুলোর পুনরাবৃত্তিতে প্রেষণা শক্তি যোগায়; **দ্বিতীয়তঃ**, এই ধারণা শিক্ষার্থীদের ভুল প্রচেষ্টাগুলোকে ত্যাগ করতে সাহায্য করে; **তৃতীয়তঃ**, অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর কাজে উদ্‌বোধকের (incentive) কাজ করে। এই অগ্রগতির ধারণা শিক্ষার্থীদের দেওয়ার জন্য আধুনিক কালে স্বয়ং শিক্ষণের পদ্ধতি (Auto instruction) বা প্রোগ্রাম পদ্ধতির (Programme instruction) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে রিপোর্ট (Progress-report) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু, এই রিপোর্ট আমরা সাধারণতঃ ছয় মাস বা একবৎসর অন্তর দিয়ে থাকি। এর ফলে অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণার ফল, আমরা ছয় মাস বা এক বৎসরের আগে পাই না। তাই অগ্রগতির ধারণা থেকে তাড়াতাড়ি শিখন উপযোগী ভাল ফল পেতে হ'লে, যত কম সময়ের ব্যবধানে সম্ভব এই রিপোর্ট দিতে হবে। সাপ্তাহিক (weekly) বা মাসিক (Monthly) রিপোর্ট দিতে পারলে ভাল হয়। যদি সম্ভব হয় সমষ্টিগতভাবে শ্রেণীর অগ্রগতির চার্ট যদি ছাত্রদের অবগতির জন্য রাখা হয়, তা'হলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অগ্রগতির ধারণা

॥ **পাঁচ** ॥ প্রশংসা (Praise) শিখনের পেছনে প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

---

1. "understood failure challenges effort. Understood success stimulates further effort...From what the pupil knows and understands comes the motive for further learning.";—Wheat ; Foundations of school learning.

যখন শিক্ষার্থীরা কোন বিশেষ কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে, তখন তাদের যদি প্রশংসা করা যায়, তা'হলে তারা শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। অন্যদিকে কোন ভুল শিখন হ'লে, শিক্ষার্থীদের তিরস্কার (Blame) করাও ঠিক উচিত হবে না। ভুল শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পুনঃপ্রচেষ্টায় (Reproof) অনুপ্রাণিত করতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে যথাযোগ্য সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা এবং পুনঃপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করা। সাধারণতঃ দেখা গেছে যারা অন্তর্মুখী (introvert) ছাত্র তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রক্রিয়া শিখনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান বা বহির্মুখী (extrovert) ছাত্রদের ক্ষেত্রে তিরস্কার থেকেও অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রশংসা ও পুনঃপ্রচেষ্টা

॥ **ছয়** ॥ যদিও শিখন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া তবুও দেখা গেছে, দলগত প্রভাব এই প্রক্রিয়ার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই দলগত প্রভাব দু'দিক থেকে শিখনকে প্রভাবিত করে। **প্রথমতঃ** দলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার (Rivalry) মনোভাব জাগ্রত হয়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুরাগ ও মনোযোগ নির্ধারণ করে। মনোবিদ্ **হারলক্** (Hurlock) এক পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব বিশেষভাবে কমবয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে যদি পারেন, তা'হলে তাঁর কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে, এই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকের মনে রাখার দরকার অহেতুক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব অনেক খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ছাত্রদের মধ্যে যাতে ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে, তাদের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিলে, দলগতভাবে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগে। এছাড়া, শিক্ষক নানা কৌশলে, যদি শিক্ষার্থীদের নিজেদের পূর্ব অবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মনোভাব গড়ে তুলতে পারেন তাহলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। আধুনিককালে মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, এই ধরনের আত্মপ্রতিযোগিতামূলক (self-rivalry) মনোভাব শিখনের বিশেষ সহযোগী। **দ্বিতীয়তঃ** অন্য একদিক থেকে দলগত প্রভাব শিখনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এটা হ'ল পারস্পরিক সহযোগিতার (Co-operation) দিক। দলগত ভাবে বাস করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত শিখতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সহযোগিতা পরস্পর

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতা

বিরোধী মনে হ'লেও, তারা একত্রে ব্যক্তির উপর কাজ করে। তাই বার্ণার্ড (Barnard) বলেছেন—"*the modern school which emphasises a socialized setting for instructional activities is capitilizing on proven psychological phenomena*"[1] শিক্ষক বিদ্যালয়ে, এই দুই প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন এবং তাদের শিখনে সাহায্য করবেন।

॥ **সাত** ॥ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ, অনুরাগ সৃষ্টি করার জন্য আর একদিকে শিক্ষককে কাজ করতে হবে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপন যাতে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে পারে সে বিষয়ের দিকে তাঁকে নজর দিতে হবে। অন্যান্য কৌশলের মধ্যে, শিক্ষণ সহায়ক বিভিন্ন বস্তু (Teaching-aids) শিক্ষার্থীর শিখনের প্রতি অনুরাগ ও মনোযোগ আকর্ষণে সহায়তা করে। তাই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষন সহায়ক বস্তু (Teaching-aids) শ্রেণী কক্ষে ব্যবহার করতে হবে। এই সব বস্তু ব্যবহার করলে, অন্য আর একদিকে ভাল ফল পাওয়া যায়, তা'হল শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষণের দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য থাকে। কেউ দেখেও শিখতে পারে, কেউ শুনেও শিখতে পারে। এই ধরনের পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষণ সহায়ক বস্তু থেকে তাদের উপযুক্ত পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। মনোবিদ্ বার্ণার্ড (Barnard) এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন '*Because of their variety and vividness, instructional aids speed and strengthen learning*"[2]

শিক্ষণ সহায়ক বস্তু

॥ **আট** ॥ সবশেষে শিক্ষকের যথাযোগ্য নির্দেশনা (guidance) শিক্ষার্থীদের শিখনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। ভুল সংশোধন, সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষক ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনে সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষকের যথাযোগ্য নির্দেশনা, শিক্ষার্থীদের হতাশামূলক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব যথাযোগ্য নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by learning? How is it related to maturation? Discuss some of the conditions of effective learning
(পৃঃ ২—৮ ; ৬০—৭০)
[C. U. B. T. '62

1-2. Psychology of teaching and learning ; Barnard.

2. How do children learn ? Critically consider Thorndike's major laws of learning. (পৃঃ ৮-১২ ; ১৭-১৯ ; ২২-২৭) [C. U, B. T. '63]
3. Discuss the various theories of learning and indicate which one of them appears to be most satisfactory to you. (পৃ; ১৩-৬৩) [C U.B.T. '64, K.U.B.T. '64]
4. What is the relation between maturity and learning ? How does a child learn ? Discuss the various theories in this connection. (পৃঃ ৬-৮ ; ১৩-৬৩) [C.U.B.T, '65]
5. How are learning and maturation related to each other ? Discuss three principal laws of learning of Thorndike. [C.U.B.T. '67] (পৃঃ ৬-৮ ; ১৭-১৯ ; ২২-২৭)
6. Critically consider learning as a conditioned response. Discuss in this connection. What is meant by unconditioning of responses. (পৃঃ ২৭-৩৭) [K.U.B.T. '66]
7. Clearly explain the trial and error theory of learning. Can this theory fully explain human learning ? Discuss. [K. U. B. T. 69] (পৃঃ ১৩-২৭)
8. What is learning ? What is maturation ? Show how they are related to each other. Discuss the educational implication of the relationship. (পৃঃ ২-৮) [C.U.B.T. '69]
9. Dwell on learning as conditioned response with suitable illustration. A child displays fear of a dog. How can that fear be unconditioned ? (পৃঃ ২৭-৩৭) [C.U.B.T. '70]
10. Discuss the conditioned response theory of learning and show how you would utilize this in helping boys to learn school subjects. (পৃঃ ২৭-৩৭) [C.U.B.A. '62]
11. Discuss thorndike's major laws of learning and show how they can be utilized in helping pupils to learn school subjects. [C.U.B.A. '63] (পৃঃ ১৭-২৭)
12. How is learning usually defined ? What do you understand by trial and error method of learning ? Give examples. [C.U.B.A, '64] (পৃঃ ২-৮ ; ১৩-১৭)
13. Give examples of 'conditioned reflex method of learning. How is fear response conditioned in the child ? [C.U.B A. '66] (পৃঃ ২৭-৩৪)
14. Explain fully the gestalt' theory of learning. Add your own comment. (পৃঃ ৪৫-৫১ ; ৫৬) [C.U.B.A. '68]
15. Define learning. Briefly explain the main theories of learning, (পৃঃ ২ ; ১৩-৬৩) [C,U.B.A. '70]
16. Enunciate and critically discuss Thorndike's major laws of learning, indicating their application in the class rooms. [N.B,U.B.T, '66] (পৃঃ ১৩-১৯ ; ২২-২৭)

17. Note the subjective conditions of learning and consider the teacher's task with regard to them. (পৃঃ ১৩-১৭) [N.B.U.B.T. '69]

18. Analyse thorndikes theory of learning. Can this theory fully explain human learing ? Discuss this question [N B.U.B,T. '70] (পৃঃ ১৩-১৭)

19. Define learning and describe its nature What are the different kinds or types of learning ? What is a learning curve ? (পৃঃ ২-১২) [N.B.U.B.T, '67]

20. Write notes on the following :

(*a*) Classical Conditioning (পৃঃ ২৮- ৩৪)
(*b*) Instrumental Conditioning (পৃঃ ৩৯-৪০)
(c Emotional Conditionting (পৃঃ ৩২-৩৩)
(*d*) Reinforcement (পৃঃ ৪০-৪২)
(*e*) Contiguity theory of Learning (পৃঃ ৩৭-৩৯)
(*f*) Field theory of learing (পৃঃ ৪৫-৪৭)
(*g*) Whole & Part learning (পৃঃ ৬০-৬২)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুকরণ

[IMITATION]

শিখনের তত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা শিখনের বিভিন্ন কৌশল (Mechanism of learning) সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। যেমন, অনুবর্তন (Conditioning), প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি (Trial & error mechanism), অন্তর্দৃষ্টি মূলক পদ্ধতি (Insightful learning) ইত্যাদি। কিন্তু শিখন প্রাথমিক স্তরে খুব সহজ এক কৌশলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাই পৃথকভাবে উল্লেখ করার দরকার। এই প্রাথমিক শিখনের কৌশল হ'ল অনুকরণ (imitation)। মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ছাড়াও কতকগুলো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সব প্রবণতাকে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি (Pure instinct) হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ, তাদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক কেন্দ্র (emotional core) বা আচরণের নির্দিষ্টতা সব সময় বজায় থাকে না। ম্যাকডুগাল তাই এদের নকল সংস্কার (Pscudo instinct) বলেছেন। মানুষের সুস্থ ও সামাজিক জীবন যাপনের দিক থেকে এদের উপযোগিতার কথা শিক্ষাবিদগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে তাঁরা তিন ধরনের প্রবণতার কথা বলেছেন—**অনুকরণ** (imitation), **অনুভাবন** (suggestion) এবং **অনুবেদন** (sympathy)। **ম্যাক্‌ডুগাল**[1] (Mc. dougall) এদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,—**(1) এই তিন ধরনের প্রক্রিয়ার জন্য অন্ততঃপক্ষে দু'জন ব্যক্তির দরকার; একজন প্রভাবক এবং অন্যজন প্রভাবিত ব্যক্তি। (2) একজন ব্যক্তির উপর অপর জন প্রভাবিত করবে এবং একে অন্যের মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে। নান্**[2] (Nunn) এই তিন ধরনের দলীয় প্রবণতার নাম

মানুষের প্রবণতার স্বরূপ

---

1. They are closely allied as regards their effects, for in each case the process in which the tendency manifests itself involves an interaction between at least two individuals of whom one is the agent, while other is the person acted upon or patient."—Mc. Dougall ; Social Psychology.

2. "The general tendency shown by an individual to take over from others their modes of action, feeling and thought". Nunn : Education : its data and first principle.

দিয়েছেন **মেমিসিস্** (Mimesis)। অপরের ক্রিয়াকলাপ, অনুভূতি এবং চিন্তাধারা গ্রহণ করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের মধ্যে আছে নান্ তাকেই বলেছেন, **মেমিসিস্** (mimesis)। এই সব প্রবণতার মধ্যে অনুকরণ, মানুষের নানা রকমের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে বলে, মনোবিদ্‌গণ একে শিখনের এক রকম শিখন কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সুতরাং, এখানে আমরা শুধুমাত্র অনুকরণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অনুকরণের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
[Definition and Nature of Imitation]

পূর্বেই বলেছি, অনুকরণের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তিমূলক আচরণের অনেক মিল আছে। তাই অনেক মনোবিদ্ একে প্রবৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন যেমন, **উইলিয়ম জেমস্** (William James) বলেছেন—"*imitativeness is possessed by man in common with other gragarious animals and is an instinct in the fullest sense of the term*"[1] অর্থাৎ, অনুকরণের প্রকৃতি মানুষ এবং অন্যান্য সমাজবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে সমভাবে থাকে। এই অর্থে, তাকে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির পর্যায়ে বিবেচনা করা যায়। মনোবিদ্ **বল্ড্উইন্** (Baldwin) অনুকরণকে প্রবৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির মত তিনি অনুকরণের প্রবৃত্তিরও (instinct of imitation) পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে, কোন মনোবিদ্ অনুকরণকে অন্যান্য প্রবৃত্তির সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করেন না। তবে তাঁরা প্রত্যেকে স্বীকার করেছেন যে, অনুকরণ যে কোন সামাজিক জীবের মধ্যে বর্তমান থাকে। মানুষের বা প্রাণীর যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তির ক্রিয়াশীলতার একটা দিক হিসেবে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ অনুকরণকে বিচার করেছেন। মনোবিদ্ **রস্** (Ross) অনুকরণকে যূথবদ্ধতার ক্রিয়াগত দিককে বুঝিয়েছেন এবং এই অনুকরণের দরুন দলবদ্ধ প্রাণী একই ভাবে কাজ করে। মনোবিদ্ **ম্যাকডুগাল**ও[2] একই ভাবে অনুকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। **ড্রিভার** (Drever)[3] বলেছেন; অন্যের

অনুকরণের সংজ্ঞা

1. Principles of Psychology ; James.
2. "Imitation is an innate tendency possessed by members of gragarious species, owing to which an individual attempts to copy in himself the actions and movements that he finds in others." Mc. Dougall.
3. "Performing an act seen performed by another, the process being stimulated (and guided) by the seen act" : Drever : Dictionary of Psychology.

দেখে কোন কাজ করাই হ'ল অনুকরণ। এই ধরনের কাজ করার প্রেরণাও আসে অন্যের কাছ থেকে। মনোবিদ্ **থ্যুলেস** (Thouless)[1] একটু অন্যভাবে অনুকরণকে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অন্যে যে ভাবে কাজ করছে, সেই ভাবে কাজ করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি তাই হ'ল অনুকরণ'। মনোবিদ্ **গ্যারেট** (Garrett) অনুকরণকে প্রাণীর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে কোন মানুষকে বিশেষভাবে কাজ করতে দেখে, সেই রকম কাজ করার চেষ্টা করে। তখন আমরা তাকে বলি অনুকরণ (imitation)। সুতরাং, এই সব আধুনিক সংব্যাখ্যান থেকে আমরা বলতে পারি,—**দলগত পরিস্থিতিতে মানুষের, তার সাধারণ প্রবণতার প্রভাবে অন্যের কাজ বা আচরণের রীতিকে গ্রহণ করার পদ্ধতি হ'ল অনুকরণ** (imitation)।

অনুকরণের প্রকৃতি

অনুকরণ মানুষের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য ইতর প্রাণীদের মধ্যেও অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। পাখীর ছানা মায়েদের অনুকরণ করে। একটা কাক ডাকলে, অন্যান্য অনেক কাক স্বর মিলিয়ে তার সঙ্গে ডাকতে আরম্ভ করে। কাকাতুয়া, ময়না ইত্যাদি পাখী যে কথা বলে, তাকেও আমরা অনুকরণমূলক শিখন বলতে পারি। সুতরাং অনুকরণ শুধুমাত্র, একই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এক শ্রেণীর প্রাণী অন্য শ্রেণীর প্রাণীর আচরণ অনুকরণ করতে পারে। বানররা মানুষকে বিশেষভাবে অনুকরণ করে। সার্কাসে যে সব পশুর খেলা দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণভাবে অনুকরণের দ্বারা শিখানো হয়ে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও অনুকরণ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে। একেবারে শৈশবে ছেলেমেয়েরা যে সব আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করে থাকে, তা বিশেষভাবে অনুকরণের জন্য করে থাকে। মায়েরা যখন হাসেন তখন তারা হাসে আবার মায়েরা যখন কাঁদেন তখন তারা কোন কারণ ছাড়াই কাঁদতে থাকে। অনেক রকম দেহ ভংগী শিশুরা বয়স্কদের কাছ থেকে অনুকরণের ফলে শিখে। পরবর্তী জীবনে বিদ্যালয়েও লক্ষ্য করা যায়, অনেক কাজ তারা সমবয়সীদের অনুকরণ করে শিখে। অনুকরণের প্রভাব শুধুমাত্র, শৈশবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বয়স্ক জীবনেও দেখা যায়। বয়স্ক জীবনে এমন অনেক কাজ আছে, যা আমরা শুধুমাত্র অনুকরণের সাহায্যে অন্যের কাছ থেকে শিখি। সবশেষে অনুকরণের আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুকরণ শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে হয় না। দলগত জীবনে অনুকরণের প্রভাব দেখা যায়। মানুষ দলবদ্ধভাবে অনুকরণ করতে পারে। পোষাক পরিচ্ছদ, ফ্যাসান ইত্যাদি আমরা সমাজ

1. "Readiness to follow other person's course of action, which we call imitation"—Thouless : General and Social Psychology.

জীবনে দলগত ভাবে অনুকরণ করে থাকি, সুতরাং এই আলোচনা থেকে অনুকরণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

[এক] **অনুকরণ ইতর প্রাণীর মধ্যেও বর্তমান।**

[দুই] **অনুকরণের প্রভাব বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর বাইরেও দেখা যেতে পারে।**

[তিন] **মানুষের ক্ষেত্রে অনুকরণ সর্বস্তরে হয়ে থাকে। শৈশব থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত তার আচরণের মধ্যে অনুকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।**

[চার] **অনুকরণ সামাজিক স্তরে দলবদ্ধভাবে হতে পারে।**

অনুকরণের প্রকারভেদ
[Types of Imitation]

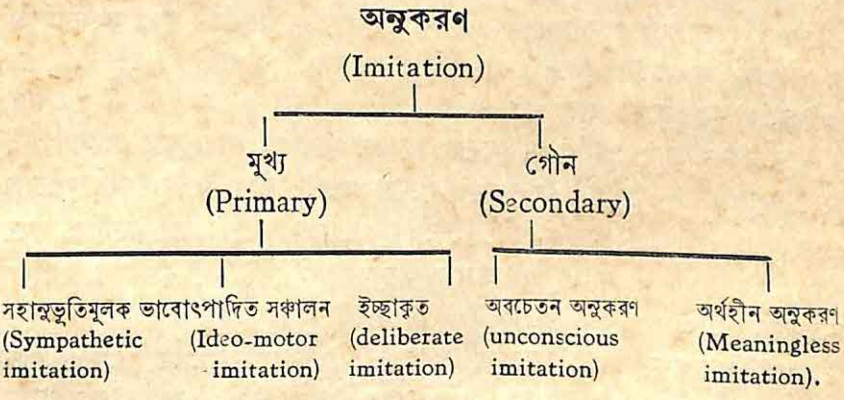
আলপোর্টের শ্রেণী বিভাগ

অনুকরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মনোবিদগণ তাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন যেমন, মনোবিদ **আলপোর্ট** মানুষের আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিন রকমের অনুকরণের কথা বলেছেন। জন্মের পর থেকেই শিশুরা অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। বয়স্কদের অনেক আচরণ এবং শিশুদের প্রাথমিক আচরণ বিশেষভাবে অনুকরণের দ্বারা তারা আয়ত্ব করে। এই সময়ের অনুকরণ অনুবর্তনের (conditioning) দ্বারা বা অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার (conditioned response) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **আলপোর্ট** (Allport) এই অনুকরণের নাম দিয়েছেন **অনুবর্তনমূলক অনুকরণ** (conditioned reflex imitation)। প্রায় এক বছর বয়স পর্যন্ত এই রকমের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। অনেক মনোবিদ্ এতে প্রতিধ্বনত কৌশল (Echo principle) বলেছেন। কারণ, শিশুরা বয়স্কদের আচরণকে প্রতিধ্বনিত করে। দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণ আরও একটু বয়স বাড়লে হয়। এর নাম দিয়েছেন আলপোর্ট (Allport), **এম্প্যাথি** (Empathy)। মায়ের কোলে বসে থাকতে থাকতে, মায়ের দৈহিক বিচলতা দেখলে, শিশুরা অনুরূপ আচরণ করে। মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে অনেকে বল মারার মত করে পা ছুঁড়ে। এই ধরনের দৈহিক বা পেশীয় ক্রিয়ার অনুকরণকে আলপোর্ট বলেছেন এম্প্যাথি। তৃতীয়তঃ ধরনের আচরণকে বলা হয় **সচেতন বা ইচ্ছাকৃত অনুকরণ** (conscious imitation)। এক বছর বয়সের পর থেকে স্ব-ইচ্ছায় শিশুরা বয়স্কদের অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। এই ধরনের ইচ্ছাকৃত আচরণ পরবর্তী জীবনে শিখনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

আলপোর্টের এই শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও, অনেক মনোবিদ অনুকরণের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন, মনোবিদ্ **ড্রিভার** (drever) অনুকরণকে ছ'ভাগে ভাগ করেছেন। [এক] **অবচেতন অনুকরণ** (unconscious imitation)এবং [দুই] **ইচ্ছাকৃত অনুকরণ**(deliberate imitation)। এরকম আরও অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে।

ম্যাক্‌ডুগালের শ্রেণী বিভাগ

তবে ম্যাকডুগালের শ্রেণী বিভাগ অনেক বিস্তৃত তাই তাঁর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। তিনি প্রধানতঃ অনুকরণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন,—[এক] **মুখ্য** (primary) এবং [দুই] **গৌন** (secondary)। তাঁর এই ভাগ বিশেষভাবে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে করা হয়েছে। পরে তিনি মুখ্য অনুকরণ (primary imitation) কে তিনভাগে ভাগ করেছেন [এক] **সহানুভূতিমূলক অনুকরণ** (sympathetic imitation). [দুই] **ভাবোৎপাদিত সঞ্চালনমূলক অনুকরণ** (Ideo motor imitation) এবং [তিন] **ইচ্ছাকৃত অনুকরণ** (deliberate imitation)। অন্যদিকে গৌন অনুকরণকে (secondary imitation) তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন [এক] **অবচেতন অনুকরণ** (unconscious imitation) এবং [দুই] **অর্থহীন অনুকরণ** (meaningless imitation).



সহানুভূতিমূলক অনুকরণ

সহানুভূতিমূলকঅনুকরণ (Sympathetic imitation) শিশু এবং বয়স্ক সকলের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের অনুকরণের পেছনে কোন রকম সচেতন মানসিক ইচ্ছা থাকে না। গোষ্ঠী জীবনে পারস্পরিক সহানুভূতির ভাগ থেকে এই ধরনের ক্রিয়ার অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। অন্যকে হাসতে দেখলে আমরা অনেক সময় হাসি আবার অন্যকে কাঁদ্‌তে দেখলে অনেক সময় আমাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

অনেক সময় একই রকমের ধারণা থাকার জন্য দেহ সঞ্চালনের অনুকরণ

লক্ষ্য করা যায়। যেমন ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে অনেকে পা নাড়াচাড়া করে। হাতে ঘড়ি না থাকলেও অন্যে ঘড়ি দেখলে নিজের হাতের দিকে তাকাই। ক্রিকেট খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা বল মারারজন্য ব্যাট তুললো দর্শকরাও অনুরূপভাবে হাত নাড়ে। অর্থাৎ, মনের বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে এইধরনের অনুকরণআমরা করে থাকি। খেলার মাঠে আমরা যখন এই রকম অনুকরণ করি, তখন, আমাদের মনে একটা দৃঢ়মূল ধারণা থাকে যে আমরা যেন খেলছি।

ভাবোৎপাদিত সঞ্চালনমূলক অনুকরণ

ইচ্ছাকৃত অনুকরণ (deliberate imitation) আমরা সচেতনভাবে করে থাকি। কারও কোন কিছু ভাল দেখলে, আমরা অনুকরণ করার চেষ্টা করি। পোষাকের ডিজাইন, হাতের লেখা, বাচন ভংগী ইত্যাদি আমরা অন্যের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুকরণ করে থাকি অর্থাৎ সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা যখন অন্যের আচরণ অনুকরণ করি তখন তাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত অনুকরণ (deliberate imitation)।

ইচ্ছাকৃত অনুকরণ

অবচেতন অনুকরণ (unconscious imitation) সাধারণতঃ শৈশবে দেখা যায়। তবে বয়স্কদের জীবনেও এ ধরনের অনুকরণ দেখা যায়। বিশেষভাবে সামাজিকীভবন (socialization) এই ধরনের অবচেতন অনুকরণের প্রভাবে হয়ে থাকে। কোন রকম চিন্তা বা বিচার বিবেচনা না করে যখন আমরা অন্যের আচরণ অনুকরণ করি তখন তাকে বলা হচ্ছে, অবচেতন অনুকরণ। আমাদের অনেক সামাজিক আচরণ আমরা এইভাবে অনুকরণের দ্বারা গ্রহণ করি।

অবচেতন অনুকরণ

অনেক সময় শিশুরা এমন অনেক আচরণ অনুকরণ করে, যার কোন অর্থই তারা বুঝে না। শুধুমাত্র অনুকরণ করার জন্যই তারা এই ধরনের আচরণ করে থাকে। জৈবিক প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে করে না। এই রকম অনুকরণকে সেই জন্য বলা হয় অর্থহীন অনুকরণ (meaningless imitation)।

অর্থহীন অনুকরণ

এই প্রত্যেক রকম অনুকরণই ব্যক্তির জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম অনুকরণ কমে যায়। কিন্তু তা'হলেও এটা ঠিক যে প্রত্যেক বয়সেই মানুষ অনুকরণ করে। যদিও তার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এ প্রসঙ্গে, আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

অনুকরণের সূত্র
[Laws of Imitation]

মনোবিদগণ অনুকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য

নির্দেশ করেছেন। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুকরণের সূত্র (law of imitation) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সূত্রগুলো—

প্রথমত ঃ, অনুকরণ সব সময় উপরের দিক থেকে নীচের দিকে যায়। অর্থাৎ, বয়স্কদের আচরণ শিশুরা অনুকরণ করে ; সামাজিক দিক থেকে উন্নত মানের ব্যক্তি নিম্ন-মানের ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সমাজ ব্যবস্থার দিকে এর গতি থাকে। তাই ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন *Imitation proceeds from higher to the lower.*

দ্বিতীয়ত ঃ, মনোবিদগণ মনে করেন, আমাদের মানসিক চিন্তা ও ধারণাই কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনুকরণ প্রথমে হয় অন্তরের অর্থাৎ ধারণার বা চিন্তার তার পরে হয় আচরণের। অর্থাৎ অনুকরণ প্রথমে হয় আভ্যন্তরীণ পরে হয় বাহ্যিক।

তৃতীয়তঃ, যদিও প্রথমে অনুকরণ মানসিক পর্যায়ে হয়, কিন্তু পরে দেখা গেছে চিন্তার ক্ষেত্রে অনুকরণ কমে যায় এবং আচরণের অনুকরণ বা বাহ্যিক আচরণটাই ব্যক্তির মধ্যে প্রধানভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই আচরণটা স্থায়ী হয়। ফলে অনুকরণমূলক আচরণ থেকে ধীরে অভ্যাস গঠিত হয়।

চতুর্থতঃ, সমাজের মধ্যে অনুকরণের প্রভাব খুব দ্রুত হারে হয়। অর্থাৎ, অনুকরণমূলক আচরণ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনুকরণের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়। একজন কোন আচরণ অনুকরণ করলে, তার কাছ থেকে আরও দুই জন বা আরও বেশী তা অনুকরণ করে। আবার তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আরও অনেকে অনুকরণ করে। এমনি ভাবে গুনোত্তর প্রগতিতে (geometric progression) অনুকরণ ছড়িয়ে পড়ে

মানবজীবনে অনুকরণের গুরুত্ব

[Importance of imitation in human life]

শিক্ষাবিদ্ **নান্** (Nunn) মানব জীবনে অনুকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"*The most original minds find themselves only in playing the sedulous ape to others who have gone before them along the same path of self assertion.*"[1] অধ্যাপক নানের এই মন্তব্য থেকে বুঝা যায় অনুকরণ মানব জীবনের বিকাশে এবং মানব সভ্যতার বিকাশে কি পরিমাণ সহায়তা করেছে। সাধারণভাবে

1. Education : its data & first principle : Nunn,

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব
[Theory of Formal Discipline]

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কে ধারণা ছিল একটু অন্যরকমের। তাঁরা মনে করতেন, 'মন' বা 'আত্মা' একটা একক সত্ত্বা। তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায় না। সুতরাং, যে অভিজ্ঞতা মনের এক অংশকে প্রভাবিত করে, তা সমভাবে সম্পূর্ণ মনকে প্রভাবিত করে। সঞ্চালনের কোন সমস্যাই নেই এই বিশ্লেষণে। কিন্তু আধুনিক যুগের সূত্রপাতে, মনের ধারণার কিছু পরিবর্তন হ'ল। মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) গড়ে উঠল। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিক এবং মনোবিদ্‌গণ মনকে একটা জটিল যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হ'ল—পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা (faculty of observation), স্মরণ শক্তি (faculty of memory), যুক্তি শক্তি (faculty of reasoning), বিচারশক্তি (faculty of judgement), ইচ্ছাশক্তি (faculty of volition) ইত্যাদি এ রকম আরও শক্তি (Power)। অর্থাৎ মন, কতকগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলো শক্তির সমবায় মাত্র। আর অভিজ্ঞতা হ'ল কাঁচামাল (Raw material) যা ঐ মনরূপ যন্ত্রের মধ্যে যায় এবং সেখানে বিচারশক্তি তার মূল্যায়ণ করে, যুক্তি.শক্তি তাকে যথাযথ ক্রমে সাজায়, স্মৃতি শক্তি তাকে ধারণ করে রাখে **প্লেটো** (Plato) তাঁর 'রিপাবলিক (Republic) এ শাসক শ্রেণীর শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন গণিত শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলে, তার চরম পরিণতি এবং প্রভাব আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত দেখতে পাই। এই সব মানসিক শক্তি বাদীগণ মনে করতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল—মনের বিভিন্ন শক্তিকে উন্নত করা (Disciplined)। শিখনের দ্বারা মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা যায়। বিশেষ এক শ্রেণীর বিষয় (Subject), বিশেষ এক ধরনের শক্তিকে চর্চার সুযোগ দেয়, এবং এর ফলে তার বৃদ্ধি হয়। এখন, যে কোন কাজে যেখানে ঐ শক্তির প্রয়োজন, সেখানে, তা ঐ বর্দ্ধিত হারে কাজ করে। এইভাবে এক পরিস্থিতির শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। একেই বলা হয় শিখন সঞ্চালনের **মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্ব** (Theory of formal discipline)। **জন লক্** (John Locke) এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—"*We are born with faculties and powers capable of almost anything......but it is only the exercise of those powers which give us ability and skill in anything and lead us toward perfection.*" মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বে বিশ্বাসীগণ

মানসিক শক্তিবাদ ও শৃঙ্খলাতত্ত্ব

বিশেষভাবে গণিত ও ল্যাটিন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ তাঁদের ধারণা এই দুটো বিষয় মনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলোকে চর্চ্চার দ্বারা বাড়িয়ে তুলে। **কুইন্টিলিয়ন** (Quintilian), **লক্** (Locke) প্রভৃতি ল্যাটিন শিক্ষার উপর এ জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ল্যাটিন পড়লে মনের সব রকম শক্তির উন্নতি হয়, এবং এই শিখন যে কোন রকম বিষয় আয়ত্বে আনতে সহায়তা করে, এমন কি, জীবনের অন্যান্য সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করে। যেমন, **পেইনি** (Payne) বলেছেন—'*The study of latin language itself does eminently disciplined the faculties and secure to a greater degree than that of the other subject.........the formation and growth of these mental qualities which are the best preparation for the business of life—whether that business is to consist in making fresh mental acquisitions or in direction the powers thus strengthened and matured to professional and other persuits.*" গণিতে শিখন সম্পর্কেও তিনি বলেছেন এই বিষয়ের দ্বারা শিক্ষার্থী মনযোগ, যুক্তিশক্তি, নির্ভুল গণনার ক্ষমতা বিকাশ করা যায় (Arithmatic if judiciously tought, forms in the pupil the habit of mental attention, argumentive sequence, absolute accuracy etc.)। এই ধরনের চিন্তাধারার কাল বহুদূর বিস্তৃত হওয়ার দরুন, প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সমস্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তা বহুদিন ধরে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাদের পাঠ্যক্রম (Curriculum) নির্ধারণে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, **ঈয়েল** (Yale) বিশ্ববিদ্যালয় যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন সেখানেও আমরা এই তত্ত্বের গুরুত্ব দেখতে পাই। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে—*A commanding object, therefore, in a collegiate course should be to call into daily and vigorous exercise the faculties of the students.*"

আলোচনা

এই মানসিক শক্তিবাদ, যা সুদৃঢ়ভাবে বহুযুগ ধরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে, তার উপযোগিতাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। **হার্বাত** (Herbert) প্রভৃতি চিন্তাবিদগণের সন্দেহ প্রকাশ সত্ত্বেও যে মতবাদ মনোবিদ্যার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল; তার মূলে প্রথম আঘাত হানেন **উইলিয়ম জেমস্** (William James)। আধুনিক মনোবিদগণ তাই এখন আর শৃঙ্খলাতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে মানসিক শক্তিবাদও (faculty Psychology) পরিত্যক্ত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, শিখনের সঞ্চালন কিছু পরিমাণে হ'লেও তার স্বরূপ মানসিক-শক্তিবাদীগণ

just the opposite result from that which the popular view would lead one to suspect, কিন্তু, জেমসের পদ্ধতির ভেতর অনেক ত্রুটি ছিল। তাই, বর্তমানকালে মনোবিদ্‌গণ জেমস্‌-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মানেন না। যেমন **র‍্যাপ** (Rapp) **জেমস্** এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেছেন—"*This did not make any sense at all, unless we are to conclude that learning renders one increasingly stupid and progressively more unteachable,*" শিখনের ক্ষেত্রে মানসিক অবসাদ (Mental fatigue). একঘেঁয়েমি (monotony), বিষয় বস্তু কাঠিন্য (Difficulty value of the learning materials) ইত্যাদিকে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি বলেই জেমস্ এ ধরনের ফল পেয়েছেন। তাই জেমস্ এর পরীক্ষার আধুনিক কালে কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, জেমস্‌ই প্রথম তাঁর এই পরীক্ষা থেকে বহু প্রচলিত মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাই জেমস্ এর পরীক্ষার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে আধুনিক মনোবিদ্ **গ্যারেট** (Garrett) মন্তব্য করেছেন "*This experiment of James was inadequate in method and inconclusive in results, but it possesses historical significance since it started the experimental attack upon the problem of the extent of transfer through special practice,*" মনোবিদ্ **গেটস্** ও (Gates) একইভাবে জেমস্ এর এই পরীক্ষার মূল্যায়ণ করেছেন। **কোলেসিনক** (Kolesnik) বলেছেন, জেমস্ এর পরীক্ষা পরবর্তীকালে মনোবিদ্‌গণের সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে (*he inspired latter educational psychologists to refine their experimental techniques and persue the question further.*

সঞ্চালনে পরীক্ষা পদ্ধতি ও সঞ্চালনের পদ্ধতি

জেমস্‌-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত শিখন সঞ্চালনের উপর বহু পরীক্ষা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শিখনের সঞ্চালন কি ভাবে হয় তা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের এই সব পরীক্ষা থেকে শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। আধুনিক পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার সঞ্চালনের পরীক্ষা করার জন্য একটা সাধারণ রীতি অনুসরণ করা হয়। এই সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকলে পরীক্ষাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে। তাই পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করার পূর্বে আমরা এই সাধারণ পদ্ধতির উল্লেখ করব। সাধারণতঃ এক দল পরীক্ষার্থীকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ এমন ভাবে করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে সমতা

থাকে। বিশেষভাবে যে বিষয়ের সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা করা হবে, সেই বিষয়ের ক্ষমতার দিক থেকে এই সমতা লক্ষ্য করা হয়। এই সমতা নির্ণয়ের জন্য ঐ বিষয়ের ক্ষমতা পরিমাপক একটা অভীক্ষা (Test) তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই অভীক্ষার ফলাফল থেকে দু'টো দলের প্রাথমিক ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়। এর পর একটা দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাখা হয় এবং অন্য দলকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রথম দলকে বলা হয় পরীক্ষামূলক দল (Experimental group) আর দ্বিতীয় দলকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (controlled group)। কিছুদিন ধরে পরীক্ষামূলক দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণ (Training) দেওয়ার পর আবার দু'দলের ক্ষমতা পরিমাপ করে দেখা হয় অপর একটা অভীক্ষার দ্বারা। এখন, যদি প্রথম দল (Experimental group) দ্বিতীয় দলের (Controlled group) চেয়ে শেষ অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় তা'হলে বুঝতে হবে অনুশীলনের জন্য তাদের সঞ্চালন হয়েছে। একে বলা হয় ধনাত্মক সঞ্চালন (positive transfer)। যদি দেখা যায় প্রথম দল, দ্বিতীয় দলের চেয়ে খারাপ করেছে, তা'হলে বুঝতে হবে অনুশীলন তাদের সঞ্চালনে সাহায্য করে নি শুধু নয়, তাদের ঐ ক্ষমতার বিকাশকে ব্যহত করেছে। একে বলা হয় ঋণাত্মক সঞ্চালন (Negative transfer)। আর যদি দেখা যায় উভয় দল পরবর্তী পরীক্ষায় একই রকম দক্ষতা প্রদর্শন করেছে, তখন বলা হবে কোন সঞ্চালনই হয় নি বা শূন্য পরিমাণ সঞ্চালন হয়েছে (No transfer or, Zero transfer)। অর্থাৎ, বিশেষ প্রশিক্ষণ পরবর্তী পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে নি। মনোবিদ্‌ **আলপোর্ট** (Alport) এই ধরনের পরীক্ষার রীতিকে একটা ছকের সাহায্যে পরিবেশন করেছেন—

পরীক্ষামূলক দল (Experimental group) : → বিশেষ মানসিক অভীক্ষার প্রয়োগ (T_1) → বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন → পুনরায় T_1 প্রয়োগ

নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group) : → বিশেষ মানসিক অভীক্ষার প্রয়োগ (T_2) → কোন বিশেষ অনুশীলন নয় → পুনরায় T_1 প্রয়োগ

এই রীতি অনুসরণ করে, অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে সঞ্চালনের উপর। এই রকম কয়েকটা পরীক্ষার আলোচনা করলে, আমরা সঞ্চালনের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারব। যে সব বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা হয়েছে, তাদের প্রকৃতি বিচার করে আমরা দু'ভাগে এই সব পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমতঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা; দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর উপর পরীক্ষা।

বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা

[Experiments on different types of learning materials]

[এক] **সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক শিক্ষণীয় বিষয়-**

বস্তু (Sensory motor learning materials): ওয়েব (Webb) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সব শিক্ষায় সংগ্রাহক (Receptor) এবং চালক যন্ত্রের (motor organ) সমন্বয় প্রয়োজন হয়, সেই সব বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে কি ভাবে সঞ্চালন হয় তার উপর পরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল ধাঁধার শিখনের উপর (Maze learning)। তিনি প্রথম কাগজে রেখা টেনে কতকগুলো ধাঁধা তৈরী করেন। এরপর, তিনি বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে একটা নির্দেশক (stylus) এর সাহায্যে একটা বিশেষ নক্সার উপর হাত চালনা করিয়ে অনুশীলন করান। এই অনুশীলনের প্রভাব কতটা অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, তা পরীক্ষা করার জন্য অন্যান্য নক্সা-গুলোর মধ্যেকার পথ নির্দেশ করতে বলেন। এই সব পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এই ধরনের সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক কাজের শিখনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অবস্থায় শতকরা ১৯ থেকে ৭৭ ভাগ ধনাত্মক শিখন সঞ্চালন (Positive transfer) হয়।

ওয়েব এর পরীক্ষা

[দুই] **প্রত্যক্ষণমূলক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু** (**Perceptual learning material**): প্রত্যক্ষণমূলক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঞ্চালনের ক্ষেত্রে, অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। যে সব বিষয়বস্তু শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর আদর্শ প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন তাদেরই প্রত্যক্ষণমূলক বিষয়বস্তু বলা হচ্ছে। এই ধরনের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঞ্চালনের ক্ষেত্রে **থর্নডাইক** (Thorndike) এবং **উডওয়ার্থের** (Woodworth) পরীক্ষা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। থর্নডাইক এবং উড্ওয়ার্থের (Thorndike and Woodworth) নানান রকম পরীক্ষা করেছেন। এই সব পরীক্ষার মধ্যে বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের (Estimates of areas of different geomatrical figure) পরীক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রথম পরীক্ষার্থীদের ১০ বর্গ সেন্টিমিটার থেকে ১০০ বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অনুশীলন করান। অনুশীলন, শুধুমাত্র চোখে দেখে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার উপর করা হয়। এর পর তাঁরা এই শিখনের প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে কতটা সঞ্চালিত হয় তা পরীক্ষা করার জন্য ঐ সব পরীক্ষার্থীকে চোখে দেখে অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বললেন। এই পরীক্ষা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন—

উডওয়ার্থ-থর্নডাইকের পরীক্ষা

(১) একই আকার ও ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বেলা সঞ্চালনের পরিমাণ—৪৪%
(২) একই আকার কিন্তু বেশী ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বেলা সঞ্চালনের পরিমাণ—৩০%
(৩) ভিন্ন আকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বেলা সঞ্চালনের পরিমাণ—৫২%

আর একটা পরীক্ষায় থর্নডাইক এবং উডওয়ার্থ পরীক্ষার্থীদের রেখার

দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের (Estimation of length) ক্ষমতার সঞ্চালন দেখেন। তাঁরা পরীক্ষার্থীদের '৫ থেকে ১'৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের রেখাকে প্রত্যক্ষণের অনুশীলন করিয়ে তার প্রভাব ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের উপর পরীক্ষা করে দেখেন। এই পরীক্ষা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে এই সব ক্ষেত্রে কোন সঞ্চালন হয় না। অনুরূপভাবে ওজন নির্ণয়ের (estimation of weight) বেলা তাঁরা অনুরূপভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে 40% সঞ্চালন হয়। আবার কোন ছাপা অংশ থেকে কাটার অভীক্ষা (cancellation test) প্রয়োগ করে দেখেন একটা বিশেষ অক্ষর কাটার শিখন, অন্য কোন অক্ষর কাটার ক্ষেত্রে কতটা সঞ্চালিত হয়। এই পরীক্ষায় তারা 25% সঞ্চালন লক্ষ্য করেন।

[ক] এই ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে **থর্নডাইক** এবং **উড্ওয়ার্থ** (Thorndike and Woodworth) কতকগুলো সাধারণ সিদ্ধান্ত করেন প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের ক্ষেত্রে। তাঁরা বলেন—**শিখনের সঞ্চালন সার্বজনীন নয়।**

[খ] অর্থাৎ সব রকম শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালন হয় না। যেমন তাঁরা তাদের রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন। **শিখন সঞ্চালনের পরিমাণ বিভিন্ন শিক্ষণ পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়।**

[তিন] স্মৃতি সংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (Memory materials) : বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু মুখস্থ করার ক্ষমতা কিভাবে বিষয়ান্তরে সঞ্চালিত হয় তার পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেছেন।

স্লাইট্ এর পরীক্ষা

ইংরেজ মনোবিদ্ **স্লাইট্** (W. G. Slight) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার যে ফল প্রকাশ করেন, তার থেকে আমরা কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত করতে পারি না। তিনি তাঁর পরীক্ষার্থীদের গদ্য (prose), কবিতা (poetry), চিঠি (letters), অর্থহীন বর্ণসমষ্টি (Nonesense syllable), রাশিবিজ্ঞান ব্যবহৃত সংখ্যা ছক (statistical table) ইত্যাদি নানা ধরনের বিষয় মুখস্থ করান। এবং তাদের পারস্পরিক ক্ষেত্রে কি পরিমাণের সঞ্চালন হয় তা নির্ণয় করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সঞ্চালন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণের ও বিভিন্ন প্রকৃতির সঞ্চালন হয়ে থাকে। কোন ক্ষেত্রে সঞ্চালনের পরিমাণ খুবই নগণ্য ; আবার কোন ক্ষেত্র সঞ্চালন একেবারেই হয় না ; কোথাও বা ঋণাত্মক সঞ্চালনও হয়। স্লাইট্ তাঁর পরীক্ষা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত করেন যে **স্মৃতির সঞ্চালন মানসিক শৃঙ্খলাবাদের (Theory of formal discipline) উপর নির্ভরশীল নয়। অনুশীলনের দ্বারা স্মরণ করার ক্ষমতাকে বাড়ানো যায় না।** স্লাইটের পর আরও অনেক মনোবিদ স্মৃতির উপর পরীক্ষা করেন। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে

স্লাইটের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ সঞ্চালন লক্ষ্য করেন। কিন্তু এই সব মনোবিদ প্রত্যেকেই স্লাইটের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এক মত।

[চার] যুক্তিক্ষমতার সঞ্চালন (Transfer of Reasoning) ঃ যুক্তির ক্ষমতার সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা করেন মনোবিদ **উইঞ্চ** (W. H. Winch)। তিনি এই পরীক্ষা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাহায্যে করেন। দু'দল ছাত্রের উপর প্রথম একটা যুক্তির অভীক্ষা (Test of reasoning) প্রয়োগ করে তাদের প্রাথমিক যুক্তি শক্তি পরিমাপ করেন। পরে একদলকে দশ সপ্তাহ ধরে বিশেষ ভাবে যত্ন করে পাটীগণিত অনুশীলন করানো হয়। অন্যদল স্বাভাবিক পাঠ্যসূচী অনুশীলন করে পড়ে যেতে থাকে। দশ সপ্তাহ পরে উভয় দলের যুক্তির ক্ষমতা আবার অভীক্ষার (Test) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এই শেষ পরীক্ষায় পরীক্ষামূলক দল (Experimental group) অর্থাৎ যাদের বিশেষ অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তারা শতকরা 30 ভাগ বেশী নম্বর পায়। এর থেকে উইঞ্চ সিদ্ধান্ত করেন যে—**গাণিতিক যুক্তির অনুশীলন অন্যান্য যে কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়।** **বার্লো** (M. C. Barlow) নামে আরও এক মনোবিদ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তি শক্তির সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা করেন। যুক্তিকে ক্রিয়াশীল করার জন্য যে সব মানসিক ক্ষমতার দরকার সেগুলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেন। যেমন—বিশ্লেষণ (Analysis), বিমূর্তিকরণ (Abstraction), সামান্যীকরণ (Generalisation) ইত্যাদি। এই প্রত্যেক ক্ষমতার অনুশীলন করিয়ে পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার সঞ্চালনের পরিমাণ নির্ণয় করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে এই শিখন যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়।

উইঞ্চ এর পরীক্ষা

[পাঁচ] আদর্শের সঞ্চালন (Transfer of Ideals) ঃ আদর্শ (ideals) কি ভাবে এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন মনোবিদ **বাগ্‌লে** (W. C. Bagley)। তিনি একদল ছাত্রকে বিশেষ ভাবে অংকের খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখার নির্দেশ দেন। এই বিষয়ের প্রতি তিনি ছাত্রদের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তারা যখন অংক খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখার আদর্শ গড়ে তুললো, তখন তিনি তাদের অন্যান্য বিষয়ের খাতাগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন, তিনি দেখলেন ভাষার সাহিত্যের খাতায় বা অন্যান্য বিষয়ের খাতায় এই আদর্শ সঞ্চালিত হয় নি। এই সব খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া তো দূরের কথা বরং তাদের সাধারণ অবস্থা থেকে খারাপ হয়েছে। এই পরীক্ষার বিবরণ বাগ্‌লে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত 'Educational values' নামে এক পুস্তিকায় দিয়েছেন। আদর্শের

বাগ্‌লো ওরুডিগারের পরীক্ষা

সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তাঁর এই সন্দেহ প্রকাশ করার দরুন বিভিন্ন মনোবিদ্ পরবর্তীকালে আরও অনেক পরীক্ষা করেন এবং ভিন্ন সিদ্ধান্ত করেন। যেমন **রুডিগার** (W. C. Ruediger), একই ধরনের পরীক্ষায় তাঁর পরীক্ষারীতির একটু পরিবর্তন করে অন্যরকম ফল পান। তাঁর ধারণা বাগ্‌লের পদ্ধতিতে ছাত্ররা সাধারণ আদর্শ গড়ে তোলার সুযোগ পায় নি; শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে অঙ্কের খাতায় লেখার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন করেছে মাত্র। আর সেই জন্যই অভ্যাস এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় নি। রুডিগার তাই সামগ্রিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তার অনুশীলন করান। পরে পরীক্ষা করে তিনি দেখেন এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে **যে কোন মানসিক ক্রিয়াকে আদর্শের স্তরে উন্নীত করে অন্য যে কোন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করা যায়।**

বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য বিষয়ের উপর পরীক্ষা

[Experiment on different school-subjects]

বিদ্যালয়ে যে সব বিষয় পড়ানো হয়, তাদের ক্ষেত্রে কি ভাবে সঞ্চালন হয় তার উপর আজ পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষার মধ্যে যে গুলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তাদের কতকগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করব।

[এক] **ব্যাকরণ শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer value of Grammar]**—ব্যাকরণের শিক্ষা কিভাবে ভাষা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে তা পরীক্ষা করার জন্য অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। **ব্রিগস** (Briggs) সমান বুদ্ধি সম্পন্ন দু'দল ছেলের মধ্যে এক দলকে তিন মাস ধরে শুধুমাত্র ব্যাকরণ পড়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং অন্য দলকে সাধারণ নিয়মের ভাষা শিখার সুযোগ দেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি লক্ষ্য করেন পরীক্ষামূলক দল (experimental group), কেবলমাত্র একটা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে এবং সাধারণভাবে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করতে পেরেছে। এটা হ'ল বিভিন্ন শব্দের মধ্যে মিল ও পার্থক্য (likeness and difference) খুঁজে বের করার ক্ষমতা। অর্থাৎ; যাঁরা বিশেষভাবে ব্যাকরণ পড়েছে তারা সহজে এই মিল বা অমিল বুঝতে পারে ভাষা পড়তে গিয়ে।

ব্রিগস্-এর পরীক্ষা

[দুই] **পাটীগণিত শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer Value of Arithmatic]**: **উইঞ্চ** (Winch) যুক্তি শক্তির উপর যে পরীক্ষা করেন,

পাটীগণিতের ক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একদল ছাত্রকে দশ সপ্তাহ ধরে পাটীগণিত বিশেষভাবে পড়ানোর পর দেখেন

উইঞ্চ এর পরীক্ষা

যে তাদের গাণিতিক যুক্তির সঞ্চালন শতকরা ৩০ ভাগ অন্য পরিস্থিতিতে হয়েছে।

[তিন] **জ্যামিতি শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer value of Geometry]:** রাগ্ (H. O. Rugg) নামে একজন মনোবিদ্ জ্যামিতির সঞ্চালনের উপর এক পরীক্ষা করেন। শুধুমাত্র জ্যামিতি অনুশীলন করিয়ে তার প্রভাব তিনি অন্যান্য বিষয় শিক্ষণের উপর পরিমাপ করেন।

রাগের পরীক্ষা

পরীক্ষা থেকে রাগ্ সিদ্ধান্ত করেন যে জ্যামিতির বিশেষ প্রশিক্ষণ জ্যামিতির অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শতকরা ৩২ ভাগ সঞ্চালিত হয়, কিন্তু, জ্যামিতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয় মাত্র শতকরা ৭ ভাগ।

[চার] **ল্যাটিন শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer value of Latin]:** পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ল্যাটিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। তাই সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ল্যাটিনের উপর নানান রকম পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রাচীন

কক্স এর পরীক্ষা

ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষা শিখনের উপর ল্যাটিন শিক্ষার প্রভাব অনুশীলন করেন মনোবিদ্ কক্স (coxe)। তাঁর পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে ল্যাটিনের বিশেষ অনুশীলন ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে সাহায্য করে মাত্র। কেবলমাত্র ল্যাটিন উদ্ভূত ইংরেজী শব্দগুলোকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করতে সহায়তা করে। কক্সের এই পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকে আধুনিক মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ল্যাটিনের মানসিক শৃঙ্খলাগত কোন বিশেষ সার্বজনীন মূল্য নাই।

[পাঁচ] **উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer value of Botan]:** হিউইনস (Hewins) নামে একজন মনোবিদ কি ভাবে উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষা সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, তা পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি পরীক্ষামূলক দল (Experi-

হিউইনস এর পরীক্ষা

mental group) কে বিশেষ ভাবে উদ্ভিদ বিদ্যার পাঠ দিয়ে পরে পরীক্ষা করে দেখেন তা কতটা সাধারণ পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ শিখনের প্রভাব উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৩

ভাগ সঞ্চালিত করে, কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ৪.৫% ভাগ সঞ্চালিত করতে পারে।

[ছয়] **বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের আপেক্ষিক সঞ্চালন মূল্য [Relative transfer value of different School Subjects] :** বিভিন্ন স্কুল পাঠ্য বিষয়ের আপেক্ষিক সঞ্চালনের উপর এবং এক বছর বিদ্যালয়ের পাঠ্যের প্রভাবের উপর বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন **থর্নডাইক** (Thorndike)।

থর্নডাইকের পরীক্ষা

এক বছরে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন কিভাবে সাধারণ বুদ্ধি বৃত্তিকে প্রভাবিত করে তা নির্ণয়ের জন্য থর্নডাইক এক বিশদ পরীক্ষা করেন। তাঁর এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এক বৎসরের বিদ্যালয়ের শিখন সাধারণভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শতকরা ২৩ ভাগ সঞ্চালিত হয়। তিনি পরীক্ষালব্ধ ফলকে আরও বিশ্লেষণ করে দেখেন যে বেশী বুদ্ধিমান ছাত্ররা বেশী পরিমাণে সঞ্চালিত করে। অপর দিকে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রেরা কম পরিমাণে সঞ্চালন করে থাকে। থর্নডাইকের এই পরীক্ষার একটা তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হ'ল যে **সঞ্চালনের পরিমাণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যাঙ্কের (I. Q.) উপর নির্ভরশীল।** এছাড়া, প্রায় ১৩৫০০ শিক্ষার্থীর উপর কয়েক বছর পরীক্ষা করে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের (School subject) আপেক্ষিক সঞ্চালন মূল্যও নির্ণয় করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ।

বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি......	+৩.০
পৌরনীতি, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা সমাজবিদ্যা......	+২.৯
রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান......	+২.৭
পাটীগণিত, বুক কিপিং......	+২.৬
ব্যায়াম, খেলাধূলা......	+০.৮
বাণিজ্যিক বিষয়, অংকন, ইংরাজীভাষা, ইতিহাস, গান	০.০
রন্ধন শিল্প, সূচী শিল্প, স্টেনোগ্রাফী......	−০.১
জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শরীরবিদ্যা ইত্যাদি	−০.২
অভিনয়	−০.৫

শিখন সঞ্চালনের উপর যে সব পরীক্ষার কথা আমরা উল্লেখ করলাম তা সংক্ষেপে নীচের ছকের সাহায্যে আমরা পরিবেশন করতে পারি।

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষণীয় বিষয় বস্তু	পরীক্ষক	সঞ্চালনের পরিমাণ
1.	সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয় মূলক শিখন—ধাঁধার শিখন	ওয়েব্ (Webb)।	19%—77% সঞ্চালন
2.	প্রত্যক্ষণ মূলক শিখন-ক্ষেত্রফল নির্ণয়	থর্নডাইক ও উড্ওয়ার্থ (Thorndike&Wood-worth)	বিভিন্ন ক্ষেত্রে 30%—52% সঞ্চালন
3.	স্মিতি মূলক শিখন	স্লাইট্ (Sleight)	কোন কোন বিষয়ে নগণ্য ধনাত্মক সঞ্চালন আবার কোথায় ঋণাত্মক সঞ্চালন
4.	যুক্তির ক্ষমতার সঞ্চালন	উইঞ্চ	30% সঞ্চালন
5.	আদর্শ	বাগ্লে ও রুডিগার (Baglay &Ruediger)	সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন
6.	ব্যাকরণ	ব্রিগস্ (Briggs)	মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা সঞ্চালন
7.	পাটীগনিত	উইঞ্চ (Winch)	30% সঞ্চালন
8.	জ্যামিতি	রাগ (Rugg)	জ্যামিতিক ক্ষেত্রে-32% অন্য ক্ষেত্রে—7% সঞ্চালন
9.	ল্যাটিন	কক্সে (Coxe)	কেবলমাত্র ল্যাটিন+ধাতু উদ্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে সঞ্চালন
10.	উদ্ভিদ বিদ্যা	হিউইনস্ (Hewins)	উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণে—33% অন্যান্য পর্যবেক্ষণে— 4·5%

বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

[General discussion of Transfer Experiments]

সঞ্চালন সম্পর্কে আমরা যে সব পরীক্ষার উল্লেখ করেছি তার থেকে মনোবিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে শিখনের সঞ্চালন হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ শিখন সঞ্চালন যে হয়, তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমান করলেন। কিন্তু এ কথা তাঁরা বিশ্বাসও করেন যে এই সঞ্চালন সীমাহীন নয়। বিখ্যাত মনোবিদ **ওরাটা** (R. T. Orata) ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিখন সঞ্চালনের উপর যে সব পরীক্ষা হয়েছে

সঞ্চালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

তার মধ্যে প্রায় ২০০ উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শতকরা ২৮ ভাগ ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিমাণে সঞ্চালন হয়েছে ; শতকরা ৪৮ ভাগ ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিমাণে সঞ্চালন দেখা গেছে ; শতকরা ৭ ভাগ ক্ষেত্রে সঞ্চালনের পরিমাণ খুবই নগন্য। শতকরা ৩.৬ ভাগ ক্ষেত্রে কোন রকম সঞ্চালনই হয় না। শতকরা ৭.২ ভাগ ক্ষেত্রে কোন সময় ধনাত্মক আবার কোন সময় ঋণাত্মক সঞ্চালন দেখা গেছে। এবং শতকরা ৩ ভাগ ক্ষেত্রে ঋণাত্মক সঞ্চালন হয়েছে। ওরাটা (Orata) ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২১১টি সঞ্চালন পরীক্ষার আবার এক বিশ্লেষণ করেন এবং তার থেকেও তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে প্রায় শতকরা ৮০টি পরীক্ষার বেলা ধনাত্মক সঞ্চালন হয়েছে ["*Transfer is a fact as revealved by nearly 80 percent of the studies*"—*Orata.*]। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছে শিখন-সঞ্চালন নিয়ে এবং সেই সব পরীক্ষার ফলাফল ওরাটার ঐ সিদ্ধান্তকেই প্রমাণিত করেছে। এই সব পরীক্ষার ফলাফল থেকে আধুনিক কালে মনোবিদগণ সকলে শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমত। এবং সব সিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁরা শিখন সঞ্চালন সংক্রান্ত প্রথম সমস্যার সমাধান করেছেন। এই সব সিদ্ধান্ত গুলো হ'ল—

সঞ্চালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

॥ **এক** ॥ এক বিষয়ের শিখন অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হ'তে পারে আবার নাও হ'তে পারে ; আবার অনেক সময় অন্য বিষয়ের শিখনকে ব্যহত করতে পারেন (The transfer effect may be positive, zero or negative)। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সঞ্চালনের প্রভাব ধনাত্মক হয়।

॥ **দুই** ॥ সঞ্চালন বেশীর ভাগ শিখন পরিস্থিতিতে ধনাত্মক হ'লেও, তার পরিমাণ খুবই কম। সামগ্রিকভাবে শিখন-সঞ্চালন কোথাও হয় না।

॥ **তিন** ॥ সঞ্চালনের পরিমাণ পরিস্থিতি ভেদে পরিবর্তনশীল।

॥ **চার** ॥ সঞ্চালনের পরিমাণ শিক্ষার্থীর সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

॥ **পাঁচ** ॥ সঞ্চালন বিভিন্ন মানসিক শক্তির উৎকর্ষণের মাধ্যমে হয় না, বা, সঞ্চালন সার্বজনীন নয়। মানসিক শৃঙ্খলাবাদকে (Theory of formal discipline) মেনে নেওয়া যায় না।

॥ **ছয়** ॥ কোন কোন ক্ষেত্রে সঞ্চালন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ ও মানসিক অবস্থার উপর।

॥ **সাত** ॥ কিছু পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন মান (Transfer value) অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু কোনটারই খুব বেশী নয়।

॥ **আট** ॥ জীবনাদর্শের সঞ্চালন (Transfer of ideal) সম্ভব।

শিখন-সঞ্চালনের তত্ত্বাবলী
[Theories of Transfer of Training]

শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষণের দ্বারা মনোবিদগণ মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের উপর তাদের অনাস্থাকেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষা পরিচালনা করার সময় মনোবিদগণের যে শুধুমাত্র ঐ তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করার উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, তার পরিবর্তে ভিন্ন কোন মতবাদ গড়ে তোলা যায় কি না সে চেষ্টাও অনেকের ছিল। কেন, শিখনের সঞ্চালন হয় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে না পারলে, তাকে সার্থকভাবে মানুষের শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করা যাবে না। তাই বর্তমানকালে মনোবিদগণের কাছে 'কেন সঞ্চালন হয়', এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু বিভিন্ন মনোবিদ মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের বিরুদ্ধে একত্রিত হ'লেও নতুন মতবাদ গঠনে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। এর ফলে বিভিন্ন মনোবিদ শিখন-সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন। এই সব মতবাদের মধ্যে আমরা তিনটে সম্পর্কে বিশেষভাবে এখানে আলোচনা করব।—(১) **অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব** (Theory of Identical elements); (২) **সামান্যীকরণের তত্ত্ব** (Theory of Generalization) এবং (৩) **সমগ্রতাবাদ** (Gestalt theory)।

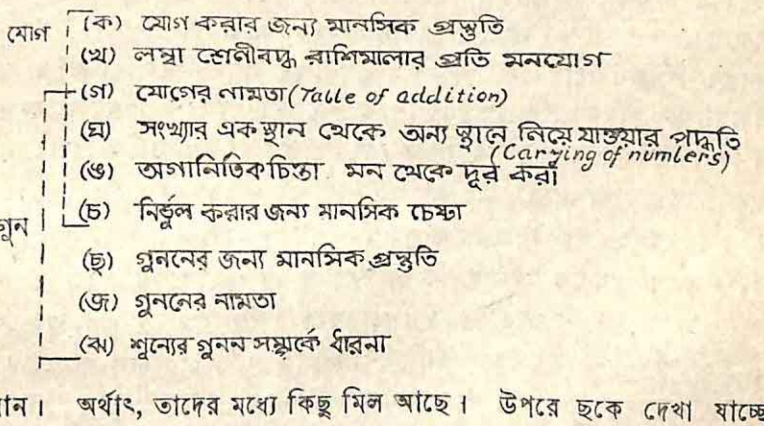
॥ এক ॥ অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বাবলী
[Theory of Identical elements]

অভিন্ন উপাদান তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন বিখ্যাত **মনোবিদ থর্নডাইক** (E. L. Thorndike)। ইতিপূর্বে আমরা থর্নডাইক এবং উড্ওয়ার্থের বিভিন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। তাঁর এই সব পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে থর্নডাইক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে শিখন-সঞ্চালন নির্ভর করে উভয় পরিস্থিতির উপাদানের অভিন্নতার উপর। তাঁর মতে শিখনের দ্বারা মনের মধ্যেকার বহু সূক্ষ্ম উপাদানের উৎকর্ষন হয়, বহু ছোট ছোট অভ্যাস গঠিত হয়। এখন এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলো যে পরিমাণে পরবর্তী কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকবে, শিখনও সেই পরিমাণে সেখানে সঞ্চালিত হবে।[1] থর্নডাইকের এই তত্ত্বের দুটো দিকের প্রতি বিশেষভাবে

অভিন্ন উৎপাদনের তত্ত্ব

1. 'Training the minds means the development of thousands of particular independent capacities, the formation of countless particular habits, for the working of mental capacity depends upon the concrete data with which it works. Improvement of any one mental function or activity will improve others only in so far as they possess elements common to it also—prin. Teaching ; Thondike.

আমাদের দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। প্রথমতঃ, **শিখন-সঞ্চালন প্রভাবিত** (influenced) **এবং প্রভাব কারী** (influencing) **পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদানের অবস্থানের জন্য ঘটে থাকে** [*Transfer is due to the presence of indentilcal elements in both the influenced and iufluencing situation*]। এই কারণে, থর্নডাইকের তত্ত্বকে অনেক সময় '*Influential Theory*' বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, **শিখন-সঞ্চালনের পরিমাণ প্রভাবিত এবং প্রভাবকারী পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদানের সমানুপাতী** [*The amount of transfer is directly proportional to amount of identical elements present in the influenced and the influencing situation*]। অর্থাৎ, কোন পরিস্থিতির শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সেই পরিমাণে সঞ্চালিত হয়, যে পরিমাণে তাদের মধ্যে আংশিক মিল আছে। এই কারণে থর্নডাইকের এই অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ অভিন্নতার তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা না করে 'আংশিক অভিন্নতার তত্ত্ব' বা 'Theory of partial Identity' বলা হয়ে থাকে। থর্নডাইক তাঁর নিজের তত্ত্বে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পাটীগণিতের 'প্রথম চারি নিয়ম' (First four rule) কে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন, যোগের শিক্ষা গুণনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হবে তার কারণ, যোগ ও গুণনের মধ্যে সাধারণ উপাদান



বর্তমান। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কিছু মিল আছে। উপরে ছকে দেখা যাচ্ছে যোগের জন্য ৬টি মানসিক উপাদান প্রয়োজন [ক—চ]। আবার গুণনের জন্য সাতটি মানসিক উপাদান প্রয়োজন [গ—ঝ]। এখন এই সব উপাদানের মধ্যে চারটি উপাদান [গ, ঘ, ঙ, চ] উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ। সুতরাং এই চারটি মানসিক উপাদান যেহেতু দু'ধরনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন, সেহেতু যোগের অভিজ্ঞতা গুণন শিখনের ক্ষেত্রে ঐ উপাদানের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। অপর দিকে, থর্নডাইক তাঁর তত্ত্বের সঞ্চালনের পরিমাণগত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বিয়োগ সমাধানের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন হয় তার সঙ্গে গুণনের উপাদানের তুলনা

করেছেন। গুণনের জন্য সাতটি মানসিক উপাদানের [ক-ছ] প্রয়োজন এবং বিয়োগের জন্য ছয়টি মানসিক উপাদানের প্রয়োজন [চ-ট], তা'হলে গুণন এবং

গুণন
- (ক) গুননের জন্য মানসিক প্রস্তুতি
- (খ) গুননের নামতা
- (গ) শূন্যের গুনন সম্পর্কে ধারনা
- (ঘ) যোগের নামতা
- (ঙ) সংখ্যা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা
- (চ) নির্ভুল করার জন্য মানসিক চেষ্টা
- (ছ) অ গানিতিক চিন্তা মন থেকে দূর করা

বিয়োগ
- (জ) বিয়োগের নামতা
- (ঝ) ধার করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা
- (ঞ) বিয়োগ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি
- (ট) সংখ্যার স্থান মূল্য (*Placevalue*) সম্পর্কে ধারনা

বিয়োগের মধ্যে ছটি সাধারণ উপাদান প্রয়োজন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও কিছু সঞ্চালন হবে। অর্থাৎ. বিয়োগের শিক্ষা গুণনের শিখনের ক্ষেত্রে কিছু সঞ্চালিত হবে ঐ অভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে। কিন্তু পূর্ববর্তী ছকের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, যোগ এবং গুণনের মধ্যে অভিন্ন উপাদানের সংখ্যা চার। কিন্তু বিয়োগ এবং গুণনের মধ্যে অভিন্ন উপাদানের সংখ্যা দুই। সুতরাং বিয়োগের শিখন থেকে গুণনের শিখন অপেক্ষা যোগের শিখন থেকে গুণনের শিখনে বেশী পরিমাণে শিখন সঞ্চালন হবে। এর দ্বারা থর্নডাইক প্রমাণ করলেন, যে শিখন সঞ্চালনের পরিমাণ অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের সমানুপাতী।

অভিন্ন উপাদানের জৈবিক ব্যাখ্যা

থর্নডাইক তাঁর শিখনের তত্ত্বের মত সঞ্চালনেরও এক শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে কোন মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ উদ্দীপকের দরুন উত্তেজনার স্নায়বিক পথ পরিক্রমা দিয়ে শুরু হয় এবং এক ধরনের দৈহিক **অভিযোজনের** (Motor adjustment) মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। এই উত্তেজনা স্নায়ু পথে অবস্থিত **স্নায়ুসন্ধিতে** (Synapse) যথেষ্ট বাধা পায়। কিন্তু কোন উত্তেজনা যদি একবার ঐ বাধাকে অতিক্রম করে শেষ প্রান্তে পৌছাতে পারে, তা'হলে তার পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে স্নায়বিক বাধা কমে যায়। থর্নডাইকের মতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন কোন অবস্থার সম্মুখীন হই না যা সম্পূর্ণভাবে অভিনব। কিছু না কিছু উপাদান পুরাতন হবেই। এবং এই পুরাতন উপাদান থাকার দরুন আমরা তাড়াতাড়ি ঐ নতুন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারি। সুতরাং তাঁর মতে অভিন্ন উপাদান হ'ল সেই সব উপাদান যাদের স্নায়ু পথে গতি এক এবং

যাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা ক্ষমতা এক।[1] পরবর্তীকালে, থর্নডাইক তাঁর এই মানসিক উপাদনের ধারণার কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি মনে করেন উপাদানের অভিন্নতা যে কেবলমাত্র পরিস্থিতির মধ্যেই থাকবে তার কোন মানে নেই। এই অভিন্নতা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির দিক থেকেও হতে পারে বা শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও হতে পারে। প্রথম ধরনের অভিন্নতাকে তিনি '**বিষয় বস্তুর অভিন্নতা**' (indentities of substance) বলেছেন এবং দ্বিতীয় ধরনের অভিন্নতাকে '**পদ্ধতির অভিন্নতা**' (indentities of procedure) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর 'Educational Psychology' বইয়ে মন্তব্য করেছেন—"*These identical elements may be in the stuff, the data concerned in the training, or in the attitude the method taken with it.*"[2] অর্থাৎ, এই পরিবর্তীত ধারণা অনুযায়ী ইংরাজীর শিখন বাংলা শিখনকে সেই পরিমাণে সহায়তা করবে যে পরিমাণে তাদের মধ্যে ধ্বনি বা ব্যাকরণগত মিল আছে, বা, দু'ধরনের ভাষা শিক্ষার পদ্ধতির মিল আছে।

থর্নডাইকের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা

[Discussion on Thorndike's theory of Identical Elements]

থর্নডাইকের মতবাদ অনুযায়ী শিখন-সঞ্চালন অভিন্ন উপাদানের অবস্থানের জন্য হয়ে থাকে। থর্নডাইকের শিখন সম্পর্কে (Learning) এবং বুদ্ধি (intelligence) সম্পর্কে যে মতবাদ আছে, তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি এই তত্ত্ব গঠন করেছেন। আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও দেখতে পাই যে অভিন্ন পরিস্থিতিতে শিক্ষা তাড়াতাড়ি হয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের মূল্য যথেষ্ট আছে। সঞ্চালনের পরিমাণ বাড়াতে হলে শিক্ষককে সব সময় এই অভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

থর্নডাইকের এই তত্ত্বের প্রয়োগমূলক দিক থেকে যথেষ্ট উপযোগিতা থাকলেও বিভিন্ন চিন্তাবিদ বা মনোবিদ একে সম্পূর্ণ নির্ভুল তত্ত্ব হিসেবে মেনে নেন না। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে এই তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন।

অভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা

॥ এক ॥ থর্নডাইকের তত্ত্বের জৈবিক ভিত্তির বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন শরীর বিজ্ঞানী। থর্নডাইক বলেছিলেন অভিন্ন স্নায়ুকোষের

1. By indentical elements are meant mental processes which have the same cell action in the brain—Principles of teaching—Thorndike.

2. Thorndike—Educational Psychology : Briefer course.

কার্যকারিতার মাধ্যমে সঞ্চালন হয়। একথা ল্যাস্‌লি (Lashly) প্রভৃতি শরীর বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষার দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন।

॥ **দুই** ॥ অনেকে মনে করেন, অন্যান্য সমস্যার ন্যায়, থর্নডাইক শিখন-সঞ্চালনেরও এক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর এই তত্ত্বে। সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র আংশিক সমগুণসম্পন্ন অভ্যাসগুলোর সংযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তা'ছাড়াও সঞ্চালনের জন্য ব্যক্তির যে নিজস্ব অনুরাগ, আগ্রহ, তাগিদ ইত্যাদির যে প্রয়োজন আছে, তার উল্লেখ আমরা এই তত্ত্বের মধ্যে পাই না। দুটো পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাকলেই সঞ্চালন হবে না। যে পর্যন্ত না ব্যক্তি সেই অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারে, সে পর্যন্ত সঞ্চালন সম্ভব হবে না। তাই সঞ্চালন অভিন্ন উপাদানের জন্যই হয় এ ধারণা ভুল।

॥ **তিন** ॥ আবার, থর্নডাইক তাঁর তত্ত্বে বলেছেন, শিখন-সঞ্চালনের পরিমাণ অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের সমানুপাতী। কিন্তু এই মন্তব্য তাঁর নিজের পরীক্ষার দ্বারাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাই ভিন্ন আকার ও অবয়বের ক্ষেত্রের বেলা সবচেয়ে বেশী সঞ্চালন (52%) হয়েছে। সুতরাং, একথা বলা যায় না একই আকার ও ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের থেকে ঐ সব ক্ষেত্রের বেলা বেশী অভিন্ন উপাদান বর্তমান ছিল।

॥ **চার** ॥ এই তত্ত্বের আর একটা ত্রুটি হ'ল 'মৌলিক উপাদান' এর ধারণা। থর্নডাইক **মৌলিক উপাদান** (elements) বলতে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা কতটা **মৌলিক** (elemental) সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যেমন, তিনি যোগ, গুণন ইত্যাদির **নামতাকেও** (table of addition & multiplication) মৌলিক অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এই নামতাকে আরও বিশ্লেষণ করা যায় একথা সকলেই বিশ্বাস করেন।

॥ **পাঁচ** ॥ **ওরাটা** (P. T. Orata) অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে যাঁরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে আসলে সঞ্চালন হয় না। সঞ্চালন বলতে আমরা মাধ্যমের পরিবর্তন বুঝি (change of vehicle)। কিন্তু, এই তত্ত্ব অনুযায়ী মাধ্যমের কোন পরিবর্তন হয় না। এখানে সঞ্চালন হচ্ছে এই উপাদানের পুনরাবৃত্তির দ্বারা। তাই এই ধরনের পরিবর্তনকে সঞ্চালন বলা যায় না। মনোবিদ আলপোর্টও (G. W. Allport) একই ধরনের মন্তব্য করেছেন এই তত্ত্ব সম্পর্কে।[1]

1. "......the term transfer ought never be used by those who believe in partial identity. Transfer suggests change of vehicle, where as the hypothesis of elements should mean just what it says identicle vehicle."—Personality : A Psychological Interpretation : G. W. Allport.

॥ দুই ॥ সামান্যীকরণের তত্ত্ব
[Theory of Generalization]

অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের উপরোক্ত সব অসুবিধা বিশ্লেষণ করে মনোবিদ জাড্ (C. H. Judd) শিখন-সঞ্চালনের এক নতুন তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, সঞ্চালন নির্ভর করে অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের (Generalization of experience) উপর। বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যেকার সাধারণ গুণগুলোকে খুঁজে বাহির করে, সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনই সামান্যীকরণ। এইভাবে বস্তু সামগ্রী সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা বা সূত্র গড়ে উঠবে তাই পরবর্তী পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে। জাড্ (Judd) তাঁর এই তত্ত্ব বিশেষ ধরনের পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন। তিনি দু'দল ছেলেকে জলের মধ্যে ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটি বস্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে অভ্যাস করান। এরপর তিনি একদল ছেলেকে প্রতিসরণের নিয়ম-(Principle of refraction) সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন। অর্থাৎ, জলের নীচে কোন বস্তু থাকলে কি ভাবে আমরা তার আপাতঃ অবস্থান (Apparent position) প্রত্যক্ষ করি, তা বুঝিয়ে দেন। অন্যদলকে তিনি আর কিছু বলেন না। এর পর তিনি লক্ষ্য বস্তুটাকে জলের চার ইঞ্চি নীচে স্থাপন করে দু'দলকে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি গুলি ছুঁড়তে বললেন। এই নতুন পরিস্থিতিতে তিনি লক্ষ্য করলেন, পরীক্ষামূলক দল, অর্থাৎ, যাদের প্রতিসরণের নিয়ম জানানো হয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পেরেছে। কিন্তু যারা প্রতিসরণের নিয়ম জানে না তারা আগের মতই ভুল করছে। জাড্ (Judd) মনে করেন মানুষের উন্নত ধরনের মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে (Higher mental processes) বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার চর্চ্চার মাধ্যমে বা অভিন্ন উপাদানের উপস্থাপনের দ্বারা ক্রিয়াশীল করা যায় না। সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামান্যীকরণের দ্বারাই এই সব মানসিক ক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলা যায়। মানুষের মনের সবচেয়ে উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাগুলোই হ'ল সাধারণ ধর্মী ("*The highest powers of the mind are general, not specific*)। তাই শিখনের সঞ্চালনের জন্য আমরা একমাত্র তাকেই দায়ী করতে পারি।

জাড্-এর পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত

জাডের (Judd) পরবর্তীকালে আরও অনেক মনোবিদ তাঁর এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন। মনোবিদ্ রুগার (H. A. Ruger) ধাঁধা (puzzle) নিয়ে পরীক্ষা করে জাডের অনুরূপ ফল পান। তিনিও তাঁর পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে নতুন পরিবেশে কোন বিশেষ অভ্যাসের উপযোগিতা নির্ভর করে তাদের

অন্যান্য মনোবিদ্‌দের সিদ্ধান্ত

মধ্যেকার সাধারণ ধারণার উপর। অর্থাৎ, বিশেষ কোন ক্রিয়াকে তখনই আমরা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারি যখন নতুন এবং পুরাতন পরিস্থিতিতে সেই ক্রিয়াটির মূল তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে। রুগার (Ruger) মন্তব্য করেছেন—"*In general, the value of specific habits under a change of conditions depend directly on presence of a general idea which would serve for their control*"[1] ওরাটাও (P. T. Orata) অভিন্ন উপাদান তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে একই কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, সঞ্চালন অভিন্ন উপাদানের দ্বারা স্বতশ্চালিত হয় না। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোন কিছু শিখলে, শিখন (learning) হয় ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা যান্ত্রিক অপরিবর্তনীয় অভ্যাসই গঠিত হয়। এই অভ্যাস নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির অভিযোজনে সাহায্য করে না। তাই যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিমূলক শিখন-সঞ্চালনের উপযোগী নয়। কিন্তু, অপর পক্ষে শিক্ষার্থীদের যদি সচেতনভাবে তাদের অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করতে শেখানো হয় তা'হলে তার দ্বারা অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ হয়। এই ধরনের সামান্যীকৃত অভিজ্ঞতা খুবই নমনীয়। এবং এই নমনীয়তার জন্যই তা স্বাভাবিকভাবে যে কোন নতুন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়।[2]

সামান্যীকরণের তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা
[General discussion on the theory of Generalization]

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এবং বিভিন্ন মনোবিদের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিখন সঞ্চালন অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

সামান্যীকরণের গুরুত্ব

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব যদি সত্য হ'ত তা'হলে জাডের (Judd) পরীক্ষায় উভয় দলের ক্ষেত্রেই সঞ্চালন হওয়া উচিত ছিল। কারণ অভিন্ন উপাদান উভয় দলের ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে তা হয় নি। শুধুমাত্র অভিন্ন উপাদান থাকলেই সঞ্চালন হয় না। ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যদি তাদের মধ্যেকার সাধারণ মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারে, তাহলে সঞ্চালন হবে না। তাই যারা উভয় পরিস্থিতির মধ্যে

1. Psychology of efficiency—H. A. Ruger ; Arch of Psychol, No. 15.

2. "When an individual is trained in mere routine fashion or drill, he gets fixed and mechanical habits which do not transfer. On the other hand, when he is trained consciously to organise his knowledge or procedure in such a way that general princieples are formulated, the result is not a mechanical habit but generalization, or an adaptive and flexible form of behaviour which by virtue of its flexibility transfers."—P. T. Orata ; The theory of Identical Elements.

যে একই প্রতিসরণের নিয়ম কাজ করছে এটা উপলব্ধি করতে পারলো, তাদের ক্ষেত্রেই সঞ্চালন দেখা গেল। কোন শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে উপলব্ধি করার প্রক্রিয়াকেই মনোবিদ্‌গণ **সামান্যীকরণ** (Generalization) বলেছেন। মনোবিদ্‌ **বার্নার্ড** (Barnard) বলছেন, "*Generalization is a form of understanding which enhances the possibilities of application to new learning conditions.*" সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে এই ধরনের সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা। কেবলমাত্র এই ধরনের সামান্যীকৃত শিখনই সঞ্চালনকে সহায়তা করবে এবং শিক্ষার প্রকৃত আদর্শে পৌছতে সহায়তা করবে।

সামান্যীকরণ ও অভিন্ন উপাদান

সামান্যীকরণের তত্ত্ব এবং অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য একেবারে বিপরীত। কারণ, প্রথম তত্ত্বে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বে পৃথক বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। যে সব মনোবিদগণ সামান্যীকরণে বিশ্বাসী তাঁরা সকলেই থর্নডাইকের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিশেষ বিচারে তাদের সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ধর্মী বলা যায় না। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের জন্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন, এবং তার সঞ্চালনের জন্য উভয় পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণ গুণ খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং, সামান্যীকৃত জ্ঞান প্রয়োগ করার জন্যও সাধারণ উপাদান খুঁজে পাওয়ার দরকার। তাই এদের পরস্পর নিরপেক্ষ বিপরীত তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। বরং তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মনোবিদ্‌ আলপোর্ট (Allport) এই দুই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ছোট ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রে বা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলা সঞ্চালন যান্ত্রিক অভ্যাস গঠন এবং অভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে হয়। কিন্তু বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঞ্চালন সামান্যীকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। **কোলেসনিক** (W. B. Kolesnik) মন্তব্য করেছেন—"*These two theories may be regarded as supplimentary rather than mutually opposed, considered together, they indicate how transfer takes place and how it can be faciliated.*"[1]

॥ তিন ॥ সঞ্চালনের সমগ্রতাবাদ
[Gestalt theory on transfer]

সমগ্রতাবাদীদের তত্ত্ব ইতিপূর্বে অনেকক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে। সমগ্রতাবাদীগণ মানুষের সামগ্রিক আচরণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

1. Educational Psychology—W. B. Kolesnik.

শিখনের ক্ষেত্রে যেমন সামগ্রিকতা, ঐক্য এবং অন্তর্দৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনি, শিখন সঞ্চালনের বেলায়ও তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তাঁরা অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব বা সামান্যীকরণের তত্ত্ব কোনটাকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু বলেছেন, দুটো পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাকলেও তা উপলব্ধি করার দরকার, বা অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের জন্যও শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। তাই তাঁদের মতে সঞ্চালন নির্ভর করে—নতুন এবং পুরাতন পরিস্থিতিতে অংশ এবং সমগ্রের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের উপর এবং সেই সম্পর্ক ব্যক্তি কি ভাবে প্রত্যক্ষ করছে তার উপর [*Transfer is dependent upon whole part relations between the old and new situation as well as upon the learning perception (insight) of these relation*] ক-অবস্থার শিখন, খ-অবস্থায় তখনই সঞ্চালিত হবে যখন শিক্ষার্থী উভয় অবস্থার মধ্যেকার বিষয়বস্তু সমাধান পদ্ধতি অথবা মানসিক অবস্থার দিক থেকে যে সাদৃশ্য আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। শুধুমাত্র উপাদান, বিষয় বস্তু বা পদ্ধতি সঞ্চালনের উপযুক্ত কারণ নয়। সঞ্চালন এদের প্রত্যেকের সমবায়েই সংঘটিত হয়। **হুইলার** (Wheeler) নামে একজন মনোবিদ বলেছেন সঞ্চালনের জন্য প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়। [*Transfer consists essentially of some degree of duplication or response in two situation*] তিনি আরও বলেছেন প্রতিক্রিয়ার এই পুনরাবৃত্তি তিনটি শর্তাধীনে হয়ে থাকে—(১) **বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের জন্য,** (২) **পদ্ধতির সাদৃশ্যের জন্য** এবং (৩) **মানসিক অবস্থার সাদৃশ্যের জন্য**। কিন্তু এই সাদৃশ্য এমন হওয়ার দরকার যা ব্যক্তি তার নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। আবার, কোন পরিস্থিতিতে সাদৃশ্য ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ, সাদৃশ্য অনেকাংশে ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ধরনের সাদৃশ্যকে সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্‌গণ শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য বা অভিন্ন উপাদান না বলে একে ক্রিয়াশীল সমতা (Functional similarity) বলেছেন। সমগ্রতাবাদীগণ মনে করেন, এই ক্রিয়াশীল সমতাই শিখনের সঞ্চালনের মূল কারণ। একজন বিখ্যাত সমগ্রতাবাদী **হ্যামলেও** (Hamley) একই কথা বলেছেন।[1] এই মতবাদ থেকে একটা জিনিস বুঝা যায় যে সঞ্চালন বুদ্ধির (Intelligence) উপর নির্ভরশীল। কারণ,

সমগ্রতাবাদের বৈশিষ্ট্য

1. "Common elements are common mental elements; they are not necessarily common elements in the objective situations. They are methods, procedures and ideals that are in the Gestalt sense 'functionally similar'' —Hamley.

উভয় পরিস্থিতির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য শিক্ষার্থীর সাধারণ মানসিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হয়। তাই বলা যেতে পারে, সঞ্চালনের পরিমাণ অভিন্ন উপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর না করে ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (Intelligence) পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

শিখন-সঞ্চালনের শিক্ষাগত মূল্য [Educational Values of Transfer]

শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষা

শিখন-সঞ্চালনের সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ এবং শিক্ষাবিদ্ এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের জন্য তৈরী করে দেওয়া। শিক্ষার্থী যাতে সার্থকভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অভিযোজন করতে পারে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের অবস্থা আগে থেকে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। বিদ্যালয়ে যে সব শিক্ষার্থীরা আজকে আছে, তারা কে কিরকম জীবন পরিবেশের সম্মুখীন হবে তা বলা মুশকিল। তাই শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার আগে আমরা ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এখন এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি? একমাত্র উত্তর হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কতকগুলো নমনীয় আচরণ ধারা দিয়ে দেওয়া, যার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তারা জীবনের যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। অর্থাৎ, এমন কতকগুলো কৌশল আয়ত্ব করতে তাদের সাহায্য করতে হবে যার দ্বারা পরবর্তী জীবনে অন্যান্য সমস্যা তারা সার্থকভাবে সমাধান করতে পারে। সুতারং, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে যে নীতি কাজ করছে তা হ'ল শিখন-সঞ্চালনের নীতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর জীবন পরিবেশে সঞ্চালিত না করতে পারে, তা'হলে সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা (Education) তার নিজস্ব তাৎপর্য হারাবে। এই কারণে, ভবিষ্যৎ নাগরিকতা—শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালনের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। বরং শিখন-সঞ্চালনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করতে পারলে শিক্ষারই কোন মূল্য থাকে না।

শিখন-সঞ্চালন ও শক্তির অপচয়

শিখন-সঞ্চালনের গুরুত্ব আরও একটা দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হ'ল স্বল্প শক্তি ব্যয় করে বেশী কাজ করা। বিশেষ করে বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষের এই প্রবণতা আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করে যত তাড়াতাড়ি ব্যক্তি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি সে

জীবনের পথে এগিয়ে যাবে। শিখন সঞ্চালন, এই মানসিক শক্তির অপচয়কে কমাতে সহায়তা করে। তাই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না করে স্বল্প আয়াসে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে শিখন-সঞ্চালনের যথেষ্ট মূল্য আছে।

শিখন-সঞ্চালনের এই গুরুত্বের জন্যই এই নীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে দেখা গেছে এক অবস্থার শিখন অন্য অবস্থায় সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ প্রশ্ন করেছেন—কিভাবে এই সঞ্চালনকে বেশী করা যায়? কি ধরনের শিখন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করবে? কোন কোন বিষয়ের সঞ্চালন সবচেয়ে বেশী? কিসের সঞ্চালন আমরা করতে চাই এবং কোথায় করতে চাই? এরকম নানা প্রশ্ন শিক্ষাবিদ্‌গণের সামনে এসেছে। সঞ্চালন যে বিভিন্ন বিষয়ের হয় তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু, কিভাবে তা আনা যাবে, তা নির্ভর করছে শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। প্রাচীন শৃঙ্খলাবাদের উপর ভিত্তি করে আমরা যদি শিখন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করি এবং বিদ্যালয়ে কয়েকটা বিশেষ বিষয়ের মাধ্যমে চারিত্রিক বিকাশের চেষ্টা করি, তা'হলে, সে চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক এবং তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। তাই শিখন সঞ্চালনকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হ'লে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিচার করতে হবে। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে।

শিখন-সঞ্চালন ও শিখন পদ্ধতি

সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা
[Education for Transfer]

মনোবিদ্ মার্শেল (J. L. Murshell) বলেছেন,—"*Our attitude towards transfer determines our attitude towards teaching; if we retain the disciplinary prepossession instruction ceases to be an art, the whole problem of procedure vanishes*···[1] সুতরাং, সঞ্চালনকে বাড়াতে হ'লে, বর্তমান পরীক্ষামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে তার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ শিখনের যেমন কতকগুলো শর্ত (conditions of learning) নিরূপণ করেছেন, তেমনি সঞ্চালনেরও কতকগুলো শিক্ষা পদ্ধতিনির্ভর শর্তের কথা বলেছেন।

॥ এক ॥ আমরা জানি বোধহীন যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির দ্বারা শিখন হয়। কিন্তু সেই শিখনের সঞ্চালন হয় না। কি শিখছে এবং কেন শিখছে, এটা শিক্ষার্থীর জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে উদ্দেশ্য (aim) সম্পর্কে শিক্ষকের

1. Psychology of Secondary school Teaching—J. L. Murshell

পরিষ্কার ধারণা থাকার দরকার। শিক্ষার্থীরাও যাতে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়, সে বিষয়েও শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীকে সব সময় সঙ্কীর্ণ শিখন পরিবেশের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে কার্যকরী পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান শিখন পরিস্থিতির যথার্থ উপযোগিতা ছাত্ররা যাতে উপলব্ধি করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই সঞ্চালন সম্ভব হবে। দৈনন্দিন পাঠদানের সময় শিক্ষককে ঐ পাঠের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্যের পাঠের মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পালনের কথা বুঝালে চলবে না; সেই সব নিয়মগুলো যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে সার্থকভাবে গ্রহণ করে সে দিকে শিক্ষকের নজর দিতে হবে।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা

॥ **দুই** ॥ শিখন সঞ্চালন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার (understanding) উপর। অর্থাৎ, বিষয়বস্তুর সাধারণগুণ (Generalization) উপলব্ধির উপর সঞ্চালন নির্ভর করে। আবার, অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, বোধগম্যতা শিক্ষার্থীর সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির (General mental ability or intelligence) উপর নির্ভর করে। এখন অনেকে মনে করেন, যেহেতু বুদ্ধি মানুষের জন্মগত ক্ষমতা, এবং তাকে বাড়ানো যায় না, সেহেতু শিক্ষার্থীর সমগ্রতাবোধকে বাড়ানো যায় না। এই ধারণার মধ্যে সত্যতা থাকলেও বুদ্ধির সীমার মধ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা (understanding) বাড়িয়ে তুলতে পারেন। যে সব শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি কম, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করলে, তারা সহজে বুঝতে পারে। সুতরাং, যতদূর সম্ভব বিভিন্ন শিক্ষণ সহায়ক কৌশল (Teaching aids) এর মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের কাছে। আবার, এ কথা স্মরণ রাখার দরকার বিষয়বস্তুর হৃদয়ঙ্গম শুধুমাত্র মুখস্থের উপর নির্ভর করে না। বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা প্রত্যক্ষ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আসে; এবং প্রয়োগ ছাড়া বোধগম্যতা আসে না। তাই শিক্ষকের এই দু'দিকেই নজর রাখতে হবে, সঞ্চালন বাড়াতে হলে, বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষার্থীদের দিয়ে, তাতে নতুন জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার অনুশীলন করাতে হবে। এতে করে শিখন যেমন তাদের কাছে অর্থপূর্ণ হবে, অন্যদিকে অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে এক পরিস্থিতিতে থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করতে হয় তার প্রশিক্ষণও পাবে। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ তাই মন্তব্য করেছেন—"*Learning by doing will have greater transfer value than learning that is limited to deall.*"

শিক্ষণ সহায়ক কৌশলের ব্যবহার

॥ **তিন** ॥ থর্নডাইকের মতে বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে অভিন্ন উপাদানের অবস্থানের জন্য সঞ্চালন হয়। পরে আমরা দেখেছি, শুধুমাত্র অভিন্ন উপাদানের অবস্থিতি নয়, শিক্ষার্থীর সে সম্পর্কে ধারণা সঞ্চালনে সহায়তা করে। তাই সঞ্চালন বাড়াতে হ'লে, শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে যে মিল আছে, সেটা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরে, শিক্ষক তাদের অভিন্ন দিকটির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এতে করে শিক্ষাদানের কাজ সহজ হবে, শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে এবং একই সঙ্গে সঞ্চালনও সম্ভব হবে। সুতরাং, সঞ্চালনের পরিমাণ বাড়াতে হ'লে, শিক্ষক সমস্যাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিন্ন উপাদান খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস গঠন করবেন। একবার ছাত্ররা যদি সমস্যাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করতে শেখে তা'হলে তা ভবিষ্যতে যে-কোন পরিস্থিতিতে তারা কাজে লাগাবে; এবং এমনি ভাবে অভিন্ন উপাদান খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে শিখনকে সঞ্চালিত করবে।

অভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি

॥ **চার** ॥ শিক্ষার্থীরা যাতে সব সময় বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পারে, শিক্ষককে সে দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। কারণ, শিখন-সঞ্চালন বিশেষভাবে মূল তত্ত্বের উপলব্ধির মাধ্যমে ঘটে থাকে। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাদের মধ্যেকার সাধারণ সূত্রটি খুঁজে বাহির করবেন। এর দ্বারা তাদের অভিজ্ঞতার যে সামান্যীকরণ হবে তা স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চালিত হবে। এই সঙ্গে সামান্যীকৃত জ্ঞান কিভাবে অন্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয় তার প্রশিক্ষণও শিক্ষকদের দিতে হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষক বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করে তার সমাধান পদ্ধতি দেখালে, শিক্ষার্থীরা সঞ্চালন করতে শিখবে।

সামান্যীকরণের উপর গুরুত্ব

॥ **পাঁচ** ॥ বিষয়বস্তুর সামান্যীকরণের মাধ্যমে যেমন সঞ্চালন হয়, তেমনি ব্যক্তিজীবনেরও মূল আদর্শের সঙ্গে শিখনকে সংযুক্ত করতে পারলেও সঞ্চালন ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের মূল জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে ছোট আদর্শ গড়ে তুলতে পারলে, সেই সব আদর্শ শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত করবে। কতকগুলো আদর্শ আছে, যা শিখনকেই সহায়তা করে। বিশেষভাবে এগুলোর দিকে শিক্ষকের নজর দেওয়ার দরকার। যেমন—শিক্ষার প্রতি অনুরাগ (love for learning); জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা (desire of knowledge), অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা (respect for others opinion) ইত্যাদি আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে জীবনে

জীবনাদর্শ গঠন

সঞ্চালিত করা যায়। বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে আরও কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে। কারণ এ সব আদর্শ (ideals) ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার্থীদের আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। যেমন—

(১) সমাজ সংহতির আদর্শ।

(২) সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, অভিনয় ইত্যাদির রস যথাযথভাবে উপলব্ধি করার আদর্শ।

(৩) সব কিছু অভিজ্ঞতা বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করার আদর্শ।

(৪) কাজ করার প্রকৃত অভ্যাস এর আদর্শ।

(৫) গঠনমূলক কাজের প্রতি অনুরাগ।

(৬) মতবিরোধকে সহজভাবে গ্রহণের আদর্শ।

এই ধরনের ছোট ছোট জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এবং এদের সাধারণ ধর্মের জন্য এরা বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত হবে। শিক্ষক যতদূর সম্ভব এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠদান করলে, বিদ্যালয়ের শিখন সহজভাবে বৃহত্তর জীবন পরিবেশে সঞ্চালিত হবে।

কোন বিশেষ বিষয়ের শিখন থেকে কিছু লাভ করতে হ'লে, বা জীবন ধারণের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে হ'লে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক বিষয় এমন সামগ্রিকভাবে

আলোচনা

পড়াতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয় সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলো সহজে সমাধান করতে পারে। পাঠ্যসূচী এমন হওয়ার দরকার যা জীবনের সকল রকম সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। তাই জীবন পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসূচীরও পরিবর্তন দরকার। জীবনের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম পাঠ্যসূচী সঞ্চালনে সহায়তা করতে পারে না। পাঠ্যসূচী রচনায় আর একটা দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দরকার, তা'হল বিষয় নির্বাচন। আধুনিক পাঠ্যসূচী শিখন-সঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তা'হলেও এ সম্পর্কে আরও চিন্তার অবকাশ আছে। আমরা জানি, শিখন সঞ্চালন হ'লেও তা এমন বেশী হয় না যে সার্বজনীনভাবে সর্বত্র তার প্রভাব দেখা যাবে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফল থেকে দেখা গেছে, শিখন সঞ্চালন ধনাত্মক হ'লেও তার পরিমাণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই খুবই কম। তাই পাঠ্যসূচীতে কোন বিষয়কে তার শৃঙ্খলা মান (disciplinary value) বিচার করে নির্বাচন করলে চলবে না। কয়েকটি মাত্র বিষয়ের মাধ্যমে ছাত্ররা জীবনের সবরকম কৌশল আয়ত্ব করতে পারে না। তারা যাতে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় গুণগুলো আয়ত্ব করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। আধুনিক Core Curriculum এর

মধ্য দিয়ে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং সঞ্চালন বেশী পরিমাণে পেতে হ'লে পাঠ্যক্রমকে সেই অনুযায়ী সাজাতে হবে। আর শুধু শিক্ষক নয়, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে, কিভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনে বেশী পরিমাণে সঞ্চালিত করা যায়। অর্থাৎ, শিক্ষা-ক্ষেত্রে, **সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা** (Planning for transfer), **সঞ্চালনের জন্য পাঠদান** (Teaching for transfer), **সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা** (Education for transfer), ইত্যাদি কথাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি সঞ্চালন সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত না করে, তা'হলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আদর্শচ্যুত হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by transfer of training? When does transfer take place? Discuss how to ensure transfer from class room situation to life. [সম্পূর্ণ অংশ] [C. U. B. T. '66]
2. Should mathematics be taught only for its disciplinary value? Discuss in the light of recent experimental findings on transfer of training. [সম্পূর্ণ অংশ] [C. U. B. T. '70]
3. What is transfer of training? Discuss with experimental evidences, the problems of transfer of training. [N. B. U. B. T. '67] [পৃঃ ৮৬-১১২]
4. Discuss in the light of current experimental findings the educational values of transfer. [পৃঃ ৮৭-১১২]
5. What is meant by transfer of training? When and to what extent is transfer possible? How will you ensure that things learnt in the class room may be transferred to the pupil's life outside? [সম্পূর্ণ অংশ] [K. U. B. T. '63, '65, '68] [C. U. B. T. '64]
6. Write notes on the following:
   (a Formal discipline. [পৃঃ ৮৩-৮৫]
   (b) Transfer of ideals. [পৃঃ ৯২-৯৩]
   (c) Theories of identical elements. [পৃঃ ৯৮-১০২]
   (d) Transfer and generalization. [পৃঃ ১০৩-১০৫]

শিখন সহায়ক মানসিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা

ব্যক্তির জীবন বিকাশে শিখনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই শিখন প্রক্রিয়াকে আমাদের অন্যান্য অনেক মানসিক প্রক্রিয়া এবং মানসিক ক্ষমতা সহায়তা করে। মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পন, চিন্তন, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি প্রক্রিয়া শিখন প্রক্রিয়াকে এবং সাধারণ বিকাশকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে শিখন সহায়ক, এই মানসিক ক্ষমতা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পন, চিন্তন, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। সব শেষে, শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ এক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অবসাদ, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এই অবসাদের প্রভাব কিভাবে কমানো যায় সে সম্পর্কে কাজ ও অবসাদ এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্মরণ ক্রিয়া

[MEMORY]

স্মৃতিকে কোন বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা বুঝানো যায় না। যে বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার একটা ছাপ আমাদের মনে অবচেতন স্তরে থেকে যায়। মনের এই অবচেতন স্তর থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে চেতন স্তরে পুনরুদ্রেক করাই হ'ল **স্মরণ ক্রিয়া** (Memory)। সাধারণ অর্থে আমরা 'স্মৃতি' (Memory) কে একটা গুণ-বাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। আমরা বলি 'রামের স্মৃতি খুব কম, ও কিছুই মনে রাখতে পারে না।' বা 'যদুর স্মৃতি খুব প্রখর; ও একবার কিছু শিখলেই অনেকদিন মনে রাখতে পারে'। কিন্তু মনোবিদ্যায় স্মৃতি বলতে কোন গুণকে বুঝি না। স্মৃতি বলতে স্মরণ ক্রিয়াকে (Process of Memory) বুঝি। বিভিন্ন দার্শনিক, স্মৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে যে সব অভিজ্ঞতা বা ধারণা এখন চেতন মনে (conscious mind) নেই, অথচ পূর্বে ছিল, সেই সব অভিজ্ঞতা বা ধারণাকে চেতনায় আনাকে স্মৃতি বলেছেন। দার্শনিক **স্পিনোজা** (Spinoza) বিশদভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সব প্রাচীন দার্শনিক চিন্তা ধারা থেকে স্মৃতি বা স্মরণ ক্রিয়ার প্রকৃত রূপ বুঝা যায় না। স্মরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেন মনোবিদ্ **এবিংহস্** (Ebbinghaus) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'On Memory' নামে একটা বই প্রকাশ করেন। মানুষের স্মরণক্রিয়া ও শিখণ পদ্ধতিকে যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগারে পরিমাপ করা যায়, সর্ব প্রথম তিনি তা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি স্মরণ ক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে, স্মৃতি কি, তা বলার প্রয়োজন।

স্মৃতি সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা

কোন কিছু শিখার পর বা কোন অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আবার যখন, সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করি, তখন আমরা বলি, তার পেছনে স্মরণক্রিয়া কাজ করছে। **মনোবিদ্ উড্ওয়ার্থ** (Woodworth) বলেছেন —যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পূর্বে শেখা কোন কাজকে সেই একই ভাবে পরবর্তীকালে সম্পাদন করতে পারি, তাই হ'ল স্মৃতি (*doing*

স্মৃতির আধুনিক সংজ্ঞা

1. Woodworth & Scholesberg : Experimental Psychology.

what one has learned to do)"। **মনোবিদ্ স্টাউট** (Stout) ও একই ভাবে স্মরণক্রিয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগতভাবে তার পুনরুদ্রেক করার প্রক্রিয়াই হ'ল স্মৃতি"। অর্থাৎ, স্টাউট এই সংজ্ঞার মধ্যে একটা বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল আদর্শগত পুনরুদ্রেক (ideal revival)। অর্থাৎ, এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে, স্টাউট, স্মৃতির সঙ্গে অন্যান্য পুনরুদ্রেক-মূলক প্রক্রিয়ার পার্থক্য করেছেন। যেমন, কল্পনায় (imagination) অভিজ্ঞতার বিকৃত পুনরাবৃত্তি হয়। আধুনিক আমেরিকান মনোবিদ্গণ স্মৃতি (Memory) কথাটা ব্যবহার করেন না। তাঁরা শিখন (Learning) প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, মনোবিদ ডেভিস্ (Davis), শিখন প্রক্রিয়ার দু'টো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে—সঞ্চয়ন (acquisition), সংরক্ষণ (Retention) এর কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী স্মৃতি শিখন প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত একটা প্রক্রিয়া মাত্র। মনোবিদ্ **টেলফোর্ড** (Telford) বলেছেন, শিখনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন হয়; আর স্মৃতির দ্বারা আমরা সেই পরিবর্তনকে ধরে রাখতে পারি। অর্থাৎ, এই মতবাদ অনুযায়ী, স্মৃতি ও সংরক্ষণকে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মনোবিদ্ **ক্লজমিয়ার** (H. J. Klausmeier) কিন্তু স্মৃতিকে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদিও তিনি স্মৃতিকে শিখনের সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তবুও স্মৃতি বলতে তিনি সংরক্ষণ বা ধারণ, প্রত্যাভিজ্ঞা (recognition) এবং পুনরুদ্রেক (Recall) এই তিন ধরনের প্রক্রিয়ার সমবায়কে বুঝিয়েছেন। মনোবিদ্ **রস** (Ross) স্মৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাকে আমরা সম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আমেরিকান এই মনোবিদ্গণ স্মৃতিকে যে শিখনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, এটা ঠিক নয়। বরং স্মৃতি, বা স্মরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা শিখন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করতে পারি। কারণ, শিখনের (Learning) উদ্দেশ্যই হ'ল, পরবর্তী জীবনে আচরণের পরিবর্ধন থেকে ভাল ফল পাওয়া। আর শিখন থেকে ভাল ফল পেতে হলে অভিজ্ঞতার পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, শিখন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক সবগুলোই স্মরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। মনোবিদ্ রস্ (Ross), তাই বলেছেন—"*Memory is a complex process involving the establishment of depositions, their retention and the recalling of ex-*

1. "Memory is the ideal revival, so far the ideal revival is more reproductive in which the subject of past experience are reinstated as far as possible in the order and manner of their original occurance."—Stout : Manual of Psychology.

periences that have left the depositions behind them.[1] অর্থাৎ, **অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়, তাই হ'ল স্মৃতি** (Memory) বা স্মরণক্রিয়া (Process of Memory)।

স্মরণ ক্রিয়ার বিশ্লেষণ
[Analysis of Memory]

সাধারণভাবে আমরা বলেছি, কোন কিছু শিখার পর আবার যখন সেই কাজ একইভাবে সম্পন্ন করা হয়, তখন তাকে বলি স্মরণ করা। তা'হলে বলা যায় শিখা থেকে শুরু করে আবার ঠিক একইভাবে কাজ করা পর্যন্ত যে সব প্রক্রিয়া আমাদের মনে ঘটে তার সমস্তটাকে মিলে আমরা বলি স্মরণক্রিয়া। ধরা যাক আমরা একটা কবিতা মুখস্থ করছি। কবিতাটি মুখস্থ করা থেকে সেটাকে পরবর্তী যে কোন পরিস্থিতিতে আবৃত্তি করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে স্মরণ ক্রিয়া। এখন দেখা যাক এই শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যান্য কি কি প্রক্রিয়া কাজ করে। কোন কিছু স্মরণ করার জন্য প্রাথমিক যে উপাদান দরকার তা'হল অতীত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ, একটা কবিতার কয়েকটা লাইন স্মরণ করতে গেলে, প্রথম দরকার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ণ বা সাধারণভাবে তা শিখার দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা যখন কবিতা মুখস্থ করে আনতে বলি, তারা তখন, বাড়ীতে গিয়ে কবিতাটি বার বার পুনরাবৃত্তির সাহায্যে শিখে। এবং পরের শ্রেণীতে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন, তারা সেটার পুনরুদ্রেক করে। কিন্তু এই দুই সময়ের ব্যবধানে এই শিখা বিষয়বস্তুটাকে ধরে রাখতে হয় মনের মধ্যে। তা না হলে তার পুনরুত্থাপন বা পুনরুদ্রেকের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং, এইভাবে বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যায়, স্মরণক্রিয়ার উপাদান হ'ল—[এক] **শিখন বা স্থিরিকরণ** (Learning or fixation); [**দুই**] **ধারণক্রিয়া** (Retention) এবং [**তিন**] **পুনরুত্থাপন** (Reproduction)। রস্ (Ross), ক্লজমিয়ার (Klausmeire) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই স্মৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্গণ পুনরুত্থাপন (Reproduction) প্রক্রিয়াকে দু'টো পৃথক প্রক্রিয়ায় ভাগ করেছেন। এই দু'টো প্রক্রিয়া হ'ল—**পুনরুদ্রেক** (Recall) এবং **প্রত্যাভিজ্ঞা** (Recognition)। অর্থাৎ, পুনরুত্থাপন দু'ভাবে হ'তে পারে। পূর্বে শিখা কোন বিষয়বস্তুকে, আমরা তার অবর্তমানে পুনরুত্থাপন করি, তখন তাকে বলা হয় পুনরুদ্রেক (Recall)। যেমন, শ্রেণীতে আমরা শিক্ষার্থীদের যখন

স্মরণ ক্রিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়া

1. Ground work of educational Psychology—Ross.

প্রশ্ন করি "পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল"। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মনে ইতিহাসের জ্ঞানের পুনরুদ্রেক হয়। তারা সঠিকভাবে বলতে পারে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল। এই খ্রীষ্টাব্দটি স্মরণ করার বা পুনরুত্থাপন করার জন্য অন্য কোন রকম মাধ্যমিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় নি। আবার, যখন আমরা ছাত্রদের প্রশ্ন করি—"পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৮৫, ১৭৭৫, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও), তখন যে প্রক্রিয়ার দ্বারা তারা ইতিহাসের ঘটনার পুনরুত্থাপন করে তাকে বলা হয় প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বর্তমানে তার পুনরুত্থাপনকে বলা হয় প্রত্যাভিজ্ঞা। একে আমরা বিশেষ এক ধরনের উদ্দেশ্যমুখী প্রত্যক্ষণ হিসেবেও বিবেচনা করতে পারি। তা'হলে, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী স্মরণ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা চারটে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার সন্ধান পাই। [এক] যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা স্মরণ রাখার বস্তুকে মনের অন্তর্ভুক্ত করছি, তাকে বলা হচ্ছে **শিখন** (Learning) বা **স্থিরিকরণ** (Fixation), [দুই] যে মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই বস্তু সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে মনে স্থায়ীভাবে রাখছি তাকে বলা হয় **সংরক্ষণ বা ধারণ** (Retention) ; [তিন] এখন, মনে অবস্থিত বা সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কাজে লাগাই তার একটা হ'ল—**পুণরুদ্রেক** (Recall) এবং অপরটা হ'ল [চার] **প্রত্যাভিজ্ঞা** (Recognition)। এখন আমরা, এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করব। তবে তার পূর্বে স্মরণ ক্রিয়া সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে গেলে কি ধরনের উপাদান ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। এই আলোচনা পরবর্তী অংশে আমরা যে সব পরীক্ষামূলক ফলের কথা উল্লেখ ক'রব, তা হৃদয়ঙ্গমে সহায়তা করবে।

স্মরণ ক্রিয়ার পরীক্ষার জন্য উপকরণ
[Materials for Memory experiments]

অর্থহীন বর্ণসমষ্টি

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, জার্মান মনোবিদ্ **এবিংহস্** (Ebbinghaus) স্মৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মতভাবে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর এই সব পরীক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক (objective) করার জন্য এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার থেকে সংযোগ (association) মুক্ত করার জন্য, তিনি সবক্ষেত্রেই **অর্থবিহীন বর্ণসমষ্টি** (Nonsense-syllable) ব্যবহার করেন। তাঁর ধারণা ছিল, স্মৃতি শক্তি বা স্মরণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। তাই মানুষের এই সহজাত প্রক্রিয়ার ফলাফল পরিমাপ করার জন্য তার উপর পারিপার্শ্বিকের যে প্রভাব আছে, সেটাকে বাদ দেওয়ার দরকার। অনেক সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযোগের ফলে, আমরা তাড়াতাড়ি স্মরণ

করতে পারি। এই সংযোগ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য তিনি একধরনের নতুন বর্ণ সমষ্টির আবিষ্কার করেন, যার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু মিল নেই। এই বর্ণসমষ্টির দু'দিকে থাকে ইংরেজী বর্ণমালার দুটো ব্যঞ্জন বর্ণ (consonant) এবং মাঝে থাকে একটা স্বরবর্ণ (Vowel)। যেমন—LAR, TIR, FOB, ইত্যাদি। এগুলোকই তিনি বলেছেন, অর্থহীন বর্ণসমষ্টি (Nonsense-syllable)।

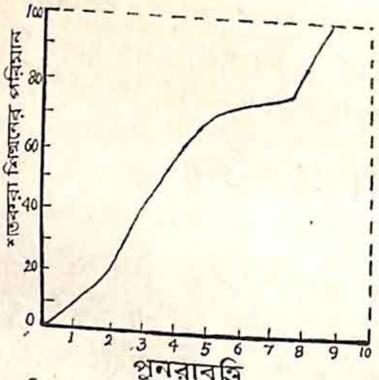
শিখন-স্মৃতির প্রথম প্রক্রিয়া [Learning]

কোন জিনিস স্মরণ রাখতে হ'লে সর্ব প্রথম যা আমাদের করতে হয়, তাই হ'ল শিখন (Learning)। শিখন কি, সে সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলতে পারি, শিখনের দ্বারা আমরা কোন অভিজ্ঞতাকে মনের সঙ্গে গেঁথে নিই। অর্থাৎ, কোন অভিজ্ঞতাকে মনের অংশ বিশেষে পরিণত করি। পরে এই শিখন, জীবনের কোন নতুন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। স্মৃতির বা স্মরণক্রিয়ার দিক থেকে বিচার করলে, একে আমরা এক কথায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া (Process of acquiring knowledge) হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন বিষয়বস্তুকে পুনঃপুনঃ উপস্থাপনের মাধ্যমে, তাকে মনে অভিজ্ঞতা সামগ্রীর অংশে পরিণত করাকেই বলা হয় শিখন প্রক্রিয়া (Learning process)। সুতরাং, শিখন হ'ল মনের সক্রিয় প্রক্রিয়া (active process) এবং এর একটা লক্ষ্য আছে। আমরা যখন কোন কবিতা মুখস্থ করি, তা কতক্ষণ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করব, তা ঠিক করে নিই। অর্থাৎ, একবার সঠিকভাবে না দেখে পুনরুত্থাপন করা পর্যন্ত আমাদের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এই যে সঠিকভাবে একবার পুনরুত্থাপন করতে পারা, এটা হ'ল লক্ষ্য (goal)। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা যতবার দরকার অধীত বস্তুকে উপস্থাপন করি।

শিখন ও স্মরণক্রিয়া

শিখন প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা স্মরণক্রিয়ার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ তা হ'ল এটা একটা ক্রম বর্ধমান প্রক্রিয়া (Gradual process)। সাধারণতঃ, মনের মধ্যে অভিজ্ঞার যে স্থিরিকরণ (fixation) হয়, তা ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। কোন অভিজ্ঞতাকে মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হ'লে, তাকে বার বার উপস্থাপন করতে হয় এবং প্রত্যেক উপস্থাপনে, কিছুটা করে অংশ আমাদের মনে থেকে যায়। এমনিভাবে বার বার উপস্থাপনের ফলে এক সময় অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অংশটা মনে স্থান পায়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপস্থাপনে শিখনের পরিমাণকে যদি ছক কাটা কাগজে (Graph

paper) স্থাপন করলে যে লেখ চিত্র (Graph) পাওয়া যায়, তাকে বলা হয়, শিখনের লেখ চিত্র (Learning curve)। X-অক্ষ বরাবর পুনরাবৃত্তি ও Y-অক্ষ বরাবর শতকরা শিক্ষার হার ধরে এই চিত্র আঁকা হয়। উপরে এই রকম



শিক্ষার লেখ চিত্র (Curve of Learning)

চিত্র দেওয়া হ'ল। এই চিত্র দেখা যাচ্ছে, শিখনের হার প্রথম দ্রুত হয়, তারপর, একটা সময় আসে যখন এই বৃদ্ধির হার কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় লেখ প্রায় X-অক্ষের সমান্তরাল হ'য়ে যায়। অর্থাৎ, এই স্তরে বার বার উপস্থাপন সত্ত্বেও আমাদের শিখনের কোন তারতম্য হয় না। একে শিখনের চিত্রের উপত্যকা (plateau of learning) বলা হয়। কিন্তু এর পরেই, হঠাৎ শিখনের হার এক সময় খুব বেড়ে যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা শিখনের লক্ষে পৌছাই। শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি, তাই এখানে আর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। শিখন যে কোন ভাবেই হউক না কেন, শিখনের পর ঐ অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে ধারণ করি, এবং পরে স্মরণ করি, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

পুনরুদ্রেক-স্মৃতির তৃতীয় প্রক্রিয়া [Recall]

পুনরুদ্রেক (Recall) এবং **প্রত্যাভিজ্ঞা** (Recognition) এদের উভয়ের আলোচনা আসলে, ধারণ প্রক্রিয়ার (Retention) পর হওয়া উচিত। কিন্তু প্রথমে আমরা এদের আলোচনা করছি, তার কারণ হ'ল, এই দুটো প্রক্রিয়া ছাড়া ধারণ ক্রিয়া যে আছে, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কোন বিষয়বস্তু শিখনের পর, তার সবটা যে আমাদের মনে সংরক্ষিত থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কতটা

পুনরুদ্রেক কি

সংরক্ষিত আছে, তা নির্ভর করবে, যতটা আমরা পুনরুদ্রেক করতে পারি, তার উপর। ধরা যাক, কোন ইতিহাসের ছাত্র পড়লো পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু শিক্ষকমহাশয় যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে খ্রীষ্টাব্দটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলো না। এর অর্থ তার মনে এই অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত নেই। সাধারণভাবে আমরা বলি, এই অভিজ্ঞতার তার কোন স্মৃতি নেই। কিন্তু কেন? তার শিখন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু, বর্তমানে সেই অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করা তার সম্ভব হ'ল না। তা'হলে ধারণ ক্রিয়ার (Retention) অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে, পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়ার দ্বারা। **পুণরুদ্রেক বলতে আমরা সেই সব মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝি যে গুলো আমাদের শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পুনরায় চেতনায় আনতে সহায়তা করে।**

পুনরুদ্রেকের কারণ হিসেবে মনোবিদগণ **সংযোগকে** (Association) নির্দেশ করেছেন, দু'টো ঘটনা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা এমনভাবে মনের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত থাকে যে একটার বর্তমানে, অপরটা আমাদের চেতনায় উপস্থাপিত হয়। এটা মনের একটা বিশেষ গুণ। অর্থাৎ, **সংযোগ বলতে মনের সেই বিশেষ গুণকে বলা হয়, যা অতীতের দু'টো ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা ধারণার মধ্যে এমন যোগসূত্র স্থাপন করে যে তাদের যে কোন একটা চেতনায় উপস্থাপিত হলে, অপরটা সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় উপস্থাপিত হয়।** আমরা যখন তাজমহল দেখি তখন সম্রাট শাজাহানের কথা মনে পড়ে। গীতাঞ্জলির কথা উঠলেই কবিগুরুর কথা মনে পড়ে। মনের মধ্যে এই যে অভিজ্ঞতার বা ধারণার সংযোগ স্থাপন হয়, এ সম্বন্ধে প্রাচীন দার্শনিকদেরও ধারণা ছিল। প্রাচীন দার্শনিক **অ্যারিষ্টটল** (Aristotle) সংযোগকে মনের বিশেষ ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যে অভিজ্ঞতার বর্তমানে অন্য অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক হয় তাকে তাঁরা নাম দিয়েছেন পুনশ্চৈতন্যকারী অভিজ্ঞতা বা ধারণা (Reviving ideas) এবং যে অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক হয় তাকে বলে, পুনশ্চৈতন্য অভিজ্ঞতা বা ধারণা (Revived idea)। এই অভিজ্ঞতাগুলো নিজেদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধন সৃষ্টি করে মানসিক পর্যায়ে। এই সব সংযোগ সম্পন্ন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে তিন ধরনের বন্ধন সৃষ্টি হয়। এই তিন ধরনের বন্ধন অনুযায়ী সংযোগের তিনটে সূত্রের (Laws of association) কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রগুলো হ'ল—[এক] **সন্নিধির সূত্র** (Law of contiguity) **[দুই] সাদৃশ্যের সূত্র** (Law of similarity) এবং **[তিন] বৈসাদৃশ্যের সূত্র** (Law of contrast)। সন্নিধির সূত্রে বলা হয়েছে, দু'টো অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যের জন্য তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এই

পুনরুদ্রেকের কারণ-সংযোগ

সান্নিধ্য দু'দিক থেকে হ'তে পারে—সময়ের দিক থেকে (contiguity in time) এবং অবস্থানের দিক থেকে (contiguity in space)। অভিজ্ঞতার অবস্থানের সান্নিধ্যের জন্য যে সংযোগ হয় তাকে মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, **সমকালীন অবস্থানের জন্য সংযোগ** (simultaneous association)। সময়ের সান্নিধ্যের জন্য যে সংযোগ হয়, তাকে বলা হয়েছে, **ক্রমানুবর্তীতার জন্য সংযোগ** (successive association)। সাদৃশ্যের সূত্রে বলা হয়েছে, সদৃশ অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। কবিতায় ধ্বনির মিল আছে, কবিতা গদ্যাংশের চেয়ে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করা সম্ভব হয়। বৈসাদৃশ্যের সূত্রে ঠিক বিপরীত কথা বলা হয়েছে। বিপরীত ঘটনাগুলো, বা, অভিজ্ঞতা-গুলো পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের জন্য সংযোগ স্থাপন করে। ফলে একটা অভিজ্ঞতা মনে এলে, অপরটা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে। সুতরাং এই ধরনের সংযোগের জন্য হোস্টেলে খেতে বসে, মায়ের দেওয়া বাড়ীর খাবারের কথা মনে পড়ে। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, স্মরণ ক্রিয়ার জন্য বা বিশেষভাবে পুনরুদ্রেকের জন্য সংযোগের প্রয়োজন হয়। এবং এই সংযোগ শিখনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একটা কথা মনে রাখার দরকার, পুনরুদ্রেকের জন্য যে সংযোগ কাজ করে, তা নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় সংযোগ (active association)। অর্থাৎ, পুনরুদ্রেকের জন্য আমাদের মানসিক সক্রিয়তার দরকার হয়।

এই সংযোগের সামান্য বিভিন্নতা অনুযায়ী আমরা পুনরুদ্রেককে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—**প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক** (Direct recall) আর **পরোক্ষ পুনরুদ্রেক** (Indirect recall)। প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক আমরা সেগুলোকে বলি যখন কোন জিনিসকে মনে আনার জন্য অন্য কোন ধারণার সাহায্য নিতে হয় না। আবার যখন পুনরুদ্রেকের সময় অন্য ধারণার সাহায্য নিই তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect recall)। ধরা যাক রামের কথা বললেই শ্যামের কথা মনে আসে। এখানে শ্যামের কথা মনে আসার পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া আছে তাকে বলছি প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক (Direct recall)। আবার রামের কথা থেকে যখন যদুর (শ্যামের ভাই) কথা মনে পড়ে তখন আগে শ্যামের কথা ভাবতে হয়, তারপর শ্যামের সঙ্গে যদুর সংযোগ হয়। অর্থাৎ এখানে পুনরুদ্রেকের জন্য অন্য একটা ধারণার সাহায্য নিতে হচ্ছে। একে বলে পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect recall)। সংযোগ স্থাপন করা মনের একটা বিশেষ গুণ। একথা সংযোগের আলোচনার সময় বলেছি। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংযোজিত জিনিসগুলো মনে আনছি তা হ'ল পুনরুদ্রেক। সুতরাং পুনরুদ্রেক আর সংযোগ এক নয়। সংযোগ আমাদের পুনরুদ্রেক ঘটায়। মনোবিজ্ঞানী **মিচোটি** আর **পোর্টিচ** (Michottee & Portych)

পুনরুদ্রেকের শ্রেণী-বিভাগ

দু'রকম পুনরুদ্রেকের উপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে শিখার পর সময় যত অতিবাহিত হতে থাকে আমাদের প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক-ক্ষমতা তত কমতে থাকে। অর্থাৎ বহুদিন পরে কোন জিনিসকে মনে করার জন্য আমাদের পরোক্ষ পুনরুদ্রেকের সাহায্য নিতে হয়।

নামের পুনরুদ্রেক
[Recalling of Names]

বহুদিন বাদে স্কুলের এক বন্ধুর সাথে দেখা। অনেকদিন কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য তার নাম ভুলে গেছি। দেখা হ'লে কথা বললাম। হঠাৎ যদি সে জিজ্ঞেস করে, "আমাকে চিনতে পারছ তো?" ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয় 'হ্যাঁ'; কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলার পরও তার নাম মনে করতে পারা যায় না। তারপর সে চলে যাওয়ার অনেক পরে হয়তো তার নামটা মনে পড়ল। এই ভুলে যাওয়া নাম পুনরুদ্রেকের সময় যে মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে সে সম্বন্ধে **জেমস্** (James), **ওয়েঞ্জল** (Wenzl) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে আমরা যখন কোন ভুলে যাওয়া নাম স্মরণ করতে চাই তখন প্রথমে অনেক ভুল নাম মনে পড়ে। আর এই সব ভুল নামের সঙ্গে আসল নামের একটা সাদৃশ্য থাকে। ওয়েঞ্জল বলেন—আমাদের ভুলে যাওয়া নামের পুনরুদ্রেক শুরু হয় একটা সাধারণ গুণ থেকে (General characteristics) এবং আস্তে আস্তে সেটা শোধরাতে শোধরাতে ঠিক দিকে এগিয়ে যায় (*The process of recalling a name starts with general characteristics of the name and advances towards the specific*)। যেমন,—আমি মনে করতে চাই যে নামটা সেটা হ'ল 'রহিম'। কিন্তু প্রথমে আমার মনে পড়ল 'করিম'। এ দু'টো নামের উচ্চারণগত দিক থেকে মিল আছে। তারপর হয়তো মনে পড়ল 'কবীর'। এমনি করতে করতে রহিম নামটা মনে এল। এমনি করে অপর্ণার নাম স্মরণ করতে গিয়ে হয়তো প্রথমে মনে পড়ে সুপর্ণা, ইত্যাদি।

নাম-পুনরুদ্রেকের কৌশল

পুনরুদ্রেক মুহূর্ত
[Condition of Readiness]

পুনরুদ্রেক সম্বন্ধে আর একটা জিনিস বলার আছে। সবাই-এর বোধ হয় অভিজ্ঞতা আছে যে, কোন জিনিসের সমস্ত কিছু মনে আসছে, তবু জিনিসটা ঠিক কি তা বলতে পারছি না। একটি কবিতার কয়েক লাইন কেউ আমাদের সামনে আবৃত্তি করল, আমরা

পুনরুদ্রেক মুহূর্ত কি?

সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করলাম, কবিতাটির কি নাম, বা কোন বইয়ের কবিতা। আমাদের কাছে জিনিসটা এত পরিচিত যে আমরা এক্ষুণি বলে ফেলতে পারি কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছি না। এটা ঠিক একেবারে পুনরুদ্রেক হয় নি; তার ঠিক আগের পর্যায়; আর একটু কিছু যদি মনে আনতে পারি তা'হলেই কবিতাটির নাম মনে পড়ে। মনের এই অবস্থাকে বলা হয় **পুনরুদ্রেক মুহূর্ত** (Condition of Readiness)

পরিচিতি বা প্রত্যাভিজ্ঞা [Recognition]

সাধারণ অর্থে 'মনে করা' বলতে যা বুঝি তার আলোচনা পুনরুদ্রেকের ভেতর পড়ে। কিন্তু এ রকম জিনিসও আছে যা আমরা আগে দেখেছিলাম এবং এখন দেখলে চিনতে পারি। এগুলোও স্মরণক্রিয়ার একটা অঙ্গ। কোন একজন লোককে রাস্তায় দেখে যদি আমাদের মনে পড়ে যে ছোটবেলায় সে আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত, তখন তাকে বলি **প্রত্যাভিজ্ঞা** (Recognition)। প্রত্যাভিজ্ঞাকে এক ধরনের বিশেষ প্রত্যক্ষণও আমরা বলতে পারি। পুনরুদ্রেকের সঙ্গে প্রত্যাভিজ্ঞার পার্থক্য হ'ল যে—প্রথম প্রক্রিয়া ঘটে বস্তুর অনুপস্থিতিতে এবং মানসিক কল্পের মাধ্যমে (through formation of mental image)। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া কাজ করে বস্তুর উপস্থিতিতে। কতকগুলো জিনিসের মধ্যে যেটাকে আগে দেখেছিলাম, সেটাকে চিনতে পারি প্রত্যক্ষণের জন্য। এদিক থেকে প্রত্যাভিজ্ঞা পুনরুদ্রেকের চেয়ে সহজ প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে দু'টো প্রক্রিয়াই আমাদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করে। দেখা যায় যে জিনিসের পুনরুদ্রেক করতে কষ্ট হচ্ছে সেই জিনিস সামনে থাকলে সহজে মনে করতে পারি। পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণ হয়েছে যে—যে কোন রকম বিষয়বস্তুরই স্মরণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যাভিজ্ঞা সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া।

প্রত্যাভিজ্ঞা কি ?

ধারণক্রিয়া [Retention]

আমরা যা শিখি তার সমস্ত কিছুই আমাদের স্মৃতিতে থাকে না। যেটুকু আমরা ধারণ করতে পারি সেটুকু আমাদের স্মৃতি হয়ে দাঁড়ায়। ধারণ (Retention) **বলতে আমরা বুঝি শিখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যা থাকে আর বিশেষ সময় পরে যা মনে থাকে তার মধ্যে পার্থক্য।** খুব সহজভাবে বলতে গেলে **নির্দিষ্ট সময় পরে আমাদের মন যা সঞ্চয় করে রাখতে পারে তাই**

ধারণ ক্রিয়া কি ?

হ'ল এ সময়ের মধ্যে ধারণের পরিমাণ। আর এই ধারণ করে রাখবার পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তাই হ'ল ধারণক্রিয়া। সাধারণ অর্থে আমরা একেই বলে থাকি স্মৃতিশক্তি। প্রথমে আমরা কিভাবে ধারণের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং পরে ধারণপ্রক্রিয়ার বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

স্মরণশক্তি বা ধারণ-ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি [Methods of measuring Retention]

আমরা এখানে যে সব পদ্ধতিগুলোর আলোচনা করব সেগুলো **ধারণ-ক্ষমতা** পরিমাপের পদ্ধতি হ'লেও এদের প্রথম অংশটা শিক্ষণ-পদ্ধতি (Learning process) ছাড়া কিছু নয়। কারণ কোন জিনিস কতটা মনে আছে তা দেখতে হ'লে প্রথমে সেটা শেখার দরকার। তাই এই সব পদ্ধতির প্রথম অংশটিকে শিক্ষা-পদ্ধতি হিসেবেও বলতে পারি। এখানে আমরা কয়েক রকম পদ্ধতির কথা আলোচনা করব।

স্মৃতির পরিসর

জ্যাকবস্ (Jacobs) ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্মরণক্রিয়ার উপর একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করেন। তাঁর মতে আমাদের স্মরণ করবার ক্ষমতারও একটা পরিমাণ আছে। একে তিনি বলেন স্মৃতির পরিসর (Span of memory)। আমরা কোন জিনিস একবার দেখে বা শুনে যতটা নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারি তাকেই বলা হয় **স্মৃতির পরিসর** (Memory Span)। জ্যাকবস্ পরীক্ষা করেন অঙ্কের সাহায্যে। পরীক্ষার্থীকে প্রথম কয়েকটি অঙ্কসমষ্টি একবার বলে দেওয়া হয়। তারপর তাকে সেগুলো লিখে বা মুখে বলে পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। এমনি করে প্রত্যেকবার উপস্থাপনে একটি করে অঙ্ক বাড়িয়ে তাকে এক একবার দেখানোর বা শোনানোর পর পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। পরীক্ষার্থী একবার দেখে বা শুনে যতগুলো অঙ্ক ঠিকভাবে বলতে পারে, তাই হয় তার স্মৃতির পরিসর। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার—পরীক্ষার্থীকে যে অঙ্কগুলো শোনানো হয় সেগুলো কোন বিশেষ সংখ্যা নয়। যেমন—৯৩২ ; এটা নয় শত বত্রিশ নয়। তাকে এইভাবে শোনানো হয়—নয়, তিন, দুই ইত্যাদি।

Method of retained number

বীনে (Binet), **হেন্‌রী** (Henry), **স্মিথ্** (Smith) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ জ্যাকবস্-এর এই নিয়মকে অনুসরণ করে একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি পরিমাপের চেষ্টা করেন। জ্যাকবস্ যেমন পরীক্ষার্থী যতদূর না পারে ততদূর পর্যন্ত একটি করে অঙ্ক বড়িয়ে যাচ্ছিলেন, এঁরা কিন্তু তা না করে পরীক্ষার্থীকে এক সঙ্গে কতকগুলো অঙ্ক পরপর সাজিয়ে একবার দেখালেন বা

শোনালেন। এর পর তাকে লিখতে বললেন। এতে পরীক্ষার্থী যতগুলো মনে রাখতে পারল তাই হ'ল তার ধারণক্ষমতা। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার্থীকে তার স্মৃতির যা প্রকৃত পরিসর তার চেয়ে বেশী পরিমাণ বিষয়বস্তু দেওয়া হয়; তার থেকে সে তার স্মরণ-ক্ষমতা অনুযায়ী মনে রাখে। এইভাবে ধারণক্রিয়া পরিমাপের পদ্ধতিকে বলা হয় Method of Retained number।

সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যেও স্মৃতির পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং এর অনেক পরিবর্তনও হয়েছে। প্রথম যখন এই পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করা হ'ত তখন পরীক্ষার্থীকে একটি বিশেষ বিষয় পড়তে দেওয়া হ'ত এবং সেটা তার মুখস্থ করতে যত সময় লাগত তাই হ'ত তার স্মরণ-ক্ষমতা। আবার অনেকে সময় না দেখে কতবার পড়ার পর মুখস্থ করতে পারে তাই দেখলেন। কিন্তু এই পরিমাণ-পদ্ধতিতে অনেক গণ্ডগোল থেকে যেত। কারণ এমনও হ'তে পারে কোন পরীক্ষার্থী একেবারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকবার বেশী পুনরাবৃত্তিও করতে পারে। এতে তার সময় বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই এই পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করে এখন কাজে লাগান হয়।

শিখন নির্ভর পদ্ধতি

এই পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার্থীকে যে জিনিসটি শিখতে হবে সেটা একবার করে পড়ানো হয় আর প্রত্যেকবার পড়ার শেষে তার যা মনে আছে তা লিখতে বলা হয়। এমনি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সমস্ত জিনিসটা ঠিকভাবে লিখতে পারে ততক্ষণ এই ভাবে তাকে পড়ানো হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি পরীক্ষার্থী ঠিক কখন বিষয়বস্তুটা সম্পূর্ণভাবে শিখে ফেলেছে। এই পদ্ধতির দ্বারা, অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর শিক্ষার সময় দেখে তুলনামূলকভাবে তাদের স্মৃতিশক্তির বা ধারণক্ষমতার পরিমাপ করতে পারি। এই পদ্ধতিতে ধারণক্রিয়ার পরিমাপকে বলা হয় **শিখন নির্ভর পদ্ধতি** (Learning Method)।

অনেকে শিখন নির্ভর পদ্ধতি না ব্যবহার করে এক বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। এতে যে জিনিসটা শিখতে হবে সেটা পরীক্ষার্থীকে দু' তিনবার পড়ে শোনানোর পর তাকে বলতে বলা হয় এবং যেখানে ভুল করে সেখানটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সবটা নিজে থেকে বলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে করা হয়। এখানে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে যতবার ভুল ধরিয়ে দিতে হয় সেই হিসেবে তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ বিচার করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **ভুল ধরিয়ে দেওয়া পদ্ধতি** (Prompting বা Anticipation Method)।

ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি

আবার অনেক সময় পরীক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির (Learning method) সাহায্যে বিষয়বস্তুটি শিখানো হয়। তারপর কিছু সময় পরে আবার তাকে সেই জিনিসটাই শিখতে বলা হয়। আগের শিক্ষার জন্য কিছু পরিষ্কার মনে থেকে যায়, ফলে দ্বিতীয়বার শিক্ষার সময় কিছুটা কম সময় বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা কম লাগে। এই প্রথম আর দ্বিতীয়বার শিক্ষার সময়ের মধ্যে শতকরা পার্থক্যকেই তার স্মৃতিশক্তির পরিমাপ হিসেবে ধরা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **সঞ্চয়-পদ্ধতি** (Saving Method)।

সঞ্চয় পদ্ধতি

বল্ডউইন (Baldwin), **জ্যাঙ্গউইল** (Zangwill), **বেণ্ট্লি** (Bently), **হুইপ্লে** (Whipple) প্রভৃতি মনোবিদগণ প্রত্যাভিজ্ঞার সাহায্যে ধারণের পরিমাপ নির্ণয়ের এক পদ্ধতির প্রচলন করেন। পরীক্ষার্থীকে কতকগুলো জিনিস দেখানোর পর সেগুলোকে নতুন জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষার্থীকে বলা হয় তার ভেতর থেকে পুরানো জিনিসগুলোকে খুঁজে বাহির করতে। আগের জিনিসের সে শতকরা যত ভাগ খুঁজে বের করতে পারে তাই হয় তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ। এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি (Recognition Method)।

প্রত্যাভিজ্ঞা পদ্ধতি

মুন্স্টারবার্গ (Mzunsterberg), **বিগহাম** (Bigham), **গাম্বল** (Gamble) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ তাঁদের পরীক্ষার্থীদের কতকগুলো জিনিস ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেখানোর পর সেগুলোকে ওলটপালট করে মিশিয়ে দেন। তারপর পরীক্ষার্থীদের বলেন যে ভাবে পর পর দেখানো হয়েছিল জিনিসগুলোকে ঠিক সেই ভাবে সাজাতে। যদি সাজানোতে ভুল থাকে আবার তাকে দেখানো হয় এবং তার পর সাজাতে বলা হয়। এই ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিকভাবে সাজাতে পারে ততক্ষণ পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করা হয়। পরীক্ষার্থীর ঠিকমত সাজানোর জন্য যতবার পুনরাবৃত্তি দরকার হয় তাই হয় তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ। একে বলা হয় পুনর্গঠন-পদ্ধতি (Reconstruction method)।

পুনর্গঠনের পদ্ধতি

এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ এদের কিছু পরিবর্তন করে স্মরণক্রিয়া পরীক্ষার কাজে লাগান। তবে এবিহংস্ (Ebbinghaus), লা (Luh), প্রভৃতি মনোবিদগণ বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের ধারণক্ষমতা, পরিমাপক পদ্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষার্থী নিয়ে তাদের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ধারণক্রিয়ার পরিমাপ করেন। লা (Luh) ভুল সংশোধন-পদ্ধতি, সঞ্চয়-পদ্ধতি, প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি আর পুনর্গঠন-পদ্ধতির

বিভিন্ন পদ্ধতির ধারনের উপর প্রভাব

সাহায্যে স্মৃতির পরিমাপ করার পর তুলনামূলকভাবে দেখেন যে এদের মধ্যে ভুল সংশোধন-পদ্ধতি (Anticipation or Prompting method) হ'ল সবচেয়ে কঠিন পদ্ধতি; আর প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি (Recognition method) হ'ল সব চেয়ে সহজ পদ্ধতি। লা (Luh)-এর পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :—

যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল	২০ মিঃ পরে শতকরা যতভাগ মনেছিল।
১। ভুল সংশোধন-পদ্ধতি	৬৮%
২। সঞ্চয়-পদ্ধতি	৭৫%
৩। শিক্ষা-পদ্ধতি	৮৮%
৪। পুনর্গঠন-পদ্ধতি	৯০%
৫। প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি	৯৮%

কি কি জিনিসের উপর ধারণক্রিয়া নির্ভর করে? (Factors of Retention) :—বিভিন্ন মনোবিদ্ ধারণক্রিয়া কি কি জিনিসের উপর নির্ভর করে তাই প্রথম পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে আমরা জানতে পারি যে বিষয়গুলি আমাদের ধারণ-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

অধিক শিক্ষন

॥ এক ॥ **শিক্ষার পরিমাণ** (Amount of learning): একটা কবিতা মুখস্থ করছি। যখনই একবার না দেখে সম্পূর্ণটা বলতে পারি তখনই মুখস্থ হয়েছে বলে রেখে দিই। আবার কিছুক্ষণ পরে সেটা মনে করার চেষ্টা করে দেখা যায় কিছুটা ভুলে গেছি। তখন যদি কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারার পরও কয়েক বার পড়তাম সময় লাগত কিছু বেশী ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্য করা যেত একই সময় পড়ে কম ভুলতাম। এই ভাবে শিখন সম্পন্ন হওয়ার পর আবার তাকে পুনরাবৃত্তি করাকে বলে অধিক শিখন (Overlearning)। এবং এই অধিক শিক্ষা ধারণের সহায়ক। এবিংহস্ (Ebbinghaus), ক্রুজার (Krueger) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এর সত্যতা প্রমাণ করেন। এবিংহস্ কতকগুলো অর্থহীন বর্ণসমষ্টির তালিকা নিয়ে এক একটি ভিন্ন পরিমাণে অধিক শিক্ষা করেন। তারপর একই সময়ের ব্যবধানে কোনটা কত মনে আছে তা দেখেন। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল নীচের ছক

যতবার পড়া হয়েছিল	৮	১৬	২৪	৩২	৪২	৫৩	৬৪
শতকরা যত ভাগ মনে ছিল	৮%	১৬%	২৩%	৩২%	৪৭%	৫৪%	৬৪%

থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি একবার বেশী পড়ার জন্য আমাদের ধারণ প্রায় শতকরা একভাগ বেশী হয়েছে।

তা'হলে আমরা বলতে পারি শিক্ষার পরিমাণের উপর আমাদের ধারণক্রিয়া নির্ভর করে। তবে এখানে একটা জিনিস বলার আছে, সেটা হ'ল প্রত্যেক একবারের জন্য যদি ১% মনে থাকে তবে কোন জিনিস ১০০ বার পড়লে আমরা ভুলব না। কিন্তু তা হয় না, কারণ সব কিছুরই একটা সীমা (limit) আছে। আবার অত্যধিক পরিমাণে পুনরাবৃত্তি করলে তার ফলাফল আবার উল্টো হবে।

॥ **দুই** ॥ **শিক্ষা-পদ্ধতি** (Method used in learning) :—আমরা সাধারণতঃ যখন একটা কবিতা মুখস্থ করি সেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না পড়ে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে নিই। হয়তো এক একটা স্তবক আলাদা আলাদা করে মুখস্থ করি। কিন্তু এতে ধারণ কম হয়। আমরা যদি একটি জিনিস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে শিক্ষা করি তাতে বেশী মনে থাকে, পরিশ্রমও কম হয়। এই ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে শিক্ষা করাকে বলা হয় আংশিক পদ্ধতি (Part Method) আর এক সঙ্গে সমস্তটা শিক্ষা করাকে বলা হয় সামগ্রিক পদ্ধতি (Whole method)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি কবিতা বারবার সম্পূর্ণটা পড়ে মুখস্থ করলে আর খণ্ড খণ্ড করে মুখস্থ করলে তাদের মধ্যে ধারণের পার্থক্য হয় প্রায় ১৬%।

সামগ্রিক ও আংশিক শিক্ষণ পদ্ধতি

আবার আমরা সাধারণতঃ কোন কিছু মুখস্থ করতে হলে একেবারে বসে বার বার পড়তে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখস্থ হয়। কিন্তু একসঙ্গে বহুবার না পড়ে যদি সময়টাকে ভাগ করে নেওয়া হয় তা হলে বেশী মনে থাকে। অর্থাৎ কোন কবিতা মুখস্থ করতে গিয়ে আমরা একই সঙ্গে ১৬ বার না পড়ে যদি কিছু সময় বাদে বাদে চার বার করে পড়ি তা হলে বেশী মনে থাকে। এতে শিক্ষা যত তাড়াতাড়ি হয় ধারণও তত বেশী হয়। এক সঙ্গে শিক্ষা করাকে বলা হয় অবিরাম শিক্ষা (Massed learning) আর সময় ভাগ করে পড়াকে বলা হয় সবিরাম শিক্ষা (Distributed learning)। মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্ অর্থহীন বর্ণসমষ্টি আর অর্থপূর্ণ কবিতা দুই-এর উপর পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে সবিরাম শিক্ষায় আমাদের ধারণ বেশী হয়। তিনি ১৫০০ শব্দবিশিষ্ট একটি গদ্যের উপর পরীক্ষা করে দেখেন যে ঐ রকম গদ্য একদিনে পর পর চার বার না পড়ে চার দিনে চার বার পড়া যায় তা'হলে ভাল মনে থাকে।

সবিরাম ও অবিরাম শিখন পদ্ধতি

এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখার দরকার—আমরা আংশিক পদ্ধতিতে অধীত বস্তুকে খণ্ড করছি আর সবিরাম পদ্ধতিতে সময়কে খণ্ড করছি। দুটোর ভিতর তফাত মনে রাখতে হবে।

এ ছাড়াও দেখা গেছে সক্রিয় শিক্ষায় (Active learning) নিষ্ক্রিয় শিক্ষার (Passive learning) চেয়ে বেশী মনে থাকে। সক্রিয় শিক্ষা বলতে আমরা

বুঝি সেই সব শিক্ষাকে যেখানে কিছুটা সময় আবৃত্তি করার জন্য দেওয়া হয়। একবারে আবৃত্তি না করে বারবার পড়ে শিক্ষা করাকে নিষ্ক্রিয় শিক্ষা (Passive learning) বলে। কবিতা মুখস্থের সময় যদি একবার করে পড়ে কিছুটা মনে করার চেষ্টা করি এবং তারপর আবার পড়ি আবার মনে করি, তা'হলে আমাদের বেশী মনে থাকে। নীচে এবিংহস্‌-এর একটা পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হ'ল। এর থেকে বুঝা যাবে সক্রিয় শিক্ষা আমাদের কি পরিমাণে ধারণে সাহায্য করে।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শিখন পদ্ধতি

আবৃত্তির সময়	চার ঘণ্টার পরে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল
সমস্ত সময় যখন আবৃত্তির শিক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল (Passive)	১৫%
$\frac{১}{৫}$,, ,, ,, ,, ,, ,,	২৬%
$\frac{২}{৫}$,, ,, ,, ,, ,, ,,	২৮%
$\frac{৩}{৫}$,, ,, ,, ,, ,, ,,	৩৭%
$\frac{৪}{৫}$,, ,, ,, ,, ,, ,,	৪৭%

॥ তিন ॥ **অধীত বস্তুর পরিমাণ** (Amount to be learned) :— মনোবিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে একমত যে দু'টো বিষয়বস্তুর মধ্যে যেটার পরিমাণ বেশী কিছু সময় পড়ে সেটা শতকরা বেশী ভাগ মনে থাকে। একটা ছোট কবিতা আর একটা বড় কবিতা মুখস্থ করার ঠিক একই সময় পরে যদি আবৃত্তি করি হয়তো আপাতঃ ভাবে আমরা দেখব যে ছোট কবিতা বেশী মনে আছে, কিন্তু যদি শতকরা হিসেব করি তা'হলে দেখব যে বড়টাই বেশীর ভাগ মনে আছে। এবিংহস্‌ অর্থবিহীন বর্ণসমষ্টির সাহায্যে পরীক্ষা করেও এই ফল পান। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :

বস্তুর দৈর্ঘ্য

তালিকায় যতগুলি শব্দ ছিল	প্রথম মুখস্থ করতে যত বার পড়তে হয়েছিল	একই সময়ে পড়ে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল
১২	১৭	৩৫%
২৪	৪৫	৪৯%
৩৬	৫৬	৫৮%

এর থেকে বুঝা যায় আমাদের ধারণক্রিয়া অধীত বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এর কারণ হিসেবে আমরা পুনরাবৃত্তির সংখ্যাকেও দায়ী করতে পারি। এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে তালিকায় শব্দসংখ্যা

বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষা করার জন্য পুনরাবৃত্তির সংখ্যাও বাড়ছে। তবে এই বৃদ্ধির হারের তফাত আছে।

॥ চার ॥ **অধীত বস্তুর বিশেষত্ব** (Characteristics of the material):—অর্থপূর্ণ আর ছন্দোময় জিনিস অর্থবিহীন বা গদ্যের চেয়ে বেশী মনে থাকে। এই কারণে আমাদের অর্থবিহীন শব্দের চেয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বেশী মনে থাকে। আবার গদ্যের চেয়ে কবিত বেশী মনে থাকে।

বস্তুর বৈশিষ্ট্য

॥ পাঁচ ॥ **অধীত বস্তুর উজ্জ্বলতা** (Vividness):—**ক্যালকিন্স্** (Calkins), **জারশীল্ড্** (Jersield) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে সব বিষয় আমাদের পরিষ্কার অভিজ্ঞতা দেয় সে সব বিষয় বেশী মনে থাকে। একই জিনিস একটা বাজে হাতের লেখা থেকে পড়লে যা মনে থাকে, একটা ভাল হাতের লেখা থেকে পড়লে তার থেকে বেশী মনে থাকে।

বস্তুর সংবেদন গত বৈশিষ্ট্য

এই সব ছাড়াও অনেকে ধারণের আরও কতকগুলো কারণ বলেছেন, যেমন—অধীত বস্তুর উপস্থাপনের কাল। এখানে আর এগুলো আলাদা করে আলোচনা করার দরকার নেই। উপরে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যেই সব কিছু বলা হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের স্মরণক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হলে, এই সব দিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধারণ ক্রিয়ার যে সব বস্তুগত গুণের উপর নির্ভর করে, বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনের সময় সে গুলোর উপর লক্ষ্য রাখি, তা'হলে, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

ধারণক্রিয়া সম্পর্কে মতবাদ
[Theories of Retention]

যে মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা অতীতের অভিজ্ঞতাকে অবচেতন মনে সঞ্চয় করে রাখি তাকে বলা হয় ধারণক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—এই অভিজ্ঞতা কি ভাবে কোথায় অবস্থান করে। এই অভিজ্ঞতা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেলে, তার পুনরুদ্রেক কখনও সম্ভব হ'ত না। সুতরাং, স্মৃতির এই রেশ মনের বা শরীরের কোন না কোন স্তরে সঞ্চিত থাকে। কোথায় এবং কি ভাবে, এই রেশ (Trace) থাকে তা আবিষ্কার করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ দুটো বিশেষ স্থানের কথা বলেছেন। এই অনুযায়ী ধারণক্রিয়ার উৎস হিসেবে দুটো মত প্রচলিত আছে। এর একটা হ'ল **শরীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological theory) এবং অপরটা হ'ল **মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological theory)।

উইলিয়ম জেমস্ (William James) প্রভৃতি মনোবিদ্ বলেন, আমাদের মনের সার উপাদান হ'ল চেতনা (consciousness)। তাঁর মতে, মন এবং চেতনা সমব্যাপক (Co-extensive)। সুতরাং, অবচেতন মন বলে কিছু নেই। চেতনায় এখন যা নেই, মনেও তা নেই। তাঁর মতে চেতনা বহির্ভুক্ত কোন কিছু জিনিসই মানসিক নয়। জেমস্ (James) এই টুকু বলেই, তাঁর বক্তব্য শেষ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তাই মনের এই ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি শরীর বিজ্ঞানের সাহায্য নিলেন। তিনি বললেন অবচেতন অভিজ্ঞতাগুলো মনের বহির্ভুক্ত হ'লেও তারা কোন না কোন অবস্থায় শরীরের কোথাও থাকে এবং মানসিক সচেতন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এমনকি সুযোগ পেলে তারা মানসিক বা সচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এর কারণ হিসেবে তিনি দেহ মনের সম্পর্ককে নির্দেশ করেন। এই সম্পর্ক বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মাধ্যমে ঘটে। যে কোন মানসিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া দেহে বা, বিশেষভাবে মস্তিষ্কে কোন পরিবর্তন আনে। মানসিক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে একটা বিশেষ রেখাপাত করে এবং মানসিক ক্রিয়ার অবর্তমানে, **স্মৃতি রেশ** (Memory trace) হিসেবে মস্তিষ্কে থাকে। জেমস্ বলেন, এই স্মৃতিরেশ বা স্মৃতি চিহ্ন আমাদের মস্তিষ্কে থাকে বলে, অতীত অভিজ্ঞতাকে বা ঘটনাকে স্মরণ করা সম্ভব হয়। অবশ্য, মস্তিষ্কের এই সব রেখা বা চিহ্ন চর্চ্চার অভাবে অনেক সময় অস্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে আনুষঙ্গিক মানসিক ক্রিয়ার পুনরুদ্রেকও (Recall) অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সুতরাং, জেম্সের মতে মস্তিষ্কের উপর ধারণক্রিয়া নির্ভর করে। জেম্সেরই মত আরও অনেকে ধারণক্রিয়ার শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। **মিল** (Mill), **কার্পেণ্টার** (Carpenter) প্রভৃতি চিন্তাবিদ্গণ ধারণক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্ককে দায়ী করেছেন। তাঁরা মনে করেন, কোন অভিজ্ঞতা চেতনা থেকে চলে গেলেও তার আনুষঙ্গিক চিহ্ন স্থায়ীভাবে আমাদের মস্তিষ্কে স্পন্দন (vibration) সৃষ্টি করে যায়, এর ফলেই আমরা পরে ঐ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি। কিন্তু মিল (Mill), কার্পেণ্টার (carpenter) প্রভৃতির এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার যদি মস্তিষ্কে স্থায়ী স্পন্দন হয়, তা'হলে মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তার ফলে, মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

শরীর বৃত্তীয় মতবাদ

তবে একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের ধারণক্রিয়ার জন্য শারীরিক অবস্থা দায়ী। তবে ধারণক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, মানসিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, এ ধারণা ভুল। কারণ—[এক] মস্তিষ্কের স্মৃতি রেশ বা

মনস্তাত্বিক মতবাদ

স্মৃতি চিহ্নের অস্তিত্ব একেবারে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের কোনরকম চিহ্নই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হয় নি। **[দুই]** যে ধারণা বা অভিজ্ঞতা চেতনা থেকে সম্পূর্ণভাবে চলে যায়, তার পুনরুদ্রেক কি করে সম্ভব হয়, তা বিজ্ঞান সম্মতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ, স্মৃতি রেশ (Memory trace) কিভাবে কাজ করে তা তাঁরা বলেন নি। **[তিন]** এই মতবাদে বলা হয়েছে, শারীরিক ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এটা জড়বাদের (Materialism) নামান্তর মাত্র। সুতরাং জড়বাদের সব ত্রুটিই এই মতবাদের মধ্যে আছে। মনোবিদ্যার গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিদ্‌গণ ধারণক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, আমাদের চেতনা ও মন সমব্যাপক নয়। চেতনার বাইরেও মানসিক ক্রিয়ার একটা বিরাট ক্ষেত্র আছে, একে বলা হয় **অবচেতন মন** (Unconscious)। সুতরাং তাঁদের মতানুযায়ী যা কিছু চেতনার বহির্ভুক্ত তা মনের বহির্ভুক্ত নয়। তাই কোন বস্তু বা অভিজ্ঞতা চেতনা থেকে অপসারিত হ'লে, মন থেকে চলে যায় না; অবচেতন স্তরে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। এই অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে প্রবণতার আকারে রক্ষিত থাকে; আবার, সুযোগ পেলেই চেতন স্তরে ফিরে আসে। বা, অনেক সময় প্রয়োজন বোধে আমরা তাদের চেতন স্তরে আনি। সুতরাং, ধারণক্রিয়ার একমাত্র উৎস হ'ল ঐ অবচেতন মন। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ অবচেতন মনের এই ক্রিয়া যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ নির্ভর তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

স্মৃতির শ্রেণী বিভাগ
[Classification of Memory]

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, প্রাচীন পন্থীরা স্মৃতিকে বিশেষ এক রকমের মানসিক শক্তি (Faculty) হিসেবে ভাবতেন। তখন মনে করা হ'ত স্মরণ করার ক্ষমতা একক, তার শ্রেণী বিভাগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু, আধুনিক মনোবিদ্‌গণ স্মৃতিকে এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁরাও এই প্রক্রিয়াকে অবিভাজ্য মনে করেন। তবে তাঁরা মনে করেন বিভিন্ন বস্তু, প্রতিক্রিয়া বা ধারণাকে কেন্দ্র করে এই প্রক্রিয়া কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তাই স্মৃতিকে শ্রেণীবিভাগ করার রীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্নভাবে স্মৃতির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই সব শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করব।

মনোবিদ বার্গসঁ (Bargson) স্মৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—**অভ্যাসগত স্মৃতি** (Habit memory), **প্রকৃত স্মৃতি** (True memory)। যখন

অভ্যাস বশতঃ আমরা কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা ঘটনাকে স্মরণ করি, তখন তাকে বলা হয় অভ্যাসগত স্মৃতি। অর্থাৎ, না বুঝে বার বার পুনরাবৃত্তি করে যখন আমাদের শিখন হয়, এবং সেই শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা যখন, আমরা পরবর্তীকালে স্মরণ করি, তাকে বলা হয় অভ্যাসগত স্মৃতি। একে অনেকে যান্ত্রিক স্মৃতিও (Rote memory) বলে থাকেন। এই ধরনের স্মৃতি বিশেষভাবে সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়ার (Motor mechanism) পুনঃপুনঃ চর্চার ফলে অভ্যাস গঠনের দরুন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে বিষয়বস্তুর হৃদয়ঙ্গমের ফলে, আমরা যখন মানসিক কল্পের (Mental image) সাহায্যে বস্তুকে স্মরণ করি, তখন তাকে বলা হয় প্রকৃত স্মৃতি (True memory)। বিষয়বস্তুর উপলব্ধির জন্য যুক্তি শক্তির প্রয়োজন হয় বলে অনেকে একে তার্কিক স্মৃতি বা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি (Logical memory) আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, এই ধরনের স্মরণে মানসিক কল্পের প্রয়োজন হয়, দেহ সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে না। অনেকে পাঠ্যবস্তুর কোন কিছু তাৎপর্য না বুঝেই মুখস্থ করে যেতে পারে। এটা সম্ভব হয় ভাষাগত অভ্যাস গঠনের জন্য। অর্থাৎ, জিহ্বা, স্বতঃশ্চলভাবে নড়ে যায় অভ্যাসের জন্য। আবার অনেকে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে তবেই মুখস্থ করতে পারে। এবং তাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় মানসিক সংযোগের জন্য পুনরুদ্রেক হয়ে থাকে। শিক্ষাবিদ নান্ (Nunn), অভ্যাসগত স্মৃতি ও প্রকৃত স্মৃতির পার্থক্যকে ঠিক এভাবে বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন, মানসিক কল্প (image) ছাড়া পুনরুদ্রেক হতে পারে না। তবে অভ্যাসগত স্মৃতির ক্ষেত্রে এটা মুখ্য নয়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় এই ধরনের যান্ত্রিক স্মৃতির (Rote memory) প্রয়োজন হয়। যেমন নামতা শিখা, বানান শিখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। যে কোন ধরনের অভিজ্ঞতা যার স্বতঃশ্চল প্রয়োগ প্রয়োজন, তার স্মৃতিও স্বতঃস্ফূর্ত না হ'লে আমাদের কাজের অসুবিধা হবে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যাতে এই ধরনের স্মৃতি ক্রিয়াশীল হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখার দরকার। তবে সব সময় মনে রাখার দরকার এই ধরনের যান্ত্রিক অভ্যাস গঠনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বোধগম্য হওয়ার দরকার। তাই বিষয়বস্তুর তাৎপর্য আগে বুঝে তার পর মুখস্থ করায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে।

অভ্যাসগত স্মৃতি ও প্রকৃত স্মৃতি

দেখা গেছে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগে খুব বেশী করে পড়শুনা করে। এবং পড়ার কিছুক্ষণ পর তারা পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন থাকে তা সঠিকভাবে উত্তর করতে পারে। এইভাবে শিখনের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্মরণ করাকে বলা হয় **তাৎক্ষণিক স্মৃতি** (Immediate memory)। আবার কোন কিছু অভিজ্ঞতা গ্রহণ করার পর অনেক সময় পরে,

তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী স্মৃতি

স্মরণ করাকে বলা হয় **স্থায়ী স্মৃতি** (Permanent memory)। উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, বলতে হয়, স্থায়ী স্মৃতিই ভাল। কারণ, স্থায়ী স্মৃতি, শিক্ষার্থীদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। যদিও আপতঃভাবে শিখনের পর যত সময় যেতে থাকে, ততই আমরা ভুলে যাই, তা'হলেও আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, সময়ের ব্যবধানে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হয় এবং কোন বিশেষ বস্তু সম্পর্কে ধারণ অনেক বেশী সুদৃঢ় হয়, এবং তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বাড়ে। এই ধরনের স্থায়ী স্মৃতি গঠনে বিদ্যালয়ের সচেষ্ট হওয়ার দরকার। আমরা অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অভিজ্ঞতাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করতে পারি, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন (Reorganisation) করতে সুবিধা হয়, এবং স্থায়ী স্মৃতির বিকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক স্মৃতিকে কার্যকরী করার জন্য যে প্রবণতা, তা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দূর করায় সব সময় সচেষ্ট হবেন।

অনেকে আবার স্মৃতি মাধ্যমের দিক থেকে তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। **ব্যক্তিগত স্মৃতি** (Personal memory), এবং **নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি** (Impersonal memory)। আমরা প্রত্যক্ষভাবে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং স্মরণ করি, তাকে বলা হয় ব্যক্তিগত স্মৃতি (Personal memory)। তবে আমাদের বেশীরভাগ অভিজ্ঞতা আসে অন্যের কাছ থেকে, বা বই পড়ে। এই সব অভিজ্ঞতার স্মরণকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি (impersonal memory)। যদিও নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতির চেয়ে আমাদের ব্যক্তিগত স্মৃতির পরিমাণ অনেক কম, তবুও ব্যক্তিগত স্মৃতিই অনেক বেশী জীবনে কার্যকরী।

ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি

কোন কোন মনোবিদ স্মৃতিকে সংবেদনগত দিক থেকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। স্মৃতি বা পুনরুদ্রেক কল্পের (image) মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই সব মানসিক কল্প, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণ বা কল্পের বিভিন্নতা অনুযায়ী স্মৃতিও পাঁচ রকম—দর্শনগত স্মৃতি (Visual memory), শ্রবণগত স্মৃতি (Auditory memory), স্পর্শগত স্মৃতি (Tactual memory), ঘ্রাণজাত স্মৃতি (Olfactory memory), স্বাদমূলক স্মৃতি (Gustatory memory)। এই সব স্মৃতির মধ্যে আমাদের জীবনে, দর্শনগত ও শ্রবণগত স্মৃতিই প্রধান। তবে অনেকে আছে, যাদের দর্শনগত স্মৃতি বেশী, আবার কেউ আছে, যার শ্রবণগত স্মৃতি বেশী। অর্থাৎ, যারা দর্শনধর্মী (Visual type), তারা দর্শনমূলক অভিজ্ঞতা অনেক দিন ধারণ করে রাখতে পারে। আবার যারা শ্রবণধর্মী তারা শ্রবণমূলক অভিজ্ঞতা বহুদিন মনে রাখতে পারে। বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে আমাদের এই দু'ধরনের স্মৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়।

দর্শন ও শ্রবণগত স্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতি

সুতরাং, শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী, শিক্ষণমূলক অভিজ্ঞতাও তাদের কাছে অনুরূপভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাদের দর্শনগত স্মৃতি প্রখর, তারা যাতে দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, তার সুযোগ করে দিতে হবে। যাদের শ্রবণগত স্মৃতি প্রখর, তারা যাতে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্মৃতি

স্মৃতিকে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় (Active and Passive memory) এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করারও রীতি প্রচলিত আছে। যখন শিক্ষার্থীরা মনে রাখার জন্য নিজেদের মানসিক ইচ্ছা বিশেষভাবে প্রয়োগ করে, তখন তাকে বলা হয় সক্রিয় স্মৃতি (Active memory), আবার কোন অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্রেক করার জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয় মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তখন তাকে বলে নিষ্ক্রিয় স্মৃতি (Passive memory) শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় স্মৃতিই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় মানসিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে, এই সক্রিয়তা যাতে শিক্ষার্থীদের স্মরণ ক্রিয়ার সব পর্যায়ে বর্তমান থাকে সে দিকে নজর দেওয়া।

এছাড়াও মনোবিদ্‌গণ বিভিন্নভাবে স্মৃতির শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তাদের সবগুলোর উল্লেখ করে, আর এই আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। স্মৃতি যে রকম ধরনের হউক না কেন, শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। আদর্শগত দিক থেকে তার্কিক স্মৃতি (Logical memory), স্থায়ী স্মৃতি, ব্যক্তিগত স্মৃতি ও সক্রিয় স্মৃতি বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন। এবং শিক্ষক এই ধরনের স্মৃতি বিকাশে সহায়তা করবেন।

স্মরণ রাখার সবচেয়ে সহজ উপায়
[Economic Method of Memorization]

Memory training

স্মৃতিশক্তি বাড়ানো সম্ভব কি না অনেকে জিজ্ঞেস করেন। অনেক সাধারণ লোকের ধারণা আছে স্মরণশক্তি বাড়ানো যায়। কিন্তু মনোবিদ্‌গণ এই ধারণায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে স্মরণক্রিয়া মানুষের একটা সহজাত গুণ, এটাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। তবে যাতে স্মরণক্রিয়া ভালভাবে কাজ করে তার জন্য কতকগুলো উপায় মনোবিদ্‌গণ বলেছেন। এগুলোকে স্মৃতিশক্তি ঠিকভাবে কাজে লাগানোর উপায় (Memory training) বলতে পারি। এদের স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায় বললে ভুল হবে। আসলে এর দ্বারা শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যে ভুল থাকে তা শোধরানো

যায়। তাই অনেক সময় এদের শিখনের সহজ উপায়ও (Condition of economic learning) বলা হয়। এইগুলো হ'ল :—

॥ এক ॥ আমরা যদি কোন জিনিস মুখস্থ করতে চাই তার উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং সব সময়ে একটা বিশেষ মানসিক ইচ্ছা রাখতে হবে যে আমাদের মুখস্থ করতে হবে।

॥ **দুই** ॥ এখন যে জিনিস শিখতে চাইছি তার সঙ্গে পূর্বের শিখা কোন জিনিসের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এতে তাড়াতাড়ি শিখা যায়।

॥ **তিন** ॥ কোন কিছু মনে রাখতে হ'লে তার ছন্দ ঠিক রেখে পড়তে হবে, এবং বার বার আবৃত্তি করতে হবে। এই ছন্দ আর আবৃত্তি আমাদের তাড়াতাড়ি মুখস্থ করায় সাহায্য করে।

॥ **চার** ॥ কোন জিনিস এক সঙ্গে অনেকবার পড়লে আমাদের বিরক্ত লাগে। এতে মুখস্থ করার ব্যাঘাত ঘটে। সেইজন্য কিছু সময়ের তফাতে তফাতে পড়া ভাল (সবিরাম শিখন)।

॥ **পাঁচ** ॥ প্রথমে সমস্তটা মনে রাখার চেষ্টা না করে একটা সারাংশ মনে রেখে, তারপর সমস্তটা মুখস্থ করা উচিত। অর্থাৎ বুঝে মুখস্থ করলে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়।

॥ **ছয়** ॥ শিখার পর সারাংশটা লিখে ফেলা উচিত।

॥ **সাত** ॥ শিখার পর বিভিন্ন বন্ধুর সঙ্গে ঐ বিষয় আলোচনা করলে ভাল মনে থাকে।

॥ **আট** ॥ একটা কিছু শিখার পর কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার দরকার। ঘুমোতে পারলে আরও ভালো হয়। তা না'হলে একটা জিনিস শিখার পর একই ধরনের আর একটা জিনিস শিখলে দু'টোই আমরা গুলিয়ে ফেলি। যদি বিশ্রাম সম্ভব না হয় তা'হলে ভিন্ন ধরনের বিষয় পড়া উচিত।

বিস্মৃতি
[Forgetting]

আগেই বলেছি সারাজীবন ধরে যা শিখি তার সবকিছু আমাদের মনে থাকে না। কিছু শিখার পর যত সময় যেতে থাকে বা আমরা যত নতুন জিনিস শিখতে থাকি তখন আগের শিখা জিনিসগুলোর আর সব কিছু মনে থাকে না। একে আমরা বলি ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতি (Forgetting)। এবিংহস্ প্রথম এই ভুলে যাওয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কতটা আমরা ভুলি, কি পরিমাণে ভুলি, কতটাই বা আমাদের মনে থাকে, এই সব আবিষ্কার করা। তাঁর পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ :—

বিস্মৃতি কি ?

তিনি প্রথমে কতকগুলো অর্থবিহীন বর্ণসমষ্টি (Nonsense syllable) তৈরী করেন। তারপর সেগুলোকে ১৩টা-১৩টা করে কয়েকটা তালিকা (List) করেন। এই রকম আটটা তালিকা তিনি মুখস্থ করেন। এতে প্রত্যেকটার জন্য তাঁর সময় লাগে ১৮ থেকে ২০ মিনিট। তারপর কিছুক্ষণ সময় পরে আবার তিনি সেটা মুখস্থ করেন। এবার কিছুটা সময় কম প্রয়োজন হয়, তার কারণ আগের শিক্ষার জন্য কিছুটা মনে ছিল। এরকম বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন প্রত্যেকবার পুনঃশিক্ষার সময়, কিছুটা বেশী অংশ মনে থাকে। যে তালিকা তাঁর প্রথম দিন শিখতে লেগেছিল ১০১০ সেকেণ্ড, একমাস পরে তাই মুখস্থ করতে লাগে ৮০৩ সেকেণ্ড। অর্থাৎ ২০৭ সেকেণ্ড সময় কম লাগছে। বা, আগে যা সময় লেগেছিল তার শতকরা ২০'৫ ভাগ বেঁচেছে এক মাস পরে। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল পরের পৃষ্ঠার ছকে দেওয়া হ'ল।

বিস্মৃতির স্বরূপ

এবিংহস্ লেখচিত্রের সাহায্যে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল দেখান। x অক্ষে সময়ের পার্থক্য y অক্ষে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল তা ধরে তিনি লেখ-চিত্র আঁকেন। এই লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে প্রথমে, অর্থাৎ শিখার সঙ্গে সঙ্গে এই রেখা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে। পরে সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে এই বাঁক কমতে কমতে ঐ রেখা প্রায় x অক্ষের সমান্তরাল হয়। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় আমরা যখন কোন

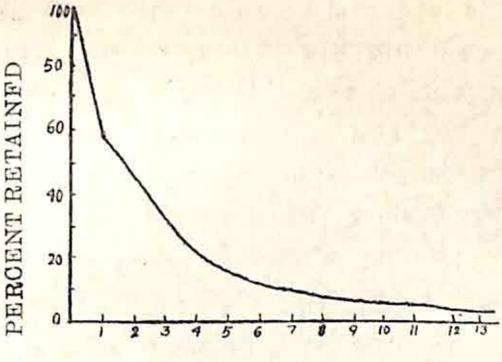
বিস্মৃতির লেখচিত্র

শিখার যত সময় পরে আবার শিখেছিলেন	শতকরা যত সময় বেঁচেছিল
$\frac{১}{৩}$ ঘণ্টা	৫৮'২%
১ ,,	৪৪'২%
৮'৯ ,,	৩৫'৮%
২৪ ,,	৩৩'৭%
২ দিন	২৭'৮%
৬ ,,	২৫'৫%
১ মাস	২১'১%

এবিংহস-এর পরীক্ষার ফল

অধীত বস্তুকে ভুলে যাই তার বেশীর ভাগটাই ভুলি শিখার সঙ্গে সঙ্গেই, তারপর ভুলে যাওয়ার হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এবিংহস্-এর পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রং (Strong), ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বোরাস্ (Boras) প্রভৃতি মনোবিদগণ এই ভুলের হারের উপর পরীক্ষা করে একই রকম ফল পান। তাঁদের

প্রত্যেকের লেখই এইরূপ হয়। একে বলা হয় বিস্মৃতির লেখ (Curve of forgetting)।



বিস্মৃতির লেখ (Curve of forgetting)

অনেক মনোবিজ্ঞানী ঐ বিস্মৃতির লেখ আঁকবার সময় x অক্ষ শুধু সময় না ধরে সময়ের লগারিদম ধরেন। তাতে দেখা যায় যে লেখটি একটি অবনত সরল রেখা (Inclined straight line) হয়। এর থেকে তাঁরা বিস্মৃতির লগারিদম সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্র হ'ল—কোন বিশেষ সময় (t) মিনিট/ঘণ্টা পরে আমাদের কতটা মনে থাকবে তার পরিমাণ হবে এক মিনিট/ঘণ্টা পরে যা মনে থাকে তার থেকে ১০ মিনিট/ঘণ্টায় যা মনে থাকে তার সঙ্গে সময়ের (t) লগারিদমের গুণফলের বিয়োগ করলে যা হয়। অর্থাৎ কোন সময়, (t) পরে মনে ধারণের পরিমাণ, R=এক মিনিট পরে যা মনে আছে (A)—১০ মিনিট পরে যা মনে থাকে (B)×log t বা, $R=A-B \log t$। অনেক সময় পরীক্ষায় ভুল থাকার জন্য লগারিদম সূত্র অনুসারে ফল পাওয়া যায় না।

বিস্মৃতির লগারিদম্ সূত্র

বিস্মৃতির কারণ
[Causes of Forgetting]

আমরা কেন ভুলি—এ একটা বিশেষ সমস্যা। অবশ্য ভুলে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। তা না হ'লে ছোটবেলা থেকে যে সব অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তা যদি সব মনে থাকে আমাদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে। আর তাই যদি হ'ত তা'হলে নতুন জিনিস আমরা শিখতে পারতাম না। তাই আমরা শিখিও যত, ভুলিও তত। তাই এই বিস্মৃতিকে স্মরণক্রিয়ার একটা অঙ্গ হিসেবে ধরা যায়। মনোবিজ্ঞানী রিবো (Ribot) বলেছেন Forgetting is an essential

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

condition of memory। তবে তার মানে এই নয় যে আমরা যা কিছু শিখি সবই ভুলে যাই আর তাই উচিত। সমস্ত কিছুকে ভুলে যাওয়াও যেমনি বিপদজনক আবার মনে রাখাও তেমনি বিপদ। তাই এই দু'টো প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে একটা মাঝামাঝি অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত। আর প্রত্যেক মানুষের বেলায় তা হয়ও। কি হারে আমরা ভুলি সে কথা আগেই বলেছি। এখন বলব কেন ভুলি। ভালভাবে ধারণ করবার জন্য যে যে জিনিসগুলো মেনে চলতে হয় তা না করলে ভুলের হার বাড়ে। অর্থাৎ ধারণকে যেগুলো ব্যহত করে বিস্মৃতিকে সেগুলো সহায়তা করে। তাছাড়া কতকগুলো জিনিস আছে যেগুলো আমাদের বিস্মিতিতে সাহায্য করে, সেগুলো হ'ল :—

বস্তুগতকারণ

॥ এক ॥ **অধীত বস্তুর গুণ ঃ** যে সব জিনিস শিখতে দেরী হয় তাদের ভুলিও সহজে। গদ্য আমরা কবিতার চেয়ে বেশী হারে ভুলি। এটা অবশ্য কিছুক্ষণ পরিমাণের জন্য হয়, যে জিনিস শিখতে দেরী হয়, তার জন্য পুনরাবৃত্তির বেশী প্রয়োজন হয়, তাই ভুলি দেরীতে।

শিখন সংক্রান্ত কারণ

॥ **দুই** ॥ **ঠিকমত না শিখা ঃ** যে সব জিনিস আমরা কমাবার অভ্যাস করি (under-learning) সেগুলো তাড়াতাড়ি ভুলি। যেমন আমরা আমাদের নাম কোন সময় ভুলি না, তার কারণ হ'ল বার বার ব্যবহারের ফলে ওটা আমাদের বেশী শিক্ষা হয়, কিন্তু অন্য একজনের নাম আমরা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। আবার যে বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন থাকি তার নামটা সহজে ভুলি না। কিন্তু কয়েকদিনের আলাপে যার নাম জানি তাকে ভুলে যাই।

দৈহিক কারণ—মস্তিষ্কে আঘাত

॥ তিন ॥ **মস্তিষ্কে আঘাতের দরুন অচৈতন্য হওয়া** (Shock Amnesia) আমাদের স্মরণক্রিয়া নির্ভর করে আমাদের মস্তিষ্কের কাজের উপর। তাই মস্তিষ্কে যদি কোন গণ্ডগোল হয় আমাদের ধারণ-ক্ষমতা লোপ পায়, ফলে আমরা ভুলে যাই। ধরা যাক কোন ছেলে ফুটবল খেলতে খেলতে মাথায় খুব আঘাতের ফলে অচৈতন্য হ'য়ে গেল। তারপর শুশ্রূষা করার পর তার চেতনা ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞসা করা যায় সে খেলার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। এতে অবশ্য খুব বেশী আগের ঘটনাকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। এরকম দুর্ঘটনা থেকে মাঝে মাঝে স্মৃতি একেবারে লোপ পায়।

দৈহিক কারণ—ঔষধের প্রভাব

॥ **চার** ॥ **ওষুধের ক্রিয়া ঃ** অনেক সময় খুব বেশী ওষুধ খেলে, মদ খেলে স্মৃতি লোপ পায়, মানুষ অনেক জিনিস তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। যে সব ওষুধ মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোকে খারাপ করে দেয় সেগুলো আমাদের ভোলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

॥ পাঁচ ॥ **রেট্রো-অ্যাকটিভ ইনহিবিসান** (Retro-active Inhibition)ঃ কোন কিছু জিনিস শিখার পর আবার কোন নতুন জিনিস শিখলে দেখা যায় যে শেষটা কিছুটা প্রথমটাকে ভুলিয়ে দেয়। পর পর দু'টো কবিতা মুখস্থ করলে দেখা যাবে যে যখন প্রথম কবিতাটা আবৃত্তি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন তার ভিতর দ্বিতীয়টার কোন কোন কথা চলে আসছে। একে মনোবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন Retro active inhibition। এর ফলে দেখা গেছে আগের কবিতাটা বেশী ভুলি।

ইনহিবিসান

॥ ছয় ॥ **দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজের প্রভাব** (ঘুমের উপকারিতা)ঃ এবিংহস্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তিনি এমনি যা ভোলেন কোন কিছু শিখার পর ঘুমালে তার চেয়ে কম ভোলেন। ডেলেনবাক্ (Dallenbach) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেন যে কোন কিছু শিখার পর আমরা যত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারি তত বেশী মনে থাকে। তিনি দু'জন পরীক্ষার্থীকে অর্থহীন বর্ণসমষ্টি তালিকা মুখস্থ করিয়ে কতবার তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পাড়িয়ে তারপর কতটা মনে আছে দেখেন। আর কতবার তাদের সাধারণভাবে অন্য কাজ করতে দিয়ে তারপর কতটা মনে আছে দেখেন। এতে দেখা যায় একই সময়ের ব্যবধানে ঘুমের পর তাদের বেশী মনে থাকে। নীচে তাদের পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হ'ল ঃ

বিশ্রামের অভাব

	এক ঘণ্টা পর	দুই ঘণ্টা পর	চার ঘণ্টা পর	আট ঘণ্টা পর
অন্য কাজ করার পর শতকরা যত ভাগ মনে ছিল	৪৬%	৩১%	২২%	৯%
ঘুমানোর পর শতকরা যত ভাগ মনে ছিল	৭০%	৫১%	৫৫%	৫৬%

তাঁর এই পরীক্ষা থেকে ডেলনবাক্ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রথম আমরা যে শতকরা বেশী পরিমাণ ভুলি তার কারণ হ'ল ঘুমাতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত Retro-active inhibition-এর কথাই জোর করে বলে। দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজ অন্য কাজের মনে রাখায় ব্যাঘাত ঘটায়।

॥ সাত ॥ **অবসাদ** (Fatigue)ঃ খুব বেশী সময় ধরে কাজ করলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ঠিক এমনি খুব বেশীক্ষণ মানসিক কাজ করলে আমাদের মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ আসে। ফলে এই অবস্থায় আমরা যা শিখি তা তাড়াতাড়ি আমরা ভুলে যাই। এই

অবসাদ

শিক্ষার পেছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে না। আসলে অবসাদ নয়, সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে না বলে আমরা ভুলে যাই।

॥ আট ॥ **অবচেতন মনে অবদমন** (Unconscious repression): ফ্রয়েদ এবং তার মতবাদে বিশ্বাসী অনেক মনোবিদ মনে করেন যে ভোলাটা আমাদের ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ আমরা ভুলতে চাই বলে ভুলি। তাঁদের মত হ'ল আমরা জীবনের সমস্ত অপ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলোকে ভুলতে চাই। তবে এই সব ভুলে যাওয়াকে আমরা ধারণ-ক্রিয়ার অভাব হিসেবে ধরতে পারি না। এই সব ঘটনার অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের অবচেতন মনে অবদমিত থাকে এবং ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে আনা যায়। তাই এর আলোচনা এখানে না করাই ভাল।

অবদমন

ভাল স্মৃতি শক্তির লক্ষণ
[Marks of Good Memory]

ভাল স্মৃতিশক্তির কয়েকটা গুণ কাছে। স্মরণক্রিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যথাযথ কাজ করার সামগ্রিক ফল স্মরণক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ ভাল স্মরণক্রিয়ার লক্ষণ এদের উপরই নির্ভরশীল। যেমন, ভাল স্মরণ-ক্রিয়ার লক্ষণ হ'ল—

॥ এক ॥ তাড়াতাড়ি শিক্ষা করা। অর্থাৎ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যার যত দ্রুত, তার স্মৃতিশক্তিও তত ভাল। যদি কোন ছাত্র খুব তাড়াতাড়ি কোন জিনিস শিখতে পারে তাকে খুব বেশী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বলে আখ্যা দিই।

॥ **দুই** ॥ আবার শুধুমাত্র তাড়াতাড়ি শিক্ষা করাকে ভাল স্মৃতির লক্ষণ বলতে পারি না। কারণ যে তাড়াতাড়ি শিখে এবং তাড়াতাড়ি ভোলে তাকে আমরা ভাল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বলি না অর্থাৎ ভাল স্মৃতির একটা গুণ যেমন তাড়াতাড়ি শিখা, তেমনি তার আনুষংগিক গুণ হ'ল অনেক সময় মনে রাখা বা ধারণ করা।

॥ **তিন** ॥ শুধু শিখে মনে রাখলেই চলবে না, তাকে আবার যথাসময়ে পুনরুদ্রেক করারও দরকার। অনেকে আছে যারা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। মনেও রাখতে পারে, কিন্তু যথাসময়ে পুনরুদ্রেক করতে পারে না। এরকম অভিজ্ঞতা পরীক্ষার সময় অনেকেরই হয়। সুতরাং যথাসময়ে পুনরুদ্রেক করতে পারার ক্ষমতা ভাল স্মৃতির লক্ষণ।

॥ চার ॥ সবশেষে, অধীত সমস্ত বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিচার করার ক্ষমতাও থাকা চাই ভাল স্মৃতির জন্য। সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান না করলে ঐ সব অভিজ্ঞতাগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে না। সুতরাং অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধান—ভাল স্মৃতির লক্ষণ।

প্রশ্নাবলী

1. How is memory distinguished from imagination ? What are the process involved in memorization ? Is there memory or memories ?
[পৃঃ ১৪৫-১৪৬ ; ১১৭-১১৮ ; ১৩৩-১৩৬] [C.U.B.T. '69, N.B.U.B.T. '66]
2. Analyse the processes involved in remembering. How would you plan your lessons so that the pupils may not easily forget what they learn ?
[পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৭-১৪২] [C.U.B.T.'61, K.U.B.T. '65]
3. Analyse memory. Can memory be improved ? [C.U.B.T. '67]
[পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৬-১৩৭]
4. Analyse memory. Indicate how it is related to learning. Can memory be improved ? Discuss. [পৃঃ ১১৭-১২০ ; ১৩৬-১৩৭] [C.U.B.T. '70]
5. Describe the stage involved in the process of memorization. (Part)...
[পৃঃ ১১৭-১১৮ পৃঃ] [C.U.B.A. '64]
6. What do you understand by economical methods of memorising ? Show your acquaintance with some of them. [C.U.B.A. '66]
[পৃঃ ১৩৬-১৩৭]
7. Analyse memory. Bring out the factors which influence forgetting
[পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৯-১৪২] [C.U.B.A. '68]
8. Why do we forget ? what are the different causes of forgetting.
[পৃঃ ১৩৭-১৪২] [C.U.B.A. '70]
9. Analyse 'memory'. How can your pupil make the utmost use of his/her memory ? [পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৬-১৩৭] [N.B.U.B.T. '69]
10. Write notes on the following :
   (a) Direct and Indirect recall. [পৃ: ১২২-১২৩]
   (b) Whole and part learning. [পৃঃ ১২৯-১৩০]
   (c Condition of readiness [পৃঃ ১২৩-১২৪]
   (d) Forgetting. [পৃঃ ১৩৭-১৪২]
   (e) Memory training. [পৃঃ ১৩৬-১৩৭]

পঞ্চম অধ্যায়

কল্পন

[IMAGINATION]

বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় সংবেদনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ উদ্দীপকের বর্তমানে, আমাদের সংবেদন হয় এবং তাকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই প্রত্যক্ষণ (Perception), আমাদের মনে একটা চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনে। আমরা একটা ছবি প্রত্যক্ষ করলাম। সেই ছবিকে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে, তার সম্পর্কে মনে একটা বিশেষ ধারণা জন্মে। এই বাস্তবধর্মী ধারণা একে বারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। পরে হয়তো, কোনদিন নির্জনে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ছবিটার কথা মনে পড়ে। তখন আমাদের চোখের সামনে সেই ছবির প্রতিরূপ একটা ভেসে ওঠে। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু আছে। হয়তো, একদিন রাস্তায় কোন লোককে গাড়িচাপা পড়তে দেখেছিলাম, পরে কোনদিন, সেই কথা মনে পড়লে, চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। এই ধরনের প্রতিচ্ছবি শুধুমাত্র চোখ বা দর্শনেন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে হয় তাই নয়; অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করেও হয়ে থাকে। তবে সে গুলোর সংখ্যা খুবই কম। বা সচরাচর দেখা যায় না। এই ধরনের প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় **ভাবমূর্তি বা কল্প** (Image)। অর্থাৎ, **অতীত কোন ঘটনার বা অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি যখন কোন বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ফলে, আমাদের মনে ভেসে ওঠে, তখন আমরা তাকে বলি ভাবমূর্তি বা কল্প** (Image)। ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার জন্য বস্তুগত উদ্দীপক (Objective stimulus) প্রয়োজন হয় না। মনোবিদ থর্ণডাইক (Thorndike) বলেছেন— প্রকৃত অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় মন যদি সেই সব প্রক্রিয়া নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারে তাহলেই ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়।

সূচনা—ভাবমূর্তি

এখন এই ভাবমূর্তি যে কেবলমাত্র অতীত প্রকৃত অভিজ্ঞতার হয় তা নয়। অনেক সময় আমাদের মনে এমন সব বস্তু বা ধারণার ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় যার সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। রামায়ণে রাবণের বর্ণনা পড়ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে একটা মানুষের ছবি ভেসে উঠছে। তার দশটা মুখ, কুড়িটা চোখ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, আমরা দেখছি (আপতঃভাবে) একটা দেহ কাণ্ডের সঙ্গে দশটা মাথা

কল্পন কি?

লাগানো। এই যে অতীত অভিজ্ঞতা বিবর্জিত বস্তুর ভাবমূর্তি আমাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে, একে বলা হয় **কল্পনাগতভাব মূর্তি** (Image of Imagination)। এই কল্পনাগত ভাবমূর্তি সৃষ্টির মূলে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, তাকে বলা হয় কল্পন (Imagination)। রাবণকে আমরা কোনদিন দেখি নি। কিন্তু তার বিবরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অতীত অভিজ্ঞতার কতকগুলো অংশকে একত্রিত করে তার কল্পনা আমরা করে নিই। মনের বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করতে পারি। একে বলা হয় ধারণক্রিয়া। অপর এক প্রক্রিয়ায় আমরা এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরুত্থাপন করতে পারি। একে বলা হয় পুনরুদ্রেক (Recall)। কল্পন হ'ল শেষোক্ত প্রক্রিয়ার বিকৃত রূপ। বিকৃত বলার কারণ, কল্পনের সাহায্যে আমরা যে বস্তুর ভাবমূর্তি সৃষ্টি করি, বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। বা বাস্তব জগতে তার সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকৃত অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই তার সৃষ্টি হয়। নরসিংহের কল্পনাগত ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে গিয়ে, আমরা মানুষের ধড়ের উপর সিংহের মাথা বসিয়ে দিই। আমরা মানুষ দেখেছি, সিংহও দেখেছি। কিন্তু সিংহ মানব কোনদিন দেখি নি। তাই নরসিংহের দেহের বর্ণনা যখন পড়ি, তখন মানুষ এবং সিংহ সম্পর্কে অতীত ধারণা থেকে একটা বিশেষ ভাবমূর্তির সৃষ্টি করি। এই অর্থেই আমরা এই ভাবমূর্তিকে বিকৃত বলছি। তা'হলে, কল্পন হ'ল **সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও ধারণা যথেচ্ছ সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা বা ধারণার ভাবমূর্তি সৃষ্টি করি।** কল্পনা বলতে সাধারণ অর্থে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করাকে বুঝাই। কিন্তু মনোবিদ্যায় একে আমরা বিশেষ ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করি। তাই একে বলা হয়েছে **কল্পন** (Imagination) বা **কল্পনার প্রক্রিয়া** (Process of imagination)।

স্মৃতি ও কল্পন এর মধ্যে সম্পর্ক

[Relation between Memory and Imagination]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মৃতি আর কল্পনকে বিশেষভাবে আলাদা করার প্রয়োজন। তাই তাদের সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব। স্মৃতি আর কল্পন এই দু'রকম মানসিক প্রক্রিয়াতেই আমাদের ভাবমূর্তির সাহায্য নিতে হয়। দু'টোই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে টেনে আনে। অবশ্য খুব সাধারণভাবে এ কথাও বলতে পারি স্মৃতি আমাদের কল্পন এর বস্তুর যোগান

কল্পন ও স্মৃতির সাদৃশ্য

দেয়। যেমন—কোন লোককে স্মরণ করার মানে তাকে আমি আগে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, সেই ধারণাকে মনে আনা। আবার যখন মৎস্যকন্যার কথা কল্পনা করছি তখন মানুষ আর মাছ এই দুই সম্বন্ধে অতীত ধারণাকে কাজে লাগাচ্ছি। শুধু মাছের মাথাটার সঙ্গে মানুষের মাথাটা বদলে নিচ্ছি মনে মনে।

আবার সাধারণ প্রত্যক্ষণে আমাদের চিন্তাধারায় যেমন সময় (Time), স্থান (Space), কারণ ও ফলাফল সব কিছু কাজ করে তেমনি স্মৃতি আর কল্পনার এই দু'টো প্রক্রিয়ায়ও এই সব গুণগুলো থাকে।

সুতরাং এই দু'টো দিক থেকে স্মৃতি আর কল্পন-এর মধ্যে বেশ মিল আছে। কিন্তু পার্থক্যও তাদের মধ্যে আছে। যেমন—

স্মৃতিতে আমাদের অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। ঘটনার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমনটি আগে শিখেছিলাম বা দেখেছিলাম তাই মনে পড়ে।

কল্পন ও স্মৃতির পার্থক্য

কিন্তু কল্পনায় ঘটনা বিকৃত হয়। আগে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, একটা মানুষকে আমরা ঠিক যে ভাবে দেখেছিলাম সেই ভাবেই মনে করতে পারি। কিন্তু যখন মৎস্যকন্যার কথা কল্পনা করি তখন বিভিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে মিশিয়ে একটা অবাস্তব জিনিস তৈরী করি।

আবার স্মৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ হ'ল প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা (Recognition)। কিন্তু কল্পনাতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ যা আমি কোনদিন দেখি নি, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তাকে চেনার কোন কথা ওঠে না।

যতই বৈসাদৃশ্য তাদের মধ্যে থাকুক না কেন, এবং স্মৃতি আর কল্পন দু'টো পৃথক প্রক্রিয়া ঠিকই তবে তারা প্রায় সব সময়েই মিশে থাকে। কোন আত্মীয়ের মৃত্যুর দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে কিছু না কিছু কল্পনা জড়িয়ে থাকবেই। আবার যে কোন কল্পনার মধ্যে স্মৃতি থাকবেই। এই কারণে এদের আলাদা করে বেছে আলোচনা করা খুবই কঠিন।

কল্পন ও চিন্তন-এর মধ্যে সম্পর্ক

[Relation between Imagination & Thinking]

কল্পন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার পূর্বে আর একটা মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য করার দরকার। সেটা হ'ল চিন্তনক্রিয়া (Thinking)। সাধারণতঃ আমরা চিন্তা, স্মৃতি আর কল্পনাকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। তাই প্রথমে এদের সম্বন্ধে আলাদা ধারণা প্রয়োজন। এখানে আমরা খুবই সংক্ষেপে কল্পন আর চিন্তনের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কল্পনা আমরা করি ভাবমূর্তির মাধ্যমে। অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার ভাবমূর্তি হ'ল আমাদের কল্পনার উপাদান। কিন্তু চিন্তনের উপাদান হ'ল প্রত্যক্ষ ধারণা (Percept)। অর্থাৎ চিন্তনক্রিয়ায় আমরা অতীত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করি। সুতরাং, চিন্তন হ'ল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আর কল্পন হ'ল যুক্তি বিহীন মানসিক প্রক্রিয়া। আবার আমাদের চিন্তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য (Goal) থাকে আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা একটা বিশেষ পথে অগ্রসর হই। কিন্তু কল্পনার কোন বাঁধাধরা পথ বা উদ্দেশ্য নেই। চিন্তার একটা ফলাফল আছে। অর্থাৎ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করে আমরা সমাধান খুঁজে পেতেও পারি বা, নাও পেতে পারি। কিন্তু কল্পনার কোন ফলাফল থাকে না। কারণ কল্পনা হ'ল উদ্দেশ্যহীন। চিন্তার জন্য গভীর ইচ্ছাকৃত মনোযোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কল্পনা হয় আমাদের মনের খুব দুর্বল অবস্থায়। চিন্তন হ'ল বিমূর্ত (Abstract)। কিন্তু কল্পনা হ'ল দেহধারী (Concrete)। আবার চিন্তনের একটা বিশেষ গুণ হ'ল যে এটা সংঘবদ্ধ (Systematised), কিন্তু কল্পন একেবারে বিচ্ছিন্ন (Isolated)।

কল্পন ও চিন্তনের পার্থক্য

উপরের ঐ আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি কল্পন আর চিন্তনক্রিয়া হ'ল দু'টো আলাদা মানসিক প্রক্রিয়া। তবে সাধারণ অর্থে চিন্তা বলতে আমরা সব কিছুকেই বুঝাই। যখন বলি "আমি রামের কথা চিন্তা করছি" তখন ঠিক চিন্তনক্রিয়ার কথা বলি না। রামকে আমি আগে দেখেছি—এখন তার কথা চিন্তা করছি, অর্থ হ'ল তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করছি। এটা হ'ল স্মরণক্রিয়া। আবার যখন বলি "আমি আমার বাড়ীটা নতুন করে তৈরী করার চিন্তা করছি", তখন আমরা স্মরণ বা চিন্তনক্রিয়ার কথা বলি না। এটা হ'ল কল্পনা। কারণ যে নতুন ধরনের বাড়ী হবে তার কোন অতীত বা বর্তমান অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি চিন্তাকে আমরা দু'রকম অর্থে ব্যবহার করি। যদিও এটা বৈজ্ঞানিক অর্থে ভুল তবুও এর পেছনে কারণ আছে। কোন কিছু নতুন চিন্তা করার জন্য আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুত্থাপন বা স্মৃতির যেমন প্রয়োজন হয়, আবার কল্পনারও তেমন প্রয়োজন হয়। স্মৃতি আমাদের প্রত্যাভিজ্ঞায় (Recognition) সাহায্য করে আর কল্পনা আমাদের নতুন পথের সন্ধান দেয়। এই দুয়ে মিলে আমাদের চিন্তার পথ নির্দেশ করে। এই আলোচনা থেকে বলতে পারি চিন্তন হ'ল কল্পনের চেয়ে আরও বিস্তৃত প্রক্রিয়া। সুতরাং এই অলোচনাও বিস্তৃত হওয়ার দরকার। তবে এখানে তার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। সুবিধার জন্য চিন্তন এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য পর পৃষ্ঠায় ছকের আকারে দেওয়া হ'ল ঃ

কল্পন, স্মৃতি ও চিন্তন

কল্পন (Imagination)	চিন্তন (Thinking)
১। কল্পনের মাধ্যম হ'ল ভাবমূর্তি (Image)	১। চিন্তনের মাধ্যম হ'ল ধারণা (percept)
২। কল্পন বুদ্ধিবিহীন মানসিক প্রক্রিয়া	২। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া
৩। কল্পন উদ্দেশ্যবিহীন	৩। চিন্তন উদ্দেশ্যযুক্ত
৪। কল্পনের কোন ফলাফল নেই	৪। চিন্তনের ফলাফল আছে
৫। কল্পন মনের শিথিল অবস্থা-উদ্ভূত	৫। চিন্তনের জন্য গভীর ইচ্ছাকৃত মনোযোগের (Voluntory attention) প্রয়োজন
৬। কল্পন দেহধারী (Concrete)	৬। চিন্তন বিমূর্ত (abstract)
৭। কল্পন বিশৃঙ্খল (Unsystemetised)	৭। চিন্তা সুসংবদ্ধ (Systemetised)
৮। কল্পন বিচ্ছিন্ন গুণের হ'তে পারে	৮। কিন্তু চিন্তা সামগ্রিক (General) গুণের হয়

কল্পনের উপাদান
[Elements of Imagination]

এ পর্যন্ত আমরা কল্পন এর সঙ্গে স্মৃতি আর চিন্তনের তফাত করলাম। এখন আমরা বলব এই কল্পন প্রক্রিয়ার জন্য কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়। কিছু কল্পনা করার পূর্বে প্রথমতঃ আমাদের দরকার কল্পিত বস্তু সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা। যখন আমরা পরীর কল্পনা করছি তখন জানার দরকার তার দেহের গঠন কি রকম। একটি সুন্দরী মেয়ের শরীরে দু'টো ডানা আছে তা দিয়ে সে উড়ে যেতে পারে। তারপর আমাদের প্রয়োজন স্মৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার। বিভিন্ন মেয়ে কি রকম দেখতে তার থেকে খুঁজে বাহির করা কে সুন্দরী। আবার কোন পাখীর ডানা বড় এবং দেখতে সুন্দর। এই সব আমরা পাব আমাদের স্মৃতির কাছ থেকে। সব শেষে দরকার একটা মানসিক চেষ্টা যার দ্বারা অতীতের এই সব অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে নিয়ে, সাজিয়ে একটা নতুন জিনিস তৈরী করব। এখানে আমরা বিশেষ একটা মেয়েকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে একটা বিশেষ পাখীর ডানা লাগিয়ে আমরা পরীর কল্পনা করি। তা'হলে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে কল্পনার জন্য দরকার—

কল্পনার উপাদান

॥ এক ॥ যে বস্তুকে কল্পনা করব তার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা। ॥ দুই ॥ অতীত অভিজ্ঞতাগুলোকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলবার মানসিক চেষ্টা।

উপরের এই আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে আমাদের কল্পনার বেশীর ভাগ নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার উপর। আমরা যা ইচ্ছা তাই কল্পনা করতে পারি না। এর একটা সীমা আছে। কল্পনা নির্ভর করবে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার প্রসারের (Range of past experiences) উপর। আমি যা কোনদিন দেখি নি বা শুনি নি তা নিয়ে কল্পন করতে পারি না। অন্ধ লোক যে কোনদিন মানুষ অথবা পাখী দেখে নি তার পরীর কল্পনা করা অসম্ভব। তেমনি যারা কানে শুনতে পায় না তারা কোনদিন সুরের কল্পনা করতে পারে না। এই কল্পনার বেশীর ভাগ নির্ভর করে স্মৃতির উপর—স্মৃতি প্রবল হ'লে কল্পনা করা সম্ভব। যে জিনিসের অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে গেছি তা আমাদের কল্পনায় কোনদিন আসতে পারে না। আবার কল্পিত বস্তুর গঠন বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম হতে পারে। আমরা কল্পিত পরীকে একরকম দেখতে পারি, আবার অন্য জনে অন্য রকম দেখতে পারে।

কল্পন ও ইন্দ্রিয়

এখানে আর একটা কথা বলে কল্পনা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা শেষ করব। কল্পনা হয় ভাবমূর্তির মাধ্যমে। এটা হ'ল ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর জ্ঞান। কিন্তু আমরা জানি ভাবমূর্তি যে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হতে পারে। তেমনি কল্পনাও যে সব সময় দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর একথা ভুল। ভাবমূর্তিও যেমনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের হতে পারে কল্পনাও তেমনি যে কোন ধরনের ভাবমূর্তিকে অবলম্বন করে হতে পারে। সুরকার যখন নতুন গানের সুর ঠিক করেন তখন আগের শোনা ভিন্ন গানের সুরের অংশকে এক সঙ্গে মেশান। এমনি স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ সব রকমেরই কল্পনা করতে পারি।

কল্পনের শ্রেণীবিভাগ
[Classification of Imagination]

মানুষের সমস্ত কল্পনাগুলোকে আমরা কয়েকটা বিস্তৃত শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। আমরা যে সব কল্পনা করি তাদের প্রকৃতিগতভাবে চারটে শ্রেণীতে প্রথম ভাগ করব।

॥ **এক** ॥ ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা। এদের সাধারণতঃ বলা হয় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কল্পনা (Active & Passive imagination)।

॥ **দুই** ॥ মৌলিকতা ও কৃত্রিমতাপূর্ণ কল্পনা (Creative or Artificial imagination) বা রচনাত্মক ও গ্রহণাত্মক কল্পনা (Creative & Receptive imagination)।

॥ **তিন** ॥ বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্যজনিত কল্পনা (Imagination with purpose)।

॥ **চার** ॥ বিশ্বাসজনিত ও বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা (Imagination with and without belief)।

এখন আমরা এদের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব।

॥ **এক** ॥ **ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা** :—আমাদের কল্পনা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দুই-ই হ'তে পারে। যখন আমরা অলসভাবে বসে থাকি তখন আমাদের মনে নানা রকম ঘটনার প্রতিবিম্ব ভেসে উঠে, আবার মিলিয়ে যায়। এই সব ঘটনাকে মনে আনার জন্য আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টা করি না। একে বলে **অনিচ্ছাকৃত কল্পনা** বা **নিষ্ক্রিয় কল্পনা** (Passive imagination)। দিবাস্বপ্ন (Day-dream), কল্পনাবিলাস (fantasy) এই ধরনের নিষ্ক্রিয় কল্পনা। আদিম যুগের মানুষের এবং বেশীর ভাগ শিশুদের চিন্তাধারা এই রকম হয়। আবার প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও চিন্তাধারা অনেক সময় নিষ্ক্রিয় হয়।

নিষ্ক্রিয় কল্পনা

অনেক সময় আমরা ইচ্ছা করেই বিভিন্ন জিনিস কল্পনা করি। ভাবছি, আমাদের গরুর বাচ্চা হ'লে কি রকম রং হবে, গরু কত দুধ দেবে, বাচ্ছাটা কি করব ইত্যাদি। এখানে আমরা নিজের ইচ্ছায় কল্পনা করি। এই প্রকার কল্পনাকে বলা হয় **ইচ্ছাকৃত কল্পনা** বা **সক্রিয় কল্পনা** (Active imagination)। এখানে আমরা নিজেরা চেষ্টা করি কিছু সুখকর জিনিস কল্পনা করার। তবে এ নয় যে সক্রিয় কল্পনা সব সময় সুখকর হয়। অনেক সময় দুঃখদায়ক কল্পনাও সক্রিয় কল্পনা হয়।

সক্রিয় কল্পনা

সাহিত্য সৃষ্টি অথবা যে কোন উদ্ভাবনী চিন্তার পেছনে এই দুই রকম কল্পনাই এক সাথে কাজ করে।

॥ **দুই** ॥ **রচনাত্মক ও গ্রহণাত্মক কল্পনা** :—কল্পনাকে আমরা ভাবমূর্তির স্বরূপ দেখে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

যখন মানসিক প্রতিবিম্ব কল্পনাকারী নিজে থেকে সৃষ্টি করে তখন তাকে বলি **মৌলিক কল্পনা** বা **রচনাত্মক কল্পনা** (Creative imagination)। একটা জিনিস মনে রাখার দরকার—যা আগেও একবার বলেছি—যে কল্পনা যত মৌলিকই হ'ক না কেন, যে কল্পনা করছে তার নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে হতে পারে না। এর মৌলিকতা কল্পনাকারীর মানসিক ভাবমূর্তির মধ্যে। কবির কল্পনা, শিশুর কল্পনা, দার্শনিকদের চিন্তা এই শ্রেণীর কল্পনার মধ্যে পড়ে।

মৌলিক কল্পনা

আমরা যখন অন্যের সাহায্য নিচ্ছি কল্পনা করার জন্য তখন সেই কল্পনাকে বলব **কৃত্রিম কল্পনা** বা **গ্রহণাত্মক কল্পনা** (Artificial or receptive imagination)। বইয়ের কোন জায়গায় হাওড়ার পুলের বিবরণ পড়তে পড়তে যখন আমাদের মনে পূর্বে না-দেখা

কৃত্রিম কল্পনা

পুলের একটা ছবি ভেসে উঠে তখন সেই কল্পনাকে বলি কৃত্রিম কল্পনা। একটা সহজ উদাহরণের দ্বারা আমরা মৌলিক আর কৃত্রিম কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারব। রামায়ণ বাল্মীকির মৌলিক কল্পনা (Creative imagination) উদ্ভূত। কিন্তু আমরা যখন রামায়ণে বর্ণিত অশোক বনে বন্দিনী সীতার বিবরণ পড়ি তখন আমাদের মনে যে ছবি ভেসে উঠে তা হ'ল কৃত্রিম কল্পনা।

॥ তিন ॥ **বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্যজনিত কল্পনা** ঃ—অনেক সময় আমরা বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কল্পনা করি। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই সব কল্পনাও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সাধারণতঃ আমরা এদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—(A) বৌদ্ধিক কল্পনা (Intellectual imagination), (B) সৌন্দর্যবোধ ফোটাবার উদ্দেশ্যে কল্পনা (Aesthetic imagination) আর (C) কার্যকরী কল্পনা (Practical imagination)।

বৌদ্ধিক কল্পনা

[A] কোন জিনিসের প্রকৃত রূপ বুঝতে বা জ্ঞান লাভ করতে আমরা যে কল্পনার আশ্রয় নিই তাকে বলা হয় **বৌদ্ধিক কল্পনা** (Intellectual imagination)। অর্থাৎ কল্পনা যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সাহায্য করছে তখন সেই কল্পনাকে বলছি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কল্পনা। বিজ্ঞানী বা দার্শনিকগণ এই কল্পনাকে আশ্রয় করে নতুন জ্ঞানের বিষয় বুঝতে চেষ্টা করেন। এই কল্পনা আবার মৌলিক অথবা কৃত্রিম দুই-ই হতে পারে। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করে-ছিলেন তখন তিনি **মৌলিক বৌদ্ধিক কল্পনা** (Creative intellectual imagination) কাজে লাগিয়েছিলেন। আবার আমরা জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কোন বই পড়ি অর্থাৎ কোন বই থেকে জ্ঞানলাভের জন্য যে কল্পনার আশ্রয় নিই তাকে বলে **কৃত্রিম বৌদ্ধিক কল্পনা** (Receptive intellectual imagination).

সৌন্দর্যবোধক কল্পনা

[B] আমরা যে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নতুন কিছু শিল্প সৃষ্টি করি বা কোন শিল্পসৃষ্টিকে উপভোগ করি তাকে বলা হয় **সৌন্দর্যবোধের কল্পনা** (Aesthetic imagination)। কবি এবং শিল্পীরা সাধারণতঃ এই কল্পনার আশ্রয় নেন। এই সৌন্দর্যবোধ-আশ্রিত কল্পনা আবার মৌলিকও হতে পারে বা কৃত্রিমও হতে পারে। কবি বা লেখক কোন জায়গার বর্ণনা করতে গিয়ে যে কল্পনার আশ্রয় নেন তাকে বলা হয় সৌন্দর্য-বোধ-আশ্রিত মৌলিক কল্পনা (Creative aesthetic imagination)। আর আমরা সেই বর্ণনা পড়ার সময় যে কল্পনার আশ্রয় নিই তাকে বলা হয় সৌন্দর্য-বোধ-আশ্রিত কৃত্রিম কল্পনা (Receptive aesthetic imagination)।

[C] যে কল্পনার সাহায্যে আমরা কোন সমস্যার সমাধান করি তাকে বলা হয় কার্যকরী কল্পনা (Practical imagination)। এই কল্পনার সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, আর রাজনীতিবিদগণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করেন। কোন বাঁধ তৈরী করার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা তার ছবি আঁকেন, নক্সা তৈরী করেন, আনুমানিক খরচের হিসেব করেন। তারপর বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু হয়। এই কল্পনার সাহায্যে তিনি বাঁধ তৈরীর কাজে এগোলেন, একেই বলা হয় **কার্যকরী কল্পনা** (Practical imagination)।

কার্যকরী কল্পনা

॥ চার ॥ **বিশ্বাসজনিত বা বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা** : কল্পনা আবার দু'রকম হতে পারে—বিশ্বাস্য আর অবিশ্বাস্য। কোন কল্পনায় যখন প্রতিচ্ছবি (image) প্রকৃত কোন ঘটনার (Real) হয় বা আমরা বিশ্বাস করি, তখন তাকে বলা হয় বিশ্বাস্য কল্পনা (Imagination with belief)। ধরা যাক, আমরা কল্পনা করছি বরফ দিয়ে ঢাকা হিমালয়ে চূড়ার। এই জিনিসটা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা সত্যি জানি যে হিমালয়ের চূড়ার বরফ দিয়ে ঢাকা। যখন সৌরমণ্ডলের কল্পনা করি এবং মনে মনে ভাবি কি ভাবে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে আর চাঁদ কিভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, আরও সব গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে অবস্থান করছে, তখন এই কল্পনাকে বলি বিশ্বাস্য কল্পনা (Imagination with belief)। কারণ আমরা এই সব ঘটনার সত্যতাই বিশ্বাস করি। আর এই বিশ্বাস থেকে এই কল্পনার উৎপত্তি। এই ধরনের কল্পনাকে আমরা বিশেষ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(a) **ঐতিহাসিক কল্পনা** (Historical imagination), (b) **প্রতীক্ষা** (Expectation or anticipation), (c) **বৈজ্ঞানিক কল্পনা** (Scientific imagination)।

বিশ্বাসজনিত কল্পনা

[a] যখন অতীতের কোন বস্তু যাকে আমরা সত্য ব'লে জানি, তার কল্পনা করি তখন তাকে বলা হয় **ঐতিহাসিক কল্পনা** (Historical imagination)। সিন্ধু-সভ্যতার বিবরণ পড়তে গিয়ে তখনকার দিনের আচার-আচরণের যে কল্পনা আমরা করি তাকেই বলব ঐতিহাসিক কল্পনা। কল্পনা মাত্রই অতীত অভিজ্ঞতার হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা বলতে আমরা সেই সব ঘটনার কল্পনাকে বলছি যে সব ঘটনাকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ইতিহাস যেমন সত্য, এই সব কল্পনার বস্তুগুলোও সত্য।

ঐতিহাসিক কল্পনা

[b] **প্রতীক্ষা** (Expectation) হ'ল কোন দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আমাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ভাবমূর্তি বা প্রতিচ্ছবি (image) সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া। আমরা মনে মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কল্পনা করি যে

আমরা ধরে নিই যা ভাবছি তাই ঠিক হবে। এই পরিবর্তনের জন্য আমরা নিজেদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করতে থাকি। যেমন পরীক্ষা দেওয়ার পর ফল বাহির হওয়ার আগে আমরা ভাবি ফেল করব। এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কল্পনা করতে থাকি কি ভাবে আর সবাই-এর সঙ্গে মিশব, কথা বলব, কি বলব—কেন ফেল করেছি, ইত্যাদি। কতকগুলো মানসিক প্রক্রিয়া মিলে আমাদের মনে এই জাতীয় কল্পনার সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষার ফলাফলের কথাই ধরা যাক। প্রত্যেকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন। প্রত্যেকেই চায় নিজের ভবিষ্যৎ ভাল করে গড়ে তুলতে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর এটা অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং ফেল হলে ভবিষ্যতে তা খারাপ হবে এ ধারণা আমাদের মনে আছে। তারপর সে ভাবে তার এই যে ধারণা সে ফেল হবে এটা একেবারে সত্য এবং তখন সে তার জন্য নিজেকে মানসিক দিক থেকে তৈরি করতে থাকে। তা'হলে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি প্রতীক্ষার (Expectation) জন্য দরকার—(i) **একটা গঠনমূলক কল্পনা** (Constructive imagination), (ii) **ভবিষ্যতের সঙ্গে এই কল্পনার একটা সংযোগ** (iii) **একটা বিশ্বাস যে এই কল্পনা সত্য হবেই,** (iv) **এই কল্পিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেকে তৈরী করা।** এই সবগুলো একসঙ্গে মিলে আমাদের মধ্যে প্রতীক্ষার (Expectation or anticipation) সৃষ্টি করে।

প্রতীক্ষা

[c] আগে যে দু'রকমের বিশ্বাস্য কল্পনার আলোচনা করলাম সেই দু'টোই কালাশ্রিত (Has reference to time)। অর্থাৎ প্রথমটি অতীতের বস্তুর কল্পনা আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ বস্তুর সম্বন্ধে কল্পনা। কিন্তু **বৈজ্ঞানিক কল্পনা** হ'ল কালাতীত। এর কোন বিশেষ ধরনের কাল নেই। যে কোন যুগের জন্যই সত্য। এই কল্পনার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আপাতঃ ভিন্ন (Apparently different) ঘটনাগুলোর মধ্যে সাধারণ সূত্র অনুসন্ধান করেন। এই বৈজ্ঞানিক কল্পনা সব সময়েই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। নিউটন এই ধরনের বিশ্বাস-উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক কল্পনার দ্বারাই মাধ্যাকর্ষণের সূত্র অবিষ্কার করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক কল্পনা

এই গেল সংক্ষেপে বিশ্বাস-উদ্ভূত কল্পনার কথা। আবার এমনও কল্পনা হ'তে পারে যার প্রতিবিম্বগুলি একেবারে মিথ্যা বস্তুর। এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব তো নেই, তা'ছাড়া আমরা নিজেরাও বিশ্বাস করি না। এইগুলোকে বলা হয় অবিশ্বাস্য বা বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা (Imagination without belief)। যখন আমরা আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়ি তখন আমাদের মনে এই ধরনের কল্পনা হয়।

বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা

কল্পন
[Imagination]

- সক্রিয় (Active)
- নিষ্ক্রিয় (Passive)
- মৌলিক (Creative)
- কৃত্রিম (Receptive)
- বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য-জনিত কল্পনা
  - বুদ্ধিআশ্রিত (Intellectual)
    - রচনাত্মক (Creative)
    - গ্রহণাত্মক (Receptive)
  - সৌন্দর্যবোধ ফুটাবার জন্য কল্পনা (Aesthetic)
    - রচনাত্মক (Creative)
    - গ্রহণাত্মক (Receptive)
  - কার্যকরী (Practical)
  - ঐতিহাসিক (Historical)
  - প্রতীক্ষাজনিত (Expectation)
  - বৈজ্ঞানিক (Scientific)
- বিশ্বাস্য (With belief)
- অবিশ্বাস্য (Without belief)

কল্পনের বৃদ্ধি
[Development of Imagination]

আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমহারেই আমাদের কল্পনা-প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তাই অভিজ্ঞতা এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্পনপ্রক্রিয়াও উন্নত হতে থাকে। ছোট বেলা আমাদের থাকে নিক্রিয় কল্পনা (Passive imagination)। বেশীরভাগ কল্পনাবিলাস (Fantasy)। ছোট ছেলেরা ধূলো নিয়ে ভাত রান্না করে, পুতুলকে আদর করে খাওয়ায়। কিন্তু যত আমাদের বয়স বাড়তে থাকে, যখন আমরা পড়াশুনা করি, নতুন নতুন জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি, তখন ঐ ছোট বেলার কল্পনা চাপা পড়ে যায়। এর বদলে আসে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা কার্যকরী কল্পনা। জানার আকাঙ্ক্ষা বা কৌতূহল প্রকৃতি (Instinct of curiosity) থেকেই সব কল্পনার উৎপত্তি হয়। আরও যখন বয়স বাড়ে অর্থাৎ পরিণত বয়সে (Matured age) কল্পনা আরও উন্নত হয়। পরিপক্ক জীবনে পুরোপুরিভাবে দেখা দেয় সৌন্দর্যবোধ ফুটাবার কল্পনা (Aesthetic imagination), বুদ্ধিআশ্রিত কল্পনা (Intellectual imagination)। সুন্দরকে উপলব্ধির মধ্যে বা সত্যকে উপলব্ধির মধ্য দিয়েই এই বয়সের কল্পনা প্রকাশ পায়।

শিক্ষা ও কল্পন
[Education & Imagination]

কল্পন বলতে আমাদের সাধারণ ধারণা হ'ল কল্পনা বিলাস (Fantasy)। এবং শিক্ষাবিদগণের প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী এই মানসিক প্রক্রিয়া জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতায় কোন রকম সাহায্য করে না। এই ধারণা অনুযায়ী কল্পনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নে কল্পন প্রক্রিয়ার কোন স্থান থাকতে পারে না। কিন্তু, আধুনিক শিক্ষাবিদগণ এবং মনোবিদগণ মনে করেন, কল্পন জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার পরীপন্থী তো নয়ই বরং জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কল্পনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনার সময় লক্ষ্য করেছি, আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা গ্রহণে কল্পনা বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, মানবসভ্যতার উন্নতির মূলে আছে মানুষের উন্নত ধরনের ভাবমূর্তি সৃষ্টির ক্ষমতা। যে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানুষের কল্পন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু বিকাশের পরিচায়ক।

কল্পনা প্রাথমিকভাবে দু'রকমের হ'তে পারে—মৌলিক বা রচনাত্মক (creative) এবং কৃত্রিম বা গ্রহণাত্মক (Receptive)। এই দুই শ্রেণীর কল্পনাই মানুষের জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। গ্রহণাত্মক কল্পনা ব্যক্তি-জীবনে কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করবে।

কল্পনা ও কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা

দীর্ঘ দিনের জীবন পরিক্রমায়, মানুষ যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করছে, তাই হ'ল কৃষ্টি। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানুষের কৃষ্টির সার্থক এবং যোগ্য অধিকারী করে গড়ে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা যদি, অতীত ঘটনা (ইতিহাস), চিত্রকলা (Art), সাহিত্য (Literature) ইত্যাদি পাঠের সময় যথাযোগ্য মানসিক কল্প বা ভাব-মূর্তি সৃষ্টি করতে না পারে, তা'হলে তারা কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে অক্ষম হবে। সুতরাং শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধরনের গ্রহণাত্মক কল্পন প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করা। কারণ শিক্ষার বা বিদ্যালয়ের একটা প্রধান কর্তব্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য কৃষ্টিগত তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষমতা বিকাশ করা। কারণ, এই তাৎপর্য উপলব্ধির উপর নির্ভর করবে পরবর্তী স্তরের প্রগতি। অন্যদিকে, কল্পনার সাহায্যেই সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি রচনাত্মক কল্পনার মধ্য দিয়েই সমাজজীবনের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন। সুতরাং, শিক্ষার বা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব একই সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিনব বস্তুর কল্পনা সৃষ্টি করে, সমাজজীবনের এই অগ্রগতিতে সহায়তা করা। কল্পনের এই দ্বিমুখী উপযোগীতার জন্যই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনার বিকাশের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিশুদের কল্পনা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ, তাদের জীবনের গতি নির্ণয় করে দেয়। শৈশবে ছাত্র ছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবে কল্পনা প্রবণ হয়। এই জীবনের কল্পনা, নানা কিছু বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শিক্ষার দ্বারা যথাযোগ্য সুযোগ দিয়ে যদি এই সব কল্পনার বিকাশ করা যায়, তা'হলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ, একটা বিশেষ দিকে গতি নেয়। যে সব শিশু যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলা করে, এবং নানাভাবে যন্ত্রাংশ জুড়ে তাদের কাল্পনিক যন্ত্র তৈরী করতে চায়, তাদের সেই কল্পনাকে যদি সুপথে পরিচালিত করা হয়, তা'হলে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে এই দিকে উন্নতি করে। এমনকি, নতুন কিছু আবিষ্কারও করতে পারে। তাই কল্পনা ও শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য সাধনে, একই দিকে কাজ করে যাচ্ছে। উভয়ের উদ্দেশ্যই ব্যক্তির ক্ষমতানুযায়ী তার বিকাশ সাধন করা। সুতরাং, সুষ্ঠু কল্পনা শক্তির বিকাশ করা, শিক্ষার একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য

কল্পনা ও জীবন বিকাশ

শিক্ষাক্ষেত্রে যে মানসিক উপাদান সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা'হল—প্রেষণা (Motivation)। যথাযোগ্য প্রেষণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত না করতে পারলে, শিখন কোন সময়েই সম্ভব হবে না। এই প্রেষণা গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি (sterotyped mechanical repetition, বা মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে জাগানো কোন মতেই সম্ভব নয়। কল্পনা দু'দিক থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করে। কল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তা আসে। একই সঙ্গে তার মধ্যে নতুনের সন্ধান পায় বলে শিক্ষার্থীরা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং কল্পনা শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মসক্রিয়তা আনে এবং যথাযোগ্য মানসিক অবস্থা সৃষ্টির পেছনে উদ্বোধক (incentive) হিসেবে কাজ করে।

কল্পনা ও প্রেষণা

শিক্ষাক্ষেত্রে, কল্পনের এই গুরুত্বের জন্য, আমাদের সব সময় তাদের কল্পনা-জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের সহায়তা করতে হবে। কল্পনার বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের কাজ দিতে পারেন। যেমন—

কল্পনা ও শিক্ষক

॥ এক ॥ আমরা জানি কল্পনার প্রাথমিক উপাদান হ'ল অতীত অভিজ্ঞতা। অতীত অভিজ্ঞতার উপাদানকে একত্রিত করে, আমরা কল্প বা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করি। এই অতীত অভিজ্ঞতা যত নিখুঁত ও ব্যাপক হবে, কল্পনার সামগ্রী তত সুন্দর হবে। তাই শিক্ষার্থীদের কল্পনার বিকাশ করতে হ'লে, তাদের অতীত অভিজ্ঞতা যাতে সুন্দরভাবে সঞ্চয় করতে পারে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কিছু জিনিসকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার বিকাশ করতে হবে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বা পাঠ্য বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে কি ভাবে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করতে হয় বিদ্যালয়ে তার প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের দিতে হয়।

॥ দুই ॥ কল্পনার বিকাশের জন্য বিশেষ করে তার বিস্তৃতির জন্য, ভ্রমণ কাহিনী, ভৌগলিক বিবরণ, ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠের সুযোগ বিশেষভাবে করে দিতে হবে। শৈশবের কল্পনা বিশেষভাবে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তাই কল্পনার বিকাশের জন্য, এই সব বিষয়কে মূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন না করতে পারলে তাদের কল্পনার বিকাশ হবে না। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Teaching aids) শিক্ষককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

॥ তিন ॥ সৌন্দর্য বোধ বিকাশ করা শিক্ষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য বোধ বিকশিত না হলে, পরবর্তী জীবনে, তারা বিকৃত রুচির পরিচয় দেবে। আর এই সৌন্দর্যবোধ কল্পনার বিকাশের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনা সম্ভব। সৌন্দর্যবোধ, বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে

ভাল ভাল ছবি, কবিতা ও কল্পনামূলক সাহিত্য কার্যের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। এবং এদিকে তাদের যাতে প্রবণতা সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে।

॥ **চার** ॥ অনেক সময় শিক্ষার্থীরা খুব বেশী রকম কল্পনা প্রবণ হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে, কৈশোরের এটা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কল্পনার যেমন ভাল দিক আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। অতিরিক্ত কল্পনা-বিলাস, আমাদের জীবনে সর্বনাশের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের কল্পনার নিয়ন্ত্রণ করাও শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীরা যাতে অত্যন্ত বেশী কল্পনাপ্রবণ না হ'য়ে পড়ে, এবং তাদের কল্পনা যাতে কোন খারাপ বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে না ওঠে, সে দিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই দিকে শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে, এক মাত্র উপায় হ'ল তাদের কোন না কোন কাজের মধ্যে নিয়োগ করে রাখা। অলস মন থেকেই কু-চিন্তা, কু-কল্পনা আসে। তাই নানা রকম ভাল কাজে শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করে রাখলে, তাদের মধ্যে খারাপ-কল্পনার সুযোগ থাকে কম।

প্রশ্নাবলী

1. What are the different types of imagination, a child displays ? Illustrate your answar. How can a teacher help the proper unfold- of a child's imagination. [পৃঃ ১৪৯-১৫৪ : ১৫৫-১৫৮] [C.U.B.T. '68]
2. What is the relation between Image and Imagination ? What are the different type of imagination ? What can you do for healthy development of imagination in child. [K.U.B.T. '63] [পৃঃ ১৪৪ ; ১৪৯-১৫৪ ; ১৫৫-১৫৮]
3. List the various types of imagination. How can they be developed ? Answer with special reference to the younger group of children. [পৃঃ ১৪৯-১৫৪ ; ১৫৫-১৫৮] [K.U.B.T. '69]
4. Discuss how child's imagination can be trained and developed [পৃঃ ১৫৫-১৫৮] [N.B.U.B.T. '69]
5. Write notes on the following :
   (a) Expectation. [পৃঃ ১৫২-১৫৩]
   (b) Intellectual imagination. [পৃঃ ১৫১]
   (c) Memory & Imagination. [পৃঃ ১৪৫-১৪৬]
   (d) Thinking and imagination [পৃঃ ১৪৬-১৪৮]

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিন্তন

[THINKING]

যে সব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞান আহরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে বা আমাদের শিখনে সহায়তা করে তাদের মধ্যে চিন্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তন শুধুমাত্র শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনায় সহায়তা করে তাই নয়, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য মানসিক সংগঠনে সাহায্য করে। চিন্তন লব্ধ জ্ঞানের বা শিখনের প্রয়োগের সম্ভাব্যতা অনেক বেশী। তাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে বা শিক্ষা মনোবিদ্যায়, চিন্তন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দার্শনিকগণ মনে করেন, চিন্তন (thinking) মনের অস্তিত্বের পরিচায়ক। প্রাচীন **দার্শনিক অ্যারিস্টটল** বলেছেন, চিন্তন প্রক্রিয়া মানুষকে অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে। চিন্তনের অস্তিত্বের কথা বিচার করে দার্শনিকগণ মানুষের অভিজ্ঞতার জগতকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন। একটা হ'ল তার সংবেদনগত নিতান্তই বর্তমান জগত ; অপরটা হ'ল চিন্তার জগত বা চিন্ময় জগত। এই দ্বিতীয় জগতেই সে বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে বিশ্ব-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং, চিন্তনের প্রকৃত কাজ হ'ল—অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে, ইন্দ্রিয়াতীত লোকে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা। কিন্তু এই চিন্তন ক্রিয়ার স্বরূপ কি ?

চিন্তনের স্বরূপ

[Nature of Thinking]

ব্যাপক অর্থে, যে কোন জ্ঞান দায়ক অবগতিকে (cognition) আমরা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করি। সুতরাং, এই ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যক্ষণ (Perception), স্মৃতি (Memory), কল্পন (Imagination) ইত্যাদি যে কোন জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকেই আমরা **চিন্তন** বলতে পারি। যেমন, দার্শনিক **লক** (Locke), চিন্তনকে এক বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"*Thought is the perception of the agreement and disagreement of ideas.*" অর্থাৎ, বিভিন্ন ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়াই হ'ল চিন্তন। যার দ্বারা বিশেষ থেকে সাধারণ ধারণায় আসা যায়, যুক্তির দ্বারা

চিন্তনের ব্যাপক অর্থ

কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়, সম্বন্ধের আবিষ্কার ও সমস্যার সমাধান করা যায়, তাকেই বলা হয় **চিন্তন ক্রিয়া** (Thinking)। অনেক সময়ে তাই মনোবিদ্যায় চিন্তনের প্রতিশব্দ হিসেবে **ভাবনার বিস্তার** (elaboration) কথাটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চিন্তনের এটা সঙ্কীর্ণ অর্থ। সব জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকে চিন্তন বলা যায় না। সুতরাং চিন্তন কি তা জানতে হ'লে, তাকে আরও বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার।

চিন্তন ও প্রত্যক্ষণ

চিন্তন যে কি, তা সঠিকভাবে বলতে হ'লে, তার বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করার দরকার এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য সমজাতীয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে তার পার্থক্য করার দরকার। সাধারণ অর্থে, চিন্তন ও প্রত্যক্ষণকে (Perception) একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য থেকে চিন্তনের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষণের প্রধান পার্থক্য হ'ল, প্রত্যক্ষণ বস্তু নির্ভর, কিন্তু চিন্তন বস্তু নির্ভর নয়। প্রত্যক্ষণের জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন। কিন্তু চিন্তন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে হ'য়ে থাকে। চিন্তার ক্ষেত্রে বস্তুর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষণের দ্বারা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি। এই প্রত্যক্ষণ লব্ধ বিষয়বস্তুকে বলা হয় প্রত্যক্ষিত বস্তু (Percept)। অন্যদিকে চিন্তন দ্বারা আমরা বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাই। চিন্তন হয় ভাবমূর্তি বা কল্পের (Image) সাহায্যে।

চিন্তন ও সামগ্রিক জ্ঞান

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে চিন্তনের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এর দ্বারা কোন বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে আমরা সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করি। কোন বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন ঐ বস্তুর কোন গুণ (Quality), ভাব (Characteristic) বা অর্থ (Context) কে বিশ্লেষণ করি। বস্তুর অর্থ বলতে তার পরিবেশগত তাৎপর্যকে বুঝায়। অন্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিচার করে তাকে একটা বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত করি। এই ভাবে বস্তুর যে অর্থ বা গুণবোধ হয়, তা ঐ জাতীয় সব বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনোবিদগণ তাই বলেছেন, চিন্তনের বিষয়বস্তু তাই সব সময়েই সাধারণ প্রকৃতির (General) হয় এবং প্রত্যক্ষণের বস্তুর মত তা স্থান-কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; একেবারেই মুক্ত।

চিন্তন ও বিমূর্তজ্ঞান

আবার, প্রত্যক্ষণে যেমন, আমাদের জ্ঞানের বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়, চিন্তনে তা হয় না। যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা সমস্যা নিয়ে আমরা চিন্তা করি, তখন, সেই বস্তুর সব অংশের কথা এক সঙ্গে ভাবি না। তার কোন বিশেষ গুণকে আলাদা করে নিয়ে ভাবি। ফুলকে

প্রত্যক্ষ করার জন্য তার বিভিন্ন অংশকে পৃথক করে নিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্যকে ফুল থেকে পৃথক করে নিয়ে অনুধাবন করা চিন্তায় সম্ভব। এই জন্যই চিন্তাকে বিমূর্ত (abstract) বলা হয়। মনোবিদ কফ্‌কা (Koffka)[1] চিন্তনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কালে তাই মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের চিন্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল আমরা বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায় না প্রত্যক্ষ করেও তার সম্পর্কে বিমূর্ত চিন্তন করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে তাই আমরা প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করে থাকি। এই প্রতীক (symbol) বা চিহ্ন (Sign) মূর্ত বস্তুর প্রতিস্থাপিতরূপ হিসেবে কাজ করে।

চিন্তন ও বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

চিন্তনে, বস্তুর বিভিন্ন গুণকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত অবস্থায় দেখা সম্ভব হয়, বিশ্লেষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে (Analytic process)। এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা চিন্তনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার কোন বস্তুর বিশেষ গুণ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পেতে হলে, তাকে শুধু বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, তাদের সংযুক্তিকরণ বা সংশ্লেষণ (synthesis) করা প্রয়োজন। কারণ, বিচ্ছিন্ন গুণগুলোকে বিচার করে তাকে আবার বস্তুর মধ্যে আরোপ করাই হ'ল চিন্তার ধর্ম। সুতরাং, চিন্তনে বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষন (synthesis) এই দু'ধরনের প্রক্রিয়াই কাজ করে।

চিন্তন ও উদ্দেশ্য

চিন্তনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, চিন্তন সব সময়ে উদ্দেশ্যমুখী (Purposive)। সমগ্রতাবাদী মনোবিদগণ (Gestalt Psychologists) চিন্তনের এই বৈশিষ্ট্যের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চিন্তনের ধর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধান করে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞান লাভও হতে পারে, বা ব্যবহারিক ও উপযোগিতাপূর্ণ হ'তে পারে। যে কোন ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। এবং সেই সমস্যা আমাদের অতীত জ্ঞান সামগ্রীর মধ্যে একটা ফাঁকের (gap) সৃষ্টি করে। চিন্তনের কাজ হ'ল, ঐ সমস্যার সমাধান করে, জ্ঞানের ক্ষেত্রের এই ফাঁককে পূরণ করা।

চিন্তন ও সক্রিয়তা

সবশেষে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিন্তন মনের এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়া (Mental process)। সুতরাং মনের সক্রিয়তা চিন্তনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষণ, কল্পন ইত্যাদি প্রক্রিয়াতেও মন সক্রিয় থাকে। কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইচ্ছা প্রণোদিত মনোযোগের (volitional attention) প্রয়োজন হয়। কল্পনের জন্য এ ধরনের মনোযোগের কোন প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্যের পথে মনকে

1. It is characteristics of our thinking that we are able to carry out thought process abstractly, with any sort of material, quite independently of the natural relation of things."—Koffka : Growth of mind.

বিশেষভাবে সক্রিয় করতে না পারলে, চিন্তনের দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

তা'হলে এই আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, চিন্তনের [এক] **বিশ্লেষণ** (analysis), [দুই] **সংশ্লেষণ** (synthesis), [তিন] **উদ্দেশ্যের অনুধাবন** (Purposiveness), [চার] **জ্ঞানের সামান্যীকরণ** (Generalization), [পাঁচ] **বিমূর্ত ভাব গ্রহণ** (abstraction) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা চিন্তন প্রক্রিয়ার কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি। **সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে বস্তু, ব্যক্তি বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উদ্দেশ্যমুখী সামগ্রিক বিমূর্তজ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াই হ'ল চিন্তন।**

চিন্তনের সংজ্ঞা

চিন্তনের বাহন
[Vehicle of Thought]

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, চিন্তন মানুষের এক ধরনের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াই বস্তুকেন্দ্রিক। কিন্তু চিন্তনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা বলেছি, এই প্রক্রিয়ার জন্য মূর্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তা'হলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে চিন্তন যদি বস্তু নির্ভর নয়, এবং বিমূর্ত তবে কি ভাবে তা সম্পন্ন হয়। মনোবিদগণ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা বলেন, চিন্তন ও বিমূর্ত স্তরে বিশেষ কতকগুলো মাধ্যমের (Medium) সাহায্যে ঘটে থাকে। এই সব মাধ্যমকে মনোবিদগণ বলেছেন চিন্তনের বাহন (vehicle of thought)। এই বাহন প্রধানতঃ চার ধরনের—[এক] **ভাবমূর্তি বা কল্প** (Image) ; [দুই] **ধারণা বা প্রত্যয়** (Concept) ; [তিন] **সংকেত বা চিহ্ন** (Symbol or sign) **এবং** [চার] **অবধারণ বা বিচারকরণ** (Judgement or Reasoning)। চিন্তন প্রক্রিয়ার জন্য ভাবমূর্তি, বস্তু সম্পর্কিত ধারণা, সংকেত এবং বিচারকরণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। আমরা এই সব মাধ্যমে বা বাহন সম্পর্কে এখন বিশদভাবে আলোচনা করব।

চিন্তন ও ভাবমূর্তি
[Thought & Image]

চিন্তনের প্রাথমিক বাহন হিসেবে, মনোবিদগণ ভাবমূর্তি বা কল্প (Image) কে নির্দেশ করেছেন। বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপের মানসিক প্রতিচ্ছবিকে বলি ভাবমূর্তি (Image)। যে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ লব্ধ জ্ঞান আমাদের মনে সংরক্ষিত থাকে। কল্পন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ভাবমূর্তির কথা উল্লেখ

করেছি। যখন, অতীত কোন ঘটনা, বস্তু বা অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি কোন মানসিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে ভেসে ওঠে তখন তাকে বলা হয় ভাবমূর্তি বা কল্প। মনোবিদগণ মনে করেন, প্রত্যক্ষণের জন্য যেমন সংবেদন প্রয়োজন, চিন্তনের জন্য তেমনি ভাবমূর্তি বা কল্পের (Image) প্রয়োজন। অনেক মনোবিদ্ বলেছেন, ভাবমূর্তি ছাড়া চিন্তন একেবারে সম্ভব নয়। আমরা যখন কোন বিষয় সম্পর্কে, চিন্তা করি, তখন তার ভাবমূর্তি আমাদের মনের মধ্যে গঠিত হয়। এবং এই ভাবমূর্তি চিন্তনের বিষয়বস্তু হিসেবে কাজ করে।

চিন্তনের বাহন—ভাবমূর্তি

কিন্তু, অনেক মনোবিদ মনে করেন ভাবমূর্তিকে (Image) বাদ দিয়েই চিন্তন সম্ভব। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, এই প্রশ্ন মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। একদিকে **উর্জবার্গ** পন্থী মনোবিদগণ (Wurzburg School), বিশেষ করে, জেমস্ (James), স্টাউট (Stout), উড্ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদগণ বললেন, চিন্তন ভাবমূর্তি ছাড়াই সম্ভব হয়। অপরদিকে সংগঠনবাদীগণ (structuralist) বিশেষ করে মনোবিদ **টিচেনার** (Titchner), বললেন ভাবমূর্তি ছাড়া চিন্তন একেবারেই সম্ভব নয়। চিন্তন ও ভাবমূর্তির সম্বন্ধ সম্পর্কে এই আলোচনা মনোবিদ্যার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও প্রাথমিক স্তরে এই তর্ক তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে, এই বিষয় নিয়ে মনোবিদগণ অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। এই আলোচনা থেকে চিন্তন ও ভাবমূর্তির সম্পর্ক সম্পর্কে বিশদ ধারণা হবে এই উদ্দেশ্যে।

ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের সম্ভাবনা

জেমস্ (James) মনে করেন আমাদের চেতনার প্রত্যন্ত সীমায় (Fringe of consciousness) কোন ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় না। তিনি বলেছেন, চেতনা অবিচ্ছিন্ন হলেও সেখানে যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় তা সব সময় অবিচ্ছিন্ন নয়। ভাবমূর্তির মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। এই ফাঁকগুলো 'যদি' (If), 'কিন্তু' (But) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই অবস্থাকে তিনি বলেছেন অপরিবর্তনীয় অবস্থা (Intransitive state)। এই অবস্থায় আমাদের মনে কোন ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, এ সত্ত্বেও আমাদের চেতনায় এবং চিন্তার অবিচ্ছিন্নতা (Continuity) বজায় থাকে ; কারণ, এই অবস্থাগুলো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সুতরাং, জেমস্ এর থেকে সিদ্ধান্ত করলেন, আমাদের চেতনায় চিন্তন ভাবমূর্তিহীন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। মনোবিদ্ **স্টাউট** (Stout), জেমস্-এর মতবাদকে সমর্থন করে বলেছেন এই সব ভাবমূর্তিহীন পরিবর্তন (Imageless transition) অস্পষ্ট হলেও আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি

ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের স্বপক্ষে যুক্তি

এই গুলোকেই সম্বন্ধ সূচক চিন্তনের (Relational thinking) মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। একটা গান শুনলে, তার ভাষাগুলো আমরা ভুলে যাই, কিন্তু তার সুরের রেশটা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই অবস্থায় মনে কোন ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয় না। **দার্শনিক ডেকার্তে** (Descartes) সর্ব প্রথম ভাবমূর্তি নির্ভর এবং ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের কথা বলেন। আধুনিক-কালে, মনোবিদ **বিনে** (Binet) ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের উপর পরীক্ষা করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে এই রকম চিন্তন সম্ভব। তিনি বলেন, সমস্যা প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে আসে এক কাজ করার আকাঙ্ক্ষা (*Aufgabe*) এবং এই আকাঙ্ক্ষা তাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। সম্বন্ধ সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞানকে **উড্‌ওয়ার্থ** নাম দিয়েছেন সম্বন্ধের অনুভূতি (feeling of relation)। এবং এই অনুভূতি ভাবমূর্তি ছাড়াও হতে পারে। মনোবিদ **অ্যাচ্‌** (Ach) অন্য একদিক থেকে বিচার করে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁর মতে কোন শব্দের (Word) ভাবার্থ কোন ভাবমূর্তি ছাড়াই চেতনার প্রত্যান্তে (Fringe of consciousness) অবস্থান করে। ফলে ঐ সম্পর্কিত চিন্তন ভাবমূর্তি ছাড়াই সম্ভব। এ সম্পর্কে **কার্ট বুউলার** (Kurt Buhler) একেবারে চরমভাবাপন্ন। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করেছেন, ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। এবং ভাবমূর্তিহীন চিন্তনই স্বাভাবিক।

ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের বিপক্ষে যুক্তি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মনোবিদ্ টিচেনার (Titchner) তাঁর বিখ্যাত বই "*The experimental Psychology of thought process*" এ ভাবমূর্তিহীন চিন্তার পক্ষে যে যুক্তি বিভিন্ন মনোবিদ উপস্থাপন করেছিলেন, তা খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, আমাদের সচেতন মনোভাব (conscious attitude), বা মনের প্রস্তুতি-ভাবকে (Peparatory set) দৈহিক নাড়াচাড়া বা গতীয় ভাবমূর্তি (kinaesthetic image) রূপে বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি "Infinity broods over all things" এই কথাটা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সচেতন মনোভাবকে (conscious attitude) বিশ্লেষণ করে দেখেন। তিনি বলেন, এই কথা চিন্তার সময় একটা ভাবমূর্তির সৃষ্টি তো হয়ই তা'ছাড়া কতকগুলো দৈহিক পরিবর্তনও হয়। তিনি বলেন, যাঁরা ভাবমূর্তিহীন চিন্তনে বিশ্বাসী, তাঁরা অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা বিচার করেন নি। তাঁরা চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, মানসিক প্রক্রিয়ার উপর লক্ষ্য না দিয়ে চিন্তার বিষয় বস্তুর প্রকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে, তাঁদের বিশ্লেষণের মধ্যে ভুল থেকে গেছে। তিনি তাই বলেছেন ভাবমূর্তিহীন চিন্তনের সিদ্ধান্ত উদ্দীপকগত ভ্রান্তি দুষ্ট (stimulus error)।

এই শতকের গোড়ার দিকে ভাবমূর্তি ছাড়া চিন্তন সম্ভব কি না এ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক, পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে পরীক্ষা করতে গিয়ে মনোবিদগণ উপলব্ধি করেছেন, সম্বন্ধ সূচক চিন্তনের (Relational thinking) প্রকৃতি অন্তর্দর্শনের (Introspection) দ্বারা বিশ্লেষণ করা খুব কষ্ট সাধ্য কাজ, এবং এর জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই অসুবিধার জন্য পরবর্তীকালে মনোবিদগণ অন্তর্দর্শনের সাহায্যে চিন্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ চেষ্টা ত্যাগ করে তার আচরণগত দিকের উপর বেশী জোর দেন। এই সব পরীক্ষা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, চিন্তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাবমূর্তিকে অবলম্বন করে হ'য়ে থাকে। যদি বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবমূর্তিহীন চিন্তন হয় ও, তার মাধ্যম হিসেবে ভাষা (Language) কাজ করে। ভাষাই তার আচরণগত দিক।

আলোচনা

চিন্তন ও ধারণা
[Thought & Concept]

ভাবমূর্তি (Image) যেমন এক ধরনের চিন্তনের বাহন। ধারণাও (concept) এক রকম চিন্তনের বাহন। ধারণা কথাটা আমরা সামগ্রিক প্রত্যয় এই অর্থে ব্যবহার করছি। ভাবমূর্তির সাহায্যে আমরা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। তেমনি ধারণার সাহায্যে আমরা বস্তু শ্রেণী (class of object) সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। যেমন, বিশেষ কাক সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমাদের ভাবমূর্তিই যথেষ্ট। কিন্তু কাককে জাতিগতভাবে চিন্তা করতে হ'লে, বা পাখীকে জাতিগতভাবে চিন্তা করতে হ'লে তাদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রয়োজন। চিন্তনের ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণার (concept) গুরুত্বের কথা প্রত্যেক মনোবিদই স্বীকার করেছেন। আমরা এই ধারণার প্রকৃতি ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

চিন্তন ও ধারণা

একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ গুণ বর্তমান আছে, তার অভিজ্ঞতাই হ'ল ধারণা। একজন বিশিষ্ট মনোবিদ্ ধারণার সংজ্ঞা দিয়েছেন—"*A concept is the idea that stands for any one of a number of individual resembling one another in some essential attribute*" অর্থাৎ, সব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীর সাধারণ কোন গুণ সম্পর্কে জ্ঞানকে ধারণা বলা যেতে পারে। তর্কশাস্ত্রে (Logic) আমরা সাধারণ ধারণা বলতে যা বুঝি মনোবিদ্যার এই 'ধারণার' (concept) সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। তর্কশাস্ত্রে ধারণা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর সাধারণ গুণকে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে (objectively) গ্রহণ করা হয়। এখানে ব্যক্তি মনের দ্বারা ধারণার (concept)

ধারণার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

প্রভাবিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই, এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কোন প্রশ্ন উঠে না। এই রকমের ধারণা স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু মনোবিদ্যায় সাধারণ ধারণা (concept) ভিন্ন ধর্মী। এই ধারণা ব্যক্তিমনের সক্রিয়তা সৃষ্টি হয় এবং তা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ধারণায় ব্যক্তিমনের ক্রমপরিণতি বা পরিমননের (Maturity) সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতা লাভ করে। এই অর্থে, কোন বিশেষ শব্দের অর্থও সাধারণ ধারণার পর্যায়ে পড়ে।[1] আবার, এই সাধারণ ধারণা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক হ'তে পারে, এবং সাধারণ উপাদানের পরিমাণগত দিক থেকে (degree of generality) পৃথক হ'তে পারে। মানসিক জটিলতার দিক থেকেও এই ধারণার পার্থক্য হতে পারে। যখন শিশুরা বাড়ীর বিড়ালটা দেখে বিড়ালের ধারণা গঠন করে, তখন তার এই বিড়ালের ধারণা লোমশ, সাদা, চতুষ্পদ ছোট্ট প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও সে বিড়াল এবং কুকুরের মধ্যে সহজে পার্থক্য করতে পারে, তবুও তার এই ধারণা একটা মাত্র বিষয়বস্তুকে (প্রাণী) অনুশীলনের ফলে গড়ে উঠেছে। তাই এর সাধারণ ধর্মীতা (Generality) অনেক কম। এই রকম ধারণাকে বলা হয় **ব্যক্তি বিশেষের ধারণা** (Idea of the Individual)। আবার ঐ শিশু যখন অন্যান্য বাড়ীর আরও অনেক বিড়াল দেখে, তখন তার বিড়াল সম্পর্কে পূর্বের ধারণার আরও বিস্তৃতি হয়। তখন তার বিড়াল সম্পর্কে ধারণা লোমশ, সাদা চতুষ্পদ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না সে সামগ্রিকভাবে বিড়াল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা গ্রহণ করতে পারে। এই রকমের ধারণাকে বলা হয় **জাতিগত ধারণা** (Idea of class)। এখানে ধারণার সাধারণ ধর্মীতার (Generality) আরও বিস্তার হয়। এর চেয়ে আরও জটিল এবং বেশী সাধারণ গুণ সম্পন্ন ধারণা আমাদের হয়ে থাকে। এই সব ধারণা বিশেষভাবে বিমূর্ত গুণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। একশ্রেণীর বস্তু বা প্রাণীর বিশেষ সাধারণ গুণগত ধারণা মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন সততা, সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। এই রকমের ধারণাকে **বিমূর্ত ধারণা** (Abstract idea) বলা হয়। মনোবিদগণ ধারণাকে তাই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—**[এক] ব্যক্তি বিশেষের ধারণা, [দুই] জাতিগত ধারণা** এবং **[তিন] বিমূর্ত ধারণা**। এই তিন রকমের ধারণার পার্থক্য শুধুমাত্র সাধারণ ধর্মীতার (degree of generality) দিকে থেকে। 'মানুষ' শব্দটা দিয়ে যখন বিশেষ মানুষকে বুঝাই তখন প্রথম শ্রেণীর ধারণার প্রকাশ হয় আবার 'মানুষ' বলতে যখন মানব জাতিকে বুঝাই, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণার প্রকাশ হয় এবং 'মানুষ' বলতে যখন মানবীয় গুণকে বুঝাই (লেখাপড়া শিখে মানুষ হও) তখন তৃতীয় শ্রেণীর ধারণার প্রকাশ হয়ে থাকে।

1. 'The meaning of a word is a concept—Woodworth : Psychology.

মনোবিদগণ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ ধারণা (concept) সৃষ্টির মূলে কতকগুলো মানসিক ক্রিয়া কাজ করে। অন্যভাবে বলা যায়—আমাদের বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বিশেষ কতকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো হ'ল—[এক] **তুলনা** (Comparison) [দুই] **বিমূর্তীকরণ** (Abstraction), [তিন] **সামান্যীকরণ** (Generalization) এবং [চার] **নামকরণ** (Naming)।

ধারণার বিকাশ

শিশুদের প্রথম অভিজ্ঞতা কোন বিশেষ প্রাণী বা বস্তুতে আবদ্ধ থাকে। পাখী সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে সে বাড়ীর খাঁচায় রাখা পাখীকে চিনতে শেখে। তার নামকরণও করে। এটা ময়না। এটাই হ'ল তার সাধারণ ধারণা সৃষ্টির প্রথম ধাপ। তবে মনোবিদগণ এই স্তরকে সাধারণ ধারণ গঠনের পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন না। এটা উদ্দেশ্যহীন অভিজ্ঞতা গ্রহণের পর্যায় মাত্র। ক্রমে শিশু আরও অনেক রকম পাখী দেখে। টিয়া, কাকাতুয়া, কাক, বাবুই, চড়ুই ইত্যাদি। এই দেখা শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষণ (Passive observation) নয়। এই সব বিভিন্ন ধরনের পাখীর মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন পাখীর বৈশিষ্ট্যগুলো সে লক্ষ্য করে। এর ফলে, পাখীর সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য শিশুর চোখে পড়ে এবং পাখী জাতি সম্পর্কে তার একটা প্রাথমিক ধারণা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **তুলনা** (Comparison)। এই ভাবে তুলনা করে বিভিন্ন পাখীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা সম্ভব হয় মনের যে বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা, তা হ'ল বিশ্লেষণী ক্ষমতা (Power of analysis)। চিন্তনের মধ্যেও এই ক্ষমতার ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই।

তুলনা

পরবর্তী স্তরে শিশু পাখীর বিভিন্ন সাধারণ গুণগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করে। পাখী পর্যবেক্ষণের সময় তার প্রাথমিক সাধারণ ধারণা থেকে, শিশু এক একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করে। এবং মিলিয়ে দেখে তা প্রত্যেক পাখীর মধ্যে বর্তমান কি না। অর্থাৎ, ডানা—সব পাখীর আছে কি না তা দেখার দরকার; পা—প্রত্যেক পাখীর আছে কি না তা বিচার করে দেখার দরকার; ঠোঁট—প্রত্যেকের আছে কি না বিচার করে দেখার দরকার। এই ধরনের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য পাখীর জাতিগত ধারণা গঠনের জন্য কোন কোন অঙ্গগুলো প্রয়োজনীয় এবং কোন গুলো অপ্রয়োজনীয় তা খুঁজে বাহির করা। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বিমূর্তীকরণ** (Abstraction)।

বিমূর্তীকরণ

বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে সংশ্লেষণী প্রক্রিয়া (synthesis) বা **সামান্যীকরণ** (Generalization)। গুণ গুলোকে বস্তু থেকে আলাদা করে

যখন দেখা হয়, তখন কোন গুণটা সমজাতীয় সব বস্তুর মধ্যে আছে তা লক্ষ্য করা হয় বিমূর্তীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এইভাবে সাধারণ মৌলিক গুণ গুলোকে বেছে নিয়ে একত্রিত করে একটা বিশেষ শ্রেণীর বা জাতির বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান গ্রহণ করি। বিভিন্ন পাখীর সাধারণ গুণ গুলোকে বিশ্লিষ্ট ভাবে দেখে তাদের একত্রিত করে পাখী সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণার সৃষ্টি করি। এটাই হ'ল চিন্তন ক্রিয়ার মানসিক পর্যায়ের শেষ স্তর। এই স্তরেই আমাদের একক সাধারণ ধারণা জন্মে।

সামান্যীকরণ

তবে সাধারণ ধারণা গঠন সামান্যীকরণের মধ্যেই শেষ হ'য়ে যায় না। এর পরে আর একটা কাজ আমরা করি, তা হ'ল **নামকরণ** (Naming)। উপরোক্ত সব প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অর্জন করে থাকি। কিন্তু, সর্বশেষ পর্যায়ে ঐ সাধারণ ধারণার একটা নাম দিই। ধারণার প্রকাশের জন্য এই নামকরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। অর্থাৎ, শিশু জানে জগতে এক শ্রেণীর প্রাণী আছে যাদের দুটো ডানা, দুটো পা, দুটো চোখ, একটি ঠোঁট আছে। তারা ডিম পাড়ে; তারা উড়তে পারে। এই বললে, বলা শেষ হয় না। বক্তব্য তখনই শেষ হয়, যখন সে বলে,—সেই প্রাণীর নাম 'পাখী'। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **নামকরণ** (Naming)।

নামকরণ

এইভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের যে সাধারণ ধারণা (concept) হয়। তার পেছনে থাকে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা। কিন্তু, দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় আমাদের সাধারণ ধারণা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জন্মায়। এই রকমের স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ ধারণা গঠনে, মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভিন্ন হয়। সাধারণতঃ দুই পর্যায়ে এই রকমের ধারণা জন্মে। এই ধারণা সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ জাতিগত ভাবমূর্তি (Generic Image) সৃষ্টি করতে হয়। যখন একই জাতীয় বিভিন্ন বস্তু আমাদের মনে উপস্থাপিত হয়। তখন তাদের সাধারণ গুণগুলো বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে, আমাদের মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এই পুনরাবৃত্তির ফলে, সাধারণ গুণের পৌণঃপুনিকতার দরুন, আমাদের মনে এই সব সাধারণ গুণের এক মিলিত ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় জাতিগত ভাবমূর্তি (Generic Image)। এই জাতিগত ভাবমূর্তি (Generic image) কিন্তু সাধারণ ধারণা (concept) নয়। পরিপূর্ণ ধারণা গঠন ও বিশেষ বস্তুর ভাবমূর্তি গঠন (Image of particular object) এই দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হ'ল জাতিগত ভাবমূর্তি গঠন (Generic Image)। এর পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতিগত ভাবমূর্তিকে সাধারণ ধারণায় পরিবর্তন (Transition to concept proper) করতে হয়। এই পরিবর্তন হঠাৎই সংঘটিত হয়। যখন

জাতিগত ভাবমূর্তি গঠন ও ধারণার বিকাশ

ব্যক্তি হঠাৎ ঐ সব একজাতীয় বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করে তখনই তার মধ্যে এদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা জন্মে। তবে এই ধারণা গঠনের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে তাকে পূর্বোক্ত চারটে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। শুধু আকস্মিক ঐ বৈসাদৃশ্যের প্রত্যক্ষণ তার এই কাজে সাহায্য করে মাত্র। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে কোন রকমের সাধারণের ধারণা গঠনে—**তুলনা, বিমূর্তীকরণ, সামান্যীকরণ এবং নামকরণ** এই চারটে প্রক্রিয়া কাজ করে।

চিন্তন ও সংকেত
[Thought & Symbol]

আধুনিক মনোবিদগণ চিন্তনকে অনুশীলন করতে গিয়ে তার বাহ্যিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেন চিন্তন কতকগুলো সংকেতকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করে। এই সব

সংকেত কি ?

সংকেত চিন্তনে প্রত্যক্ষ বস্তুর পরিবর্তে কাজ করে থাকে। এই সংকেতকে মাধ্যম করেই চিন্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। চিন্তনে সংকেত দু'রকমের ব্যবহৃত হয়—**প্রতীক** (Symbol) এবং **চিহ্ণ** (Sign)। প্রতীক এবং চিহ্ন, দুই অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে অন্য কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে চিন্তনের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণে উপস্থাপনে সহায়তা করে। কোথাও ধোঁয়া দেখলে, আগুন সম্পর্কে আমাদের চিন্তন শুরু হয়। এখানে আগুন আমরা প্রত্যক্ষ করি না; প্রত্যক্ষ করি ধোঁয়া। কিন্তু এই ধোঁয়াকে মাধ্যম করেই আগুনের চিন্তন শুরু হয়। তাই ধোঁয়া হ'ল আগুনের চিহ্ণ (Sign)। এই চিহ্ন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয় মাত্র। তাই তাকে সাধারণভাবে চিন্তনের বাহন বলা যায় না। অন্যদিকে প্রতীক (Symbol) আমাদের বস্তুকে অনুধাবনে সহায়তা করে। প্রতীক সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত বস্তুর পরিবর্ত হিসেবে কাজ করে; এখানে অনুমানের কোন সুযোগ নেই। যখন, আমরা শ্রেণীতে ট্রেনের আপেক্ষিক গতি (Relative velocity) বুঝানোর জন্য দু'টো ডাস্টার (Duster) ব্যবহার করি, তখন ঐ ডাস্টার গুলো ট্রেনের প্রতীক হিসেবে কাজ করে এবং গতি সম্পর্কিত চিন্তনে সাহায্য করে। মনোবিদগণ মনে করেন আমাদের ভাষা (Language) এক ধরনের সাধারণ ও সার্বজনীন প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তাই চিন্তন ও ভাষার সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব।

মানুষের জীবনে ভাষা (Language) আর চিন্তন প্রায় সমকালীন। আদিম মানুষ মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গী করতো। পরে ধ্বনি আর ছবির সাহায্যে তাদের চিন্তনের ধারাকে তারা প্রকাশ করতো কিন্তু

সভ্যতার অগ্রগতির ধারা অনুশীলন করলে, দেখা যায়, ভাষা এবং চিন্তন পরস্পরের বিকাশে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। ভাষা বা শব্দ যা আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি, তা শুধুমাত্র ধ্বনি নয়। এগুলো বাহ্যিক বস্তু ও আমাদের চিন্তনের পারস্পরিক ক্রিয়ার যে ফল তার প্রতিনিধি বা প্রতীক (Symbol)। ভাষা, বস্তু এবং ভাব উভয়েরই প্রতীক। ভাষা বিমূর্ত এবং প্রতীক ধর্মী। আমাদের চিন্তনও ভাবনির্ভর এবং প্রতীক ধর্মী। তাই ভাষা এবং চিন্তনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। ধ্বনি আর রূপের মধ্য দিয়ে চিন্তন আকার প্রাপ্ত হয়। তাই ভাষা চিন্তার বাহনও বটে আবার বহিঃপ্রকাশও বটে।

ভাষা কি ?

মানুষের জীবনে ভাষার প্রয়োজনীয়তা তিন দিক থেকে দেখা দেয়। **প্রথমতঃ** ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব হয়। মানব সভ্যতার বর্ত্তমান পর্যায়ে বাক্ শক্তিহীন ব্যক্তি সমাজের সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা হ'ল ভাষার মানসিক প্রয়োজনীয়তার দিক। **দ্বিতীয়তঃ** ভাষা ব্যক্তিমনের জটিলতাকে দূর করে। মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তখন মন শান্ত হয়। এই ভাবে, ভাষা ব্যক্তিজীবনের মানসিক সুস্থতাকে বজায় রাখে। ক্রৌঞ্চ বধের পর মনের বেদনাকে আদি কবি প্রকাশ করলেন ভাষার মাধ্যমে ; দৃষ্টি পড়লো, নিজের উচ্চারিত দেব ভাষার প্রতি ; মন শান্ত হ'ল। **তৃতীয়তঃ** ভাষা চিন্তনকে সাহায্য করে। ভাষা চিন্তনের প্রধান উপাদান। ভাষার স্বচ্ছতা, চিন্তার স্বচ্ছতার পরিচায়ক। কারণ চিন্তনের অনেক সময় বহিঃপ্রকাশ হয় ভাষার মাধ্যমে।

ভাষার কাজ

ভাষার সঙ্গে চিন্তার কি রকমের সম্পর্ক আছে তা আলোচনা করতে গেলে, তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথাই বলার প্রয়োজন। চিন্তন প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় ভাষার মাধ্যমে। নিজের মনে কোন বস্তুকে ধরে রাখতে হলে যেমন ভাষার প্রয়োজন, আবার তাকে প্রকাশ করার জন্যও ভাষার দরকার। আবার এই ভাষার দ্বারা চিন্তন ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হয়। জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে অন্যের কি ধারণা, অন্যের অভিজ্ঞতা কি. তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পেলেই অন্যে অনুভাবিত হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ও চিন্তনের এই সম্পর্ক বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। অন্যের চিন্তাধারা ভাষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর সামনে প্রকাশ পায় বলেই তার দ্বারা তাদের চিন্তন ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হয়। আবার, এই ভাষার সাহায্যেই নিজের চিন্তাকে মনের মধ্যে নির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে ধরে রাখা যায়। জগতের বহু বিচিত্র বস্তু সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তা করে তাদের প্রত্যেকের স্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বিচ্ছিন্নরূপে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাষার প্রতীক দিয়ে তাদের সহজে

ভাষা ও চিন্তনের সম্পর্ক

আমরা ধরে রাখতে পারি। এই জন্য দেখা যায় ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উন্নতি হয় আর চিন্তার উন্নতির সঙ্গে ভাষার উন্নতি হয়।

চিন্তার বিবর্তনে ভাষার আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি জাতির বুদ্ধিবৃত্তি আর মননশীলতার পরিচায়ক। কিন্তু, তা বলে, সব সময় ভাষা চিন্তার পরিচায়ক নয়। তাই যদি হ'ত তা'হলে তোতাপাখীর চিন্তা শক্তি আছে, এ কথা বলতে হয়। শুধুমাত্র বাক্‌যন্ত্রের নাড়াচাড়া করলে চিন্তন হয় না, বাকযন্ত্রের ঐ পরিবর্তন অর্থপূর্ণ হওয়ার দরকার। আবার ভাষা আর চিন্তনের মধ্যে যদিও ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তবু একথা বলা যায় না তারা সমব্যাপক (Co-extensive)। সাধারণ অর্থে চিন্তার উন্নত স্তরে ভাষার প্রয়োজন হলেও চিন্তনের নিম্নস্তরে বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় আমাদের মনে এমন সব জিনিসের চিন্তা হয়, যা আমরা ঠিকমত ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। আবার, যাদের কোন রোগের জন্য বাক্‌যন্ত্রের কাজ নষ্ট হয়ে যায়, তারাও চিন্তা করতে পারে। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন, এ সব ক্ষেত্রেও মানুষ মনে মনে কথা বলে (Sub-vocal speech)। আধুনিক কালে অনেক মনোবিদ্ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন কোনরূপ প্রতীক ছাড়াই আমাদের চিন্তন সম্ভব হয়। আচরণবাদী (Behaviourist) ওয়াট্‌সন (Watson) ভাষাকে চিন্তার আচরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং তাকেই অনুশীলনের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থির করেছেন। কিন্তু, তাঁর এই ধারণা পরবর্তী কালে অনেক মনোবিদ ভুল বলে প্রমাণ করেছেন।

চিন্তন ও ভাষার সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য

যদিও ভাষা ও চিন্তন সমব্যাপক (Co-extensive) নয়, তবুও চিন্তন যে ভাষার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে, সে বিষয়ে বর্তমানে মনোবিদগণের কোন সন্দেহ নেই। তবে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমের কথা তাঁরা বলেছেন। তাই চিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমরা ব্যক্তিজীবনে ভাষার বিকাশের ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব। এই সম্পর্কে আমরা জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখ করেছি। তারই সার সংক্ষেপ এখানে একত্রে উল্লেখ করব। মনোবিদগণ ব্যক্তিজীবনে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভাষার বিকাশ

ভাষার বিকাশের **প্রথম স্তরে** শিশুরা কতকগুলো অক্ষর বা ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে। প্রথম প্রথম স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে পারে। পরে 'ম', 'ব' ইত্যাদি ব্যাঞ্জন ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করে। এই ভাষা শিক্ষা যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অনুবর্তনের দ্বারা হয়ে থাকে। এই সব ধ্বনিগুলো শিশুর কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন থাকে।

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুরা অনুকরণের (imitation) দ্বারা কিছু ধ্বনি ও শব্দ

উচ্চারণ করতে শিখে। এবং বিশেষ বিশেষ শব্দকে বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করে বলতে শিখে। কিন্তু অর্থবোধ তাদের হয় না। শুধুমাত্র অনুকরণমূলক পুনরাবৃত্তির দ্বারা তাদের এই সংযোগ স্থাপিত হয়। মা, বাবা, ইত্যাদি শব্দ গুলোকে বাবা, মায়ের সঙ্গে তারা সঠিকভাবে যুক্ত করতে পারে।

তৃতীয় স্তরে, শিশুদের অর্থবোধ আসে। এই সময়ে আশেপাশের সমস্ত বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে শিখে। তবে ক্রিয়া পদের (verb) ব্যবহার তারা তখনও করতে পারে না। ভাষার বিকাশের এই স্তরকে বলা হয় অর্থবোধের স্তর (stage of comprehension)।

চতুর্থ স্তরে, শিশুরা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয়। এবং ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তবে তার জন্য তারা বাক্য ব্যবহার করতে পারে না। বিচ্ছিন্ন 'শব্দ' দিয়ে তার যে সব জিনিস চাই তা বুঝানোর চেষ্টা করে। বড়রা যে সব কথা বলে, তার কিছু কিছু বোধ এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। ভাষা বিকাশের এই স্তরকে বলা হয় ভাষা সচেতনতার স্তর (Language sense stage)।

পঞ্চম স্তরে, শিশুরা বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া ও বিশেষণ পদের ব্যবহার করতে পারে। অন্যেরও অনেক বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য তারা বুঝতে পারে। এই স্তরে শুধুমাত্র ভাষার নির্দেশ দ্বারা তাকে যে কোন ধরনের কাজ করান যায়। এই স্তরকে বলা হয় বাক্য বলার স্তর (Sentence stage)।

ষষ্ঠ স্তরে, শিশু বিমূর্ত শব্দ (abstract word) ব্যবহার করতে শিখে এবং এই সব শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। যৌগিক বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় এবং বাক্যের মধ্যেও বিমূর্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারে। এই স্তরকে বলা হয় বিমূর্ত ভাষা বিকাশের স্তর (Stage of abstract Language)।

সব শেষ স্তরে, ভাষা সে পড়তে ও লিখতে শিখে। পড়া এবং লেখা শিখলে, তার ভাষা বিকাশ পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। এমনিভাবে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ভাষার বিকাশ হয়। ভাষার এই বিকাশের ধারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এবং এই অধ্যায়েও কিছু উল্লেখ করব।

চিন্তন ও বিচারকরণ
[Thought & Reasoning]

বিচারকরণকে চিন্তনের বাহন না বলে, চিন্তনের বিশেষ এক স্তর বলা যেতে পারে। উন্নত স্তরের চিন্তনকে অনেকে বিচারকরণ (Reasoning) হিসেবে বর্ণনা

করেছেন। তবে বিচারকরণকে চিন্তনের মাধ্যম, বিশেষ করে, উন্নত ধরনের চিন্তনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্পর্ক বা সম্বন্ধ স্থাপনই হ'ল বিচারকরণ। মনোবিদগণ মনে

চিন্তন ও বিচারকরণ

করেন মানুষের উন্নত ধরনের চিন্তনের প্রয়োজন হয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। এবং সমস্যা সমাধান মূলক চিন্তনের (Problem solving thinking) মাধ্যম হ'ল বিচারকরণ (Reasoning)। মনোবিদ **স্ট্যান্‌লী গ্রে** (Stanley Gray), বলেছেন, কার্যকারণ সম্পর্কের মানসিক প্রত্যাভিজ্ঞাই হ'ল বিচারকরণ।[1] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যেতে পারে, প্রাণী যখন এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার জন্য তার জন্মগত বা অর্জিত কৌশল নেই, তখন তার সামনে বিশেষ এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সে মূর্ত বস্তুর সাহায্যে বিশেষভাবে অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদির ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণমূলকস্তরে সমাধান করতে পারে। কিন্তু কোন কোন সময় এই সমস্যা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান আসে সমস্যামূলক পরিস্থিতির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। এই সম্পর্ক নির্ধারণ হয় প্রতীকের (Symbol) মাধ্যমে। **এই প্রতিকের মাধ্যমে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণের দ্বারা সমস্যা সমাধানের এই পদ্ধতিকেই বিচার-করণ (Reasoning) বলা হয়।** দার্শনিক-শিক্ষাবিদ্ **ডিউই** (Dewey) বলেছেন, আমাদের মনে যখন সংশয় বা বিশেষ কোন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন বিচারকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

এইভাবে বিচারকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এর দ্বারা আচরণ ধারার পরিবর্তন হয়। ফলে, একে এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়াও (Learning Process) বলা যেতে পারে। বিচারকরণের দ্বারা আমরা নতুন পরিস্থিতিতে অভিযোজন করতে পারি। এবং এই অভিযোজনের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা আমাদের আচরণ ধারার মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনি। গেস্টাল্ট মনোবিদগণ শিখনের ক্ষেত্রে এই দিকের উপরই

বিচারকরণ ও শিখন

বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন অন্তর্দৃষ্টি (Insight) বিচারকরণের (Reasoning) নামান্তর মাত্র। তবে বিচারকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে আমরা কোন ধারণার সঙ্গে অন্য কোন ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করি। সুতরাং অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা এখানে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ধারণ গঠন

---

1. "Reasoning the word used to describe the mental recognition of cause and—effect relationships."—J. Stanley Gray : Creative thinking, Reasoning, Problem-solving : Educational Psychol. (Skinner-ed)

(concept formation) না হলে এবং সেই ধারণাকে প্রত্যক্ষভাবে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে না পারলে, সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। এই ধারণাই হ'ল অতীত অভিজ্ঞতার উপাদান যা বিচারকরণে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা বা ধারণার (concept) সংখ্যা যত বেশী হবে, তত নির্ভুলভাবে সে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তাছাড়া এই নির্ভুলতা প্রয়োগ কুশলতার উপরও নির্ভরশীল। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকলে চলবে না, সার্থকভাবে তাকে প্রয়োগ করতে হবে সমস্যা সমাধানের জন্য। তাই বলা যেতে পারে, বিচারকরণ, অতীত অভিজ্ঞতার পরিমাণ এবং প্রয়োগ কুশলতা উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিচারকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতির বিভিন্ন স্তরকে বলা হয় বিচারকরণের সোপান (stages of reasoning)। দার্শনিক ডিউই, বিচারকরণের পাঁচটি সোপানের কথা বলেছেন।

বিচারকরণের বিভিন্ন সোপান

[এক] **সমস্যার উদ্ভব**—বিচারকরণ হয় সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে। সমস্যার উদ্ভব না হ'লে বিচারকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি অনুভব করে না। সাধারণ নিয়মে কাজ করতে করতে যেখানে সে গিয়ে তার অতীত অভিজ্ঞতার কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তির দ্বারা সে পরিস্থিতিকে আয়ত্বে আনতে পারে না, তখন সেই পরিস্থিতি তার কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সমস্যার এই উদ্ভব তাই বিচারকরণের প্রথম সোপান।

[দুই] **সমস্যার পর্যবেক্ষণ**—যেই মাত্র সমস্যার উদ্ভব হ'ল, ব্যক্তির তখন কাজ হ'ল সমাস্যাটার বিভিন্ন অংশ পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা। সমস্যার সমাধান বিশেষভাবে এই পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে।

[তিন] **তথ্যানুসন্ধান**—সমস্যার পর্যবেক্ষণের পর তার সমাধানের জন্য সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। এক এক করে বিভিন্ন সম্ভাব্য তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এর ফলে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা হয়।

[চার] **প্রকল্প গঠন**—তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত পায়, বা যে সম্ভাব্য সমাধান সে খুঁজে পায়, সেটিকে সে সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে। এই সাময়িকভাবে গৃহীত সম্ভাব্য সমাধানকে যা ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় প্রকল্প (Hypothesis)। এই প্রকল্পের উপর পরবর্তী স্তরের চিন্তন অগ্রসর হয়।

[পাঁচ] প্রয়োগ ও পরীক্ষণ—বিচারকরণের সব শেষ সোপানে, পূর্ববর্তী সোপানে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে প্রয়োগ করে দেখতে হয়। এই প্রয়োগ হয় মানসিক স্তরে প্রতীকের মাধ্যমে। যদি গৃহীত প্রকল্প প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তি সমস্যার সমাধান করতে পারে তা হ'লে, সেই প্রকল্পকে সে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করে। আর যদি দেখা যায় প্রকল্প প্রয়োগের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা যায় না, তা'হলে ব্যক্তি ঐ প্রকল্পকে ত্যাগ করবে এবং আবার অন্য প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং তাকে পরীক্ষা করে দেখবে।

বিচার করণের বিভিন্ন সোপানের ক্রমানুবিকাশ

[প্রথম পর্যায়—সমস্যার উদ্ভব] যে কোন একটা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা এই বিচারকরণের সোপানগুলো উপলব্ধি করতে পারি। ধরা যাক্, শ্রেণীতে ছাত্ররা গুণ করতে পারছে না। খুব যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও তারা প্রত্যেকটি অঙ্ক ভুল করছে। শিক্ষকের কাছে এটা একটা সমস্যা। তিনি ভাবছেন, সব রকম কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ছেলেরা কেন গুণ অঙ্কে ভুল করছে। এটা তাঁর কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করলো।

[দ্বিতীয় পর্যায়—সমস্যা পর্যবেক্ষণ] এই সমস্যা যেই শিক্ষকের সামনে দেখা দিল, তিনি সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হলেন। তাঁর প্রথম কাজ হবে, সমস্যাটাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা। এটাকে আমরা সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা বলতে পারি। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলেন, গুণ অঙ্কের মধ্যে কোথায় কোথায় তারা ভুল করছে।

[তৃতীয় পর্যায়—তথ্যানুসন্ধান] এর পর বিশ্লেষণ করে তিনি সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলেন। গুণ অঙ্ক করার জন্য কি কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। গুণ অঙ্ক করার জন্য নামতা জানার দরকার; যোগ জানার দরকার; সংখ্যার স্থান মূল্য সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার; শূন্যের গুণ সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার। অর্থাৎ, কোন কোন দিক থেকে ছাত্রদের গুণ অঙ্ক ভুল করার সম্ভাবনা আছে, তা অনুসন্ধান করে দেখলেন।

[চতুর্থ পর্যায়—প্রকল্প গঠন] এর পরবর্তী পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের প্রকৃত সম্পাদনার সঙ্গে তার এই সম্ভাব্য কারণগুলোকে একত্রে বিচার করে, তিনি সম্ভাব্য সামাধান সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন অঙ্ক সমাধানের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখবেন ঠিক কোথায় তারা ভুল করছে। এই তুলনামূলক বিচারে ধরা যাক তিনি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত করলেন, ছাত্রদের সংখ্যার স্থান মূল্য (Place value) সম্পর্কে ধারণা নেই বলে, তারা দশক এবং পরবর্তী উচ্চস্থানে গুণে ভুল করছে। এই যে তিনি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, একে বলা হয় প্রকল্প (Hypothesis)।

[পঞ্চম পর্যায়—প্রয়োগ ও পরীক্ষণ] সব শেষ স্তরে, শিক্ষক এই প্রকল্পের প্রয়োগ করেন। তিনি ছাত্রদের গুণের অন্যান্য অংশের উপর গুরুত্ব না দিয়ে, তাদের বিশেষ ভাবে সংখ্যার স্থান মূল্য (Place value) সম্পর্কে ধারণা দেন। পরে দেখেন, তাদের গুণ অঙ্কে ভুল হচ্ছে কি না। যদি দেখেন আর ছাত্রদের ভুল হচ্ছে না, তা'হলে বলতে হবে তিনি তাঁর সমস্যার সঠিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে। যদি দেখা যায়, তা সত্ত্বেও তার ছাত্ররা ভুল করছে, তখন তাঁকে আবার নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়, এবং তার প্রয়োগ ও পরীক্ষণ করতে হয়। এমনিভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।

বিচারকরণের আর এক পদ্ধতি হ'ল অনুমান (Inference)। অনুমান প্রক্রিয়ার দ্বারা অনেক সময় আমরা জানা কোন অভিজ্ঞতা থেকে অজানা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করি। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনেক সময় এরকম অজানা বস্তু সম্পর্কে অনুমান করে থাকি। যেমন, সকালে দরজা খুলে যদি দেখি, বারান্দায় পায়ের ছাপ, অন্যঘরের জানালা ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে, তা'হলে আমরা অনুমান করি রাতে চোর এসেছিল। অর্থাৎ, জানালা ভাঙা, পায়ের ছাপ ইত্যাদি ঘটনা জানা অভিজ্ঞতা; কিন্তু 'চোর আসার' ঘটনাটা নতুন। এই অনুমান (Inference) দু'রকমের হতে পারে—**আরোহ** (Inductive) এবং **অবরোহ** (Deductive)। কয়েকটা তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তের অনুমানকে বলা হয় আরোহ বিচারকরণ (Inductive reasoning)। যেমন আমরা চোর সম্পর্কে অনুমান করলাম। আবার অনেক সময় সাধারণ কোন ধারণা থেকে আমরা বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনুমান করি, এই ধরনের অনুমানের দ্বারা বিচারকরণকে বলা হয় **অবরোহ** বিচারকরণ (Deductive reasoning)। যেমন, আমরা বলি, "তিনটি বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে বলা হয় ত্রিভুজ; ABC একটি তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্র; সুতরাং ABC একটি ত্রিভুজ"। এইভাবে বিচারকরণকে বলা হয় অবরোহ বিচারকরণ (Deductive reasoning)।

অনুমান

মনোবিদগণ বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন, বিচারকরণ উন্নত ধরনের চিন্তন প্রক্রিয়ার কৌশল। সুতরাং যথাযোগ্য মানসিক পরিমনন হলে বিচারকরণ সম্ভব নয়। ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিমনন অনেক বেশী বয়সে হয়। তাই বলে, একথা বলা যায় না যে পরিণত বয়স ছাড়া বিচারকরণ সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে আট-নয় বৎসর বয়স থেকে বিচার করণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও তার এই বয়সে বিচারকরণ সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন হয় না; কারণ ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিমনন ছাড়াও অতীত অভিজ্ঞতার পরিমাণও কম থাকে।

আলোচনা

চিন্তন ও শিক্ষা
[Thinking & Education]

শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তনের গুরুত্বের কথা প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাবিদ্ প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন। শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের নিরপেক্ষ চিন্তনের বিকাশ করা। কারণ ভবিষ্যৎ জীবনের যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে হলে, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হলে, নিরপেক্ষ চিন্তন একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই শিক্ষা দ্বারা যদি একটা মাত্র মানসিক বৈশিষ্ট্যের আমরা বিকাশ চাই, তা'হলে চিন্তনকে প্রথম স্থান দিতে হবে। এখন শিক্ষার দ্বারা যেমন, চিন্তনের বিকাশ করা যায়, অন্যদিকে শিক্ষার জন্যও চিন্তনের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে আমরা যে সব বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের পড়তে দিই তার বেশীর ভাগই বিমূর্ত (abstract) প্রকৃতির। সুতরাং, ঐ বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে চিন্তন প্রক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তনের গুরুত্ব দু'দিক থেকে—**প্রথমতঃ**, চিন্তন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে, শিখনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা এবং বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। **দ্বিতীয়তঃ**, শিক্ষার দ্বারা, শিক্ষার্থীদের চিন্তনের বিকাশ করতে হবে, যাতে তারা পরবর্তী জীবনে স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং, চিন্তনের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শিক্ষককে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে হবে। কি কি তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক কাজ করবেন, সে সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব।

চিন্তন ও শিক্ষা

॥ **প্রথমতঃ** ॥ আমরা জানি চিন্তন ভাবমূর্তির (Image) মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং, শিক্ষার্থীরা যাতে ভাবমূর্তি গঠনে সক্ষম হয়, সে দিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের মূর্ত বস্তুর সাহায্যে প্রথম বিমূর্ত জ্ঞানকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিতি থেকেই তার মানসিক প্রতিচ্ছবি গঠন করা সম্ভব হবে। যখন শিক্ষক মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন, তখন তার বিভিন্ন দিকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন। এর ফলে তাদের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে। পর্যবেক্ষণ যত নিখুঁত হবে, ভাবমূর্তিও নিখুঁত হবে এবং তার ফলে চিন্তনও নির্ভুল হবে। যে সব ক্ষেত্রে, পাঠ্য বিষয়বস্তুকে মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় না, সেখানে, বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতে না পারলে তাদের যথাযোগ্য ভাবমূর্তি বা কল্প (Image) গঠিত হবে না। ভাবমূর্তি গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকের আর একদিক থেকে দায়িত্ব আছে। ভাবমূর্তি

ভাবমূর্তি গঠন ও শিক্ষকের দায়িত্ব

গঠনের দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ভাবমূর্তি, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এবং দেখা গেছে, এক একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে এক একটি ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে ভাবমূর্তি গঠনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের এক্ষেত্রে কর্তব্য হবে, যে ছাত্র যে ভাবে, ভাবমূর্তি গঠন করতে পারে, তার কাছে সেই মত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে তাদের চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ সহজতর হবে।

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ চিন্তনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল সাধারণ ধারণা (concept)। এই ধারণার বিকাশও বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ধারণা গঠনের জন্য যে বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণের দরকার হয়, শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক যদি ঐ ধরনের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশ করতে না পারেন তা'হলে তাদের চিন্তনের বিকাশ হবে না। ধারণা গঠনের জন্য প্রথমতঃ সবজাতীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলনামূলকভাবে দেখার দরকার। কোন সাধারণ জ্ঞান বা সাধারণসূত্র স্থাপনের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্য নেন এবং তাদের বিশ্লেষণ করে বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন তা'হলে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ধারণা জন্মে। এইভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই রকম বৈশিষ্ট্যের অবস্থান দেখে, শিক্ষার্থীরা সামান্যীকরণ (generalization) করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন ধরনের গাণিতক সূত্র, বৈজ্ঞানিক তথ্য, ব্যাকরণের সূত্র ইত্যাদি প্রতিস্থাপনে এই রকম পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ধারণা গঠনের ক্ষমতা ব্যক্তির জন্মগত সাধারণ মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও, তা কৌশল সাপেক্ষ। সুতরাং, চর্চ্চার দ্বারা শিক্ষার্থীদের এই কৌশল আয়ত্তে সহায়তা করা সম্ভব। তাই শিক্ষক সব সময় এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে নতুন পরিস্থিতিতে কি ভাবে সাধারণ সূত্র গঠন করতে হবে তার কৌশল তারা ধীরে ধীরে আয়ত্ব করবে এবং তাতে তারা অভ্যস্ত হবে।

ধারণার বিকাশ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ চিন্তনের প্রধান উপাদান হ'ল প্রতীক। অন্যদিকে শিক্ষারও মাধ্যম হ'ল প্রতীক বা ভাষা। সুতরাং, শিক্ষার দ্বারা ভাষার বিকাশ করতে না পারলে, শিক্ষার্থীদের চিন্তনেরও বিকাশ হবে না। আমরা জানি শিশুর অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের মত ভাষা বিকাশেরও বিভিন্ন স্তর আছে। শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশ করতে হলে শিক্ষককে এই স্তরগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমানুসারে অগ্রসর হতে হবে। ভাষা শিক্ষার্থীকে অন্যের মনের ভাব বুঝতে সহায়তা করে ; ভাষা শিক্ষার্থীকে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে সহায়তা করে ; ভাষা, শিক্ষার্থীকে মানব সমাজের জ্ঞানের

ভাষার বিকাশ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

ভাণ্ডারকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর ভাষায় বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষককে এই তিন দিকের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারা যে কোন পরিস্থিতিতে, যাতে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যের ধারণা সম্পর্কে জানতে পারে, সে ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিকাশ করতে হবে। নিজেদের মনের ভাবও তারা যাতে অন্যের কাছে সুষ্ঠুভাবে ভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সবশেষে, ভাষা শিক্ষার দ্বারা মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে সে যাতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে সে বিষয়েও শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে। ভাষা ছাড়াও আমরা আরও অনেক প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। গণিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যবহার করি। ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক (digit) গুলোও এক ধরনের সংকেত। অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্রের সাহায্যে তথ্য পরিবেশন করি, এই সব ধরনের প্রতীক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে। কারণ, এই সব সংকেত বা প্রতীক সম্পর্কে তাদের যদি যথার্থ ধারণা না থাকে, তা'হলে তারা দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যাই সমাধান করতে পারবে না। এমনকি, প্রত্যক্ষ অনেক সমস্যার তাৎপর্যই তারা উপলব্ধি করতে পারবে না।

সবশেষে, শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিচারকরণের বিকাশ করতে না পারলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। উপযুক্ত বিচারকরণের ক্ষমতা উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক। তা'ছাড়া, বিচারকরণ দ্বারাই জীবনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করে, কি ভাবে তার সমাধানে পৌঁছানো যায় তার প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। প্রজেক্ট পদ্ধতি (project method), সমস্যা সমাধানমূলক (problem method) ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষা দিলে, শিক্ষার্থীদের বিচারকরণের ক্ষমতার বিকাশ হয়। বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করে, শিক্ষক যদি তাদের সহায়তায় বিভিন্ন সোপানে তা সমাধানের চেষ্টা করেন, তা'হলে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হয়। এবং এই আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ করতে পারলে, তা পরবর্তী জীবনে তাদের নিরপেক্ষ চিন্তনে সহায়তা করবে, এবং তাদের জীবনোপযোগী করে গড়ে তুলবে।

বিচারকরণ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

প্রশ্নাবলী

1. What is an image ? Discuss the relation between image and thinking. [পৃঃ ১৬২-১৬৫]
2. Difine concept. Discuss the various steps of concept formation and its role in the thinking life of man. [পৃঃ ১৬৫-১৬৯]

3. What is meant by thinking? Discuss the role of the school in developing the thinking life of the school children.
[পৃঃ ১৫৯-১৬২ ; ১৭৭-১৭৯]

4. Discuss the relation between language and thought. How does language develops in school children? Discuss the teachers role in this respect.
[পৃঃ ১৬৯-১৭২]

5. What is reasoning. Describe the development of reasoning in children.
[পৃঃ ১৭২-১৭৬]

6. Write notes on the following :
   (a) Image. [পৃঃ ১৬২-১৬৫]
   (b) Language and thought. [পৃঃ ১৬৯-১৭২]
   (c) Concept formation. [পৃঃ ১৬৫-১৬৯]
   (d) Reasoning. [পৃঃ ১৭২-১৭৬]
   (e) Inference [পৃঃ ১৭৬]

সপ্তম অধ্যায়

মনযোগ ও অনুরাগ

[ATTENTION & INTEREST]

আমরা সাধারণ অর্থে মনোযোগ কথাটাকে এমনভাবে ব্যবহার করি যাতে মনে হয় এটা যেন মনের একটি গুণ। প্রাচীনকালে, মানসিক শক্তিতে (Mental faculty) বিশ্বাসী মনোবিদ্‌গণ এই অর্থেই মনোযোগ কথাটা ব্যবহার করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল মন কতকগুলো ক্ষমতার সমষ্টি। স্মরণ ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ইত্যাদির মত মনোযোগও এক ধরনের ক্ষমতা। এবং অনুশীলনের দ্বারা এর বিকাশ করা সম্ভব। কিন্তু পরবর্তীকালে, মনোবিদ্‌গণ মানসিক শক্তিবাদকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছেন। সুতরাং সেই সঙ্গে মনোযোগের এই ধারণাকেও বর্জন করা্ হয়েছে। কিন্তু মনোযোগ কি তা সঠিকভাবে বলাও খুব মুশকিল। বিখ্যাত ফরাসী মনোবিদ রিবোঁ (Ribot) বলেছেন, অনুভূতির প্রকাশমূলক দিক হ'ল মনোযোগ (Emotive process translated into action)। কিন্তু মনোযোগ বলতে আমরা প্রক্ষোভমূলক আচরণকে (Emotional behaviour) বুঝি না। মনোযোগ আচরণ নয়। মনোযোগ যেমন মনের গুণ নয়; তেমনি বাহ্যিক আচরণ নয়। অনেক মনোবিদ্ মনোযোগকে সংবেদনের তীব্রতা (intensification of sensory impression) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু, আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনোযোগকে মনের একটা ক্রিয়া বা তাকে মনোযোগ প্রক্রিয়া (act of attending) হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মনোযোগ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা

সাধারণভাবে মনোযোগ বলতে আমরা বুঝি, মনকে একান্তভাবে যুক্ত করা। সাধারণতঃ 'মনোনিবেশ' কথাটাকে সমর্থক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ, মনোযোগ বলতে, কোন বস্তু সম্পর্কে একান্তভাবে সচেতন হওয়াকে বুঝি। কিন্তু শুধুমাত্র সচেতনতাই মনোযোগ নয়। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ প্রত্যেকেই মনোযোগের ক্রিয়াশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে তাঁরা তার সচেতনতার দিককে উপেক্ষা করেন নি। মনোবিদ্ **ম্যাক্‌ডুগাল** (Mc. Dougall)[1] বলেন, যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই হ'ল মনোযোগ। মনোবিদ **স্টাউটও** (Stout) একই ভাবে

মনোযোগের আধুনিক সংজ্ঞা

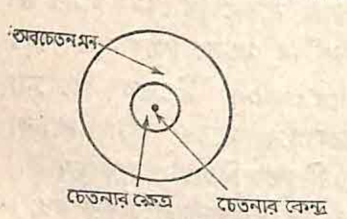
1. Attention is merely conation or striving considered from the point of view of its effects on cognitive process"—Mc Dougall. An out line of psychology.

মনোযোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার পেছনে যে মানসিক সক্রিয়তা কাজ করে তাই মনোযোগ (Attention is conation determining cognition)। এই মানসিক সক্রিয়তা (Conation) যত বেশী হবে মনোযোগও তত তীব্র হবে। এই ধরনের বহু সংজ্ঞা মনোবিদ্‌গণ দিয়েছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞা থেকে তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয় না। তাছাড়া লক্ষ্য করা গেছে, কোন সংজ্ঞার মধ্যেই মনোযোগ প্রক্রিয়ার সব বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। সুতরাং, এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হলে তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করার দরকার।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য
[Characteristics of Attention]

॥ এক ॥ আধুনিক মনোবিদ্‌গণ এ বিষয়ে একমত যে মনোযোগ (Attention) মনের একটা কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া (Central process)। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়ার ফলে উদ্দিষ্ট বস্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্র স্থলে উপস্থাপিত হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী মনের বিভিন্ন স্তরকে দুটো এক কেন্দ্রীয় বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যার বাইরের বড় অংশটা হ’ল অবচেতন মন (Unconscious mind) আর কেন্দ্রটা হ’ল চেতন মনের কেন্দ্রস্থল (Core of consciousness)। আর,

মনোযোগের কেন্দ্রানুগতা



ভেতরের ছোট বৃত্তটা হ’ল চেতনার বিস্তৃতি। অর্থাৎ, ঐ ক্ষেত্রে অন্তর্গত যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন। কিন্তু ঐ চেতনায় উপস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন একটা সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন। ঐ বস্তু তখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে। এই অবস্থায় আমরা বলি, ঐ বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগী। সুতরাং, মনোযোগের একটা বৈশিষ্ট্য হ’ল যে **এই প্রক্রিয়ার ফলে কোন বিশেষ প্রত্যক্ষণের বস্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত হয়।** ফলে এই বস্তু সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন হই। মনোবিদ্ **টিচেনার** (Titchner)[1], মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন, চেতনার যে স্তরে আমরা বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করি তাই মনোযোগ। মানুষের জ্ঞানমূলক প্রচেষ্টায় সহায়তা করাই হ’ল মনোযোগের কাজ। বস্তু সম্পর্কে সচেতনতার

1. Titchner—The psychology of feeling and attention.

তারতম্য ভেদে, টিচেনার তাই মনোযোগকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন—কেন্দ্রীয় মনোযোগ (Focal attention) এবং প্রান্তীয় মনোযোগ (Peripherial or Marginal attention)। তবে এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ আধুনিক মনোবিদ্ পরিত্যাগ করেছেন।

॥ **দুই** ॥ মনোযোগের প্রথম বৈশিষ্ট্য থেকে লক্ষ্য করা গেল, চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে আমরা কেন্দ্র স্থলে উপস্থাপিত করি। অর্থাৎ, চেতন মনে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন বিশেষ মুহূর্তে আমরা বিশেষ একটা অংশের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি। সুতরাং, মনোযোগ প্রক্রিয়ায় বস্তু নির্বাচন (selection) একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিপরীত ক্রমে, মনোযোগের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল তার নির্বাচনী ক্ষমতা (Selective capacity)। এখন, এই বস্তু নির্বাচন দু'ভাবে হতে পারে। বিভিন্ন বস্তু, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য তার নির্বাচনে আমাদের বাধ্য করে, এবং চেতনার কেন্দ্রে স্থান করে নেয়; অথবা, আমরা কোন আন্তরিক চাহিদার দরুন অনেক সময় বস্তু নির্বাচন করে থাকি। এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনেকে মনোযোগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—**ঐচ্ছিক মনোযোগ** (Voluntary attention) এবং **অনৈচ্ছিক মনোযোগ** (Non-Voluntary attention)। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে **ড্রিভার** (Drever), **স্টাউট** (Stout) ইত্যাদি মনোবিদ্ বলেছেন, মনোযোগের মধ্যে পরিত্যাগ (Rejection) এবং নির্বাচন (Selection) দুই প্রক্রিয়াই বর্তমান। কিন্তু, পরিত্যাগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। অন্য দিকে তাই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আমরা অবশ্যম্ভাবী হিসেবে বিবেচনা করি। মনোবিদ **ফ্লেচার** (Fletcher)[1] তাই মনোযোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার এই দিকটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মনোযোগের নির্বাচনী ক্ষমতা

॥ **তিন** ॥ মনোযোগের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এর মধ্যে দু'টো মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। মনোযোগের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। আমরা যখন কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই তখন তার সমস্ত রকম দোষ-গুণ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, আমরা বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখি। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক (analytical) সংবেদনের মাধ্যমে

মনোযোগ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়া

1. "Attention represents a selection or singling out of certain aspects of the observable environment to the exclusion of others which may at the time be impinging upon the sease organs"—Fletcher.

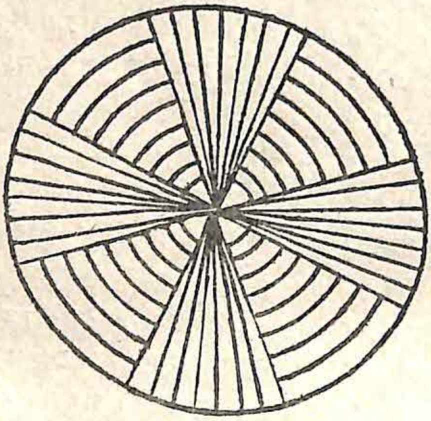
—Educ. Psychol. [Skinner Ed.]

বস্তুমুখী জ্ঞান আমাদের হয় না। বস্তুধর্মী জ্ঞান একক এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আসে। তাই মনোযোগেই বস্তু যখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে তখনই আমরা তার সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাকে সংশ্লেষণ (synthesis) করি। এই সংশ্লেষণের মাধ্যমেই সামগ্রিক একক বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে থাকি। এই কারণে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনে করেন মনোযোগের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক (analytical) এবং সংশ্লেষণাত্মক (synhetic) প্রক্রিয়া উভয়েই কাজ করে। আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিলে, তার দৈহিক বিভিন্ন অংশগুলো আমাদের চোখে পড়ে; কিন্তু একই সঙ্গে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের একটা সামগ্রিক ধারণা জন্মে।

॥ **চার** ॥ মনোযোগ কোন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে খুব বেশী সময় স্থির থাকতে পারে না; সব সময় এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় পরিবর্তনশীলতা (shift of attention)।

মনোযোগের পরিবর্তন

কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে লক্ষ্য করা গেছে, কিছু সময় অন্তর তার পার্শ্ববর্তী অন্যবস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ চলে যায়। অর্থাৎ, আমাদের পরিপূর্ণ মানসিক ইচ্ছা (will) সত্বেও আমরা কোন বস্তুকে ইচ্ছামত চেতনার কেন্দ্র স্থলে ধরে রাখতে



পারি না। স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে অন্য বস্তু স্থানান্তরিত করে। উপরে ছবিতে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। আমরা যদি লম্বালম্বি দাগ টানা অংশটার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করা যাবে আমাদের মনোযোগ অন্য অংশটার প্রতি চলে যাবে। মনোযোগের এই প্রকৃতিকে পরিবর্তনশীলতা (shifting of attention) বলা হয়ে থাকে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, গড়ে প্রায় দু' সেকেণ্ড অন্তর এই

পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে এর তাৎপর্য এই নয় যে সাধারণ জীবনে আমরা কোন বস্তুর প্রতি দুই সেকেণ্ডের বেশী মনোযোগ দিতে পারি না। এই পরিবর্তনশীলতা অন্যান্য বস্তুগত ও ব্যক্তিগত অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তা'ছাড়া, বিশুদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করছি, দৈনন্দিন জীবনে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না। কেবলমাত্র সম্পূর্ণভাবে বিষয়ান্তর হ'লে এই পরিবর্তনকে আমরা বুঝতে পারি।

॥ পাঁচ ॥ মনোযোগের আর এক ধরনের পরিবর্তনের কথা মনোবিদ্‌গণ বলেছেন। অনেক সময় উদ্দীপক থাকা সত্ত্বেও, আমরা তার থেকে উত্তেজনা গ্রহণ করতে পারি না। কানের কাছে একটা হাত ঘড়ি ধরলে তার ক্ষীণ টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যায়। আমরা যদি ঐ শব্দের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করি, তা'হলেও দেখা যাবে কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আবার কিছু পরেই শব্দটা কানে ধরা পড়ছে। এক্ষেত্রে, উদ্দীপক সব সময়েই বর্তমান থাকে; কিন্তু কখনও তার সংবেদন (sensation) হচ্ছে কখনও আবার হচ্ছে না। এর সদুত্তর দেওয়ার জন্য মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, আসলে মনোযোগেরই পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যকে মনোবিদ্‌গণ বলেছেন চঞ্চলতা (fluctuation of attention)। একে আমরা সংবেদনগত পরিবর্তনশীলতা বলতে পারি। উদ্দীপকের উদ্দিপনা শক্তি যত ক্ষীণ হবে, এই চঞ্চলতার পরিমাণও তত বাড়বে। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে তাকে একটা তরঙ্গের (wave) সঙ্গে তুলনা করেছেন। তরঙ্গের যেমন একটা উর্দ্ধগতি (positive phase) এবং একটা নিম্নগতি (Negative phase) আছে, তেমনি মনোযোগ প্রক্রিয়াও এই দু'টো পর্যায়ের মধ্যে পরিবর্তনশীল। পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে মনোযোগের এই তরঙ্গের সময়কাল, আট থেকে আঠারো সেকেণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মনোযোগের চঞ্চলতা

॥ ছয় ॥ বস্তুধর্মী জ্ঞান আহরণের এই সক্রিয়তা ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ। আমরা ইচ্ছা করলেই যত ইচ্ছা বস্তুর উপর মনোযোগ দিতে পারি না। এর কারণ, একত্রে অনেক বস্তুকে আমরা চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত করতে পারি না। ব্যক্তিগত এই সীমাকে বলা হয় মনোযোগের পরিসর (Span of attention)। মনোযোগের পরিসর পরিমাপ করার জন্য মনোবিদ্‌গণ আজকাল ট্যাচিস্‌টোস্কোপ (Tachistoscope) নামে এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, সাধারণভাবে স্বাভাবিক মানুষের মনোযোগের পরিসর চার থেকে পাঁচ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, একক সময়ে আমরা চার বা পাঁচ একক বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারি।

মনোযোগের পরিসর

এছাড়াও, মনোবিদ্‌গণ মনোযোগ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গেলে, তাত্ত্বিক আলোচনার কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। তাই সেই বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত রেখে, তার শিক্ষাগত তাৎপর্যপূর্ণ দিক গুলোরই উল্লেখ করলাম। আর আমাদের কাজের সুবিধার জন্য তাত্ত্বিক আলোচনাকে যেমন বাদ দিয়েছি, তার তাত্ত্বিক সংজ্ঞাগুলোকেও পরিত্যাগ করা ভাল। কারণ মনোযোগের সংজ্ঞা কি তা নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। তাই আমাদের এই আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ মনোযোগের এক কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি। **পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে মনোযোগ এমন এক পরিবর্তনশীল সদাচঞ্চল সচেতন প্রক্রিয়া যা নির্বাচিত বস্তুর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে একক বস্তুধর্মী জ্ঞান আহরণে আমাদের সহায়তা করে।**

মনোযোগের কার্যকরী সংজ্ঞা

মনোযোগের দৈহিক অনুষঙ্গ
[Physiological accompaniment of Attention]

টিচেনার বলেছেন মনোযোগের পেছনে একটা প্রস্তুতিপর্ব (attentive-set) আছে। এই প্রস্তুতি যে শুধুমাত্র মানসিক প্রস্তুতি তা নয়। দৈহিক এবং মানসিক উভয় রকম প্রস্তুতিই মনোযোগের পেছনে ক্রিয়াশীল। মনোযোগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কতকগুলো দৈহিক বৈশিষ্ট্য আছে। একে বলা হয় মনোযোগের দৈহিক অনুষঙ্গ। আধুনিক মনোবিদ্ মান্ (N. L. Munn) এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

মনোযোগের দৈহিক পরিবর্তন

[**প্রথমতঃ**] মনোযোগের সময় দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযত কাঠিন্য লক্ষ্য করা যায়। যখন, আমরা সিনেমায় কোন যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে থাকি, বা, খেলার মাঠে গোলের মুখে যখন বল আসে, তখন রুদ্ধশ্বাসে দেহের সব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে সেদিকে মনোযোগ দিই। মনোবিদ্‌গণ কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, মনোযোগ দেওয়ার দরুন, এই ধরনের দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার প্রত্যেক অংশের প্রতি আমরা তীব্র মনোযোগ দিই, ফলে, দৈহিক স্বতঃশ্চল ক্রিয়াগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ হ'য়ে যায়।

[**দ্বিতীয়তঃ**] পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ এবং কান মনোযোগের সময় বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। যখন কোন স্বাদ,

গন্ধ বা স্পর্শানুভূতির প্রতি মনোযোগ দিই তখনও যেন চোখ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। কিন্তু পেশীয় স্থবিরতা যা বিশেষভাবে প্রস্তুতি মুহূর্তে লক্ষ্য করা যায়, তা পর মুহূর্তে খুব বেশী পরিমাণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসা কোন কান্নার শব্দে, প্রথমে আমরা থমকে দাঁড়াই, তারপর আমরা তার উৎস সন্ধানে বেগবান হই। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, মনোযোগে শক্তির সঞ্চয়ন (Conservation of energy), এবং শক্তির বিমুক্তন (Release of energy) উভয় প্রক্রিয়াই ক্রিয়াশীল হয়। প্রস্তুতিপর্বে আড়ষ্টতার মূলে আছে, অস্বস্তি (tension), আর পরবর্তী পর্যায়ে শক্তির বিমুক্তনের মূলে আছে, স্নায়বিক শক্তির মুক্তি গতি বিচরণ। যখন, এই গতিশীল ধারা ব্যক্তিকে সাফল্যে পৌঁছে দেয় তখন আনন্দানুভূতি (Pleasure) দেখা দেয়। আবার, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে আসে অবসাদ (Fatigue)।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ মনোযোগের আনুষঙ্গিক দৈহিক পরিবর্তনগুলো, নিছক আবর্তিত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) নয়। যেহেতু, মনোযোগ মনের সচেতন প্রক্রিয়া, তার সঙ্গে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকি। এই সব দৈহিক পরিবর্তন, আমাদের বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, এই সব দৈহিক পরিবর্তন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system) দ্বারা পরিচালিত, এবং এই সব ক্রিয়ার পেছনে মস্তিষ্কের সব প্রয়োজনীয় অংশকে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এমনকি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যে মানুষের দেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (endocrine glands) গুলোও বিশেষভাবে কার্যকরী হয় মনোযোগের সময়। সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মনোযোগ প্রক্রিয়া প্রভাবে আমাদের সংবেদনগত পরিবর্তন (Sensory change), পেশীর কাজের পরিবর্তন (Motor changes) এবং গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন (Glandular changes) হ'য়ে থাকে। এবং এই বিশেষ ধরনের দৈহিক পরিবর্তন গুলোকে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনোযোগের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ঠিক প্রক্ষোভমূলক আচরণের মত এগুলোকেও মনোযোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রকাশ পায়।

মনোযোগ ও অমনোযোগ
[Attention and Inattention]

সাধারণভাবে মনোযোগ (attention) এবং অমনোযোগ (inattention) এই দুটো কথাকে আমরা বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যে সব শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার সময় একাগ্রতা দেখায়, তাদের আমরা বলি মনোযোগী,

আর যাদের পড়াশুনার সময় এই একাগ্রতার অভাব দেখা যায়, তাদের অমনোযোগী বলা হয়। এই সব শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী বলে তিরস্কার করি। কিন্তু অমনোযোগ (inattention) এই শব্দের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। মনোযোগে, বিষয়বস্তু চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; চেতনা বস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু, অমনোযোগে চেতনা বস্তু থেকে অন্যবস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকে অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত। তাই এই অবস্থাকে মনোযোগহীনতার অবস্থা হিসেবে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা যায় না। কারণ, কোন বিশেষ বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ নেই বলে, ব্যক্তি মনোযোগহীন একথা বলা যায় না। সাধারণতঃ দেখা গেছে, যে শিক্ষার্থীর বিশেষ মুহূর্তে শিক্ষকের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য বিষয়বস্তুর প্রতি তার মনোযোগ আছে। তাই অমনোযোগ, মনোযোগ শূন্যতা নয়; বিষয়ান্তরে মনোযোগ।

সাধারণ অর্থে অমনোযোগ কি ?

তা'ছাড়া মনোযোগের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, দেখা যায় মনোযোগ এবং অমনোযোগ বিপরীতধর্মী নয়ই বরং তারা একই মানসিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ব প্রকৃতির অনেক বস্তুই একই সঙ্গে আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে (range of consciousness) সঙ্গে উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু, তাদের মধ্যে যেটা চেতনার কেন্দ্রে উপস্থাপিত হয়েছে, তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই। কোন বিশেষ মুহূর্তে চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অংশের উপর মনোযোগ আকৃষ্ট, বাকী অংশের সঙ্গে চেতনা সক্রিয়ভাবে যুক্ত নয়। তবে চেতনার ক্ষেত্রের এই সব বস্তুরই প্রতি আমরা অমনোযোগী। অনেকে একে বলেছেন প্রান্তীয় মনোযোগ (marginal attention)। এই কারণে অমনোযোগকে মনোযোগের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা যায় না। বরং এদের একই প্রক্রিয়ার দু'টো অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। চেতনার কেন্দ্রের বাইরে যে সব বস্তু আছে, যে কোন মুহূর্তে তাদের কেন্দ্রস্থলে আসার সমান সম্ভাবনা আছে। তাই অমনোযোগের ক্ষেত্রও আমাদের মনোযোগকে প্রভাবিত করে। অমনোযোগ তাই একেবারে মূল্যহীন নয়, পরবর্তী মনোযোগের বস্তুকে নির্ধারণে তা সব সময় সহায়তা করে।

অমনোযোগের তাৎপর্য

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ [Classification of Attention]

বিভিন্ন মনোবিদ্ মানুষের মনোযোগ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে মনোযোগকে

শ্রেণী বিভাগ করেছেন। এর পূর্বেও আমরা এই শ্রেণী বিভাগের কয়েকটা সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। কেউ বলেছেন মনোযোগ দু'রকমের—**কেন্দ্রীয় মনোযোগ** (Focal) এবং **প্রান্তীয় মনোযোগ** (Marginal)। আবার কেউ বলেছেন, **ঐচ্ছিক** (Voluntary) এবং **অনৈচ্ছিক** (Non-valuntary)। আরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যেমন—বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ (Analytical attention) এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ (Synthetic attention)। এ সম্পর্কে মনোবিদ্ **রস্** (Ross) যে মতবাদ প্রচার করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ

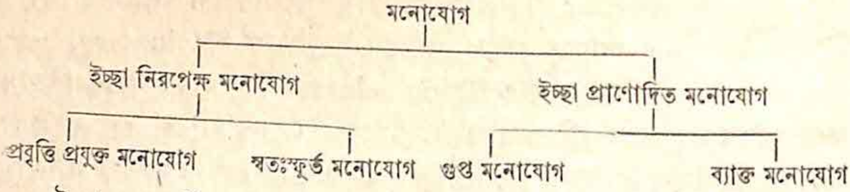
রস (Ross) **প্রথমতঃ** মনোযোগকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যে মনোযোগ মানুষের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না; কেবল মাত্র চিরস্থায়ী মানসিক সংগঠনের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রস বলেছেন, **ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ** (Non volitional attention)। ক্ষুধার তাগিদে আমরা যে খাদ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই তা ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত নয়। জৈবিক তাগিদ নিয়ন্ত্রিত বা জৈব মানসিক সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ধরনের মনোযোগকেই রস (Ross), ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ বলেছেন। অন্যদিকে মনোযোগ যখন আমাদের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাকে বলা হয় **ইচ্ছা প্রাণোদিত মনোযোগ** (Volitional attention)। অর্থাৎ, বিশেষ মানসিক ইচ্ছা বা প্রেষণার তাড়নায় কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় ইচ্ছা প্রাণোদিত মনোযোগ।

ইচ্ছা নিরপেক্ষ ও ইচ্ছা প্রাণোদিত মনোযোগ

রস, ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগকে (non-volitional attention) আবার, দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যখন মনোযোগ বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তির (Instinct) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন তাকে বলা হয় **প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ** (enforced attention)। অর্থাৎ জন্মগত জৈব-মানসিক প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনোযোগকে, এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষুধার প্রবৃত্তির তাড়নায় খাদ্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, বাৎসল্যের প্রবৃত্তির তাড়নায়, শিশুদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, এই শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্মগত প্রবণতার সমন্বয়ের ফলে, নতুন ধরনের জৈব মানসিক সংগঠন তৈরী হয়। এই জৈব-মানসিক সংগঠনকে বলা হয় **সেণ্টিমেণ্ট** (Sentiment)। এই সব সেন্টিমেন্টের দ্বারা যে সব মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রস্ বলেছেন **স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ** (Spontaneous attention)। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্টের বিকাশ হ'লে, সেই ব্যক্তির বর্তমানে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিই। দেশের প্রতি সেন্টিমেন্টের গড়ে ওঠার জন্য, বিদেশে গেলে, দেশ সংক্রান্ত কোন

প্রবৃত্তি প্রযুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ

বস্তু বা আলোচনার প্রতি আমাদের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যায়। এই গুলোকেই বলা হয় **স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ**।



গুপ্ত ও ব্যাক্ত মনোযোগ

ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগকেও রস দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যখন, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য একক ইচ্ছার প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় **গুপ্ত মনোযোগ** (implicit attention)। আবার, কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য বারবার আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে প্রয়োগ করতে হয়, তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় **ব্যাক্ত মনোযোগ** (Explicit Attention)। অর্থাৎ, সামান্য ইচ্ছার দ্বারা আমরা কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারি, বা বার বার ইচ্ছা শক্তিতে প্রয়োগ করে অনেক সময় বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। ইচ্ছা শক্তির তীব্রতার পার্থক্যের দিক থেকে মনোযোগের এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। রসের (Ross) এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মনোযোগ চার রকমের—[এক] **ইচ্ছা-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ** (Non volitional enforced attention), [দুই] **ইচ্ছা নিরপেক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ** (Non-Volitional spontaneous attention), [তিন] **ইচ্ছা প্রাণোদিত গুপ্ত মনোযোগ** (Volitional implict attention) এবং [চার] **ইচ্ছা প্রাণোদিত ব্যাক্ত মনোযোগ** (Volitional explicit attention)।

মনোযোগের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

এছাড়াও, মনোযোগকে শ্রেণী বিভাগ করার আরও নানা রকম রীতি আধুনিক মনোবিদ্গণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির মনোযোগের প্রকৃতিকে মনোবিদ্গণ তার তীব্রতার ও স্থায়িত্বের প্রকৃতির দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। অনেক সময় আমরা কোন বিষয়ের প্রতি এত গভীরভাবে মনোযোগ দিই, যে অন্য কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে একেবারে সচেতন থাকি না। দার্শনিকগণ যখন কোন বিশেষ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন তখন কোন কোন চিন্তা তার সেই চিন্তা স্রোতকে ব্যাহত করতে পারে না। বিষয়বস্তুর প্রতি এই মনোযোগকে বলা হয় গভীর মনোযোগ (Intensive attention)। আবার, অনেক সময় আমরা একই সঙ্গে বহু বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিই, কিন্তু কোনটার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিই না। এই ধরনের মনোযোগকে বলা হয় বিতরিত

মনোযোগ (Distributed attention)। আর এক দিক থেকেও মনোযোগকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন—**ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোযোগ** (Sensorial attention) এবং **বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোযোগ** (Intellectual attention)। যখন কোন বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তার প্রতি মনোযোগ দিই, তখন তাকে বলা হয় **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোযোগ**। আবার, আমরা যখন চিন্তার বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই, তখন তাকে বলা হয় **বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোযোগ**। এই ধরনের শ্রেণী বিভাগ আধুনিক মনোবিদ্‌গণের দেওয়া হ'লেও মনোযোগের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এগুলো করা হয়েছে। তাই এদের দ্বারা মনোযোগের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতরূপ বুঝা যায় না। মনোবিদ্ রসের (Ross) শ্রেণী বিভাগ মনোযোগের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তারই গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। আমরা এই শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনের মনোযোগের বিকাশ ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার গুরুত্ব কি সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

মনোযোগের বিকাশ
[Development of Attention]

মনোযোগ ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে আমরা মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার সময়ে উল্লেখ করেছি, ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন ধরনের মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সব রকম মনোযোগ শৈশবে দেখা যায় না। মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিজীবনে মনোযোগের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন।

ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগের স্তর

প্রথম স্তরে শিশুদের মধ্যে ইচ্ছা নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ দেখা যায়। অর্থাৎ, শিশুদের মনোযোগ প্রাথমিক স্তরে, প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুরা বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে। বস্তুর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, এই সময়ের মনোযোগ বস্তুগত নির্ধারক দ্বারা বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। পরবর্তী স্তরে, শিশুদের মধ্যে সেন্টিমেন্টের বিকাশ শুরু হয়। সেন্টিমেন্ট বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনোযোগ সেন্টিমেন্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, নিজের বাড়ীর প্রতি সেন্টিমেন্ট বিকাশ হওয়ার ফলে, বাড়ী সংক্রান্ত যে সব বস্তু তার প্রতি মনোযোগ দেখা যায়। বিদ্যালয়ের প্রতি সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠার ফলে, বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বস্তুর প্রতিও তাদের মনোযোগ দেখা যায়। এমনিভাবে, শিশুর মনোযোগের বিকাশের প্রথম স্তরে আমরা কেবলমাত্র ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগই (Non Volitional attention) দেখতে পাই।

পরবর্তী স্তরে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের বিকাশ হয়। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে আত্ম বিকাশের ফলে, এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে শিখে। তবে মনোযোগ বিকাশের এই স্তরে, প্রথম পর্যায়ে অভ্যাস গঠনের দরুন, তাদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি। এই ধরনের মনোযোগের জন্য খুব বেশী মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে ইচ্ছা-প্রাণোদিত গুপ্ত মনোযোগের (implicit attention) আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে, আদর্শের বিকাশ হয়, তখন আদর্শ অনুযায়ী প্রবল মানসিক ইচ্ছার দ্বারা বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। এটাই হ'ল মনোযোগের সবচেয়ে জটিলতম স্তর। এই ধরনের ব্যক্তি মনোযোগের (explicit attention) বিকাশ হ'লেই, তা জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সার্থকভাবে সহায়তা করে।

ইচ্ছা প্রাণোদিত মনোযোগের স্তর

অনেক মনোবিদ্ মনোযোগের বিকাশকে বস্তুগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে তিনটে স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরে মনোযোগ বিশেষভাবে স্বাভাবিক উদ্দীপক (Natural stimulus) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মনোযোগের প্রকাশ দেখা যায়। যেমন, শিশুরা খুব জোর আলো বা শব্দের প্রতি মনোযোগ দেয়। এই স্তরকে তাই বলা হয় **স্বাভাবিক মনোযোগের স্তর** (Uncondition stage)। পরবর্তী স্তরে, মনোযোগ আংশিকভাবে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লেও, বাইরের উদ্দীপকের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পড়াশুনায় মনোযোগ দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা নেই, কিন্তু পরীক্ষা পাশের জন্য জোর করে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। অর্থাৎ, এই স্তরে তাগিদটা বাহ্যিক। কিন্তু, ইচ্ছা প্রযুক্ত হওয়ার ফলে, এই স্তরে বিশেষ প্রেষণায় বস্তুকে কেন্দ্র করে মনোযোগের অনুবর্তন হ'তে শুরু করে। তাই একে বলা হয় **অনুবর্তনমূলক মনোযোগের স্তর** (conditioning stage)। পরবর্তী স্তরে, আদর্শকে (ideal) কেন্দ্র করে, স্থায়ীভাবে মনোযোগের অনুবর্তন হয়ে থাকে। এবং আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ীভাবে, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সর্বশেষ স্তরকে বলা হয় **অনুবর্তিত মনোযোগের স্তর** (conditioned stage)।

আলোচনা

মনোযোগের নির্ধারক
[Conditions of Attention]

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, এই মানসিক প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল নির্বাচনী ক্ষমতা। কিন্তু,

প্রশ্ন হ'ল কি করে আমরা বহু বস্তুর মধ্যে বিশেষ একটাকে কি ভাবে মনোযোগের জন্য নির্বাচন করি। এখানে, আমরা মনোযোগের নির্ধারক বলতে, মনোযোগ প্রক্রিয়ার কারণকে বুঝাচ্ছি না। যে শর্তগুলো বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। তাদেরই সাধারণভাবে মনোযোগের নির্ধারক (Conditions of attention or determiners of attention) বলা হয়ে থাকে। যদিও তাৎপর্যগত অর্থে, এদের মনোযোগের নির্ধারক না বলে, বস্তু নির্বাচনের কারণ বা নির্ধারক বলাই উচিত। যাই হউক, এই বস্তু নির্বাচন সাধারণতঃ ছ'টো কারণে হয়ে থাকে। বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন অনেক গুণ থাকে, যার জন্য পাশাপাশি অন্য বিষয়বস্তু থেকে পৃথক হয়ে তা আমাদের চেতনার কেন্দ্র স্থলে উপস্থাপিত হয়। অথবা, অনেক সময় আমাদের আন্তরিক তাগিদের জন্য কোন বিশেষ বিষয়বস্তুকে আমরা বেছে নিই। এই ছ'টো দিক বিবেচনা করে মনোবিদ্‌গণ মনোযোগের নির্ধারককে ছ'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) **বস্তুগত নির্ধারক** (Objective conditions or determiners) এবং (২) **ব্যক্তিগত নির্ধারক** (Subjective conditions or determiners)।

মনোযোগের নির্ধারক কি ?

উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের দরুন আমরা অনেক সময় বস্তু নির্বাচন করে থাকি। অর্থাৎ, উদ্দীপক তার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে, তাকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে মনোযোগের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনোযোগের বস্তু নির্বাচনের পেছনে, এই সব কারণগুলোকেই বস্তুগত নির্ধারক (Objective Condition) বলা হয়ে থাকে। বস্তুর কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে সে সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করব।

বস্তুগত নির্ধারক

[এক] **তীব্রতা** [**Intensity**]—উদ্দীপক পুঞ্জের মধ্যে সব চেয়ে তীব্র উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোন বিশেষ পরিস্থিতির যে অংশ আমাদের বেশী উদ্দীপ্ত করে তার প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই। রাস্তায় বিজ্ঞাপনের আলোর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল তার প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই। খুব রঙীন ছবির বই ছোট ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, বস্তু তার উদ্দীপনার তীব্রতার দরুন আমাদের মনোযোগে নির্বাচিত হতে পারে।

[ছুই] **বিস্তৃতি** [**Extencity**]—উদ্দীপকের বিস্তৃতিও নির্বাচনের কারন। বিশেষ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপক বড় হ'লে তার সংবেদনগত প্রভাবও বেশী হয়, ফলে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি।

[তিন] **পুনরাবৃত্তি** [**Repetition**]—সব সময়েই যে তীব্র উত্তেজক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং ক্ষীণ উত্তেজক করবে না, তা ঠিক নয়। খুব ক্ষীণ উত্তেজকও বার বার পুনরাবৃত্তির জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ

করে। বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কান্নার শব্দ পুনরাবৃত্তির দরুন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

[চার] **অভিনবত্ব** [Novelty]—অভিনব কোন বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একজন অত্যন্ত বেঁটে লোক দেখলে, তার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই। কেউ যদি নতুন কোন স্টাইলের জামা বা পোষাক পরেন, তার প্রতি আমাদের মনোযোগ যায়। অভিনবত্বকে আমরা বস্তুর নিজস্বতা বলতে পারি। উদ্দীপকের কোন একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগের নির্ধারকের কাজ করে।

[পাঁচ] **গতিশীলতা** [Movement] **ও পরিবর্তন** [Change]—গতিশীল উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যে সব উদ্দীপক অপেক্ষাকৃত গতিশীল তাদের প্রতি আমরা মনোযোগ দিই। কোন সভায় সকলে যখন বসে আছি, তখন যে ক'জন উঠে চলে যাচ্ছে, তাদের প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আবার বিভিন্ন গতিশীল উদ্দীপকের মধ্যে যার গতি অপেক্ষাকৃত বেশী সে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাস্তায় সব চলমান গাড়ির মধ্যে যে গাড়িটি পাশ দিয়ে সব গাড়িকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল, তার প্রতি আমাদের মনোযোগ যায়। গতিশীলতাই হ'ল পরিবর্তন। আমরা তাই সাধারণভাবে বলতে পারি, যে কোন ধরনের পরিবর্তন (change) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

[ছয়] **আকস্মিকতা** [Suddenness]—উদ্দীপকের আকস্মিক উপস্থাপনের জন্য তা আমাদের অনেক সময় মনোযোগকে আকর্ষণ করে। এও এক ধরনের পরিবর্তন। পরিবেশগত সাম্যাবস্থার মধ্যে যে কোন আকস্মিক পরিবর্তনের দরুন, সেই উদ্দীপকের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। হঠাৎ, বিদ্যুৎ চমক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সবাই যখন মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, সে অবস্থায় কেউ যদি হঠাৎ কিছু হাত থেকে ফেলে শব্দ করে, অমনি সকলে তার প্রতি মনোযোগ দেয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের আকস্মিক আবির্ভাবের মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

[সাত] **স্পষ্টতা** [Clarity]—অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই। আবছা বা অপরিষ্কার হাতের লেখা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। পাশাপাশি একটা ভাল ও একটা খারাপ হাতের লেখা থাকলে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হাতের লেখাটা প্রথম আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাধারণভাবে, একে আমরা আকৃতির (Form) বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যে সব বস্তুর সঠিক আকৃতি আছে, তাদের দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হয়ে থাকি। অর্থাৎ, বস্তুর পরিপূর্ণ আকৃতি (Complete form) মনোযোগের নির্ধারক।

এই সব বস্তুগত কারণ ছাড়া অনেক সময় আমরা বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই ব্যক্তিগত কারণে। অর্থাৎ, বস্তু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দরুন যে সব সময় আমাদের মনোযোগকে নির্ধারণ করে তা নয়। আমাদের আন্তরিক অবস্থা এবং চাহিদা ও মনোযোগের বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বিশেষ মানসিক অবস্থা মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এখানে আমরা এই সব ব্যক্তিগত নির্ধারক (Subjective conditions) সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্যক্তিগত নির্ধারক

[এক] **প্রবৃত্তি** [Instincts]—প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা অনেক সময় বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি। মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, প্রবৃত্তি ব্যক্তিকে কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করে [*An instinct is an innate Psycho-physical disposition which determines its possesser to (or to pay attention to) any object of a certain class*……]। ক্ষুধার প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা বিভিন্ন বস্তু সামগ্রীর মধ্যে খাদ্য বস্তুর প্রতিই মনোযোগ দিই। **রস্** (Ross) এই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত মনোযোগকেই প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ (Enforced attention) নাম দিয়েছেন।

[দুই] **প্রক্ষোভ** [Emotion]—বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভমূলক অবস্থা আমাদের বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করে। যেমন ভয় পেয়ে আমরা যখন দৌড়ে পালাই, তখন, পাশাপাশি কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভিক অবস্থা, আমাদের বিশেষ ধরনের বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে।

[তিন] **মনঃপ্রকৃতি** [Temperament]—বিভিন্ন মনঃপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা মেজাজগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়। যাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই হ'ল সব কাজের খুঁৎ ধরা, তারা সব কিছু বস্তুর খারাপ দিকটার প্রতিই মনোযোগ দেয়। যারা অল্পে উত্তেজিত হয়, দেখা গেছে, তারা যেন বিশেষভাবে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

[চার] **সেন্টিমেন্ট** [Sentiment]—সেন্টিমেণ্টকে আমরা অর্জিত জৈব-মানসিক প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। প্রবৃত্তির মত এই জৈব মানসিক-প্রবণতাও ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে সাহায্য করে। একই রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টের দরুন, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে।

[পাঁচ] **অভ্যাস** [Habits]—অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তু নির্বাচন করে থাকি। চা-পানের যাদের অভ্যাস আছে, সকাল বেলা উঠে, প্রথমেই তাদের চায়ের কাপের দিকেই নজর যাবে। পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যাদের আছে তাদের চোখে অপরিষ্কার সামান্য কিছু জিনিসই চোখ পড়ে।

[ছয়] **অনুরাগ ও মনোভাব** [Interest and Attitude]—বিশেষ বস্তুর প্রতি অনুরাগ আমাদের মনোযোগে বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। যাঁদের খেলায় অনুরাগ আছে, তাঁরা সকাল বেলা কাগজ পেয়েই প্রথমে খেলার খবরের প্রতি আকৃষ্ট হন। যাঁদের রাজনীতিতে অনুরাগ আছে, তাঁরা রাজনৈতিক খবর দ্বারা আকৃষ্ট হন। মনোযোগ এবং অনুরাগের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অংশে বিশদভাবে আলোচনা করব। অনেক সময় অতীত অভিজ্ঞতার দরুন বস্তুকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের মনোভাব (attitude) গড়ে ওঠে। এই মনোভাব বস্তু নির্বাচনে, বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

মনোযোগের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত কারণ বা নির্ধারকগুলোর মধ্যে মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ,

আলোচনা

ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোই মনোযোগের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। তাঁরা এও মনে করেন যে ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোর জন্যই বস্তুগত নির্ধারকগুলো সক্রিয় হয়। আপতঃ ভাবে বস্তু নির্বাচনের পেছনে, বস্তুগত নির্ধারকের নিয়ন্ত্রণ দেখা গেলেও আসলে, আন্তরিক কোন তাগিদের থেকেই মনোযোগের বস্তু নির্বাচিত হয়ে থাকে। এই কারণে, মনোবিদ্‌গণ বস্তুগত নির্ধারকগুলোকে **গৌণ নির্ধারক** (Secondary conditions) এবং ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোকে **মুখ্য নির্ধারক** (Primary condition) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে এই সব নির্ধারকগুলো এককভাবে কোন সময়েই কাজ করে না। মনোযোগে বস্তু নির্বাচনের পেছনে, এক সঙ্গে নানা রকম নির্ধারকই কাজ করে থাকে। বিভিন্ন বস্তুগত ও ব্যক্তিগত নির্ধারক একত্রে বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে বলে আমরা বিশেষ বস্তু বা উদ্দীপককে নির্বাচন করে থাকি।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব ও শিক্ষকের দায়িত্ব [Educational Implications of attention and the teacher's role]

আধুনিক সংব্যাখ্যানে, শিক্ষাকে ব্যক্তির উপর আরোপিত কোন বিশেষ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে সক্রিয় প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তা ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়। মনোযোগ ও ব্যক্তি-জীবনের এক সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষাকালীন মানসিক সক্রিয়তা মনোযোগ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসতে পারে না।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, কোন শিখনই শিক্ষার্থীর আত্মপ্রচেষ্টা ছাড়া হতে পারে না। এই আত্মপ্রচেষ্টামূলক শিখন মনোযোগের দ্বারা নির্ধারিত হয়।[1] শিক্ষার্থীরা যদি কোন বিশেষ সমস্যার বিভিন্ন অংশের প্রতি এবং সমগ্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রতি সার্থকভাবে মনোনিবেশ করতে না পারে, তা'হলে তারা সে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। একথা গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ বিশেষভাবে বলেছেন। তাই শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্বের কথা আধুনিক কোন মনোবিদ্‌গণ অস্বীকার করে না। তাছাড়া, মনোযোগ, প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার স্পষ্টতা (clarity) সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করে। ফলে যে কোন বিষয়বস্তুর বোধগম্যতায় (understanding) মনোযোগ বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পাঠ্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত করার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে শিক্ষকদের উপর এসেই পড়ে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করতে না পারলে, কোন রকম উন্নত শিক্ষা কৌশল দ্বারাই ভাল ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং, কোন কোন দিক থেকে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে, সে সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব।

মনোযোগ ও শিক্ষা

[**প্রথমতঃ**] আমরা জানি মনোযোগ ব্যক্তিজীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ, বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকমের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে, তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে ইচ্ছা নিরপেক্ষ (non-volitional attention) থাকে। এবং প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীরা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়। শিক্ষার এই স্তরে তারা কৌতূহল, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রবৃত্তির তাড়নায়, যে সব বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়, তাদের কেন্দ্র করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই অবস্থায় জোর করে অন্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা বৃথা হবে। এর পর বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠতে থাকে, বিশেষ বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে। তবে এই সেন্টিমেন্ট গঠনের প্রথম স্তরে শুধুমাত্র বস্তু কেন্দ্রিক সেন্টিমেন্টই গঠিত হয়, ধারণা সংক্রান্ত সেন্টিমেন্ট থাকে না। সুতরাং পরবর্তী স্তরে, এই সব সেন্টিমেন্ট নিয়ন্ত্রিত মনোযোগকে শিক্ষার ব্যাপারে কাজে লাগাতে হবে। জ্ঞানমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেন্টিমেন্ট পরিচালিত মনোযোগ বা স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ (spontaneous attention) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রস্ (Ross)[1] বলেছেন

ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

1. "For faithful intellectual work spontaneous non-volitional attention is the heighest form of attention possible. When such sentiments are built up pupil will take his own education in hand, looking at his teacher not as a task master, but as a friend and guide who will help him in his researches."
—Ross: Ground work of educational Psychology.

—শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেন্টিমেণ্ট পরিচালিত স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ সৃষ্টি করতে পারলে, তারা সহজভাবে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করবে। শিক্ষণ তাদের কাছে বোঝা স্বরূপ মনে হবে না। শিক্ষকের প্রতিও তাদের আদর্শ শিখন-সহায়ক মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা-উপযোগী সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলা। শিক্ষকের প্রতি যথাযোগ্য সেন্টিমেণ্ট, পড়াশুনার প্রতি যথাযোগ্য সেন্টিমেণ্ট, বিদ্যালয়ের প্রতি সেন্টিমেণ্ট, ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে, এই কথা মনে রেখে শিক্ষককে সুপরিকল্পিতভাবে, সেন্টিমেণ্ট গঠনের মাধ্যমে তাদের মনোযোগ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হবে।

ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

[**দ্বিতীয়তঃ**] শিক্ষার্থীদের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যাতে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় সেদিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। কারণ, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়বস্তু বা কাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ আসতে পারে না। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা এই ধরনের মনোযোগকে কেন্দ্র করে দেওয়া হলেও পরবর্তীকালের শিক্ষার জন্য ইচ্ছাযুক্ত মনোযোগের আশ্রয় নিতে হবে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণার (ideas) প্রতি আগ্রহী করতে হবে। তাদের মধ্যে একটা আদর্শ জাগ্রত করতে হবে, এবং সেই আদর্শে পৌছানোর জন্য সক্রিয় ইচ্ছা তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এই ইচ্ছাই জীবন পথে জ্ঞান আহরণে তাকে সাহায্য করবে। এর ফলেই শিক্ষার্থীর মধ্যে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের সৃষ্টি হবে। পরবর্তীকালে, এই জীবনাদর্শ ও অর্জিত মনোযোগ ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের মতই কাজ করবে এবং সারা জীবনব্যাপী জ্ঞান আহরণে সহায়তা করবে।

ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগ ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগের আপেক্ষিক গুরুত্ব

আমরা এই আলোচনা থেকে, বলতে পারি মনোযোগ সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের সহায়তায় শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে ঐচ্ছিক মনোযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু এই ধরনের আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে কাজে পরিণত করার সব সময় সম্ভব হয় না। অনেক সময়, শিশুকে পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য জোর করতে হয় এবং ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু কোন উপায়ান্তর না থাকলেই সে পথ গ্রহণ করা উচিত। যদি স্বাভাবিক মনোযোগ পাঠ্যবস্তুর প্রতি একেবারেই না থাকে, তবেই এই চেষ্টা করতে হবে, প্রথম থেকেই আমাদের ইচ্ছাকে শিশুর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। এ কথা আমাদের মনে রাখার

দরকার, জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে (Intellectual education) আমরা যতদূর সম্ভব স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের সাহায্য নেব। কিন্তু, চরিত্র গঠনে, এবং সং-অভ্যাস গঠনের জন্য আমাদের অবশ্যই ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের সাহায্য নিতে হবে। নিছক সহজাত প্রকৃতি-প্রযুক্ত মনোযোগ বা সেন্টিমেণ্ট পরিচালিত মনোযোগের উপর ছেড়ে দিলে, চরিত্র গঠন হবে না। তাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের জন্য প্রয়োজন বোধে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগকে বিশেষভাবে সুকৌশলে কাজে লাগাতে হবে।

[তৃতীয়তঃ] শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগ প্রক্রিয়াকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে হলে, মনোযোগের পরিসর (span of attention) সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণাকে কাজে লাগাতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের এক সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। স্থতরাং, শিক্ষার্থীর মনোযোগ তার ব্যক্তিগত সীমার বাইরে যেতে পারে না। শিক্ষককে এ কথা মনে রেখে, বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। বিষয়বস্তুর যে সব দিকের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, তার সংখ্যা খুব বেশী হয়, তা'হলে শিক্ষার্থীরা সমগ্রভাবে তার উপর নজর দিতে পারবে না। এরকম পরিস্থিতিতে বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

মনোযোগের পরিসর ও শিক্ষকের দায়িত্ব

[চতুর্থতঃ] মনোযোগের বিভিন্ন নির্ধারকগুলোকে ঠিক মত কাজে লাগাতে পারলে, শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আনা সম্ভব হবে। আমরা জানি বস্তুর তীব্রতা ও স্পষ্টতা মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্থতরাং, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যাতে এই গুণ থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতিও (extensity) মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষকের এই দিকের প্রতি নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠের জন্য যে সব বই নির্বাচন করবে তার ছাপা, যাতে বড় বড় ও পরিষ্কার হয়, সেদিকে বিশেষভাবে দেখতে হবে। বোর্ডে লেখার সময়, লেখা যাতে পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং বড় হয়, এবং ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সব বিষয়বস্তুতে তাদের মনোযোগ আনা যাচ্ছে না, সে সব বিষয়বস্তু বারবার (Repetition) পুনরাবৃত্তি করতে হবে। কারণ পুনরাবৃত্তির ফলে মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। তবে একই রকমভাবে পুনরাবৃত্তি করলে অনেক সময়ে একঘেঁয়েমি এসে যেতে পারে। দরকার হলে তিনি বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গমে সহায়তার জন্য অনেক সময় আমরা শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Teaching aids) ব্যবহার করে থাকি। এই সব উদ্দীপনের মাধ্যমে আমরা অভিনবত্ব (Novelty), গতিশীলতা (Move-

মনোযোগের নির্ধারক ও শিক্ষকের দায়িত্ব

ment) ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য পাঠের মধ্যে আনতে পারি। পরিবর্তনের (change) নির্ধারককে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক তার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের রীতি মাঝে মাঝে পরিবর্তন করবেন। শিক্ষক আলোচনার সময় গলার স্বর পরিবর্তন করলে, শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হয়। তা না হলে শিক্ষক যদি একই রকম ভাবে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেন, তা'হলে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোকেও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ভাল ফল পেতে পারেন। জন্মগত যে সব প্রবণতা, প্রক্ষোভ এবং মনঃপ্রকৃতি মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, সেগুলোকে শিক্ষারক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। এই সব জন্মগত মানসিক সংগঠন এবং অবস্থার তাড়নায় শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে, যে সব বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়, তার থেকেই তাদের শিক্ষা শুরু করতে হবে। সেগুলোকে বাধা দিয়ে শিক্ষার কাজ চলতে পারে না। শিক্ষক নিজস্ব ব্যক্তিগত কৌশলের প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ এই মনোযোগকে পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত করতে হবে। অন্যান্য অর্জিত ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোর যথাযোগ্য বিকাশে সহায়তা করতে হবে। যেমন এমন সেন্টিমেণ্ট এবং অভ্যাস গঠন করতে হবে, যা তাদের বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন কাজে তাদের মনোযোগী করে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগী (Interested) করে তুলতে হবে। অনুরাগই শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ না জন্মালে, শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হবে না। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব।

মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব

[পঞ্চমতঃ] মনোযোগের চঞ্চলতা এবং পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। মনোযোগ পরিবর্তনশীল এবং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সরে যায়, এবং দেখা গেছে বয়সের সঙ্গে এই পরিবর্তনশীলতার সম্পর্ক আছে। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা। যে বিষয়বস্তুর প্রতি অনেকক্ষণ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে হয়, সে সব বিষয় নির্বাচন না করাই উচিত। তাছাড়া কিছুক্ষণ অন্তর বিষয়ান্তরে মনোযোগকে পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া লক্ষ্য করা গেছে, মনোযোগের প্রকৃতির দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে। কেউ অনেকক্ষণ কোন বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে (Fixator) আবার কেউ চপল মনোযোগ সম্পন্ন (Fluctuator)। এদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী বস্তু নির্বাচন করতে হবে। যারা অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারে তারা বস্তু সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান আহরণ করে; কিন্তু যারা সদাচঞ্চল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করে না তাদের পক্ষে সম্ভব হয়

না ; আবছা আবছা জ্ঞান আহরণ করে এবং বাকীটা নিজেদের মনে মনে কল্প (Image) হিসেবে তৈরী করে নেয়। এর ফলে ভুল বেশী হয়। এদের প্রতি শিক্ষকের বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এবং দরকার হলে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়বস্তুর আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে তাদের পরিপূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান আহরণে সহায়তা করতে হবে। তবে মনোযোগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে, কাজে লাগাতে হলে এই ধরনের পরিবর্তনশীলতাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ অভ্যাস এবং অনুরাগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই রকম পরিবর্তনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মনোযোগ সম্পর্কে শিক্ষককে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে—শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি যদি মনোযোগ না থাকে, তা'হলে পাঠদান করে কিছু লাভ নেই। সুতরাং, শ্রেণীতে শিক্ষক যা কিছুই করুন না কেন, তা কতটা মনোযোগ নির্ধারণে সহায়তা করবে ; তা বিবেচনা করেই করতে হবে। কারণ মনোযোগই হ'ল শিখনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত (condition)। শিখনের (Learning) অন্য সব শর্ত আদর্শজনক হলেও মনোযোগ ছাড়া শিখন হতে পারে না। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ মনোযোগ ও প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করলেই শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগের তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা হবে। তিনি বলেছেন—"Attention explores and perception discovers"[1] এখন যেহেতু শিখনের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রই গবেষণামূলক (Exploratory) প্রকৃতির, সেহেতু এ ক্ষেত্রে মনোযোগই একমাত্র তার সহায়ক প্রক্রিয়া।

আলোচনা

অনুরাগ
[Interest]

অনুরাগ শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন। শিখন ও মনোযোগের শর্ত হিসেবে আমরা অনুরাগের কথা বলেছি। যে কোন ধরনের ইচ্ছা যুক্ত প্রক্রিয়ার (Volitional process) দ্বারা ব্যক্তির কোন না কোন চাহিদা চরিতার্থ হয়। এবং তাদের প্রত্যেকের মূলে কাজ করে ব্যক্তির অনুরাগ। এই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর অনুরাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করার পূর্বে অনুরাগ কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার দরকার।

ব্যুৎপত্তি গত অর্থে, ল্যাটিন 'Interest' কথার অর্থ হ'ল 'it matters' বা 'if concerns' অর্থাৎ, আমাদের অনুরাগের বস্তু হ'ল সেই সব গুলো, যে গুলো

1. R. S. Woodworth : Psychology.

আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। অর্থের প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, অর্থাৎ, অর্থ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই ভাবে অনুরাগ কথাটা যখন ব্যবহার করি, তখন তার উপর বস্তুগত (Objective meaning) আরোপ করি।

অনুরাগ কি ?

মনোবিদ্‌গণ অনুরাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন। অনেক মনোবিদ্ তাকে মানসিক অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যখন বলি, খেলা ধূলায় অনুরাগ আছে। এই খেলা-ধূলা নিয়ে যখন বিব্রত থাকি, তখনকার মানসিক অবস্থাকে আমরা বলি খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ (Interest for play)। এখানে অনুরাগকে এক ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Subjective experience) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মনোবিদ্ **স্টাউট্** (Stout) অনুরাগকে অভিজ্ঞতার প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়ামূলক দিক (Conative affective aspect) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যখন বলি খেলার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তখন খেলার প্রতি আমাদের বিশেষ মানসিক অনুভূতি (feeling) কে বুঝাতে চাই। একই সঙ্গে, আমাদের এই অনুরাগের বস্তুকে পাওয়ার একটা সক্রিয়তাকে বুঝাই। তবে এই সক্রিয়তা বস্তুর বর্তমানেই দেখা যায়। **ক্রো এবং ক্রো** (Crow & Crow), বলেছেন অনুরাগ বলতে আমরা ব্যক্তির কোন বিশেষ বস্তু, ক্রিয়া বা অন্য ব্যক্তির প্রতি মানসিক আকর্ষণকে বুঝাই। এই ভাবে বিভিন্ন মনোবিদ্ অনুরাগকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অনুরাগ কথাটা, এই অর্থে ব্যবহার করায় আপত্তি করেন। কোন বস্তুর বর্তমানে আমাদের অনুরাগ থাকবে, আবার, তার অবর্তমানে অনুরাগ নেই, একথা মেনে নেওয়া যায়। খেলাধূলা করার সময় বা সে সম্পর্কে আলোচনার সময় আমাদের খেলার প্রতি অনুরাগ আছে, বাকী সময়ে নেই, একথা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। অন্য কাজে আমরা যখন ব্যস্ত থাকি, তখন খেলার প্রতি আমাদের অনুরাগ চলে যায় না। তাই, একথা বলা যায়, অনুরাগের বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত অর্থ ছাড়াও, তার একটা প্রকৃত অর্থ আছে। মনোবিদ্ **ম্যাক্‌ডুগাল, ড্রিভার** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ এই নতুন অর্থে অনুরাগ কথাটা ব্যবহার করেছেন। **ড্রিভার** (Drever), বলেছেন—"*An interest is a disposition in its dynamic aspect.*" অর্থাৎ, অনুরাগ এক ধরনের মানসিক প্রবণতা, যে প্রবণতাকে আমরা মানসিক সংগঠনও (Mental structure) বলতে পারি। এটাকে আমরা অনুরাগের (interest) সংগঠনগত অর্থও (Structural meaning) বলতে পারি। ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, যে সব বস্তু প্রাণীর প্রবৃত্তি-গত প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত, সেই সব বস্তু আমাদের অনুরাগের। কোন বস্তুর প্রতি প্রাণীর অনুরাগের পরিমাণও এই প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতার শক্তির

সমানুপাতী।"[1] কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে, এই প্রবৃত্তিগুলো আরও জটিল হয়। তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্জিত মানসিক সংগঠন বা সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। সেন্টিমেণ্ট যেমন অর্জিত, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের অনুরাগের বস্তুও লক্ষ্য করা যায়। মানুষের তাই অর্জিত অনুরাগের বস্তুও থাকে। অনেকে মনে করেন, কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ, সেই বস্তু বা বিষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। কিন্তু, ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, এ ধারণা ভুল। অনুরাগ সব সময় মানসিক প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়; বস্তুকে কেন্দ্র করে নয়। তিনি বলেছেন "মানুষের অনুরাগের সঙ্গে ইতর প্রাণীর অনুরাগের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত। তবে মানুষের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অর্জিত প্রবণতা আছে। সুতরাং, অনুরাগের বস্তুও কিছু কিছু অর্জিত। তাই পার্থক্য শুধুমাত্র জটিলতার।"[2] আধুনিক প্রত্যেক মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদকে স্বীকার করেছেন। মনোবিদ্ **রস্** (Ross) বলেছেন, মানুষের অনুরাগ অভিজ্ঞতামূলক নয়, প্রেষণা মূলক; এবং অনুরাগ সৃষ্টির মূলে থাকে বস্তুকেন্দ্রীক প্রক্ষোভ [*Interest is conative rather than cognitive; the emotions must be organised round the object of interest*][3]। মনোবিদ্ **টেল্‌ফোর্ড** (Telford) বলেছেন যে সব বস্তুর মধ্যে আমাদের পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাদের প্রতি আমরা অনুরক্ত হই। সুতরাং, আমরাও অনুরাগকে মানসিক সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করব।

অনুরাগ ও মনোযোগের সম্পর্ক
[Relation between Interest and Attention]

এখন অনুরাগকে যদি আমরা তার সাংগঠনিক অর্থে ধরি, স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে তার আচরণগত বহিঃপ্রকাশ কি? কারণ যে কোন ধরনের মানসিক প্রবণতা বা সংগঠন আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, মনোযোগে বস্তু নির্বাচন হয়ে থাকে। বিশেষ বস্তু নির্বাচন করে, আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিই। অর্থাৎ, মনোযোগে, বিশেষ বস্তু সম্পর্কে জানার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। **ম্যাক্‌ডুগাল** (Mc. Dougall) তাই মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

অনুরাগ ও মনোযোগ

1. "Animals are interested in objects in so far as the objects are of kind that evoke instinctive impulses, and in proportion to the strength of those impulses." Mc Dougall: An-outline of Psychology.

2. "The human being goes much further along the live of development, acquiring sentiments for many more objects and so extends more widely his field of ecquired interest"—Mc. Dougall: An outline of Psychology.

3. Ground work of Educational Psychology. Ross

উল্লেখ করতে গিয়ে "Striving to cognize" বা, 'জানার জন্য উদগ্র বাসনা' এই কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যে কোন ধরনের এই রকম প্রেষণামূলক কাজের পেছনে নির্দিষ্ট মানসিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন, যা প্রেষণা শক্তি জোগাবে। রস্‌ও (Ross) একই কথা বলেছেন—"প্রত্যেক প্রেষণামূলক কাজের পেছনেই মানসিক কোন সংগঠন কাজ করে ; সুতরাং মনোযোগের পেছনেও নিশ্চয়ই কোন এমনি মানসিক সংগঠন আছে, যা শক্তি জোগায়" [*We know every striving experience involves the activity of some conative disposition in the mental structure. So in attention some reservoir of mental energy must be opened.*][1] ম্যাকৃডুগালের মতে, মনোযোগের পেছনে, যে মানসিক প্রবণতা কাজ করে তাই হ'ল অনুরাগ (Interest)। অর্থাৎ, এই অনুরাগ মনোযোগে কোন বস্তু নির্বাচিত হবে তা নির্ণয় করে দেয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় যেমন আমরা বিশেষ কোন বস্তুর বর্তমানে, আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করি, ঠিক তেমনি অনুরাগ আমাদের বস্তুর দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, মনোযোগ (Attention) এবং অনুরাগ (Interest) দ্বারা আমরা একই মানসিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝাতে চাই। আমরা প্রক্রিয়াটিকে (Process) বলছি মনোযোগ ; আর যে মানসিক সংগঠন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে বলছি অনুরাগ। 'কোন বস্তুতে আমাদের অনুরাগ আছে', এর তাৎপর্য হ'ল, বর্তমানে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে, 'কোন বস্তুর প্রতি আমি মনোযোগী'-এর, তাৎপর্য আমাদের কোন মানসিক প্রবণতার (Mental disposition) ক্রিয়াশীল প্রকাশ হয়েছে। তাই ম্যাকৃডুগাল মন্তব্য করেছেন,—"অনুরাগ হ'ল সুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হ'ল ক্রিয়াশীল অনুরাগ" (*Interest is latent attention ; and attention is interest in action*]। মনোবিদ্‌ রস্‌ও (Ross) ম্যাকৃডুগালের এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, "একই জিনিসকে দু'দিক থেকে দেখার মত মনোযোগ এবং অনুরাগকে আমরা দেখছি। এদের দু'য়েরই মূল ভিত্তি হ'ল মনের মধ্যে সুসংবদ্ধ প্রবণতার সংগঠন। যখন আমরা শুধুমাত্র সংগঠনটাকে বুঝাতে চাই তখন অনুরাগ কথাটা ব্যবহার করি এবং যখন, আমরা তার দ্বারা নির্ধারিত অভিজ্ঞতাটিকে বুঝাতে চাই, তখন মনোযোগ কথাটা ব্যবহার করি মাত্র।"[2] সুতরাং এই আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে

1. Ground work of Educational Psychology.

2. They (Attention & Interest) are, merely different ways of looking at the something, like two sides of a coin. The fact underlying both is an organised disposition in the mental structure. We use the word interest for the structure itself, while we use the word attention to describe the experience which the structure is always ready to determine."—Ross : Ground work of Psychology.

মনোযোগ এবং অনুরাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। এবং এই কারণেই অনুরাগ মনোযোগের বিভিন্ন নির্ধারকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অনুরাগের শ্রেণীবিভাগ ও বিকাশ
[Classification of Interests and their Development]

অনুরাগের শ্রেণী বিভাগ বলতে মানসিক সংগঠনের দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ, অনুরাগের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ নয়। কারণ বিষয়বস্তুর দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ করতে গেলে আলোচনা বেড়ে যাবে এবং কোন সময়েই তা সম্পূর্ণ হবে না। তাই আমরা শুধুমাত্র মানসিক সংগঠনের দিক থেকেই মানুষের অনুরাগের শ্রেণীবিভাগ করব। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি মানুষের প্রবণতা দু'ধরনের হ'তে পারে জন্মগত এবং অর্জিত। এই দু'দিক থেকে অনুরাগকেও আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। **স্বাভাবিক অনুরাগ** (Natural interest) এবং **অর্জিত অনুরাগ** (Acquired interest)। জন্মগত সহজাত প্রবণতার দরুন মানুষের মধ্যে যে অনুরাগ দেখা যায় তাকে বলা হচ্ছে **স্বাভাবিক অনুরাগ** (Natural interest)। যেমন শিশুদের কোন কিছু গড়বার বা ভাঙবার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। আবার অর্জিত প্রবণতা যেমন, সেন্টিমেন্ট, অভ্যাস ইত্যাদির জন্য মানুষের মধ্যে যে অনুরাগ দেখা যায় তাকে বলা হয় অর্জিত অনুরাগ (Acquired interest)। গান, খেলাধূলা, ছবি আঁকা ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ এই ধরনের অর্জিত অনুরাগ।

স্বাভাবিক ও অর্জিত অনুরাগ

মানুষের জীবনে প্রাথমিক স্তরে, সাধারণতঃ স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রবৃত্তি পরিচালিত অনুরাগই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন, জন্মগত প্রবণতার সমন্বয়ে নতুন নতুন মানসিক সংগঠন বা প্রবণতা-মূলক কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়, তেমনি, অর্জিত অনুরাগেরও বিকাশ হতে থাকে। এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে রঙ্, শব্দ, এবং চলমান বস্তুর প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এক থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মধ্যে কিছু কিছু পছন্দ অপছন্দ (likes and dislikes) লক্ষ্য করা যায়। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলনার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। এই বয়সে বিশেষভাবে, স্প্রিং-এর রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী ইত্যাদির প্রতি বেশী ঝোঁক দেখা যায়। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সে ছেলে ও মেয়েদের অনুরাগের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের, সেলাই, পুতুল খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। ছেলেদের মাঠে খেলাধূলা, পড়াশুনা ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। দশ থেকে বার বছরের মধ্যে ছেলেদের এবং মেয়েদের অনুরাগের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য

অনুরাগের বিকাশ

লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের মধ্যে নারী সুলভ অনুরাগ দেখা দেয় এবং ছেলেদের মধ্যে পুরুষ সুলভ আচরণ দেখা দেয়। মেয়েদের, সাহিত্য চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। ছেলেদের গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। এই ধরনের অনুরাগের পৃথকীকরণ কৈশোরে গিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ব্যক্তির পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী প্রাপ্ত জীবনে মেয়েদের গৃহকাজের প্রতি অনুরাগ দেখা দেয় এবং পুরুষদের কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে নানা রকম অনুরাগ গড়ে ওঠে।

অনুরাগ ও শিক্ষা
[Interest & Education]

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শের যুগে, শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহকে শিক্ষাদানের কাজে লাগাতে না পারলে, ব্যক্তি সত্ত্বা বিকাশের যে কোন প্রচেষ্টাই যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। আগ্রহ ভিত্তিক শিক্ষাই কেবলমাত্র মনোবিদ্যা সম্মত শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে। শিক্ষাবিদ্ **হার্বার্ত** (Herbert) শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরাগের (Interest) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি করা। মনোযোগ যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তাই নয়, বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গমে তাদের সাহায্য করে। কিন্তু, কোন কোন শিক্ষাবিদ্, এই ধরনের অনুরাগ ভিত্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে মতবাদ পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, অনুরাগ ভিত্তিক সরস পাঠ, শিক্ষার্থীদের খুব সহজ জীবন যাত্রার উপযোগী করে গড়ে তোলে; জীবনের প্রতিযোগিতামূলক জটিল কাজের উপযোগী তারা হয় না। কিন্তু, আধুনিক প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, অনুরাগ সম্পর্কে এই ধারণা ভুল। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ প্রায় হার্বার্তের মতবাদকে মেনে নিয়েছেন। মনোবিদ্ **হার্টম্যান** (Hartmann) বলেছেন শিক্ষার্থীদের অনুরাগের বিস্তৃতি হয়তো খুবই কম, কিন্তু এই অনুরাগের উপর ভিত্তি করেই, শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। কারণ, অনুরাগ দ্বারা শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, এবং অনুরাগের দ্বারাই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

শিক্ষা ও অনুরাগ

সুতরাং, শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য অনুরাগ সৃষ্টি করা। তবে অনুরাগের অর্থ এই নয় যে শিক্ষার্থীদের সহজ সরল বস্তুই শুধু শেখাতে হবে। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ দেখা দিলে, বিষয়বস্তু যত কঠিনই হউক না কেন, তা তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। মনোবিদ্ **ভ্যালেন্টাইন** (Valantine) বলেছেন, অনুরাগ আর

অনুরাগ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

আনন্দ এক জিনিস নয়। অনুরাগ হ'ল মনোযোগ দেওয়ার প্রবণতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত মানসিক অনুভূতি। এই অনুভূতি আনন্দদায়ক বা বেদনা-দায়ক হতে পারে। জীবন রক্ষার তাগিদে আমরা বহু বেদনাদায়ক বস্তুর প্রতি-ও মনোযোগ দিয়ে থাকি। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হ'লে, পাঠ্য বিষয়বস্তুকে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে না পারে যে পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপযোগিতা জীবনে প্রয়োগ মূল্য আছে, তা'হলে তারা আগ্রহী হবে না। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যে সব সমস্যা আত্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন রকম সাহায্য ছাড়াই বা সামান্য সাহায্যে সমাধান করতে পারে, সেই সব বস্তুর প্রতিই তারা অনুরাগী হয়। সুতরাং, বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষককে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার কথা বিবেচনা করতে হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে, কোন কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগী হয়। সুতরাং, তাদের এই স্বাভাবিক অনুরাগকেও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। অনেকে মনে করেন, এই ধরনের স্বাভাবিক অনুরাগের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করলে, শিক্ষাক্ষেত্র সীমিত হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিক অনুরাগকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে কেবলমাত্র তার উপরই ভিত্তি করেই শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষার একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল অনুরাগ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অনুরাগের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে নতুন নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুরাগ সৃষ্টি করতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, অনুরাগ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে, একথা মনে রেখে শিক্ষার্থীদের যতদূর সম্ভব হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্য অনুরাগ সৃষ্টির আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আমাদের, দেশে বেশীরভাগ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরের পর বৃত্তি জীবনে ঢুকবে। সুতরাং, মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে যাতে তাদের মধ্যে যথাযোগ্য বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টি করতে না পারলে, পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অভিযোজন করতে পারবে না। প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বৃত্তি সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণ (Field trip) ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শিক্ষক, তাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারেন। সবশেষে, শিক্ষার্থীদের পাঠে এবং পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে শিক্ষকের নিজস্ব অনুরাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষক নিজে যদি পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত না হন, তা'হলে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথার্থ অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাই প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত যে, যে বিষয়ে পড়ান তার প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. "Interest is latent attention ; and attention is interest in action." Discuss. Indicate the different types of attention. [C. U. B. T. '59]
[পৃঃ ২০১-২০৫ ; ১৮৮-১৯১]
2. Discuss the relation between interest and attention. What are the different kinds of attention ? Is volitional attention possible without interest ? [পৃঃ ২০১-২০৫ ; ১৮৮-১৯১] [C. U. B. T. '62]
3. Describe the process involved in being attentive. What is the relation between interest and attention ? What are the educational implications of the relationship ?
[পৃঃ ১৮১-১৮৬ ; ২০৬-২০৮] [K. U. B. T. '66]
4. Why is it necessary that the pupil's in a class should be attentive ? How can a teacher make his pupils attentive.
[পৃঃ ১৯৭-২০১] [K. U. B. T. '68]
5. Define attention and point out its characteristics. Discuss—"Interest is latent attention ; and attention in action." [N. B. U. B. T. '66]
[পৃঃ ১৮১-১৮৬ ; ২০৩-২০৫]
6. What are the conditions of attention ? Discuss how the teachers can utilize them in the class room for securing attention of the school children. [পৃঃ ১৯২-১৯৬ ; ১৯৮-২০১]
7. Write notes on the following :
(a) Development of attention. [পৃঃ ১৯১-১৯২]
(b) Types of attention. [পৃঃ ১৮৮-১৯১]
(c) Subjective conditions of attention. [পৃঃ ১৯৫-১৯৬]
(d) Interest. [পৃ· ২০১-২০৩]
8. Why is attention important in education ? Elucidate the external and internal determiners of attention. [পৃঃ ১৯২-২০১] [C. U. B. T. '70]

অষ্টম অধ্যায়

সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি
[GENERAL MENTAL ABILITY : INTELLIGENCE]

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই কিছু লোক খুব সহজভাবে জীবনের সব রকম সমস্যারই সমাধান করতে পারে। যে কোন নতুন পরিস্থিতিতে তারা খুব সহজেই মানিয়ে চলতে পারে ; জীবনে যে কোন রকম সমস্যা আসুক না কেন, যে কোন ধরনের প্রশ্ন জাগুক না কেন, তারা তা নিজস্ব ভংগীতে সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। এঁদের আমরা বলি বুদ্ধিমান (Intelligent)। কোন রকম বাহ্যিক সক্রিয় সাহায্য ছাড়াই এঁরা সুন্দরভাবে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, কিছু লোক আছেন যাঁরা জন্ম থেকেই নির্বুদ্ধি। এঁদের সাধারণ ভাষায় আমারা নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন (idiot) বলে থাকি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এই সব লোককে হাজার রকম চেষ্টার দ্বারা স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের মত কর্মক্ষম করে তোলা যায় না। বুদ্ধিহীন বলতে আমরা সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির অভাবকে বুঝাই না ; স্বাভাবিকের চেয়ে কম মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝাই মাত্র। কিন্তু, এই সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, বুদ্ধি মানুষের জন্মগত (inherited) মানসিক ক্ষমতা। মনোবিদ্‌গণের মধ্যে এ সম্পর্কে এখন আর কোন মতভেদ নেই। কিন্তু, এই জন্মগত মানসিক ক্ষমতাকে আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না। যে পর্যন্ত না জন্মগত ক্ষমতা মানুষের অর্জিত আচরণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে, সে পর্যন্ত তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না। এই কারণে, বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে, নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষভাবে, বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে এই সমস্যার উদ্ভব, সুতরাং, বুদ্ধি কি, এবং এই মানসিক ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ কি, সে সম্পর্কেই পূর্বে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বুদ্ধির সংজ্ঞা
[Definition of Intelligence]

বুদ্ধির সংজ্ঞা কি হবে, তা নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্ বুদ্ধির সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে নিরূপণ করেছেন। এক কথায় বলা যায়, যত মনোবিদ্ বুদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন, বুদ্ধির প্রায়

ততগুলো সংজ্ঞা আছে। তাই বুদ্ধির সংজ্ঞা এত সহজে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অন্য দিকে সব মনোবিদ্গণের সংজ্ঞা আলোচনা করাও এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধির যে কোন কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে, বিভিন্ন মনোবিদ্গণের দেওয়া সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এখন এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন মনোবিদ্গণের দেওয়া সংজ্ঞাগুলোকে সাধারণভাবে চারটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন—[এক] **জৈবিক সংজ্ঞা** (Biological definition), [দুই] **শিক্ষামূলক সংজ্ঞা** (Educational definition), [তিন] **মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞা** (Faculty definition) এবং [চার] **পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞা** (Empirical definition)। বুদ্ধির সংজ্ঞার এই ধরনের শ্রেণী-বিভাগ কেবলমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন মনোবিদ্গণের দেওয়া সব সংজ্ঞাকেই এর যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এমন কোন কথাই নেই। মনোবিদ্গণ বুদ্ধিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে এক একটা দিকের উপর তাদের সংজ্ঞায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের এই গুরুত্বের দিকে বিবেচনা করে মনোবিদ্ **পিণ্ট্নার** (Pintner) এই শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

সূচনা

যে সব সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে মানুষের অভিযোজনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাদেরই জৈবিক সংজ্ঞার শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেক মনোবিদ্ মানুষের অভিযোজনমূলক আচরণকে প্রকৃতির নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে যে ব্যক্তি যত বেশী পরিমাণ পরিবেশের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, সে ততবেশী বুদ্ধিমান। যেমন মনোবিদ্ **স্টার্ন** (Stern) বলেছেন,—**জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করার সাধারণ মানসিক ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি** [*It is general mental adaptability to new problems and conditions of life*]। স্টার্ন (Stern) অন্যত্র বলেছেন—জীবনের নতুন নতুন চাহিদার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারার সচেতন সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি। স্টার্নের এই সব সংজ্ঞা থেকে একটা জিনিস বুঝা যায়, বুদ্ধি (intelligence) এবং বিশেষ ক্ষমতার (special ability) পার্থক্য আছে। বুদ্ধিকে তিনি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে বুদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানমূলক কাজেরও পার্থক্য করেছেন। কারণ বুদ্ধি বলতে তিনি অভিনব পরিস্থিতিতে অভিযোজনের কথাই বলেছেন। স্টার্নের মতই মনোবিদ্ **ওয়েলস্** (Wells) বলেছেন—**মনের যে ধর্ম বলে, আমাদের আচরণ ধারার পুনর্বিন্যাস**

জৈবিক সংজ্ঞা

করে অভিনব পরিস্থিতিতে উন্নত ধরনের প্রতিক্রিয়া করি, তাই হ'ল বুদ্ধি [*Intelligence means precisely the property of recombining our behaviour pattern as to act better in novel situation*] মনোবিদ্ **প্যাটারসন্** (Paterson) তাঁর সংজ্ঞায় জৈবিক মতবাদ আরও পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে **বুদ্ধি হ'ল এমন এক জৈবিক কৌশল, যার সাহায্যে কোন জটিল উদ্দীপক পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে** একক প্রতিক্রিয়া করতে পারি। [*Intelligence seems to be.a biological mechanism by which the effects of a complexity of stimuli are brought together and given a some what unified effect in behaviour.*], **এড্ওয়ার্ড্স্** (Edwards) বলেছেন—**পরিবর্তনশীল বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি** [*Capacity for variability and versatility of response*]। এই ধরনের প্রত্যেক সংজ্ঞাতেই ব্যক্তির অভিযোজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বৌদ্ধিক কাজ বলতে উন্নত ধরনের অভিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এই মতানুযায়ী, অভিব্যক্তির স্তরে যে প্রাণী যত উন্নত, সে তত বেশী পরিমাণ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে পারে ; আবার যে যত বেশী পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন করতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান।

শিক্ষামূলক সংজ্ঞা

শিক্ষামূলক সংজ্ঞাগুলোতে মানুষের শিখন ক্ষমতার (Learning Capacity) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। **বাকিংহাম** (Buckingham) বলেছেন, **শিখনের ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি** [*Intelligence is the ability to learn*]। একই ভাবে **কল্ভিন্** (Colvin) বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন—"**ব্যক্তির বুদ্ধি তার অভিযোজন সংক্রান্ত অতীত শিখন বা শিখন ক্ষমতার সমানুপাতী** [*An individual possess intelligence in so far he has learned or can learn to adjust himself to his environment*]। মনোবিদ্ হোলিংওয়ার্থ (Holling worth) বলেছেন। **বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার চাহিদা অনুযায়ী শিখতে পারে** [*An intelligent person learns how to do and how to get what is wanted.*] এই ধরনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক সংজ্ঞায় মানুষের শিক্ষাক্ষমতার (educability) উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যত তাড়াতাড়ি এবং যত সহজে শিখতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান।

কোন কোন মনোবিদ্ বুদ্ধিকে আবার মানসিক ক্ষমতা বা গুণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জৈবিক সংজ্ঞা বা শিক্ষামূলক সংজ্ঞায় বুদ্ধিকে পরোক্ষভাবে

(indirectly) বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু, মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধি কি, তাই বলা হয়েছে। যেমন **বিঁনে** (Binet) বলেছেন—বুদ্ধি বোধগোম্যতার সম্পূর্ণতা, আবিষ্কারের ক্ষমতা, একাগ্রতা এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তার ক্ষমতার সমবায়ে গঠিত। অর্থাৎ, বুদ্ধি বলতে মানুষের কতকগুলো ক্ষমতার সমবায়কে বলি। এই ক্ষমতাগুলো হ'ল—[এক] **বোধগম্যতার সম্পূর্ণতা** [দুই] **আবিষ্কারের ক্ষমতা,** [তিন] **কোন কাজে একাগ্রতা এবং** [চার] **বিচারকরণের ক্ষমতা** [*Intelligence is the completeness of understanding, inventiveness, persistance in a given task and critical judgement*]। **ট্যারম্যান** (Terman) বুদ্ধি ও বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতাকে একই হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষের বুদ্ধি তার বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতার সমানুপাতী" [*An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking*]। মনোবিদ্ **উড্রো** (Woodrow) বুদ্ধিকে এক সার্বজনীন ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি মনে করেন এই সার্বজনীন ক্ষমতার কাজ হ'ল অন্যান্য গৌণ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা [*Intelligence is an acquiring capacity*], **ক্যাটেলও** (Cattel) একই ভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন [*Capacity to acquire capacities*]।

সবশেষে, **পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞাগুলোকে** বুদ্ধির কার্যকরীতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী এই সব সংজ্ঞায় বুদ্ধির পরীক্ষামূলক ফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন **থর্নডাইক** বুদ্ধিকে আদর্শ প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন [*We may define intelligence in general as the power of good response from the point of view of truth or fact*]। **ব্যালার্ড** (Ballard) একই ধরনের অনুরাগ, জ্ঞান ও পরিবেশের মধ্যে মনের আপেক্ষিক ক্ষমতাকে বুদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করেন। [*A relative general efficiency of the mind measured under similar conditions of knowledge, interest and habituation*]। **পিঁয়ো** (Pieron) বলেছেন, "বুদ্ধি কোন মানসিক কৌশল নয় ; নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে আমরা আচরণের যে মূল্যায়ণ করি, তাই হ'ল বুদ্ধি।" অর্থাৎ, তাঁর মতে বুদ্ধি হ'ল মূল্য নিরূপিত আচরণ [*Intelligence does not exist in the mental mechanism, it is only an effect, a functional resultant under certain defined condition, a behaviour value*]।

মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞা

এমনি ভাবে বিভিন্ন মনোবিদ্ বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন। এছাড়া এমন অনেক

সংজ্ঞা আছে, যাদের আমরা বিশেষভাবে কোন শ্রেণীভুক্ত করতে পারি না। যেমন, মনোবিদ্ **থার্সটোন** (Thrustone) বলেছেন, "বুদ্ধি হ'ল প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জীবন যাপনের ক্ষমতা" [*Intelligence is the capacity to live trial and error existence*]।

পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞা

মনোবিদ্ **ক্রিম্যান** (Freeman) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি কি পরিমাণে নিজের অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস করে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, তার উপর তার বুদ্ধি নির্ভর করে" [*Psychologically, degree of intelligence seems of depend on the facility with which the subject matter of experience can be organised into new patterns*]। **বার্ট** (C. Burt) বলেছেন, "ব্যক্তির জৈব-মানসিক সংগঠনের মধ্যে পুনর্বিন্যাস করে অপেক্ষাকৃত নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি" [*Power of maladjustment to relatively novel situation, by organising new psycho physical combinations*].

এই রকম বহু সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই, যে কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অন্যদিকে, বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে, তা পরস্পর বিরোধী নয়। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করলেও দেখতে পাই এই সব শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক নেই। যেমন, জৈবিক সংজ্ঞাগুলোর (Biological definition) মধ্যে মানুষের অভিযোজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষামূলক (Educational definition) সংজ্ঞায় মানুষের শিখন ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার শিখনও (Learning) এক রকমের অভিযোজনের প্রক্রিয়া। তাই শিখন-বুদ্ধির পরিচায়ক, অভিযোজন-বুদ্ধির পরিচায়ক, দু'টো কথাই এক। দু'টোরই মূল বক্তব্য ব্যক্তির আচরণের পরিবর্ধন। অন্যদিকে বুদ্ধি যে এক ধরনের মানসিক ক্ষমতা (Mental capacity) সেটার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলোতে। এই সব সংজ্ঞাগুলোর দ্বারা বুদ্ধির অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বুদ্ধিকে মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করে বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায় এই সংজ্ঞায়। অপর দিকে এই মানসিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমরা কি পাই, তাই বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং, তাদের মধ্যেও পরস্পর বিরোধের কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধি যে মানুষের জন্মগত ক্ষমতা একথা আধুনিককালে প্রত্যেক মনোবিদই স্বীকার করেন। এবং সেই মানসিক ক্ষমতা মানুষের সকল রকম বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে প্রকাশ প্রায় এবং শিখন সমেত সব রকম অভিযোজন-

আলোচনা

মূলক প্রচেষ্টায় সাহায্য করে, সে বিষয়েও বর্তমানে কোন মতভেদ নেই। সুতরাং এই সংজ্ঞাগুলোর প্রধান অসুবিধা হ'ল যে তারা কেউই সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির (intelligence) বৈশিষ্ট্যগুলোকে বা বুদ্ধিমূলক কাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে কোন সংজ্ঞার মধ্যে সংযোজিত করা হয় নি। তাই কোন একটা সংজ্ঞাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা যায় না।

এই কারণে আধুনিক অনেক মনোবিদ্ বুদ্ধির সংজ্ঞার (definition) বদলে, তার বিবরণের (Description of intelligence) উপর ঝোঁক দিয়েছেন। অর্থাৎ, বুদ্ধি বলতে আমরা কি কি ধরনের মানসিক ক্ষমতাকে বলি, সেগুলোর তালিকা তৈরী করেছেন। বৌদ্ধিক কাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এই ধরনের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। যেমন, **গ্যারেট** (Garret) বলেছেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন অর্থাৎ, ভাষা, সংখ্যা, ছবি, সমীকরণ, সূত্র ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি [*The abilities demanded in the solution of problems which require the comprehension and the use of symbols/i.e., words, numbers, diagrams, equations, formulae etc.*]। মনোবিদ্ **স্টডার্ড** (Stoddard) তাঁর 'Meaning of intelligence' বইয়ে বুদ্ধির এই বিবরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বুদ্ধির নয়টি বৈশিষ্ট্যের বা গুণের কথা বলেছেন—(১) **কাঠিন্য** (Difficulty), (২) **জটিলতা** (complexity), (৩) **বিমূর্ততা** (Abstractness) (৪) **পরিমিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা** (Economy), (৫) **উদ্দেশ্যমুখী অভিযোজনের ক্ষমতা** (adaptiveness to a goal), (৬) **সামাজিক মূল্য** (social value) (৭) **সৃজনধর্মীতা** (Emergence of original), (৮) **একাগ্রতা** (concentration) এবং সবশেষে (৯) **প্রক্ষোভিক রোধ** (Emotional resistance)। তাঁর এই সংজ্ঞাকে এইভাবে বলা যায় **কঠিন বিমূর্ত জটিল পরিস্থিতিতে, প্রক্ষোভিক শক্তির রোধকে অতিক্রম করে, একাগ্রতার সঙ্গে স্বল্প শ্রমে সামাজিক মূল্য সম্পন্ন উদ্দেশ্যমুখী সৃজনাত্মক কাজ করার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি** [*Intelligence is the ability to undertake activities that are characterised by difficulty, complexity, abstractness, economy, adaptiveness to a goal, social value and the emergence of originals, and to maintain such activities under conditions that demand a concentration of energy and a resistance to emotional forces.*)[1] মনোবিদ্ **হ্যাগার্টিও** (Haggurty) অনুরূপভাবে বুদ্ধিকে কতকগুলো মানসিক প্রক্রিয়ার সমবায় হিসেবে বিবেচনা

বুদ্ধির বিবরণ

1. The meaning of intelligence : G. D. Stoddard.

করেছেন। তিনি বলেছেন, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পন ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার সমবায়কেই বুদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করা হয় [*It is a practical concept connoting a group of complex mental processes traditionally defined in systematic psychologies as sensation, perception, association, memory, imagination, discrimination, judgements and reasoning.*]। এমনিভাবে বহু মনোবিদ্ বুদ্ধির নির্দিষ্ট কোন সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার বদলে, তার বিবরণ (Description) দিয়েছেন। আধুনিক কালে রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধির বিবরণ দেওয়ার প্রবণতাও মনোবিদ্গণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই সব বিবরণ থেকেও বুদ্ধির সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোন ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু, বুদ্ধি সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়ার চেষ্টা মনোবিদ্গণ বহুদিন থেকেই করে আসছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা মনোবিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকার (Journal of Educational Psychology) পক্ষ থেকে বিভিন্ন মনোবিদ্গণের কাছ থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়। কিন্তু যে সব মনোবিদ্ এর উত্তর দেন তাতে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংজ্ঞা বা বিবরণ কোন দিক থেকে মনোবিদগণের মধ্যে মতৈক নেই।

বুদ্ধির কার্যকরী সংজ্ঞা

এই মতপার্থক্যের কারণ হিসেবে **মাইলস** (Miles) বলেছেন, 'বুদ্ধি' এই কথাটাকে আমরা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কোন ধরাবাঁধা অর্থ তার নেই। বুদ্ধির দ্বারা আসলে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝাতে চাই তার পরিপূর্ণ তালিকা তৈরী করা আজও সম্ভব হয় নি, বা সম্ভব হবেও না।[1] সুতরাং, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'টো উপায় আছে। বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য নিজস্ব কোন ধারণা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করা, অথবা ক্যাটেল (Cattel), হেব্ (Habb) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ যেভাবে বুদ্ধিকে বিবেচনা করেছেন, সে ভাবে তাকে গ্রহণ করা। প্রথমতঃ আমরা নিজের জন্য কার্যকরী বুদ্ধির এক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এই সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করব। এবং পরে বুদ্ধি সংক্রান্ত আধুনিক ধারণা সম্পর্কেও উল্লেখ করব। এখন বুদ্ধির কোন কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হ'লে, প্রথমেই বুদ্ধিমূলক কাজকে বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে বুদ্ধিমূলক কাজ কোনটা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধির অভীক্ষায় (Intelligence test) যে সব প্রশ্ন থাকে তাদের

1. " 'Intelligence' is an 'open' concept, because the number of activities legitimately characterised as indicators has never been listed—would indeed hardly be capable of being listed... "—H. J. Butcher : Human Intelligence its nature and assessment.

কতকগুলোকে বেছে নিতে পারি। মনোবিদ্‌গণ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বুদ্ধি অভীক্ষায় যে সব সমস্যা থাকে, তার সমাধানে মানুষের বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সুতরাং এরকম কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, বুদ্ধির মধ্যে কি কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে।

প্রথমতঃ, বুদ্ধির অভীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, কতকগুলো ধারণা বা শব্দ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় তাদের মধ্যে কোন দিক থেকে মিল আছে, যেমন—

সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা

বই, খবরের কাগজ, শিক্ষক, মিউজিয়াম, ইত্যাদির মধ্যে কোন দিক থেকে মিল আছে। এই রকমের প্রশ্ন সমাধান করতে হ'লে ব্যক্তিকে কি করতে হয়। ব্যক্তিকে বিশ্লেষণের দ্বারা এই বস্তু বা ধারণার মধ্যে সমতার গুণ খুঁজে বাহির করতে হবে। এই ধারণা বা বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্নের সঠিক সমাধান হবে, ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র মিলের (similarity) দিকটা খুঁজে বাহির করতে পারে। অর্থাৎ, প্রশ্ন অনুযায়ী সম্পর্ক খুঁজে না পেলে সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং, সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, এই রকম বুদ্ধিমূলক কাজ করার জন্য সমস্যা উপযোগী সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা ব্যক্তির মধ্যে থাকার দরকার। তা'হলে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে, **"যথাযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে বাহির করার ক্ষমতা"** (ability to find relevant relations) বুদ্ধির অন্তর্গত।

দ্বিতীয়তঃ প্রায় সমস্ত বুদ্ধির অভীক্ষায় এক ধরনের প্রশ্ন থাকে, যেখানে কতকগুলো, শব্দ বা ধারণা দেওয়া হয় এবং তার বিপরীতার্থক শব্দ বা ধারণা

সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা

লিখতে বলা হয় (supply the opposites)। এই রকম সমস্যায় তা'হলে দু'টো জিনিস দেওয়া থাকে। একটা শব্দ বা ধারণা আর একটা সম্পর্ক (বৈপরীত্যের)। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিকে তার অতীত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে এমন শব্দ বা ধারণা খুঁজে বাহির করতে হয়, যা প্রদত্ত সম্পর্কে (বৈপরীত্যের) প্রদত্ত কোন শব্দ বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত। যেমন ধরা যাক্ বলা হয়েছে—'শক্ত' এই শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ বল। এক্ষেত্রে 'শক্ত' এই শব্দটা আমাদের দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে 'বৈপরীত্যের' সম্পর্ক। এই সমস্যার সমাধান করতে হ'লে আমাদের অতীত শব্দ জ্ঞান থেকে এমন একটা শব্দ খুঁজে বাহির করতে হবে যা 'শক্ত' এই শব্দের সঙ্গে বৈপরীত্যের সম্পর্ক যুক্ত। অর্থাৎ 'নরম' শব্দটা আমরা এই পদ্ধতিতে খুঁজে পেলাম। কোন ধারণার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে অন্য কোন ধারণাকে যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সম্বন্ধ স্থাপনের প্রক্রিয়া (Education of correlate)। তা'হলে আমরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারি, **সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা** (ability to educe correlates) বুদ্ধির অন্তর্গত।

তৃতীয়তঃ, আর এক ধরনের সাধারণ প্রশ্ন বুদ্ধির অভীক্ষায় লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের প্রশ্নগুলো নিম্নলিখিত আকারে থাকে—

চোখ : দেখা : : কান : ?

অর্থাৎ এখানে সমস্যার ভাষা হ'ল—'চোখে'র সঙ্গে 'দেখার' যে সম্পর্ক কানের সঙ্গে কিসের সে সম্পর্ক বর্তমান। এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দু'টো পর্যায়ে কাজ করতে হয়। প্রথমতঃ খুঁজে বাহির করার দরকার চোখ এবং দেখার মধ্যে কি ধরনের মিল আছে। বিশ্লেষণের দ্বারা যখন আমরা বুঝতে পারি চোখের সঙ্গে দেখার কার্যগত (Function) সম্পর্ক, তখন প্রশ্নের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজে প্রশ্ন করি, কানের সঙ্গে কার্যগত দিক থেকে কার সম্পর্ক আছে। এইভাবে আমরা দুই স্তরে সমস্যার সমাধান করি। প্রথম পর্যায়ে সমাধানের জন্য আমাদের দরকার হয় সম্পর্ক খুঁজে বাহির করার ক্ষমতা (ability to find relevant relation) এবং দ্বিতীয় স্তরে দরকার হয় সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা (ability to educe correlate)। অর্থাৎ, পূর্বের দু'টো ক্ষমতাই একত্রে কাজ করে, আমাদের এই ধরনের সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে।

সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া ও সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতার সমন্বয়

এমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেক পরিস্থিতিতে এই দু'রকমের মানসিক ক্ষমতা কোন সময় একক-ভাবে আবার কখনও বা একত্রে আমাদের সমস্যা সমাধানের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বুদ্ধি বলতে বুঝি—(1) **বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথাযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে বাহির করার ক্ষমতাকে** বা (2) **সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতাকে** বা (3) **এই দুই ক্ষমতার সমবায়কে** [*Intelligence consists in* (1) *the ability to discover the dignificant relation in a given situation, or in* (2) *the ability to educe relevant correlates, or in* (3) *a combination of these abilities.*] এই কার্যকরী সংজ্ঞার সঙ্গে মনোবিদ্ স্পীয়ারম্যানের (Spearman) দেওয়া সংজ্ঞার যথেষ্ট মিল আছে। তিনি বুদ্ধির অন্তর্গত তিনটে ক্ষমতার কথা বলেছেন। **প্রথমতঃ,** নিজের মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবার ক্ষমতা (ability to discover ones own mental processes)। **দ্বিতীয়তঃ,** প্রত্যক্ষ বা ধারণার বস্তু সামগ্রীর মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা (ability to discover essential relations between items of knowledge, whether perceived or thought of)। **তৃতীয়তঃ,** সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা (ability to educe correlates)। আমাদের কার্যকরী সংজ্ঞায় স্পীয়ারম্যানের

আলোচনা

সংজ্ঞার একটা ক্ষমতা নেই। কিন্তু মানুষের নিজের মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সাধারণভাবে সর্বত্র প্রয়োজন। তাই তার উল্লেখকে অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। **ভেক্সলারও** (Wechsler) বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার সঙ্গে এই সংজ্ঞার যথেষ্ট মিল আছে। তিনি বলেছেন, যে সার্বজনীন ক্ষমতার দ্বারা কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী কাজ করতে পারে, বিচার বিবেচনামূলক চিন্তা করতে পারে এবং পরিবেশের সঙ্গে সার্থক-ভাবে অভিযোজন করতে পারে, তাই হ'ল বুদ্ধি [*Intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment.*]। সুতরাং, এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আমরা পূর্বোক্ত কার্যকরী সংজ্ঞাকে বুদ্ধির সার্থক সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

বুদ্ধি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা
[Modern Concept of Intelligence]

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, বুদ্ধির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণের অসুবিধা থাকায় মনোবিদগণ, তাঁর সার্বজনীন সংজ্ঞা গঠনের পক্ষপাতী নয়। আধুনিক মনোবিদগণের মধ্যে বিশেষভাবে এই প্রবণতা দেখা যায়। তাঁরা বুদ্ধিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন। এবং পৃথক পৃথক ভাবে তাদের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। এ সম্পর্কে মনোবিদ্ **ক্যাটেল** (R.B. Cattel) এবং **হেব্** (D.O. Hebb) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধির ধারণাকে কার্যকরী পর্যায়ে আনার জন্য আধুনিক মনোবিদ্গণের এই প্রচেষ্টা। ক্যাটেল (R. B. Cattel) বুদ্ধিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন,—তরল বুদ্ধি (Fluid) এবং কেলাসিত বুদ্ধি (Crystallised)। হেব্ও (Hebb) অনুরূপভাবে দু'রকমের বুদ্ধির কথা বলেছেন—A-বুদ্ধি (Intelligence-A) এবং B-বুদ্ধি (Intelligence-B)। হেব্ এর A বুদ্ধি ও ক্যাটেল এর তরল বুদ্ধি একই শ্রেণীভুক্ত এবং কেলাসিত বুদ্ধি ও B-বুদ্ধি একই শ্রেণীর। জীববিজ্ঞানীগণ যেমন প্রাণীর প্রকৃতিকে জন্মগতরূপ (Genotype) এবং প্রকাশমান (Phenotype) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তেমনি মনোবিদ্গণও বুদ্ধিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তার জন্মগতরূপ এবং প্রকাশমানরূপ। মানুষের বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্মগতরূপ (Gens-type) তার জীন (Gene) সংগঠনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ কি তা আমরা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। এটা একটা অনুমান (Hypothesis) মাত্র। তবে এই অনুমানের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া যায়। অন্যদিকে, ব্যক্তির প্রকাশমান রূপ (Phenotype)

বুদ্ধির শ্রেণী বিভাগ

তার জীন সংগঠন এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তির কোন বিশেষ-প্রকাশমান বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে তার কোন জীন দ্বারা নির্ধারিত কি না, সে কথা জীববিজ্ঞানীগণ বলেন না। তাঁদের মতে পরিবেশ যে ব্যক্তির জীন সংগঠনের উপর প্রতিক্রিয়া করেছে, তার নির্ণায়কই হ'ল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ঠিক একই অর্থে মনোবিদ্‌গণ বুদ্ধির শ্রেণীর বিভাগ করেছেন। ক্যাটেলের তরল বুদ্ধি (Fluid intelligence) বা হেব্‌ এর A-বুদ্ধি জীব বিজ্ঞানীগণ জন্মগত রূপেরই (Gesotype) সামিল। অর্থাৎ, বুদ্ধিকে আমরা সাধারণতঃ জন্মগত মানসিক ক্ষমতা (innate capacity) হিসেবে বিবেচনা করি ; আমাদের ধারণা বুদ্ধি এরূপ কোন ক্ষমতা যা আমরা জন্মগতভাবে জীন সংগঠনের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাই এবং এমন এক শক্তি যা আমাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শুধু এই নয়, এই জন্মগত ক্ষমতা আমাদের মানসিক বিকাশের সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু এই ধরনের বুদ্ধিকে আমরা বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তবে এ ধরনের জন্মগত ক্ষমতা যে মানুষের মধ্যে আছে, যা তার বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তার পক্ষে আমরা অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারি, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে। বুদ্ধি সম্পর্কে এই ধারণাকে A-বুদ্ধি বা, ধারণাগত বুদ্ধি, বা জন্মগত বুদ্ধি বলা হয়। সুতরাং এই ধরনের A-বুদ্ধির প্রত্যক্ষভাবে সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুশকিল এবং তাকে অনুশীলনের বাহ্যিক প্রচেষ্টা সবই অর্থহীন।

A-বুদ্ধি

অন্যদিকে বুদ্ধির একটা প্রকাশমান দিক আছে। এই প্রকাশমান দিকটাকেই বলা হয় কেলাসিত বুদ্ধি বা B-বুদ্ধি। আমরা কোন ব্যক্তির চাতুর্য, যুক্তিশক্তি, তাড়াতাড়ি কোন কিছু বুঝাবার ক্ষমতা ইত্যাদি দেখে তাকে বুদ্ধিমান (intelligent) বলি। অর্থাৎ, বুদ্ধিকে আমরা এই ধরনের কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এই যেমন বুদ্ধি জন্মগত নয়, তেমনি অর্জিতও নয়। জন্মগত ক্ষমতা ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল ব্যক্তিআচরণের মধ্যে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাই বুদ্ধির প্রকাশমান রূপ বা B-বুদ্ধি। এই ধারণা অনুযায়ী B-বুদ্ধিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি বিভিন্ন মানসিক কাজের মধ্যে। এটা জীববিজ্ঞানীগণের ব্যক্তির প্রকাশমানরূপের (Pheno-type) মত। এটা জন্মগত মানসিক ক্ষমতার বা বুদ্ধির পরোক্ষরূপ মাত্র। এই B-বুদ্ধি যেহেতু পরিবেশের উপর নির্ভর করে, সেহেতু, এর পরিমাণ বা প্রকৃতি মানুষের সমাজ ও গোষ্ঠী ভেদে পরিবর্তিত হয়। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যায় বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা এই B-বুদ্ধি (Intelligence-B) কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং পরবর্তী অংশে

B-বুদ্ধি

বুদ্ধি সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করব, তা বিশেষভাবে এই B-বুদ্ধির সম্বন্ধে ; জন্মগত বুদ্ধি বা A-বুদ্ধি সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ, পরিবেশের সঙ্গে জন্মগত বুদ্ধির প্রতিক্রিয়ার ফলে আচরণের মধ্যে আমরা সেই জন্মগত ক্ষমতার যে প্রকাশ-মানরূপ দেখতে পাই সে সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব ; কোন জন্মগত ক্ষমতা সম্পর্কে নয়। মনোবিদ্ **ভার্নন** (Vernon), এই বুদ্ধির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর দু'টো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। **প্রথমতঃ** এই বুদ্ধি, কোন ব্যক্তি জীবনে সব সময় স্থির থাকে না। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়। তবে একই রকম পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই রকম থাকে। **দ্বিতীয়তঃ** এই বুদ্ধি সম্পর্কে ধারণা সমাজ ভেদে পৃথক। কোন বিশেষ সমাজে যে আচরণকে বুদ্ধিমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অন্য কোন সমাজে তাকে সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নীতি প্রভাবিত যান্ত্রিক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই রকম পরিবর্তনশীল ধারণা গ্রহণ করায় আমাদের বিশেষ কিছু অসুবিধা তো হয়ই না বরং সুবিধাই হয়ে থাকে।

C-বুদ্ধি

ইংরেজ মনোবিদ্ ভার্নন্ (P. E. Vernon), ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আর এক ধরনের বুদ্ধির কথা বলেন। বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা ও বুদ্ধির অভীক্ষার বিভিন্ন ফলাফল অনুশীলন করে, তিনি বলেন, বুদ্ধি আর এক শ্রেণীরও হতে পারে। এই বুদ্ধিকে তিনি C-বুদ্ধি (Intelligence-C) নাম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষার (Intelligence tests) দ্বারা আমরা যে সংখ্যাগত পরিমাণ নির্ণয় করি, তার দ্বারাও বুদ্ধিকে বুঝাতে চাই। যেমন, বুদ্ধ্যাঙ্ক (I.Q) দিয়ে আমরা বুদ্ধিকেই বুঝাই। এই বুদ্ধির সঙ্গে A-বুদ্ধির এবং এমন কি B-বুদ্ধিরও অনেক পার্থক্য আছে। ভার্নন্ (Vernon), অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করে দেখান, যে বুদ্ধিকে আমরা প্রকাশ করি তাকেই C-বুদ্ধি বলেছেন। তবে এই C-বুদ্ধির আসল প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণভাবে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। একথা ভার্নন্ নিজেও স্বীকার করেছেন।[1] তবে সাধারণ ভাবে বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন, এই সব ফলাফলের যে ভাবে তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনেক সময় বেশ পার্থক্য থেকে যায়। একই অভীক্ষায় একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধাঙ্ক যা হয় একজন সাধারণ এক ব্যক্তিরও তাই হতে পারে। সুতরাং, বুদ্ধাঙ্ক বা বুদ্ধির পরিমাণের, দিক থেকে তাঁরা সমান। কিন্তু, প্রকৃত অভিজ্ঞতা তা বলে না। এই ধরনের

1. How far intelligence-C can serve as an index of intelligence A is still a matter of disagreement among Psychologist''—Vernon : Intelligence and actual environment.

সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ভার্নন্ এই তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে এ সম্পর্কে আরও গবেষণার অবকাশ আছে।

আলোচনা

বুদ্ধির এই আধুনিক শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও আরও অনেক শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন মনোবিদ্ করেছেন। তবে এই শ্রেণী বিভাগ ধারণাগত দিক থেকে করা হয়েছে। তাই এদের তাৎপর্য বুদ্ধি সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য যে সব শ্রেণী বিভাগ তা আপতঃ প্রকৃতিগত এবং তাদের সবই B-বুদ্ধি সংক্রান্ত যেমন থর্নডাইক (E.L. Thorndike) তিন রকম বুদ্ধির কথা বলেছেন। বিমূর্ত বুদ্ধি (abstract intelligence); অর্থাৎ, বিমূর্ত চিন্তনের জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়; দ্বিতীয়তঃ **কার্যকরী বুদ্ধি** (Concrete intelligence), প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ করার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। তৃতীয়তঃ **সামাজিক বুদ্ধি** (Social intelligence), সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এটা বুদ্ধির বাহ্যিক প্রকাশমান অবস্থার শ্রেণীবিভাগ কর্ম ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। সুতরাং, এই শ্রেণীবিভাগ আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী B-বুদ্ধির। তাই পূর্বেই আমার উল্লেখ করেছি আমরা পরবর্তী সব আলোচনাই এই B-বুদ্ধি (Intelligence-B) সম্পর্কেই হবে। এবং এই কারণে বুদ্ধির অন্যান্য শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বুদ্ধির তত্ত্বাবলী
[Theories of Intelligence]

বুদ্ধির তত্ত্ব কি ?

বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে যেমন আমরা মতভেদ লক্ষ্য করেছি, তেমনি বুদ্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণেও মনোবিদ্গণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্নভাবে বুদ্ধির প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে বহু প্রাচীন কাল থেকে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে আমরা নানা রকম মতবাদ দেখতে পাই। বুদ্ধির স্বরূপ সংক্রান্ত মনোবিদ্গণের বিভিন্ন মতবাদ বুদ্ধির তত্ত্ব (Theory of intelligence) হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বুদ্ধি সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদগুলোকে সাধারণতঃ তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। [এক] **রাজতন্ত্রবাদ** (Monarchic View), [দুই] **সামন্ততন্ত্রবাদ** (Oligarchic view) এবং [তিন] **অরাজকবাদ** (Anarchic View)।

বুদ্ধি সম্পর্কে প্রাচীন তত্ত্ব

বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে রাজতন্ত্রবাদের মূলবক্তব্য হ'ল বুদ্ধি এমন এক কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি যা মানুষের সব রকম কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, বুদ্ধি মনঃজগতের সর্বময় কর্তা যার নির্দেশে অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। যে ব্যক্তিজীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তিনি অন্য

যে কোন ক্ষেত্রেই একই রকম যোগ্যতার প্রমাণ দেবেন। কারণ, একই মানসিক ক্ষমতার বলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পারদর্শিতা নির্ভর করে। অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রবাদে বুদ্ধির সার্বজনীন একক ক্ষমতার কথাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী বুদ্ধি বলে কোন একক মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্ব মনঃজগতে নেই। কতকগুলো বিশেষ মানসিক ক্ষমতা আমাদের বিভিন্ন ধরনের আচরণের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব ক্ষমতাগুলোর সমবায়কে আমরা সাধারণভাবে বুদ্ধি বলে থাকি। অর্থাৎ, এই মতানুযায়ী মানুষের মনের কতকগুলো প্রাথমিক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাগুলোকে ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজ সম্পন্ন করে থাকি। এই মতবাদের সঙ্গে মানসিক শক্তিবাদের (Faculty Psychology) বিশেষ মিল আছে। অন্যদিকে, অরাজকবাদে বলা হয়েছে, মানুষের মন কতকগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ উপাদান দিয়ে গঠিত। বুদ্ধি বলতে আমরা কোন কেন্দ্রীয় শক্তিকেও বুঝি না বা বিশেষ কয়েকটা মানসিক শক্তির সমবায়কেও বুঝি না। মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে যে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মানসিক ক্ষমতা বা উপাদান আছে, তারা যেভাবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজ করে তাকেই বুদ্ধি বলে থাকি। কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে বলে, অন্য পরিস্থিতিতেও দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই সব প্রাচীন মতবাদ বা তত্ত্বগুলো পরীক্ষিত নয়, অনুমান মাত্র। কিন্তু বুদ্ধির বিশ্লেষণে, আধুনিককালে, মনোবিদগণ, রাশিবিজ্ঞানের (statistics) কৌশল বিশেষভাবে প্রয়োগ করায়, বুদ্ধি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা পাওয়া গেছে। এই সব বিজ্ঞান সম্মত তত্ত্বগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যেও অনুরূপ প্রাচীন ধারণা বর্তমান। তবে তাদের তত্ত্ব গাণিতিক সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আধুনিক মনোবিদ্যায় ও বুদ্ধি সংক্রান্ত প্রাচীনতত্ত্বেরই অস্তিত্ব আছে, তবে নবরূপে। আমরা এখন এই সব আধুনিক তত্ত্ব সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

॥ এক ॥ স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
[Spearman's Two-factor theory of Intelligence]

প্রাচীন রাজতন্ত্রবাদের অনুরূপ বুদ্ধির তত্ত্ব প্রদান করেছেন **স্পীয়ারম্যান**। স্পীয়ারম্যান (Spearman) ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধি সম্পর্কে এই দ্বি-উপাদানতত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত ফলাফল আমেরিকান জার্নাল ও সাইকোলজিতে (American Journal of Psychology), "*General intelligence objectively determined and measure*" নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ

সূচনা

করেন। স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্ব পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই তত্ত্ব মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনাকে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। মনোবিদ্ **বুচার** (H. J. Butcher)[1] স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, তাঁর এই তত্ত্ব মনোবিদ্‌গণকে মানুষের সাধারণ বুদ্ধির (General intelligence) গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা এখানে সাধারণভাবে আলোচনা করব। সাধারণভাবে, কারণ, এই তত্ত্ব যে জটিল গাণিতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, বিশেষ অসুবিধা হবে।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের মূল বক্তব্য

স্পীয়ারম্যান (Spearman), বহু শিক্ষার্থী এবং ছেলে-মেয়েদের বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদনের (cognitive performance) প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। বৌদ্ধিক কাজ বলতে আমরা সেই সব কাজকে বলছি যার সম্পাদনে প্রক্ষোভ-মূলক প্রতিক্রিয়ার কোন স্থান নেই। এই ধরনের বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদনকে বিশ্লেষণ করে, স্পীয়ারম্যান এই সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেন তা মানুষের বুদ্ধির প্রকৃতি নির্ণয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তিনি বলেছেন, যে কোন রকমের বৌদ্ধিক কাজ করতে গেলে, দু'রকমের মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয়। এই ধরনের উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান (factor) সব রকম বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে প্রয়োজন হয় ; এবং অপর উপাদান বিশেষ কাজের জন্য বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, যে কোন রকমের বৌদ্ধিক কাজ করার জন্য দু'রকমের মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই দু'রকমের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে এক রকম ক্ষমতা সব রকম বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে বর্তমান থাকে। এই ক্ষমতাকে স্পীয়ারম্যান বলেছেন, g-উপাদান (g-factor)। এছাড়া, প্রত্যেক কাজ করার জন্য আর এক ধরনের বিশেষ উপাদান প্রয়োজন হয়। এই উপাদান, বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধরনের হয়। এই উপাদানের নাম দিয়েছেন বিশেষ উপাদান (specific-factor) বা S-উপাদান (S-factor)। একটা উদাহরণ দিলে এ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। গণিতের (Mathe-

1. "......It is more due to Spearman than to any one man that the idea of 'general' intelligence as an important psychological factor has become part of the body of psychological knowledge, and indeed most people's way of thinking"—Butcher ; Human intelligence, its nature and measurement.

2. "......all branches of intellectual activity have in common one fundamental function, whereas the remaining specific elements of the activity seem in every case to be wholly different from that in all the others."—Spearman : The abilities of man.

matics) বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের কিছুটা সাধারণ উপাদান (I-factor) এবং এক ধরনের বিশেষ উপাদান (S-factor) S_m প্রয়োজন হয়। আবার ভাষা শিক্ষার জন্যও আমাদের কিছুটা সাধারণ উপাদান (I-factor) এবং এক ধরনের বিশেষ উপাদান (S-factor), S_l প্রয়োজন হয়। গান বাজনার জন্যও অনুরূপভাবে, কিছুটা সাধারণ মানসিক উপাদান (I-factor) এবং গান-বাজনার জন্য বিশেষ ধরনের ক্ষমতা (S-factor) S_s দরকার হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা সাধারণ মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশেষ কাজে পারদর্শিতা দেখানোর জন্য সেই কাজের উপযোগী বিশেষ মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয়। যেমন, গণিতের দক্ষতার জন্য দরকার S_m, ভাষার দক্ষতার জন্য S_l, গানের দক্ষতার জন্য S_s ইত্যাদি। স্পীয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, এই সিদ্ধান্তের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে একটু আলোচনা করা যাক।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, স্পীয়ারম্যান তাঁর তত্ত্ব গাণিতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন। এই গাণিতিক ভিত্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু উল্লেখ করছি। স্পীয়ারম্যান বহু ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজ (cognitive activities) করতে দেন। তাদের প্রত্যেকের পারদর্শিতাকে সাংখ্যমান (Numerical value) দ্বারা মূল্যায়ণ করেন। অর্থাৎ, সাধারণভাবে পরীক্ষায় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান বুঝানোর জন্য যেমন নম্বর দিই, ঠিক তেমনি বিভিন্ন কাজ করার ক্ষমতাকেও তিনি সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করেন। এরপর স্পীয়ারম্যান বিভিন্ন কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। বিশেষ এক রাশিবিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে (Statistical Method) এই সম্পর্কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই সম্পর্ককে রাশিবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সহগতি (correlation)। বিশ্বজগতে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে, সম্পর্কযুক্ত। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, দুটো চলের (variable) মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক বর্তমান থাকে। এই সম্পর্ককে বলা হয় সহগতি (correlation)। এই সহগতি বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে। যেমন ধরা যাক, থার্মোমিটার দিয়ে আমরা জর দেখি। এখানে দু'ধরনের চলের সহগতির দ্বারাই জর পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এই দুটো চল হ'ল—তাপমাত্রা (Temperature) এবং থার্মোমিটারের মধ্যে পারদের উচ্চতা (Height of the marcury column)। তাপমাত্রা যে হারে পরিবর্তন হয়, থার্মমিটারের পারদও সেই হারে উপরের দিকে উঠতে থাকে। অর্থাৎ, তাপ বাড়লে, পারদের উচ্চতা বাড়ে, তাপ কমলে, পারদের উচ্চতা কমে। সুতরাং তাপমাত্রা এবং পারদের উচ্চতার যে সম্পর্ক

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তি

আছে তা ধণাত্মক (positive)। এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় ধণাত্মক সহগতি (Positive correlation)। আবার, ধরা যাক্ একটা পাত্র থেকে কিছু জল আমরা অন্য পাত্রে ঢালছি। এক্ষেত্রে, এক পাত্রের জল যে পরিমাণ কমছে, অন্যপাত্রের জল ঠিক সেই পরিমাণ বাড়ছে, অর্থাৎ, একটা বাড়লে, অপরটায় কমছে, বা একটা কমলে অপরটায় বাড়ছে। দুটো চলের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় ঋণাত্মক সহগতি (Negative correlation)। আবার এমন অনেক চল আছে যাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। যেমন দৈহিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের পারস্পরিক নিরপেক্ষতাকেও সহগতির ভাষায় প্রকাশ করে থাকি। একে বলা হয় সহগতিশূন্যতা (Zero correlation or, indifference)। তা'হলে এই বিশ্ব প্রকৃতির যে কোন দুটো ঘটনাকে বা মানব প্রকৃতির যে কোন দু'টো বৈশিষ্ট্যকে (trait) আমরা এই তিন ধরনের সহগতির যে কোন একটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। রাশিবিজ্ঞানীগণ সহগতির প্রকৃতি ও পরিমাণকে প্রকাশ করার জন্য এক ধরনের সাংখ্যমান ব্যবহার করেন। এবং এই সাংখ্যমান নির্ণয় করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন। সহগতির পরিমাণকে যে সাংখ্যমান দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাকেই বলে সহগতির সহগাঙ্ক (co-efficient of correlation)। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব। সাধারণতঃ, এই সহগতির সহগাঙ্ককে ইংরেজী 'r' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে কোন দু'টো মানসিক বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার বা বস্তুর মধ্যে সহগতিকে প্রকাশ করার বিশেষ একটা রীতি আছে। যদি দুটো চল a, এবং b হয়, তাদের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ককে r_{ab}, এইভাবে লেখা হয়। যদি আমরা ইংরেজী (e) এবং বাংলা (b) এই দুই ভাষার মধ্যে সহগতি নির্ণয় করতে চাই, তবে সহগাঙ্ককে আমরা r_{eb} দ্বারা প্রকাশ করব।

স্পীয়ারম্যান বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে এই নিয়মে পারস্পরিক সহগতি নির্ণয় করে দেখলেন যে তাদের মধ্যেকার সহগতি একটা বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মকে তিনি বিশেষ একটা সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করেন। এই সমীকরণ হ'ল—

$$r_{da} \times r_{bc} - r_{ad} \times r_{bc} = 0$$

অর্থাৎ, a, b, c, এবং d এই চারটে বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ক ঐ নিয়ম মেনে চলে। a ও b এর মধ্যে সহগাঙ্ককে c ও d এর সহগাঙ্ক দিয়ে গুণ করে, তার থেকে, a, d এবং b, c এর সহগাঙ্কের গুণফল বিয়োগ করলে, বিয়োগফল শূন্য (0) হবে। স্পীয়ারম্যানের এই নিয়মকে বলা হয় **টেট্রাড্ সমীকরণ** (Tetrad equation), এবং বামদিকের বিয়োগফলকে বলা হয় **টেট্রাড্ অন্তর** (Tetrad difference)। স্পীয়ারম্যান লক্ষ্য করেছেন,

বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগাঙ্ককে পারস্পরিক সহগতির ছকে সাজালে, তারা তাদের মান বেশী থেকে ক্রমশঃ কমের দিকে যেতে থাকে। স্পীয়ারম্যানের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য, নীচে এমনি একটা ছক দেখান হ'ল। ধরা যাক, পাঁচটা বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে—ইংরেজী (a), বাংলা (b), অংক (c), ইতিহাস (d) এবং ভূগোল (e)। এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হয়েছে। অর্থাৎ, একটার সঙ্গে অপর চারটার সম্পর্ক কি তা নির্ণয় করা হয়েছে। নীচের ছকে তাদের এই সহগাঙ্ক পরিবেশন করা হ'ল। এই ছককে বলা হয় সহগতির ছক (correlation matrix)।

	ইংরাজী (a)	বাংলা (b)	অংক (c)	ইতিহাস (d)	ভূগোল (e)
ইংরাজী (a)	—	·৮৪	·৭০	·৫৬	·৪২
বাংলা (b)	·৮৪	—	·৬০	·৪৮	·৩৬
অংক (c)	·৭০	·৬০	—	·৪০	·৩০
ইতিহাস (d)	·৫৬	·৪৮	·৪০	—	·২৪
ভূগোল (e)	·৪২	·৩৬	·৩০	·২৪	—

এখন টেট্রাড্ সমীকরণে এই সহগাঙ্কের মান বসালে আমরা দেখতে পাই টেট্রাড্ অন্তর শূন্য হয়। টেট্রাড্ অন্তর সব সময় ঠিক শূন্য হবেই এমন কোন কথা নেই। পর্যবেক্ষণে নানারকম ত্রুটি থাকার জন্য এর কিছু তারতম্য হ'তে পারে। এখানে বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা একটা আদর্শ কল্পিত অবস্থার উল্লেখ করেছি। $r_{ab}='84$, $r_{cd}='40$, $r_{ad}='56$ এবং $r_{bc}='60$ সুতরাং, $r_{ab}\times r_{cd}-r_{ad}\times r_{bc}='84\times'40-'56\times'60='336-'336=0$.

আপাতঃ দৃষ্টিতে সহগতির সহগাঙ্কের এই প্রকৃতির অর্থ আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কিন্তু, স্পীয়ারম্যান গাণিতিক যুক্তির দ্বারা এর থেকে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা বিশেষভাবে মূল্যবান। তিনি গাণিতিক যুক্তির দ্বারা বললেন, যেহেতু বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহগতির সহগাঙ্ক টেট্রাড্

সমীকরণ মেনে চলে সেহেতু তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান (general factor) বর্তমান এবং প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাছাড়া আর একটা করে বিশেষ উপাদান বর্তমান। অর্থাৎ, তিনি প্রমাণ করলেন, দ্বি-উপাদান সম্পন্ন সহগতির ছকেরই (correlation matrix) কেবলমাত্র এই বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। এটাই হ'ল স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের মূল ভিত্তি।

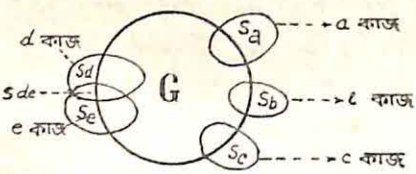
দ্বি-উপাদান তত্ত্বের তাৎপর্য

স্পীয়ারম্যান কিন্তু শুধুমাত্র গাণিতিক বিশ্লেষণ করেই তাঁর কাজ শেষ করেন নি। তিনি এর যে তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন, তা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্পীয়ারম্যান সাধারণ উপাদান (general factor) বা *g*-উপাদানকে গাণিতিক উপাদান বিশ্লেষণের (factor analysis) পদ্ধতির দ্বারা গাণিতিক মান (Mathematical value) হিসেবে পেয়েছেন। এর স্বরূপ কি, স্পীয়ারম্যান তা নিজেও বলতে পারেন নি। তবে এটা কোথায় থাকে তা তিনি বলতে পেরেছেন। মানুষের বিচার বিবেচনামূলক কাজকে বিশ্লেষণ করেই একে খুঁজে পাওয়া গেছে। যেহেতু এই সাধারণ উপাদান (*g*-factor) মানুষের সব রকম বিচার-বিবেচনামূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, এবং যেহেতু অন্যদিকে, মানুষের বুদ্ধিও সব রকম বিচার-বিবেচনামূলক কাজে প্রয়োজন হয়, মনোবিদ্যার দিক থেকে এই সাধারণ উপাদানকে (*g*-factor) বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে পারি। স্পীয়ারম্যান নিজেও অনেক জায়গায়, এই সাধারণ মানসিক উপাদানকে বুদ্ধি (intelligence) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। স্পীয়ারম্যান বলেছেন, এটা এমন একটা শক্তি যা এক কাজ থেকে অন্য কাজে স্থানান্তরিত হয় [*It is some force capable of being transfer from one mental operation to another different one*] সুতরাং, স্পীয়ারম্যানের এই গাণিতিক তত্ত্ব অনুযায়ী এ কথা বলা যেতে পারে যে, যেহেতু '*g*' একটা সাধারণ সার্বজনীন উপাদান এবং সব রকম বিচার বিবেচনামূলক কাজ করতে গেলে তার প্রয়োজন হয়, সেহেতু তা মনেরও একটা সার্বজনীন ক্ষমতা। আর, মনের এই সার্বজনীন ক্ষমতা বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না। তা'হলে, এ দিক থেকে বিচার করতে গেলে, স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদানের গাণিতক তত্ত্ব বুদ্ধিরও তত্ত্ব। কারণ এর দ্বারা স্পীয়ারম্যান বুদ্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখার দরকার, একে বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্ব বললে ভুল করা হবে। স্পীয়ারম্যান কর্ম সম্পাদনের দক্ষতাকে বিশ্লেষণ করে দু'শ্রেণীর মানসিক উপাদানের খোঁজ পেয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধির দু'টো উপাদান নিয়ে গঠিত এ কথা বলেন নি। তিনি দু'টো উপাদানের মধ্যে সাধারণ উপাদানকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সে হিসেবে, একে বুদ্ধির এক উপাদানের তত্ত্ব (One-factor theory) বলা উচিত। এখানে প্রাচীন

রাজতন্ত্রবাদকেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই মত অনুযায়ী বুদ্ধি এমন এক সার্বজনীন সাধারণ মানসিক ক্ষমতা যা মানুষের সব রকম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজে প্রযুক্ত হয়।

স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বকে আমরা জ্যামিতিক ছবির দ্বারা খুব সহজে পরিবেশন করতে পারি। ধরা যাক, মাঝের বড় বৃত্তটা হ'ল সাধারণ উপাদান বা G। আর ছোট ছোট অধিবৃত্তগুলো একটা বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমূলক কাজের (Cognitive activities) সীমা রেখা। এখন স্পীয়ারম্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক কাজ করার জন্য কিছুটা করে সাধারণ উপাদান এবং কিছুটা করে বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক্ '*a*' একটা কাজ। এই কাজ করার জন্য যে পরিমাণ f উপাদান দরকার তা a অধিবৃত্ত ও বড় বৃত্তের সমপাতন দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর ঐ অধিবৃত্তের যে অংশটা বাইরে আছে তার দ্বারা বিশেষ উপাদানের পরিমাণ বুঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ a কাজের সম্পাদনের জন্য কিছুটা সাধারণ উপাদান (*g*-factor) বা সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে এবং কিছুটা এ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিশেষ ধরনের উপাদান S_a প্রয়োজন হয়েছে। এমনিভাবে, b, c, d, e, ইত্যাদি আরও কতকগুলো কাজ ছবিতে দেখানো হয়েছে। এবং তাদের বিশেষ উপাদানকে যথাক্রমে S_b, S_c, S_d, S_e ইত্যাদি দ্বারা পরিবেশন করা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সব কাজ করার জন্য সম পরিমাণ *g*-উপাদানের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, বিভিন্ন কাজ *g*-সম্পৃক্ততার (*g*-saturation) দিক থেকে পৃথক। দু'টো কাজের মধ্যে সহগতি (Correlation) নির্ভর করে এই সাধারণ উপাদানের পরিমাণের উপর বা তাদের *g*-সম্পৃক্ততার উপর। দুটো কাজের মধ্যে *g*-সম্পৃক্ততা যত বেশী হবে, তাদের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্কও তত বেশী হবে। আবার যাদের *g*-সম্পৃক্ততা কম, তাদের মধ্যে সহগতিও কম। ছবিতে, a এবং b কাজের মধ্যে যে সহগতি হবে, a এবং c কাজের মধ্যে তার চেয়ে বেশী সহগতি হবে। কারণ a ও c-এর *g*-সম্পৃক্ততা c এর চেয়ে বেশী। কিন্তু, সব সময়, সহগতি *g*-সম্পৃক্ততা দ্বারা নির্ণীত হয় না। যেমন, ছবিতে, d এবং e কাজের ক্ষেত্রে, সাধারণ, *g*-উপাদান ছাড়াও, বিশেষ উপাদানেরও মিল আছে। S_d ও S_e মধ্যেও কিছু সাধারণ ক্ষেত্র (Sde) আছে। অর্থাৎ, এটা বিশেষ উপাদানের মিল। এই বিশেষ উপাদানের অভিন্নতাও তাদের মধ্যে সহগতিকে বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং, তাদের মধ্যে এই সহগতিকে শুধুমাত্র *g*-সম্পৃক্ততা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা



বা, টেট্রাড্ অন্তর শূন্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানে শুধুমাত্র ছ'টো মানসিক উপাদান আছে। স্পীয়ারম্যান এই অসুবিধার কথা উপলব্ধি করে, পরবর্তী কালে (১৯২০) তাঁর এই তত্ত্বের মধ্যে অন্য এক উপাদানের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। এই ধরনের সাধারণ বিশেষ উপাদানের সমবায়কে (Overlapping specific factor) তিনি নাম দেন দলগত উপাদান (Group factor)। অর্থাৎ, যে ক্ষমতা বা উপাদান একের বেশী বৌদ্ধিক কাজে প্রয়োজন হয় অথচ সাধারণ উপাদানের মত সব কাজে প্রয়োজন হয় না তাকেই তিনি বলেছেন দলগত উপাদান (Group factor)। বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় একই রকম বিশেষ উপাদান দলগত উপাদানের সৃষ্টি করে।

॥ দুই ॥ থমসনের বাছাই তত্ত্ব ও অন্যান্য তত্ত্ব [Thompson's Sampling theory and other theories]

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের সমালোচনা

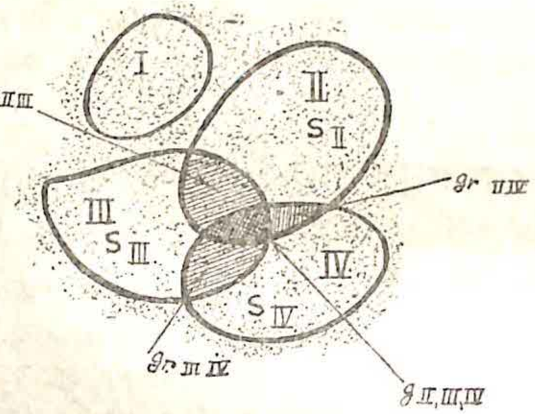
স্পীয়ারম্যানের মতবাদ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে ; বহু সমালোচনা হয়েছে তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্বের। এই সমালোচকদের মধ্যে থম্‌সনের (Thompson) নাম বিশিষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁর মতে বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহগতি (correlation coefficient) যে টেট্রাড্ সমীকরণের (Tetrad equation) নিয়ম মেনে চলে, সেটা ঠিক ; কিন্তু, তার ব্যাখ্যা দ্বি-উপাদান ছাড়াও দেওয়া সম্ভব। আমরা একটা মাত্র সাধারণ উপাদান (general factor)-এর কথা না বলে, শুধুমাত্র দলগত উপাদানের (group-factor) ধারণার দ্বারা সহগতির এই প্রকৃতিকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। স্পীয়ারম্যান, আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি, তিনি নিজেও পরবর্তীকালে এই দলগত উপাদানের (group-factor) অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Human ability" বইয়ে তিনি তাই মন্তব্য করেছেন, দ্বি-উপাদানের তত্ত্ব বুদ্ধির বা মানসিক ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে শেষ কথা নয় ; মানসিক ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণের একটা প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে।[1]

থমসনের বাছাই তত্ত্ব

থমসন্ (G. Thompson), তাই শুধুমাত্র দলগত উপাদান দিয়ে বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী, আমাদের মন কতকগুলো মৌলিক পরস্পর নিরপেক্ষ উপাদানের সমবায়ে গঠিত। এই সব মৌলিক উপাদান এতই সূক্ষ্ম যে তাদের প্রকৃতি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে কোন ধরনের কাজ করার জন্য এদের কতকগুলো প্রয়োজন হয়। এবং এই সব মৌলিক উপাদান-

1. "The two factor theory only indicates the initial degree of analysis, certainly not the ultimate'—C. Spearman & Wynn Jones ; Human ability.

গুলোর সমবায়েই বিশেষ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন কাজের জন্য কোন কোন মৌলিক উপাদান প্রয়োজন তা নির্ণীত হবে কাজের প্রকৃতির দ্বারা। বিভিন্ন কাজের মধ্যে সহগতি নির্ভর করে এই মৌলিক উপাদানের সমবায়ের উপর। বা, এই মৌলিক উপাদানগুলো দলগতভাবে সহগতির নির্ধারণ করে। সুতরাং, এর দ্বারা বৌদ্ধিক কাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়।



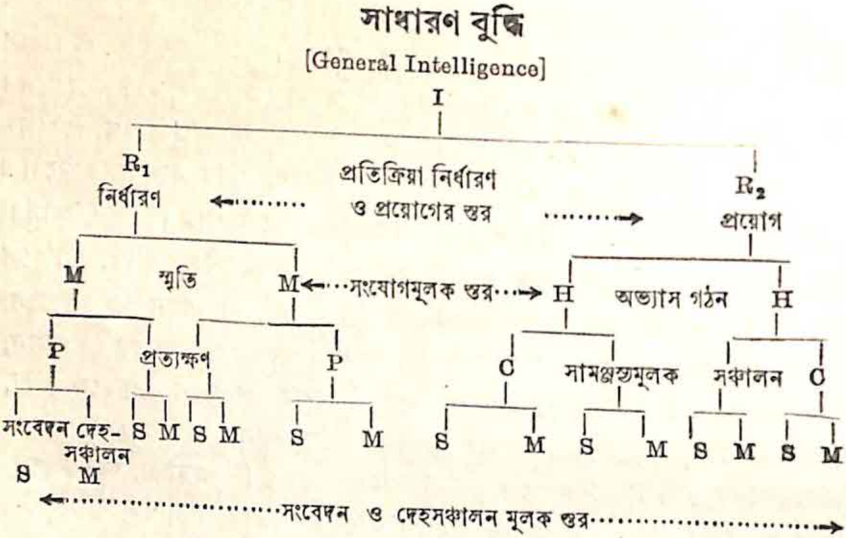
কোন কাজে কত পরিমাণ মানসিক উপাদানের প্রয়োজন হবে এবং কোন কোন উপাদানের প্রয়োজন হবে, তা নির্ভর করে বাছাই এর নীতির (Sampling & Chance) উপর। থমসনের তত্ত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার জন্য আমরা উপরের ছবির সাহায্য নিচ্ছি। ছবিতে বিন্দুগুলো দিয়ে মৌলিক উপাদান-গুলোকে পরিবেশন করা হয়েছে। এখন কোন বিশেষ কাজ I এর জন্য যে মানসিক উপাদানগুলো কার্যকরী তাদের (I) চিহ্নিত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আবার II নম্বর III নম্বরও IV নম্বর কাজের জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন হয়েছে, তাদেরও অনুরূপভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এখন, বিভিন্ন কাজের মধ্যে একই রকম মৌলিক উপাদানের পরিমাণ যত বেশী হবে, তত তাদের মধ্যে সহগতিও বেশী হবে। যেমন এখানে I নং কাজের উপাদানের সঙ্গে অন্য কোন কাজের উপাদানের মিল নেই। সুতরাং, তার সঙ্গে অন্য কাজের সহগতি নেই। কিন্তু II, III এবং IV নম্বর কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহগতি বর্তমান। II নং এবং III নং কাজের মধ্যে যে পরিমাণ সহগতি আছে, II নং IV এর মধ্যে তার চেয়ে কম আছে। কারণ II এবং III নম্বর কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী। বিভিন্ন কাজের সীমারেখায় বেষ্টিত যে সাধারণ ক্ষেত্র তাকেই বলা হবে দলগত উপাদান (group factor)। থমসন্ (Thompson), তাই বলেছেন, বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে যে সহগতি তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের সঙ্গে এই মতবাদের আদর্শগত বিশেষ কোন অমিল নেই। স্পীয়ারম্যান নিজেও পরবর্তীকালে দলগত উপাদান (group-factor) এর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, থমসন্ যে শুধুমাত্র দলগত উপাদানের কথা বলেছেন সেটাও আংশিক সত্য। কারণ, তাঁর মতবাদের মধ্যেও আমরা স্পীয়ারম্যানের মত তিন ধরনের উপাদান দেখতে পাই। যদি, আমরা একত্রে নানা রকম বৌদ্ধিক কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়া অনুশীলন করি, তা'হলে দেখব, তারা বাছাই এর নিয়ম অনুযায়ী (Sampling) এমন কতকগুলো উপাদানকে একত্রিত করবে, যা তাদের সব গুলোর জন্য প্রয়োজন হয়। যেমন, এখানে II, III এবং IV নম্বর কাজের মধ্যে এরকম সাধারণ ক্ষেত্রকে *g* II, III, IV দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এই মৌলিক উপাদানের সমবায়কে আমরা স্পীয়ারম্যানের *g* উপাদানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এছাড়া, কতকগুলো ক্ষেত্রে দেখা যাবে, যা দু'টো বা তার বেশী কাজের বেলায় সাধারণ, কিন্তু, সব কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ নয়। একে বলা যেতে পারে দলগত উপাদান (group factor)। ছবিতে g_r III, IV, g_r II IV, g_r II, III, ক্ষেত্রের দ্বারা এই ধরনের দলগত উপাদানকে পরিবেশন করা হয়েছে। সবশেষে, কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য একক। এগুলোকে আমরা বিশেষ উপাদান (*s*-factor) বলতে পারি। ছবিতে, S_I, S_{II}, S_{III}, এই ধরনের ক্ষেত্র। সুতরাং, স্পীয়ারম্যানের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই তত্ত্বের সৃষ্টি হলেও, এই দুই মতবাদই গাণিতিক দিক থেকে নির্ভুল। এই কারণে, বার্ট (Burt), ভার্নন্ (Vernon) প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ মনোবিদ্ এই মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বাছাই তত্ত্ব ও দ্বি-উপাদান তত্ত্ব

তবে **বার্ট** (Burt) বা **ভার্নন** (Vernon) এই তত্ত্বকে একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। **বার্ট** (C. Burt) বলেছেন, মানসিক উপাদান (Factor) বলতে আমরা শুধুমাত্র গাণিতিক সাংখ্যমানকে বুঝি না। এদের আমরা আচরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। তিনি এবং ভার্নন উভয়েই তিন ধরনের উপাদানকে মানুষের বিভিন্ন ক্ষমতাগুলোর ক্রমপর্যায়ের শ্রেণী বিন্যাসের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। স্পেনসার (Spencer), ম্যাক্‌ডুগাল (Mc-dougall) প্রভৃতি দার্শনিক ও মনোবিদ্‌গণের ধারণা অনুসরণ করে, বার্ট বলেছেন যে মানুষের সংবেদন ও দেহসঞ্চালনমূলক কাজকে (Sensor-motor) ভিত্তি করে মানসিক সংগঠনের সমন্বয় হয়। তার মধ্যেকার সমস্ত ক্ষমতাগুলোর সমন্বয় করার শক্তিকে তিনি বুদ্ধি বলেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী সমন্বয়ের বিভিন্ন ধাপ ছবিতে দেখানো হয়েছে।

বার্ট—ভার্ননের ক্রম-সমন্বয় মূলক তত্ত্ব



এই মত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে সাধারণ সরল সংবেদন (S) এবং দেহসঞ্চালন (M)। পরবর্তী পর্যায়ে এদের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষণ (P) ও সামঞ্জস্যমূলক (C) কাজ ব্যক্তিজীবনে লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংবেদন ও দেহসঞ্চালনমূলক আচরণের সমন্বয় হয়। তৃতীয় পর্যায়ে স্মৃতি (M) ও অভ্যাসের (H) বিকাশ হয়। চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া (R) নির্ধারণ ও প্রতিক্রিয়া প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় দেখা দেয়। এটাই হ'ল সর্বোচ্চ স্তর। বুদ্ধি এই প্রত্যেক পর্যায়ে কাজ করে, তবে বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রকৃতি ভিন্ন হয়। এই সব স্তর গুলোর মধ্যে সবচেয়ে নীচের স্তরকে আমরা বিশেষ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পরবর্তী স্তর গুলোকে দলগত উপাদানের স্তর হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আর সর্বশেষ স্তরকে আমরা সাধারণ উপাদান বলতে পারি। ভার্ননও (vernon) এইভাবে মনঃ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে দু'ধরনের দলগত উপাদান লক্ষ্য করা যায় —[এক] **ভাষা ও শিক্ষামূলক উপাদান** (V:ed) এবং [দুই] **প্রত্যক্ষণ ও যান্ত্রিক উপাদান** (K:M)। এর থেকেই অন্যান্য ধরনের গৌণ দলগত উপাদান এবং বিশেষ উপাদানের প্রকাশ দেখা যায়। বার্ট এবং ভার্ননের এই মতবাদ আধুনিক কালে বুদ্ধির বিবরণমূলক উপাদান (Descriptive factor) নির্ণয়ে সহায়তা করেছে। থমসন্ যে সব উপাদানের কথা বলেছিলেন, তাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু বার্ট বা ভার্নন যে সব উপাদানের কথা বলেছেন, সে গুলোকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি

এবং পরিমাণও করতে পারি বিভিন্ন অভীক্ষা (Test) দ্বারা। এই কারণে থমসনের বাছাই তত্ত্বের এই বিস্তৃতি বুদ্ধি সংক্রান্ত পরবর্তী গবেষণাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। বুদ্ধি সম্পর্কে এই মতবাদ, বুদ্ধির অভীক্ষা রচনায়ও আধুনিক কালে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

॥ তিন ॥ থার্স্টোনের বহু উপাদানের তত্ত্ব [Thurstone's Multiple factor theory]

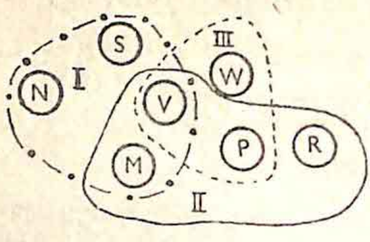
বুদ্ধি পূর্বোক্ত দুটো তত্ত্ব ছাড়া, রাশি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের মতবাদ গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় বহু উপাদানের তত্ত্ব (Multiple factor theory) বা প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতার তত্ত্ব (Theory of primary abilities)। এই মতের প্রবর্তক হ'লেন থার্স্টোন (L.L. Thurstone)। তিনি বিশেষ এক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানসিক পরীক্ষার ফলাফলের উপাদান বিশ্লেষণ (Factor-analysis) করে দেখলেন, যে যদিও বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতি আছে, কিন্তু তার পরিমাণ এত কম যে তার থেকে তাদের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান আছে এটা সিদ্ধান্ত করা যায় না। তা'ছাড়া এই বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ্য করা গেল কতকগুলো কাজ এক একটা শ্রেণীতে দলবদ্ধভাবে থাকে। এর থেকে থার্স্টোন (Thurstone) ধারণা করলেন, এই এক দলভুক্ত কাজগুলো একই মানসিক ক্ষমতার পরিচায়ক। থার্স্টোন ৫৬ রকমের বিভিন্ন বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) নিয়ে প্রায় ২৪০ জন শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধি কতকগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রাথমিক মানসিক উপাদান দ্বারা গঠিত। তিনি এরকম সাতটি প্রাথমিক উপাদানের কথা বলেছেন—

বহু উপাদানের তত্ত্ব

[এক] **স্থান প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা** (Spatial ability), [দুই] **সাধারণ প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা** (Perceptual ability), [তিন] **সংখ্যা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা** (Numerical ability), [চার] **ভাষাবোধের ক্ষমতা** (Word meaning), [পাঁচ] **স্মৃতি** (Memory), [ছয়] **ভাষার দক্ষতা** (Verbal fluency) এবং [সাত] **যুক্তি শক্তি** (Reasoning)। থার্স্টোন বলেছেন, এই সব প্রাথমিক উপাদানগুলো বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে কতকগুলো থাকে।[1] যেমন, এখানে, I নং কাজ করার জন্য স্থান প্রত্যক্ষণ (S), সংখ্যাগত (N), ভাষা প্রয়োগ (V) এবং স্মৃতি (M) এই চারটে

1. "It is much more likely that each test will require one or more abilities, but that these will differ from one test to another." Thurstone: Primary mental ability Psychol. Mong. no. 1, 1938.

ক্ষমতার প্রয়োজন। এদের সমবায়েই ঐ বৌদ্ধিক কাজ সম্পন্ন হয়। II নং কাজের জন্য, ভাষা প্রয়োগ (V) স্মৃতি (M), প্রত্যক্ষণ (P) এবং যুক্তির (R) ক্ষমতার প্রয়োজন। অন্যদিকে III নং কাজের জন্য ভাষাবোধ (W), ভাষা প্রয়োগ (V) এবং প্রত্যক্ষণের (P) ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। যেহেতু, যে কোন ধরনের বৌদ্ধিক কাজে এই উপাদান গুলোর কয়েকটা বা কোন ক্ষেত্রে সব কয়টারই প্রয়োজন হয়,



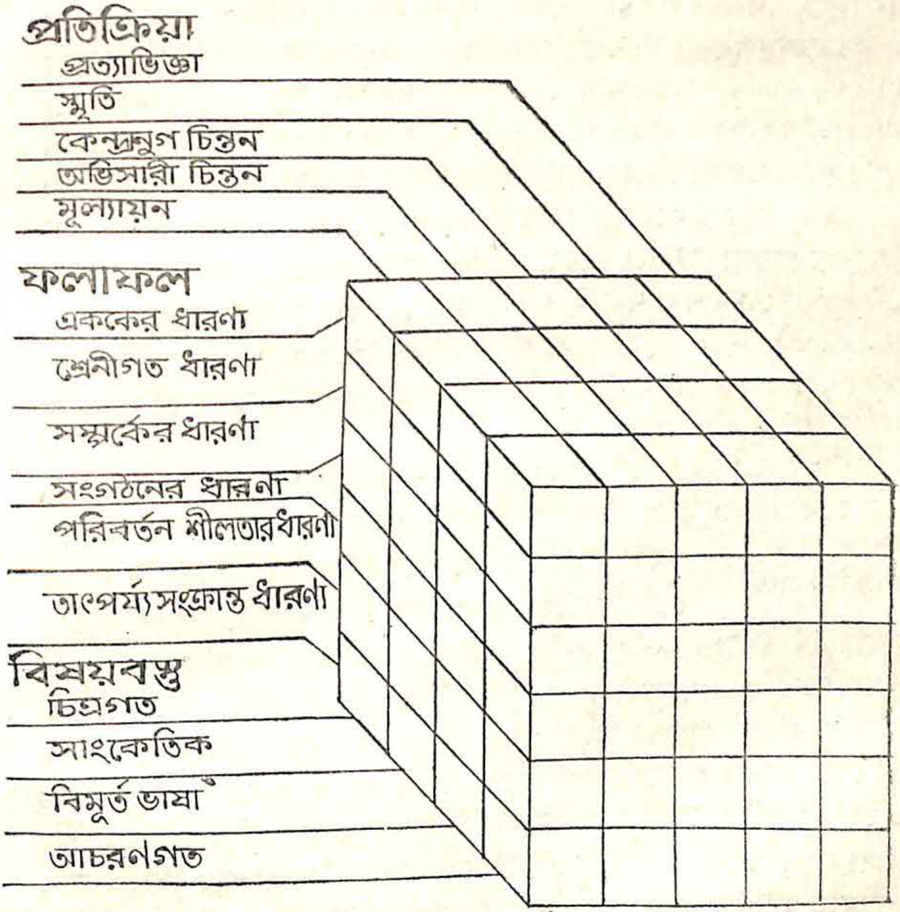
থার্স্টোন বলেছেন, এই কয়েকটা মৌলিক উপাদানের সমবায়েই বুদ্ধি গঠিত। যদিও পরবর্তীকালে অনেক মনোবিদ্ থার্স্টোনের প্রাথমিক ক্ষমতা (Primary ability) নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন, তবুও আজকাল অনেক বুদ্ধির অভীক্ষা (intelligence test) এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠন করা হচ্ছে।

॥ চার ॥ গিলফোর্ডের বুদ্ধির সংগঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব [Guilford's theory on the Structure of Intellect]

আমেরিকায় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Southern California) অধ্যাপক গিলফোর্ড (J. P. Guilford) এবং তাঁর সহকর্মীরা বুদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় 16 বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করেছেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গবেষণা সংক্রান্ত ফলাফলের 40টি বিবরণ প্রকাশ করেছেন। তিনি উপাদাণ বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে (Factor analysis) তিনি এ পর্যন্ত 70টি উপাদান (Factor) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও এই সব উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবু তাদের কিছু কিছু সমতার দিকও আছে। এই সমতার উপর ভিত্তি করে তিনি তাদের তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী, বুদ্ধির তিনটে মাত্রা (Three-dimension) আছে। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বুদ্ধির উপাদান গুলোকে তিনি বুদ্ধির তিনটে মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই তিনটে মাত্রা হ'ল—(1) প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত উপাদান। এই মাত্রাকে তিনি নাম দিয়েছেন, **প্রক্রিয়াগত মাত্রা** (Operational dimension)। (2) বিষয়বস্তু সংক্রান্ত উপাদান। অর্থাৎ, বুদ্ধিমূলক কাজের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। একে গিলফোর্ড (Guilford) বলেছেন, **বিষয়বস্তুগত মাত্রা** (Content dimension)। (3) জ্ঞানের প্রকৃতি সংক্রান্ত উপাদান। বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির কাছে জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু বিশেষ প্রকৃতিতে আসে। এই মাত্রাকে তিনি বলেছেন,

গিলফোর্ডের তত্ত্ব

ফলাফলের মাত্রা (dimension of product)। গিলফোর্ড প্রক্রিয়াগত মাত্রায় (Operational dimension) আবার সাধারণ প্রকৃতির পাঁচটি শ্রেণীর মানসিক ক্ষমতার কথা বলেছেন। এই মানসিক ক্ষমতার দ্বারা বৌদ্ধিক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই সব সাধারণধর্মী মানসিক ক্ষমতা গুলো হ'ল—



(1) **প্রত্যাভিজ্ঞা** (Cognition), (2) **স্মৃতি** (Memory), (3) **কেন্দ্রানুগ চিন্তন** (Convergent thinking), (4) **অভিসারী চিন্তন** (Divergent thinking) এবং (5) **মূল্যায়ণ** (evaluation)। প্রত্যাভিজ্ঞার দ্বারা জ্ঞানের বস্তুকে চেনা যায়; স্মৃতির দ্বারা জ্ঞানের সামগ্রীকে ধারণ করা যায়; কেন্দ্রানুগ চিন্তন দ্বারা প্রকৃষ্ট একক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়; অভিসারী চিন্তন দ্বারা বিভিন্ন রকম সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় এবং

মূল্যায়ণের দ্বারা বিষয়বস্তুর উপযোগীতা মূল্য নিরূপণ করা হয়। বিষয়বস্তুগত মাত্রায় (Content dimension) গিলফোর্ড বুদ্ধির ক্ষেত্রে চার রকম বিষয়বস্তু আয়ত্বের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—(1) **চিত্রগত বা মূর্ত** (Figural or concrete) বিষয়বস্তু আয়ত্বের ক্ষমতা; (2) **সাংকেতিক বিষয়বস্তু** (Symbolic) আয়ত্বের ক্ষমতা। যেমন, বর্ণমালা, সংখ্যা ইত্যাদি; (3) **বিমূর্ত ভাষাযুক্ত বিষয়বস্তু** বা আদর্শ (Semantic) আয়ত্বের ক্ষমতা এবং (4) **আচরণমূলক বিষয়বস্তু** (Behavioural) আয়ত্বের ক্ষমতা; বিশেষভাবে সামাজিক আচার আচরণ আয়ত্বে এই ক্ষমতা সাহায্য করে। ঠিক একইভাবে গিলফোর্ড, ফলাফলের মাত্রায় (dimension of product) ও ছয় রকমের ফল শ্রেণীভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ, মানসিক ক্ষমতা ও বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ক্ষমতার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ছয় রকমের ফল পাওয়া যায়। সেগুলো হ'ল—(1) **এককের ধারণা** (Unit), যেমন, শব্দার্থ ইত্যাদি; (2) **শ্রেণীগত ধারণা** (Classes) যেমন শব্দ সমষ্টির অর্থ ইত্যাদি; (3) **সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা** (Relation), (4) **সংগঠন সংক্রান্ত ধারণা** (System), (5) **পরিবর্তনশীলতা সংক্রান্ত ধারণা** (Transformation) এবং (6) **তাৎপর্য সংক্রান্ত ধারণা** (Implication)।

গিলফোর্ডের তাৎপর্য

গিলফোর্ডের এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা ছবিতে (পৃঃ ২৩৫) দেওয়া হয়েছে। ঘনকের তিন তলে তিনটে মাত্রা দেখানো হয়েছে। এবং প্রত্যেক মাত্রার অন্তর্গত ক্ষমতা শ্রেণীগুলোকেও দেখান হয়েছে। এই ত্রি-মাত্রিক শ্রেণী বিভাগের প্রথম মাত্রায় আছে, 5টি উপাদান, দ্বিতীয় মাত্রায় 6টি উপাদান এবং তৃতীয় মাত্রায় আছে 4টি উপাদান। সুতরাং গিলফোর্ডের মত অনুযায়ী তাদের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে, $5 \times 6 \times 4 =$ 120টি মানসিক উপাদান নিয়ে বুদ্ধির গঠিত হওয়া সম্ভব। এর মধ্যে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে প্রকাশিত শেষ রিপোর্ট পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই গিলফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা 70টি উপাদানকে বিশেষণের দ্বারা বাহির করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং বাকী এখনও 50টি উপাদানকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলছে। গিলফোর্ড (Guilford) এর এই তত্ত্ব মোটামুটিভাবে থার্স্টোনের প্রাথমিক উপাদানের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু, গিলফোর্ডের এই তত্ত্বে থার্স্টোনের মতবাদকে অনেক বিস্তৃত করা হয়েছে। গিলফোর্ডের বুদ্ধির প্রকৃতি ও উপাদান সম্পর্কে এই তত্ত্ব আধুনিক মনোবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অনেকে একে রসায়ন বিদ্যার পিরিয়ডিক্ টেবিল (Periodic table)-এর আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুধুমাত্র বুদ্ধি নয়, মানুষের সব রকম ক্ষমতার সার্থক ব্যাখ্যা করা যায় এই তত্ত্বের দ্বারা।

বুদ্ধির পরিমাপ
[Measurement of Intelligence]

বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করা যায় কি ভাবে। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি নিয়ে মতবাদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু, বুদ্ধির পরিমাপের ব্যাপারে তাদের মধ্যে এত মতবিরোধ নেই। পূর্বে ধারণা ছিল, মানসিক ক্ষমতাগুলোকে পরিমাপ করা যায় না। তাঁদের যুক্তি মনকে স্কেলের পাশে বসানো যায় না, বা, তরল অবস্থায় কোন পরিমাপক পাত্রের মধ্যে ঢালা যায় না, সুতরাং পরিমাপের প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বরং, মানুষ সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই পরস্পরের জ্ঞান, ক্ষমতা, মানসিক বৈশিষ্ট্য চরিত্র ইত্যাদির আপেক্ষিক পরিমাপ করে আসছে। তা'ছাড়া, সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তার দ্বারাও ক্ষমতার পরিমাপ করতে চাই। কিন্তু, প্রথম যুগে বুদ্ধি বা যে কোন মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ দু'টো ভ্রান্ত ধারণার উপর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌গণ মনে করতেন বুদ্ধি আর দৈহিক গঠনের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। এবং বুদ্ধির পরিমাপ, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাপের সঙ্গে সহগতি আছে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের মতবাদও গড়ে উঠেছিল। যেমন, ফ্রেনোলজি (phrenology); এর মূল বক্তব্য হ'ল মানুষের মাথার খুলির পরিমাপের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক থাকে। এই সব চিন্তাবিদ্‌গণ মাথার খুলির পরিমাপ থেকে মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা করতেন। ফিজিয়গ্‌নমি (physiognomy) নামে আর এক মতবাদ প্রচলিত ছিল, যেখানে মুখের অবয়ব থেকে মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা করা হ'ত। গ্র্যাফোলজিতে (Graphology) হাতের লেখাকে বিশ্লেষণ করে মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা করা হ'ত। কিন্তু এই সব পরিমাপের পদ্ধতির মুশকিল হ'ল বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানসিক ক্ষমতা সঠিকভাবে কি সম্পর্ক আছে, তা তখনকার দিনে জানা ছিল না। সব কিছুই অনুমান সাপেক্ষে হ'ত। তাই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মনোবিদ্যা যখন পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হ'ল তখন থেকে দেখতে পাই বুদ্ধিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিমাপ করার প্রচেষ্টায় মনোবিদ্‌গণ বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু, প্রাথমিক স্তরে আমরা লক্ষ্য করি ক্যাটেল (J. M. Cattel) প্রভৃতি মনোবিদ সাধারণ সংবেদনমূলক প্রতিক্রিয়া (sensory response) পরিমাপ করে বুদ্ধির পরিমাণ

বুদ্ধি পরিমাপের প্রাচীন পদ্ধতি

সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু, বর্তমানে, এই পদ্ধতির কোনটাকেই বিজ্ঞান সম্মত হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বা তাদের ব্যবহার করা হয় না। বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে এবং অনেক বেশী নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করার পন্থা আধুনিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে। বুদ্ধিকে পরিমাপ করার জন্য এখন যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাকে বলা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test)।

বুদ্ধির অভীক্ষা কি ?

সাধারণভাবে মনোবিদ্যায় অভীক্ষা (Test) বলতে আমরা কোন পরিমাপক যন্ত্রকে (Measuring instrument) বুঝি। যন্ত্র মানেই কারিগরি কৌশল সব সময় নাও হ'তে পারে। মনোবিদ্যায় অভীক্ষা বলতে আমরা বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক প্রতিক্রিয়া উৎপাদনকারী উদ্দীপকের সমবায়কে বুঝি। এই উদ্দীপক কোন শব্দ (word), কোন ভাষামূলক সমস্যা (written problem) বা প্রত্যক্ষ কোন কাজও (activity) হ'তে পারে। আর মানসিক বৈশিষ্ট্য বলতে, বুদ্ধি, স্মৃতি, যুক্তি ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতা বা ক্রিয়া হতে পারে। তা'হলে আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) বলতে এমন উদ্দীপক সামগ্রীর সমবায়কে বুঝি যেগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া করলে, যে ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করছে, তার বুদ্ধি প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ, **বুদ্ধির পরিচায়ক প্রতিক্রিয়া উৎপাদনকারী উদ্দীপক সমবায়কেই বুদ্ধির অভীক্ষা বলা হয়।** বুদ্ধির এই অভীক্ষাকে বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য মনোবিদ্‌গণ বহুদিন থেকে চেষ্টা করে চলেছেন। তার যোথ্যতা (validity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ইত্যাদি সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। মনোবিদ্যায় পরিমাপের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (subjectivity) কাটিয়ে উঠে পরিপূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক (objective) পদ্ধতির প্রবর্তনে তাঁরা বিশেষভাবে সচেষ্ট। ফলে মনোবিদ্যার মধ্যে এই পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিককালে বিশেষভাবে আলোচনা হচ্ছে। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে। মনোবিদ্যার বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে, দেখা যায় বুদ্ধির-অভীক্ষা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা সাধারণ মনোবিদ্যার বিকাশেও বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। বর্তমানে বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। এই সবগুলোর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এদের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব, এই উদ্দেশ্যে প্রথম বিনের (Binet) কথা উল্লেখ করছি।

বিঁনে-সাইমনের অভীক্ষা
[Binet-Simon Scale]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual difference) অনুশীলনের উপর মনোবিদ্‌গণের খুব ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এই বিষয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ফরাসী মনোবিদ্‌ **আলফ্রেড্‌ বিঁনে** (Binet) এবং তাঁর সহকর্মী **ডাক্তার সাইমন** (Simon) বুদ্ধি পরিমাপের বিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষা প্রকাশ করেন। বিঁনে (Binet) বহুদিন থেকেই বুদ্ধি পরিমাপ করার কৌশল সম্পর্কে ভাবছিলেন। তাঁর এই চিন্তাধারায় অনুপ্রেরণা জোগায়, তখনকার ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ। ফরাসী সরকারের সামনে, তখন একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল, শিক্ষার্থীদের প্রচুর পরিমাণে অকৃতকার্যতাকে কেন্দ্র করে। এই সব নিম্নমান সম্পন্ন ছাত্রদের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থ অপচয় হচ্ছিল। তাই সরকার ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিঁনে কে এমন কোন বিজ্ঞান সম্মত কৌশল আবিষ্কার করতে বললেন যার দ্বারা এই সব ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই বাছাই করা যায়। অন্যদিকে সাইমন ছিলেন সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন রোগীদের রোগ নির্ণয় করার খুব অসুবিধা হয়। কারণ তারা তাদের দৈহিক অসুবিধার কথা ঠিক মত বলতে পারে না। তাই সাইমনও বিঁনের কাজে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মত বুদ্ধির অভীক্ষা (intelligence test) প্রকাশিত হ'ল। এই কারণে, এই অভীক্ষা বিঁনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale) নামে পরিচিত। তাঁদের এই অভীক্ষার প্রকৃত নাম ছিল—"*A metrical scale of intelligence*"। এই অভীক্ষায় সব সমেত 30টি সমস্যা ছিল। এই সমস্যাগুলো কাঠিন্যানুক্রমে সাজানো ছিল (graded according to difficulty)। বিঁনে বুদ্ধিকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশের পৃথক পৃথক পরিমাপের চেষ্টা করেন নি। মনোযোগ, কল্পন, বিচার করণ, যুক্তি ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াকে সামগ্রিক ফলাফল দিয়ে বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই অভীক্ষায় যে সব সমস্যা নির্বাচন করেছিলেন, তা বিশেষভাবে ঐ সব মানসিক প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। এই অভীক্ষা বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে বিঁনে এবং সাইমন বিশেষ বিশেষ বয়সের স্বাভাবিক সীমা প্রশ্নের মধ্যে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, বিশেষ বয়সের কোন শিশু, তার যদি স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ হয়, তার কতগুলো প্রশ্ন পারা উচিত, তা তাঁরা নির্ধারণ করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অভীক্ষা

এই অভীক্ষার অনেক ত্রুটি ছিল। বিঁনে এবং সাইমনও তা উপলব্ধি করেছিলেন।

এই কারণে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, তিন বৎসর গবেষণার পর বিঁনে এবং সাইমন ঐ অভীক্ষার সংস্কার করে নতুন নামে প্রকাশ করেন। এবারে তাঁরা নামকরণ করেন—"*Development of intelligence in children*"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের অভীক্ষা

এই অভীক্ষায় সব সমেত 58টা সমস্যা ছিল। এই সমস্যাগুলোকে বয়সানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো হয়েছিল। এর দ্বারা 3 থেকে 13 বৎসর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপ করার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বয়সের জন্য সমস্যা পৃথক করা হয়েছিল। বিভিন্ন বয়সের জন্য প্রশ্ন সংখ্যা ছিল 4 থেকে 8টা পর্যন্ত। এই সর্বপ্রথম 'এজ্ স্কেল' (Age-scale)-এর প্রবর্তন করা হ'ল। কোন বয়সে কোন প্রশ্ন দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করার জন্য বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল। যে প্রশ্নটা কোন বিশেষ বয়সের শতকরা 60 থেকে 70 ভাগ ছেলে-মেয়ে উত্তর করতে পারে, সেটাকে সেই বয়সের প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। যে প্রশ্নে কোন বিশেষ বয়সের প্রায় সব ছেলেমেয়েরা অনুত্তীর্ণ হয়েছিল, সে প্রশ্নকে আর সেই বয়সের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় নি। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্করণের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই যে এতে প্রথম মানসিক বয়সের (Mental age) ধারণা স্থাপন করা হয়। কোন শিশু এই অভীক্ষায় কতগুলো প্রশ্ন উত্তর করতে পারে তার উপর নির্ভর করে তার মানসিক বয়স। যদি সে 8 বৎসর বয়স্ক ছেলের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলো সঠিকভাবে উত্তর করতে পারে, তার মানসিক বয়স এই ধারণানুযায়ী হবে 8 বৎসর। তবে তার সাধারণ বয়স যদি 5 বৎসর হয়, মানসিক বৃদ্ধির দিক থেকে সে 3 বৎসর এগিয়ে আছে বলতে হবে। আর যদি তার সাধারণ বয়স (chronological age) 8 বৎসর হয়, তা'হলে তার মানসিক বিকাশ ও দৈহিক বিকাশের মধ্যে সমতা আছে। অর্থাৎ, সে মানসিক বিকাশের দিক থেকে স্বাভাবিক। আবার তার বয়স যদি 10 বৎসর হয়, তা'হলে বলতে হবে সে মানসিক বিকাশের দিক থেকে 2 বৎসর পিছিয়ে আছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বহু মনোবিদ্ এই অভীক্ষার সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, কিছু সমস্যা ঠিক বয়স উপযোগী হয় নি।

১৯১১ খ্রীঃ অভীক্ষা

এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন, ক্রমশঃ উপরের দিকে বয়সের প্রশ্নগুলো তুলনামূলকভাবে বেশী কঠিন হয়ে গিয়েছে। বিঁনে নিজেও এটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আরও তিন বৎসর কাজ করার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, বিঁনে ও সাইমন তাঁদের অভীক্ষার আর একটা সংস্করণ প্রকাশ করেন। বিঁনে এই বছরই মারা যান, ফলে এটাই হ'ল সেই বিষয়ে তাঁর

সর্বশেষ প্রচেষ্টা। এই সংস্করণে পূর্বের অভীক্ষার কতকগুলো সমস্যাকে বাদ দেওয়া হয়। যে সব সমস্যার বা প্রশ্নের সমাধান ব্যক্তির বিশেষ অভিজ্ঞতার (Specific experience) উপর নির্ভর করে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়। এছাড়া বহু ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষা করে প্রশ্নগুলো বিশেষ বিশেষ বয়সের জন্য নির্বাচন করা হয়। এই অভীক্ষায় বয়স সীমাও বাড়ানো হয়। 3 থেকে 15 বৎসর বয়সের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে সমস্যা দেওয়া হয় এবং তা'ছাড়াও আর একটি শ্রেণী করা হয় যার নাম দেওয়া হয় প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রেণী (Adult group)। সব সমেত এই অভীক্ষায় 54টি প্রশ্ন বা সমস্যা ছিল। মানসিক বয়সের ধারণাকে এই সংস্করণে আরও দৃঢ়তর করা হয়। এবং পরিমাপের একক হিসেবে মাস বা বৎসরকে (বয়সকে) ধরা হয়। বিঁনে সাইমনের এই অভীক্ষার পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এ কথা স্থিরভাবে বলা যায়, তাঁরা এই সংস্করণে বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে 'এজ স্কেলের' (Age scale) যাথার্থ্যতাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁদের ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অভীক্ষার বিভিন্ন সমস্যার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হ'ল।

১৯১১-এর অভীক্ষা*

বয়স—॥ তিন ॥

1. চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেখানো
2. দুটো অংক পুনরাবৃত্তি করা
3. ছবি দেখে বিভিন্ন জিনিসের নাম করা
4. পদবী বলা
5. ছয় শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পুনরাবৃত্তি করা

বয়স—॥ পাঁচ ॥

1. দুটো বস্তুর ওজন তুলনা করা
2. বর্গক্ষেত্র দেখে আঁকা
3. দশ শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পুনরাবৃত্তি করা
4. চারটে মুদ্রা গণনা করতে পারা
5. একটা আয়তক্ষেত্রের দুটো অংশকে যুক্ত করা

বয়স—॥ দশ ॥

1. পাঁচটা বস্তুকে ওজনক্রমে সাজানো
2. দু'টো ছবি দেখার পর, মনে করে আঁকা
3. যুক্তিহীন বক্তব্যকে সমালোচনা করা
4. কঠিন প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া
5. তিনটে শব্দকে দু'টো বাক্যে ব্যবহার করা

বয়স—॥ বারো ॥

1. রেখার দৈর্ঘ্য নিরূপণ
2. তিনটে প্রদত্ত শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন
3. তিন মিনিটে ৬০টি শব্দ বলা
4. তিনটে বিমূর্ত শব্দকে ব্যাখ্যা করা
5. বিক্ষিপ্ত শব্দ রাশি থেকে অর্থ খুঁজে পাওয়া

বিঁনে-সাইমনের অভীক্ষা প্রকাশের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনোবিদ্‌গণ তাঁদের পদ্ধতির দ্বারা আকৃষ্ট হন। এবং বিভিন্ন দেশে বিঁনের পদ্ধতি অনুসরণ করে বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী হতে থাকে। তবে অনেকক্ষেত্রে বিঁনের অভীক্ষার অনুবাদ (Translation) বা পরিবেশ উপযোগী সামান্য পরিবর্তন (adaptation) করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইংলণ্ডে **বার্ট** (Burt) বুদ্ধির এক সার্থক অভীক্ষা তৈরী করেন। বিঁনের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আমেরিকায়

* কেবলমাত্র তিন, পাঁচ, দশ ও বারো বৎসর বয়সের সমস্যার সাধারণ প্রকৃতির উল্লেখ করা হ'ল।

যে সব কাজ হয়, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। **গডার্ড** (Goddard) প্রথম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিঁনে সাইমনের পদ্ধতি অনুসরণ করে এক বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করেন। **কালম্যান্** (Kuhlman) পর পর ১৯১২, ১৯২২ এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, এক অভীক্ষার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন। তবে ১৯১৬, ১৯৩৭ এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, টারম্যানের (Terman) প্রচেষ্টায় বিঁনে সাইমন স্কেলের যে সব সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। তাই সে সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ
[Stanford Revision]

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক টারম্যান (Terman) ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, বিঁনে সাইমন অভীক্ষার এক আমেরিকান সংস্করণ প্রচার করেন। একে বলা হয় **স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ** (Stanford revision), বা অনেক সময় বলা হয় **স্ট্যানফোর্ড বিঁনে অভীক্ষা** (Stanford Binet scale)। টারম্যান, বিঁনের অভীক্ষায় কিছু কিছু দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করেন, এবং সেগুলোকে দূর করে অভীক্ষার পুণঃ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত অভীক্ষায় মোট সমস্যা বা প্রশ্ন ছিল 90টি। অর্থাৎ বিঁনের শেষ সংস্করণের চেয়ে 36টি প্রশ্ন বেশী ছিল এই সংস্করণে। 3 থেকে 10 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে (Age group) 6টি করে প্রশ্ন ছিল। প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে কিছু কিছু বিকল্প প্রশ্নও ছিল। 12 বৎসর বয়সের জন্য 8টি প্রশ্ন ছিল, 14 বৎসর ও স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক (Average Adult) শ্রেণীতে 6টি করে প্রশ্ন ছিল। এছাড়া, উন্নত বয়স্ক (Superior Adult) একটা শ্রেণী নতুন দেওয়া হয়েছিল এবং এতেও 6টি প্রশ্নছিল। স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক শ্রেণীকে 16 বৎসর বয়সের সমান এবং উন্নত বয়স্ক শ্রেণীকে 18 বৎসর বয়সের সমান ধরা হয়েছিল। অর্থাৎ, এই অভীক্ষায় বয়স শ্রেণী (Age group) ছিল—3 থেকে 10 বৎসর, তারপর 12 এবং 14 বৎসর, এবং দুটো বয়স্ক শ্রেণী। 3 থেকে 10 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক সমস্যার জন্য স্কোর (score) ছিল, 2 মাস করে। 12 বৎসরের জন্য প্রত্যেক স্কোর ছিল 3 মাস এবং 14 বৎসর স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক ও উন্নত বয়স্ক শ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য স্কোর ছিল 4 মাস করে। প্রশ্ন সংখ্যা ও স্কোরের পদ্ধতি পরের পাতায় তালিকায় দেওয়া হ'ল। টারম্যান প্রায় 1000 ছাত্রছাত্রীর উপর পরীক্ষা করার পর বিভিন্ন বয়স শ্রেণীর প্রশ্নগুলো নির্বাচন করেন। ১৯১৬ সংস্করণে টারম্যান প্রথম মানসিক বৃদ্ধি বা বুদ্ধির সাংখ্যমান (Numerical value)

১৯১৬ খ্রীঃ স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ

নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধাঙ্কের (Intelligence Quotient, I. Q)[1] যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন। বুদ্ধাঙ্ক বলতে সাধারণ বয়স এবং মানসিক বয়সের অনুপাতকে

বয়স শ্রেণী	প্রশ্ন সংখ্যা	স্কোর
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	6×8=48	প্রত্যেক প্রশ্ন 2 মাস
12	8×1=8	প্রত্যেক প্রশ্ন 3 মাস
14 স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স, উন্নত বয়স	6×3=18	প্রত্যেক প্রশ্ন 4 মাস
বিভিন্ন বয়সে বিকল্প প্রশ্ন	12	বয়সানুযায়ী
মোট=90		

বোঝায়, তবে সুবিধার জন্য এই অনুপাতকে 100 দ্বারা গুণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ,

$$\text{বুদ্ধাঙ্ক (I. Q.)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (Mental Age)}}{\text{সাধারণ বয়স (Chronological Age)}} \times 100$$

সংক্ষেপে, $\text{বুদ্ধাঙ্ক (I. Q.)} = \frac{\text{মাঃ বঃ (M. A.)}}{\text{সাঃ বঃ (C. A.)}} \times 100$

8 বৎসরের একটি শিশু যদি 8 বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে, তা'হলে তার মানসিক বয়সও 8 বৎসর। এক্ষেত্রে তার বুদ্ধাঙ্ক হবে $\frac{8}{8} \times 100$ বা 100। এই শিশুকে বলা হবে স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন। আবার, ঐ শিশু যদি 8 বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো উত্তর করতে না পারে কেবলমাত্র 7 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো সঠিকভাবে সমাধান করতে পারে, তবে তার মানসিক বয়স হবে 7 বৎসর এবং তার বুদ্ধাঙ্ক হবে $\frac{7}{8} \times 100$ বা 88। আবার, সে যদি 9 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারে, তাহলে তার মানসিক বয়স হবে 9 বৎসর এবং বুদ্ধাঙ্ক হবে $\frac{9}{8} \times 100$ বা, 113। যাদের বুদ্ধাঙ্ক 100 এর চেয়ে কম তাদের বলা হবে নিম্ন বুদ্ধি সম্পন্ন, আর যাদের 100 এর বেশী তাদের বলা হবে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন। জার্মান মনোবিদ্ **স্টার্ণ** (Stern) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে টারম্যান, সার্থকভাবে বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করার প্রক্রিয়ার প্রথম প্রবর্তন করলেন তাঁর এই সংস্করণে। টারম্যানের এই অভীক্ষা আমেরিকায় প্রায় 20 বৎসর ধরে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হ'ত।

1. জার্মান মনোবিদ্ উইলিয়ম স্টার্ণ (William Stern) প্রথম বুদ্ধাঙ্কের (Intelligence Quotient) বা I.Q. প্রবর্তন করেন।

এর পর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, **টারম্যান** (Terman), **মেরিল** (Merrill) এর সহযোগিতায় এই অভীক্ষার আর একটা সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই অভীক্ষাকে তাঁদের দু'জনের নাম অনুসারে **টারম্যান-মেরিল সংস্করণ** (Terman-Merrill revision of the Binet-scale) বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে ভাষা ভিত্তিক অভীক্ষা হিসেবে এই সংস্করণ শুধুমাত্র আমেরিকায় নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহার করা হয়। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এক এক করে উল্লেখ করছি।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ

॥ **এক** ॥ এই সংস্করণে দুটো স্বয়ং সম্পূর্ণ অভীক্ষা তৈরী করা হয়। একটিকে বলা হয় এম-ফর্ম (M-form) এবং অপরটা এল্-ফর্ম (L-form)। মানসিক অভীক্ষার পরিভাষায় এদের বলা হয় সমান্তরাল অভীক্ষা (Parallel test)। অর্থাৎ, দু'টো অভীক্ষায় সমস্যাগুলো ভিন্ন রকমের হলেও একই বয়সের জন্য তারা সমান কাঠিন্যের (equal difficulty value)। অর্থাৎ, যে কোন একটা অভীক্ষা দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়। এবং একটাকে অপরটার প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

॥ **দুই** ॥ এই সংস্করণের প্রত্যেক অভীক্ষা (এম ফর্ম বা এল ফর্মে) ১২৯টি করে প্রশ্ন ছিল। বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বিভিন্ন দিক পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন এই অভীক্ষায় সংযোজিত করা হয়।

॥ **তিন** ॥ বয়স শ্রেণীকে ও (Age-group) উপরের দিকে ও নীচের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। এই অভীক্ষার বয়স শ্রেণী নীচের দিকে ২ বৎসর থেকে শুরু হয়েছে এবং উপরের দিকে তিনটে উন্নত বয়স্ক শ্রেণী দিয়ে শেষ হয়েছে। এই বিস্তৃতির ফলে অনেক বেশী বয়স পরিসরের মধ্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

॥ **চার** ॥ 2 থেকে 5 বৎসর বয়স পর্যন্ত 6 মাস অন্তর প্রশ্নগুলোকে বয়স শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল। টারম্যান ও মেরিল, তাঁদের পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কম বয়সে বুদ্ধির বৃদ্ধির হার বেশী থাকে। সুতরাং এই পর্যায়ে সঠিকভাবে বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে হ'লে, অভীক্ষার মধ্যে সমস্যার বিস্তৃতিও দ্রুত হওয়ার দরকার। 6 থেকে 14 বৎসর পর্যন্ত এক বৎসর অন্তর প্রশ্নগুলোকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছিল। এর পর, স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্কদের (Average Adult) একটা শ্রেণী এবং পরে উন্নত বয়স্কদের (superior Adult) জন্য 3টি শ্রেণী ছিল। অর্থাৎ, মোট 20টি শ্রেণীতে প্রশ্নগুলোকে ভাগ করা হয়েছিল। এই শ্রেণী গুলো হ'ল—2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 বৎসর বয়সের জন্য, স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক (Average adult), উন্নত বয়স্ক—I (Superior Adult—I) উন্নত বয়স্ক

—II (Superior Adult II) এবং উন্নত বয়স্ক—III (Superior Adult —III)।

১৯৩৭ সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

	বয়স শ্রেণী	প্রশ্ন সংখ্যা	স্কোর	মোট স্কোর
পূর্ণ অভীক্ষা	2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5	প্রত্যেকে শ্রেণী—6 মোট 6×7=42	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য এক মাস	
	বিকল্প প্রশ্ন	প্রত্যেক শ্রেণীতে 1, মোট=7		
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	প্রত্যেক শ্রেণী—6 মোট—6×9=54	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য দু' মাস	এ পর্যন্ত=14 বৎসর
	স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক	8	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য দু' মাস	1 বৎসর 4 মাস
	উন্নত বয়স্ক I, উন্নত বয়স্ক II, উন্নত বয়স্ক III	প্রত্যেক শ্রেণী—6 মোট 6×3=18	উন্নত বয়স্ক I এর জন্য 4 মাস করে উন্নত বয়স্ক II এর জন্য 5 মাস করে উন্নত বয়স্ক III এর জন্য 6 মাস করে	2 বৎসর 2 বৎসর 6 মাস 3 বৎসর
		মোট 129		মোট 22 বৎসর 10 মাস
সংক্ষিপ্ত অভীক্ষা	2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5	প্রত্যেক শ্রেণীতে 4 মোট 4×7=28	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য $1\frac{1}{2}$ মাস	
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	প্রত্যেক শ্রেণীতে 4 মোট 4×9=36	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য 3 মাস	এ পর্যন্ত 14 বৎসর
	স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক	4	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য 4 মাস	1 বৎসর 4 মাস
	উন্নত বয়স্ক—I উন্নত বয়স্ক—II উন্নত বয়স্ক—III	প্রত্যেক শ্রেণীতে 4 মোট 4×3=12	উন্নত বয়স্ক—I প্রত্যেক প্রশ্নের 6 মাস উন্নত বয়স্ক—II প্রত্যেক প্রশ্নের $7\frac{1}{2}$,, উন্নত বয়স্ক—III প্রত্যেক প্রশ্নের 9 মাস	2 বৎসর 2 বৎসর 6 মাস 3 বৎসর
		মোট—80		মোট—22 বৎসর 10 মাস

॥ পাঁচ ॥ 2 থেকে 5 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক 6 মাস অন্তর বয়স শ্রেণীতে এবং 6 থেকে 14 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে 6টি করে প্রশ্ন ছিল।

স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রেণীতে প্রশ্ন ছিল 8টি। আর, উন্নত বয়স্ক তিন শ্রেণীর (Superior Adult I, II, III) প্রত্যেকটি 6টি করে প্রশ্ন ছিল। এছাড়া 2 থেকে 5 বৎসর বয়স পর্যন্ত 7টি শ্রেণীতে 7টি বিকল্প (Alternative) প্রশ্ন ছিল। এইভাবে মোট 129টি প্রশ্ন বিভিন্ন বয়স শ্রেণীতে ভাগ করা ছিল।

॥ **ছয়** ॥ 2 থেকে 5 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক প্রশ্নের স্কোর হ'ল একমাস করে। 6 থেকে 14 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বয়স শ্রেণীর 6টি করে প্রশ্নের প্রত্যেকটির স্কোর হ'ল 2 মাস করে। স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়সে (Average Adult) 8টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির জন্য স্কোর ধরা হয়েছিল, 2 মাস করে। উন্নত বয়স্ক—1 এ 6টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির জন্য স্কোর হ'ল 4 মাস ; উন্নত বয়স্ক II এর 6টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির জন্য স্কোর হ'ল 5 মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক III এর 6টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির জন্য স্কোর ধরা হয়েছিল 6 মাস করে। সব কিছু একত্রে হিসেব করলে দেখা যাবে, এই অভীক্ষায় সর্বোচ্চ মানসিক বয়সের পরিমাণ হতে পারে 22 বৎসর 10 মাস।

॥ **সাত** ॥ এই অভীক্ষার মধ্যেই টারম্যান এবং মেরিল, একটা সংক্ষিপ্ত অভীক্ষা রচনা করেছিলেন। প্রয়োজন বোধে বুদ্ধির পরিমাপ তাড়াতাড়ি করার জন্য এই সংক্ষিপ্ত অভীক্ষাকে প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে মাত্র চারটি করে মোট 80টি প্রশ্ন নিয়ে এই অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছিল। প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে তাঁরা এই চারটি প্রশ্নকে তারকা চিহ্ন (*) দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। সেই মত, স্কোরকে বাড়ানো হয়েছে। বিবরণের তালিকায় এই সংক্ষিপ্ত অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলোও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

॥ **আট** ॥ এই অভীক্ষার আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, টারম্যান এবং মেরিল এখানে আংশিক স্কোর দেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পূর্বে ধারণা ছিল, যদি কোন শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সব প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারে তবে ঐ বয়সকে তার মানসিক বয়স (Mental age) হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু ঐ অভীক্ষায় তাঁরা মানসিক বয়সকে বিভিন্ন শ্রেণীর আংশিক বয়স স্কোরকে (Age score) যোগ করে নির্ণয় করার পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থী যদি 6 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট সব প্রশ্ন গুলো উত্তর করতে পারে তবে তার মানসিক বয়স হবে 6 বৎসর। এর পরে যদি সে 7 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলো উত্তর না করে মাত্র তিনটে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে, তার মানসিক বয়স সেই অনুপাতে বাড়বে। অর্থাৎ 3টি প্রশ্নের উত্তরের জন্য 2 মাস করে মোট 6 মাস তার মানসিক বয়সের সঙ্গে যোগ হবে। অর্থাৎ তার মানসিক বয়স দাঁড়াবে 6 বৎসর 6 মাস। আবার যদি 8 বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের আরও একটা সমাধান করতে পারে, সেই অনুপাতে তার মানসিক বয়স আরও 2 মাস বাড়বে। অর্থাৎ তার মানসিক বয়স হবে

6 বৎসর 6মাস+2মাস বা, 6 বৎসর 8 মাস। এমনিভাবে মানসিক বয়সের যৌগিক ধারণা প্রথম টারম্যান এবং মেরিল এই অভীক্ষা সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন।

॥ নয় ॥ সবশেষে, এই অভীক্ষার আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বুদ্ধির বৃদ্ধির বয়স সীমা নির্ধারণ। আমরা লক্ষ্য করেছি এই অভীক্ষায় সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে 22 বৎসর 10 মাস, কিন্তু কোন বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করতে গেলে, যদি তার বয়স 22 বৎসর 10 মাসের বেশি হয়, তা'হলে তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধাঙ্কও কমতে থাকবে। কিন্তু, তা ঠিক নয়। টারম্যান এবং মেরিল বলেছেন, 15 বৎসর বয়সের পর বুদ্ধির বিকাশ হয় না। স্থতরাং বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করার সময় বয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণ বয়সকে (Chronological Age) সব সময় 15 ধরতে হবে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে এই বয়স সীমা ধরা হয়েছিল 16 বৎসর।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা এই অভীক্ষায় কিভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় বা বুদ্ধাঙ্ক (I. Q.) নির্ণয় করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। মনে করা যাক্ 10

বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়

বৎসর বয়স্ক একজন ছেলের আমরা বুদ্ধি পরিমাপ করতে চাই। প্রথমতঃ আমাদের এই অভীক্ষায় এমন একটা বয়স স্তর (Age level) নির্ণয় করতে হবে, যেখানে ছেলেটি সব প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে উত্তর করতে পারে। এই সর্বনিম্ন স্তর যেখানে ব্যক্তি সবগুলো প্রশ্ন উত্তর করতে পারে তাকে বলা হয় **প্রাথমিক বয়স** (Basal age)। সাধারণতঃ প্রচলিত নিয়ম হিসেবে পরিক্ষার্থীর সাধারণ বয়স থেকে দু'বৎসর নীচের প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করা হয়। অর্থাৎ, এই বিশেষ ছেলের ক্ষেত্রে আমরা তাকে 8 বৎসরের প্রশ্নগুলো দেবো। যদি সে ঐ বয়সের সব প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে তা'হলে তার প্রাথমিক বয়স (Basal age) ধরা হবে 8 বৎসর। যদি, সে তা না পারে, তা'হলে তাকে পরবর্তী বয়সশ্রেণী অর্থাৎ 7 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন দেওয়া হবে। এমনিভাবে সর্বনিম্ন বয়স স্তর খুঁজে বাহির করতে হবে। ধরা যাক এই ছেলেটি 8 বৎসরের জন্য সব প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে উত্তর করতে পেরেছে। স্থতরাং, তার প্রাথমিক বয়স হ'ল 8 বৎসর···(১)। এর পর তাকে 9 বৎসর শ্রেণীর প্রশ্ন-গুলো দেওয়া হবে। ধরা যাক এই শ্রেণীর 6টি প্রশ্নের মধ্যে সবগুলোই ঠিকভাবে উত্তর দিতে পেরেছে···(2)। তারপর তাকে 10 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো দেওয়া হবে। ধরা যাক্ এই বয়স শ্রেণীর 6টা প্রশ্নের মধ্যে 5টা সঠিকভাবে উত্তর করতে পেরেছে···(3)। এরপর তাকে 11 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো দেওয়া হলে সে 6টা প্রশ্নের মধ্যে 3টা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে··(4)। তারপর 12 বৎসরের প্রশ্নগুলোর মধ্যে সে একটা মাত্র উত্তর করতে পেরেছে

...(5)। এর পর দেখা গেছে পরবর্তী কোন স্তরে কোন প্রশ্নই সে উত্তর করতে পারে নি। এমনিভাবে আমাদের উপরের দিকেও এমন একটা স্তর খুঁজে বাহির করতে হবে, যারপর শিক্ষার্থী পর পর দু'টো শ্রেণীর কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে নি। যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ পরীক্ষার্থী প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে কিছু প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে, সে ক্ষেত্রে এই অভীক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত যতগুলো প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে, তার জন্য তাকে আংশিক স্কোর দিতে হবে, এবং এই সমস্ত স্কোরের যোগফল দ্বারাই তার মানসিক বয়স নির্ণয় করা হবে। এই মানসিক বয়সের ভিত্তিতেই তার বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করা হবে। যেমন, আলোচ্য উদাহরণে—

ছেলেটির সাধারণ বয়স—10 বৎসর।

1. প্রাথমিক বয়স—8 বৎসর

2·9	বৎসর বয়সশ্রেণীতে,	সঠিক উত্তর 6টি,	স্কোর—	2 মাস×6—	1 বৎসর
3·10	" " "	" 5টি	"	2 মাস+5—	10 মাস
4·11	" " "	" 3টি	"	2 মাস×3—	6 মাস
5·12	" " "	" 1টি	"	2 মাস×1—	2 মাস
6·13	" " "	" 0	"	2 মাস×0—	0
7·14	" " "	" 0	"	2 মাস×0—	0
			মানসিক বয়স—		10 বৎসর 6 মাস

$$\therefore \text{ বুদ্ধাঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{সাধারণ বয়স}} \times 100 = \frac{\text{10 বৎসর 6 মাস}}{\text{10 বৎসর}} \times 100 = 105$$

এখানে, মনে রাখার দরকার, বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ বয়স 15 বেশী ধরা চলবে না। মনে করা যাক কোন 30 বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির এই অভীক্ষায় মোট মানসিক বয়স নির্ণয় করা হয়েছে 18 বৎসর। তা'হলে, তার বুদ্ধাঙ্ক হবে—

$$\frac{\text{18 বৎসর (মা. ব.)}}{\text{15 বৎসর (সা. ব.)}} \times 100 = 120.$$

এমনিভাবে বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক মনোবিদ্ সমালোচনা করেছেন। নানারকম তাত্ত্বিক ও গাণিতিক দিক থেকে এর ত্রুটির কথা তাঁরা বলেছেন। এই সব কারণে এই ধরনের বুদ্ধাঙ্ক (I.Q.) নির্ণয়ের পদ্ধতি আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, টারম্যান তাঁর এই অভীক্ষার আর একটা সংস্করণ প্রকাশ করেন। একে ১৯৬০ এর স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ (1960, Stanford revision) বলা হয়ে থাকে। এই সংস্করণে, এল্ এবং এম ফর্মের বদলে একটা মাত্র অভীক্ষা তৈরী করা হয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ দু'ই ফর্ম থেকে সমস্যা বা প্রশ্নগুলো নির্বাচন করা হয়। তা'ছাড়া

এই অভীক্ষায় বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ধরা হয় 18 বৎসর। এই অভীক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ভেস্‌লারের (Weschler) পদ্ধতি অনুসরণে **বিচ্যুতিমূলক বুদ্ধ্যঙ্কের** (Deviation I. Q.) ধারণা। এখানে সাধারণ নিয়মে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় না করে, তাকে স্ট্যাণ্ডার্ড স্কোরে (Standard score) প্রকাশ করা হয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 100কে গড় ধরা হয় এবং 16কে সমক বিচ্যুতি (Standard deviation) হিসেবে ধরা হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই অভীক্ষার উপর পর্যাপ্ত পরীক্ষা হয় নি, তাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে মনোবিদ্‌গণের এখনও সন্দেহের অবকাশ আছে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের অনুরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এই অভীক্ষার অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় করা হয়েছে। এবং স্থানীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে, সংস্কারও করা হয়েছে। বাংলাভাষায় এই অভীক্ষার এক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগ।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অভীক্ষার প্রশ্নের প্রকৃতি

বয়স ॥ সাত ॥

1. আঙ্গুল গননা করা
2. সরল বাক্য শুনে পুনরাবৃত্তি করা
3. ছবি দেখে বিসাদৃশ অংশ খুঁজে বাহির করা।
4. তিনটে অংক শুনে বিপরীত দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা।
5. তিনটে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরী করা
6. টোকা দিয়ে শব্দ করলে তা গণনা করতে পারা।

বয়স ॥ নয় ॥

1. ছবি দেখে পরে মনে করে আঁকা
2. বাক্যের ইতঃস্তত বিন্যস্ত শব্দ ঠিক করে সাজানো
3. বিভিন্ন বাক্যের যুক্তির মধ্যে বৈসাদৃশ্য খুঁজে বাহির করা
4. জোড়া জোড়া শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে বাহির করা
5. ছড়া বলা
6. চারটে অংশ শুনে বিপরীত দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা।

বিঁনে-সাইমন স্কেলের বিভিন্ন সংস্করণের তুলনা মূলক সারসংক্ষেপ

বিঁনে সাইমন শ্রেণীর অভীক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত আমরা বুদ্ধির বিঁনে-সাইমন পদ্ধতি অনুসারে যে সব অভীক্ষা তৈরী হয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এই ধরনের অভীক্ষা যত বর্তমানে পাওয়া যায়, তাদের মোটামুটি তিনটে বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। **প্রথমতঃ**, এই জাতীয় অভীক্ষার পরিমাপের এককের (unit) একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই অভীক্ষায় পরিমাপের একক হ'ল

বয়স (Age)। এখানে প্রত্যক্ষভাবে মানসিক বয়স নির্ণয় করা যায়। প্রত্যেক প্রশ্নের বা সমস্যার স্কোর (score) বয়সে দেওয়া হ'য়ে থাকে। তাই একে মনোপরিমিতির ভাষায় **এজ্ স্কেল** (Age scale) বলা হয়। **দ্বিতীয়তঃ** এই

প্রকাশের সাল	প্রকাশক	প্রশ্ন সংখ্যা	বয়স শ্রেণী	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
1905	বিঁনে-সাইমন	30	—	কাঠিন্যানুসারে প্রশ্ন তালিকভুক্ত
1908	বিঁনে-সাইমন	58	3 থেকে 13 বৎসর	সর্ব প্রথম মানসিক বয়সের ধারণা দান
1911	বিঁনে-সাইমন	54	3 থেকে 15 প্রাপ্তবয়স্ক শ্রেণী	16 বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়ের মানসিক বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি
1916	টারম্যান	90	3 থেকে 10, 12, 14, স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স। উন্নতবয়স্ক	I. Q. বা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ এবং বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য সাধারণ বয়সের সীমা—16 বৎসর
1937	টারম্যান ও মেরিল	129, (এম্ ও এল্ ফর্মের প্রত্যেকটিতে	2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক, উন্নত বয়স্ক—I উন্নত বয়স্ক—II উন্নত বয়স্ক—III	সংক্ষিপ্ত অভীক্ষার ব্যবস্থা, বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য সাধারণ বয়সের সীমা—15 বৎসর
1960	টারম্যান			বিচ্যুতিমূলক বুদ্ধাঙ্কের ধারণা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ে সাধারণ বয়স সীমা—18 বৎসর

ধরনের অভীক্ষায় যে সব সমস্যা সংযোজিত হয় তা প্রায়ই ভাষা ভিত্তিক। ব্যক্তিকে উত্তর দিতে হ'লে বা সমাধান করতে হ'লে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। তাই একে **ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাও** (verbal test) বলা হ'য়ে থাকে। **তৃতীয়তঃ** এই ধরনের অভীক্ষায় দেখা গেছে, কোন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করতে গেলে, একজন পরীক্ষককে সারাক্ষণ এককভাবে তার প্রতি মনযোগ দিতে হয়। ফলে এক সঙ্গে একজনের বেশী ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তাই এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে, একে **ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (Individual test) বলা হয়।

বিঁনের পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত বুদ্ধির অন্যান্য অভীক্ষা

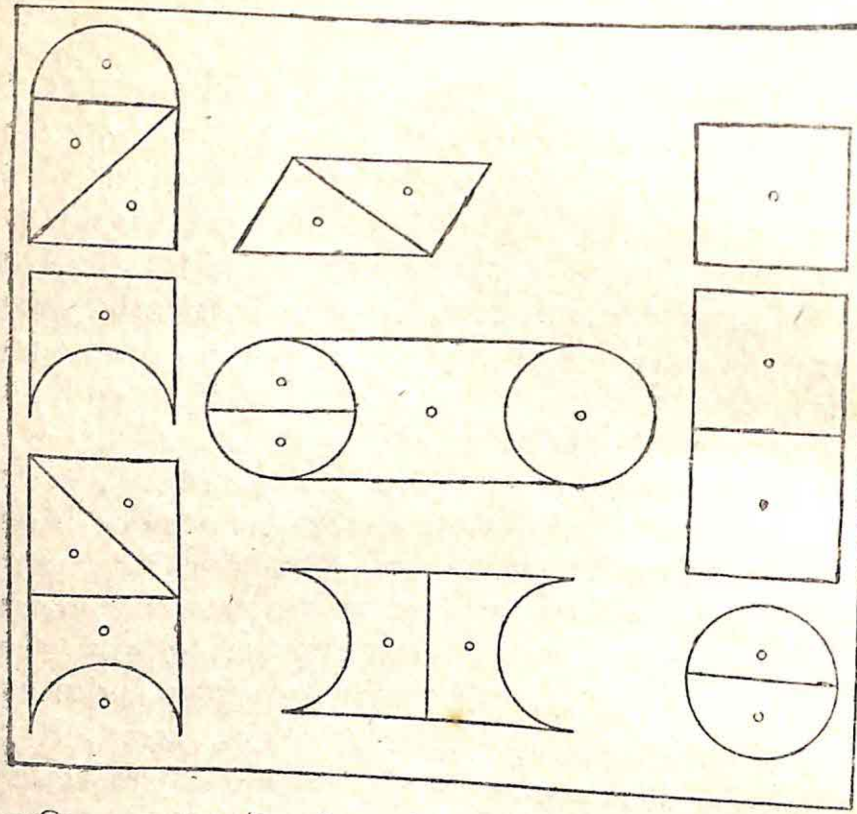
[Other Types of intelligence tests developed after Binet]

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, বিঁনের প্রথম বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকাশের পর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মনোবিদ্ তাঁর পদ্ধতির দ্বারা আকৃষ্ট হন। ফলে বুদ্ধি-পরিমাপের বিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষা তৈরী করার ব্যাপারে মনোবিদ্গণের বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। কিছু মনোবিদ্ বিঁনের প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরই অভীক্ষার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। ফলে বিভিন্ন দেশে বিঁনের অভীক্ষার অনুরূপ অভীক্ষার প্রকাশ হয়। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু, কিছু কিছু মনোবিদ্ বিঁনের প্রবর্তিত পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁদের সমালোচনা বিশেষভাবে পূর্বোক্ত তিনটে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, ফলে নতুন নতুন বুদ্ধির অভীক্ষা প্রস্তুত হতে থাকে।

সম্পাদনী অভীক্ষা

কোন কোন মনোবিদ্ বিঁনের অভীক্ষার ভাষাগত ভিত্তিকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। এই অভীক্ষায় ব্যক্তিতে ভাষার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে হয় বলে, সব ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যে সব ব্যক্তির ভাষাগত অসুবিধা (Language difficulty) আছে, যারা কথা বলতে পারে না, কানে শুনতে পায় না, তাদের বুদ্ধি এই অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তা'ছাড়া বুদ্ধি যে কেবলমাত্র বিমূর্ত চিন্তনে প্রকাশিত হয়, তাই নয়, মানুষের কারিগরি কর্ম সম্পাদনের মধ্যেও বুদ্ধির প্রকাশ হয়। এই কারণে, বিভিন্ন মনোবিদ্ বিঁনের পদ্ধতি থেকে দূরে সরে এসে, বুদ্ধির অভীক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ প্রয়োগমূলক সমস্যা নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ, এই সব অভীক্ষায় মৌখিক বা ভাষাগত সমস্যার পরিবর্তে, হাতে-কলমে কিছু কাজ করতে দেওয়া হয়। ব্যক্তির সম্পাদনের প্রকৃতি দেখে তার বুদ্ধি নিরূপণ করা হয়। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় **সম্পাদনী অভীক্ষা** (Performance test)। এই ধরনের অভিক্ষার সমাধানের জন্য বা প্রয়োগের জন্য ভাষার বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে এই ধরনের বহু অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন—**আলেকজাণ্ডারের পাশ্ এ্যলং অভীক্ষা** (Alexander's Pass-along test), **ডিয়ার বর্ণের ফর্মবোর্ড অভীক্ষা** (Dearborns Form board test), **কোহ্‌র ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা** (Koh's Block design test), **নক্স্‌এর কিউব কন্‌স্ট্রাক্‌সন অভীক্ষা** (Knox's Cube construction test), **হিলির পাজল্ অভীক্ষা** (Healy's Puzzle) গুড

এনাফ্ এর **মানুষ আঁকার অভীক্ষা** (Good enough's Man-drawing test), ইত্যাদি অভীক্ষা আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রচলিত। এখানে আমরা ডিয়ার বর্ণের ফর্মবোর্ড অভীক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ



করছি। এর দ্বারা এই জাতীয় অভীক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে। সাধারণতঃ ফর্মবোর্ডে (Form board) একটা কাঠের চৌকোনা বোর্ডের উপর কতকগুলো বিভিন্ন আকারের গর্ত থাকে। এই গর্তগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ভরার জন্য বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো থাকে। ডিয়ার বর্ণের ফর্মবোর্ডে, চারটি আদর্শ নক্সা আছে। বোর্ডটাকে এক একটা নক্সা অনুযায়ী সাজিয়ে পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। পরিক্ষার্থীর কাজ হ'ল অতিরিক্ত কাঠের টুকরো-গুলোকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে বোর্ডে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে, এবং বাইরে কোন টুক্‌রো না পড়ে থাকে। কাজ সম্পূর্ণ করতে মোট কত সময় লাগলো তার উপর স্কোর (score) দেওয়া হয়। এবং মোট কতবার নাড়াচাড়া করে সমস্যার সমাধান করলো, তার উপর বিচার করেও স্কোর (score) দেওয়া হয়। যদিও সম্পাদনী অভীক্ষা আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে, তবুও এই ধরনের অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) সম্পর্কে মনো-

বিদ্‌গণের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেক মনোবিদ্‌ই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এই জাতীয় অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির অন্তর্গত সব রকম মানসিক বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা যায় না। তাঁদের এই সন্দেহ অমূলক নয়। বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়, একে পরিত্যাগ করে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাকে গ্রহণ করা নয়। আধুনিক মনোবিদ্‌গণের অভিমত এই উভয় ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করলে, মানুষের প্রকৃত বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব হবে।

এই দু'ধরনের অভীক্ষার যুগ্ম প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন ভেক্সলার (Wechsler)। তিনি বেলভিউর সহযোগিতায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, দু'ধরনের সমস্যার সমন্বয়ে এক অভীক্ষা তৈরী করেন যার নাম হ'ল ভেক্সলার-বেলভিউ অভীক্ষা (Wechsler-Bellevue test)। এরপর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, শিশুদের জন্য এক অভীক্ষা তৈরী করেন। এর নাম হ'ল **ভেক্সলারের শিশুদের জন্য অভীক্ষা** (Wechsler Intelligence Scale for Children ; WISC) এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, বয়স্কদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্ম অপর একটি অভীক্ষা তৈরী করেন (Wechsler Adult Intelligence Scale ; WAIS)। বুদ্ধি সম্পর্কে ভেক্সলারের ধারণা হ'ল বুদ্ধি এমন এক সার্বজনীন শক্তি যা বিমূর্ত চিন্তনেও যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি, কর্মসম্পাদনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, দু'ধরনেরই বিষয়বস্তু ছাড়া বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর অভীক্ষার মধ্যে তিনি দু'ধরনের সমস্যার সংযোজন করেছেন। তাঁর দুটো অভীক্ষায় যে ধরনের সমস্যা ছিল তার বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

ভেক্সলারের অভীক্ষা

ভেক্সলারের বয়স্কদের জন্য অভীক্ষার সমস্যা

1. সাধারণ জ্ঞান (General information)
2. সাধারণ বোধগম্যতা (General Comprehension)
3. গাণিতিক যুক্তি (Arithmetical reasoning)
4. সংখ্যা সারি (Number series)
5. সাদৃশ্য (Similarities)
6. শব্দভাণ্ডার (vocabulary)
7. সংখ্যাগত সংকেত (Digit symbol)
8. ছবি পূর্ণ করা (Picture Completion)
9. ব্লক ডিজাইন (Block design)
10. ছবি সাজান (Picture arrangement)
11. ছবির বিভিন্ন অংশ একত্রিত করা (Picture Assembly)

ভেক্সলারের শিশুদের জন্য অভীক্ষার সমস্যা

1. সাধারণ জ্ঞান (General knowledge)
2. সাধারণ বোধগম্যতা (General Comprehension)
3. গাণিতিক যুক্তি (Arithmetic)
4. সাদৃশ্য (Similarities)
5. শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)
6. ছবিপূর্ণকরা (Picture completion)
7. ছবি সাজানো (Picture arrangement)
8. ব্লক ডিজাইন (Block design)
9. বস্তুর বিভিন্ন অংশ একত্রিত করা (Object Assembly)
10. কোড্ ব্যবহার করা (Coding)

এই সব সমস্যাগুলোর মধ্যে কতকগুলো সম্পাদনী সমস্যা এবং কতকগুলো ভাষা ভিত্তিক সমস্যা। ভাষা ভিত্তিক সমস্যাগুলো থেকে বুদ্ধাঙ্ক আলাদাভাবে বাহির করা হয়; আবার সম্পাদনী সমস্যাগুলো থেকে বুদ্ধাঙ্কগুলো আলাদা বাহির করা হয়। পরে তাদের মধ্যে যুগ্ম বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করা হয়। এই অভীক্ষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল বয়স্কদের বুদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করার ব্যবস্থা। এই কারণে, ভেক্সলারের অভীক্ষা আধুনিককালে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভেক্সলার তাঁর এই অভীক্ষায় প্রথম বিচ্যুতিমূলক বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের ধারণা দেন। এছাড়া, বয়স্ক ভিত্তিক স্কোর না দিয়ে সাংখ্যমানকে কিভাবে বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন করা যায়, তার পদ্ধতিও ভেক্সলার নির্ণয় করেন।

কোন কোন মনোবিদ্ বিঁনে সাইমন পদ্ধতির বয়স ভিত্তিক স্কোর (Age-score) দেওয়ার পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন, এই পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। প্রত্যেক বয়স শ্রেণীর মধ্যে মানসিক বিকাশগত পার্থক্য সমান নয়। সুতরাং, স্কেলের এককের মধ্যে তফাত লক্ষ্য করা যায়। ফলে তাঁরা সাধারণ সংখ্যা স্কোরের (Point scoring) পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই ধরনের অভীক্ষাকে **সাংখ্যমানগত অভীক্ষা** (Point-scale of intelligence) বলেছেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ার্কি এবং ব্রিজেস (Yerke & Bridges) এই ধরনের অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এই ধরনের অভিক্ষা আরও প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের অভীক্ষার সাংখ্যমানকে কিভাবে মানসিক বয়সে পরিবর্তিত করা যায়, তার পদ্ধতিও বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাংখ্যমানগত অভীক্ষা তৈরী হ'লেও মানসিক বয়স (Mental age) এবং বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের গুরুত্ব বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে আদৌ কমে নি।

সাংখ্যমানগত অভীক্ষা

আর একদিকে বুদ্ধির অভীক্ষার বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা হ'ল, এই অভীক্ষার প্রয়োগমূলতার (applicability) দিক থেকে। অনেকে বলেন বিঁনের ব্যক্তিগত অভীক্ষার (Individual test) দ্বারা আমরা এক সময়ে মাত্র একজন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করতে পারি। এর ফলে আমাদের অনেক বেশী সময় ব্যয় হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধের আপতকালীন অবস্থায় বহু সৈন্য নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে ছিল, তখন, আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত মনোবিদ্গণ একধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা আবিষ্কার করেন, যার দ্বারা একই সময়ে বহু ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। এই ধরনের অভীক্ষাকে বর্তমানে **দলগত বুদ্ধির অভীক্ষা** (Group test of intelligence) বলা হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের উৎসাহে **আর্মি আলফা অভীক্ষা** (Army Alpha test) ও **আর্মি বিটা অভীক্ষা** (Armi

দলগত অভীক্ষা

Beta test) নামে দু'টো অভীক্ষা প্রকাশ করেন। পরে, আবার এই অভীক্ষাগুলোর সংস্কার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও **আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন অভীক্ষা** (Army General Classification test) নামে আর একটা দলগত অভীক্ষা তৈরী করা হয়। এই সব অভীক্ষা বর্তমানকালে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। আর্মি আল্‌ফা অভীক্ষায় আট রকমের সমস্যা ছিল। সেই সমস্যাগুলো—(1) নির্দেশ অনুসরণ (Following direction), (2) গাণিতিক সমস্যা (Arithmetic problems), (3) কার্যকরী বিচারকরণ (Practical judgement), (4) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Synonym-antonym), (5) ইতস্ততঃ বিন্যস্ত বাক্য (Disarranged Sentences), (6) সংখ্যা সারি পূর্ণকরা (Number series completion), (7) সম্পর্ক স্থাপন (analogies), (8) সাধারণ জ্ঞান (General information)। এই আট রকমের সমস্যা নিয়ে আর্মি আল্‌ফা অভীক্ষা গঠন করা হয়েছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই অভীক্ষার অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। আর্মি বিটা অভীক্ষায় (Army Beta) অভীক্ষা মোট সাতটি সম্পাদন মূলক সমস্যা (Performance) ছিল। যেমন—(1) ধাঁধা (Mazedrawing); (2) ঘনক বিশ্লেষণ (Cube analysis), (3) X—O তালিকা। (4) সংখ্যাগত সঙ্কেত (Digit symbol), (5) সংখ্যার সঠিকতা নির্ণয় করা (Digit checking), (6) ছবির পরিপূর্ণতা (Picture Completion) এবং (7) জ্যামিতিক অঙ্কন (Geometric Construction)। এই বিশ্লেষণ থেকে যানা যায়, আর্মি আল্‌ফা হ'ল ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা এবং আর্মি বিটা হ'ল সম্পাদনী অভীক্ষা।

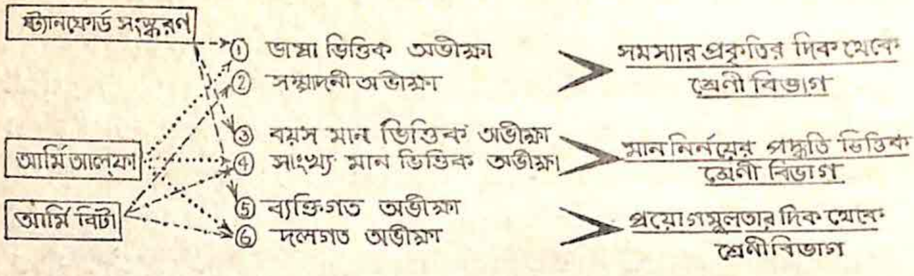
আলোচনা

তা'হলে বুদ্ধির অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই। বর্তমান কালে বিভিন্ন রকমের অভীক্ষার ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব অভীক্ষাগুলোকে আমরা পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে তিনটে মৌলিক গুনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। **প্রথমতঃ**, সমস্যার প্রকৃতির দিক থেকে (Test Content)—(1) ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা (Verbal test), ও (2) সম্পাদনী অভীক্ষা বা ভাষাহীন অভীক্ষা (Performance test or, non-verbal test), **দ্বিতীয়তঃ**, মান নির্ণয়ের পদ্ধতির দিক থেকে (scoring)— (3) বয়স-মান-ভিত্তিক অভীক্ষা (Age scale) ও (4) সাংখ্যমান-ভিত্তিক অভীক্ষা (Performance scale)। **তৃতীয়তঃ**, প্রয়োগমূলতার দিক থেকে (Administrability)— (4) ব্যক্তিগত অভীক্ষা (Individual test) এবং দলগত অভীক্ষা (Group test)। তবে এই কথা স্মরণ রাখার দরকার যে, কোন আধুনিক অভীক্ষার প্রত্যেক শ্রেণী এক একটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে, স্ট্যান-

ফোর্ড সংস্করণ—ভাষাভিত্তিক, বয়স মান সম্পন্ন ব্যক্তিগত অভীক্ষা (Individual, verbal test with age scoring)। অনুরূপভাবে, আর্মি বিটা,

বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণী বিভাগ

[Classification of intelligence tests]



দলগত বুদ্ধি পরিমাপের সাংখ্যমান সম্পন্ন সম্পাদনী অভীক্ষা (group non-verbal test with point scoring)।

বুদ্ধির অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার পূর্বে, আর একরকমের অভীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে, এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষার দ্বারা দেখেছেন, প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা আমরা উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। সুতরাং এই উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের যাতে পার্থক্য করা যায়, তার জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করার প্রচেষ্টা বর্তমান কালে চলছে। মনোবিদ্ এ্যালিস্ হিম্ (Alice Heim) ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে AH_5 নামে এক অভীক্ষা এই উদ্দেশ্যে তৈরী করেছেন।[1] তাঁর এই অভীক্ষা পরবর্তী কয়েক বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই অভীক্ষায় মোট 72টি সমস্যা ছিল। এর মধ্যে 36টি ভাষাভিত্তিক ও সংখ্যাসারি, এবং অন্যগুলো চিত্রগত (diagramatic)। এই অভীক্ষার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে হিম্ (A. Heim) বুঝতে পারেন, এর কিছু ত্রুটি আছে। তাই তিনি $A.H_6$ নামে আর একটা অভীক্ষা তৈরীর উপর গবেষণা করছেন। এই গবেষণার প্রাথমিক বিবরণ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই অভীক্ষা সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে প্রকাশ করা হয় নি। তবে এই অভীক্ষা প্রকাশিত হ'লে আরও সঠিকভাবে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

AH_5 ও AH_6

---

1. "$A'H_5$ is a test of general intelligence, designed for use with selected, highly intelligent, subjects. It is intended for adults, such as students and research workers and potential entrants to the university and the professions," Alice Heim : Appraisal of Intelligence,

বুদ্ধির পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যাবলী
[Problem Connected with the Measurement of Intelligence]

বুদ্ধির পরিমাপকে কেন্দ্র করে বর্তমানকালে, নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে, নানারকম তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা অন্যত্র কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। বিশেষভাবে বুদ্ধাঙ্কের বণ্টন (Distribution of I. Q), বুদ্ধির অভীক্ষার প্রকৃতি (Nature of intelligence test) এবং বুদ্ধাঙ্কের স্থিরতা (Constancy of I. Q.) নানারকম সমস্যা ও সন্দেহ মনোবিদ্‌গণের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এখন আমরা এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব।

বুদ্ধির বণ্টন
[Distribution of Intelligence]

বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টন

বুদ্ধির বণ্টন সম্পর্কে আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্যের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। বুদ্ধি স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে। অর্থাৎ, অনেক ব্যক্তির বা ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি কোন বিশেষ অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করলে দেখা যায়, খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি থাকে যারা উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন বা প্রতিভাবান (Superior)। বিপরীত দিকে, খুব কম সংখ্যক থাকে যারা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন। অধিকাংশ ব্যক্তি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন। এই সব সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধাঙ্ক সাধারণতঃ 90 থেকে 110 পর্যন্ত ধরা হয়। এদের সংখ্যা সমগ্র জন সংখ্যার প্রায় ⅔ অংশ। বাকী ⅓ অংশের কিছু থাকে ক্ষীণ বুদ্ধির দিকে আর কিছু থাকে উন্নত বুদ্ধির দিকে। উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন বা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আবার বুদ্ধাঙ্কের বিভিন্নতা অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ করা হ'য়ে থাকে।

বুদ্ধির অভীক্ষার প্রকৃতি
[Nature of Intelligence test]

বুদ্ধির অভীক্ষা ও বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা

বুদ্ধির অভীক্ষার সাধারণ সমস্যাবলীর প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আপাতঃভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পারদর্শিতার অভীক্ষার (Achievement tests) সমস্যার সঙ্গে বুদ্ধির অভীক্ষার সমস্যার বিশেষ কিছু তফাত নেই। তাই অনেকে এই অভীক্ষাগুলো পারদর্শিতার অভীক্ষার বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার (Achievement test or, scholastic test) সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে

বিবেচনা করেছেন। কিন্তু, এই রকমের ধারণা অসঙ্গত। কারণ, পারদর্শিতার অভিক্ষা বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার দ্বারা আমরা ব্যক্তির বিশেষ কোন সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণের প্রভাবে কতটা উন্নতি হয়েছে তা পরিমাপ করি। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন শ্রেণীর ছাত্রদের এক বৎসর বিশেষ কোন বিষয় পড়ানোর পর, তাদের ঐ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের কতটা উন্নতি হয়েছে, তা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা আমরা ব্যবহার করি, তাদেরই বলা হয়, পারদর্শিতার অভীক্ষা বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা (Achievement test/Scholastic test/ Attainment test)। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে, আমাদের সাধারণ পরীক্ষাও (examination) এই ধরনের ক্ষমতার পরিমাপ করে। কিন্তু. বুদ্ধির অভীক্ষা আপাতঃভাবে একরকম দেখতে হ'লেও তার উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত। বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা আমরা ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করি যা তার পারদর্শিতা বা বিদ্যাবত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, একটা হ'ল জন্মগত ক্ষমতার পরিমাপক অভীক্ষা আর অপরটা হ'ল তার অর্জিত গুণের পরিমাপক অভীক্ষা। সুতরাং, কোন যুক্তিতেই বুদ্ধির অভীক্ষাকে অর্জিত বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

অন্যদিকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার তুলনামূলক বিচারকরণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধি এমন এক মানসিক ক্ষমতা যা ব্যক্তির জ্ঞানমূলক কাজ থেকে শুরু করে সব কাজেই প্রয়োজন হয়। এবং তার সঙ্গে ব্যক্তির পারদর্শিতার যে সম্পর্ক আছে সে কথা আধুনিক প্রত্যেক মনোবিদ্ই স্বীকার করেন। মনোবিদ্ **বুচার** (Butcher) বলেছেল "*Intelligence is without doubt associated with high achievement in a very wide range of tasks and occupations.*" সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এই মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতি তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

অর্জিত জ্ঞানের সূচক

শিক্ষা মনোবিদ্গণ (Educational psychologist) তাই আজকাল শিক্ষার্থীর উন্নতির হারকে বা বিদ্যাবত্তাকে বিচার করার জন্য দু'ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের তুলনামূলক বিচার করেন। তাঁদের অর্থাৎ, কোন শিক্ষার্থী তার স্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতা (Intelligence) অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করছে কি না বা অগ্রসর হ'চ্ছে কি না, তাই বিচার করাই উদ্দেশ্য। এই তুলনামূলক বিকাশের হারকে প্রকাশ করার জন্য বর্তমানে এক ধরনের সূচক ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় **অর্জিত জ্ঞানের সূচক** (Achievement Quotient, বা A. Q)। অর্থাৎ, **শিক্ষাগত বিকাশের সূচক** (Educational Quotient ; বা E. Q.) এবং **বুদ্ধাঙ্কের** (I. Q) অনুপাতকে 100 দিয়ে গুণ করে এই অর্জিত জ্ঞানের সূচক পাওয়া যায়। বা, খুব সাধারণভাবে, শিক্ষাগত

বয়স (Educational age) এবং মানসিক বয়স (Mental age) এর অনুপাতকে 100 দ্বারা গুণ করলে এই সূচক পাওয়া যাবে।

$$\underset{(\text{I.Q.})}{\text{বুদ্ধ্যঙ্ক}} = \frac{\text{মা. ব. (M. A.)}}{\text{সা. ব. (C. A.)}} \times 100 \quad \cdots \quad (1);$$

$$\underset{(\text{E. Q.})}{\text{শিক্ষাগত বিকাশের সূচক}} = \frac{\text{শিক্ষাগত বয়স (E. A.)}}{\text{সাধারণ বয়স (C. A.)}} \times 100 \cdots (2);$$

$$\underset{(\text{A. Q.})}{\text{অর্জিতজ্ঞানের সূচক}} = \frac{\text{শিক্ষাগত বিকাশের সূচক}}{\text{বুদ্ধ্যঙ্ক}} \times 100$$

$$= \frac{\frac{\text{শি. ব.}}{\text{সা. ব.}} \times 100}{\frac{\text{মা. ব.}}{\text{সা. ব.}} \times 100} \times 100 = \frac{\text{শি. ব. (শিক্ষাগত বয়স)}}{\text{মা. ব. (মানসিক বয়স)}} \times 100$$

অর্থাৎ, কোন শিক্ষার্থীর অর্জিতজ্ঞানের সূচক যদি 100 হয় তা'হলে বুঝতে হবে, মানসিক ক্ষমতানুযায়ী তার শিক্ষাগত বিকাশ হচ্ছে। যদি তার ঐ সূচক 100 এর চেয়ে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে, কোন বাহিক ত্রুটির জন্য তার শিক্ষাগত বিকাশ মানসিক ক্ষমতানুযায়ী হচ্ছে না, তার চেয়ে কম হচ্ছে। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

বুদ্ধ্যঙ্কের স্থিরতা
[Constancy of I. Q.]

বুদ্ধির পরিমাপকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে আর একটা দিক থেকে তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের ধারণা মানুষের বুদ্ধিকে প্রশিক্ষণ দ্বারা বাড়ানো সম্ভব। **স্মিড্** (B. Schmidt), **ওয়েলম্যান** (B. L. Wellman), **স্কিলস্** (H. M. Skeels) প্রভৃতি মনোবিদ্ বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। সুতরাং তাঁদের এই ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ্যঙ্কেরও (I. Q.) পরিবর্তন হয়। কিন্তু অন্যান্য মনোবিদ্ পরবর্তীকালে, তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে, মনোবিদ্‌গণ বলেন বুদ্ধি যেহেতু জন্মগত মানসিক ক্ষমতা, সেহেতু তার পরিমাণ জ্ঞাপক সূচকও সমস্ত বয়সে সমান থাকা উচিত। এবং বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা তাঁরা দেখেছেন, কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক সব বয়সে সমান থাকে। অর্থাৎ, এই বুদ্ধ্যঙ্ক যেহেতু সাধারণ বয়স ও মানসিক বয়সের অনুপাত, তাদের বুদ্ধিও সমহারে হয়।

বুদ্ধ্যঙ্কের স্থিরতা ও সম্ভাব্য ত্রুটি

তবে একথা আমাদের মনে রাখা দরকার, কোন মানসিক অভীক্ষাই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য (Reliable) নয়। সুতরাং, একই অভীক্ষার পুনরাবৃত্তিতে আমরা যে সব সময় ঠিক একই বুদ্ধাঙ্ক (I. Q.) পাব, এই ধারণা ঠিক নয়। একবার পরীক্ষণ ও পরবর্তী পরীক্ষণের মধ্যে যে ব্যবধান বিজ্ঞান সম্মতভাবে মেনে নেওয়া যায় তাকে বলে সম্ভাব্য ত্রুটি (Probable error)। আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন, সম্ভাব্য ত্রুটির সীমার মধ্যে (within limits of probable error) বুদ্ধাঙ্ক সকল বয়সে স্থির থাকে। এই কারণে, আজকাল প্রত্যেক অভীক্ষার সঙ্গে এই সম্ভাব্য ত্রুটির সূচকও দেওয়া হয়। যেমন, ১৯৩৭ এর স্ট্যানফোর্ড সংস্করণের সম্ভাব্য ত্রুটি হ'ল 3 থেকে 4 ; অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক যদি এক সময় পরিমাপ করে 100 নির্ণয় করা হয়, পরবর্তী পরীক্ষণে তা 96 থেকে 104 এর মধ্যে হ'তে পারে। এবং এই পরিবর্তন বুদ্ধাঙ্কের অস্থিরতার পরিচায়ক নয়। এমনিভাবে ভেক্সলার বেলভিউর অভীক্ষায় সম্ভাব্য ত্রুটির পরিমাণ হ'ল 5।

তবে অনেক মনোবিদ্ এর চেয়েও বেশী পরিমাণ পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন। সেই সব অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঐ পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং অনেক সময় অভীক্ষার ত্রুটিই দায়ী। সাধারণতঃ যে সব কারণে, বুদ্ধাঙ্কের এই আপাতঃ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা'হল—[এক] **দৈহিক কারণ** (Physical causes)—অনেক সময় অভীক্ষা প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ দৈহিক অসঙ্গতিকে অগ্রাহ্য করা হয়। পরে পরীক্ষা করতে যাওয়ার সময় তা যদি সেরে যায়, তা'হলে বুদ্ধাঙ্কের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন, বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তনের জন্য দায়ী হয়। অনেক সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হয় বলে, বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। [দুই] **প্রক্ষোভগত কারণ** (Emotional causes)—বুদ্ধির কোন অভীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীরা যদি অস্বাভাবিক রকমে ভীত হয় বা রেগে যায়, তবে তার ঐ মানসিক অবস্থা পরিমাপের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। [তিন] **পরীক্ষক সংক্রান্ত কারণ** (Causes due to examiner)—অনেক সময় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন হয়। যে পরীক্ষকের আচরণ—শিক্ষার্থীর উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে তিনি যে বুদ্ধির পরিমাপ করবেন, তা কখনই সঠিক হতে পারে না। পরবর্তীকালে তাই বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। [চার] **পরীক্ষা পরিস্থিতি** (Testing condition)—অনেক সময় পরীক্ষা-পরিস্থিতি আদর্শ না হওয়ার

বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তনের কারণ।

জন্য বুদ্ধির পরিমাপ সঠিকভাবে করা যায় না। ব্যক্তির মনের উপর তার পরিবেশ সব সময়ই প্রভাব বিস্তার করে। তাই যে ঘরের মধ্যে ব্যক্তির পরীক্ষা করা হচ্ছে তা যদি আদর্শস্থানীয় না হয়, তাহলে তার থেকে যে পরিমাপ পাওয়া যাবে, তা নির্ভুল হতে পারে না। [পাঁচ] **অভীক্ষার ত্রুটি** (Defects of the tests)—অনেক সময় অভীক্ষার ত্রুটির দরুন বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যে অভীক্ষার যাথার্থ্যতা (Validity) এবং নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় নি, তার থেকে আমরা কোন সময় সঠিক ফল পেতে পারি না। এছাড়া, বুদ্ধির অভীক্ষায় সাধারণতঃ যে সব প্রশ্ন দেওয়া হয়, তা সবসময় কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা বিবর্জিত (Culture free) নয়। ফলে, কৃষ্টিগত প্রভাব, বুদ্ধির অভিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য আজকাল মনোবিদ্‌গণ কিভাবে এই কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার প্রভাবকে অভীক্ষার মধ্য থেকে বাদ দেওয়া যায় তার জন্য গবেষণা করে যাচ্ছেন। তা'হলে, আমরা বুদ্ধাঙ্কের স্থিরতা সম্পর্কে বলতে পারি, আদর্শ শর্তসাপেক্ষে সম্ভাব্য ত্রুটির সীমার মধ্যে বুদ্ধাঙ্ক ব্যক্তিজীবনে স্থির থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির তাৎপর্য বা বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা

[Significance of Intelligence in the field of education Or Uses of Intelligence tests]

সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বা মনোবিদগণের কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন কালেও তা ছিল না। তবে আধুনিককালে, বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হওয়ায় শিক্ষকদের কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে। বুদ্ধিকে সঠিকভাবে পরিমাপ করে, শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধাঙ্ক অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করতে পারলে, তাদের স্বাভাবিক জীবন বিকাশ করা সম্ভব হবে না। বুদ্ধাঙ্কের পরিমাণ অনুযায়ী, উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এদের শিক্ষা সম্পর্কে আমরা পৃথকভাবে অন্যত্র আলোচনা করব। এখানে আমরা সাধারণভাবে, বুদ্ধির অভীক্ষা কিভাবে কাজে সাহায্য করে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। আপাতঃভাবে বুদ্ধির অভীক্ষার একমাত্র উপযোগিতা হ'ল বুদ্ধি পরিমাপ করা, কিন্তু, সার্বজনীন মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বুদ্ধি, আমাদের সব

সূচনা

রকম কর্ম সম্পাদনেই প্রয়োজন হয়। তাই এই বুদ্ধির পরিমাপ বা বুদ্ধির অভীক্ষা পরোক্ষভাবে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। তাই বুদ্ধির অভীক্ষায় এই সব উপযোগিতাকে আমরা পরোক্ষ উপযোগিতা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

[এক] শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি তার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাবিদ্‌গণ ও মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, জন্মগত ক্ষমতা (Inherited mental ability) হিসেবে বুদ্ধি মানব জীবনের জ্ঞানমূলক প্রগতির সীমা নির্ধারণ করে দেয়। পূর্বে থেকে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারেন, তা'হলে তার থেকে শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক অগ্রগতি কতটা হ'তে পারে, সে সম্পর্কেও তিনি ধারণা করতে পারবেন। ফলে, যে সব শিক্ষার্থী অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারছে না, তাদের সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত ধারণা করতে এবং তাদের জন্য তিনি উপযোগী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে মনোবিদ্‌গণ এ সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত করেছেন, যা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের এই পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, বুদ্ধাঙ্কের সঙ্গে বিদ্যালয়ের বিদ্যার্জনের সম্পর্ক সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা ধারণা পাওয়া গেছে, তা'হল—

শিক্ষার্থীর প্রগতি ও বুদ্ধাঙ্ক

(1) যে সব ছেলেমেয়েদের বুদ্ধাঙ্ক 70-এর নীচে তারা বিদ্যালয়ে পড়লেও প্রায় 10-11 বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতেই পড়তে থাকে। এদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়েরা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পৌছে, তবে তাও প্রায় 14-15 বৎসর বয়সে। এর বেশী তাদের পড়াশুনা হয় না।

(2) 70 থেকে 85-এর মধ্যে যাদের বুদ্ধাঙ্ক দেখা গেছে, তারা শ্রেণীর গড় বয়স থেকে অন্ততঃ দু-তিন বৎসরের বড় হয়। এদের শিক্ষার শেষ সীমা হ'ল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর উপরে ওঠে না।

(3) 85 থেকে 115 পর্যন্ত যাদের বুদ্ধাঙ্ক, তারা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে। তবে যাদের বুদ্ধাঙ্ক 100 নীচে তারা মাঝে মাঝে দু-একবার ফেল করে। এদের মধ্যে অনেকেই স্নাতক স্তর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে।

(4) যে সব ছেলেমেয়েদের বুদ্ধাঙ্ক 115 বেশী, তারা বিদ্যালয়ে এবং কলেজে ভাল ছাত্র-ছাত্রী বিবেচিত হয়। এবং দেখা যায় শ্রেণী-স্বাভাবিক বয়সের তুলনায় তারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পড়াশুনা করে। অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'লে এরা জীবনে যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারে।

সুতরাং, এই ধরনের তথ্য, যা আমরা বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে পাই, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বে থেকে ধারণা দিতে পারে। এই

ধারণাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে সহায়তা করতে পারেন।

শিক্ষার্থে দলগঠন ও বুদ্ধ্যঙ্ক

[দুই] শিক্ষককে কর্মক্ষেত্রে, অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করতে হয় পাঠদানের সুবিধার জন্য। শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হ'লে, তাদের ছোট দলে (section) ভাগ করার রীতি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। এই দল বিভাগ বিজ্ঞান সম্মত হওয়ার দরকার। এই দল বিভাগের ভিত্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি বা বুদ্ধ্যঙ্ককে গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, সমান মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন না হ'লে একই শ্রেণীতে শিক্ষাদান করতে শিক্ষকের অসুবিধা হয়। যে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা, বিচার-করণের ক্ষমতা, যুক্তি শক্তি, স্মৃতি ইত্যাদি একই রকম, তারাই এইভাবে শিক্ষকের পদ্ধতির দ্বারা একত্রে প্রভাবিত হতে পারে। তাই শিক্ষাদানের জন্য দলগঠন করতে হ'লে, তারা যাতে সমান মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয় (Homogenious) সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। বুদ্ধির অভিক্ষা শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। উপযুক্ত শ্রেণী বিন্যাস ও দল গঠনে শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করবে তার পেশাগত সাফল্য।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও বুদ্ধ্যঙ্ক

[তিন] আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-মূলক নির্দেশনা (Educational guidance) দেওয়া শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্গত। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব নিয়মে বিকশিত হয়। তার এই বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে নানা ধরনের মানসিক ক্ষমতা, প্রক্রিয়া ও অবস্থা। মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, এই সব মানসিক ক্ষমতা, মানসিক প্রক্রিয়া ও অবস্থার মধ্যে বুদ্ধি বিশেষভাবে গুরুত্ব-পূর্ণ। বুদ্ধি হ'ল এমন এক সার্বজনীন ক্ষমতা যা শিক্ষার্থীদের যে কোন কর্ম-সম্পাদনে প্রয়োজন হয়। এবং এও দেখা গেছে বিভিন্ন বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিমাণ বুদ্ধির বা মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ অংকের বিভিন্ন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যে মানসিক ক্ষমতার দরকার; ভাষার রস উপলব্ধি করার জন্য তার চেয়ে কম প্রয়োজন হয়। এর অর্থ এই নয়, যারা ভাষা চেষ্টা করেন, তাদের সকলের বুদ্ধ্যঙ্ক কম। আমরা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই মন্তব্য করছি। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা আনতে হ'লে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতানুযায়ী বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করতে হবে। এই শিক্ষামূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাই বুদ্ধির পরিমাপ এত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষকের নির্দেশনামূলক দায়িত্ব সম্পাদনে তাকে সাহায্য করবে।

[চার] আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা অনেকাংশেই বৃত্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তির কথা চিন্তা করে, শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয়। পূর্বে পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা চিন্তা করেই বিভিন্ন ধরনের বিষয় পড়তে অনুপ্রাণিত করতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়, এই দায়িত্ব অনেকটা শিক্ষকের উপর এসে পড়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষা-মূলক নির্দেশনার (Educational guidance) সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি-মূলক নির্দেশনা (Vocational guidance) দিতে হবে। যেমন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে বুদ্ধির-গুরুত্ব আছে, ঠিক তেমনি কর্মজীবনেও এর গুরুত্ব আছে। কর্ম-জীবনের কৃতকার্যতা (Job success)। অনেকাংশে ব্যক্তির বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধি, ব্যক্তিকে কর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ব করতে যেমন সহায়তা করে, তেমনি কর্ম-পরিবেশে সার্থকভাবে অভিযোজন করতেও সাহায্য করে। তাই আজকে শিক্ষককে যখন ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা বিবেচনা করে, বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিতে হবে তখন শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন, শিক্ষামূলক নির্দেশনা বা বৃত্তিমূলক নির্দেশনা কোনটাই কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষার উপর নির্ভর করে দেওয়া হয় না। তবে বুদ্ধির পরিমাপ এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ও বুদ্ধাঙ্ক

[পাঁচ] শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং কর্ম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বা ব্যক্তির নির্বাচনের ব্যাপারে বুদ্ধির অভীক্ষা বিশেষভাবে সাহায্য করে। আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ বর্তমান কালে বাড়লেও, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খুব বেশী ভীড় দেখা যায়। সুতরাং এই ভীড়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন (selection) প্রয়োজন। এই নির্বাচন করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার তুলনামূলক বিচার করতে হবে। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ও কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে একই রকম সমস্যা দেখা দেয়। এই কারণে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য মনোবিদ্‌গণ আধুনিক-কালে কাজ করেন। এই উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিমাপ একান্তভাবে প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী ও কর্মী নির্বাচন ও বুদ্ধির অভীক্ষা

[ছয়] সবশেষে বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষককে অন্য একদিক থেকে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নানা রকম মানসিক অসুস্থায় ভোগে। তাদের এই সব মানসিক অসুস্থতা অনেক সময় শিক্ষকের নজর এড়িয়ে যায়। বা শিক্ষক অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে এগুলোকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু, মানসিক সুস্থ অবস্থা শিক্ষা সহায়ক। সুতরাং যদি কোন শিক্ষার্থী মানসিক রোগগ্রস্ত হয়,

মানসিক রোগ নির্ণয় ও বুদ্ধির অভীক্ষা

তার চিকিৎসার ব্যবস্থা শিক্ষককে করতে হবে। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করতে গেলে, অনেক সময় প্রাথমিকভাবে এই সব মানসিক অসুস্থতা নির্ণয় করা যায়। বিশেষভাবে সম্পাদনী অভীক্ষাগুলো প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেছে, বিশেষ মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বিশেষ এক ভঙ্গীতে সমস্যার সমাধান করে। যেমন যারা প্যারানইয়া নামে মানসিক রোগে ভোগে তাঁরা সম্পাদনী অভীক্ষার বিভিন্ন নক্সাকে (design) উল্টো ভাবে সমাধান করে। মানুষের ছবি আঁকতে গেলে, তার মাথাটা নিচের দিকে দেয়, পা টা উপরের দিকে দেয়। সুতরাং, বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করতে গিয়ে শিক্ষক যদি এরকম কোন উপসর্গ লক্ষ্য করেন, তা'হলে তিনি অন্ততঃপক্ষে তার চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারেন।

এই সব বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়াও বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষককে আরও নানাভাবে সাহায্য করে। শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন কাজের পরিচালনা, বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজে নির্বাচন ইত্যাদি কাজে ও শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষকের কাজে সহায়তা করবে। শিক্ষক বিচক্ষণতার সঙ্গে বুদ্ধির অভীক্ষা যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন তা'হলে তিনি তার থেকে অনেক ভাল ফল পাবেন। মনোবিদ্ কোলেস্‌নিক্ (Kolesnik) বলেছেন—"*A wise teacher is aware of the limitations of the intelligence test...... but she also recognised their utility in various aspects of the school's work.*"

প্রশ্নাবলী

1. What is intelligence ? What are its factors ? How are they measured ? [N.B.U.B.T. '65]
[সম্পূর্ণ আলোচনার সারাংশ]
2. What is intelligence and what is its nature ? Give a brief history of intelligence testing movement. [পৃঃ ২০৯-২৫৬] [N.B.U.B.T. '67]
3. Indicate the various uses of intelligence tests. Show your acquaintance with anyone notable tests of intelligence. [N.B.U.B.T. '70]
[পৃঃ ২৪২-২৪৯ পৃঃ : ২৬১-২৬৫]
4. Clearly state Spearman's view on the nature of intelligence and show your acquaintance with any one of the test of intelligence.
[পৃঃ ২২২-২২৯ ; ২৪২-২৪৯] [N.B.U.B.T. '69]
5. What are intelligence tests ? How do they differ from scholastic tests ? Discuss their respective functions. [N.B.U.B.T. '66]
[পৃঃ ২৩৭-২৩৮ ; ২৫৭-২৫৯]
6. What is intelligence ? Describe any standardized intelligence test that you know and show how intelligence can be measured with it.
[পৃঃ ২০৯-২২২ ; ২৪২-২৪৯] [C.U.B.T. '66]

7. How is intelligence related to scholastic learning? Why should a teacher try to know the intelligence of the educands he is teaching? [পৃঃ ২৫৭-২৫৯ ; ২৬১-২৬৫] [C.U.B.T. '67]
8. Discuss the nature of intelligence. Write how intelligence is measured with special reference to Binet scale. [C.U.B.T. '68] [পৃঃ ২২১-২৩৬ ; ২৩৯-২৪৯]
9. Indicate the nature of intelligence and describe a test of its measurement. [পৃঃ ২২১-২৩৩ ; ২৪২-২৪৯] [C.U.B.T. '70]
10. Explain in detail the nature of intelligence and indicate the uses of intelligence test. [পৃঃ ২২১-২৩৬ ; ২৬১-২৬৫] [C.U.B.A. '63]
11. Define intelligence and discuss the importance of intelligence tests in child guidance and class teaching. [C.U.B.A. '64] [পৃঃ ২০৯-২২১ ; ২৬১-২৬৫]
12. Describe any test of intelligence that you are familiar with and indicate the uses of intelligence tests in school. [পৃঃ ২৪২-২৪৯ ; ২৬১-২৬৫] [C.U.B.A. '66 ; K U.B.T. '68]
13. What are intelligence tests? Show your acquaintance with anyone of them. [পৃঃ ২০৯-২২১ ; ২৪২-২৪৯] [C.U.B.A. '68]
14. Elucidate clearly the meaning of I. Q. and M. A. Classify the different intelligence tests and point out their usefulness. [C.U.B.A. '69] [পৃঃ ২৪২-২৪৩ ; ২৫৬ ; ২৬১-২৬৫]
15. What is intelligence? Can it be measured? [C.U.B.A. '70] [পৃঃ ২০৯-২২২ ; ২৩৭-২৩৮]
16. Give a general idea of the intelligence tests and indicate their importance in educational and vocational guidance. [C.U.B.T. '71] [পৃঃ ২৩৮ ; ২৪৯-২৫৬ ; ২৬১-২৬৫]
17. Discuss the nature of intelligence in the light of various theories? [পৃঃ ২২২-২৩৬] [K.U.B T. '63, '67]
18. Distinguish between intelligence and Attainment tests. What are the different types of intelligence tests? How are intelligence tests used in the field of education? [পৃঃ ২৫৭-২৫৯ ; ২৫৬ ; ২৬১-২৬৫] [K.U.B.T. '64 '66]
19. What is intelligence? Discuss critically the various theories of intelligence. [পৃঃ ২০৯-২৩৬] [K.U.B.T. '65]
20. What are performance tests? Fully describe one test by which intelligence is measured. [পৃঃ ২৫১-২৫৩] [C.U.B.A. '54]
21. Is I. Q. constant? Give reasons for your answer. [C.U.B.T '63 (part)] [পৃঃ ২৫৯-২৬১]
22. Discuss about the modern concept of intelligence—A and Intelligence—B. In this context discuss the limitation of intelligence test in measuring intelligence—A. [পৃঃ ২১৯-২২১]
23. Trace the history of development of intelligence tests after Binet. [পৃঃ ২৫১-২৫৬]
24. Write notes on the following:
    (a) Group test of intelligence. [পৃঃ ২৫৪-২৫৫] (b) I. Q. [পৃঃ ২৪৩-২৪৪]
    (c) M. A. [পৃঃ ২৪২ ; ২৪৩-২৪৪] (d) Binet Simon scale. [পৃঃ ২৩৯-২৪২]
    (e) Wechsler—Bellevue scale. [পৃঃ ২৫৩-২৫৬]

নবম অধ্যায়

কাজ ও অবসাদ
[WORK & FATIGUE]

মানুষের সব রকম চেষ্টার মূলেই এক বিশেষ মানসিকতা কাজ করে। সবচেয়ে কম শ্রম করে, কি করে সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায়। সভ্যতার মানদণ্ডে ও মানুষের কর্মক্ষমতাকে (efficiency) এই দিক থেকেই বিচার করা হয়। মানুষের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একই মানসিকতা ও একই মানদণ্ড কাজ করে। কোন ছাত্র কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, কোন ছাত্র সবচেয়ে কম শ্রম ব্যয়ে অধিক পরিমাণে শিখতে পারে, তা দিয়েই বিচার করা হয় তার শিখন ক্ষমতা (Learning efficiency)। সুতরাং যে কোন ধরনের চেষ্টিত কাজ (voluntary action) ও তার জন্য ব্যয়িত শক্তির অনুপাতের উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা। ব্যক্তির এই কর্মক্ষমতা তার জীবনের মূল্য নিরূপিত করে। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে, ব্যক্তির কর্ম ক্ষমতার প্রকৃতি এবং তার উপর অন্যান্য অবস্থার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব। বিশেষভাবে, এই কর্মক্ষমতার প্রকৃতি ব্যক্তির শিক্ষা কাজকে কি ভাবে প্রভাবিত করে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই হ'ল এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমে কাজ কি? কাজের প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্পর্কে উল্লেখ করার দরকার।

কাজ কি?
[What is work?]

পদার্থ বিজ্ঞানীগণ (Physicist) বলেন, কোন একক পরিমাণ বস্তুকে একক পরিমাণ দূরত্বে স্থানান্তরিত করাকে কাজ বলা যেতে পারে। শরীর বিজ্ঞানীগণ (Physiologist) বলেছেন, যে প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের স্নায়বিক শক্তির খরচ হয় তাই হ'ল কাজ; এবং কাজের পরিমাপ করা যায়, দেহের আন্ত্রিক ক্রিয়ার পরিবর্তনের (Metabolic change) দ্বারা। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী, মানুষের সব রকম প্রতিক্রিয়াকেই আমরা কাজ (work) বলতে পারি। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে সব প্রতিক্রিয়ার সামাজিক মূল্য আছে, যে সব প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবিকা উপার্জনে সহায়তা করে, তাই হ'ল কাজ। কিন্তু এটা কাজের সংকীর্ণ অর্থ। মানুষের যে কোন রকম প্রতিক্রিয়াকেই আমরা কাজ বলতে পারি, যদি

কাজের প্রকৃতি

তার জন্য স্নায়বিক শক্তির খরচ হয়। মনোবিদ্ ড্যাট্‌সী (Deitze)[1] বলেছেন, কাজ এবং খেলার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই, তাদের মধ্যে পার্থক্য মনোভাবগত। অনেকে উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে, কাজকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—**অচেষ্টিত কাজ** (Non-voluntary action) এবং **চেষ্টিত কাজ** (voluntary action)। অর্থাৎ, যে কাজের পেছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে না তাকে বলে অচেষ্টিত কাজ, আর যে কাজের পেছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে তাকে বলা হয় চেষ্টিত কাজ। কাজকে অন্য একদিক থেকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়—**দৈহিক কাজ** (physical work) এবং **মানসিক কাজ** (Mental work)। কোন ব্যক্তি যখন কাজ করার জন্য দৈহিক শ্রম ব্যয় করে তখন সেই কাজকে বলা হয় দৈহিক কাজ (physical work); যেমন কোন বোঝা তোলা। আবার, কোন কাজ করার জন্য যখন মানসিক শ্রম ব্যয় করা হয় তখন তাকে বলে মানসিক কাজ (Mental work)। যেমন; অঙ্ক কষা। কিন্তু এই ধরনের কাজের শ্রেণী বিভাগ, সব সময় পরিষ্কার নয়। মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, সব রকম কাজেই, স্নায়বিক শক্তি ক্ষয় হয়, সুতরাং, তাদের পৃথক করা খুব মুশকিল। শুধুমাত্র, বলা যেতে পারে, কোথাও বৃহৎ পেশী কাজে লাগে আবার কোথাও ক্ষুদ্র পেশী কাজে লাগে মাত্র। তাই সম্পূর্ণভাবে তাদের পৃথক করা যায় না।

যাই হউক কাজ যে রকমের হউক না কেন, তাতে, শক্তি ব্যয়িত হয়, এবং অনেকক্ষণ কাজ করার পর শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে কাজ করার ক্ষমতা

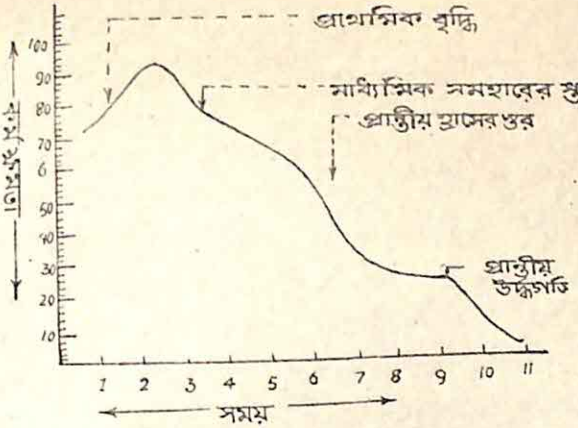
মানুষের কর্মক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

কমে যায়। একটা যন্ত্রকে অনেকক্ষণ কাজ করালে, তার জ্বালানী ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে, তার কর্মক্ষমতা কমতে থাকে; যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ক্ষয় হওয়ার ফলেও কর্মক্ষমতা কমে। তেমনি, মানুষ যখন কোন কাজ করে, তার স্নায়বিক শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। ফলে, দেহের পেশীর অক্ষমতা (impairment) লক্ষ্য করা যায়। এর দরুন ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা কমে আসতে থাকে। মানুষের কাজের পরিমাণ বিভিন্ন অবস্থায় বিশ্লেষণ করলে, কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে কোন ব্যক্তির কাজের পরিমাণ লেখচিত্রের সাহায্যে পরিবেশ করি তা'হলে লক্ষ্য করা যাবে, প্রথম কাজ শুরু করার সময় কর্ম ক্ষমতা একটু কম থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কর্মক্ষমতা বেড়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর পরবর্তীস্তরে কিছুক্ষণ সমহারে কাজ হতে থাকে। এই অংশকে কাজের লেখচিত্রের অধিত্যকা (plateau) বলা

---

1. "The difference between work and play is a matter of attitude toward rather than nature of activity"—Deitze : work & efficiency ; Psychol. Appl. to human affairs (Gray).

হয়। এর পর দেখা যায় খুব দ্রুত গতিতে কর্মক্ষমতা কমতে থাকে, কিন্তু শেষের দিকে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, কর্মক্ষমতা সাময়িকভাবে বেড়ে



ওঠে। একে বলা হয় সাময়িক প্রান্তীয় উর্দ্ধগতি (End spurt)। এই অবস্থা খুবই সাময়িক এবং পরবর্তীকালে দ্রুত হ্রাসের গতিই বজায় থাকে। এই কর্মক্ষমতার এই হ্রাস খুবই সাময়িক এবং অনেক সময় এক নাগাড়ে কাজ করার সময় এই ধরনের কাজের প্রতি অনীহা (aversion) লক্ষ্য করা যায়। এই অনীহা শুধুমাত্র দৈহিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিছু কিছু মানসিক অবস্থাও এর সঙ্গে জড়িত থাকে।

কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণ
[Causes of Lowering of work efficiency] :

কর্মক্ষমতার হ্রাস ও অবসাদ

মানুষের কাজের ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তার ধীরে ধীরে হ্রাস হয়। মনোবিদ্‌গণ এই হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—দুটো প্রধান কারণে এই কর্মক্ষম ক্রমোবনতি হয়। প্রথমতঃ, **প্রেষণা** (Motivation) না থাকার দরুন। দ্বিতীয়তঃ, **অবসাদ** (Fatigue) এর দরুন। কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির উৎসাহের অভাব ঘটলে, তার কাজের হার কমে যেতে থাকে। কাজের প্রকৃতি ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে এই প্রেষণারও তারতম্য হয়। অর্থাৎ, যে কাজে, একজন ব্যক্তি উৎসাহিত হবে, অপর একজন সেই কাজে উৎসাহিত না হ'তে পারে ; শিশুর কাছে যে কাজ নিতান্তই খেলা, বয়স্কদের কাছে, সেই কাজের পেছনে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অন্যদিকে অবসাদ (Fatigue) হ'ল কর্মক্ষমতা হ্রাসের সার্বজনীন কারণ। এই অবসাদ

কি? এ নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford)[1] বলেছেন, "কর্মক্ষমতার হ্রাসই হ'ল অবসাদ"। হার্ভে পিটারসন্ (H. A. Peterson),[2] বলেছেন, 'কাজ করার জন্য কর্ম ক্ষমতার হ্রাসই হ'ল অবসাদ'। স্যাণ্ডিফোর্ডের সংজ্ঞা খুবই সীমিত। তিনি যে কোন ধরনের কর্মক্ষমতার হ্রাসকেই অবসাদ বলেছেন, কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্‌গণ যে কোন ধরনের কর্মক্ষমতার হ্রাসকে অবসাদ বলেন না। পিটারসনের সংজ্ঞা এদিক থেকে অনেকটা বিশেষ ধর্মী। তিনি একনাগাড়ে কাজ করার দরুন, আমাদের কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয় তাকেই অবসাদ বলেছেন। অন্য অনেক কারণে আমাদের কাজের ক্ষমতার হ্রাস হতে পারে। যেমন অসুস্থতার জন্য অনেক সময় আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, তাকে আমরা অবসাদ বলবো না। তা'হলে এই সংজ্ঞা থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে যে অবসাদ কর্ম পরিস্থিতিতে কর্মের দরুনই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্য একদিক থেকে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ এই ধরনের সংজ্ঞাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের মত হ'ল, অবসাদের কর্মক্ষমতার হ্রাসই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এছাড়া নানা রকম বৈশিষ্ট্য কর্ম পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। যেগুলো, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উচিত নয়। যেমন, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করলে, কর্মক্ষমতার হ্রাস পায়, মনোযোগের অভাব দেখা দেয়, মাথা ধরে, ভুল বেশী হতে থাকে, ইত্যাদি আরও নানারকম লক্ষণ দেখা যায়। আধুনিক মনোবিদ্‌গণের ধারণা অনুযায়ী অবসাদ (Fatigue) বলতে আমরা বিশেষ কোন লক্ষণকে বুঝি না, বা বিশেষ কোন গুণকে বুঝি না। এটা কোন বস্তু বা অবস্থাও নয়। তাঁরা বলেন এটা একটা সাধারণ নাম (general name) মাত্র। এক নাগাড়ে খুব বেশী সময় কাজ করার দরুন, ব্যক্তির মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়, তাদের আমরা একত্রে নামকরণ করেছি অবসাদ। অর্থাৎ অবসাদ এই কথাটার দ্বারা ঘটমান কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক অবস্থাকে নির্দ্দেশ করি [*Fatigue is not an entity ; it is convenient name to include different mental and physical phenomena associated with continuous work-Moore*] আধুনিক কালে, অবসাদ (Fatigue) কে এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়। আবসাদের অর্থ শুধুমাত্র কর্মক্ষমতার হ্রাস নয়।

অবসাদকে আমরা অনেক সময় বিরক্তির (Boredom) সমতুল্য হিসেবে

1. "decreasing competancy to do work"—Sandiford: educational psychology.

2. "...loss of ability to do work due to previous work not and due to illness"—Peterson: Educational psychology.

বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু এ রকমের ধারণা ভুল। তাই অবসাদ কি, তা বুঝতে হলে, তার সঙ্গে বিরক্তির পার্থক্য করার দরকার। আপাতঃভাবে এদের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রে কাজের অনিচ্ছা দেখা যায়, অবসাদ এবং বিরক্তি উভয়েই কর্ম ক্ষমতার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু অবসাদের দরুন কর্মক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কমে যায়, কিন্তু বিরক্তিতে তা কমে না। বিরক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষমতা না কমলেও কাজের প্রতি অনিচ্ছা দেখা যায়। কাজের একঘেঁয়েমীর জন্য এক ধরনের অবসাদ বোধও দেখা যায়। তাই অনেকে একে অবসাদের সঙ্গে পার্থক্য করতে গিয়ে **অবসাদের অনুভূতি** (Feeling of fatigue) বলেন। কোন কোন মনোবিদ্ একে দুষ্ট অবসাদও (False fatigue) নাম দিয়েছেন। এই ধরনের অবসাদ অনুভূতি বা বিরক্তির নানা রকম উপসর্গ দেখা যায়। যেমন, চঞ্চলতা বা অস্থিরতা, অমনোযোগ, আলস্যভাব, খিটখিটে মেজাজ, ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রকৃত অবসাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল আলস্য। সাধারণ-ভাবে, বিরক্তি প্রকৃত অবসাদের আগেই দেখা যায়।

অবসাদ ও বিরক্তি

মনোবিদ্‌গণ অবসাদকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন,—**দৈহিক অবসাদ** (Physiological fatigue) এবং **মানসিক অবসাদ** (Mental fatigue)। সাধারণ পেশীঘটিত (Muscular), এবং ইন্দ্রিয়গত (sensory) অবসাদকে বলা হয় **দৈহিক অবসাদ**। খুব বেশী সময় ধরে দৈহিক পরিশ্রম করলে, যে অবসাদ আসে তাকেই দৈহিক অবসাদ বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক শ্রমের একটা সীমা আছে; শ্রম এই সীমা ছাড়িয়ে গেলে, অবসাদ দেখা দেয়। অন্যদিকে মানসিক কাজ অনেকক্ষণ ধরে করলে, মানসিক কর্মক্ষমতা কমতে থাকে এবং অবসাদ দেখা দেয়। অনেক সময় ধরে একনাগাড়ে অংক কষলে, বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি, নির্ভুল করার ক্ষমতা সমস্ত দিক থেকে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একেই বলা হয় মানসিক অবসাদ (Mental fatigue)। তবে দৈহিক এবং মানসিক কাজকে যেমন সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না, ঠিক তেমনি, দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদকেও পৃথক করা যায় না। অনেকক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করলে, মানসিক অবসাদও আসে, আবার একটানা মানসিক কাজ করলেও দৈহিক অবসাদ আসে। সুতরাং দু'ধরনের অবসাদকে পৃথকভাবে বিচার করা খুবই মুশকিল। কোন কোন মনোবিদ্ তাই অবসাদকে এইভাবে শ্রেণীবিভাগ না করে, **আংশিক** (partial fatigue) এবং **সামগ্রিক** (General fatigue) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কোন সময় বিশেষ এক ধরনের কাজ করার জন্য আমাদের অবসাদ আসে বা দেহের বিশেষ অংশকে কেন্দ্র করে অবসাদ দেখা দেয়, অন্য কোন কাজ বা দেহের অন্য কোন অঙ্গের উপর তার প্রভাব থাকে না।

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ

এই ধরনের অবসাদকে বলা হয় আংশিক অবসাদ (partial fatigue)। আবার অনেক সময় দৈহিক বা মানসিক কাজের ফলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এই ধরনের অবসাদকে বলা হয় সামগ্রিক অবসাদ (General fatigue)

অবসাদের কারণ
[Causes of Fatigue]

অবসাদ দৈহিক হউক বা মানসিক হউক, সামগ্রিক হউক বা আংশিক হউক, তার পেছনে কতকগুলো কারণ আছে। এই কারণগুলোকে মনোবিদগণ তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। [এক] শারীরিক বা দৈহিক কারণ (Physiological cause); [দুই] মানসিক কারণ [Mental Cause] এবং [তিন] পরিবেশগত কারণ (Environmental Cause)। অবসাদের এই কারণগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

দৈহিক কারণ

মনোবিদ স্যাণ্ডিফোর্ড, অবসাদের তিন ধরনের দৈহিক কারণের কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের দেহ সংগঠনের উপাদান জনিত তারতম্যের জন্য অনেক সময় অবসাদ হ'য়ে থাকে। এই সব কারণগুলোকে দৈহিক কারণ বলা হচ্ছে।

॥ **প্রথমতঃ** ॥ আমাদের কোন কাজ করতে গেলে, স্নায়বিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে এই স্নায়বিক শক্তি দেহের পেশী তন্তুর (Muscle fibre) এবং কোষের (cell) উপাদান থেকে আসে। ফলে কাজ করার সময় দেহের এই সব অংশের ক্ষয় হয়। কিন্তু, একই সময়ে দেহের অন্যান্য অংশের ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ক্ষয় স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু একটানা অনেক সময় ধরে কাজ করলে, ক্ষয় এবং ক্ষয় পূরণের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, ফলে দেহের শক্তি ক্ষয়ের দরুন, স্বাভাবিকভাবে অবসাদ লক্ষ্য করা যায়। **স্যাণ্ডিফোর্ড** (Sandiford) বলেছেন, দেহের স্নায়ুকোষ এবং পেশীতে শক্তি উৎপাদনকারী শক্তির ক্ষয় হওয়ার দরুন অবসাদ আসে।[1]

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ দেহের পেশীর ক্রিয়ার ফলে, দেহের মধ্যে অপচয়জনিত দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়। এই অতিরিক্ত পদার্থকে পুনরায় সংশোধণ করার ব্যবস্থাও দেহের মধ্যে আছে। কিন্তু এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় দেহকে দোষমুক্ত করার জন্য সময় লাগে। একটানা কাজ করলে, দেহযন্ত্র সে সুযোগ পায় না। ফলে, দেহের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ব্যহত হয়। সাধারণতঃ এই দূষিত পদার্থ

1. 'The exhaustion of the energy producing compounds in the body, especially in muscle fibres and in the cell bodies of the neurons.''—Sandiford; Educational psychology.

স্নায়ুসন্ধিতে (synapse) জমে। উড্‌ওয়ার্থ[1], এই কারণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ দেহের মধ্যে শক্তি উৎপাদন করে শর্করা জাতীয় (Carbohydrate) উপাদান। এই শর্করা জাতীয় উপাদানের বিশ্লেষণের (decomposition) ফলে দেহে কর্মমূলক শক্তির উৎপত্তি হয়। এই বিশ্লেষণের জন্য অক্সিজেন (Oxygen) প্রয়োজন হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তার অক্সিজেন রক্তের সঙ্গে মিশে এবং রক্তের মধ্যের লোহিত কণিকা (Red blood corpuscle) দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। সুতরাং, অক্সিজেনের অভাব ঘটলে দেহের মধ্যে এই বিশ্লেষণ ক্রিয়ার অসুবিধা হয়, এবং দেহের ক্ষয় পূরণের অভাব দেখা যায়। এই কারণেও অবসাদ দেখা যায়।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ অত্যধিক কাজের জন্য দেহের লবণের (salt) পরিমাণ হ্রাস পায়। এবং এর ফলেও দেহের কর্মক্ষমতার হ্রাস পায়। অনেক সময় এই লবণের পরিমাণ খুব হ্রাস পেলে, অন্যান্য নানারকম দৈহিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, এবং তার ফলে, শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়।

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ দৈহিক নানারকম অসুস্থতার জন্য অনেক সময় অবসাদ হয়ে থাকে।

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ অবসাদ অনেক সময় দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ত্রুটির জন্য হয়ে থাকে। কোন বিশেষ কাজ করতে গিয়ে যেটুকু অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন, আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী অঙ্গ সঞ্চালন করে থাকি। এর ফলে, আমাদের কাজের জন্য যেটুকু শক্তি ক্ষয় হওয়া উচিত, তার চেয়ে বেশী শক্তি ক্ষয় হয় এবং অবসাদ তাড়াতাড়ি আসে। এইসব দৈহিক কারণ যে শুধুমাত্র দৈহিক অবসাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়; মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, এই সব দৈহিক কারণগুলো মানসিক কাজের মধ্যে অবসাদ আসার জন্যও দায়ী। গোল্ডস্টাইন (Goldstein) তাঁর এক বিশেষ পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, যে মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পেশীগত ক্রিয়া হয় এবং তার ফলে দৈহিক শক্তির ক্ষয় হয়।

মানসিক কারণ

অবসাদের দৈহিক কারণ যেমন আছে, তেমনি কিছু মানসিক কারণও আছে। যে সব বিশেষ মানসিক অবস্থা, ইচ্ছা, ইত্যাদির প্রভাবে যখন আমাদের অবসাদ দেখা দেয় তাদের বলা হয় **অবসাদের মানসিক কারণ।**

---

1. "Fatigue is an accumulation of the waste product of muscular activity' Wood Worth; Psychology.

॥ **প্রথমতঃ** ॥ কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা (Motivation) এবং অনুরাগের (Interest) অভাব অবসাদের জন্য দায়ী। কাজের পেছনে যথাযোগ্য অনুরাগ বা প্রেষণা থাকলে, একটানা কাজ করেও অনেক সময় অবসাদ আসে না। আবার, যে কাজে ব্যক্তির প্রেষণা নেই, সেই কাজ তার কাছে বোঝা স্বরূপ। ঐ ধরনের আরোপিত কাজ করতে গেলে ব্যক্তি সহজে অবসাদগ্রস্ত হয়। এই জন্য দেখা যায় ছেলেমেয়েরা খেলাধূলার সময় খুব তাড়াতাড়ি অবসাদগ্রস্ত হয় না। তবে প্রেষণা থাকলেই অবসাদ আসে না একথা ঠিক নয়। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করলে, প্রেষণা থাকা সত্ত্বেও দৈহিক কারণে স্বাভাবিকভাবে অবসাদ আসতে বাধ্য। প্রেষণা কেবলমাত্র অযথা অবসাদকে (unnecessary fatigue) দূর করতে পারে।

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ কোন কাজ করার জন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতি (Mental readiness) প্রয়োজন হয়। এই মানসিক প্রস্তুতি, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং যে কোন কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে কাজ করার জন্য ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত সেই কাজে সে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে; ফলে অবসাদ আসে না। যদি তার ঐ কাজের প্রতি মানসিক প্রস্তুতি না থাকে, তা'হলে সে সহজে অবসাদগ্রস্ত হবে।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ অভ্যাসের অভাবের জন্য অনেক সময় অবসাদ দেখা যায়। অভ্যাস ব্যক্তিজীবনে স্নায়বিক শক্তির অপচয় কমিয়ে দেয়। যে কাজ করার জন্য আমাদের এই স্বতঃশ্চল জৈবমানসিক সত্বা মানসিক শক্তির ক্ষয়ও বন্ধ করে। তবে, আগ্রহ ও প্রেষণার জন্য নতুন কাজ অনেক সময় অবসাদকে কমিয়ে রাখে। তাই অবসাদ একদিকে যেমন প্রেষণার অভাবের জন্য হয়, এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের জন্য কম হয়, তেমনি নতুন কিছু কাজ করার সময়ও অনেক সময় প্রেষণার জন্য অবসাদ কম হয়ে থাকে।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ মানসিক ইচ্ছার অভাব থাকার দরুন অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে অবসাদ আসে। যে সব ক্ষেত্রে জোর করে মানসিক ইচ্ছা প্রয়োগ করতে হয়, সেখানে অবসাদ তাড়াতাড়ি আসে। মানসিক ইচ্ছা প্রবল হ'লে অনেক সময় অনেক কঠিন কাজও করা সম্ভব হয়। তাই এই মানসিক ইচ্ছা, অবসাদের একটা বিশেষ-কারণ। এইসব মানসিক কারণগুলোর উপর নানা পরীক্ষা করে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্তে এসেছেন, এইসব কারণের চেয়ে দৈহিক কারণগুলো অবসাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

দৈহিক ও মানসিক কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণে অবসাদ আসে।

পরিবেশগত কারণ

কর্মপরিস্থিতির, যে সব আদর্শ পরিবেশের অভাবের দরুন অবসাদ দেখা দেয়, তাদের বলা হয় অবসাদের পরিবেশগত কারণ। এই পরিবেশগত কারণের উপর আধুনিককালে, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা

করা হয়েছে। এইসব পরীক্ষা লব্ধ ফল থেকে বর্তমানকালে, কর্মপরিস্থিতি থেকে অযথা অবসাদ দূর করার জন্য, জ্ঞানের এক বিশেষ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হ'ল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য রক্ষার (work hygiene) করা।

॥ **প্রথমতঃ** ॥ কর্ম পরিবেশের অন্তর্গত অবস্থা অবসাদের কারণ। কর্ম পরিস্থিতি যদি কাজের অনুকূল না হয়, তা'হলে অবসাদ তাড়াতাড়ি হয়। যেমন, যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করছে, সেই শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকার। ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার হওয়ার দরকার। কারণ নোংরা দেওয়াল, আলোর অভাব ঘটায়, তাতে করে শিক্ষার্থীদের চোখের উপর খুব বেশী চাপ পড়ে; তা'ছাড়া বাইরে থেকে আলো আসার পথ যদি ভাল না হয়, তাতেও তাদের অবসাদ আসে। ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থাও ভাল হওয়ার দরকার। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা খারাপ হ'লে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়ার উপর চাপ পড়ে, ফলে, তারা তাড়াতাড়ি অবসাদগ্রস্ত হয়। একই ভাবে যে কোন কর্ম পরিস্থিতিতে কাজের পরিবেশ ভাল না হওয়ার জন্য অযথা অবসাদ আসে।

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ কর্মক্ষেত্রের বাইরের পরিবেশও অনেক সময় অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কাজের সময় বাইরে যদি খুব হৈ চৈ হয়, তা'হলে কাজে মনোযোগের অভাব ঘটে, ফলে, তাড়াতাড়ি অবসাদ দেখা দেয়। অনেক সময় পরিবেশগত কারণে ব্যক্তির মধ্যে বিরক্তি (Boredom) সৃষ্টি হয় এবং এই বিরক্তির জন্য অবসাদ তাড়াতাড়ি আসে।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ কাজের প্রকৃতি অনেক সময় আমাদের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি করে, এবং ঐ বিরক্তির দরুনও অবসাদ আসে।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ আবহাওয়ার প্রভাবে অনেক সময় অবসাদ হ'য়ে থাকে। খুব গরমের দিনে অবসাদ বেশী তাড়াতাড়ি আসে; আবার শীতের দিনে কর্মক্ষমতা অনেক বেশী হয়।

বিদ্যালয়ে অবসাদ
[Fatigue in School]

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে মানসিক কাজ করে। এইসব মানসিক কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে তারাও অবসাদগ্রস্ত হয়। অনেক শিক্ষার্থী বা অভিভাবককে মন্তব্য করতে শোনা যায়, পড়ার চাপে শিক্ষার্থীরা খুব অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবসাদকে পরীক্ষা করার জন্য আধুনিক মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁদের এই পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতার হ্রাস ঠিক অবসাদের জন্য হয় না; বিশেষ-

বিদ্যালয়ে অবসাদের বিভিন্ন দিক

ভাবে বিরক্তির (Boredom) জন্যই হ'য়ে থাকে। বিদ্যালয়ের অবসাদের অনুশীলনের জন্য নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে। মনোবিদ্ **উইঞ্চ** (W. H. Winch), পরীক্ষা করে দেখেছেন, যারা দিনের বেলা অন্যত্র কাজ করে রাতে পড়াশুনা করে, তাদের কর্মক্ষমতা রাতে পড়ার সময় $\frac{1}{6}$ অংশ কম হয়। অপর একজন মনোবিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন অবসরের ঠিক পূর্বে, শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা সকালের দিকের চেয়ে কম থাকে। থর্নডাইকও (Thorndike) অনুরূপ পরীক্ষা করে একই ধরনের সিদ্ধান্ত করেছেন। **হেক্** (Heck), **মার্স** (Marsh) ইত্যাদি মনোবিদ্‌গণ সকলে এ বিষয়ে একমত যে, দিনের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ করার ক্ষমতার তারতম্য হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের অবসাদের উপর অন্য একদিকে পরীক্ষা করেছেন অনেক মনোবিদ্। তাঁরা বিশেষভাবে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের অবসাদ মূল্য (Fatigue value) নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। **ভাগনার** (Wagner), অ্যাসৃথোসিওমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অবসাদমূল্য কত তা নির্ণয় করেছেন। অবসাদ মূল্যের সূচক দিয়ে কোন বিষয় কত তাড়াতাড়ি অবসাদ আনে তার আপেক্ষিক পরিমাপ প্রকাশ করা হয়। পরিপূর্ণ অবসাদ মূল্যকে 100 ধরে ভাগনার নিম্নরূপ তালিকা দিয়েছেন—

বিষয়		অবসাদ মূল্য
গণিত	...	100
ভাষা	...	91
ইতিহাস ও ভূগোল	...	85
প্রকৃতি বিজ্ঞান	...	80
অংকন	..	75
খেলাধূলা ব্যায়াম	...	90

এ সম্পর্কে, আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এবং মনোবিদ্‌গণ কোন সময়ে এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। অনেক মনোবিদ্ বলেছেন, এই ধরনের বিষয়ের কোন অবসাদ মূল্য নেই, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, এবং পদ্ধতির দরুন বিভিন্ন বিষয়ে অবসাদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। তা'ছাড়া, শিক্ষার্থীদের অনুরাগের অভাবের দরুনও বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে অবসাদের তারতম্য দেখা যায়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসাদের লক্ষণ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসাদের দরুন নানা রকম লক্ষণ দেখা যায়, সে সম্পর্কেও মনোবিদ্‌গণ বিশেষ গবেষণা করেছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের দরুন যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তাদেরও তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (1) **দৈহিক** (Physical) (2) **মানসিক** (Mental) এবং (3) **প্রক্ষোভিক** (Emo-

tional)। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে ক্লান্তি (Tiredness), মাথা ধরা, মাথা ব্যাথা, দৃষ্টির ও শ্রবণ শক্তির অস্বচ্ছতা, ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। অনেকে বলেছেন, অবসাদের জন্য শিক্ষার্থীদের স্নায়বিক অক্ষমতাও লক্ষ্য করা যায়। মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে, মনোযোগের অভাব, মানসিক স্থৈর্যের অভাব, নির্ভুল গণনা শক্তির অভাব, স্মরণ করার ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ারও কিছু কিছু পরিবর্তন অবসাদের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন, উত্তেজনা, বিমর্ষতা, আনন্দের অভাব, ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করে, শিক্ষার্থীদের অবসাদ সম্পর্কে সচেতন না হ'লে, অনেক সময় খারাপ ফল দেখা যায়। এই ধরনের উপসর্গগুলোকে এড়িয়ে গেলে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থায়ী উপসর্গ (symptom) গড়ে ওঠে, যেগুলো তার যথার্থ শিখনের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ের শিখন ও অবসাদ

বিদ্যালয়ে শিখনের ক্ষেত্রে অবসাদের প্রভাব দূর করতে না পারলে, শিখনকে কার্যকরী করা যাবে না। শিখনের জন্য সুস্থ দেহ মন প্রয়োজন। কিন্তু অবসাদ, দেহ এবং মন উভয়কে প্রভাবিত করে। অবসাদের ফলে, শিক্ষার্থীর মনোযোগ, মানসিক স্থৈর্য, চিন্তন, স্মৃতি, ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু বিকাশ ব্যহত হয়। ফলে শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশও সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে না। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষককে বিশেষভাবে যত্নবান হ'তে হবে। যার ফলে অযথা অবসাদ শিখন ক্ষেত্রে আসতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে, শিক্ষকের নিজের মনোভাবও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষক নিজে অবসাদগ্রস্ত, এবং শ্রেণী কক্ষে কোনরূপ আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন না, তার পক্ষে শিক্ষার্থীদের অযথা অবসাদ দূর করা সম্ভব হবে না। শিক্ষক বিদ্যালয়ের অবসাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে, এই অযথা অবসাদের প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করা যাবে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
[Different ways of measuring Fatigue]

দৈহিক অবসাদ পরিমাপের পদ্ধতি

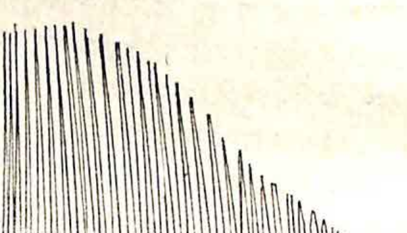
আধুনিক মনোবিদ্যার বিকাশের কল্যাণে, দৈহিক এবং মানসিক উভয় ধরনের অবসাদের পরিমাণ নির্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব পদ্ধতির মধ্যে কিছু যান্ত্রিক কৌশল আছে, কিছু অভীক্ষাও (Test) আছে। সাধারণতঃ যান্ত্রিক কৌশলগুলো দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

দৈহিক অবসাদ পরিমাপের কৌশলে বিশেষভাবে নানারকম দৈহিক ক্রিয়াকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এই সব পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে একটানা কাজ দিয়ে, নাড়ীর স্পন্দনের পার্থক্য, অঙ্গ সঞ্চালনের পার্থক্য, দেহের উত্তাপের পার্থক্য ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। প্রথম ও শেষ পরিমাপের সঙ্গে পার্থক্য অবসাদের দ্বারা নির্ণীত হয় বলে বিবেচনা করা হয়। আমরা এখানে দৈহিক অবসাদ পরিমাপের কয়েকটা কৌশল সম্পর্কে উল্লেখ করছি।

[এক] **অ্যাস্থিসিওমিটার** (Aesthesiometer): এই যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে ত্বকের স্পর্শানুভূতি পরিমাপ করা যায়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, অবসাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের স্পর্শানুভূতি কমতে থাকে। এই কারণে এই যন্ত্রকে অবসাদ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ত্বকের স্পর্শানুভূতি দ্বারা অবসাদের পরোক্ষ পরিমাপ পাওয়া যায় এই পদ্ধতিতে।

[দুই] **হাতের শক্তি পরিমাপক ডাইনামোমিটার** (Hand-dynamometer): এই যন্ত্রের সাহায্যে হাতের কব্জির শক্তি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। দৈহিক অবসাদের দরুন, দৈহিক পেশীর কর্মক্ষমতা কমে যায়। এই কারণে এই যন্ত্রের সাহায্যে অবসাদের দরুন হাতের পেশীর কর্মক্ষমতার কি রকম পরিবর্তন হয়, তা পরিমাপ করা যায়।

[তিন] **আরগোগ্রাফ** (Ergograph): অবসাদ পরিমাপের জন্য এই পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার করেন মসো (Mosso), ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এই যন্ত্রে পরীক্ষার্থীর হাতকে শক্ত করে টেবিলের সঙ্গে বাঁধার ব্যবস্থা আছে। হাতকে এমনভাবে বাঁধা হয়, যার ফলে একটামাত্র আঙ্গুল (মাঝের আঙ্গুল) কেবলমাত্র খোলা থাকে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র মাঝের আঙ্গুল ছাড়া যাতে অন্যান্য আঙুল না নাড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই মাঝের আঙুলের সঙ্গে একটা ওজন দড়ির সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই ওজনটা একটা কপি কলের (Pulley) উপর দিয়ে টেবিলের বাইরে ঝোলানো থাকে। এই যন্ত্রে অবসাদের পরীক্ষার জন্য আর একটা যন্ত্র সঙ্গে প্রয়োজন হয়। তাকে বলা হয় কাইমোগ্রাফ (kymograph)। এই **কাইমোগ্রাফ** গায়ে ধোঁয়ানো কালো কাগজ (smoked paper) লাগানো থাকে। এবং এই কাগজ সমেত সম্পূর্ণ অংশটা যাতে ধীরে ধীরে ঘুরতে পারে তার জন্য স্প্রীং বা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকে। পরীক্ষার্থীদের মাঝের আঙুল যে সুতোর সঙ্গে বাঁধা আছে তার সঙ্গে একটা ধাতব লেখনী (Metal stylus) এমনভাবে লাগানো থাকে যে পরীক্ষার্থী



আঙুলটা নাড়াচাড়া করলে, ওজনটা ওঠা-নামা করে এবং সেই সঙ্গে ধাতব লেখনীটাও নাড়াচাড়া করে। এখন এই লেখনীটাকে কাইমোগ্রাফের গায়ে আল্‌তো করে লাগিয়ে পরীক্ষার্থীকে আঙুল নাড়াচাড়া করে ওজনটা একবার তুলতে এবং একবার নামাতে বলা হয়। এই কাজ করার সময় পরীক্ষার্থীর ধীরে ধীরে আঙুলের পেশীর অবসাদ আসে। ফলে প্রথমে সে যত জোরে জোরে টানে, পরে তত জোরে পারে না। কাইমোগ্রাফের কাগজের উপর অনুরূপভাবে দাগ পড়তে থাকে। এর ফলে একটা লেখচিত্রের সৃষ্টি হয়, একে বলা হয় **আরগোগ্রাম্‌** (Ergogram)। এর লেখচিত্রের বিভিন্ন অংশ পরিমাপ করে আমরা ব্যক্তির বিশেষ অঙ্গের পেশীর অবসাদের পরিমাপ করতে পারি। এই লেখচিত্র বিশ্লেষণ করলে, লক্ষ্য করা যায়, মানুষের সাধারণ কর্মক্ষমতার সব বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বর্তমান। প্রথম প্রথম দু'একটা টান ছোট হয়, তার পরের টানগুলো বেশ বড় হয়। অর্থাৎ এটাকে আমরা **প্রাথমিক উর্ধগতির সময়** (Primary warming up period) বলতে পারি। পরে এই উন্নত অবস্থা কিছুক্ষণ বজায় থাকে, এবং সামান্য কিছু নেমে তা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। একে আমরা অধিত্যকা স্তর বলতে পারি। এর পরের টানগুলো ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে, এবং সবশেষে খুবই ছোট হ'য়ে যায়। একে বলা হয় ক্রমঃ অবনতির স্তর। কিন্তু শেষের দিকে দু'একটা টান খুব বড় দেখা যায়। এগুলোকে **প্রান্তীয় উর্ধগতির স্তর** (End spurt) বলা যেতে পারে। এইভাবে দৈহিক অবসাদ পরিমাপের ক্ষেত্রে, এক ধরনের সূচক ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় **অবসাদের সূচক্‌** (Fatigue Index)। সাধারণতঃ শেষ চারটে টান ও প্রথম চারটে টানের দৈর্ঘ্যের অনুপাত দিয়ে এই সূচককে প্রকাশ করা হয়। আধুনিককালে, দেহের বিভিন্ন পেশীর পরিমাপের জন্য এই ধরনের নানা রকম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

মানসিক অবসাদ পরিমাপের পদ্ধতি

দৈহিক অবসাদের মত মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য আধুনিককালে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে এই সব পদ্ধতিতেও আমরা পরোক্ষভাবে অবসাদের পরিমাপ করে থাকি। বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া অবস্থা, ক্ষমতা, পরিমাপ অভীক্ষাগুলোকে আমরা অবসাদ পরিমাপের জন্য ব্যবহার করি। একটানা মানসিক কাজ করলে, মানসিক কর্মক্ষমতার তারতম্য হয়। এই পার্থক্য দ্বারা আমরা অবসাদের পরিমাপ করি। এখানে আমরা সাধারণভাবে প্রচলিত কয়েকটা অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করব।

[এক] **পদপূরণের অভীক্ষা (Completion test)**:—এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীকে কোন বিষয়ের (subject) কিছুটা অংশ পড়তে দেওয়া হয়। এই পাঠ্য অংশের কিছু অংশে ফাঁকা রাখা হয়। পরীক্ষার্থীকে বলা হয় অংশটুকু পড়ে

যেতে এবং সেই সঙ্গে ফাঁকা পদগুলো পূরণ করতে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যতটুকু করে সে করছে, বিশেষ নির্দেশ দ্বারা সেটুকু অংশ চিহ্নিত করে, কাজ না বন্ধ করে চালিয়ে যেতে বলা হয়; আবার নির্দিষ্ট সময় পরে, ঐ সময়ের মধ্যে যতটুকু সে এগিয়ে, ততটুকু চিহ্নিত করে, আরও এগিয়ে যেতে বলা হয়। এমনিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করার পর বিশ্লেষণ করলে দেখা গেছে সময় ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থীর ভুলের পরিমাণ বাড়ে এবং পদ পূরণের সংখ্যাও কমতে থাকে। এই পরীক্ষা থেকে আমরা ব্যক্তির মানসিক অবসাদ পরিমাপ করতে পারি।

[দুই] **অক্ষর বর্জনের অভীক্ষা** (Cancellation test) **:—**এই পদ্ধতি পাদ পূরণের পদ্ধতিরই প্রায় অনুরূপ। এখানে পরীক্ষার্থীকে একটি বিষয়ের (subject) কিছু ছাপা অংশ দিয়ে তার মধ্য থেকে বিশেষ একটা অক্ষরকে কেটে বাদ দিতে বলা হয়। বিশেষ সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষার্থীর এই অক্ষর কাটার হার ও তার ভুলের তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা হয়। এবং এই তুলনামূলক বিচার দেখে তার অবসাদের হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

[তিন] **মুখস্থ করার ক্ষমতা পরিমাপক পদ্ধতি (Memorization test) :—**মুখস্থ করার ক্ষমতার হার অনুশীলন করে আমরা পরীক্ষার্থীর মানসিক অবসাদের হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারি। কোন বিষয়বস্তু একটা মুখস্থ করতে দিয়ে সময়ের ব্যবধানের তার মুখস্থ করার হার কি ভাবে কমছে, তা পরিমাপ করা যায়। এই অবনতির হার থেকে আমরা পরোক্ষভাবে অবসাদকে পরিমাপ করতে পারি।

[চার] **সংখ্যা গণনার পদ্ধতি** (Calculation test) **:—**এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে নানাধরনের সংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা দেওয়া হয়। এই সমস্যা সমাধানের সময়, নির্ভুলতা, ইত্যাদি বিচার করে অবসাদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়। বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অবসাদের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করেছেন। থর্নডাইক (Thorndike) যোগ অঙ্ক করার সময়, কি পরিমাণে অবসাদ আসে তার উপর পরীক্ষা করেছেন। **মিস্ আরাই** (Miss Arai)। গুণের সমস্যা সমাধানের সময় কি রকম অবসাদ হয় তার উপরে পরীক্ষা করেছেন।

বিদ্যালয়ে অবসাদ দূর করার উপায়
[Remedy for School Fatigue]

একটানা অনেকক্ষণ কাজ করলে, আমাদের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কর্ম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে এই অবসাদ আসবেই। আমরা যতই সুব্যবস্থা করি না কেন, কাজ মানুষের দৈহিক ও মানসিক সহ্যের সীমার

অতিরিক্ত হ'লেই অবসাদ দেখা দেবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদ আসে। আবার, অনেক সময়, পরিস্থিতির অসুবিধার দরুনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের অনুভূতি দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে এই সব অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, এবং শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমরা কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে পারি। এই সব কৌশলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

অবসাদ ও বিদ্যালয়ের কাজ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি অনুরাগের (Interest) সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনুরাগ থাকে, সে বিষয় তারা অনেকক্ষণ এক সঙ্গে পড়লেও তাদের সেই বিষয়ের প্রতি মানসিক অবসাদ আসে না। আবার যে বিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, সে সব বিষয় একটু পড়ার পরই তাদের মধ্যে অবসাদের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অযথা অবসাদ (unnecessary fatigue) দূর করতে হলে পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ ; শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ, বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ ; বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের প্রতি অনুরাগ ; ইত্যাদি সবই শিশুর অবসাদ সৃষ্টিতে বাধা দেয়। সুতরাং, এই সমস্ত দিকের প্রতি নজর দিলে, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে অবসাদের পরিমাণ অনেক কমে যাবে এবং তাদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণে মানসিক কাজ আদায় করা সম্ভব হবে, এ ব্যাপারে শিক্ষক পূর্বে আলোচিত অনুরাগ সৃষ্টির সমস্ত কৌশলই প্রয়োগ করবেন।

অনুরাগ ও অবসাদ

বিদ্যালয়ের অযথা অবসাদকে দূর করতে হ'লে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য প্রেষনা (Motivation) জাগ্রত করতে হবে। প্রেষণা এবং অনুরাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে, তারা সহজে অবসাদগ্রস্ত হবে না। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করতে পারলে তারা ঐ সব বিষয়বস্তু শিখনে আগ্রহ দেখাবে। এছাড়া, তাদের এমন সব সমস্যা দিতে হবে, তারা যেন তা সহজে সমাধান করতে পারে। তারা নিজেরা সমস্যা সমাধানে সক্ষম হ'লে, তাদের এই সাফল্য পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে প্রেষণা শক্তি জোগাবে। সুতরাং, বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। অত্যধিক দুরূহ বিষয় দিয়ে তাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললে তারা সহজেই অবসাদগ্রস্ত হবে।

প্রেষণা ও অবসাদ

এছাড়া, আধুনিক মনোবিদ্‌গণের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে টুকু মানসিক কাজ করে, তার দ্বারা অবসাদ আসতে পারে না। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের যে সব উপসর্গ দেখা যায়, তা বিরক্তির (Boredom) দরুন হয়ে থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে এই বিরক্তির ভাব না আসে সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীন, যান্ত্রিক কাজ, বিরক্তির সৃষ্টি করে। পাঠে বৈচিত্র্য আনার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Teaching aids) ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কিছু হাতে কলমে করার মত কাজ দিলে, বক্তৃতার একঘেঁয়েমি থেকে তারা মুক্তি পায়। অনেক সময়, শিক্ষকের পরিবর্তন, বিষয়ের পরিবর্তন এবং শ্রেণী কক্ষের পরিবেশের পরিবর্তন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তিভাব দূর করে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতাকে (special ability) প্রকাশ করার কিছু সুযোগ বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখলে তাদের বিরক্তি (Boredom) কম হয় এবং অবসাদও তাড়াতাড়ি আসে না।

বিরক্তি ও বিদ্যালয়ের কাজ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ'ল ত্রুটিপূর্ণ সময় তালিকা (Time table)। বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণের পরীক্ষা থেকে লক্ষ্য করা গেছে, বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়গুলোর মধ্যে অবসাদ উৎপাদনের দিক থেকে তারতম্য আছে; দিনের বিভিন্ন সময়ে কর্মক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে; আবার সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের কর্মক্ষমতারও তারতম্য থাকে। এই তিনদিকের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে সময় তালিকা (Time table) রচনা করতে না পারলে, শিক্ষার্থীদের অবসাদ কমানো যাবে না। যখন শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ করার ক্ষমতা কম থাকে, তখন যদি তাদের খুব কঠিন কিছু বিষয় পড়তে দেওয়া হয়, তা'হলে তারা খুব দ্রুত অবসাদগ্রস্ত হবে। আবার একটানা যদি সব কঠিন বিষয়গুলো পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারা তার ফলে, এমনই অবসাদগ্রস্ত হবে যে, পরবর্তীকালে আর কোন কাজই তারা করতে পারবে না। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে এমন সময়তালিকা তৈরী করা যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়।

অবসাদ ও সময় তালিকা

উপরোক্ত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেও, স্বাভাবিক নিয়মে কিছু অবসাদের প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর আসবেই। সেই প্রভাবকে কমানোর জন্যও কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে শিক্ষককে। দেহের শক্তি ক্ষয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের অবসাদ দেখা দেয়। এবং এই ক্ষয় পূরণের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘুম সবচেয়ে ভাল বিশ্রাম। এই বিশ্রামের মধ্যে, দেহ নতুন উদ্দমের কাজ করার মত শক্তি

বিশ্রাম ও অবসাদ

সঞ্চয় করে। একেবারে শিশুদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নার্শারি বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে ঘুমের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করাই অবাস্তব। তাই শিক্ষার্থীদের যাতে রাতে ভাল ঘুম হয় সে ব্যাপারে অভিভাবক লক্ষ্য রাখবেন। শিক্ষকের দায়িত্ব নয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে বিরতি বা বিশ্রাম দিয়ে শিক্ষার্থীদের শক্তির পুনরুদ্ধার শিক্ষক করতে পারেন। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে তিন বা চার পিরিয়ড (period)-এর পর বিশ্রাম দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এর দ্বারা কিছুটা ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করলে অনেক বেশী পরিমাণে অবসাদ দূর করা যায়। এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা কাজ করার পর 30 মিনিট বিশ্রাম দিলে যে ফল পাওয়া যায় প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর বা দু'ঘণ্টা অন্তর 10 মিনিট বিশ্রাম দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, বিশ্রামের সময় শিক্ষার্থীরা কিভাবে সময় কাটাবে সে সম্পর্কেও শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। এক কথায়, শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের প্রভাবকে কমানোর জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করবেন, এবং বিশ্রাম সময়কালীন আচরণবিধিও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

বিদ্যালয় পরিবেশ ও অবসাদ

এছাড়া, অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশগত কারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদ দেখা দেয়। শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা, বোর্ডের অবস্থা, শ্রেণী কক্ষের আলো, বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থার দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের অবসাদের অনুভূতি হ্রাসের জন্য সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশেরও উন্নতি করতে হবে।

আলোচনা

সবশেষে, শিক্ষার্থীকে অবসাদের প্রভাবমুক্ত করে, তাদের কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে হ'লে শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহিত করতে পারেন, তা'হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের অনুভূতি আসবে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে একটানা মানসিক কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়, সেদিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। কারণ, অভ্যাস আমাদের কাজের কাঠিন্য দূর করতে পারে। শিক্ষকের সহানুভূতি, নির্দেশনা, উৎসাহ, শিক্ষার্থীদের সব সময়েই কাজে অনুপ্রাণিত করবে, একথা মনে রেখে, কর্মের আদর্শ তিনি যদি তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তা'হলে তাঁর নিজের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What is fatigue ? Discuss the various causes of fatigue. [পৃঃ ২৬৯-২৭৫]
2. Discuss the teacher's role in avoiding fatigue of the school children. [পৃঃ ২৮০-২৮৩]
3. Distinguish between fatigue and boredom. Discuss the various methods of measuring fatigue. [পৃঃ ২৭০-২৭১ ; ২৭৭-২৮০]
4. Discuss the relation between work and fatigue. Discuss the impact of fatigue on school learning. [পৃঃ ২৬৭-২৭০ ; ২৭৫-২৭৭]
5. Write notes on the following :
   (a) Mental fatigue & Physical fatigue. [পৃঃ ২৭১-২৭০]
   (b) Ergogram. [পৃঃ ২৭৮-২৭৯]
   (c) Fatigue and school work. [পৃঃ ২৭৬-২৭৭]
   (d) Fatigue & Boredom. [পৃঃ ২৭০-২৭১]

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তিতরূপ

স্বাভাবিক, কৃত্রিম উভয় ধরনের প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তি জীবনের বিকাশ হ'চ্ছে। আমরা স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পরবর্তী স্তরে কৃত্রিম বিকাশের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এখন, প্রশ্ন হ'ল—এই বিকাশের ফলে, ব্যক্তির কি ধরনের পরিবর্তন হয়? পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তিত বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে অভ্যাস (Habit) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আচরণগত প্রস্তুতির পরিবর্তিত আকার হিসাবে মনোভাব (Attitude) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে জন্মগত প্রবণতার পরিবর্তিত রূপ হিসাবে যে মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে, সেই সেন্টিমেন্টের (Sentiment) উল্লেখ করেছি। সবশেষে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে, ব্যক্তিজীবনের যে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও পরিপূর্ণরূপ আমরা পাই তাই হ'ল—ব্যক্তিসত্বা (Personality)। আর এই ব্যক্তি-সত্বার বিভিন্ন দিক হ'ল মনঃপ্রকৃতি (Temperament) এবং চরিত্র (Character)। এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

অভ্যাস

[HABIT]

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষকে সমান তালে চলতে হবে যন্ত্র-দানবের সঙ্গে। তাই তাকে কাজও করতে হবে একদিকে যেমন দ্রুত অন্তদিকে তেমনি নিখুঁতও। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, ভেবে-চিন্তে বিচার করে কাজ করতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার-সম্ভাবনা আছে। রাস্তায় চলতে গিয়ে গাড়ী সামনে পড়লে কি করবো, তাই যদি সময় নিয়ে ভাবতে হয়, তাহ'লে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। আবার কারখানার বড় বড় স্বয়ংশ্চল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে যদি কর্মীকে প্রতি পর্যায়ে সব কিছু বিচার করে অঙ্গ সঞ্চালন করতে হয়, তাতে উৎপাদনও ব্যাহত হবে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও আছে।

অভ্যাস সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

তাই আজকে গতি-ধর্মের যুগে মানুষকেও ক্ষীপ্র গতি সম্পন্ন হ'তে হবে—দেহ সঞ্চালনের দিক থেকে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। আমাদের আচরণ ধারাকেও গতিবান করতে হবে, পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ অভিযোজন করার জন্ত। এমনি কিছু গতিবান আচরণই (Behaviour) হ'ল **অভ্যাস** (Habit)। একে শুধুমাত্র অভ্যাস বললে ভুল করা হবে, কারণ অভ্যাস বলতে আমরা মনের কোন গুণকে বুঝাই না। এটা হ'ল এক ধরনের **আচরণ** (behaviour) বা **কর্ম** (action)। তাই একে **অভ্যস্ত কর্ম** (habitual action) বলাই ভাল। তবে আমরা প্রচলিত অর্থে এই ধরনের কাজকেই অভ্যাস বলে থাকি। আবার, সাধারণ অর্থে আমরা অভ্যাস বা habit কথাটাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করি। যেমন—'ধূমপানের অভ্যাস' বা 'চুরি করার অভ্যাস' ইত্যাদি। কিন্তু, ভাল সব আচরণের ক্ষেত্রে অভ্যাস কথাটা সব সময় ব্যবহার করি না। তাই একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, অনেক খারাপ আচরণ যেমন অভ্যাস, তেমনি অনেক ভাল আচরণও অভ্যাসের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি উল্লেখযোগ্য। "Habit is our best friend and worst enemy." অনেকে এ কথাও মনে করেন

যে মানুষের জীবনটাই অভ্যাসের বন্ধনীতে আবদ্ধ। এমনকি আমাদের আবেগ-মূলক (emotional) এবং বুদ্ধিমূলক (intellectual) কাজগুলো অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত।

এখন প্রশ্ন হ'ল—অভ্যাস কি ? বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে-অভ্যাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু অমিল নেই। যেমন, মনোবিদ **থর্নডাইক বলেছেন**—'অভিজ্ঞতা অনুশীলন বা শিখনের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আয়ত্তীকৃত প্রতিক্রিয়াই হ'ল অভ্যাস।' মনোবিদ **মাহের মতে,** কোন একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করার কৌশলই হ'ল অভ্যাস (habit)। **মনোবিদ্ আলপোর্ট** (Allport) বলেছেন, অভ্যাস হ'ল এক ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ অনুবর্তিত প্রক্রিয়া যার পরিধি খুবই বিস্তৃত, অথচ একই ধরনের উদ্দীপকের বর্তমানে একই রকম আচরণ করতে আমাদের বাধ্য করে (Habits are integrated system of conditioned responses, involving altered responses as well as extended range of effective conditioning leading to fairly stereo-typed forms of responses in the face of recurrent situations of a familiar type.)। অর্থাৎ, এক কথায় আমরা বলতে পারি অভ্যাস হ'ল এক ধরনের অর্জিত কর্মসম্পাদন ক্ষমতা যার সাহায্যে আমরা স্বতশ্চলভাবে কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারি। কিন্তু এইভাবে অভ্যাসের সংজ্ঞা দিলে, তার স্বরূপ বোঝা যায় না। অভ্যাস যে কি তা সঠিকভাবে বুঝতে হ'লে, তার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার।

অভ্যাসের সংজ্ঞা

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি [Nature and Characteristics of Habit] :—

অভ্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অনেকে বলেছেন, এটা ঐচ্ছিক কর্মের (voluntary action) পুনরাবৃত্তি বা অনুশীলনের ফলে সৃষ্টি হয় (Habit may be called a product of repeated voluntary action)। আমাদের সবরকম কাজকে আমরা সাধারণভাবে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। **একটা হ'ল অনৈচ্ছিক কর্ম (Non-voluntary action) অপরটা হ'ল ঐচ্ছিক কর্ম (Voluntary action)।** অনৈচ্ছিক কাজ সম্পাদনের জন্য কোন রকম সচেতন ইচ্ছা (conscious mental will) প্রয়োজন হয় না। আর, ঐচ্ছিক কাজের জন্য সচেতন মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। এই সব

অভ্যাসের প্রকৃতি

কাজ ভেবে-চিন্তে করি। অভ্যাসের প্রকৃতি হ'ল এদের দুটোর মাঝামাঝি। অভ্যাস একবার গড়ে উঠলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে সম্পাদিত হয়। অভ্যাসজনিত কাজের (habitual action) সম্পাদনের জন্য আমাদের মানসিক ইচ্ছাকে (conscious will) প্রয়োগ করতে হয় না। কিন্তু অভ্যাস গঠনের সময় অথবা ঐ সব কর্ম প্রথম সম্পাদনের সময় ইচ্ছা এবং মনযোগ দুইয়েরই প্রয়োজন হয়। যেমন, সকালে উঠে মুখ পরিষ্কারের কথা ধরা যাক। ছোট শিশুদের মায়েরা ঘুম থেকে উঠলে জোর করে মুখ পরিষ্কার করে দেন। পরে, একটু বড় হ'লে তারা ঘুম থেকে উঠলে মুখ পরিষ্কার করার কথা বলেন। এমনিভাবে কিছুদিন করার পর শিশু যখন বড় হয়, তখন তাকে আর মনে করিয়ে দিতে হয় না। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই মুখ পরিষ্কারের কাজ যান্ত্রিকভাবে সম্পাদন করে। তখনই তাকে বলা হয় 'মুখ পরিষ্কার করার অভ্যাস।' এইভাবে, একটা ঐচ্ছিক কর্ম বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে যখন অনৈচ্ছিক কর্মের রূপধারণ করে, তখনই তাকে অভ্যাস বলা হয়। এই কারণে অভ্যাসকে অর্জিত অনৈচ্ছিক কর্ম (acquired non-voluntary action বা secondary automatic action) বলা হয়। এই ধরনের কাজ আমাদের মানসিক শক্তির (mental energy) অপচয় বন্ধ করে। কারণ দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কিছু কাজ যদি আমরা যান্ত্রিক ভাবে (mechanically) সম্পন্ন করতে পারি, তবে ঐ শক্তি ব্যয়ে আমরা জীবনের অনেক নূতন সমস্যা সমাধান করতে পারি। এরকম ধরনের সাধারণ কাজ হ'ল—হাঁটা, বসা, সাঁতার কাটা, দাঁড়ানোর ভঙ্গী ইত্যাদি। এর থেকে অনেকের ধারণা হতে পারে, অভ্যাস শুধুমাত্র দেহ-সঞ্চালন গত আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ধারণা ঠিক নয়। **অভ্যাস যেমন দৈহিক ক্রিয়া কর্মের হয়, তেমনি, মানসিক ক্রিয়ারও হতে পারে।**

যদিও অভ্যাস ঐচ্ছিক কর্মের পুনরাবৃত্তির ফলে সৃষ্টি হয়, তবুও পরিপূর্ণ অবস্থায় তার মধ্যে আমরা অনৈচ্ছিক কর্মের বহু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। কিন্তু সাধারণ অনৈচ্ছিক কর্মের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অভ্যাসের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করবো।

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য

[**এক**] অভ্যাসমূলক কাজ সম্পাদনে বিশেষভাবে সমতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ সব রকম ঐচ্ছিক কর্মই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সহায়তা করে। তাই এই ধরনের কাজ পরিবর্তনধর্মী। কিন্তু অভ্যাসমূলক কাজ আমরা উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তিতে করে থাকি এবং একইভাবে সম্পন্ন করি। কাজেই অভ্যাসমূলক কাজের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল **সম্পাদনের**

সমতা (uniformity in performance)। এটা আমাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজন করতে সাহায্য করে না।

[**দুই**] অভ্যাসমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদের কোন চিন্তা ভাবনা করতে হয় না। তাই এই ধরনের কাজ আমরা খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি। আমাদের সামনে কোন নূতন সমস্যা উপস্থিত হ'লে, তার সম্পর্কে ভাবতে হয়; বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু অভ্যাসমূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন নূতন সমস্যা থাকে না বলেই, বিশেষ চিন্তার কোন প্রয়োজন হয় না। ফলে, এই ধরনের কাজ ক্ষীপ্রতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। তাই **সম্পাদনের ক্ষিপ্রতা** (promptness of execution) অভ্যাসমূলক কাজের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

[**তিন**] অভ্যাস হ'ল আচরণের সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন রূপ। ক্ষীপ্রতার জন্য অনেক সময় আমরা অনেক কাজ ভুল ভাবে সম্পাদন করে ফেলি। কিন্তু অভ্যাস একবার গঠন হলে, যদিও আমরা তা ক্ষীপ্রতার সঙ্গে করি, তাহলেও তা আমরা নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতে পারি। অবশ্য যদি আমরা নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস করে থাকি। অর্থাৎ, যেমন ভাবে কোন ঐচ্ছিক কাজ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত হয়, অনুরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে আমরা একইভাবে নির্ভুল আকারে তার পুনরাবৃত্তি করি। তাই **সঠিকভাবে কর্মসম্পাদন** (accuracy of performance) অভ্যাসগত কাজের একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

[**চার**] অভ্যাসমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির মনযোগের (attention) প্রয়োজন হয় না। অভ্যাসের ক্ষেত্রে মনযোগ যে প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র এই কথা বললে বোধ হয় ঠিক হয় না। বরং মনযোগ দিলে, অভ্যাসমূলক কাজ ব্যহত হয়। মনযোগ কাজের ক্ষীপ্রতা কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ, **স্বতশ্চলতা** (automatization) এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। জামায় বোতাম লাগাতে গিয়ে আমরা যদি তার প্রতি বিশেষভাবে মনযোগ দিই, তাহ'লে দেখা গেছে, ঐ কাজ করতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। তাই, অভ্যাসের এই ধরনের স্বতশ্চলতা যে শুধু তার ক্ষীপ্র বা নির্ভুল সম্পাদনে সাহায্য করে তাই নয়, তার একটা ব্যবহারিক দিকও আছে। মনোবিদ **লথার** (Lawther, J. D.) এ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন—"Automatization is essential not only for speed and accuracy but for the functional use of the skill।"

[**পাঁচ**] অভ্যাসজনিত কাজ ব্যক্তি খুব সহজে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। অভ্যাসজনিত কাজ পরিমাণে খুব বেশী হ'লে বা কষ্টদায়ক হ'লেও, তা আমাদের দেহ-মনকে তত বেশী অবসাদগ্রস্ত করে না, যত করে ঐচ্ছিক

সমস্যামূলক কাজ। যেমন যাঁরা কয়লার খনিতে কাজ করেন, তাঁরা অভ্যাসের দরুন ঐ কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। **অল্প আয়াসে** এই ধরনের কাজ সম্পাদন সম্ভব হয় (ease in performance)

[**ছয়**] সবশেষে বলা যায়, অভ্যাস পরিবর্তনকে **প্রতিরোধ** (resistance to change) করে। সুষ্ঠু ও সুন্দর অভ্যাস গঠন যেমন একদিকে শিক্ষার আদর্শ, অপরদিকে অভ্যাস একবার গঠন হলে তা সহজে শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। শিশুদের একবার কোন অভ্যাস গঠন হলে তা ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হয়। এর কারণ অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির দেহ-মনের নূতন প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

অভ্যাস, প্রবৃত্তি এবং প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া [Habit, Instinct & Reflex action.] :—

আমরা অভ্যাসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি, এটা এক ধরনের অর্জিত অনৈচ্ছিক কর্ম। তাই এর মধ্যে আমরা অনৈচ্ছিক কর্মের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই সব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য অনেক সময় অভ্যাস সম্পর্কে ভুল ধারণা হয়। অন্যান্য অনৈচ্ছিক কর্মের সঙ্গে অভ্যাসের কি পার্থক্য আছে তা উল্লেখ না করলে এই ধরনের ভুল ধারণা থেকে যেতে পারে। **এখানে আমরা বিশেষভাবে প্রবৃত্তিগত কর্ম** (instinctive action) **এবং প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার** (reflex action) **সঙ্গে অভ্যাসের তফাৎ করার চেষ্টা করবো।** প্রবৃত্তিজনিত কর্ম ও প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা আমরা জন্মগতভাবে অর্জন করি (innate)। অর্থাৎ, এই সব আচরণ করার প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত। এক কথায় এদের আমরা অনর্জিত অনৈচ্ছিক কর্ম (unlearnt non-voluntary action) বলতে পারি। কিন্তু অভ্যাস আমাদের অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ব করতে হয়। কোন কাজ বারবার সম্পাদনের মাধ্যমে এক যান্ত্রিকরূপ ধারণ করে। তখন তার মধ্যে আমরা অনর্জিত অনৈচ্ছিক কর্মের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সুতরাং, অভ্যাসের সঙ্গে অন্যান্য অনৈচ্ছিক কর্মের মূলগত একটা পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। **অভ্যাস হ'ল অর্জিত (Learnt or Acquired) শিক্ষা বা চর্চার ফল, সংস্কারগত কর্ম ও প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া অনর্জিত (Unlearnt) এবং জন্মগত (Innate)।**

অভ্যাস, প্রবৃত্তি ও প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার মিল

আপতঃ দিক থেকে অভ্যাস ও সংস্কারগত কর্মের মধ্যে মিল দেখে অনেকে মনে করেন, যে কোন ধরনের অভ্যাস সহজাত সংস্কার (instinctive behaviour) এর রূপান্তর মাত্র। আবার কেউ কেউ বলেন, অভ্যাস

আমাদের নানারকম প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। **মনোবিদ্ আলপোর্টও** অনুরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, তৎপরতার দিক থেকে ঐ সব কাজের মধ্যে একটা আপাতঃ মিল দেখা গেলেও, বুৎপত্তির দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সংস্কারগত কর্ম এবং অভ্যাসকে আমরা মানসিক প্রবণতা উদ্ভূত বললেও প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়াকে আমরা তা বলতে পারি না। অন্যদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, প্রবৃত্তিগত কর্ম এবং প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অভ্যাস একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, হাঁচি, কাশি প্রভৃতি আচরণ সমভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু হাঁচি বা কাশির সময় মুখে ঢাকা দেওয়ার অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত।

অভ্যাসের দৈহিক কারণ [Physiological Basic of Habit formation]ঃ—

অভ্যাস গঠনের পেছনে কতকগুলো দৈহিক কারণ আছে। এই দৈহিক কারণগুলোর কথা মনোবিদরা স্বীকার করেছেন। অভ্যাস গঠনের মূলে আমাদের স্নায়ুকোষ (neuron), পেশী (muscle) ইত্যাদির বিশেষ এক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহযন্ত্রের এই অংশের নমনীয়তাই (plasticity) অভ্যাস গঠনের মূল কারণ। **উইলিয়াম জেমস্** (William James) বলেছেন সব জৈবিক কোষই নমনীয় (all living tissues plastic)। এই সব জৈবিক কোষের মধ্যে স্নায়ুকোষ (nerve tissue)গুলো সবচেয়ে বেশী নমনীয়। তাই মনোবিদ্ এবং শরীর বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের অভ্যাস গঠনের মূলে আছে এই অতি নমনীয় স্নায়ুকোষ। কোন প্রতিক্রিয়ার জন্য উদ্দীপনা যে স্নায়ুপথে প্রবাহিত হয়, তাকে ঐ প্রতিক্রিয়ার চাপ (arc) বলে। কোন উদ্দীপক আমাদের দেহের মধ্যে কোন সংগ্রাহক (receptor) বা ইন্দ্রিয়কে (sense organ) উত্তেজিত করলে, সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু (sensory nerve or efferent nerve) বেয়ে মস্তিষ্কে যায় এবং সেখান থেকে উত্তেজনা আবার চালক স্নায়ু (motor nerve) দিয়ে কোন কর্মেন্দ্রিয়ে (effector organ) ফিরে আসে। এই সম্পূর্ণ স্নায়ুপথকে বলে চাপ। এই উত্তেজনা কর্মেন্দ্রিয়ে পৌঁছালেই প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু, প্রথমেই কোন উত্তেজনা স্নায়ুপথ দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে না। স্নায়ুপথে বিভিন্ন কোষের সংযোগস্থলে বা স্নায়ুসন্ধিতে (synapse) এই উত্তেজনা বাধা পায়। কিন্তু, কোন উত্তেজনা একবার ঐ বাধাকে

অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি

অতিক্রম ক'রে তা গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারলে, ঐ কাজের পুনরাবৃত্তিতে বাধার পরিমান কমতে থাকে। এইভাবে একই কাজ যদি বার বার পুনরাবৃত্তি করা যায়, তাহলে তার বাধা ক্রমেই কমতে থাকে এবং এক সময় যান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তির কোন রকম প্রচেষ্টা বা ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। শুধু জৈবিক কোষের মধ্যে কেন, জড় জগতেও একই ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। বার বার ব্যবহারের ফলে জড় বস্তুরও ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যেমন, একটা তালা অনেকদিন ব্যবহার করার পর সহজে লাগানো বা খোলা যায়। একটা ভাঁজ করা কাগজকে অনেক সহজে ভাঁজ করা যায়। বেহালা বহুদিন ব্যবহার করলে তারে ভাল সুর ওঠে। সুতরাং এককথায় আমরা বলতে পারি অভ্যাস স্নায়ুকোষের নমনীয়তার দরুন পুনরাবৃত্তির ফলেই গড়ে ওঠে। অভ্যাস যে শুধু জৈবিক প্রতিক্রিয়ারই হয় তা নয়, মানসিক অভ্যাসও একইভাবে গড়ে ওঠে। মনের সচেতন ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকি, এবং যে সব কাজ সম্পাদনে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বাধা দেয়, তারাও পুনরাবৃত্তির ফলে স্বতশ্চল হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে মানসিক তাগিদে যে সব কাজ আমরা বারবার করি, পরবর্তীকালে, মানসিক চাহিদা ছাড়াও সে সব কাজ আমরা করে যাই। এই উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক অভ্যাস গঠিত হয়। তবে এই ধরনের মানসিক অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এ সম্পর্কে আমরা পরে উল্লেখ করবো।

বিভিন্ন শ্রেণীর অভ্যাস [Types of Habit] :—

সাধারণতঃ অভ্যাসকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। **দৈহিক অভ্যাস** (physical habits), **মানসিক অভ্যাস** (mental habits) এবং **আবেগ-মূলক অভ্যাস** (emotional habits)। তবে এই ধরনের শ্রেণীবিভাগকে আমরা চরম বলতে পারি না। কারণ যে অভ্যাস বা আচরণ আপাতঃভাবে দৈহিক মনে হয়, তাদের পেছনেও মানসিক ও আবেগ-মূলক অবস্থা কাজ করে। লেখা (writing), পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (cleanliness), হাবভাব (posture) ইত্যাদির আচরণকে আমরা দৈহিক অভ্যাস বলতে পারি। আপতঃভাবে এই অভ্যাস গঠনের জন্য দেহযন্ত্রের অনুশীলন প্রয়োজন হয়। তবে শুধুমাত্র বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এইসব অভ্যাস গঠিত হয় না। লেখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির অভ্যাস গঠনের জন্য মানসিক অবস্থা ও আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াও ব্যক্তির জীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, যেহেতু সকল কিছুর মাধ্যমেই,

দৈহিক অভ্যাস

দেহের কোন না কোন অঙ্গের ক্রিয়াকে যান্ত্রিক ভাবাপন্ন করা হয়, সেহেতু এদের আমরা **দৈহিক অভ্যাস** (physical habits) আখ্যা দিতে পারি।

অন্যদিকে, ব্যক্তি জীবনের অভিযোজন (individual adjustment in the environment) ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার সার্থক প্রয়োগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির চিন্তনের (thinking) অভ্যাস, এবং সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ, ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের প্রকৃতি নির্ণয় করে দেয়। এই ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া যা স্বতশ্চলভাবে ব্যক্তির সার্থক অভিযোজনে সাহায্য করে, তাদের মানসিক অভ্যাস (mental habit) বলা হয়। মনযোগের অভ্যাস (habit of attention) এই ধরনের এক গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। **উড্ওয়ার্থ** একে মনযোগ ও অমনযোগের অভ্যাস (habit of attention and inattention) আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া, পড়াশোনাও (reading) মানসিক অভ্যাসের অন্তর্গত। চিন্তনের অভ্যাস (habit of thinking), মানুষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে। এক কথায় বলা যেতে পারে, মানসিক অভ্যাস ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে নির্ণীত করে। তাই **বার্নার্ড** (barnard) বলেছেন—In a very real sense an individual's mental habits determine the type of person he will be.

মানসিক অভ্যাস

মানসিক অভ্যাস ছাড়া ব্যক্তির আবেগমূলক অভ্যাস (emotional habit) তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নানাভাবে প্রভাবিত করে। কোন বিশেষ বস্তু বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ ধরনের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রবণতার সৃষ্টি হয়। পৌনপুনিক অভিজ্ঞতার ফলে এ ধরনের অভ্যাস গঠিত হয়। ফলে এই ধরনের অভ্যাস সামগ্রিকভাবে তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। মনোভাবকে (attitude) আমরা এই ধরনের অভ্যাস বলতে পারি।

প্রক্ষোভমূলক অভ্যাস

অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী [Laws of Habit formation] :—

মনোবিদ্ **উইলিয়ম জেমস্** (William James) অভ্যাস গঠনের জন্য কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য দিতে বলেছেন। অর্থাৎ, নূতন কোন অভ্যাস গঠন করতে হ'লে, এই নিয়মগুলো মেনে চলার দরকার। এগুলোকে সাধারণভাবে অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী (laws of habit formation) বলা হয়। তিনি বিশেষভাবে চারটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

[এক] প্রথমতঃ অভ্যাস গঠন করতে হ'লে দৃঢ় মানসিক প্রত্যয়ের একান্ত প্রয়োজন। কোন কাজ অভ্যাস হিসাবে গ্রহণ করতে হ'লে, সেই কাজ দৃঢ়

প্রতীজ্ঞা নিয়ে শুরু করতে হবে। যেমন, যদি সকালে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস গঠন করতে চাই, তবে মনে মনে স্থির করে নিতে হবে যে আমাকে এই কাজ করতেই হবে। এতে করে যত রকম অসুবিধা হউক না কেন, তা আমাকে করতেই হবে। যদি ভেবে নিই যে যখন ঘুম ভাঙ্‌বে তখন ওঠা যাবে, তাহ'লে অভ্যাস গঠন হবে না। তাই অভ্যাস গঠনের জন্য মনের দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, একথাও মনে রাথার দরকার যে উদ্দেশ্যও সঠিক ভাবে নিরূপন করার দরকার। কি অভ্যাস গঠন করতে হবে, তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করার দরকার। উদ্দেশ্য যদি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য্যপূর্ণ না হয়, তাহ'লে মানসিক দৃঢ়তা সত্ত্বেও অভ্যাস গঠনে অসুবিধা হয়। তাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে অগ্রসর হ'লে অভ্যাস গঠন সম্ভব।

মানসিক প্রত্যয়

[**দুই**] অভ্যাস গঠনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে যেমন মানসিক দৃঢ়তা দরকার, তেমনি অভ্যাস গঠন করতে হ'লে মানসিক তৎপরতারও প্রয়োজন। কোন অভ্যাস গঠন করবো স্থির করলে, তার অনুশীলন প্রথম সুযোগেই আরম্ভ করতে হবে। ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস গঠন করবো, সেটা আজ থেকে না করে, আসছে মাসের ১লা তারিখ থেকে শুরু করবো, এরকম ভেবে রাখলে অভ্যাস কখনও গঠিত হবে না। যেদিন ঠিক করা হবে, যে আমার ভোরে ওঠার অভ্যাস করার দরকার, সেদিন ভোর থেকেই তা শুরু করতে হবে। ভাল দিনের জন্য ফেলে রাখলে চলবে না। এতে করে মনের স্থিরতা কমে যাবে। তাই **জেমস্‌** (James) বলেছেন—"Seize the very first opportunity to put the resolve into practice".

তৎপরতা

[**তিন**] অভ্যাস গঠনের জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। যদি কোন কাজ কিছুদিন পুনরাবৃত্তি করার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তার স্নায়বিক বাধা আবার বেড়ে যায়, এবং অভ্যাস গঠন সম্ভব হয় না। তাই যতক্ষণ অভ্যাস দৃঢ়ভাবে গঠিত না হয়, ততক্ষণ কোন রকম ব্যতিক্রম না করে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ নানা অজুহাতে আমরা অনুশীলনে ফাঁকি দিই। যেমন, ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস করতে গিয়ে, কয়েকদিন অনুশীলন করার পর, অনেক সময় কোন অজুহাতে মাঝে দু-একদিন বাদ দিই। এতে করে অভ্যাস গঠনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই একবার কোন অভ্যাস গঠনের মনস্থঃ করলে, তা দৃঢ়ভাবে গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন অজুহাতে সেই কাজের অনুশীলন বন্ধ করা চলবে না। **জেমস্‌** (James) বলেছেন—"Each lapse is like the letting fall of a ball on the string which one is carefully winding

অনুশীলন

up : a single slip undoes more than a great many turns will wind again. Continuity of training is the great means of making the nervous system act infallibly right."

[**চার**] অভ্যাস একবার গঠিত হয়ে গেলেও, সেই কাজের অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা চলে না। তাতে করে এই সব কাজের স্বতশ্চলতা কমে যায়। যে সব অভ্যাসের দৈনন্দিন জীবনে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না, তাদের সক্রিয় রাখার জন্য মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। এই পুনরাবৃত্তি সব পর্য্যায়ে প্রয়োজন। অর্থাৎ, মনের দৃঢ়তার দ্বারা অভ্যাসের পুনরনুশীলন, একান্ত প্রয়োজন।

পুনঃসংযোজন

অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুলো মেনে চললে, অভ্যাস গঠন সহজ হয় ঠিকই, কিন্তু একটা কথা মনে রাখার দরকার অভ্যাস শুধুমাত্র যান্ত্রিক অনুশীলনের ফল নয়। ব্যক্তির প্রেষনা (motive) অভ্যাস গঠনের পেছনে বিশেষভাবে কাজ করে, যদিও **আলপোর্ট** (Allport), **স্ট্যাগনার** (Stagner) প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা বলেছেন, অভ্যাস একবার গঠন হ'লে, তার প্রেষনার অংশটুকু আমরা খুঁজে পাই না। তবুও একথা ঠিক যে, অভ্যাস গঠনের মূলে কোন না কোন প্রেষণা (motive) কাজ করে। অভ্যাস অবশ্য পরবর্তীকালে নিজস্ব ক্রিয়াশীলতা (functional autonomy) লাভ করে থাকে। সুতরাং অভ্যাস গঠন করতে হ'লে, এই প্রেষণাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। অভ্যাসের নিজস্ব ক্রিয়াশীলতা আনতে হ'লে এই প্রেষণাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তির চাহিদা (need) কে চরিতার্থ করতে হবে।

আলোচনা

শিক্ষা ক্ষেত্রে অভ্যাসের গুরুত্ব [Importance of Habit in Education] :—

শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য হ'ল, ব্যক্তির আত্মসত্বার বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি সাধন করা। আমরা যদি ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ অভ্যাস গঠন করতে পারি, তাহ'লে ঐ উদ্দেশ্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারি। **জেমস** (James) বলেছেন, অভ্যাস হ'ল "flywheels of society" তাই শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত অভ্যাস গঠন করা একটা প্রাথমিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে, উল্লেখ করার দরকার যে অভ্যাস অল্প বয়সে খুব তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। শৈশবে কোন অভ্যাস গঠন করতে পারলে, তা দৃঢ় হয় এবং সেই কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিশু মন খুবই নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল। সুতরাং, শৈশবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি, শিশুদের

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও অভ্যাস

মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠন করতে না পারি, তাহ'লে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হবে। জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হবে না।

অন্যদিক থেকে বিচার করলে, একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলেও অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। আজকাল শিক্ষার্থীরা যে উচ্চপর্য্যায়ে শিক্ষা গ্রহণে অনুপযোগী হয়ে পড়ছে, তার একটা কারণ তাদের 'পাঠের অভ্যাস' (study habit) নাই। এই ধরনের অভ্যাস ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুবই মুশকিল। এমনিভাবে বলা হয়, শিখনের জন্য মনযোগ একান্ত প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে না পারলে, তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মনযোগের অভ্যাস (habit of attention) শিক্ষাক্ষেত্রে, পাঠগ্রহণ বা শিখনের দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। চিন্তনের অভ্যাসও (habit of thinking) শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা বলতে গিয়ে অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেছেন আমাদের শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থপূর্ণ চিন্তা করার অভ্যাস (habit of meaningful thinking) গঠনে সমর্থ নয়। অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সুগম করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ কতকগুলো অভ্যাস গঠন করার দরকার। এবং এই কারণে যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে যথার্থ অভ্যাস গঠনের সুযোগ থাকার দরকার। এই সব অভ্যাসই শিক্ষা প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

শিক্ষা প্রক্রিয়া ও অভ্যাস

সবশেষে, শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হ'ল, ব্যক্তিকে সমাজ-উপযোগী করে গড়ে তোলা। সমাজিক জীবনের উপযোগী আমরা তাকেই বলবো, যিনি সমাজের চাহিদা মিটিয়ে সার্থকভাবে তার সঙ্গে অভিযোজন করে বাস করতে পারেন। এই ধরনের সামাজিক অভিযোজনের জন্য সামাজিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো অভ্যাস গঠন করার প্রয়োজন। যেমন সাধারণ স্বাস্থ্যাভ্যাস, প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের অভ্যাস, অপরের মতবাদকে সহনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করার অভ্যাস, ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষার এই সামাজিক উদ্দেশ্য যদি সাধন করতে হয়, তবে অভ্যাস গঠনের আদর্শ শিক্ষার সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সামাজিক বিকাশ ও অভ্যাস

সুতরাং, বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, শিক্ষার সঙ্গে অভ্যাস গঠন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন (Learning) একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আর অভ্যাস গঠনও এক ধরনের শিখন (Learning)। বার্নার্ড (Barnard), অভ্যাসকে শিখন প্রসূত অভ্যাস

হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"Habit may be defined as a more or less automatic learned response, acquired through repeating that response in an identical or highly similar situation." সুতরাং, অভ্যাস গঠন সম্পর্কে আলোচনাকে বাদ দিয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

শিখন ও অভ্যাস

অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব [Teacher's responsibility in Habit formation] :—

অভ্যাস গঠন যেহেতু শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সেহেতু এ সম্পর্কে শিক্ষকদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব আছে। অভ্যাসের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে শিক্ষকদের দুটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ শিক্ষার মাধ্যমে সুঅভ্যাস (good habit) গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার দ্বারা, কু-অভ্যাস (bad habit) দূর করতে হবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ একদিকে যেমন সু-অভ্যাসের (good habit) উপর নির্ভর করে, তেমনি অপরদিকে কু-অভ্যাস ত্যাগের উপরেও নির্ভর করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষককে এই দুই দায়িত্বই গ্রহণ করতে হবে।

সূচনা

পূর্বে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা যে বয়সে শিক্ষকদের সাহচর্যে আসে, তা হ'ল অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। তাই শিক্ষাদানের সময় শিক্ষককে অভ্যাস গঠনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে, কি ধরনের অভ্যাস গঠনের উপর শিক্ষক গুরুত্ব দিবেন। **প্রথমতঃ,** কতক গুলো দৈহিক অভ্যাস গঠনের উপর শিক্ষক বিশেষভাবে নজর দিবেন। যেমন—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস (habit of cleanliness), দৈহিক হাবভাবের অভ্যাস (habit of posture), শরীরচর্চার অভ্যাস (habit of exercise) ইত্যাদি। এই ধরনের অভ্যাস ব্যক্তি জীবনের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষক কতকগুলো মানসিক অভ্যাস (mental habit) গঠনের প্রতিও বিশেষভাবে নজর দিবেন। এই ধরনের অভ্যাস শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে এবং শিক্ষা গ্রহনের কাজকে সহজ করে তুলবে। কতকগুলো মানসিক অভ্যাস গঠন না করতে পারলে, শিক্ষকের পক্ষে পাঠদানও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। যেমন, মনযোগের অভ্যাস (habit of attention), পড়ার অভ্যাস (reading habit), বিষয়বস্তুর সামগ্রিক অর্থবোধের অভ্যাস (habit of comprehension)। আলোচ্য বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গমের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গঠনের অভ্যাস (habit of mental)

শিক্ষা সহায়ক সু-অভ্যাস গঠন

ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, শিক্ষকের দায়িত্ব হবে কতকগুলো আবেগমূলক অভ্যাস (emotional habit) গঠন করা। বিভিন্ন ঘটনা (events) বা পাঠ্যবস্তুর (subject-matter) প্রতি যথাযোগ্য (attitude) বিকাশ করার দায়িত্ব শিক্ষকের গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে যদি এই ধরনের অভ্যাস গঠন করতে না পারা যায়, তা হ'লে তাদের সামাজিক বিকাশ কখনও সম্ভব হবে না। পরোপোকারের অভ্যাস (habit of helping others), সৌজন্য প্রকাশের অভ্যাস (courtecy) ইত্যাদির অভ্যাস শিক্ষার্থীদের গঠন করতে হবে।

সু-অভ্যাস গঠন ও শিক্ষকের দায়িত্ব

যে কোন ধরনের অভ্যাস গঠন করতে হ'লে শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হবে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ণয় করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে না থাকলে, কোন কাজে সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই সু-অভ্যাস গঠনের পূর্বে শিক্ষকের নিজের দায়িত্ব, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরও সচেতন করা। ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ যদি আমাদের কাম্য হয় তবে অভ্যাস গঠনকে পরিকল্পিতরূপ দিতে হবে। এবং সেই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র অন্ধ যান্ত্রিক উদ্দেশ্য বিহীন পুনরাবৃত্তির দ্বারা সুঅভ্যাস গঠন সম্ভব নয়। বার্নাড (Barnard) বলেছেন—"Discussion (with the pupil) about the significance of goals and the steps in habit formation help them to develop consistent approches to habit formation." তবে একেবারে ছেলেবেলায় এ ধরনের আলোচনা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং পন্থা সম্পর্কে সচেতনতা শিক্ষক কাজকে অনেক সহজতর করে তুলতে পারে। তাই প্রাথমিক কাজ হিসাবে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা আনবেন। অভ্যাস গঠন করতে হ'লে পরবর্তী পর্য্যায়ে অনুশীলন প্রয়োজন। কিন্তু অনুশীলন মানে অন্ধ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নয়। অন্ধ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কিছু দৈহিক অভ্যাস গঠন সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু মানসিক ও আবেগমূলক অভ্যাস (mental and emotional habit) এভাবে গঠিত হ'তে পারে না। পুনরাবৃত্তির মধ্যে অভিনবত্ব এনে তাকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয়, অভ্যাস যে পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হবে, সেইরূপ পরিস্থিতিতে তা অনুশীলন করা। যেমন নির্ভুল বানান করার অভ্যাস (spelling); বানান বার বার মৌখিক পুনরাবৃত্তির দ্বারা শেখা যায়। কিন্তু তাতে দেখা গেছে, অভ্যাস গঠন হ'তে দেরী হয়, এবং তার প্রয়োগের সময়ও অনেক সময় নির্ভুল হয় না। তাই বার বার মৌখিক অনুশীলন না করে,

বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে তার প্রয়োগ করে, লেখা দ্বারা শেখানো যায়। কারণ বানান শেখার উদ্দেশ্য হ'ল সঠিকভাবে লিখতে পারার জন্য। তাই ঐ পরিস্থিতিতে পরিবর্তনীয় বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করে তার অনুশীলন করলে, অভ্যাস সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভ্যাস গঠন একধরনের শিখন (learning)। সুতরাং, অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রেও থর্নডাইকের (Thorndike) ফল লাভের সূত্র (low of effect) একইভাবে প্রযোজ্য। তাই শিক্ষার্থীদের অভ্যাস গঠন তরান্বিত করতে হ'লে এবং সুদৃঢ় করতে হলে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতে হবে। যে কোন ধরনের আচরণ যা শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, তাই পরবর্তীকালে অনুশীলনের মাধ্যমে, স্বতশ্চালিত হয়। সাধারণভাবে শিক্ষকের উৎসাহ, এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিক্রিয়া শিক্ষার্থীদের কাছে পুরস্কার (reward) হিসাবে কাজ করে এবং প্রেষণা শক্তি জোগায়। তাই বার্নার্ড (Barnard), বলেছেন—"If the teacher bears in mind the need satisfaction of pupils as he attempts to direct the formation and re-formation of habits, he will be more successful than he depends on drill and repetition." মানসিক অভ্যাস গঠন করতে হ'লে শিক্ষার্থীদর এই দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

কু-অভ্যাস দূর করা

সু-অভ্যাস গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস সম্পর্কে শিক্ষকের দ্বিতীয় দায়িত্ব হ'ল কু-অভ্যাস দূর করা (breaking of bad habits)। কি ধরনের অভ্যাস আমরা বিদ্যালয়ে গঠন করবো? এর উত্তরে প্রত্যেকেই একমত হবেন যে, যে সব অভ্যাস ব্যক্তি জীবনের বিকাশের সহায়ক। কিন্তু যতই আমরা সচেতন থাকি না কেন, যতই আমরা সু-অভ্যাস গঠনে সচেষ্ট হই না কেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু খারাপ অভ্যাস গঠন করবেই। আবার কিছু খারাপ অভ্যাস তারা গৃহ পরিবেশ থেকে নিয়েও আসবে। ঐ গৃহ-পরিবেশের উপর শিক্ষকের নিজেরও কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নাই। সুতরাং, ঐ সব খারাপ অভ্যাস দূর করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকের উপর এসে পড়ে। কিন্তু এই সব খারাপ অভ্যাস দূর করার জন্য শিক্ষকরা অনেক সময় এমন উপায় গ্রহণ করেন যে তাতে করে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিই হয়। অনেক সময় শিক্ষকের আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের খারাপ আচরণ করার প্রবণতা এমন পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে তারা অসামাজিক আচরণ করতে শুরু করে। তাই এই অভ্যাসকে দূর করতে হ'লে শিক্ষকের মনোবিদ্যা সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে। **প্রথমতঃ**, খারাপ অভ্যাস গুলো শিক্ষার্থীরা অবচেতন মনে গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে, কি ভাবে শিক্ষার্থীরা

এই ধরনের অভ্যাস আয়ত্ব করে তা খুঁজে বের করা। এ ধরনের অভ্যাস অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশের জন্য হয়ে থাকে। কোন শিক্ষার্থী হয়ত অর্থ নৈতিক অবস্থার জন্যই হউক বা পিতা-মাতার অভ্যাসের জন্যই হউক নোংরা থাকার অভ্যাস গঠন করেছে। তার এই অভ্যাস দূর করার জন্য তাকে শুধুমাত্র তিরস্কার করলে চলবে না। তাদের সামনে আদর্শ তুলে ধরতে হবে। যদি অর্থ নৈতিক কারণে হয়, তাদের বুঝাতে হবে, পরিষ্কার থাকার জন্য বিশেষ অর্থ ব্যয় হয় না। আবার, অনেক সময় দেখা যায়, দৈহিক অসুস্থতার জন্য ছাত্রদের মধ্যে কু-অভ্যাস গঠিত হয়েছে। যেমন, লেখার সময় বেঁকে বসার অভ্যাস। এক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা দেখাতে হবে এবং চিকিৎসকদের সাহায্যে এ ধরনের অভ্যাস দূর করতে হবে। কারণ এ ধরনের অভ্যাস দৈহিক রুগ্নতার জন্য হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খারাপ অভ্যাস অনেক সময় মানসিক কারণে গঠিত হয়। আবেগ মূলক অস্থিরতার (Emotional instability) জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম কু-অভ্যাস দেখা দেয়। যেমন—হাতের নখ কামড়ানো, কলম মুখে দেওয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র তিরস্কার দ্বারা অভ্যাস দূর করা যাবে না। মূল কারণ দূর করে মানসিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারলে, অভ্যাস দূরীভূত হবে।

সুতরাং, কু-অভ্যাস দূর করতে হ'লে শিক্ষককে প্রথম অভ্যাস গঠনের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঐ ধরনের আচরণের কুফল সম্পর্কে ধারণা দিয়ে, পরিবর্তনের জন্য মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। এবং সেই অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করতে হবে। এরপর ঐ ধরনের অভ্যাসের চর্চা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাও যেমন এ বিষয়ে সচেষ্ট হবে, তেমনি শিক্ষকও এমন বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, যাতে করে তারা ঐ আচরণের পুনরাবৃত্তির সুযোগ না পায়। প্রয়োজন বোধে শিক্ষক কিছু মনোবিজ্ঞান সম্মত শাস্তিরও (punishment) ব্যবস্থা করতে পারেন। এই ভাবে চর্চার অভাবে, কু-অভ্যাস দূরীভূত হবে।

কু-অভ্যাস দূর করার উপায়

অভ্যাস একবার গঠিত হ'লে তাকে ত্যাগ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। তাই সু-অভ্যাস গঠনের চেয়ে কু-অভ্যাস ত্যাগ করানোর কাজ অনেক বেশী দুরূহ। শিক্ষককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। এবং যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা কোন কু-অভ্যাসের দাস না হ'য়ে পড়ে। অনেক সময় শিক্ষকের নিজস্ব অভ্যাস ছাত্ররা অনুকরণ করে। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষককে আদর্শ স্থানীয় আচরণ করতে হবে এবং কোন রকম খারাপ অভ্যাস ছাত্রদের সামনে

আলোচনা

প্রকাশ করা চলবে না। উপযুক্ত আদর্শ সামনে রেখে শিক্ষকরা অগ্রসর হলে, সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস দূরীকরণ দুই কাজই সহজ হবে।

প্রশ্নাবলী

1. How is habit distinguished from instinct? Describe the characteristics of habit. What do you mean by the saying: "Habit is the best friend and worst enemy."? [N. B. U. B, T. '67]
[পৃঃ ৭-৮ ; ৪-৭]
2. What are habits? Discuss the laws of habit formation. Is character a mere bundle of habits? Justify your answer. [N. B. U. B. T. '66]
[পৃঃ ৩-৪ ; ১০-১২]
3. What are the conditions of habit formation? How can you develop the reading habit in pupils? [C. U. B. A. '63]
[পৃঃ ৮-৯ ; ১০-১২]
4. What are habits? How are they distinguished from instincts? State the laws of habit formation. [C. U. B. A. '65]
[পৃঃ ৩-৪ ; ৭-৮ ; ১০-১২]
5. What are habits? How are they formed? Explain how bad habits can be eradicated, [C. U. B. A. '69]
[পৃঃ ৩-৪ ; ৮-৯ ; ১০-১২ ; ১৫-১৭]
6. Distinguish between reflex and habits. Explain the teachers', role in the habit formation,
[পৃঃ ৭-৮ ; ১৪-১৭]
7. Write notes on :—
   (a) Laws of habit formation. [পৃঃ ১০-১২]
   (b) Habit and Instinct. [পৃঃ ৭-৮]
   (c) Habit and Reflex. [পৃঃ ৭-৮]
   (d) Types of Habits. [পৃঃ ৯-১০]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোভাব

[ATTITUDE]

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এই **মনোভাব** (attitude)। শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য শিক্ষার জন্য, তার বিশেষ মানসিক অবস্থা (mental set) বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য মনোভাব শিক্ষার্থীর নৈতিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা যায়, অন্যদিকে যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে, তা শিখনের সহায়ক হয়। এই কারণে শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

মনোভাবের সংজ্ঞা [Definition of Attitude] :—

সাধারণ অর্থে, আমরা মনোভাব কথাটার দ্বারা আমরা কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে যে প্রক্ষোভ মূলক স্থায়ী প্রবণতা গড়ে ওঠে তাকেই বোঝাই। তবে মনোবিদ্‌রা একে এতটা নিক্রিয় অর্থে বিবেচনা করেন না।

মনোভাব কি ?

মনোবিদ্‌রা মনোভাবকে (attitude) বিশেষ এক ধরনের অভিমুখীতা বা প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই প্রবণতার সঙ্গে অন্যান্য প্রবণতার পার্থক্য হ'ল যে এরা আমাদের প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয়। **মনোবিদ্ কোলেসনিক** (Kolesnik), বলেছেন—কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে মানসিক অনুভূতিযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার যে মানসিক প্রস্তুতিই হ'ল মনোভাব।[1] এই ধরনের অনুভূতিযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে জন্মগতভাবে থাকে না। ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই ধরনের মনোভাবের বিকাশ হয়। তাই অন্যান্য জন্মগত প্রবণতার সঙ্গে পার্থক্য করতে গিয়ে মনোবিদ্‌রা একে অর্জিত গুণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। **মনোবিদ্ আলপোর্ট** (Allport) মনোভাব বলতে সেই অর্জিত **জৈব মানসিক প্রস্তুতিকে বলেছেন,**

---

1. An attitude is an emotionally toned pre-disposition to react in a certain way toward a person, an object an idea or a situation"—
Kolesnik : Educational Psychology.

যা ব্যক্তির বস্তুমুখী প্রতিক্রিয়ার শক্তি যোগায় বা তার গতি নির্ণয় করে।[1] সুতরাং, মনোভাব বলতে ব্যক্তি জীবনে অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট দৈহিক এবং মানসিক এক ধরনের প্রস্তুতিকে বুঝি। এই জৈবমানসিক প্রস্তুতি ব্যক্তিকে তার বৌদ্ধিক, দৈহিক, সামাজিক কাজে অনুপ্রাণিত করে। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌রা মনোভাব বলতে কেবলমাত্র অনুভূতিমূলক ব্যক্তি বা বস্তু মুখী প্রস্তুতিকে বুঝান না। মনোভাবের অনুভূতিমূলক দিকও যেমন থাকতে পারে, তেমনি বৌদ্ধিক (intellectual), সামাজিক (social) এবং দৈহিক (biological) দিকও থাকতে পারে। অর্থাৎ, বৌদ্ধিক, সামাজিক এবং দৈহিক অভিজ্ঞতার ফলেও মনোভাবের সৃষ্টি হ'তে পারে।

মনোভাবের প্রকৃতি [Nature of Attitude] :—

মনোভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গেলে, প্রথমে তার সঙ্গে অনুরাগের (interest) পার্থক্য করার দরকার। সাধারণ অর্থে আমরা অনেক সময় মনোভাব (attitude) এবং অনুরাগকে এক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। এর কারণ, অনুরাগ এবং মনোভাব উভয়েই ব্যক্তির বস্তুমুখী আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দু' ধরনের প্রবণতাই আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে থাকি। দু' ধরনেরই জৈব মানসিক সংগঠন আমাদের কোন কাজের প্রেষনা নির্ধারণ করে। কিন্তু এই ধরনের আপতঃ মিল থাকলেও, আমরা মনোভাব (attitude) এবং অনুরাগের (interest) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। অনুরাগকে আমরা সব সময় ধনাত্মক (positive) বলতে পারি। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমার অনুরাগ আছে, বলতে, তাকে আমি পছন্দ করি, তাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা আমার আছে, এই বুঝতে চাই, অর্থাৎ, সব প্রতিক্রিয়া গুলোই সেই বস্তু অভিমুখী (approaching)। একে আবার ব্যক্তির প্রবণতার ধনাত্মক যোজ্যতা (positive valance) বলতে পারি। কিন্তু মনোভাব (attitude) ধনাত্মক বা ঋণাত্মক্ দুই হ'তে পারে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোভাব ভাল বা খারাপ অথবা আকর্ষ বা বিকর্ষ দু'ধরনেরই যোজ্যতা (positive বা negative valance) থাকতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, অনুরাগের কেবলমাত্র পরিমাণগত দিক থেকে তারতম্য থাকতে পারে ; কিন্তু মনোভাবের গুণগত (qualitative)

মনোভাব ও অনুরাগ

1. "...Mental and neural state of readiness, organised through experience exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects with which it is related."

—Allport : Attitude, Hand Book of Social Psychology.

এবং পরিমাণগত (quantitative) উভয় দিক থেকে পার্থক্য থাকতে পারে। **মনোবিদ্ স্ট্যানলী গ্রে** (Stanley Gray) অনুরাগ এবং মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বলেছেন "interest is closely associated with one's desires, likes and wants, attitudes refers to one's appraisal of evaluation of an idea or situation." তাছাড়া, কোন বস্তুতে খুব বেশী অনুরাগ আছে বলেই তার প্রতি আমাদের মনোভাব ধনাত্মক একথাও বলা যায় না। এমন অনেক জিনিস বা ধারণা আছে যেগুলো আমরা খুবই পছন্দ করি, বা তাদের প্রতি অনুরাগ আছে, কিন্তু সেগুলোর প্রতি আমাদের ধনাত্মক মনোভাব নেই। ফুটবলের প্রতি অনুরাগ আমার থাকতে পারে কিন্তু তা বলে আমাকে ফুটবল খেলতেই হবে এমন কোন ব্যাধ্যবাধকতা নেই। অন্যদিকে মনোভাব তীব্র হ'লেই যে অনুরাগ থাকবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং অনুরাগ এবং মনোভাব পরস্পর নির্ভরশীল নয়। তবে উভয়েই শিখনের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে।

মনোভাবের মাত্রা

মনোভাব এবং অনুরাগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মনোভাবের (attitude) কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে মনোবিদ্‌রা **মনোভাবের মাত্রা** (dimensions of attitude) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মনোভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, তাঁরা চারটে মাত্রার কথা বলেছেন—**গতি** (direction), **তীব্রতা** (intensity), **বিস্তৃতি** (Extension) এবং **স্থায়িত্ব** (duration)। মনোভাবের গতি বলতে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গতির কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দু' রকমেরই মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। যেমন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভাল বা আকর্ষণ জনিত মনোভাব থাকতে অথবা খারাপ বা বিকর্ষণ জনিত মনোভাব দেখা দিতে পারে। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির মনোভাব তার **গতি প্রকৃতির** (dircetion) দিক থেকে দু' রকমের হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ **তীব্রতা** বলতে, আমরা মনোভাবের ক্রিয়া উৎপাদন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করি। ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের মনোভাবই থাকুক না কেন তার তীব্রতা কিরূপ, তার উপর নির্ভর করে, ব্যক্তি কি ভাবে সেই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করবে। বিদ্যালয়ের পাঠসূচীর প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য, কোন শিক্ষার্থী পড়াশুনা ছেড়ে দেবে, কি, ঐ অবস্থার মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যাবে তা নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মনোভাবের তীব্রতার উপর। মনোভাবের তীব্রতাই নির্ধারণ করে দেবে ব্যক্তি কি ধরনের বস্তুমুখী আচরণ করবে। মনোভাবের বিস্তৃতি বলতে আমরা তার সামগ্রিকতার পরিসরকে বুঝাই। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার

ফলে, ব্যক্তির মধ্যে বস্তু, ধারণা, বা ব্যক্তির প্রতি মনোভাব গড়ে ওঠে। এখন অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি বিচারে মনোভাবের বিস্তৃতি বিচার করা হয়। কোন শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ শিক্ষকের প্রতি ভাল মনোভাব থাকতে পারে। আবার, সেই মনোভাবের বিস্তৃতির ফলে, বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের প্রতি ভাল মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে। এই মনোভাবের **বিস্তৃতি** (Extension) ব্যক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করবে তা নির্ধারণ করে দেয়। সব শেষে, মনোভাবের **স্থায়ীত্ব** (duration) বলতে বুঝায় তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেক সময়, দেখা যায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার প্রতি স্থায়ী মনোভাব গড়ে ওঠে, আবার কোন সময়ে খুব অস্থায়ী মনোভাবও দেখা যায়।

মনোভাবের বিকাশ [Development of Attitude] :—

একেবারে প্রথম অবস্থায় শিশুর মনোভাব খুব সাধারণভাবে আনন্দ ও বেদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের অনুভূতি তাদের জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি বা অতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আসে। অনেক সময়, এই ধরনের মনোভাব বাবা, মা অথবা পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা যে সব প্রতিক্রিয়া করতে আরম্ভ করে, তার ফলে তারা পরিবেশের সংস্পর্শে আসে। এবং এই সব প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে বিশেষ পরিবেশকে কেন্দ্র করে সংবেদনগত উদ্দীপনার মাধ্যমে বিশেষ ধরনের অনুভূতিমূলক প্রবণতার সৃষ্টি করে। ফলে পরিবেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তার অনুভূতিমূলক সংযোগ স্থাপিত হয়। এ ধরনের মানসিক প্রবণতাকেও আমরা মনোভাব বলতে পারি। জীবন বিকাশের এই স্তরে কিছু কিছু অস্থায়ী মনোভাব এবং কিছু স্থায়ী মনোভাবেরও বিকাশ হয়। যেমন যে শিশু প্রত্যেকবার খাওয়ানোর সময় অসুবিধা অনুভব করে। তার খাবার প্রতি বিশেষ ধরনের স্থায়ী ঋণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এবং এই মনোভাব পরবর্তীকালে, তার খাদ্যাভ্যাসকে (food habit) প্রভাবিত করে। আবার অনেক সময় অস্থায়ী ঋণাত্মক মনোভাব বাবা-মা বা অন্য বয়স্কদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এছাড়া শিশুদের মনোভাব শিশুদের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটু বয়স বেশী হ'লে অর্থাৎ 5 থেকে 6 বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তির প্রতি মনোভাব তাদের খেলার সাথী এবং অন্যান্য বয়স্কদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ধরনের মনোভাব অনেক সময় অনুকরণ (imitation) বা অনুবর্তনের (conditioning) দ্বারা গড়ে ওঠে।

প্রাথমিক স্তর

পরবর্তী স্তরে, শিশুর মনোভাব প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এবং তার মানসিক বিকাশের সঙ্গে সে বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখে। সে বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে শেখে। বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তার যে মনোভাব বা অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতি তৈরী হয়, তা শুধুমাত্র তার জৈবিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে হয় না। শিশুরা চিন্তন দ্বারা বিশ্লেষণ করে মনোভাব গঠন করে। যদিও এই ধরনের মনোভাব স্থায়ী হওয়া উচিত, কিন্তু সব সময়, তা স্থায়ী হয় না। কারণ শিশুদের চিন্তন শক্তি বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তখনও এত পরিপক্ক হয় না যে, তারা বিষয়বস্তুর সব কিছু সামগ্রিকভাবে বিচার করে মনোভাব গঠন করতে পারে। অভিজ্ঞতাও তাদের অনেক কম থাকে। তাই পরবর্তীকালে এদের অনেক পরিবর্তন হয়। শিশুর চিন্তন শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করেও মনোভাব গড়ে ওঠে। শিশুর ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মনোভাবের বিস্তৃতিও (extensity বাড়তে থাকে। ফলে আগের স্তরে যে সব বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি, বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোভাব গড়ে উঠেছিল, সেই সব বস্তুর সামান্যীকরণের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের বিস্তৃতি বাড়ে। এক কথায়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মনোভাবের বিস্তৃতি হয় এবং পরিবর্তনও হয়। এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে।

চিন্তনের বিকাশ ও মনোভাব

মনোভাবের পরিমাপ [Measurement of Attitude] :—

মনোভাব বলতে ব্যক্তির কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার প্রতি বিশেষ ভঙ্গীতে প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতিকে বুঝি। সুতরাং, প্রত্যেক মনোভাবের একটা বস্তুগত কেন্দ্র আছে। এই বস্তু কেন্দ্রিক প্রস্তুতি খুব প্রবল হতে পারে বা একেবারে নাও থাকতে পারে। আরো বিশদভাবে বলতে গেলে, কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণা সম্পর্কে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ধনাত্মক (perfectly positive) থেকে সম্পূর্ণভাবে ঋণাত্মক (perfectly negative) পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ামূলক প্রস্তুতির তীব্রতার দিক থেকে পার্থক্য থাকে। এই কারণে মনোভাব পরিমাপ করার জন্য বিশেষ বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার প্রতি ব্যক্তির যে মনোভাব, তার প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি। এই মনোভাবের পরিমাণ, বা মানসিক প্রস্তুতির

মনোভাব পরিমাপক স্কেল

পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই সব কৌশলগুলিকে বলা হয় **মনোভাব পরিমাপক স্কেল** (Attitude Scale)। এই ধরনের স্কেল দ্বারা আমরা ব্যক্তির কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার প্রতি মনোভাবে তীব্রতা পরিমাপ করি মাত্র। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই মনোভাব পরিমাপক স্কেল তৈরী করা হয়। এর মধ্যে **থার্স্টোনের** (Thurstone) এবং **লিকার্টের** (Likert) স্কেল বিশেষভাবে বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই ধরনের স্কেলে, কোন বিশেষ বস্তুর বা ধারণার প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের তীব্রতা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন তীব্রতার পরিচায়ক কতকগুলো বাক্য ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। এবং প্রত্যেক বাক্যের (statement) সাংখ্যমান রাশিবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির দ্বারা নির্ণয় করা হয়। সাধারণ থার্স্টোনের স্কেলে, এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। লিকার্টের পদ্ধতিতে আবার প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে, পাঁচটা করে মনোভাবের তীব্রতা জ্ঞাপক উত্তর থাকে। এবং এই প্রত্যেক উত্তরের সাংখ্যমানও রাশি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির দ্বারা নির্ণয় করা হয়। এখানে এ সম্পর্কে আর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোভাবের তীব্রতা পরিমাপের খুব বেশী গুরুত্ব না থাকার জন্য আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব না। শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের মনোভাবের গতি (direction) নির্ধারণ করতে পারলে, আমাদের কাজের সুবিধা হবে। তার বেশী কিছু প্রয়োজন নেই। এই সব স্কেল দ্বারা মনো-ভাবের গতি (direction) সম্পর্কেও জানা যায়। তবে অভিজ্ঞ শিক্ষক সাধারণ ধারণা থেকেই শিক্ষার্থীদের মনোভাবের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তাই তাঁদের কাছে এই ধরনের পরিমাপক স্কেলের অত গুরুত্ব নেই।

শিক্ষা ও মনোভাব [Education & Attitude] :—

মনোভাবের ওপর শিক্ষার প্রভাব

মনোভাব ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বস্তু, ব্যক্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষাও এক ধরনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া, সুতরাং শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর মনোভাব গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। এই সব অভিজ্ঞতা গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব আছে। শিক্ষার্থীদের কোন ভুল অভিজ্ঞতা গ্রহণের জন্য যদি কোন বিষয়বস্তুর প্রতি বিরূপ মনোভাব জাগে তা হলে তা তাদের পরবর্তী জীবনের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। বিদ্যালয় জীবনে, শিক্ষার্থীরা বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে কোন বিরূপ মনোভাব গঠন করলে, তা সারাজীবন

তাদের মধ্যে থেকে যাবে। তাই বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও কাজ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার সময় শিক্ষককে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে। বিষয়বস্তুকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে করে তারা বিষয়বস্তুর সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় এবং যথাযোগ্য মানসিক প্রতিক্রিয়া করতে প্রস্তুত থাকে।

বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মনোভাব গঠন, বিদ্যালয়ের কাজকেই নানাভাবে সহায়তা করে। যেমন, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ-মূলক মনোভাব তাদের সেই বিষয়ের শিখনকে সহায়তা করে, এবং বিরূপ মনোভাব বিষয়বস্তুর শিখনকে ব্যহত করে। আবার, শিক্ষকের প্রতি বিরূপ মনোভাবও, শিক্ষার্থীর শিখনকে ব্যহত করে। সুতরাং, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উপযোগী মনোভাব গড়ে তুলতে না পারলে শিক্ষাদানের কাজই দুরূহ হয়ে পড়ে। সুতরাং শিক্ষক হিসাবে আমাদের এ বিষয়ে দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটাতে পারি, তা হলে তারা ঐ সব বিষয়বস্তুর প্রতি ধনাত্মক মনোভাব গড়ে তুলবে। সুতরাং বিষয়বস্তুকে সব সময় শিক্ষার্থীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যাতে আনন্দদায়ক হয় সে দিকেও বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

শিক্ষার উপর মনোভাবের প্রভাব

এ ছাড়া শিক্ষার আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে (social development) সহায়তা করা। ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ যথাযোগ্য সামাজিক মনোভাব (social attitude) গঠনের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ইত্যাদির প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে না উঠলে, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ হয় না। তাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, যদি ব্যক্তির সামাজিক বিকাশও হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য সামাজিক মনোভাব বিকাশ করাও শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্গত। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মধ্যে আদর্শ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। তাছাড়া সামাজিক মনোভাব বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করার প্রয়োজন।

সামাজিক বিকাশ ও মনোভাব

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোভাবের গুরুত্বের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটা

বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। এটা হ'ল শিক্ষার দ্বারা মনোভাবের পরিবর্তন। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিবর্তন করা যায় কি না, এ নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। অনেক মনোবিদ মনে করতেন, মনোভাব যেহেতু অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং অর্জিত, সেহেতু তার সহজ পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে মনোভাবও অভ্যাসের মত একবার গঠিত হলে, তাকে পরিবর্তন করা খুবই মুশকিল। তবে শিক্ষক নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনোভাবের পরিবর্তন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষক যে যে নীতি প্রয়োগ করবেন তা নিম্নরূপ:

মনোভাবের পরিবর্তন ও শিক্ষকের দায়িত্ব

[এক] শিক্ষক যে মনোভাবের পরিবর্তন করতে চান, তার শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকা উচিত। মনোভা যদি খুব তীব্র হয় তাহলে তাকে পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়। যদি আমরা কোন তীব্র মনোভাবকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি, তাহলে তার ফল ব্যক্তি জীবনে খারাপ হয়।

[দুই] শিক্ষক কোন মনোভাব পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হওয়ার পূর্বে তাঁর জানা দরকার, তাঁর প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব কিরূপ। যে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিরূপ মনোভাব নেই, তিনিই কেবলমাত্র তাদের মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারেন।

[তিন] কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষক যুক্তি তর্ক (logical argument) এবং প্রাক্ষোভিক আবেদন (emotional appeal) দুই করতে পারেন। তবে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, মনোভাবের তীব্রতা যত কম হবে ততই তাকে যুক্তি তর্কের দ্বারা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। কিন্তু মনোভাব যদি তীব্র হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাক্ষোভিক আবেদন কার্য্যকরী হয়। সুতরাং শিক্ষক মনোভাবের তীব্রতা বিচার করে তাঁর পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

[চার] মনোভাবের পরিবর্তন আনার জন্য শুধুমাত্র উপদেশ দিলে কোন কাজ হয় না। যাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে, তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। পাঠ্য-পুস্তকের জ্ঞানের সাহায্যে বা উপদেশের সাহায্যে মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারলে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে।

[পাঁচ] কোন বিশেষ মনোভাব পরিবর্তন করতে হলে, শিক্ষার্থীদের পরিবর্তিত মনোভাবের উপযোগিতা সম্পর্কে শিক্ষককে ধারণা দিতে হবে। তাছাড়া সে সম্পর্কে শিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা এবং আস্থা থাকারও প্রয়োজন।

[ছয়] অনেক সময় শিক্ষার্থীর মেলামেশার দল পরিবর্তন করলে, তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। মনোভাব পরিবর্তন করতে গিয়ে, এ ধরনের প্রচেষ্টাও শিক্ষক করতে পারেন। যে মনোভাব তিনি বিশেষ কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে আনতে চান, সেই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার মেলামেশার সুযোগ করে দিতে পারেন। এতে করে দলগত প্রভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিবর্তন হয়।

[সাত] কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তন করতে গিয়ে, শিক্ষক যদি তাঁর নিজের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীকে বোঝাতে হবে এই পরিবর্তন তার মনোভাব খারাপ বলে করা হচ্ছে না, এর দ্বারা তার মনোভাবকে আরও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই ধরনের বিশ্বাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পারলে, মনোভাব পরিবর্তনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Define attitude. Discuss the importance of attitude in the education of the children. [১৯, ২৩-২৭]
2. What is attitude? How it is different from interest? Discuss the role of the teacher in bringing about changes in the attitude of the pupil. [১৯-২৩, ২৫-২৭]
3. Write an essay on 'Attitude and its educational value.' (সম্পূর্ণ অংশ)
4. Write notes on the following :
   (a) Dimension of attitude. [২১]
   (b) Attitude scale. [২৩]
   (c) Attitude & Interest. [২০-২১]

তৃতীয় অধ্যায়

সেন্টিমেণ্ট

[SENTIMENT]

সাধারণভাবে আমরা বলি; "লোকটি খুব সেন্টিমেণ্টাল"। এর দ্বারা আমরা ব্যক্তির কোন এক বিশেষ প্রবণতাকে বুঝাই। তবে, সাধারণতঃ কেউ অল্পে দুঃখিত হ'লে বা সাধারণ কথায় রাগ করলে, আমরা তার ঐভাবে বিবরণ দিয়ে থাকি। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট কথাটার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য অনেক ব্যাপক। মনোবিদ্যায় সেন্টিমেণ্ট বলতে সাময়িক কোন মানসিক অবস্থাকে বুঝি না। বা, সেন্টিমেণ্ট কোন বিশেষ প্রক্ষোভের পুনঃ পুনঃ প্রকাশ নয়। সেন্টিমেণ্ট (sentiment) ও মনোভাব (attitude) এক জিনিস নয়। তবে এই সেন্টিমেণ্ট কি ?

মনোবিদ্ স্যাণ্ড (A. F. Shand)[1] সর্বপ্রথম সেন্টিমেণ্ট (Sentiment) কথাটাকে মনোবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, **বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলো যে মানসিক সংগঠনের সৃষ্টি করে তাই হ'ল সেন্টিমেণ্ট (sentiment)।**

সেন্টিমেণ্টের সংজ্ঞা

মানুষের মধ্যে জন্মগত কতকগুলো প্রবণতা থাকে, যাকে আমরা বলি **প্রবৃত্তি** (instinct)। জীবনে এইটুকু সম্বল করে শিশু ভূমিষ্ট হয়। জন্মের পর শিশুর সব আচরণই এই প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনের তাগিদে এইসব প্রবৃত্তিগুলোর পরিবর্তন হয়, বৃহত্তর সংহতির মাধ্যমে। এই সংহতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত অনিয়ন্ত্রিত বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভগুলোও বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে এবং উন্নততর সংগঠনের সৃষ্টি করে। এই সুগঠিত প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার যে মানসিক তন্ত্র, তাকেই বলা হয় সেন্টিমেণ্ট। ম্যাকডুগলাও (Mc Dougall)[2] **এই অর্থে সেন্টিমেণ্টের সংজ্ঞা দিয়েছেন।** তাঁর মতে, কোন বস্তু নির্ভর অভিজ্ঞতা দরুন, সেই বস্তুর প্রতি ব্যক্তির যে চিরস্থায়ী মানসিক প্রবণতার বিকাশ হয়,

1. A. F. Shand : Foundation of character.
2. "It is an enduring conative attitude toward some object induced by experience of that object"—Mc. Dougall : An outline of Psychology.

তাই হ'ল সেন্টিমেণ্ট। সেন্টিমেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে **ম্যাকডুগাল** (Mc Dougal)[1] অন্যত্র বলেছেন, কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার যে প্রবণতা তাই হ'ল প্রবণতা। কিন্তু, সেন্টিমেণ্ট যে কেবলমাত্র বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করেও হ'তে পারে।

সেন্টিমেণ্টের প্রকৃতি [Nature of Sentiment] :—

সেন্টিমেণ্টের শুধুমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাকে বুঝানো যায় না। কারণ, এরকম আরো নানারকম মানসিক সংগঠন আমাদের মধ্যে থাকে এবং আমাদের বহিঃআচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সেন্টিমেণ্ট কি তা প্রকৃতভাবে জানতে হ'লে, অন্যান্য সমজাতীয় প্রক্রিয়া এবং মানসিক সংগঠনের সঙ্গে তার পার্থক্য করার দরকার। অর্থাৎ, সেন্টিমেণ্টের প্রকৃতি আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার। বিশেষভাবে আমরা সেন্টিমেণ্ট এবং প্রক্ষোভ, সেন্টিমেণ্ট এবং সংস্কার ও সেন্টিমেণ্ট এবং মনোভাবের মধ্যে আমরা এ প্রসঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করবো। এই পার্থক্য থেকে সেন্টিমেণ্ট আসলে কি তা বুঝা যাবে।

অনেক সময় সেন্টিমেণ্ট এবং প্রক্ষোভকে (emotion) একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে যদিও কিছু পার্থক্য থাকে, মনোবিদদের অনেকের কাছে তার তাৎপর্য্য খুব পরিষ্কার নয়। এর কারণ, বিভিন্ন প্রক্ষোভ (Emotion) এবং সেন্টিমেণ্টকে আমরা একই নামে অভিহিত করি। তাই পার্থক্য উপলব্ধি করলেও মনোবিদদের ব্যবহারিক প্রয়োগ তার বহিঃপ্রকাশ সবসময় ব্যক্ত হয় না। যেমন—'ভালবাসা' (love) এই কথাটা আমরা প্রয়োগ করি কোন বিশেষ ব্যক্তির অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বিশেষ প্রক্ষোভমূলক আচরণকে বুঝানোর জন্য। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার আলিঙ্গন এই প্রক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু যখন আমরা বলি, "তিনি ঐ মেয়েটিকে ভালবাসেন", তখন এই 'ভালবাসা' (love) কথাটাকে আমরা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি। যখন দু' ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসে, তখন তারা তাদের নৈকট্যে **আনন্দ** পায়; একজনকে কেউ আঘাত করলে অন্যের **রাগ** হয়; একজন বিপদে পড়লে, অন্যে **ভীত** হয়; বিচ্ছেদের দরুন **দুঃখ** হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন অবস্থায় আমরা বিভিন্ন রকম প্রক্ষোভের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। এই যে এক বস্তু অর্থাৎ, ভালবাসার পাত্র অথবা পাত্রীকে

সেন্টিমেণ্ট ও প্রক্ষোভ

1. "A sentiment involves an individual tendency to experience certain emotions and desires in relation to some particular object"
—Mc. Dougall : An outline of Psychology.

কেন্দ্র করে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য যে নূতন মানসিন সংগঠন তৈরী হয়েছে, তাই হ'ল সেন্টিমেণ্ট। সুতরাং প্রক্ষোভ এবং সেন্টিমেণ্টের মধ্যে পার্থক্য মূলগত। প্রক্ষোভ হ'ল এক ধরনের অভিজ্ঞতা বা কাজ; কিন্তু সেন্টিমেণ্ট হ'ল সংগঠন (structure), যা অবস্থার পরিবর্তনে প্রায় একই রকম থেকে যায়। **ম্যাকডুগাল,**[1] **প্রক্ষোভ এবং সেন্টিমেণ্টের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।** ঠিক প্রবৃত্তিমূলক কর্ম (instinctive behaviour) এবং প্রবৃত্তির (instinct), মধ্যে যে পার্থক্য, প্রক্ষোভ এবং সেন্টিমেণ্টের মধ্যেও সেই পার্থক্য বর্তমান। সুতরাং মনোবিদ্যায় তাদের নামকরণ এক হ'লেও আদর্শগত দিক থেকে তারা পৃথক।

সেন্টিমেণ্ট ও প্রবৃত্তি

মানুষ জন্মগতভাবে যে সব প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে পারে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে, বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে এক মানসিক সংগঠনের সৃষ্টি করে। সে যে কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট। মনোবিদ্ **ভ্যালেণ্টাইন** (valantine) তাই বলেছেন, বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি জাগানোর জন্য যে মোটামুটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে তাই হ'ল সেন্টিমেণ্ট (sentiment)।[2] এদিক থেকে সেন্টিমেণ্ট এবং প্রবৃত্তির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। প্রবৃত্তি (instinct) যেমন কোন বস্তুর বর্তমানে, ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি, সেন্টিমেণ্টও বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। সেন্টিমেণ্ট এবং প্রবৃত্তি দুটো জৈব-মানসিক প্রবণতা (psycho physical dispositon)। অর্থাৎ, দুটোর জন্যই আমাদের যথাযোগ্য মানসিক সংগঠন (mental structure) দায়ী। কিন্তু, এই প্রকৃতি গত মিল থাকলেও, প্রবৃত্তি এবং সেন্টিমেণ্টের মধ্যে পার্থক্য আছে।

---

1. "The emotion is a mode of experience, a way of functioning, and a fact of activity; the sentiment is a fact of structure, an organised system of dispositions, which endures in a more or less quiescent condition, between the occasions upon which it is brought into activity" —Mc. Dougall : Social Psychology.

2. "A sentiment is a more or less permanent disposition build up through experience to feel various emotions in relation to a person or thing, according to varying circumstance"—Valentine : Psychology and its bearning on Education.

প্রবৃত্তি হ'ল সহজাত (Innate) মানসিক প্রবণতা, কিন্তু, সেন্টিমেণ্ট হ'ল অর্জিত মানসিক প্রবণতা। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায়, আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রতিক্রিয়া করতে পারি, কিন্তু সেন্টিমেণ্ট অভিজ্ঞতার পুণরাবৃত্তিতে গঠিত হয় এবং এই অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া সেন্টিমেণ্ট, প্রবৃত্তির চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত। প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে, বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হ'তে পারে ; কিন্তু সেন্টিমেণ্ট একই বস্তুর বর্তমানে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে।

সেন্টিমেণ্টকে সঠিকভাবে বুঝতে হ'লে, তার সঙ্গে কমপ্লেক্স্ (complex) এর তফাৎ করার দরকার। কমপ্লেক্স্ (complex) এবং সেন্টিমেণ্ট মানসিক সংগঠনের দিক থেকে অভিন্ন প্রকৃতির, উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। আপতঃ মিল থাকলেও সেন্টিমেণ্ট এবং কমপ্লেক্স এর মধ্যে পার্থক্য আছে। **প্রথমতঃ**, মনঃ সমীক্ষণবাদীরা কমপ্লেক্সকে (complex) অবচেতন মনের (unconscious mind) সংগঠন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে কোন শক্তিশালী প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতাকে আমরা অবচেতন মনে রাখি। কিন্তু এই অবদমিত ইচ্ছা (repressed desire) পরোক্ষভাবে আমাদের মানসিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিকেই তাঁরা কমপ্লেক্স (complex) বলেছেন। সুতরাং, কমপ্লেক্স অবচেতন মনের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি তার সম্পর্কে সচেতন থেকে কিছু কাজ করে না ; এবং তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার ও তার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট ব্যক্তির সচেতন মনের উপাদান, তাই তার সম্পর্কে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে। **দ্বিতীয়তঃ**, ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে কমপ্লেক্স মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি করে বা অস্বাভাবিক মনের পরিচায়ক। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট সুস্থ ও স্বাভাবিক মানবিক বিকাশের সহায়ক। তাহ'লে, বলা যায় সেন্টিমেণ্ট হ'ল আমাদের সাধারণ অর্জিত কর্ম প্রবণতা (conative tendency), আর কম্প্লেক্স (complex) হ'ল শুধুমাত্র মানসিক অসুস্থতার পরিচায়ক সেন্টিমেণ্ট-গুলো। অর্থাৎ, সেন্টিমেণ্ট হ'ল যে কোন ধরনের অর্জিত কর্ম প্রবণতা ; আর কমপ্লেক্স হ'ল বিশেষ এক শ্রেণীর সেন্টিমেণ্ট মাত্র।[1]

সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স্

সেন্টিমেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, সব শেষে বলা যায়, এদের

1. "...we shall have the word sentiment as the most general term to denote all acquired conative trends ; and complex will be used to denote sentiments that are in some manner and degree morbid or pathological."—Mc Dougal : An outline of Psychology.

কেন্দ্র করে এক ধরনের অভ্যাসমূলক আচরণধারা ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে। এই অভ্যাস না গড়ে উঠলে, সেন্টিমেণ্ট তার সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমে নষ্ট হ'য়ে যায়। আবার, এই অভ্যাস গঠনের ফলেই সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। যে শুধু জন্মের সময় থেকে মায়ের কাছ ছাড়া, মাকে কেন্দ্র করে তার সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে না। মনোবিদ **স্পলডিং** (Spalding) বলেছেন, প্রবৃত্তিগত প্রবণতাগুলো কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে যে সংঘবদ্ধ হয়, তার পেছনে নৈকট্যের অনুষঙ্গতা (Association due to contiguity) কাজ করে। অর্থাৎ, নৈকট্যের জন্যই তারা একত্রিত হয়। মনোবিদ **উইলিয়ম জেমস্** (William James) এ বিষয়ে একমত। সুতরাং সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠার মূলে প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তি (habitual repetition) প্রয়োজন হয়। সেন্টিমেণ্টের দৃঢ়তার মূলে আছে অভ্যাস। তবে সেন্টিমেণ্ট যে সব সময় মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা নয়। অনেক সময় বিমূর্ত ধ রণাকে কেন্দ্র করেও সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ তিনটে পর্য্যায়ে, সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। **প্রথমতঃ,** মূর্ত বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে (concrete particular object), **দ্বিতীয়তঃ,** সাধারণ এক শ্রেণীর মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে (concrete general object) এবং **তৃতীয়তঃ,** আমূর্ত ধারণা বা বস্তুকে কেন্দ্র করে (abstract ideas or object)।

সেন্টিমেণ্ট ও অভ্যাস

সেন্টিমেণ্টের বিকাশ [Development of sentiment] :—

সেন্টিমেণ্ট, আমাদের জন্মগত প্রক্ষোভমূলক প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেন্টিমেণ্টেরও বিকাশ হয়। সেন্টিমেণ্টের বিকাশকে মনোবিকাশের একটা অংশ বলা যেতে পারে। মানুষের মনের বিকাশ হয় বিভিন্ন স্তরে। এর মধ্যে তিনটে স্তর সেন্টিমেণ্টের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মনোবিকাশের এই বিভিন্ন স্তর পর্য্যায়ক্রমে হ'ল—(১) **প্রত্যক্ষণমূলক স্তর** (Perceptual stage), (২) **চিন্তনমূলক স্তর** (Conceptual stage) এবং (৩) **ভাবমূলক স্তর** (Ideational stage)। প্রত্যক্ষমূলক স্তরে, আমরা কেবলমাত্র বস্তুর বর্তমানে তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ, এই স্তরে মানসিক অপরিপক্কতার জন্য বস্তুর প্রত্যক্ষণ ছাড়া অভিজ্ঞতা হয় না। দ্বিতীয়তঃ চিন্তনমূলক স্তরে, মনের অভিব্যক্তির দরুন বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতার বিকাশ হয়। এই সময়ে আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। তৃতীয়তঃ ভাবমূলক স্তরে, বস্তুর অবস্থিতি ছাড়াই আমরা জ্ঞান আহরণ করতে পারি।

সেন্টিমেণ্ট বিকাশের বিভিন্ন স্তর

মনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে আমাদের মানসিক প্রবণতাগুলোরও অভিব্যক্তি হয়। অর্থাৎ, তাদের সংগঠনের মাধ্যমে সেন্টিমেণ্টের এবং তার পরে, আরো বৃহত্তর সংহতি বিধানের মাধ্যমে একক জীবনাদর্শ স্থাপিত হয়। কিন্তু, এই সংহতি সাধন যদিও স্বাভাবিক, তবুও তার পেছনে বিশেষ এক মনঃধর্ম (property of mind) কাজ করে। এই ধর্ম হ'ল সংহতি বিধানের ধর্ম। মানুষের মন, কখনও পরস্পর বিরোধী ভাবধারা পাশাপাশি পৃথকভাবে ধারণ করতে পারে না। ফলে সে সব সময় চায় বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে: মনের এই ধর্ম সংহতি বিধানের প্রক্রিয়ার শক্তি জোগায়। সুতরাং, সেন্টিমেণ্ট গঠনের পেছনে, মনের দু'টো ধর্ম কাজ করে—[এক] মনের বিকাশ ধর্মীতা এবং [দুই] বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রবণতা। এই দুই প্রক্রিয়ার ফলেই সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। আর মনোবিকাশের স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে তিনটে পর্য্যায়েই সেন্টিমেণ্ট গঠিত হয়।

প্রত্যক্ষণমূলক স্তর

প্রথমতঃ প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে (perceptual stage) শিশু অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বস্তুর প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। এই পর্য্যায়ে সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) বিশেষ ভাবে সক্রিয় থাকে। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলো থাকে অসংহত এবং বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষোভগুলোও থাকে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সংযুক্ত। মনোবিকাশের এই স্তরে, ব্যক্তির মানসিক সংগঠনকে কতকগুলো পরস্পর বিরোধী, বিক্ষিপ্ত অসংহত প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতার সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যেমন, শিশুর মায়ের প্রতি ভালবাসা, তাঁর দৈহিক অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বা, শিশুর খেলনার প্রতি যে অনুরাগ, তা আকস্মিক এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত যে অনুভূতি বা প্রক্ষোভ তাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিক্ষিপ্ত পরস্পর বিরোধী প্রক্ষোভগুলো একত্রিত হয়।

চিন্তনমূলক স্তর

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ হয়। **মনোবিদ্ ড্রিভার** (Drever) বলেছেন, এই স্তরেই সেন্টিমেণ্টের জন্ম হয়। অর্থাৎ মন যখন প্রত্যক্ষমূলক স্তর থেকে চিন্তনমূলক স্তরে উন্নীত হয় তখনই সেন্টিমেণ্ট জন্মলাভ করে। এই স্তরেই অসংহত সহজাত প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাগুলো সংঘবদ্ধ হয়; এর ফলে মনোজগতে এক নূতন ঐক্যের সৃষ্টি হয়। প্রথম স্তরে, শিশুর, মায়ের দৈহিক উপস্থিতি এবং খাদ্য গ্রহণের আগ্রহকে কেন্দ্র করে যে সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনুভূতি ছিল, তা চিন্তনমূলক স্তরে অভ্যাসের মাধ্যমে মায়ের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হ'তে শুরু করে। এই অবস্থায়, মায়ের প্রতি শিশুর প্রক্ষোভ-মূলক প্রবণতা শুধুমাত্র মায়ের উপস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মায়ের

সম্বন্ধে বিভিন্ন অবস্থায় চিন্তন, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, মা'কে কেন্দ্র করে তার সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। মা'র অসুখ করলে শিশুদের দুঃখ হয়; মায়ের আনন্দ হ'লে তাদেরও আনন্দ হয়। এই চিন্তনমূলক স্তরে সেন্টিমেণ্ট দুটো পর্য্যায়ে গড়ে ওঠে এবং দু'ধরনের সেন্টিমেণ্ট দেখা যায়। প্রথমতঃ শিশু যে সব বস্তু প্রত্যক্ষ করে, তাদেরকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক ভাবে সেন্টিমেণ্টের বিকাশ হয়। যেমন, মায়ের প্রতি সেন্টিমেণ্ট, বাবার প্রতি সেন্টিমেণ্ট, ভাই বোনদের প্রতি সেন্টিমেণ্ট, বাড়ীর বিভিন্ন বস্তুর প্রতি বিশেষ বিশেষ সেন্টিমেণ্ট পৃথক পৃথক ভাবে গড়ে ওঠে। এদের প্রত্যেকের প্রতি ভালবাসার সেন্টিমেণ্ট আলাদা আলাদা করে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিচ্ছিন্ন বস্তু কেন্দ্রিক সেন্টিমেণ্টগুলো একত্রিত হয়ে সাধারণ ভাবে পরিবারের প্রতি সেন্টিমেণ্ট (sentiment for the family) এর বিকাশ হয়। **জেমস্ ড্রিভার** (Drever) বলেছেন, আমাদের সেন্টিমেণ্ট প্রথমতঃ **বিশেষ মূর্ত বস্তুকে** (concrete particular) কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এবং পরে সেটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত এবং সংঘবদ্ধ হয়। চিন্তনের বিকাশের ফলে, যখন শিশুর সাধারণ ধারণা জন্মে, তখন সে বিশেষ কতকগুলো বস্তুকে এক শ্রেণীভুক্ত করতে শেখে এবং তখনই এই এক **শ্রেণীভুক্ত মূর্ত বস্তুকে** (concrete general) কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, শিশুর যখন ধারণা জন্মে, বাবা, মা, ভাই, বোন, বাড়ী, আসবাব পত্র, ইত্যাদি সব কিছুই একই পরিবারভুক্ত, তখনই পরিবারকে কেন্দ্র করে তার সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেন্টিমেণ্টগুলো সংযোজিত হয়। এখন এই ধরনের সাধারণ প্রবণতা ব্যক্তির জীবনের স্থিরতা নির্ধারণ করে এবং তার আচরণের মধ্যে সংহতি আনে।

এখন, বিশেষ বিশেষ সেন্টিমেণ্টগুলো, চিন্তনমূলক স্তরে, বিক্ষিপ্ত অসংহত প্রবৃত্তিমূলক জীবনকে সুসংবদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু পরবর্তী কালে, লক্ষ্য করা যায় সেন্টিমেণ্ট বা নূতন মানসিক প্রবণতাগুলোও আবার নিজেদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে। তখন মন চায়, তাদের মধ্যে সামগ্রিক ঐক্য স্থাপন করতে। এই ঐক্যস্থাপন হয় মনোবিকাশের পরবর্তী স্তরে, অর্থাৎ ভাবমূলক স্তরে (ideational stage)। এই ধরনের সংঘবদ্ধতা দু'ভাবে হতে পারে। একটা হ'ল চিন্তনমূলক স্তরে গঠিত বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কোন বিস্তৃত সেন্টিমেণ্টকে কেন্দ্র করে, অন্যান্য সেন্টিমেণ্টের সংহতি সাধনের মাধ্যমে। অথবা, অন্য কোন শক্তিশালী সত্বাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্টগুলোর সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে। মনোবিদ্‌রা মনে করেন, দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই ভাবমূলক স্তরে, ব্যক্তি জীবনে, বৃহত্তর মানসিক সংগঠন তৈরী

ভাবমূলক স্তর—
আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট

হয়। যে শক্তিশালী সত্বাকে কেন্দ্র করে, আমাদের বিভিন্ন অর্জিত প্রবণতা বা সেন্টিমেণ্টগুলো সুগঠিত হয় **ম্যাকডুগাল** তার নাম দিয়েছেন, **অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট** (master sentiment)। **ম্যাকডুগাল** (Mc Dougall) এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এই অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট যা এত প্রভাবশালী, তা নিশ্চয়ই এমন কোন সত্বাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যার প্রভাব আমাদের জীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্বা হ'ল **অহংসত্বা** (self), তাই ম্যাক্‌ডুগাল একে **আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট** (self-regarding sentiment) নামে অভিহিত করেছেন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মসচেতন (self conscious) হয়। এই আত্মসচেতনার বিকাশ, ব্যক্তিমন এবং সামাজিক মনবিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। যখন অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার ফলে, আত্মচেতনা জাগতে শুরু করে তখনই আত্মবোধের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এবং এই আত্মবোধ ধীরে ধীরে মনোজগতে পরিপূর্ণ সংহতি আনে। আত্মচেতনা ছাড়া আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট (self-regarding sentiment) গঠিত হতে পারে না। ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট আত্মশ্রদ্ধা থেকে আসে। সুতরাং একে আত্মমর্যাদাই (self-respect) বলা ভাল। তিনি মনে করেন, যখন আত্ম-চেতনার দ্বিমুখী ধারা—আত্ম প্রতিষ্ঠা (self-assertion) এবং বশ্যতা (self-submission), ব্যক্তিসত্বার মধ্যে যথাযথভাবে ভার সাম্য বজায় রেখে কাজ করে, তখনই এই ধরনের আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট সৃষ্টি হয়।[1] যাদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ বেশী থাকে তাদের সেন্টিমেণ্ট আমরা **গর্ব** (pride), **উচ্চাকাঙ্ক্ষা** (ambition) ইত্যাদি বলে থাকি। আবার যাদের ক্ষেত্রে আত্মবশ্যতা প্রবল থাকে, তাদের সেন্টিমেণ্টকে বলে থাকি **হীনমন্যতার সেন্টিমেণ্ট** (self-depreciation)। তবে ম্যাকডুগালের এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া যায় না। তার কারণ, মানুষের আত্মচেতনা এবং আদর্শ শুধুমাত্র তার আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রবণতা, এবং বশ্যতার প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ব্যক্তির এই সেন্টিমেণ্ট গঠনে আরো জটিল প্রক্রিয়া কাজ করে। ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা (previous experiences), অন্যে তার সম্পর্কে কি ভাবে (what others think about him), তার দ্বারা এবং তার নিজের ভাল মন্দ বোধ দ্বারা তার এই সেন্টিমেণ্ট নির্ধারিত হয়। তাই মানুষের জীবন বিকাশের গতি কেবলমাত্র ঐ দু'টো প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

1. "In the normal man the two main tendencies of the sentiment —the impulses of self-assertion and submission are duly balanced, ...and the sentiment is properly called "self-respect."

—Mc, Dougall : An Outline of Psychology.

হয়, এ ধারণা ভুল। তবে, আধুনিক মনোবিদ্‌রা এ কথা স্বীকার করেন যে আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন প্রবণতার সার্থক সমন্বয় হয়। **মনোবিদ্ রস্** (Ross) বলেছেন, এই অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট একমাত্র সমন্বয়ণের সূত্র। যেমন, বস্তুকণার পারস্পরিক আকর্ষণের সূত্রের ক্রমবিবর্তন দেখতে পাই, **কেপ্‌লার** (Kepler), **নিউটন** (Newton) এবং **আইনস্টাইন** প্রভৃতির মতবাদের মধ্যে, তেমনি সেন্টিমেণ্টগুলোরও ক্রমবিবর্তনের ফলে একটা অধিশাসক সেন্টিমেণ্টের বিকাশ হয়। এবং এর মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয়।[1]

ভাবমূলক স্তরে, অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট বা আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট ছাড়াও আরো কতকগুলো সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। এই সব সেন্টিমেণ্ট গুলো সাধারণতঃ বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। মনোবিকাশের এই স্তরে শিশুরা বিমূর্ত বস্তু বা ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, ফলে ঐ সব বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠতে পারে। যেমন, সততা (honesty), সত্যবাদীতা (truthfulness), ন্যায় বিচার (justice) ইত্যাদি। এই সব সেন্টিমেণ্টগুলোর সামাজিক মূল্য বিচার করে **ম্যাক্‌ডুগাল** এদের নাম দিয়েছেন **নৈতিক সেন্টিমেণ্ট** (moral sentiment)। সমাজের মধ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে অন্য ব্যক্তির কাজ আচরণ বা মানসিক আচরণ অনুকরণের মাধ্যমে এই ধরনের সেন্টিমেণ্টের বিকাশ হয়। শিশু যে ব্যক্তিকে অনুকরণ করে, সেই ব্যক্তির প্রতি তার প্রথম সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে, পরবর্তীকালে সেই বিশেষ ব্যক্তির বিভিন্ন গুণকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্টের বিকাশ হয়। এই ধরনের নৈতিক সেন্টিমেণ্ট ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভাবমূলক স্তর—
নৈতিক সেন্টিমেণ্ট

সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিজীবনে সেন্টিমেণ্টের বিকাশ বিভিন্ন স্তরে হ'য়ে থাকে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সেন্টিমেণ্ট থেকে শুরু করে, একক সত্বাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক সেন্টিমেণ্ট গঠন পর্য্যন্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। সেন্টিমেণ্ট গঠনের প্রত্যেক স্তরেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজ করে। তবে এ প্রসঙ্গে

আলোচনা

1. Just as Kepler's laws are included in the Newton's and that of Newton's in the wider generalization of Einstein's the process giving us a hierarchy of scienti c laws, so the sentiments gradually organise themselves in a hierarchy under one dominant sentiment or master sentiment."
—Ross : Ground Work of Edn. Psychology.

একটা কথা উল্লেখ করার দরকার—অহং সত্বাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সম্পূর্ণ আচরণ ধারার নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য সমস্ত প্রবণতার সামান্তীকরণ, সাধারণতঃ সব ব্যক্তিজীবনে সম্পূর্ণ হয় না। তবে প্রত্যেক জীবনই এই সামঞ্জস্য বিধানের পথেই প্রতিমূহূর্তে বিকশিত হচ্ছে। এই সংহতি স্থাপনের পথে কে কতদূর এগিয়ে যাবে তা নির্ভর করছে, ব্যক্তিসত্বার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর।

শিক্ষা ও সেণ্টিমেণ্ট [Education & Sentiment] ঃ—

সেন্টিমেন্টের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের সংব্যাখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রনে এবং মানব জীবনের বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। ম্যাক্‌ডুগালের মতে ব্যক্তি-সত্বার গঠনে, এই সেন্টিমেণ্টের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিভিন্ন জন্মগত কর্মপ্রবণতাকে সংঘবদ্ধ করার মাধ্যমেই ব্যক্তিসত্বার বিকাশ হয়। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিসত্বায় পরিপূর্ণ সংগঠনে সহায়তা করা এবং অন্যদিকে ব্যক্তিকল্যানের মাধ্যমে সামাজিক কল্যানে সহায়তা করা। ব্যক্তিজীবনের উন্নতি এবং সমাজ জীবনের উন্নতি একত্রে আনতে হ'লে, এমন এক সত্বাকে জাগ্রত করার দরকার, যা এই দু'য়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। আর এই সত্বা হ'ল অহং বা আত্মচেতনা (self consciousness), এবং আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট।

সেন্টিমেণ্ট গঠন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

সুতরাং, শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হবে এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট জাগ্রত করা। এই সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে, সেন্টিমেণ্ট বিকাশের সব শেষ স্তরে। সুতরাং অন্যান্য স্তরের বিকাশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টকে গড়ে তোলা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে, আমাদের কর্তব্য হ'বে শিশুর সেন্টিমেণ্ট বিকাশের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্নভাবে তাদের সহায়তা করা। আমরা জানি শিশুদের সেন্টিমেণ্ট প্রথম স্তরে মূর্ত পৃথক পৃথক বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বিদ্যালয় জীবনে, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এরকম কতকগুলো বস্তুকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে না পারলে, পরবর্তী স্তরে শিক্ষার কাজেরও অসুবিধা হবে। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি সেন্টিমেণ্ট ও পড়ার অন্যান্য সামগ্রীর প্রতি সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে হবে; এছাড়া শিক্ষকের প্রতি সেন্টিমেণ্ট, অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিও পৃথক পৃথক সেন্টিমেণ্ট, শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। সেন্টিমেণ্টের সঙ্গে অভ্যাসের যোগাযোগ আছে, তাই এই ধরনের বিচ্ছিন্ন

বিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্ন সেন্টিমেণ্ট গঠন ও শিক্ষকের দায়িত্ব

সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের ঐ সব বস্তুকে কেন্দ্র করে, অভিজ্ঞতার পুণরাবৃত্তির সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যে সব কাজ বিদ্যালয়ে করতে হয়, তাদের প্রতি যাতে যথাযোগ্য সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে, তার জন্য শিক্ষক সব সময় তাদের এমন সব কাজ দেবেন, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সম্পর্ক আছে। এই স্তরে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে সুতরাং সমস্ত বিষয় বস্তুকে মূর্ত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপন করতে হবে। কোন রকম বিমূর্ত জ্ঞানের বিষয় বস্তুর প্রতি তাদের সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠতে পারে না।

এর পরবর্তী স্তরে শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণীর মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। সুতরাং বস্তু সামগ্রী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা না জন্মালে, এই ধরনের সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠতে পারে না। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন বিষয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে তারা খুব সহজে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধারণ গুণ সম্পর্কে ধারণা পায়। শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এই ধরনের সেন্টিমেণ্ট বিকাশ করলে চলবে না; বিদ্যালয় পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশকেও সামগ্রিক সেন্টিমেণ্টের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। পূর্ববর্তী স্তরে, শিক্ষক, বিভিন্ন শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন ধরনের সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠেছিল, সে গুলোকে এক সূত্রে বেঁধে, বৃহত্তর সেন্টিমেণ্টের মধ্যে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ের প্রতি সেন্টিমেণ্ট (Sentiment for school) এর বিকাশ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি এই সেন্টিমেণ্ট বিকাশ করতে পারলে, শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যাবে। এই সেন্টিমেণ্টের ফলে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের যে কোন কাজে আনন্দ পাবে। এই সেন্টিমেণ্টের দরুন, তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিদ্যালয়ের যে কোন কাজে তারা আগ্রহান্বিত হবে। ফলে, শিক্ষককে পাঠদান করতে এসে, তাদের মনোযোগ ও অনুরাগ সৃষ্টির জন্য আর অতিরিক্ত কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন হবে না।

বিদ্যালয়ে সামগ্রিক-মূর্ত সেন্টিমেণ্ট ও শিক্ষকের দায়িত্ব

সেন্টিমেণ্ট বিকাশের শেষ স্তরে, যখন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, তখন, বিদ্যালয়কেও দ্বিমুখী কাজ করতে হয়। এ স্তরে শিক্ষার্থীদের আত্মচেতনার বিকাশ হয় এবং আত্মবোধের (self-regarding sentiment) গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। সুতরাং শিক্ষকের এই স্তরে কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের বিকাশে সহায়তা করা। আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের বিকাশকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করার জন্য, শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতনার (self consciousness) বিকাশ যাতে ত্বরান্বিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। যদিও বিদ্যালয় জীবনের

স্বল্প পরিসরের মধ্যে শিশুর জীবনে সম্পূর্ণ ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তবুও, এই ঐক্য গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি যাতে বিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা শিক্ষককে করতে হবে। এই স্তরে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল নৈতিক সেন্টিমেণ্টের বিকাশ্। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। বিমূর্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তনের ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে কতকগুলো নৈতিক ও সামাজিক সেন্টিমেণ্টের বিকাশ হয়, সে দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত বিভিন্ন বিমূর্ত জ্ঞানকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে হবে। দয়া, সততা, ন্যায় বিচার ইত্যাদির প্রতি সেন্টিমেণ্ট বিকাশ করতে হবে। দুই ভাবে শিক্ষক এই কাজে অগ্রসর হ'তে পারেন। **প্রথমতঃ** পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোকে ছাত্রদের সামনে পরিস্ফুটিত করে, শিক্ষক ঐ সব গুণের প্রতি শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলায় সহায়তা করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ** শিক্ষক তাঁর জীবনাদর্শ দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষার্থীদের কাছে উদাহরণ স্বরূপ কাজ করবে। ফলে শিক্ষকের জীবন-আদর্শ নানা ভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করবে। **মনোবিদ্ রস্** (Ross) তাই মন্তব্য করেছেন "The educator can do much to foster the growth of worthy sentiments by being himself an exampler of desired qualities and by holding them up as ideals to be achieved." **ম্যাকডুগালও** শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ্র করেছেন।[1] সাধারণতঃ শিক্ষক বিদ্যালয়ে যে সব নৈতিক ও সামাজিক সেন্টিমেণ্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন, তা হ'ল— সৌন্দর্য্যবোধের সেন্টিমেণ্ট (aesthetic sentiment), বিভিন্ন সামাজিক সেন্টিমেণ্ট, ধর্মীয় সেন্টিমেণ্ট, জাতীয়তা বোধের সেন্টিমেণ্ট ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the nature and growth of sentiment. Discuss the view that sentiments are the main Constituents of character.
[N. B. U. B. T. '65]

[সম্পূর্ণ অংশ]

1. "...in the main, it is by sympathetic contagion and by suggestion from admired personalities that child's moral sentiments are shaped."
Mc. Dougall : An Outline of Psychology,

2. What is sentiment ? Illustrate your answer by analysing a sentiment. How are sentiments formed ? [N. B. U. B. T, '70]
[পৃ: ২৭-৩৭]

3. What are sentiments. Discuss the process of development of sentiment.
[পৃ: ২৭ ; ৩২-৩৭]

4. Distinguish between sentiments and emotions. Discuss the role of the teacher in developing healthy sentiments of the school children.
[পৃ: ২৭ ; ৩৭-৩৯]

5. Write notes on the following :
   (a) Sentiments & Instincts ; [পৃ: ৩০]
   (b) Sentiments & Emotions ; [পৃ: ২৯-৩০]
   (c) Sentiments & Habits ; [পৃ: ৩২]
   (d) Education and the development of sentiments. [পৃ: ৩৭-৩৯]

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা

[PERSONALITY]

ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব (Personality) একটা আমূর্ত ধারণা। তাই এই শব্দটাকে আমরা সাধারণ জীবনে, এবং সাহিত্যে এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকি যে, তার থেকে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport) বলেছেন—"Its connoting significance is very broad, its denotating significance negligible." থর্নডাইক (Thorndike), এই ব্যক্তিত্ব (personality) কথাটার প্রায় আটহাজার রকমের ব্যবহার খুঁজে পেয়েছেন। সাধারণ অর্থে, খুব রাশভারি লোককে আমরা বলি—"ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব আছে।" আবার বলি—'লোকটার একেবারে ব্যক্তিত্ব নেই।" কিন্তু মনোবিদ্যা সম্মত অর্থে, ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকেরই আছে। তাই সাধারণ প্রচলিত 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটার পরিবর্তে আমরা ব্যক্তিসত্তা কথাটা ব্যবহার করব। ইংরাজী পারসোন্যালিটি (personality) কথাটা ল্যাটিন প্রতিশব্দ পারসোনা (persona) থেকে এসেছে। পারসোনা (persona) কথাটি থিয়েটারে ব্যবহৃত মুখোশকে (mask) বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হ'ত। যুগের পরিবর্তনে শব্দটার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তার তাৎপর্য্যেরও পরিবর্তন হয়েছে। তাই ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হ'লে, এই শব্দের তাৎপর্য্যের বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

সূচনা

ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা [Definition of Personality] :—

বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ্ এবং মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই সমস্ত সংজ্ঞা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মনোবিদ্ আলপোর্ট (G. W. Allport) এ রকম 50টা সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে দেখে তার থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ব্যক্তিসত্তা কথাটাকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে ধর্মযাজকরা ব্যক্তিসত্তা এবং আন্তরিক অহংবোধকে

প্রাচীন ও অমনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

(Inner self) একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তির অহংবোধই হ'ল তার ব্যক্তিসত্বা। আলপোর্ট একে বলেছেন, ব্যক্তিসত্বার ঐশ্বরিক অর্থ (Theological meaning)। আবার অনেক দার্শনিক আত্মসচেতনাকে ব্যক্তিসত্বা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। যেমন, লক্ বলেছেন, যে ব্যক্তি চিন্তন, বিচারক ও বুদ্ধির দ্বারা নিজের অহং সত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে, সেই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দার্শনিক **উইডেলব্যাণ্ড** বলেছেন, ব্যক্তি তার অহংসত্বার যে অংশ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পর্য্যবেক্ষণ করতে পারে তাই হ'ল তার ব্যক্তিসত্বা। আবার, অনেক দার্শনিক সরাসরিভাবে ব্যক্তিসত্বাকে জীবনের চরম মূল্য (supreme value) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই মতবাদগুলোকে **আলপোর্ট** (Allport) দার্শনিক অর্থ (Philosophical meaning) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই সব দার্শনিক মতবাদ থেকে একটা কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিসত্বা ব্যক্তির আন্তরিক সত্বা, নিজস্ব আত্মসচেতনতা। তবে এই আত্মসচেতনা সম্পূর্ণ নাও হ'তে পারে। যেমন **বউনি** (Bowne) বলেছেন,—"The essential meaning of personality is self-hood, self consciousness, self control and the power to know." এছাড়া, **আলপোর্ট** (Allport) ব্যক্তিসত্বার বিচার বিভাগীয় অর্থে বিশেষ ব্যবহারও লক্ষ্য করেছেন। এই অর্থ অনুযায়ী বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন সেই ব্যক্তিসত্বার অধিকারী। পরবর্তী যুগে এই বিচার বিভাগীয় অর্থের (Juristic meaning) অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক বিচার বিভাগীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'শ্রেণীবদ্ধ সম-সমাজিক বন্ধন সম্পন্ন মানুষই হ'ল একত্রে ব্যক্তিসত্বা' [A genuinely and loyally united community which lives a coherent life is in a perfectly literal sense a person.] এই ধরনের সংজ্ঞা ব্যক্তিসত্বার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আমাদের বিশেষ সহায়তা করবে না। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা বাদ দিয়ে এর সমাজতত্ত্বমূলক অর্থের (sociological meaning) কথা উল্লেখ করা যাক। অনেকে ব্যক্তিসত্বাকে সামাজিক যথার্থ্য (social effectiveness) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এছাড়া, অনেক চিন্তাবিদ্ আবার বাহ্যিক অবয়বের দিক থেকেও ব্যক্তিসত্বার সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সব সংজ্ঞাগুলোকে **আলপোর্ট** নাম দিয়েছেন, জৈব-সামাজিক সংজ্ঞা (Bio-social definition)। যেমন মে (M. A. May)[1] বলেছেন, অন্যেরা যে ভাবে ব্যক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, তার উপর ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বা নির্ভর করে।

এছাড়া, বিভিন্ন মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্বাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন

1. "It is the responses made by others to the individual as a stimulus that define his personality".—M. A. May : The foundation of personality.

এবং তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন **মর্টন প্রিন্স** (Morton Prince)[1] বলেছেন, ব্যক্তিসত্ত্বা হ'ল ব্যক্তির অর্জিত এবং সহজাত সকল রকম জৈবিক প্রবণতা এবং আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি। কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন প্রবণতার যৌগিক সমবায়ে একক সমতা সম্পন্ন ব্যক্তিসত্ত্বা কি ভাবে গড়ে ওঠে, এই জাতীয় সংজ্ঞার ভিতরে তার উল্লেখ নেই। এই সব সংজ্ঞাগুলোর আরো একটু বিস্তৃতি করে, শুধুমাত্র মানসিক প্রবণতার সমবায় না বলে, অনেক মনোবিদ্ সমস্ত ব্যক্তিগত গুণের সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন। যেমন, **ওয়ারেন্ এবং কার্মাইকেল** (Warren & Carmichael) বলেছেন—জীবন বিকাশের যে কোন স্তরে ব্যক্তির গুণাবলীর যে সমন্বয় তাই হ'ল ব্যক্তিসত্ত্বা ["the entire organisation of a human being at any stage of his development"][2] কিন্তু, এই জাতীয় সংজ্ঞার একটা দোষ যে সমবায়ের উপর জোর দেওয়া হ'লেও ব্যক্তির নিজস্বতাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আবার, অনেক মনোবিদ্ অভিযোজন প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিসত্ত্বার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। যেমন, কেম্পফ্ (Kempf)[3] বলেছেন, ব্যক্তির নিজস্বতার পরিচায়ক অভিযোজন সহায়ক অভ্যাসের সমন্বয়ই হ'ল ব্যক্তিসত্ত্বা। অন্যদিকে অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্ত্বার এককত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মনোবিদ্ **উড্‌ওয়ার্থ** (Wood Worth), **হুইলার** (Wheeler), **স্কোয়েন** (Schoen)[4] প্রভৃতিরা ব্যক্তিসত্ত্বার এই বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। **স্কোয়েন** বলেছেন, ব্যক্তিসত্ত্বা হ'ল ব্যক্তির সেই সব অভ্যাস, প্রবণতা এবং সেন্টিমেন্টের সমন্বয় যা তাকে তার শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে রাখে [personality is the organised system, the functioning whole or unity of habits, dispositions and sentiments that mark off any one member of a group as being different from any other member of the same group.]।

মনোবিদ্‌দের বিভিন্ন সংজ্ঞা

---

1. "Personality is the sumtotal of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual, and the acquired dispositions and tendencies..."

—Morton Prince : Unconscious.

2. Elements of human Psychology : Warren & Carmichæl.

3. "The integration of those systems of habits that represent an individual's characteristics adjustments to his environment."

—Kempf : The automatic functions of personality.

4. Human Nature—Schoen.

মনোবিদ্‌দের দেওয়া এই সমস্ত সংজ্ঞার কোনটাকেই ভুল বলা যায় না। কারণ, প্রত্যেক সংজ্ঞাই ব্যক্তিসত্বা (personality) কথাটার ব্যবহারিক অর্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু, এই সব সংজ্ঞার প্রধান ত্রুটি হ'ল, এগুলোতে ব্যক্তিসত্বার এক একটা দিকের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; পরিপূর্ণভাবে সব বৈশিষ্ট্য গুলোকে একত্রে কোন সংজ্ঞাতেই বিচার করা হয় নি। তাই এই সব সংজ্ঞা গুলোই অসম্পূর্ণ। ব্যক্তিসত্বার এমন এক সংজ্ঞার দরকার, যার ব্যবহারিক উপযোগিতা মনোবিদ্‌দের কাছে থাকবে, এবং যা ব্যক্তির সামগ্রিক গুণের পরিচায়ক। মনোবিদ্ আলপোর্ট, বিভিন্ন প্রচলিত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্বার এক পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাকে এইরকম পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাঁর এই সংজ্ঞার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সব সংজ্ঞারই সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। তিনি বলেছেন—"**পরিবর্তনশীল সক্রিয় জৈব মানসিক সত্বার যে সমন্বয় ব্যক্তির অভিযোজন মুলক আচরণে তার নিজস্বতা প্রকাশে সহায়তা করে তাই হ'ল ব্যক্তি সত্বা।**" **আলপোর্ট** ব্যক্তিসত্বা সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত বই Personality : A psychological adjustment-এ বলেছেন—"Personality is the dynamic organisation within the individual of those psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment." অর্থাৎ, এই সংজ্ঞার মধ্যে আমরা সমবায় বা সমন্বয় মূলক মতবাদ, একক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মতবাদ এবং অভিযোজন মূলক মতবাদ, সব কিছুরই উপাদান দেখতে পাই।

আলপোর্টের সংজ্ঞা

ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Personality] :—

আলপোর্টের (Allport) এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা ব্যক্তিসত্বার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, তিনি ব্যক্তিসত্বাকে **পরিবর্তনীয় সক্রিয় সমন্বয়** (dynamic organisation) আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে ব্যক্তিসত্বা নিছক কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের যোগফল নয়। বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটা সক্রিয় সংগঠন গড়ে তোলে। এই সমন্বয়ের প্রকৃত রূপ বিচ্ছিন্ন একক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে না। পৃথক পৃথক গুণ একক সমন্বয়ের মধ্যে এক নবরূপ গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, এই সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যক্তির জীবন পরিসরের (life-span) মধ্যে বিস্তৃত। সারা জীবন ধরে এই সমন্বয় চলছে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হচ্ছে; তার অভিব্যক্তি হচ্ছে। তাই এই সমন্বয়কে পরিবর্তনশীল

সক্রিয় সমন্বয়

সক্রিয় (dynamic) সমন্বয় বলা হয়েছে। অপর এক আধুনিক মনোবিদ্ মান্ও (Munn)[1] বলেছেন, ব্যক্তিসত্ত্বা বিভিন্ন অংশের, শুধুমাত্র যোগফল নয়, তাদের সমন্বয়। বরং একে যৌগ (compound) বলা যেতে পারে। যে উপাদান দিয়ে এই যৌগ তৈরী, তাদের কারও সঙ্গে এই যৌগের ধর্মের বিশেষ কিছু মিল নেই।

আলপোর্ট তাঁর সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে বলেছেন এই সক্রিয় সমন্বয়, কেবলমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা গুণের নয়, বা কেবলমাত্র মানসিক গুণের নয়। ব্যক্তিসত্বার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি দৈহিক এবং মানসিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের কথাই বলেছেন। **অভ্যাস (habit), মনোভাব (attitude), সাধারণ বা ব্যক্তিগত সেন্টিমেণ্ট (specific or general sentiment) ইত্যাদি সব রকম প্রবণতাই (disposition) দেহ মনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল।** আর এদের সকলের সমন্বয়েই ব্যক্তিসত্বা গড়ে ওঠে। যে সব জৈব মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের ফলে, ব্যক্তিসত্বার একক তন্ত্র (psycho-physical system) গড়ে উঠে, তাদেরই বলা হয় ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ (personality traits)। এ সম্পর্কে, উল্লেখ করা যায়, যে দেহ মনের প্রবণতার দ্বারা ব্যক্তিসত্বা গঠিত তা নিষ্ক্রিয় নয়; এরা আমাদের আচরণ ধারার গতি প্রকৃতিও নির্ণয় করে। তাই আচরণের নিয়ন্ত্রণকারী এই সত্বাগুলোর সমন্বয়ই হ'ল ব্যক্তিসত্বা।

জৈবমানসিক তন্ত্র

আবার প্রত্যেক ব্যক্তির অভিযোজন প্রক্রিয়া তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কোন বিশেষ পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আচরণ করে। তাদের আচরণের বা অভিযোজনের এক একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য (uniqueness) থাকে। এই অভিনবত্ব তার ব্যক্তিসত্বার পরিচায়ক। **আলপোর্টের** মতে ব্যক্তি নূতন পরিস্থিতিতে যে অভিযোজন মূলক প্রতিক্রিয়া করে, তা তার জৈব মানসিক সত্বার সমন্বয়ের দ্বারা নির্ণীত হয়, এবং তার এই অভিযোজন মূলক প্রতিক্রিয়ার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্য কারও প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায় না।

একক বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিসত্বার এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা আলপোর্টের সংজ্ঞার মধ্যে বলা হয়েছে। তাই তাঁর সংজ্ঞাকে আমরা সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করেছি। তিনি তাঁর সংজ্ঞার মধ্যে, ব্যক্তিসত্বা কি, কিসের দ্বারা গঠিত এবং জীবনে তা কোথায় প্রকাশিত হয় এ সব সম্পর্কেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে,

আলোচনা

---

1. Personality is not a more juxtaposition of parts, of segments... it is an integration, a blend......" —Munn : Psychology.

এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোই লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিসত্ত্বা কি? [পরিবর্তনশীল সক্রিয় সমবায়], ব্যক্তিসত্ত্বা কিসের দ্বারা গঠিত?…[জৈব মানসিক তন্ত্রের], কি তার কাজ? [নিয়ন্ত্রণ করা (determine)], কি নিয়ন্ত্রণ করে? [ব্যক্তির অভিযোজন মূলক আচরণ]; এই আচরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? [স্থান, কাল, পাত্র ভেদে, তারা একক; নিছক পুনরাবৃত্তি মূলক নিষ্ক্রিয় আচরণ নয়]। সুতরাং, এই সবগুলোই ব্যক্তিসত্ত্বার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ [Development of Personality]:—

সদ্যজাত শিশুর কোন ব্যক্তিসত্ত্বা থাকে না। তার কারণ, তখনও পর্য্যন্ত সে পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে অভিযোজন শুরু করে নি। এবং ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচায়ক কোন আচরণ ধারা গ্রহণ করে নি। তবে শিশু কতকগুলো সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। দৈহিক মানসিক সব রকম সম্ভাবনাই তার ভেতর থাকে এবং পরিবেশ তার উপর ক্রিয়াশীল হ'লে তার বিকাশ ঘটে। তাই ব্যক্তিসত্ত্বা (personality) জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত নয়; ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশ নির্ভর। মনোবিদ্ **আলপোর্ট** (Allport)[1] এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, জন্ম মুহূর্তে শিশুর মধ্যে তার উন্নত মানবধর্মের সব অনুপরমাণুই বর্তমান থাকে; কিন্তু পরিপূর্ণ সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের অধিকারী সে বিকাশের মাধ্যমে হয়। এই বিকাশের ধারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবন পরিসরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আর এই বিকাশের পথে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বার অধিকারী হয়। তাই, ব্যক্তিসত্ত্বা স্থির কোন মানসিক গুণ নয়, ব্যক্তিসত্ত্বা পরিবর্তনশীল এবং বিকাশমান সত্ত্বা। কিন্তু তা হ'লেও প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বা একটা মূল সূত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে এবং তার ফলেই আমাদের পক্ষে ব্যক্তিসত্ত্বার অনুশীলন করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ সামগ্রিক জীবন বিকাশে যে প্রক্রিয়া সহায়তা করে, ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশেও তারা সাহায্য করে। ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের ধারা অনুশীলন করে, মনোবিদ্ **আলপোর্ট** এ রকম ১৪টি কৌশলের কথা বলেছেন। এগুলোকে তিনি ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের বিভিন্ন দিক (Aspects of growth) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এইসব প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকটার উল্লেখ আমরা এখানে করবো।

ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ কি?

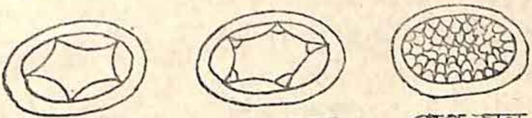
[এক] **বিভেদীকরণ (Differentiation)** ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের

1. "Only the rudiments of that which is highest and most excellent is man are given at birth. The fully fashioned social and moral being, the developed adult personality waits upon the process of growth."

—Allport : Personality.

প্রাথমিক প্রক্রিয়া। জন্মাবস্থায় শিশু কোন প্রাকৃতিক উদ্দীপকের প্রতি পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে না। তার আচরণ হয় **সামগ্রিক প্রকৃতির** (Mass action)। খিদে পেলে কাঁদে; ব্যথা লাগলে কাঁদে। সবরকম প্রক্ষোভই কান্নার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। আবার দেহ সঞ্চালনও সে সামগ্রিক ভাবে করে থাকে। কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকে ততই তার আচরণ বা প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম হ'তে থাকে এবং সে যথার্থ উদ্দীপকের প্রতি যথার্থভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। **লিউইন (K. Lewin)**[1] **বলেছেন, শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তাদের বিভিন্ন কাজের সক্রিয়তার সীমারেখার মধ্যে পার্থক্য থাকে খুবই দুর্বল। এবং এই অর্থে, শিশুদের আচরণকে বয়স্কদের আচরণের চেয়ে অনেক বেশী ঐক্যপূর্ণ বলা যায়।** লিউইন শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যের বিকাশকে নীচের ছবির সাহায্যে পরিবেশন করেছেন।

বিভেদীকরণ



শৈশবকাল বাল্যকাল প্রাপ্তকাল

শিশুদের আচরণের কোনরকম স্থির নিয়ম থাকে না। তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই সামগ্রিক আচরণধারার পরিবর্তন হয় এবং সুবিন্যস্ত হ'তে থাকে। এবং বিভিন্ন আচরণ বিশেষ একটা নির্দিষ্ট গতি নেয়। একেই বলা হয়, বিভেদীকরণ (Differentiation)। বিভেদীকরণের নীতি, **দার্শনিক স্পেনসারের মতবাদেরই** নামান্তর মাত্র। তিনি বলেছেন, জীবন ধারণের উদ্দেশ্য হ'ল—একীভূত সমগ্রতাকে ভেঙে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করার মধ্যেই জীবনের মূল সূত্র বর্তমান। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন রাশিয়ান মনোবিদ্ লুরিয়া (**Luria**) তিনি বলেছেন, এটা স্পেনসারের মতবাদেরই অনুরূপ। এই আচরণের বিভেদীকরণ ছাড়া, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু শুধুমাত্র, বিভেদীকরণ দ্বারা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সম্ভব নয়। স্পেনসারের বিভেদীকরণের নীতি যদি মেনে নিতে হয়, তবে তাঁর নীতির অপর অংশকেও মানতে হবে। অর্থাৎ, আচরণধারার মধ্যে **সামঞ্জস্যপূর্ণ** বৈচিত্র্য আনতে হবে। এই সামঞ্জস্য আনার জন্য ব্যক্তিসত্ত্বার

1. "The child to a greater extent than the adult is a dynamical unity. The infant acts first with its whole body and only gradually acquires the ability to execute part action."

—K. Lewin : Hand Book of Psychology.

গঠনের পেছনে অপর এক সমান্তরাল প্রক্রিয়া কাজ করে। মনোবিদ্‌রা একে বলেছেন, সমন্বয়ণ (Integration) প্রক্রিয়া।

সমন্বয়ণ

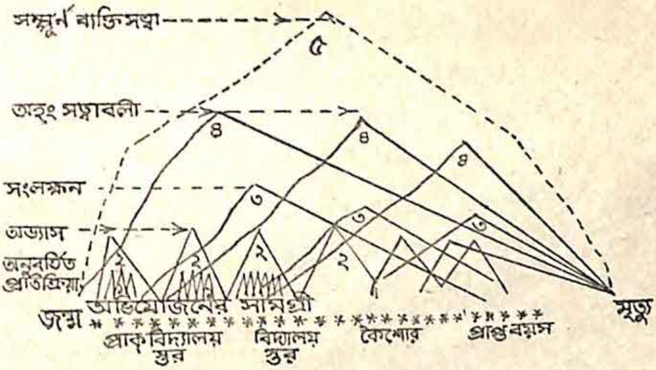
[দুই] সমন্বয়ণ (Integration) ব্যক্তিসত্তা বিকাশের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। শৈশবের আচরণধারা যা বিভেদীকরণের দ্বারা পৃথক হয়, পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পথে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে। শিশু যত বড় হ'তে থাকে, ততই তার আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। আর এর ফলে ব্যক্তিসত্তা একটা বিশেষ দিকে বিকাশ লাভ করে। জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে হ'লে, ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হ'লে, সমন্বয়ণ প্রক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন। **মনোবিদ্ আলপোর্ট** (Allport) ব্যক্তিসত্তার বিকাশে, বিভেদীকরণ এবং সমন্বয়ণ এই দুই প্রক্রিয়ার ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করেন। এই সমন্বয়ণ জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন প্রবণতা ও আচরণ ধারার ক্রমসমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হ'য়ে থাকে।

প্রথম স্তরে, শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে **অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার** (Conditioned reflex) সাহায্যে। অনুবর্তনের দ্বারা শিশু জীবনের প্রাথমিক বিভিন্ন আচরণ সম্পাদনের কৌশল অর্জন করে। অর্থাৎ, এই সর্বপ্রথম শিশু তার স্বাভাবিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া বন্ধনকে মুক্ত করে, কৃত্রিম উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। এই অনুবর্তনের দ্বারা তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাগুলোর পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সমন্বয়ণ হয়।

দ্বিতীয় স্তরে, লক্ষ্য করা যায়, এই অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলো সংখ্যায় অনেক হয় এবং তারাও অসংহত অবস্থায় থাকে। তাই ব্যক্তিজীবনের আরো বৃহত্তর সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এই স্তরে তাই অসংহত এইসব অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে, যার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে একইভাবে সে প্রতিক্রিয়া করে। এদের বলা হয় **অভ্যাস** (Habit)। অর্থাৎ, এইসব অভ্যাস ব্যক্তির সমন্বয়েরই প্রতীক।

তৃতীয় স্তরে, বিশেষ বিশেষ অভ্যাসগুলো নিজেদের মধ্যে সংযোজিত হ'য়ে আরো উন্নত ধরনের সমন্বয়ণ হয়। এই সমন্বয়ের ফলে, আচরণের সংহতি এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে সমন্বয়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মানসিক সংগঠন (Mental structure)। এই স্তরে মোটামুটিভাবে কিছু স্থায়ী বা অস্থায়ী সংগঠন তৈরী হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার **সংলক্ষণ (Traits)**। এইসব সংলক্ষণ

গুলোকে ব্যক্তিসত্বার একক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এই সংলক্ষণগুলোই ব্যক্তিসত্বার পরবর্তী বিকাশের উপাদান এবং গতি নির্ণায়ক। এদের সম্পর্কে



আমরা বিশদভাবে আলোচনা করবো। এখানে আমরা **সেন্টিমেণ্ট (Sentiment), মনোভাব (Attitude), ভাবজট্ (Complex)** ইত্যাদি দেখতে পাই।

চতুর্থ স্তরে, এইসব সংলক্ষণগুলোর মধ্যে সমন্বয় দেখা দেয়; এইসব বিচ্ছিন্ন সংলক্ষণগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে সংবদ্ধ হয়। এই সংহতির ফলে ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন **অহম্‌সত্বার** (**Selves**) বিকাশ হয়। এই অহম্‌-সত্বাগুলো বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নেই। একই ব্যক্তিরই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন অহম্‌সত্বার প্রকাশ করে। ফলে এই স্তরে অহম্ সত্বাবলীর বিকাশ হ'লেও তা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন থাকে।

পঞ্চম স্তরে, এইসব বিচ্ছিন্ন অহম্‌সত্বাগুলোর একত্রে সমন্বয়ণের মাধ্যমে একক অহম্‌সত্বার বিকাশ হয়। এবং এর ফলে ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ সমন্বয় হয়। অর্থাৎ, এর ফলে, ব্যক্তির সব রকম প্রতিক্রিয়া একক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার সবরকম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। উপরের ছবিতে ব্যক্তিসত্বার গঠনে সমন্বয়ণ প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে। অনুভূমিক রেখায় (* চিহ্নিত) ব্যক্তিজীবনের পরিসরকে পরিবেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে জীবন বিকাশের কয়েকটা স্তরেরও উল্লেখ করা হয়েছে। **(১) সমন্বয়ণের প্রথমস্তরে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (conditioned reflex) গুলোকে পরিবেশন করা হয়েছে, (২) দ্বিতীয়স্তরে অভ্যাসকে (Habit) দেখানো হয়েছে, (৩) তৃতীয়-স্তরে আছে সংলক্ষণ (Traits), (৪) চতুর্থস্তরে আছে অহম্‌সত্বাবলী (Selves), এবং (৫) সর্বশেষ স্তরে ভাঙা-ভাঙা রেখা দিয়ে সামগ্রিক ব্যক্তিসত্বাকে (Personality) পরিবেশন করা হয়েছে, এর থেকে**

বোঝা যায়, ব্যক্তির আচরণধারার ক্রমসমন্বয়ণের মাধ্যমে সুসংহতরূপ ধারণ করে, এবং তার ফলে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়।

সমন্বয়ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে, এই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়াই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করে। বিভেদীকরণ এবং সমন্বয়ণ ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রধান দুই প্রক্রিয়া। কিন্তু, এছাড়াও নানারকম প্রক্রিয়া আছে, যারা ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করে। তাই তাদের সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন।

পরিমনন

[তিন] পরিমনন (Maturation) প্রক্রিয়াও ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করে। বাইরের পরিবেশের প্রভাব ছাড়াই ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্ধনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিমনন। এই পরিমনন অবশ্য বিভেদীকরণ (Differentiation) এবং সমন্বয়ণ উভয়ের দ্বারাই হতে পারে। বিশুদ্ধ পরিমনন প্রক্রিয়ার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যে সব সম্ভাবনাগুলো আছে, তার বহিঃপ্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু ব্যক্তি এইসব বিকশিত সম্ভাবনাগুলোকে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে, কি ভাবে প্রয়োগ করবে, তার দ্বারা তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ধারিত হবে। এই অর্থে পরিমননকে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সহায়ক কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা যায়। মনোবিদ্ **আলপোর্টও**[1] পরিমননের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

শিখন

[চার] শিখনের (Learning) মাধ্যমেও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। শিখন প্রক্রিয়ার সব নিয়মই ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনুবর্তন (conditioning), প্রচেষ্টা-ভুলের পদ্ধতি (trial and error method), অনুকরণ (imitation) ইত্যাদি সবরকম শিখনের কৌশলই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করে। তবে শিখন, ব্যক্তিসত্তার সহায়তা করলেও, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শিখনের চেয়ে অনেক বিস্তৃত।

[পাঁচ] এই সব ছাড়াও, ব্যক্তিসত্তার বিকাশের আর একটা

---

1. Maturation contributes to the development of personality by bringing out every inherited feature....All these develop by virtue of an inherited mental capacity. But none of these qualities are in themselves independent unit of personality. They contribute to the formation of personal dispositions but their influence must be combined with the demands made by the environment upon the individual,

—Allport : Personality.

গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল অহম্‌সত্তার বিকাশ। আত্ম সচেতনতা (self-consciousness), আত্ম সম্মানবোধ (self-esteem), আত্মহীনমন্যতা ভাব (feeling of inferiority) এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন মনোবিকলন প্রক্রিয়া (psycho analytical mechanism), ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশে সহায়তা করে।

অন্যান্য প্রক্রিয়া

ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ধারা এত বিস্তৃত যে বিকাশের প্রক্রিয়ার একটা সামান্য তালিকা দিয়ে, তাকে বোঝানো যায় না। ব্যক্তি জীবনে, কোন বিকাশের প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হবে এবং কি রূপ নিবে তা ব্যক্তির নিজস্বতার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা মুশকিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বিকাশ লাভ করে; তাই কোন একক বৈশিষ্ট্যকে আমরা পরিপূর্ণ বিকাশের বৈশিষ্ট্য বলতে পারি না। মনোবিদ্ **আলপোর্ট** (Allport) তাই মন্তব্য করেছেন—"There are as many ways of growing up as there are individuals who grow, and in each case the end product is unique."[1]

ব্যক্তিসত্তার পরিমনন

এই কারণে, পরিপক্ক ব্যক্তিসত্তা (mature personality) বলতে কি বোঝায় তা সঠিক করে বলা মুশকিল। তবে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করে মনোবিদ্‌রা সিদ্ধান্ত করেছেন, সাধারণ তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা ব্যক্তিসত্তার পরিমননকে নির্দ্দেশ করতে পারি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে। এগুলো হ'ল—

[এক] তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে আমরা পরিপক্ক বলবো, যাঁর মধ্যে বহু স্বয়ংক্রিয় অর্জিত অনুরাগের (autonomous interest) সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন রকমে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যিনি নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারেন, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পরিপক্ক ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। তবে এর অর্থ এই নয় যে পরিপূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা (ego centricity) ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য নয়। ব্যক্তির এই একাগ্রতা যদি সামাজিক নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে কেন্দ্র করে সমাজ নির্ধারিত পথে বিকাশ না হয়, তাহ'লে তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলা যাবে না। সুতরাং কি ভাবে ব্যক্তি শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ-অনুকূল বস্তুকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের পথে নিজের অহম্‌সত্তাকে বিস্তারিত করতে পারে, তার উপর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ভর করে। ব্যক্তিসত্তার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয়, **অহম্‌সত্তার বিস্তৃতি (extension of self)।**

1. G. W. Allport : Personality : A Psychological interpretation.

[**দুই**] ব্যক্তিসত্তার পরিপক্কতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল **অহম্‌সত্তার নৈর্ব্যক্তিকতা** (self-objectification)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নিজের অহম্‌সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক বস্তু হিসাবে বিচার করতে পারে, যে নিজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে ভবিষ্যতের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারে ; যে ব্যক্তি নিজের চাহিদাকে ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে, সেই পরিপক্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অন্তর্দৃষ্টির (insight) ক্ষমতা এবং রসবোধের (sense of humour), মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

[**তিন**] পরিপক্ক বৈশিষ্ট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল **একক জীবনদর্শন (unifying philosophy of life)** গঠন। এর ফলে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাকে একক জীবনদর্শন দ্বারা পরিপূর্ণভাবে তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। এই একক জীবনদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্ত প্রবণতার, অভিজ্ঞতার এবং আচরণ ধারণার পরিপূর্ণ সমন্বয়ণ হয়। ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশ, এই সমন্বয়ণের মাধ্যমেই হয়।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ [Personality traits] :—

ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পরিবেশের সংস্পর্শে এসে নিজের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এই ধরনের বিভিন্ন সত্তাকে বলা হয় ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (trait)। এই সব সংলক্ষণগুলো কোন বিশেষ ধারণা বা ভাবের আকারে থাকে। তবে এই সংলক্ষণ কি, এ নিয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ আছে। যদিও, প্রত্যেক মনোবিদ্‌ এবিষয়ে একমত যে এই সব সংলক্ষণগুলো, ব্যক্তিসত্তার সামঞ্জস্য (consistency) বজায় রাখে, তবুও তাদের প্রকৃতি নিয়ে, তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

সংলক্ষণ কি ?

যেমন, মনোবিদ্‌ মে (**May**)[1] বলেছেন, **যে সব অভ্যাসমূলক আচরণের মধ্যে আংশিক বা সামগ্রিক মিল আছে তাদের একত্রে সংলক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়** অর্থাৎ, এই মত অনুযায়ী সংলক্ষণ (traits) ব্যক্তির আন্তরিক সত্তার অন্তর্গত নয়। কিন্তু এই অর্থে সংলক্ষণকে বিচার করলে, নানারকম অসুবিধা দেখা যায়। এই ধরনের বাহ্যিক কোন বৈশিষ্ট দিয়ে, একটা সতত পরিবর্তনশীল সংস্থা (dynamic organisation) প্রকৃতি এবং তার সামঞ্জস্যতাকে

1. "Traits are conveient names given to types or qualities of behaviour which have elements in common. They are not psycho-physical entities but rather categories for the classification of habits."

—May : Jour. of Soc. Psychol., 1932., Vol-3.

(consistency) ব্যাখ্যা করতে পারি না। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌রা সংলক্ষণের (traits) এই সংজ্ঞাকে মানেন না। অনেক মনোবিদ্ সংলক্ষণকে প্রবণতা (determining tendency) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। সংলক্ষণ ও প্রবৃত্তির মত এক ধরনের জৈবমানসিক প্রবণতা (psycho physical disposition)[1] বম্‌গার্টেন (Baumgarten) বলেছেন, **ব্যক্তি-জীবনের যে স্থায়ী মানসিক বল তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করে, তাই হ'ল সংলক্ষণ (trait)।**[1] অর্থাৎ, **বম্‌গার্টেন,** সংলক্ষণকে অন্যান্য প্রবণতার সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন। **মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport),** সংলক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য প্রবণতার তুলনামূলক বিচার করেছেন। তাঁর বিশ্লেষন থেকে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, যে সংলক্ষণ (trait), অভ্যাস (habit), মনোভাব (attitude), ইত্যাদি প্রবণতার চেয়ে অনেক বেশী সামগ্রিক এবং অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন। এছাড়া, যেহেতু এই সব সংলক্ষণ ব্যক্তিসত্বার উপাদান, সেহেতু তারা ব্যক্তির নিজস্বতার পরিচায়ক। তিনি বলেছেন, **সংলক্ষণ সামগ্রিক এবং কেন্দ্রীভুত এমন এক জৈবমানসিক সত্বা, যা বিভিন্ন উদ্দীপকের সমন্বয়ণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।**[2] অর্থাৎ, আলপোর্টের মতে ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণই ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের নির্ণায়ক। এই সংলক্ষণ সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষভাবে জীবন ধারণের মাধ্যমে। সহজাত প্রবণতা (original tendencies) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সংঘাতের ফলে সংলক্ষণের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অর্জিত প্রবণতার বিকাশ হয় তাই হ'ল সংলক্ষণ (traits)।

ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য ঃ—

[এক] আলপোর্টের ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়— সংলক্ষণগুলো, জৈবমানসিক প্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। তবে সাধারণভাবে জন্মগত জৈবমানসিক প্রবণতা (প্রবৃত্তি), বা অন্যান্য অর্জিত প্রবণতার

1. "A trait is a constant directing psychic force which determines the active and reactive behaviour of the individual,"

—Boumgarten : Brit. Jour. Psychol. 1936, 6.

2. "Traits are generalized and focalized neuro-psychic system (peculier to the individual) with the capacity to render many stimuli functionally equivalent, and to initiate and guide consistent (equivalent) forms of adaptive and expressive behaviour." —Allport : Personality.

(অভ্যাস, মনোভাব) মত এরা বিশেষ ধর্মী নয়। সংলক্ষণ অনেক বেশী সামগ্রিক ভাবাপন্ন।

[দুই] এই সব সংলক্ষণগুলো ব্যক্তির শুধুমাত্র গতানুগতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে না। তাদের সাধারণ ধর্মীতার জন্য ব্যক্তি আচরণের পরিবর্তন-শীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার যে কোন আচরণকে তাৎপর্য্যপূর্ণ করে তোলাই সংলক্ষণের কাজ। তাই সংলক্ষণ ব্যক্তি-আচরণের বিরোধক (conflict) দূর করে।

[তিন] সংলক্ষণ ব্যক্তির একক বৈশিষ্ট্য (uniqueness) বজায় রাখতে সহায়তা করে। অর্থাৎ, এই ধরনের প্রবণতা ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন উদ্দীপকের যে প্রভাবে সমন্বয়ন, নির্দ্দিষ্ট স্থির ভঙ্গীতে করে না। প্রত্যেকের আচরণের মধ্যে তাই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

[চার] সংলক্ষণ অর্জিত। জীবনপথে ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে জন্মগত প্রবণতার পুনঃসংগঠনের মাধ্যমে সংলক্ষণের বিকাশ হয়। তবে অর্জিত হ'লেও এদের কাজ অনেক বিস্তৃত এবং এরা শক্তিশালী।

[পাঁচ] আলপোর্ট আরো বলেছেন, এই সব সংলক্ষণই হ'ল ব্যক্তিসত্বার একক (unit)। এই সংলক্ষণগুলোই হ'ল ব্যক্তিসত্বার উপাদান। তবে শুধুমাত্র এদের সমবায়েই ব্যক্তিসত্বা নির্ণীত হয় না। এই সংলক্ষণের পরস্পরের মধ্যে সুবিন্যাস (organisation) প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিসত্বার স্বরূপ নির্ধারণ করে। তাদের বৈশিষ্ট্যমূলক সুসংবদ্ধতা ব্যক্তিজীবনে স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়।

[ছয়] ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল তাদের দ্বিমুখীতা। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্বার কোন বিশেষ সংলক্ষণের দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য (Bipolar characteristic) বর্তমান। যেমন সামাজিকতা (sociability) ব্যক্তিসত্বার একটা সংলক্ষণ। কিন্তু সামাজিকতাকে আমরা কোন কৌশলেই এককভাবে পরিমাপ করতে পারি না। তাকে সামাজিকতা অসামাজিকতার (sociability unsociability) বিস্তৃতির মধ্যে পরিমাপ করতে হবে। কোন মানুষই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বা সম্পূর্ণভাবে অসামাজিক নয়। এই দুই প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে ব্যক্তিসত্বার ভারসাম্য যে দিকে থাকে, তাকে শ্রেণীভুক্ত করা হয় মাত্র।

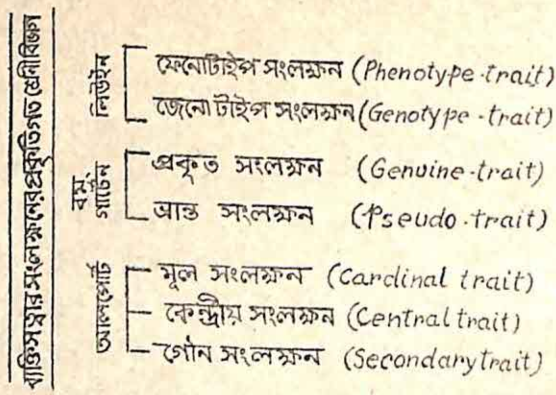
ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের সজ্ঞা নিরূপণে মনোবিদ্দের মধ্যে যে রকম মতভেদ দেখা গেছে, তেমনি তার স্বরূপ বিশ্লেষণেও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

সংলক্ষণের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

সংলক্ষণের প্রকৃতি বিচার করে বহু মনোবিদ্ সংলক্ষণ গুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কথা বলেছেন। যেমন, **লিউইন** (Lewin) সংলক্ষণের প্রকৃতি অনুযায়ী, তাদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যে সব সংলক্ষণ ব্যক্তিসত্বার বাহিক

এবং আপতঃ ব্যাখ্যা দেয়, তাদের তিনি বলেছেন, **'ফেনোটিপিক্যাল'** সংলক্ষণ (Phenotypical traits)। আবার যে সব সংলক্ষণ ব্যক্তির আচরণকে আন্তরিক সংগঠনের দ্বারা ব্যাখ্যা দেয় তাদের তিনি বলেছেন, **'জেনো টিপিক্যাল'** (Genotypical traits)। **বম্‌গার্টেন** (Baumgarten) অনুরূপভাবে সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, তাদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—**প্রকৃত সংলক্ষণ** (Genuine trait), **ভ্রান্ত সংলক্ষণ** (Pseudo traits)। অনেক সময় ব্যক্তির বাহিক আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করে, ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পাই, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের ভ্রান্তির জন্য সংলক্ষণের প্রকৃত সম্পর্কে ধারণাও ভুল থেকে যায়। এই ধরনের আপতঃদৃষ্ট সংলক্ষণগুলোকে বলা হয় ভ্রান্ত সংলক্ষণ (Pseudo-traits)। আর আচরণের পেছনে যে সব মানসিক সংগঠন্ কাজ করে সেগুলোকে বলা হয় প্রকৃত সংলক্ষণ (Genuine traits)। মনোবিদ্ **আলপোর্ট** ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, কতকগুলো সংলক্ষণ আছে যা ব্যক্তির সব রকম আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করে থাকে। এই জাতীয় সংলক্ষণগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন—**মূল সংলক্ষণ** (Cardinal traits)। তিনি এই মূল সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"It is so dominant that there are few activities that cannot be traced directly or indirectly to its influence." মনোবিদ্ **ম্যাক্‌ডুগাল** (Mc Dougall) এই ধরনের সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন, অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট (Master-sentiment), কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি জীবনে সব সময়ে এরকম একটা মাত্র মূল সংলক্ষণ দেখা যায় না। এর পরিবর্তে কতকগুলো মূখ্য সংলক্ষণ ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সব সংলক্ষণগুলোর সমবায়ে আমরা ব্যক্তিসত্বার বিবরণ দিয়ে থাকি। এই জাতীয় সংলক্ষণগুলোর আলপোর্ট নাম দিয়েছেন **কেন্দ্রিয় সংলক্ষণ** (central traits)। এছাড়া বক্তিসত্বার মধ্যে আরো কতকগুলো সংলক্ষণ দেখা যায় যে গুলোর কাজ খুব বেশী বিস্তৃত নয়। এবং তারা এত সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ ব্যক্তির মধ্যে আনতে পারে না। এই জাতীয় সংলক্ষণ গুলোকে আলপোর্ট **গৌণ সংলক্ষণ** (secondary) বলেছেন। আলপোর্টের এই সম্পূর্ণ শ্রেণীবিভাগ সংলক্ষণের আপেক্ষিক সামগ্রিকতার (generality) ভিত্তিতে করা। তাঁর মতে, সম্পূর্ণরূপে সামগ্রিক গুণসম্পন্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের নিয়ন্ত্রণকারক সংলক্ষণ হ'ল মূল সংলক্ষণ ; একক নয় অথচ বিভিন্ন মূখ্য সংলক্ষণের যার দ্বারা ব্যক্তিসত্বার সামঞ্জস্যতা লক্ষ করা যায়, সেগুলোকে বলা হয়েছে, কেন্দ্রিয় সংলক্ষণ ; এবং যেগুলোর সামগ্রিকতা (generality) একেবারে কম তাদের বলা হয়েছে, গৌণ

সংলক্ষণ। এছাড়াও সংলক্ষণের প্রকৃতিগত বিচারে আর এক দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যেমন—**সাধারণ সংলক্ষণ** (common trait) এবং **ব্যক্তিগত সংলক্ষণ** (individual trait)। অর্থাৎ কতকগুলো



সংলক্ষণ সাধারণভাবে সব ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান আর কতকগুলো ব্যক্তির নিজস্ব। তবে এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ সঠিকভাবে সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করতে আমাদের সাহায্য করে না। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌রা এ ধরনের মতবাদকে ত্যাগ করেছেন।

ব্যক্তিসত্ত্বার সংলক্ষণের নামকরণ

সংলক্ষণ সংক্রান্ত আর এক সমস্যা মনোবিদ্‌দের বিশেষভাবে চিন্তিত করেছে, তা হ'ল, তাদের সংখ্যা এবং নাম। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য, এবং দার্শনিক চিন্তাধারায়, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসত্ত্বার সংলক্ষণের বিশেষ বিশেষ নাম করণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নামেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মনোবিদ্ **আলপোর্ট ও ওড্‌বার্ট** (Allport & Odbert) ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত ব্যক্তিসত্ত্বার সংলক্ষণের নামের এক বিশদ তালিকা তৈরী করেছেন। এই তালিকায় প্রায় 17,953টা নামের উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত নামগুলোকে তাঁরা চারটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(1) যেগুলো ব্যক্তিসত্ত্বার প্রকট সংলক্ষণ এবং যেগুলো ব্যক্তিসত্ত্বাকে এককভাবে প্রকাশ করতে পারে। (2) যেগুলো ব্যক্তিসত্ত্বার সাময়িক গুণাবলী প্রকাশ করে। (3) যে সংলক্ষণ গুলোকে সামাজিক এবং চারিত্রিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। (4) যে সব সংলক্ষণের নাম ব্যক্তির দৈহিক গুণ, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে। এই সংলক্ষণের নামের সংখ্যা ইংরাজী শব্দ ভাণ্ডারের (English vocabulary) প্রায় শতকরা $4\frac{1}{2}$ ভাগ। সুতরাং, তাদের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আধুনিককালে, মনোবিদ্‌রা

ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের নাম নিয়ে বেশী মাথা ঘামান না। তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের সংখ্যা নির্ণয় করা।

সংলক্ষণের সংখ্যা—গিলফোর্ড

বর্তমানকালে, রাশিবিজ্ঞানের উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতি (factor analysis) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মনোবিদ্‌দের ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ নির্ণয় করার অনেক সুবিধা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ এই পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ বা উপাদান নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। মনোবিদ্‌ **গিলফোর্ড** (Guilford)[1] এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যক্তিসত্বার তেরটি উপাদান বা সংলক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁর এই 13টি সংলক্ষণ হ'ল— (1) সামাজিক অন্তর্মুখীতা [Social introversion]; (2) চিন্তনমূলক অন্তর্মুখীতা [Thinking introversion], (3) বিষণ্ণতা [Depression]; (4) অস্থিরচিত্ততা [Cycloid tendency]; (5) চিন্তনহীনতা [Rhathymia]; (6) সাধারণ সক্রিয়তা [General activity]: (7) প্রাধান্য-বশ্যতা [Ascendance submission]; (8) পৌরুষ-নারীত্ব [Masculinity-faminity]; (9) হীনমন্যতা [Inferiority], (10) স্নায়বিক দুর্বলতা [Nervousness]; (11) নৈর্ব্যক্তিকতা [Objectivity]; (12) সহযোগিতা [Co-operation] এবং (13) অমায়িক মনোভাব [Agreeableness]।

সংলক্ষণের সংখ্যা—ক্যাটেল

মনোবিদ্‌ **ক্যাটেল** (Cattel)[2] অনুরূপ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে মোট 16টি উপাদান বা সংলক্ষণের কথা বলেন। ক্যাটেলের এই অনুশীলন অনেক বিস্তৃত। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণগুলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং নামকরণ করেন। তাঁর তালিকার বেশীরভাগ সংলক্ষণই দ্বিমুখী। প্রথমতঃ তিনি 12টি সংলক্ষণের কথা বলেন, পরবর্তীকালে, আরো 4টি সংলক্ষণ তিনি বিশ্লেষণ করে আলাদা করতে সক্ষম হন। তাঁর তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

(1) বুদ্ধিমত্তা—ক্ষীনবুদ্ধিতা [General intelligence—Mental defects]

(2) প্রক্ষোভিক আলোড়ন—প্রক্ষোভিক স্থৈর্য্য [Cyclothyma—Schizothyma]

(3) প্রক্ষোভিক স্থায়িত্ব—প্রক্ষোভিক বিকার [Emotional stability—Neuroticism]

---

1. J. P. Guilford & R. B. Guilford
—Journs. of Abnom. & Soc. Psychol. 1934

2. Cattel—Personality.

(4) প্রভুত্ব—বশ্যতা [Dominance—Submission]
(5) উচ্ছ্বাস প্রবণতা—সংযত অভিব্যক্তি [Surgency—Desurgency]
(6) দুঃসাহসিকতা—অন্তর্মুখীতা [Adventurism—introversion]
(7) পরিণত চরিত্র—অপরিণত চরিত্র [Positive character—Immature character]
(8) অনুভূতি প্রবণতা—অননুভূতিমূলক পরিপক্কতা [Emotional sensitivity—Maturity]
(9) সন্দিগ্ধ চাপা মানসিকতা—নির্ভরযোগ্য মুক্ত মানসিকতা [Paranoid Schizothyma—Trustful accessibility]
(10) কৃত্রিমতা—সরলতা [Sophistication—Simplicity]
(11) সন্দিগ্ধচিত্ততা—বিশ্বাস প্রবণতা [Suspiciousness—Trustfulness]
(12) আত্মনির্ভরতা—সঙ্কল্পহীনতা [Self-sufficiency—Lack of resolution]
(13) দায়িত্বহীনতা—ব্যবহারিক সচেতনতা [Prohemianism—Practical conceredness]
(14) পরিবর্তন প্রিয়তা—রক্ষণশীল মনোভাব [Radicalism—Conservatism]
(15) স্নায়বিক উত্তেজনা [Nervous tension]
(16) ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা [Will control and character stability]

এ ছাড়াও বিভিন্ন মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের বিভিন্ন তালিকা দিয়েছেন, মনোবিদ্ **আলপোর্ট** ব্যক্তিসত্বার প্রধান পাঁচ শ্রেণীর সংলক্ষণের কথা বলেছেন ;—বুদ্ধি, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াশীলতার মনোভাব, মেজাজ, আত্মপ্রকাশ এবং সামাজিকতা। আবার মনোবিদ্ **রোজানফ্** (Rosanoff) অপর এক তালিকা দিয়েছেন। সুতরাং এই বিভিন্নতা থেকে বোঝা যায়, মনোবিদ্‌রা এখনও সঠিকভাবে ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারেন নি। এই নিরূপণে যথেষ্ট অসুবিধাও আছে। কারণ, মানুষের কোন আচরণই বিশেষ কোন সংলক্ষণ বা সংলক্ষণের সমন্বয় দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণও কাজ করে, তাই আচরণ বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ সংলক্ষণ (pure traits) নির্ণয় করা খুবই মুশকিল।

আলোচনা

ব্যক্তিসত্ত্বার শ্রেণীবিভাগ [Classification of Personality or Personality Types] :—

বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যক্তিসত্ত্বার শ্রেণীবিভাগ করার রীতি প্রচলিত আছে। মনোবিদ্‌রাও সংলক্ষণের মত ব্যক্তিসত্ত্বাকে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করার কথা বলেছেন। পূর্বে এই শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করে করা হ'ত। যদিও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দিক থেকে এই শ্রেণীবিভাগের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, তবুও সামাজিক মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য এই শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই আধুনিককালে, অনেক মনোবিদ্ এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী। এইভাবে সংলক্ষণ অনুযায়ী ব্যক্তিসত্ত্বার শ্রেণীবিভাগ করাকে বা বিশেষ কোন ব্যক্তিসত্ত্বার উপর কোন গুণ আরোপ করাকে বলা হয় **ব্যক্তিসত্ত্বার টাইপ** (personality type)। ব্যক্তিসত্ত্বার এই শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন দিক থেকে করেছেন। এ রকম কয়েকটা শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ব্যক্তিসত্ত্বার টাইপ কি ?

বিখ্যাত মনোবিদ্ **ইয়ুঙ্** (Jung), ব্যক্তিসত্ত্বাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একদল লোক দেখা যায় যারা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে চায় এবং তা পারেও। এরা সব সময় প্রাণ খোলা। এরা বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা না করতে পারলে তৃপ্তি পায় না। ইয়ুঙ্ বলেছেন, এদের প্রাণশক্তি (libido যে অর্থে ইয়ুঙ্ ব্যবহার করেছেন)। বহির্জগতে অভিক্ষিপ্ত, এবং নিজেকে বাইরের জগতে প্রকাশ করতে পেরে এরা তৃপ্তি লাভ করে। এই রকম ব্যক্তিসত্ত্বাকে তিনি নাম দিয়েছেন **বহির্মুখী ব্যক্তিসত্ত্বা** (extrovert type personality)। আবার একদল লোক দেখা যায়, যারা বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় মগ্ন থাকতে ভালবাসে। অর্থাৎ, ইয়ুঙের মত অনুযায়ী এদের প্রাণশক্তি অন্তর্মুখী। এরা সামাজিক মেলামেশা থেকে যতটা সম্ভব নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে এবং নিজস্ব আন্তরিক জগতের সীমার মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে ভালবাসে। এই ধরনের ব্যক্তিসত্ত্বার ইয়ুঙ্ নাম দিয়েছেন **অন্তর্মুখী ব্যক্তিসত্ত্বা** (Introvert type personality)। কিন্তু এই দু'ধরনের চরম মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিসত্ত্বার সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ বাস্তবে খুব কম লোক থাকে যাদের আমরা এই দুটো শ্রেণীর যে কোন একটাতে ফেলতে পারি। বেশীরভাগ ব্যক্তিই এর মধ্য-অবস্থা অবলম্বন করে। অর্থাৎ, তারা চরমভাবে বহির্মুখীও নয় বা অন্তর্মুখীও নয়। এই ধরনের ব্যক্তিসত্ত্বাকে বলা হয় **উভমুখী ব্যক্তিসত্ত্বা** (ambivert-type personality)। এরা

ইয়ুঙের শ্রেণীবিভাগ

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন করতে পারে। ব্যক্তিসত্ত্বার সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকেই এরা আদর্শ স্থানীয়।

ক্রেৎসমার (Kretschmer), বিভিন্ন মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। পরে ঐ সব দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি সুস্থ ব্যক্তিদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখেন। এই তুলনামূলক বিচার থেকে তিনি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিসত্বাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেন। **পিক্‌নিক্** (Pyknik), **এ্যাস্থেনিক** (Aesthenic), **হাইপোপ্ল্যাস্টিক** (Hypoplastic) এবং **অ্যাথ্‌লেটিক** (Athletic)।

ক্রেৎসমারের শ্রেণীবিভাগ

যারা বেঁটে এবং মোটা তাদের **ক্রেৎসমার** বলেছেন পিক্‌নিক্ (pyknik)। মানসিক দিক থেকে এরা চরমভাবে অনুভূতিপ্রবণ। যখন উত্তেজিত হয় তখন খুব বেশী রকম উত্তেজিত হয়, আবার যখন নিরুৎসাহ হয় খুব বেশী রকম ঝিমিয়ে পড়ে। এই সব ব্যক্তিদের Manic-depressive-psychoses রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরা অন্যের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। যারা লম্বা-রোগা এবং মানসিকতার দিক থেকে সংযত এবং আদর্শবাদী তাদের ক্রেৎসমার বলেছেন **অ্যাস্থেনিক টাইপ** (Aesthenic type)। এরা খুব স্বাবলম্বী হয়, তবে বাস্তব থেকে সব সময় দূরে সরে থাকতে চায়। যাদের দৈহিক গঠন সুদৃঢ় এবং মানসিকতার দিক থেকে সাম্য বজায় রাখে তাদের বলা হয় অ্যাথ্‌লেটিক্ টাইপ (Athletic type)। সবশেষে, যাদের দৈহিক গঠন ঠিকমত হয় নি এবং যারা সব সময় হীনমন্যতা বোধে ভোগে তাদের ক্রেৎসমার বলেছেন, **হাইপোপ্ল্যাস্টিক টাইপ** (Hypoplastic type)।

সেলডন এবং **স্টিভেন্স** (Sheldon & Stevens) বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর ব্যক্তিসত্বাকে দৈহিক গঠনের দিক থেকে তিন শ্রেণীতে এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও সমান্তরাল তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। দৈহিক গঠনের দিক যে তিনটে শ্রেণীতে তাঁরা ব্যক্তিসত্বাকে ভাগ করেছেন, তা হ'ল—(1) **এণ্ডোমর্ফ** (Endomorph)—এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ক্রেৎসমারের শ্রেণীবিভাগের পিক্‌নিক্‌দের মত। মোটাসোটা গোলাকার দেহ ; পেট বেশী মোটা এবং নরম দেহ। (2) **মেসোমর্ফ** (Mesomorph)—এদের কাঁধ চওড়া হয় এবং দেহ পেশী খুব কঠিন হয়। (3) **এক্টোমর্ফ** (Ectomorph)—এরা রোগা এবং দুর্বল হয় ; শরীরে হাড় এবং চামড়ারই প্রাধান্য দেখা যায়, মানসিক গঠনের দিক থেকে তিনটে শ্রেণী হ'ল—(1) **ভিসেরোটনিক** (Vicero-tonic)—এরা আরাম প্রিয়, ভোজন বিলাসী এবং খুব হৈ চৈ পছন্দ করে। এরা সাধারণতঃ দেহ গঠনের দিক থেকে এণ্ডোমর্ফ টাইপের। (2) **সোমা-**

সেলডনের শ্রেণীবিভাগ

টোটনিক (Somatotonic)—এরা অধ্যাবসায়ী, প্রভুত্ব করতে ভালবাসে এবং উত্তেজনা পছন্দ করে। দৈহিক গঠনের দিক থেকে মেসোমর্ফ টাইপের। (3) **সেরিব্রোটনিক** (Cerebrotonic)—এরা সাধারণতঃ অসামাজিক। এদের মধ্যে আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। এরা দৈহিক গঠনের দিক থেকে এক্টোমর্ফ দলভুক্ত। **সেলডন** (Sheldon) গাণিতিক পদ্ধতির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে **সহগতি** (correlation) বের করে সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষের দেহগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মনোগত বৈশিষ্ট্যের একটা নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে, অন্যান্য মনোবিদ্ তাঁর এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন।

মনোবিদ্ **ফ্রয়েদ্** বিশেষ এক দিক থেকে ব্যক্তিসত্বার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ফ্রয়েদ্ মানুষের যৌনশক্তি (libido) বিকাশের ধারার বিভিন্ন পর্য্যায় অনুযায়ী ব্যক্তিসত্বার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। অর্থাৎ,

ফ্রয়েদের শ্রেণীবিভাগ

ব্যক্তির যৌনতার (sexuality) দিক থেকে এই শ্রেণী-বিভাগ। যৌন জীবনের বিকাশের পথে বিশেষ বাধা বা নিয়ন্ত্রণ থেকে এই ধরনের ব্যক্তিসত্বার সৃষ্টি হয়। যেমন—

প্রথমতঃ মৌখিক রতি প্রবণতার শ্রেণী (oral erotic type)—যৌন শক্তির (libido) বিকাশের প্রথম পর্য্যায়ে, শিশু তার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে চোষণের (sucking) দ্বারা চরিতার্থ করে। সেই অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির বিকাশ স্থিরিকৃত (fixation) হয়, তা'হলে তার এই ধরণের ব্যক্তিসত্বা গড়ে ওঠে। এদের বৈশিষ্ট্য হ'ল—এরা নৈরাশ্যবাদী এবং হিংসা পরায়ণ হয়। আমরা জীবনের ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শিশুদের মত আচরণ করি। ফ্রয়েদ্ এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের আবার দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সক্রিয় টাইপ (active oral type) এবং নিষ্ক্রিয় টাইপ (passive oral type)। আপাততঃ আমাদের এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

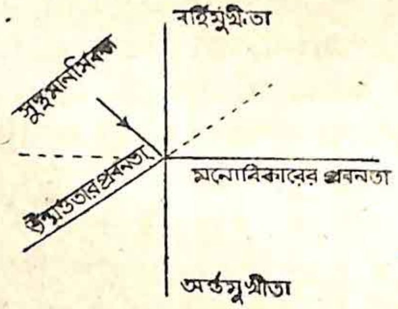
দ্বিতীয়তঃ পায়ু-রতিমূলক টাইপ (Anal erotic type) যৌনতা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ যৌন আকাঙ্ক্ষা যখন পায়ুর সক্রিয়ার মাধ্যমে চরিতার্থ হয়, তখন যদি কারো যৌন শক্তি স্থিরিকৃত হয়, তা'হলে তারা এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। এই ধরনের ব্যক্তিসত্বাকেও আবার ফ্রয়েদ্ দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক দল থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ধর্ষণকামী এবং অপর দল সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়। প্রথম দল বিশেষভাবে অনেক কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

তৃতীয়তঃ উপস্থ টাইপ (Genital type)—এই ধরনের ব্যক্তিসত্বার অধিকারীদের যৌন জীবন স্বাভাবিক হয় এবং তারা স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

ব্যক্তিসত্বাকে শ্রেণী বিভাগ করার রীতি এবং ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন টাইপে

ভাগ করার রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌ **হিপোক্রেটস্‌** (Hippocrates) থেকে শুরু করে আধুনিক অনেক মনোবিদ্‌ পর্য্যন্ত অনেকেই বিভিন্নভাবে ব্যক্তিসত্ত্বার টাইপ নির্ণয় করেছেন। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই শ্রেণীবিভাগ তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে করেছেন। সেই সব শ্রেণীবিভাগের নমুনা হিসাবে আমরা কয়েকটার উল্লেখ করলাম মাত্র। 1953 সালে, মনোবিদ্‌ **আইজাঙ্ক**[1] (Eysenck) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের রীতি অনুশীলন করার পর ব্যক্তিসত্ত্বার শ্রেণীবিভাগের এক নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। তিনি ব্যক্তিসত্ত্বাকে বিভিন্ন টাইপে ভাগ না করে, তিনি বললেন, ব্যক্তিসত্ত্বার তিনটে মৌলিক উপাদান আছে। এই উপাদানগুলোকে তিনি ব্যক্তিসত্ত্বার

আইজাঙ্ক-এর ব্যক্তিসত্ত্বার মাত্রা



মাত্রা (dimensions of personality) বলেন। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্ত্বার প্রকাশ এই ত্রিমাত্রিক পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই তিনটে মাত্রা হ'ল—(1) **অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতা (Introversion-extroversion)** ; (2) **মনোবিকার প্রবণতা (Neuroticism)** এবং (3) **উন্মত্ততার প্রবণতা (Psychoticism)**। এই তিনটে উপাদান, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যেই থাকে ; এই ত্রিমাত্রিক তলে ব্যক্তির অবস্থান তার ব্যক্তিসত্ত্বার বৈশিষ্ট্যকে নির্ণয় করে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য এই মতানুযায়ী, শ্রেণীগত নয় ; মাত্রাগত। উপরের ছবিতে এই মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হ'ল।

ব্যক্তিসত্ত্বাকে বিভিন্ন টাইপে শ্রেণীবিভাগ করা বিজ্ঞান সম্মত কি না এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিদ্‌রা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যক্তির আন্তরিক জৈব মানসিক প্রবণতার সমন্বয়ে গঠিত, তাই তাকে বাহ্যিক কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। তাছাড়া ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যক্তির নিজস্বতার পরিচায়ক, তাই তাকে কোন বিশেষ টাইপের শ্রেণীভুক্ত করা

আলোচনা

1. Eysenck : Dimensions of personality.

অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তিসত্ত্বার ধারণারই বিপরীত। তাই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে আইজাঙ্ক-এর (Eysenck) ত্রি-মাত্রিক ব্যক্তিত্বের বিবরণকে আধুনিক মনোবিদ্‌রা বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে করেন।

ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ [Mesurement of Personality] :—

মনোবিদ্‌রা বহুদিন থেকে এই ব্যক্তিসত্ত্বাকে সার্থকভাবে পরিমাপ করার চেষ্টা করে আসছেন। প্রাচীনকালে ব্যক্তিসত্ত্বাকে অনুশীলনের রীতি বিশেষ-ভাবে পর্যবেক্ষণের (observation) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিসত্ত্বার মত আন্তরিক এবং জটিল সংগঠনকে শুধুমাত্র বাহ্যিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না। ব্যক্তিসত্ত্বাকে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হ'লে এই পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন করার দরকার তেমনি এই সব পর্য্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও বৈজ্ঞানিকরীতি থাকার দরকার। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক মনোবিদ্‌রা ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। মনোবিদ্ আলপোর্ট প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করে মোট 14 রকমের পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই 14টা শ্রেণী হ'ল—(1) **সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলন** [Studies of cultural setting]; (2) **দৈহিক বিবরণ** [physical record], (3) **সামাজিক বিবরণ** [social record]; (4) **ব্যক্তিগত বিবরণ** [personal record]; (5) **প্রকাশমান আচরণ অনুশীলন** [expressive movement]; (6) **রেটিং** [rating]; (7) **আদর্শায়িত অভীক্ষা** [standardized test]; (8) **রাশিবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ** [statistical analysis]; (9) **নকল জীবন পরিস্থিতিতে পর্য্যবেক্ষণ** [miniature life situation]; (10) **পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ** [laboratory experiment]; (11) **সম্ভাবনামূলক সিদ্ধান্ত** [prediction]; (12) **গভীরতা বিশ্লেষণ** [depth analysis]; (13) **আদর্শ টাইপের অনুশীলন** [ideal type]; (14) **সংশ্লেষক পদ্ধতি** [synthetic method]। এই বিভিন্ন শ্রেণীতে আলপোর্ট প্রায় বাহান্ন রকম অনুশীলনের পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই সব পদ্ধতির পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাই আমরা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করবো। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখার দরকার কোন একটা বিশেষ পদ্ধতি দিয়ে, ব্যক্তিসত্ত্বাকে পরিপূর্ণভাবে জানা যায় না। ব্যক্তিসত্ত্বাকে জানতে হ'লে, একসঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন।

ব্যক্তিসত্ত্বা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলনের (studies of cultural

setting) মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিসত্ত্বার প্রত্যক্ষ পরিমাপ করতে পারি না। শুধু, যে পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ হচ্ছে, তাই অনুশীলন করি মাত্র। আর এই অনুশীলন থেকে আমরা ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে পরোক্ষ ধারণা করতে পারি। মনোবিদ্‌রা মনে করেন ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ অনেকাংশে সমাজপরিবেশের উপর নির্ভর করে। সমাজপরিবেশের অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপের জন্ত আমরা বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে থাকি। যেমন—

সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলন ও ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ

(1) সামাজিক মূল্যমান (social norm) অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার পর্য্যবেক্ষণের পদ্ধতির প্রবর্তন করেন **শেরিফ্‌** (Sherif)। তাঁর মতে ব্যক্তি-সত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে সামাজিক মানের একটা সম্পর্ক আছে। সুতরাং কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বাকে তার সমাজের মূল্যমান (norm) অনুশীলন করলে, জানা যেতে পারে। (2) সামাজিক পরিস্থিতির অন্ত একদিকের অনুশীলনের কথা বলেছেন, দার্শনিক **মিল** (Mill)। তিনি বলেন, সমাজের ভাষা, প্রবাদ ইত্যাদির ব্যক্তিসত্ত্বার উপর প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং, তাদের অনুশীলন করলে, ঐ সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে জানা যাবে। এই ধরনের পরিমাপের পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হ'ল এদের দ্বারা ব্যক্তিসত্ত্বার পরোক্ষ পরিমাপ পাওয়া যায় মাত্র। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে একক ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ করার কোন ইঙ্গিত নেই। ব্যক্তিসত্ত্বার উপর সামাজিক প্রভাবেরই পরিমাপ করা হয় মাত্র। তার নিজস্ব একক বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা যায় না।

অনেকে, দৈহিক গঠন ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিসত্ত্বাকে অনুশীলন করতে চেয়েছেন। বিভিন্নভাবে এই দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে অনুশীলন করে ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন—ব্যক্তির বংশগতির বিশ্লেষণ (analysis of heredity), মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন, গ্রন্থির ক্রিয়া ইত্যাদি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন, দৈহিক কাঠামোর অনুশীলন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দৈহিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

দৈহিক গঠন ও ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ

ব্যক্তিসংক্রান্ত সামাজিক বিবরণ (social record) ব্যক্তিসত্ত্বার অনুশীলনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বিভিন্ন সমাজ পরিস্থিতিকে ব্যক্তি কি ভাবে আচরণ করে, তার বিবরণ বিভিন্ন সংস্থার কাজ থেকে সংগ্রহ করা যায়। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছ থেকে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ব্যক্তির কর্ম পরিস্থিতির

সামাজিক বিবরণ ও ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ

(work situation) বিভিন্ন আচরণকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণ সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া ব্যক্তির সমাজ পরিস্থিতিতে আচরণের বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের কৌশল (socio metric technique) আছে, যেগুলোর দ্বারা ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌশল (soci-graw) দ্বারাও আমরা ব্যক্তি মনোপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারি। মনোবিদ্ **মাকৃহাও** (Muchow), **লিউইন** (Lewin) এই ধরনের পরিমাপক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ব্যক্তিগত বিবরণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তির আন্তরিক জৈব মানসিক প্রবণতার ঐক্যের মাধ্যমে গঠিত হয়। সুতরাং, ব্যক্তিসত্তাকে জানতে হ'লে, দৈহিক এবং সামাজিক বিবরণ ছাড়া ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানার প্রয়োজন। ব্যক্তি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিবরণ (personal record) তার রোজনাম্‌চা (diaries), ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র (personal correspondance) এবং নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে লেখা (thematic writing) থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উন্নত পদ্ধতিতে **সাক্ষাৎকারের** (interview) সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়।

প্রকাশমান আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

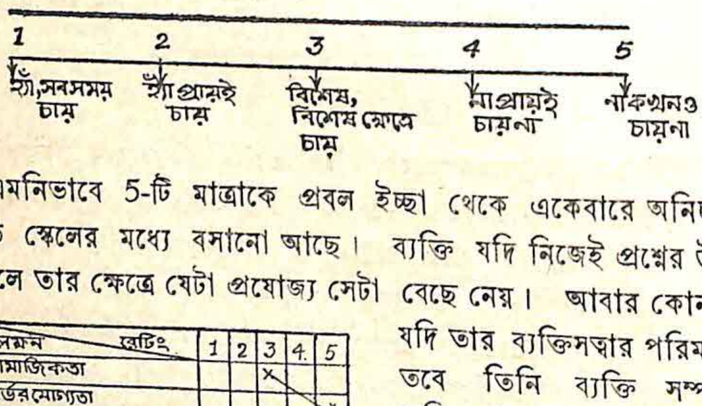
ব্যক্তির **বর্হিআচরণ (Expressive behaviour)** ও তার ব্যক্তিসত্তার অনেক সংলক্ষণকে মূর্ত করে তোলে। সুতরাং, এই সব বাহ্যিক আচরণ অনুশীলন করে, তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বর্হিআচরণ অনুশীলন সম্পর্কে **আলপোর্ট** এবং **ভার্ণন** (Allport & Vernon) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই বাহ্যিক আচরণকে বিভিন্ন দিক থেকে অনুশীলন করা যায়। প্রথম ধারণা (first impression) থেকে, ব্যক্তির আঁকা ছবি দেখে, ব্যক্তির সামগ্রিক আচরণকে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে (pattern analysis) এবং ব্যক্তির আচরণের নিজস্ব ভঙ্গীমা (style) বিশ্লেষণ করে, ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ থেকে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

রেটিং স্কেল ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

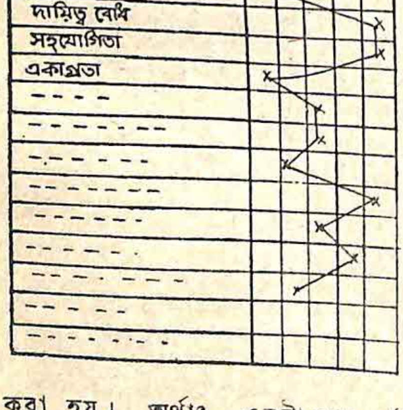
বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রেটিং স্কেলের (Rating scale) দ্বারা ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত। সাধারণতঃ রেটিং স্কেল তিন রকমের ব্যবহার করা হয়। (1) **আপেক্ষিক মূল্যনির্ণায়ক স্কেল** (Rank order scale)। এই ধরনের স্কেলে ব্যক্তির তুলনামূলকভাবে আপেক্ষিক পরিমাপ পাওয়া যায়। একজন আর একজনের চেয়ে ভাল কি খারাপ তাই বোঝা যায় মাত্র।

কিন্তু এই ধরনের স্কেলে, ব্যক্তিসত্ত্বার প্রত্যক্ষ পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া এই পরিমাপ হয় গুণগত (qualitative), পরিমাণগত (quantitative) নয়। তাই এর পরিবর্তে আজকাল বিশেষ (2) **সাংখ্যমান সম্বলিত রেটিং স্কেল** (Scoring scale) ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের স্কেলে, কোন বিশেষ সংলক্ষণকে (trait) পরিমাণগত দিক থেকে তিনটে অথবা পাঁচটা বিন্দুতে একই অবিচ্ছিন্ন মাপনিতে স্থাপন করা হয়। এখন এই মাপনি বা স্কেলে, ব্যক্তি নিজে, বা অপর কোন পরীক্ষার তার বিশেষ একটা সংলক্ষণের পরিমান নির্দেশ করেন। যেমন, আমরা প্রাধান্য বশ্যতা (Ascendance submission) নামে সংলক্ষণকে পরিমাপ করতে চাই। এখন আমাদের রেটিং স্কেলে প্রশ্ন ও ঐ সংলক্ষণকে পরিমাপ করার জন্য নিম্নরূপে পরিবেশন করা হয়।

প্রশ্ন : **লোকটি (আপনি) কি অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় (চান)?**



এমনিভাবে 5-টি মাত্রাকে প্রবল ইচ্ছা থেকে একেবারে অনিচ্ছা পর্যান্ত বিস্তৃত স্কেলের মধ্যে বসানো আছে। ব্যক্তি যদি নিজেই প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহ'লে তার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য সেটা বেছে নেয়। আবার কোন পরীক্ষক, যদি তার ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ করেন, তবে তিনি ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে, ব্যক্তির বিশেষ সংলক্ষণকে পরিমাপ করেন। এমনিভাবে ব্যক্তির বিভিন্ন সংলক্ষণকে সংখ্যাগত দিক থেকে পরিমাপ করা যায়। এ ছাড়া ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের রেটিং পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয়, (3) মানসিক বৈশিষ্ট্যের **লেখচিত্র** (Psychograph)। এখানে লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যক্তিসত্ত্বার সমস্ত রকম সংলক্ষণের পরিমাণ নির্দেশ



করা হয়। অর্থাৎ, একটা ছক কাটা কাগজে, একদিকে থাকে ব্যক্তির বিভিন্ন

সংলক্ষণের (trait) তালিকা। এবং তাদের প্রত্যেকের পাশে পাশে তিন, চার বা পাঁচ পয়েণ্টের একটা স্কেল থাকে। ব্যক্তির প্রত্যেকটা সংলক্ষণকে ঐ স্কেলে পর পর যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়। এখন, এই বিভিন্ন বিন্দু বা চিহ্ন (×) গুলো যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায়, তা ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের সামগ্রিক রূপ। একেই বলা হয় মানসিক বৈশিষ্ট্যের লেখচিত্র (psycho graph)। এটাই তার ব্যক্তিসত্বার সামগ্রিক রূপ বলা যেতে পারে। এই ধরনের লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণের পরিবেশনের রীতি আজকাল বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশেষভাবে নির্দেশনার (guidance) ক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই রেটিং পদ্ধতিকে আরো বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য, বর্তমানে মনোবিদ্‌রা বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এবং এর সাংখ্যমান দেওয়ার পদ্ধতিকে গাণিতিকভাবে নির্ভুল করার জন্যও প্রচেষ্টা চলছে।

রেটিং স্কেল ছাড়া বর্তমান কালে, ব্যক্তিসত্বা পরিমাপের জন্য আদর্শায়িত অভীক্ষার (standardized test) ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অভীক্ষা বিভিন্ন ধরনের আছে। এই সব অভীক্ষাগুলোর সুবিধা হ'ল এদের দ্বারা আমরা একটা সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ করতে পারি। এই সব অভীক্ষাগুলো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কতকগুলো থাকে **প্রশ্নগুচ্ছের** (questionnaire) আকারে, এই সব প্রশ্নগুচ্ছ, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নয়।

আদর্শায়িত অভীক্ষা—প্রশ্নগুচ্ছ

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা এদের আদর্শায়িত করা হয়েছে। তাই এদের শুধুমাত্র প্রশ্নগুচ্ছ (questionnaire) না বলে অনেকে **আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছ** (standardized questionnaire) বা **ইনভেণ্টরী** (inventory) বলা হ'য়ে থাকে। এই সব প্রশ্নগুচ্ছে, ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকে। এই প্রশ্নগুলো বিশেষভাবে ব্যক্তিগত প্রকৃতির (personal nature)। ব্যক্তিকে এই ধরনের একটা ছাপা প্রশ্নগুচ্ছ দিয়ে, তার উত্তর করতে বলা হয়। সাধারণতঃ সাক্ষাৎকারে, ব্যক্তিসত্বা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন করা হয়, সেই প্রকৃতির প্রশ্ন এখানে থাকে। কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়ার সুবিধা হ'ল, ব্যক্তি সাক্ষাৎকারে (interview) অনেক সময় সঙ্কোচের দরুন প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে গোপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে যদি তাকে বলা হয়, তার উত্তর সব সময় গোপন রাখা হবে, তাহ'লে অনেকটা সঙ্কোচ কমে যায়। ফলে এই ধরনের অভীক্ষায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে অনেক তথ্য নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারে। এই রকম প্রশ্নগুচ্ছ, দু'ধরনের হয়। কোন কোন আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির কোন বিশেষ সংলক্ষণ (trait) সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। যেমন মনোবিকার নির্ণায়ক প্রশ্নগুচ্ছ

(neurotic questionnaire)। এই প্রশ্নগুচ্ছে, মনোবিকার (neuroticism) সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছাপা থাকে। ব্যক্তিকে বলা হয় ঐ সব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে, যেগুলো তার পক্ষে প্রযোজ্য সেগুলো 'হ্যাঁ' এবং যে গুলো প্রযোজ্য নয়, সে গুলোকে 'না' বলে উত্তর দেয়। এই সব উত্তর থেকে ব্যক্তির ঝোঁক কোন দিকে তা বোঝা যায়। এমনি, বিভিন্ন রকমের প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির এক একটা সংলক্ষণ (trait) পরিমাপ করা যায়। যেমন অন্তর্মুখীতা বহির্মুখীতার প্রশ্নগুচ্ছ (extroversion-introversion questionnaire), বশ্যতা প্রাধান্যের প্রশ্নগুচ্ছ (ascendance submission questionnaire) ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু প্রশ্নগুচ্ছ আছে, যার দ্বারা একসঙ্গে ব্যক্তিসত্বার অনেকগুলো সংলক্ষণকে পরিমাপ করা যায়। এইগুলো অনেক সময় ইন্‌ভেণ্টরী (inventory) বলা হয়। যেমন, মিনেসোটা ব্যক্তিসত্বার ইনভেণ্টরী (minnesota multiphasic personality inventory, M. M. P. I.), বার্ণরয়টার-এর অভীক্ষা (Burnreuter test) ইত্যাদি। এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছের আজকাল আরও উন্নতি করা হচ্ছে। অনেক সময় উত্তর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ', 'না' মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কতকগুলো সম্ভাব্য উত্তর দিয়ে তার মধ্যে নির্বাচন করতে বলা হয়। এই রূপে ব্যক্তির উত্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

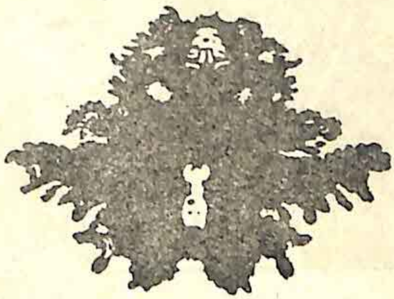
এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছ সম্বলিত অভীক্ষার প্রধান অসুবিধা হ'ল পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে গোপন করতে পারে। ফলে তার ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিমাপের জন্য আজকাল বিশেষ এক ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় যাদের বলা হয় **প্রতিফল অভীক্ষা বা অভিক্ষেপক অভীক্ষা** (projective test)। এই সব অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে কতকগুলো সমস্যা পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করা হয়, এবং সেগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই ধরনের অভীক্ষার মূল ভিত্তি হ'ল—ব্যক্তি তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজের মানসিক বৈশিষ্ট্যকে অভিক্ষেপ (project) করে, সুতরাং, তার প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে, তার ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণ সম্পর্কে জানা যায়, এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিসত্বার সংগঠন সম্পর্কেও জানা যায়। এই ধরনের বিভিন্ন অভিক্ষা বর্তমানকালে বহুপ্রচারিত আছে। যেমন—

আদর্শায়িত অভীক্ষা—প্রতিফলন অভীক্ষা

(1) **শব্দ অনুষঙ্গের অভীক্ষা (Word Association Test)**—এই অভীক্ষায় অভিক্ষেপণের নীতি খুব সহজভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই অভীক্ষায় কতকগুলো শব্দের একটা তালিকা থাকে ; পরীক্ষার্থীকে এক একটা শব্দ বলা

হয়, এবং শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে যে কথা আসে তা বলতে বলা হয়। প্রতিক্রিয়ার সময় (reaction time) এবং প্রতিক্রিয়া বা উত্তরের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এই অভিক্ষা থেকে জানা যায়।

(2) রসাক্-ইঙ্ক্-ব্লট্ অভীক্ষা (**Rorschach Ink blot test**)—এই অভীক্ষায় কতকগুলো অর্থহীন নক্সা কার্ডে ছাপা থাকে। এই সব নক্সাগুলো শুধুমাত্র কালি ছেপে তৈরী করা। সুতরাং, এগুলো বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আঁকা নয়। এই অভীক্ষার কার্ডগুলো এক একটা করে ব্যক্তিকে



দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় ছবির মধ্যে যা দেখছে তা প্রকাশ করতে। এমনিভাবে দশটি কার্ডের প্রত্যেককে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে বলা হয়। এর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের মনের সংগঠনের প্রতিফলন হয়। ব্যক্তির এই প্রতিক্রিয়াগুলোকে বিশ্লেষণ করে, তার মানসিক সংগঠন সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

(3) থিম্যাটিক অ্যাপারসেপসান অভীক্ষা (**Thematic Apperception Test**)—এই অভীক্ষায় ছবিগুলো অর্থহীন থাকে না। বিশেষ অর্থপূর্ণ ছবি বা ফটো থাকে। বিভিন্ন ছবিগুলো ভিন্ন ভিন্ন কার্ডে ছাপা থাকে। মনোবিদ্ মারে (Murry) প্রবর্তিত এই অভীক্ষায় মোট 32টি কার্ড আছে। এই 32টা কার্ডের সবগুলো প্রয়োগ করার প্রয়োজন সব সময় হয় না। আংশিকভাবেও প্রয়োগ করা যায়। এই এক একটা কার্ড ব্যক্তিকে দিয়ে, ছবিকে কেন্দ্র করে পূর্বাপর শব্দ রেখে একটা গল্প রচনা করতে বলা হয়। এখানেও পরীক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দেখা গেছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাহিনীর বিশেষ একটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করে। সুতরাং তার এই কাহিনীগুলোকে বিশ্লেষণ করে, ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

যদিও এই সব ধরনের প্রতিফলিত অভীক্ষা ব্যক্তিসত্তার পরিমাপে আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহ'লে এরা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন হয়। এই



সব অভীক্ষার দ্বারা বিশেষ কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়, কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করতে না পারলে, ব্যক্তিসত্বা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় না।

আজকাল ব্যক্তিসত্বার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য রাশি বিজ্ঞানের কৌশল (statistical analysis) ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ (Factor analysis) পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করার চেষ্টা আধুনিক মনোবিদ্‌রা করছেন। এই ধরনের পদ্ধতিকে আমরা পরিপূর্ণ পদ্ধতি বলতে পারি না। কারণ, উপাদান বিশ্লেষণের জন্য, ব্যক্তিকে কোন না কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা দিতে হয়। এই অভীক্ষার স্কোরকে রাশি-বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই এই ধরনের ব্যক্তিসত্বার অনুশীলনের পদ্ধতিকে সহায়ক পদ্ধতি (auxilary method) বলা যেতে পারে। তাছাড়া, এই পদ্ধতির দ্বারা কতকগুলো সাধারণ সংলক্ষণের (common trait) অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় মাত্র, ব্যক্তির নিজস্বতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। অনেক মনোবিদ্ আবার, এই উপাদান বিশ্লেষণের (Factor analysis) উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরী করেছেন। যেমন—**গিলফোর্ড জিমারম্যানের**

রাশি-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ

অভীক্ষা, ক্যাটেলের **অভীক্ষা** ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে, এই সব অভীক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ।

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অভীক্ষা কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করার চেষ্টা করে। তাই অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য **সংক্ষিপ্ত জীবন পরিবেশ** (Miniature life situation) সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুশীলন করার কথা বলেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে হ'লে তাকে তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিচার করতে হবে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণকে অনুশীলন করার জন্য, একটা বিশেষ সময়ে তার প্রাত্যহিক কাজ লক্ষ্য করা হয় ; এই অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের সামঞ্জস্যতা (consistancy) সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় একটা ক্ষুদ্রাকারের কর্মপরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ব্যক্তিসত্তার প্রতিক্রিয়ার অনুশীলন করে, তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

জীবন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি (Laboratory experiment) প্রয়োগ করে থাকেন। এই সব পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংবেদনগত ও অনুভূতিমূলক দিক বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায়।

পরীক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

আবার, অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের (prediction) ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অনুমান নির্ভর বলে, এর থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং, এই পদ্ধতি থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

অনুমান ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

এছাড়া, ব্যক্তিসত্তার টাইপ (type) অনুশীলন করে, অনেক সময় তাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ব্যক্তিকে আদর্শ টাইপের (ideal type)' দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করার মধ্যে যে বিভিন্ন ত্রুটি আছে, সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আদর্শ টাইপ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

ফ্রয়েদ্ (Freud) এবং তাঁর অনুগামী মনোবিদ্‌রা ব্যক্তিসত্তা অনুশীলনের জন্য বিশেষ ধরনের এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যাকে বলা হয় গভীরতা অনুশীলন (depth analysis)। এই মত অনুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের মূলে আছে অবচেতন মন (unconscious mind)। এই অবচেতন মনকে অনুশীলন করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যেমন—

গভীরতা বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

বিশেষ ধরনের সাক্ষাৎকার (psychiatric interview), মুক্ত অনুষঙ্গ (free-association), স্বপ্ন বিশ্লেষণ (dream analysis), সম্মোহন (hypnotism) ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মনোবিদ্ **মারে** (Murry), এই সব পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

সংশ্লেষক পদ্ধতি

অনেক মনোবিদ্ মনে করেন, ব্যক্তিসত্বাকে বিশ্লেষণ করে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে অনুশীলন করলে, তার সংগঠন (organisation) সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা জন্মে না। তাই তার পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তিসত্বা অনুশীলনের সামগ্রিক পদ্ধতি (synthetic methods) গুলোর কথা বলেছেন। এই ধরনের পদ্ধতির মধ্যে একটা হ'ল indentification। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপ অপর একজন ব্যক্তি অনুশীলন করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। পরে পরীক্ষামূলক ভাবে আবার ঐ ব্যক্তিকে ঐ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করা হয়। এই সব পদ্ধতির মধ্যে কেস্‌হিষ্ট্রি (Case History) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্বার সামগ্রিক রূপ পরিমাপ করা যায়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির জন্ম থেকে শুরু করে জীবন বিকাশের বর্তমান স্তর পর্যন্ত সব কিছু অনুশীলন করা হয়। এবং সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্বা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যক্তিসত্বা পরিমাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হ'ল কেস্ হিষ্ট্রি পদ্ধতি। মনোবিদ্ **আলপোর্ট** (Allport) এই পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন—"It provides a frame work, within which psychologist can place all his observations gathered by other methods ; it is his final affirmation of the individuality and uniqueness of personality. It is a completely synthetic method the only one that is spacious enough to embrace all assembled facts."[1]

আলোচনা

আমরা ব্যক্তিসত্বা অনুশীলনের যে বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করলাম, তার মধ্যে কোন একটার দ্বারা ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বা তার নিজস্বতার পরিচায়ক। সুতরাং, কোন বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা সব মানুষের ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ করা যাবে, এই ধারণাই ভুল। তাই কোন বিশেষ পদ্ধতিকে ব্যক্তিসত্বার পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। মনোবিদ্ **আলপোর্ট** (Allport) মন্তব্য করেছেন, '.. There are many ways to study man psychologically. Yet to study

I. Allport : Personality—a psychological interpretation.

him most fully is to take him as an individual. He is more than a bundle of habits; more than a nexus of obstract dimensions; more too than a representative of his species. He is more than a citizen of state, more than a mere incident in the gigantic movements of mankind. He transcends them all"[1] সুতরাং ব্যক্তিসত্ত্বা অনুশীলন করতে হ'লে বিভিন্ন দিক থেকে তাকে বিচার করতে হবে; বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তারপরে মনে রাখতে হবে, যেটুকু আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছি, তাই সম্পূর্ণ নয়; তাই শেষ নয়।

ব্যক্তিসত্ত্বা ও শিক্ষা [Personality & Education]:—

শিশুর জন্মাবস্থায় কোন ব্যক্তিসত্ত্বা থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অভিযোজন করতে গিয়ে সে কতকগুলো স্বতন্ত্র আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এর ফলে তার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ শুরু হয়। এই ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যক্তির বংশগত (heredity) এবং পরিবেশের (environment) পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। সুতরাং, ব্যক্তিসত্ত্বার প্রকৃতি নির্ণয়ে, পরিবেশের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা-পরিবেশ বা বিদ্যালয়, শিশু জীবন পরিবেশের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই তার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ অনেকাংশে তার বিদ্যালয় পরিবেশ বা শিক্ষা-পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ **স্যার পার্সি নান্** (Nunn) শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality) বলতে যা বুঝাতে চেয়েছেন, তা ব্যক্তিসত্ত্বারই নামান্তর মাত্র। তাহ'লে এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ

সুতরাং ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না; আর এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের সামগ্রিক সুযোগ করে দিতে হবে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নের মাধ্যমে এবং নূতন পরিস্থিতিতে অভিযোজনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ হয়। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্ত্বার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য, তাদের নূতন নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসক্রিয়ার সুযোগও করে দিতে হবে। আত্মসক্রিয়তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ভাবে

ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

1. Allport : Personality—a psychological interpretation.

পঞ্চম অধ্যায়

মনঃপ্রকৃতি

[TEMPERAMENT]

ব্যক্তিসত্বার স্বাতন্ত্র্য একদিকে যেমন ব্যক্তির নিজস্ব বিশেষ বিশেষ মনোভাব (attitude), সেন্টিমেণ্ট (sentiment) ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়, অন্যদিকে তা আংশিকভাবে ব্যক্তির সামগ্রিক প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার দ্বারাও নির্ণীত হয়। ব্যক্তিজীবনের উপর সমাজ পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে, তার নিজস্ব মনোভাব, সেন্টিমেণ্ট ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এই সব প্রবণতাগুলো ব্যক্তিজীবনে মোটামুটিভাবে একটা স্থায়ীরূপ নেয়। ঠিক একইভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াও জীবনে স্থায়ীরূপ ধারণ করে। প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার (emotional disposition) এই স্থায়ীরূপ আমরা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দেখতে পাই। ব্যক্তির মধ্যে প্রক্ষোভমূলক আচরণের সামঞ্জস্যও (consistancy) লক্ষ্য করা যায়। কোন ব্যক্তি সব কিছু জিনিসকে সহানুভূতির চোখে দেখে, কেউ আবার সব সময় সব ঘটনা বা বস্তুকে ঘৃণার চোখে দেখে। অনেকে আছেন, যাঁরা সবাইকে ভালবাসেন; অনেকে সবকিছু মতবাদের উপর নিজের মতামতকে জোর করে চাপাতে চান। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিসত্বার মত ব্যক্তিনির্ভর। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী একইভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করে থাকে। অর্থাৎ, ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ায় সামঞ্জস্য (consistancy) দেখা যায়। মানুষের সাধারণ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় **মনঃপ্রকৃতি** বা **মেজাজ** (temperament)। মনোবিদ্ **থ্যুলেস** (Thouless) এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"......it is this general character of a man's emotional reactions that is called his temperament."[1] মনোবিদ্ আলপোর্ট আরো বিস্তৃতভাবে এই মনঃপ্রকৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর এই সংজ্ঞা আধুনিককালে বিভিন্ন মনোবিদ্ বিশেষভাবে সমর্থন করেছেন। আলপোর্ট বলেছেন—মনঃপ্রকৃতি আমাদের দৈহিক সংগঠনের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন রসক্ষরা গ্রন্থির ও অন্যান্য দৈহিক সংগঠনের কাজের সমতার দরুন ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক

মনঃপ্রকৃতি কি ?

---

1. General & Social Psychology—Thouless.

প্রতিক্রিয়ার যে স্থায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন গড়ে উঠে তাই হ'ল মনঃপ্রকৃতি।

মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Temperament] :—

মনঃপ্রকৃতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তার বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। আলপোর্টের[1] সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা মনঃপ্রকৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই।

[এক] এই সংব্যাখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে মনঃপ্রকৃতি কোন বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা নয়। মনোবিদ্‌রা একে প্রক্ষোভমূলক আচরণের একটা বিশেষ প্রকৃতি (phenomena of an individual's emotional nature) হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

[দুই] ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক আচরণের এই বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ কোন প্রক্ষোভকে কেন্দ্র করে হ'তে পারে অথবা বিভিন্ন বস্তুর প্রতি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার যে প্রবণতা তার মধ্যে আছে, তারও প্রকৃতি হ'তে পারে। অর্থাৎ, প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার স্থায়ীরূপ বা মুড্ (mood) ; সেই মুডের তীব্রতার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্ত প্রকৃতিই মনঃপ্রকৃতির অন্তর্গত।

[তিন] প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার এই বৈশিষ্ট্যগুলোর যে অংশ জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তাকেই মনঃপ্রকৃতি (temperament) বলা হয়েছে। সুতরাং, এই মনঃপ্রকৃতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই প্রক্ষোভমূলক প্রবণতা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

মনঃপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ বা টাইপ [Classification of Temperament or Temperamental Types] :—

মনঃপ্রকৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যাচ্ছে এক একজন ব্যক্তির এক একটা নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক আচরণগত বৈশিষ্ট্য থাকে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করে থাকে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যে সম্পূর্ণভাবে জন্মগত এ ধারণা ভুল। মনঃপ্রকৃতি যদি, আচরণেরই প্রকৃতি

মনঃপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ

1. "Temperament refers to the characteristic phenomena of an individual's emotional nature, including his susceptibility to emotional stimulus, his customary strength and speed of response, the quality of his prevailing mood ; these phenomena being regarded as dependent upon constitutional makeup, and therefore largely heredity in origin."

—Allport : Personality : A Psychological interpretation.

হয়, তবে তার উপর বংশধারা বা জন্মগত দৈহিক গঠনের যেমন প্রভাব আছে, তেমনি সমাজের বা পরিবেশেরও প্রভাব থাকা উচিত। প্রাচীন দার্শনিকরা যদিও মনে করতেন, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর মনঃপ্রকৃতি নির্ভরশীল, তাহ'লেও তাদের ধারণা ছিল, মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বর্তমান। মনোবিদ্ আলপোর্ট এই প্রাচীন মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। প্রাচীন চিন্তাবিদ্ হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) বলেছেন, মনঃপ্রকৃতি (tempera-ment) দেহের হিউমারের (Humour) উপর নির্ভরশীল। এই ধারণা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত রূপই প্রকাশমান। বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তিজীবনে প্রকাশিত হয় মনঃপ্রকৃতির মাধ্যমে। এই প্রাচীন চিন্তাবিদ্দের ধারণা অনুযায়ী মনঃপ্রকৃতি দেহের হিউমারের (Humour) উপর নির্ভরশীল। এই মতানুযায়ী দেহের চার ধরনের হিউমার পাশাপাশি বিশেষ ধরনের মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টি করে। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ নীচে দেওয়া হ'ল—

প্রাকৃতিক উপাদান	প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য	সদৃশ হিউমার	মনঃপ্রকৃতি
বায়ু (Air)	উষ্ণতা ও আর্দ্রতা	রক্ত	প্রক্ষোভিক চঞ্চলতা (sanguine)
মাটি (earth)	শৈত্য ও শুষ্কতা	কৃষ্ণ পিত্ত	প্রক্ষোভিক স্থায়িত্ব (melancholic)
আগুন (fire)	উষ্ণতা ও শুষ্কতা	পীত পিত্ত	প্রক্ষোভিক তৎপরতা (choreric)
জল (water)	শৈত্য ও আর্দ্রতা	phlegm.	প্রক্ষোভিক মন্থরণতা (phlegmatic)

বর্তমানে শরীর বৃত্তীয় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, হিউমার সংক্রান্ত মনোবিদ্যাকেও (humoral psychology) পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদের মূল বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হয় নি। আধুনিক মনোবিদরা মনে করেন, মনঃপ্রকৃতি আমাদের মধ্যস্থিত বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (endocrine gland) ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। **ভুণ্ড (Wundt), রিবোঁ (Ribot), কুল্পে (Kulpe), এবিংহস্ (Ebbinghous)** প্রভৃতি

মনঃপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগের আধুনিক মতবাদ

মনোবিদ্ প্রত্যেকেই একই কথা বলেছেন। মনোবিদ্ ভ্যুণ্ডও মনঃপ্রকৃতিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মনঃপ্রকৃতির দুটো মাত্রার কথা বলেছেন। একটা হ'ল **ক্ষীপ্রতা** (speed) এবং অপরটা হ'ল **তীক্ষ্ণতা** (intensity)। তাঁর মতে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রবণতা ক্ষীপ্র শক্তিসম্পন্ন (quick-strong), **ক্ষীপ্র-ক্ষীণ** (quick-weak), **ধীর-শক্তি সম্পন্ন** (slow-strong) এবং **ধীর-ক্ষীণ** (slow-weak), এই চার ধরনের হ'তে পারে। মনঃপ্রকৃতিও (temperament) এই চার ধরনের হ'তে পারে। সুতরাং, তাঁর এই দ্বিমাত্রিক ছকে প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের চারটা মনঃপ্রকৃতিতে ফেলতে পারি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতিকে আমরা এই চারটে শ্রেণীর যে কোন একটার দ্বারা নির্দেশ করতে পারি।

তীব্রতার মাত্রা→ ক্ষীপ্রতার মাত্রা↓	শক্তিশালী (strong) মনঃপ্রকৃতি সম্পন্ন	ক্ষীণ বা দুর্বল মনঃপ্রকৃতি সম্পন্ন
ক্ষীপ্র মনঃপ্রকৃতি সম্পন্ন (quick)	কলেরিক্ (choleric)	স্যাঙ্গুইন (sanguine)
ধীর মনঃপ্রকৃতি সম্পন্ন (slow)	ম্যালান্‌কলিক (malancholic)	ফ্ল্যাগমেটিক (phlegmatic)

পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন মনোবিদ্ ব্যক্তিকে মনঃপ্রকৃতির দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ভ্যুণ্ডের দু'টো মাত্রার পরিবর্তে কেউ কেউ আবার বিস্তৃতি (breadth) এবং গভীরতা (depth) এই দু'মাত্রায় মনঃপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যাই হউক, এই সব আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাদের কিছু মিল থাকলেও, আধুনিক মনোবিদ্‌রা মনঃপ্রকৃতিকে কেবলমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় একথা মানতে রাজী নন। মনঃপ্রকৃতি দ্বারা আমরা ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে চাই, তাই তার উপর পরিবেশের প্রভাবও থাকতে বাধ্য। শুধুমাত্র বংশগতি বা দৈহিক বংশগতি (biological inheritance) দ্বারা মনঃপ্রকৃতি নির্ণীত হয় না। মনোবিদ্ **থ্যুলেস** (Thouless) বলেছেন—"If, however, we use the term temperament for the general character of the emotional disposition, it must be

আলোচনা

recognised that these are only in part innate. The general character of a man's emotional dispositions is also partly determined by environmental influences." তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হ'ল যথাযথ মনঃপ্রকৃতি গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। শিক্ষককে শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণকে ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে করে সে সমাজ স্বীকৃত আচরণ ধারা আয়ত্ত করতে পারে।

ব্যক্তিসত্ত্বা ও মনঃপ্রকৃতি [Personality & Temperament] :—

অনেক মনোবিদ্ মনঃপ্রকৃতিকে সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্বার জন্মগত দিক হিসাবে বর্ণনা (innate part of personality) করেছেন। বিভিন্ন দেশের মনোবিদ্‌দের মধ্যে ব্যক্তিসত্ত্বা ও মনঃপ্রকৃতির পার্থক্য নিয়ে অনেক গণ্ডগোল আছে। যেমন, আমেরিকান মনোবিদ্‌রা মনে করেন ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের জন্য ব্যক্তির নিজস্ব যে অবস্থা তাই হ'ল মনঃপ্রকৃতি (temperament)। তাঁরা বলেছেন,—"Temperament is the internal weather in which personality develops." অর্থাৎ ব্যক্তিমনের যে তন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে সাহায্য করে তাই হ'ল মনঃপ্রকৃতি। আবার ব্রিটিশ মনোবিদ্‌রা ব্যক্তিসত্ত্বা এবং মনঃপ্রকৃতিকে একই জিনিস হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাই তাঁরা ব্যক্তিসত্ত্বা পরিমাপক অভীক্ষাকে (personality test) মনঃপ্রকৃতির অভীক্ষা (temperament test) হিসাবেই বিবেচনা করেন। তবে এই দুই মতের কোনটাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র মনঃপ্রকৃতিই যেমন ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের মূল নয়; তেমনি আবার, মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্ত্বা এক জিনিস নয়। বুদ্ধি, দৈহিক গঠন, ইত্যাদির মত মনঃপ্রকৃতিও এক শ্রেণীর উপাদান যার দ্বারা ব্যক্তিসত্ত্বা গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তিসত্ত্বাকে বাদ দিয়ে মনঃপ্রকৃতির কথা ভাবা যায় না, তেমনি মনঃপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্ত্বার কথা ভাবা যায় না। উভয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটা হ'ল সম্পূর্ণরূপ অপরটা আংশিক বিবরণ মাত্র। যে জৈবমানসিক প্রবণতার গুচ্ছ ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হ'ল মনঃপ্রকৃতি; আর যে জৈব মানসিক সংগঠন ব্যক্তির সামগ্রিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার নিজস্বতা ফুটিয়ে তোলে তাই হ'ল ব্যক্তিসত্ত্বা। তাই মনঃপ্রকৃতিকে আলপোর্ট ব্যক্তিসত্ত্বার জৈব মানসিক উপাদান (psycho-biological factor) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্ত্বার সম্পর্ক

শিক্ষা ও মনঃপ্রকৃতি [Education & Temperament] :—

সাধারণভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতি আংশিকভাবে জন্মগত এবং আংশিকভাবে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতির কতটুকু পরিবর্তন করা যাবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে মনঃপ্রকৃতির যে অংশটা জন্মগত জৈবিক গঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেটুকু আংশিকভাবে আমরা শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত করতে পারি। কিন্তু এই পরিবর্তনের সীমা বিশেষভাবে তার জন্মগত ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত করে দেয়। মনোবিদ্‌রা মনে করেন শিক্ষার দ্বারা আমরা মনঃপ্রকৃতির বিস্তৃতি (extensity) বাড়াতে পারি। মনঃপ্রকৃতি যদি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার জৈব মানসিক সংগঠন হয়, তবে ব্যক্তির প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পরিসর বাড়িয়ে তুলে তার মনঃপ্রকৃতির পরিবর্তন করা যায়। তাই শিক্ষা হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে, শিক্ষার্থীর এই প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পরিসর বাড়িয়ে তুলে, তাদের সামাজিক গুণের বিকাশ করা। তাছাড়া ব্যক্তির যথাযোগ্য সামাজিক অভিযোজনের জন্য, মনঃপ্রকৃতিগত আচরণেরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা যায় শিক্ষার দ্বারা।

মনঃপ্রকৃতি ও শিক্ষা

প্রশ্নাবলী

1. Define temperament and distinguish it from personality. Discuss the influence of temperament on the behaviour of the individual. [সম্পূর্ণ অংশ]
2. Write notes on :—
   (a) Temperament [সম্পূর্ণ অংশ]
   (b) Temperament and Personality [পৃঃ ৮০]
   (c) Classification of Temperament [পৃঃ ৭৭-৮০]

ষষ্ঠ অধ্যায়

চরিত্র

[CHARACTER]

'চরিত্র' কথাটা আমরা সাধারণ অর্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করলেও, চরিত্র যে কি, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। 'চরিত্র' শব্দটির প্রচলিত অর্থ বিশ্লেষণ করলে, আমরা তার নানারকম তাৎপর্য্য দেখতে পাই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা আদর্শ মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে সাধারণের সামনে প্রকাশ করার জন্ত 'চারিত্রিক বিবরণ' (character writing) লেখার প্রবর্তন করেন। তাঁরা 'চরিত্র' বলতে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিবরণকে বুঝাতেন। কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্তকে চরিত্র বলা যায় না। চরিত্র শুধুমাত্র বিবরণ নয়; তার সঙ্গে আমরা আরও কিছু তাৎপর্য্য যোগ করি। সুতরাং 'চরিত্র' বলতে মনোবিদ্যায় আমরা কি বুঝাই সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হ'লে, বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের ধারণা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করার দরকার।

চরিত্র কি ? [What is Character] :—

আধুনিক অনেক মনোবিদ্ চরিত্র এবং ব্যক্তিসত্বাকে অভিন্ন হিসাবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু সকল মনোবিদ্ এই ধরনের মতবাদ মানেন না। আধুনিক মনোবিদ্যায় চরিত্র কথাটার দু'রকমের সংব্যাখ্যান দেখতে পাই। তাঁরা মনে করেন, 'ব্যক্তিসত্বা' এবং 'চরিত্র' এই দু'টো শব্দ দ্বারা আমরা একই সত্বাকে বোঝাই না। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌রা এই দু'টো শব্দের পৃথক পৃথক তাৎপর্য্য আরোপ করেছেন। অনেক মনোবিদ্ চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার বিশেষ এক পর্য্যায় হিসাবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ, এঁরা চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার একটা অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। **ফার্নল্ড্** (G. G. Fernald) বলেছেন, ব্যক্তিসত্বা হ'ল বুদ্ধি এবং চরিত্রের সমবায়। মনোবিদ্ **কান** (Kahn) বলেছেন, ব্যক্তিসত্বা চরিত্র, মনঃপ্রকৃতি এবং বুদ্ধির দ্বারা গঠিত। কিন্তু ব্যক্তিসত্বার আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, ব্যক্তিসত্বা কখনওই এ ধরনের বিচ্ছিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্যের নিছক যোগফল নয়। ব্যক্তিসত্বা এক

চরিত্র সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের গতানুগতিক ধারণা

ধরনের সক্রিয় জৈবমানসিক সংগঠন। তাই চরিত্রের এই ধরনের সংব্যাখ্যানকেও সঠিক বলে বিবেচনা করা যায় না। অন্যদিকে, আর একদল মনোবিদ্ চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার স্থায়িত্বের দিক হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে চরিত্র হ'ল ব্যক্তিসত্বার সেই বৈশিষ্ট্য, যার জন্য ব্যক্তি কোন বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে লেগে থাকে। অর্থাৎ, কোন বস্তুকে পাওয়ার যে অদম্য ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তাকেই মনোবিদ্‌রা চরিত্র বলেছেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বা থেকে পৃথক করা যায় না। মনোবিদ্ **আলপোর্ট** বলেছেন, মানুষের ঐচ্ছিক কাজ তার ব্যক্তিসত্বা সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তার ব্যক্তিসত্বার মধ্যে এমন কোন নির্দিষ্ট অংশ নেই যা শুধুমাত্র ঐচ্ছিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যাকে আমরা চরিত্র বলতে পারি। তাই আমরা এই দু'ধরনের বিশ্লেষণ বা সংজ্ঞার কোনটাকেই মেনে নিতে পারি না। সুতরাং মনোবিদ্‌দের এই সংজ্ঞা থেকে চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না।

চরিত্রের আধুনিক সংব্যাখ্যান

এখন দেখা যাক্, সাধারণভাবে আমরা 'চরিত্র' কথাটা কিভাবে প্রয়োগ করি। আমরা বলি, "তিনি টাকার লোভ সম্বরণ করে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন," অথবা, বলি, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল চরিত্র গঠন"। এখন, এই ধরনের কথার দ্বারা আমরা কি বুঝাই? যে ব্যক্তি টাকার লোভ সম্বরণ করেছেন, তিনি আদর্শ আচরণ করেছেন, বা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীদের এমন আচরণ করতে শেখাবো যা সামাজিক ও নৈতিক অর্থে আদর্শস্থানীয়। উভয় ক্ষেত্রে 'ইচ্ছা শক্তি' প্রয়োগ, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বারই অন্তর্গত, অর্থাৎ, আচরণের বিশেষ রূপ নিয়ন্ত্রণ করছে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিসত্বা। কোন বিশেষ আচরণের মধ্যে যদি প্রকাশ দেখা যায়, তবে তা তার ব্যক্তিসত্বারই অন্তর্গত; ব্যক্তির আচরণের যে কোন বৈশিষ্ট্যই তার ব্যক্তিসত্বার দ্বারা নির্ধারিত হয়। চরিত্র কথাটা আমরা তখনই আরোপ করছি যখন, ব্যক্তিসত্বাকে কোন সামাজিক ভাল মন্দের বিচারে মূল্যায়ন করছি। আলপোর্ট (Allport) তাই ব্যক্তিসত্বার পরিপ্রেক্ষিতেই চরিত্রের সংজ্ঞা নিরূপন করেছেন। তাঁর মতে **চরিত্র হ'ল মূল্য নিরূপিত ব্যক্তিসত্বা এবং বিপরীতক্রমে, ব্যক্তিসত্বা হ'ল মূল্য আরোপহীন চরিত্র।**[1] মনোবিদ্

1. "Character is personality evaluated and personality is character devaluated"—
Allport : psychology : a psychologycal interpretation.

উড্‌ওয়ার্থও চরিত্রের সংজ্ঞা একইভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—চরিত্র হ'ল ব্যক্তির সেই সব আচরণ যাকে সমাজের মান অনুযায়ী ন্যায়, অন্যায় বলা যায়। তবে ন্যায়ই হউক, অন্যায়ই হউক যে কোন নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যক্তিসত্বাকে বিচার করতে চাই। ব্যক্তিসত্বার এই বিচারের ফলকে আমরা চরিত্র বলে থাকি। তাই চরিত্র বলে পৃথক কিছু সত্বা নেই। আধুনিক মনোবিদ্‌ অনেকেই বলেছেন, চরিত্র বলে কোন কথা মনোবিদ্যায় পৃথকভাবে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, ব্যক্তিসত্বাই সামগ্রিক ধারণা যার দ্বারা আমরা ব্যক্তির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারি। তাই মনোবিদ্যায় এর পৃথক আলোচনার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, এর নৈতিক মূল্য কিছু থাকতে পারে। তাই শিক্ষাবিদ্‌ **জন্‌ অ্যাডামস্‌** (Adamas) বলেছেন "Personality is the moral estimate of the individual, an evaluation." আমরা ব্যক্তিসত্বার এই নৈতিক তাৎপর্য্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে ; চরিত্রকে পৃথক কিছু সত্বা হিসাবে নয়।

সুচরিত্রের স্বরূপ [Nature of good Character] :—

আমরা দেখেছি, ব্যক্তিসত্বাকে যখন কোন বিশেষ নৈতিক বা সামাজিক মনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, তখনি চরিত্র কথাটা আরোপ করি। চরিত্র বলে স্বতন্ত্র কোন রকম সত্বা আমাদের মধ্যে নেই। চরিত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বার মূল্যায়িত রূপ মাত্র। যেমন, আত্মপ্রাধান্য বোধ (Assertiveness), ব্যক্তিসত্বার একটা সংলক্ষণ (trait)। কিন্তু যখন আমরা এই বৈশিষ্ট্যকে সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, অর্থাৎ, প্রতিবেশীদের উপর তার প্রভাব কিরূপ, তা যখন মূল্যায়ন করি তখন সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে 'সবলচরিত্র' হিসাবে বর্ণনা করে থাকি। যে ব্যক্তি খুব বেশী পরিমাণে প্রতিবেশীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তিনিই সবল বা দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী। আবার হীনমন্যতা বা বশ্যতা (submission) অনুরূপভাবে, ব্যক্তিসত্বারই সংলক্ষণ। কিন্তু যে ব্যক্তি খুব সহজে অন্যের মতে মত দেয়, বা অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে, সে দুর্বল চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং, পূর্বে আমরা যা বলেছি, ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে যখন ভাল-মন্দের মাপকাঠিতে বিচার করি তখনই চরিত্রের কথা ওঠে। এখন এই ভাল-মন্দের মাপ সমাজের মানের (social values) উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক

সুচরিত্র বলতে কি বুঝায় ?

সমাজের মধ্যে কতকগুলো মূল্যবোধ ((values) থাকে। মানুষের সমাজ জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হচ্ছে। অন্তদিকে সমাজিক অভিব্যক্তির তারতম্যের জন্য এই মূল্যবোধেরও তারতম্য হয়। তাই সাধারণভাবে সব মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন সাধারণ নিয়মাধীন হতে পারে না। প্রত্যেক সমাজের ব্যবহারিক আচরণ-মূল্যভেদে, তুলনীয় মানের পার্থক্য থেকে যায়। অতএব সুচরিত্র (good character) বলতে কোন সর্বজন গ্রাহ্য ধারণা নেই। তাই সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যও সার্বজনীন হতে পারে না। কারণ কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় যে সংলক্ষণকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্য সমাজে তাকে খারাপ বিবেচনা করা হতে পারে। এবং এ ধরনের অভিজ্ঞতা সংখ্যায় খুব কম নয়। কিন্তু মনোবিদ্‌রা এই সমস্যার একটা বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করেছেন। তাঁরা বলেন, সাধারণ কতকগুলো ধর্মের দিক থেকে প্রত্যেক সমাজের আচরণমূল্যের মধ্যে একটা মিল আছে। আমরা এই সাধারণ ধর্মের দিক থেকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। মনোবিদ্‌রা বলেছেন—**ব্যক্তির মঙ্গল (individual wellbeing), সামাজিক মঙ্গল (social wellbeing) এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আসক্তি (inclination to social values),** এই তিনটে যে কোন সমাজের সাধারণ স্বাভাবিক ধর্ম। সুতরাং, ব্যক্তিসত্বার যে কোন সংলক্ষণকে যদি এই তিনটের যে কোন একটার অনুকূল হয়, তা'হলে তাকে আমরা সুচরিত্রেরই লক্ষণ বলব।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ ব্যক্তিসত্বার অন্তর্গত নিজস্ব মঙ্গলের জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, তাই সুচরিত্রের পরিচায়ক। যেমন, ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিজীবনে সন্তুষ্টি (satisfaction), ইত্যাদি ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক থেকে কাম্য। তবে ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, তখনই সুচরিত্রের পরিচায়ক হবে যখন তা অন্যের উন্নতিকে ব্যহত না করে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে, এবং অন্যের অমঙ্গল না করে নিজস্ব কল্যাণের পথে চালিত হবে। এছাড়া মানসিক স্থৈর্য্য (mental patience), সংকল্প (determination), স্থির চিত্ত (steadiness), প্রক্ষোভমূলক আচরণের সাম্য (emotional balance), এই সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সুচরিত্রের লক্ষণ। আবার, এই সব লক্ষণের বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ। যেমন—মানসিক চাপল্য (frickle-

mindedness), মানসিক সংকল্পের অভাব (lack of determination), প্রক্ষোভমূলক আচরণের অসমতা (emotional disbalance) ইত্যাদি। ব্যক্তিসত্বার অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আত্মতৃপ্তির (satisfaction) বৈশিষ্ট্য চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। আত্মতুষ্টি ছাড়া স্থচরিত্র হতে পারে না। উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, আত্ম-কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা, এ সব কিছুর শেষে, আত্মতৃপ্তি থাকার দরকার। যে ব্যক্তি সব কিছু পেয়েও তৃপ্তি লাভ করে না, সব সময় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিপীড়িত, তাকে স্থচরিত্রের অধিকারী বলা যেতে পারে না।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে, এবং সমাজ জীবন-যাপনের মাধ্যমে, কতকগুলো সামাজিক সংস্কার (social instinct) তার মধ্যে দেখা দেয়। এই সব সামাজিক সংস্কার বা বৈশিষ্ট্যগুলো যৌথ জীবন-যাপনের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। আদর্শ সমাজ জীবন-যাপনের জন্য যে সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, তা যদি ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তা'হলে তাকে আমরা স্থচরিত্রের অধিকারী বলতে পারি। বন্ধুপ্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিক আনুগত্য, ইত্যাদি ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্যগুলো স্থচরিত্রের লক্ষণ। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে, ব্যক্তির জীবন যেমন কল্যাণময় হয় তেমনি সমাজ-জীবনও সম্পূর্ণ ও স্থন্দর হয়ে ওঠে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন উভয় দিক থেকে এগুলো কাম্য। কিন্তু, এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির স্বার্থের উর্ধে বলে, অনেক সময় ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থমূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সমাজ আদর্শকেই বড় করে দেখতে হবে। কারণ, সমাজসম্মত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীকে স্থচরিত্রের অধিকারী বলা হবে। তাই ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দলগত স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার যে বৈশিষ্ট্য তাকেই স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলা হবে।

নৈতিক বৈশিষ্ট্য

তৃতীয়তঃ ব্যক্তি ও সমাজ কল্যাণমূলক গুণগুলো ছাড়াও এমন কতকগুলো গুণ আছে, যে গুলোও স্থচরিত্রের লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণভাবে আমরা যখন চরিত্র কথাটা ব্যবহার করি, তখন ব্যক্তিসত্বার এই দিকটার উপরই আমাদের লক্ষ্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল ব্যক্তিসত্বার নৈতিক বৈশিষ্ট্য (moral characteristics)। অর্থাৎ, এইসব গুণগুলোকে নৈতিক মূল্যের দিক থেকে বিচার করা হয়। তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতার কোন লক্ষ্য নাও থাকতে পারে।

কিন্তু বাস্তব মূল্য না থাকলেও, পরোক্ষভাবে, ব্যক্তিসত্বার মূল্যায়নে, এগুলোকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ গুলোকে আমরা চরিত্রের নৈতিক দিক বলতে পারি। যেমন—সত্যবাদীতা, সাধুতা, দয়া, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিসার্থের সঙ্গে অনেক সময় সংঘাত করলেও, এদের নৈতিক মূল্যের কথা বিচার করে, এদের সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সুতরাং, সুচরিত্রের অধিকারী আমরা তাকেই বলব, যার মধ্যে এই তিন ধরনের গুণ বর্তমান। কিন্তু, তিন ধরনের গুণ ব্যক্তিসত্বার মধ্যে থাকলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, তাদের

আলোচনা

উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী। কতকগুলোর উদ্দেশ্য ব্যক্তিকল্যাণ সাধন করা, কতকগুলোর উদ্দেশ্য সমাজ-কল্যাণ সাধন করা, আবার কতকগুলোর নৈতিকমূল্য বর্তমান। ব্যক্তিকল্যাণমূলক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজ-কল্যাণমূলক বৈশিষ্ট্যের সংঘর্ষ অবসম্ভাবী ; আবার, নৈতিক মানের সঙ্গে ব্যক্তিসার্থ ও সমাজসার্থমূলক বৈশিষ্ট্যের সংঘর্ষ হ'তে পারে। যা নৈতিক দিক থেকে কাম্য, তা অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ বা সমাজস্বার্থকে ব্যহত করতে পারে, তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনটাকে আমরা সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলব। এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার, বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে একটা বৃহত্তর মানবীয়স্বার্থ কাজ করছে। আমাদের আচরণ সেই বৃহত্তর মানবীয় স্বার্থের অনুকুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, যিনি ঐ তিন রকমের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করেন, বৃহত্তর মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনিই সুচরিত্রের অধিকারী।

চরিত্রের বিকাশ [Development of Character] :—

মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport) চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার মূল্যায়িতরূপ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এবং তাঁর মতে, ব্যক্তিসত্বা ছাড়া, চরিত্রের পৃথক আলোচনা মনোবিদ্যায় অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং,

সূচনা

চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসত্বার বিকাশেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু, চরিত্রের একটা সামাজিক দিক আছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিসত্বাকে যখন আমরা সামাজিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তখনই চরিত্রের কথা আসে। তাই মনোবিদ্‌রা মনে করেন চরিত্র বিকাশের মূলে আছে ব্যক্তির সমাজ চেতনা (social consciousness)। অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত না ব্যক্তির সমাজ চেতনার বিকাশ হয়, সে পর্য্যন্ত চরিত্র গঠন বা সমাজদর্শ অনুরূপ,

আচরণধারা আমরা অর্জন করতে পারি না। তাই যদিও সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শুরু হয় জন্মের পর থেকে, তবুও, চরিত্র গঠন আরম্ভ হয় আরও পরে। যখন শিশুর সামাজিক ও নৈতিকবোধ জাগ্রত হয়।

এখন ঠিক কোন বয়সে শিশুর মধ্যে এই সমাজ চেতনা বা নীতিবোধ জাগে, সে নিয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্‌রা ব্যক্তির জীবনের বিকাশের ইতিহাস (genetic study) অনুশীলন করে, মোটামুটিভাবে স্থির করেছেন, প্রায় এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক থাকে। এক থেকে দেড় বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুরা পাশাপাশি অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সব ছোট শিশুদের প্রতিও তাদের আকর্ষণ দেখা যায়। সুতরাং, নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই সময়ে তার আত্ম-কেন্দ্রিক অবস্থা কেটে গিয়ে, সমাজ চেতনা জাগ্রত হয়। তাই এই অবস্থা থেকেই চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু, নৈতিকবোধ শিশুদের মধ্যে আরও পরে জাগে। তাই সামগ্রিকভাবে চরিত্র গঠন বিশেষভাবে নৈতিক ভিত্তি, পরবর্তী পর্য্যায়ে শুরু হয়।

সামাজিক চেতনা ও চরিত্র বিকাশ

চরিত্র গঠনের যে সংব্যাখ্যান মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল (Mc Dougall) দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রক্ষোভমূলক আচরণকে ব্যক্তিসত্তার একক (unit) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক প্রাণীর উদ্দেশ্যমূলক জীবনায়ন (purposive striving), বিভিন্ন অবিচ্ছিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই সমস্ত স্তরগুলো পরিলক্ষিত হয় না। **তবে মানুষের ক্ষেত্রে চারটে স্তর বিশেষভাবে দেখা যায়।** সুতরাং, আমরা ঐ চারটে স্তর সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব। **প্রথম স্তরে, মানব শিশুর আচরণ কেবল মাত্র, প্রবৃত্তির (instinct) দ্বারা পরিচালিত হয়,** এবং তার আচরণের পেছনে একমাত্র যে প্রেরণা কাজ করে তা হ'ল আনন্দ ও বেদনার (pleasure and pain) অনুভূতি। যে সব আচরণ আনন্দদায়ক, সেই সব আচরণের পুনরাবৃত্তি শিশুরা করে, এবং যে সব আচরণ বেদনাদায়ক তা তারা করতে চায় না। কিন্তু, **দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, শিশু সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজ পরিবেশ তার আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।** ফলে এই স্তরে শাস্তি পুরস্কারের (reward & punishment)

চরিত্র বিকাশের বিভিন্ন স্তর

প্রভাব দ্বারা তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সময়ে শিশুর মনে নানা ধরনের সেন্টিমেণ্ট জন্মলাভ করে। এবং এই স্তরে সেন্টিমেণ্ট-গুলো বিশেষ করে বাস্তব বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। যেমন, বাবা, মা, ঘর, বাড়ী ইত্যাদি মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক প্রবণতাগুলো সংঘবদ্ধ হয়। **এর পরবর্তী স্তরে, শিশুর বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয়।** সব কিছুকে বিচার বিবেচনা করে দেখতে শেখে; তার চিন্তাশক্তি বিশেষ দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে, শিশু, সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হয়। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুশাসন, প্রসংশা এবং নিন্দার (approval and disapproval) মাধ্যমে, শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্তরেই কতকগুলো বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে, শিশুর সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। যেমন—সততা (honesty), ন্যায় বিচার (justice), সৌন্দর্য্যবোধ (aesthetic appreciation) ইত্যাদি। অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্তরে শিশুর যে সামাজিক বোধ জাগ্রত হয়, এই তৃতীয় স্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। শিশু প্রথম সমাজ চেতনার পর্য্যায়ে, বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে; তাকে ঘিরেই তার সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। যেমন, মাকে সে ভালবাসে; মায়ের দৈহিক উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। কিন্তু, পরে যখন সে আরও বড় হয়, সমাজ পরিবেশকে বিচার করতে শেখে, তখন মায়ের নিজস্ব কতকগুলো গুণকে ভালবাসতে শেখে, এবং সেই সব আমূর্ত গুণকে কেন্দ্র করে তার ধীরে ধীরে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। এই তৃতীয় স্তরে শিশু মনে যখন 'আমূর্ত' ধারণাকে ঘিরে সেন্টিমেণ্ট গড়তে শুরু করে, তখনই আবার পাশাপাশি কতকগুলো বিশেষ ধরনের সেন্টিমেণ্ট তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। এই সেন্টিমেণ্টগুলোর ম্যাক্‌ডুগাল (Mc Dougall) নাম দিয়েছেন, নৈতিক সেন্টিমেণ্ট (Moral sentiment)। এই সেন্টিমেণ্টগুলো শিশুদের মধ্যে উচিত অনুচিতের বোধ আনে। এই নৈতিক সেন্টিমেণ্টেরও বিকাশ চরিত্র বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। নৈতিক সেন্টিমেণ্ট যথাযথভাবে বিকশিত না হ'লে চারিত্রিক বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। ম্যাক্‌ডুগাল এই নৈতিক সেন্টিমেণ্টের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"Moral sentiments are real and important constituents of character."[1]

1. Mc Dougall : An outline of Psychology.

ম্যাক্‌ডুগাল, এই নৈতিক সেন্টিমেণ্টের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, সমাজের কতকগুলো নৈতিক মান আছে। এই সমাজের মধ্যে যারা বর্তমানে বসবাস করে, বা পরে যারা বসবাস করার সুযোগ পায়, তারা প্রত্যেকে এই নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ করে। সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে এই ধরনের নৈতিক সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠতে পারে না। শিশু সমাজের মধ্যে বসবাস করতে করতে, সামাজিক আচরণের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পরে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়। শিশুর ভাষার বিকাশ (language development) তার নৈতিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। ভাষার সাহায্যেই সে বিভিন্ন বিমূর্ত বস্তু সম্পর্কে ধারণা পায়, এবং সেই সব বস্তু সম্পর্কে সে চিন্তা করতেও শেখে। শিশুর এই চিন্তা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই দুই মিলে, নৈতিক সেন্টিমেণ্টের বিকাশে সহায়তা করে। যে ব্যক্তিকে সে শ্রদ্ধা করে, সেই ব্যক্তির চারিত্রিক গুণগুলোকে কেন্দ্র করে শিশুর সেণ্টমেণ্ট গড়ে ওঠে। ম্যাক্‌ডুগাল, নৈতিক সেন্টিমেণ্টের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথাও বলেছেন, সেটা হ'ল, প্রত্যেক নৈতিক সেন্টিমেণ্টই দ্বিপ্রান্তিক (pripolar)। প্রত্যেক নৈতিক সেন্টিমেণ্টেরই দু'টো দিক আছে—একটা তার ভাল দিক একটা তার খারাপ দিক। যেমন ন্যায় বিচার—অন্যায় প্রবণতা। কোমলতা-নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি। সুতরাং, নৈতিক সেন্টিমেণ্ট গড়তে হ'লে, ভাল দিকের প্রতি আসক্তি যেমন দরকার, তেমনি, খারাপ দিকের প্রতি আসক্তিও দরকার। অর্থাৎ, এই দুই বিপরীত প্রান্তিক অবস্থার প্রতি বিপরীত মনোভাব গড়ে উঠলে তবেই নৈতিক সেন্টিমেণ্ট দৃঢ় হয় এবং চরিত্র সুদৃঢ় হবে।

নৈতিক সেন্টিমেণ্টের স্বরূপ

শুধুমাত্র নৈতিক সেন্টিমেণ্ট গঠিত হলেই যে চরিত্র গঠন সম্পন্ন হয় তা নয়। তার কারণ, অন্যান্য মানসিক প্রবণতা, যেমন প্রবৃত্তি, এদের থেকে নৈতিক সেন্টিমেণ্টের প্রবণতা ক্ষমতা অনেক কম। তাই, শুধুমাত্র নৈতিক সেন্টিমেণ্টের ক্ষমতার দ্বারা চরিত্র গঠন বা ম্যাক্‌ডুগাল যাকে বলেছেন নৈতিক চরিত্র (moral character), তা গঠিত হতে পারে না। উইলিয়ম জেমস্ (William James) এই সমস্যাকে গাণিতিক আকারে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। যদিও আমাদের নৈতিক সেন্টিমেণ্টের ক্ষমতা কম। তবুও আমরা দৈনন্দিন জীবনে চায়ের কাপ সামনে রেখে সদ্য উপস্থিত বন্ধুকে এগিয়ে দিই। তখনও তো প্রবৃত্তিগত প্রবণতা প্রবল থাকে। **উইলিয়ম জেমস্** বলেছেন—

আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট ও চরিত্রের বিকাশ

Ideal impulse <instinctive propensity. কিন্তু, ঐ নৈতিক সেন্টিমেণ্টের এমন প্রবণতা কিছু যোগ হয় যার ফলে ওর শক্তি সহজাত প্রবণতার শক্তির চেয়ে বেশী হয়। তিনি একে বলেছেন—x। অর্থাৎ, তাঁর মতে, Ideal impulse + x > Instinctive propensity. বিভিন্ন দার্শনিক ও মনোবিদ্ এই অজ্ঞাত রাশি x-কে তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। কেউ বলেছেন, এটা হ'ল বিচার শক্তি, আবার কেউ বলেছেন, মৃত্যুর পরে স্বর্গীয় জগতে স্থান পাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি আরও নানারকম কথা বলেছেন। ম্যাক্‌ডুগাল (Mc Dougall) একে বলেছেন, অহম্‌সত্ত্বা (self)। ব্যক্তি অহম্‌সত্ত্বার শক্তি সবচেয়ে বেশী। সুতরাং, তার এই অহম্‌সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে প্রবণতা-গুলোর সমন্বয় করতে পারলে, যে নূতন প্রবণতা তৈরী হবে, তার শক্তি জন্মগত অন্যান্য প্রবণতার চেয়ে অনেক বেশী হবে। তাই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট (self regarding sentiment) বিকাশ করতে পারলে, চারিত্রিক বিকাশ পরিপূর্ণ হয়। মনোবিদ্ আলপোর্ট বলেছেন, এই অহম্‌সত্ত্বার বিকাশ ত্রিমুখী হয়। প্রথম এই অহম্‌সত্ত্বার বিকাশ শুরু হয় আত্মসচেতনার মাধ্যমে। এই স্তরে আত্মসত্ত্বা বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক থাকে। কিন্তু পরবর্তী স্তরে লক্ষ্যণীয় যে, এই আত্ম সচেতনতা, ব্যক্তির নিজের অস্তিত্ব বা সুযোগ সুবিধাকে ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন বস্তুকে অহম্‌সত্ত্বার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি বিচার করতে শেখে। এই স্তরকে বলা হয় অহম্‌সত্ত্বার বিস্তৃতির (extension of self) স্তর। এই স্তরে ব্যক্তি অন্য বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে। নিজের ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা থেকে অন্যের ছেলে-মেয়েদের প্রতি ভালবাসা জন্মায় ; তার পরে সাধারণভাবে মানব শিশুর প্রতি ভালবাসা জন্মে। এই সব বস্তুগুলো আত্ম-চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মার অন্তর্ভূক্ত হয়। ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে অহম্‌সত্ত্বার বিস্তৃতি হয়। তাই আত্ম-চেতনার বিস্তৃতি চরিত্র গঠনের একটা বিশেষ দিক। চরিত্র গঠনের আর একটা দিক হ'ল এই অহম্‌সত্ত্বার নৈব্যক্তি-করণ (self-objectification)। আত্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা থাকা উচিত। নিজের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে ধারণা থাকা সুচরিত্রের গুণ। তাই নিজেকে নৈব্যক্তিক (objective) বিশ্লেষণে যাচাই করার মত ক্ষমতা গড়ে তোলা আত্মবোধের বিকাশের একটা প্রধান অংশ। অবশেষে, আত্মবোধের চরম অভিব্যক্তি হ'ল—একক জীবনাদর্শ

(unifying phylosophy of life) গড়ে তোলা। এই জীবনাদর্শ, ধর্মবোধের, সৌন্দর্য্যবোধের বা সমাজবোধের যারই হউক না কেন, আত্মবোধ যখন একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শকে কেন্দ্র করে তখনই চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়।

সুতরাং, চরিত্র বিকাশের মূল কথা হ'ল আদিম প্রবৃত্তিগুলোর সমন্বয়ে এবং যথাযথ সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলা। নৈতিক সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠলে এবং আত্মচেতনার যথাযথভাবে সামাজিক বিকাশ হলে চরিত্র গঠন সম্ভব হবে। তাই চরিত্র গঠনের জন্য একদিকে যেমন নৈতিক সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলার উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। তেমনি আবার আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টও যাতে করে যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উভয়ের বিকাশের মাধ্যমে বক্তিসত্বার সমাজিক মূল্য নির্ণীত হবে, বা চরিত্রের বিকাশ হবে।

আলোচনা

শিক্ষা ও চরিত্র [Education & Character] :—

শিক্ষাক্ষেত্রে চরিত্রের গুরুত্বের কথা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ভাবে বলেছেন, অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে চরিত্র গঠনের কথা বলেছেন। যদিও বহু শিক্ষাবিদ্ শুধুমাত্র চরিত্র গঠনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে মনে করেন না, তবে তাঁরা এ কথা স্বীকার করেন যে, শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বিকাশ সাধন করা। শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হিসাবে বর্তমানে ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিসত্বা এবং চরিত্র পৃথক জিনিস নয়। ব্যক্তিসত্বারই মূল্যায়িত রূপই হ'ল চরিত্র। সুতরাং, সামগ্রিক না হলেও চরিত্র বিকাশ করা আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হ'ল শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও চরিত্র গঠন

এখন, শিক্ষার এই উদ্দেশ্যে পৌছাতে হ'লে শিক্ষকের কি কি করার প্রয়োজন : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সুচরিত্রের তিন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আছে। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যা তার আত্ম-কল্যাণে সাহায্য করে ; কতকগুলো সমাজ-কল্যাণে সাহায্য করে, আর কতকগুলো নৈতিক-মান-মূলক। সুতরাং, চরিত্র বিকাশ করতে হ'লে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে এই তিন ধরনের গুণ বিকাশ করে, সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই প্রত্যেক ধরনের বৈশিষ্ট্যই অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলার উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তার সমস্ত রকম সুযোগ করে দিতে হবে। ব্যক্তিগত দিক থেকে শিক্ষার্থীদের যাতে

শিক্ষা ও সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য

আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদা বোধ, মানসিক দৃঢ়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সুযোগ, নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বিদ্যালয়ে করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের যদি কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবেই তাদের মধ্যে আত্মকল্যাণ-মূলক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হবে। সামাজিক বিভিন্ন চারিত্রিক গুণ বিকাশের জন্য, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সমবেদনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করা যায়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে দলগত-ভাবে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে তার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থমূলক বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব কোন সময় হবে না। আর যদিও বা তা কোন সময় হয়, তা তারা নিজেরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে পারবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকও তাদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন। তাই সামাজিক দিক থেকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনতে হলে, শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাকে (activity) কাজে লাগাবেন। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা যায়। এ বিষয়ে উপদেশের বিশেষ কিছু প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে না। সুচরিত্রের আর একটা দিক হ'ল—তার নৈতিক দিক। এই নৈতিক আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলার জন্য সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের নানারকম উপদেশ দিয়ে থাকি। কিন্তু শুধুমাত্র উপদেশ দিয়ে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যায়, অন্যায় বোধ বা নীতিবোধ জাগ্রত করা যায় না। প্রত্যক্ষ মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা না এ'লে, আমূর্ত বিভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করে আচরণ ধারার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তাই যে কোন ধরনের নৈতিকজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সামনে উদাহরণ তুলে ধরতে পারলে তবেই তাদের সার্থক নৈতিক জীবনের বিকাশ সম্ভব হবে। এ বিষয়ে, শিক্ষকের নিজের জীবনের আদর্শ শিক্ষার্থীদের কাছে উদাহরণ স্বরূপ কাজ করতে পারে। তাই শিক্ষকের নিজের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ প্রবল পরিমাণে থাকার দরকার। এ ছাড়া, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন আদর্শ চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে সঞ্চারিত করা যায়। বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে শিক্ষক যদি তাঁর চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারেন এবং ঐসব বৈশিষ্ট্য কিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিতে সহায়তা করেছে তা যদি তাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে ঐ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী হবে।

সুচরিত্র গড়ে তুলতে হলে, শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। তিনি বিদ্যালয়ে যে বিষয় পড়াবেন, বা যে কোন কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন, তার উদ্দেশ্য স্থাপন করা প্রথমতঃ প্রয়োজন। তিনি বিশেষ পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কি ধরনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে উদ্যোগী সে সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা না থাকলে, তাঁর কাজ হবে উদ্দেশ্যহীন। তাই শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশ করতে হলে শিক্ষককে উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, সচেতনভাবে পাঠদানের কাজ পরিচালনা করলে তবেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র বিকাশ করা সম্ভব হবে।

চরিত্র বিকাশের নীতি ও শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে, চরিত্র বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষকের সমস্যাটাকে আরও একদিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। চরিত্র বিকাশের বিভিন্ন স্তরেও শিক্ষকের নানা কর্তব্য আছে। চরিত্রের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, চরিত্রের বিকাশ আমাদের বিভিন্ন প্রবণতার ক্রমিক সমন্বয়ের ফলে সেন্টিমেণ্ট গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকের যথাযোগ্য সেন্টিমেণ্ট বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীর সেন্টিমেণ্টের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যথাযোগ্য ভাবে সহায়তা করবেন। যখন শিক্ষার্থীরা সাধারণ মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে তাদের প্রবণতাগুলোকে সংঘবদ্ধ করে, তখন তাদের এই সামগ্রিক ধারণা যাতে শিক্ষানুকুল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া, ম্যাক্‌ডুগাল, বলেছেন, নৈতিক সেন্টিমেণ্টগুলোই চরিত্রের উপাদান। সুতরাং নৈতিক সেন্টিমেণ্টগুলো যাতে সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, এর জন্য যথাযোগ্য উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষকের নিজস্ব নৈতিক গুণ, পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিবরণ এ বিষয়ে বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। তাছাড়া বিদ্যালয় পরিবেশের সুনিয়ন্ত্রণ নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষকের নির্দেশনাও (guidance) এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। তিনি যথাযোগ্য মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে, ভাল-মন্দের মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্য করতে সাহায্য করতে পারেন। অনেক সময় নৈতিক সেন্টিমেণ্টের উপযোগিতা শিক্ষার্থীদের কাছে কিছু থাকে না বলে, তারা আদর্শ সেন্টিমেণ্ট গঠনে আগ্রহী হয় না। তাই সম্ভব হ'লে শিক্ষক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ জীবনে উপযোগিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন। এর ফলে তারা নৈতিক আদর্শ গঠনে অনুপ্রাণিত হবে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি, চারিত্রিক বিকাশ আত্ম-

বোধের সেন্টিমেন্টের (self-regarding sentiment) বিকাশের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, এই অহম্‌সত্বার শিক্ষার্থীদের যাতে যথাযোগ্য বিকাশ হয়, শিক্ষকের সেদিকেও নজর দিতে হবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের অহম্‌সত্বার বিকাশ যাতে সমাজ আকাঙ্ক্ষিত পথে হয় সেদিকে শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। তারা যাতে আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে পড়ে, যাতে তাদের ব্যক্তিগত অহম্‌সত্বাকে তৃপ্ত করার জন্য অন্যের অনুরূপ সত্বার বিকাশকে ব্যহত না করে, সেদিকে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে যোগ্য মূল্যায়ণ করতে পারে এবং সে সম্পর্কে সচেতন থাকে শিক্ষককে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের অহম্‌সত্বার যথাযোগ্য বিস্তৃতি হয়, এবং যাতে তারা বিদ্যালয়ের প্রত্যেক জিনিসকে ভালবাসতে শেখে, সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখার দরকার এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টের (self-regarding) বিকাশ বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কারণ, অহম্‌সত্বার (self) এই বিকাশ

আলোচনা

ব্যক্তিজীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই বিদ্যালয়ে আমরা চেষ্টা করলেই চারিত্রিক বিকাশের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি, এ ধারণা ভুল। তবে বিদ্যালয়ে, আমরা শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশের একটা ভিত্তি তৈরী করে দিতে পারি মাত্র। ব্যক্তির পরিপূর্ণ চারিত্রিক বিকাশ বিদ্যালয় জীবন পেরিয়ে, আরও অনেক পরে আসে। আর পরিপূর্ণ একক জীবদর্শন (unifying philosophy of life), গঠন খুব কম ব্যক্তির জীবনে গড়ে উঠতে পারে। এটা একটা আদর্শমাত্র। জীবনের সবকিছু ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে একক জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা কেবলমাত্র মহাপুরুষদের জীবনে ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন করতে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে নৈতিক সেন্টিমেন্টগুলো গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবো এবং শিক্ষার্থীদের অহম্‌সত্বার বিস্তৃতিতে সহায়তা করব। এ প্রসঙ্গে, আর একটা কথা মনে রাখা দরকার, বিদ্যালয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমিত। চরিত্র গঠন, শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, বিদ্যালয়ে, শিক্ষার্থীরা দিনের মধ্যে খুব কম সময়ই থাকে, এবং বেশীর ভাগ সময় বাইরের পরিবেশ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। তাই সমাজের বিভিন্ন সংস্থা একত্রে কাজ না করলে, শিশুদের চরিত্র বিকাশ করা যাবে না। বিদ্যালয়ে যে বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলো বিশেষভাবে সংযোজনের চেষ্টা চলছে সমাজ যদি সেইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে মর্য্যাদা না দেয়, তাহ'লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐসব গুণ কখনও স্থায়ীভাবে আনা সম্ভব হবে না। তাছাড়া চরিত্র গঠনে গৃহ পরিবেশেরও (Home) যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাই গৃহ পরিবেশকেও

নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার দ্বারা চরিত্র গঠন করা সম্ভব হবে না। তবু শিক্ষক তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সব সময় চেষ্টা করবেন, শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের জন্য।

প্রশ্নাবলী

1. What is character? How can the educator guide the pupils' character formation. [N. B. U. B. T. '69]
   [পৃঃ ৮২-৮৩ ; ৯১-৯৫]
2. What is character? How can the home and school help in developing character? [C. U. B. T. '66]
   [পৃঃ ৮২-৮৩; ৯১-৯৫]
3. What is character? What are the marks of good character? Discuss how character develops.
   [পৃঃ ৮২-৯১]
4. Write a short essay on character & Education.
   [পৃঃ ৯১-৯৫]
5. Write notes on the following :—
   (a) Marks of good character. [পৃঃ ৮৪-৮৭]
   (b) Character & self-regarding sentiment. [পৃঃ ৮৯-৯১]
   (c) Teachers' role in character formation. [পৃঃ ৯১-৯৫]

শিক্ষা-মনোবিদ্যা ও শিক্ষকের সমস্যা

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হ'ন। এই সব সমস্যাগুলোকে মনোবিদ্যার জ্ঞানের দ্বারা সমাধান না করতে পারলে, তিনি কখনওই সার্থকভাবে পাঠদান করতে পারবেন না। শিক্ষকের এই সব সমস্যা কখন কি অবস্থায়, কি ভাবে আসবে তা বলা মুশকিল। তবে সাধারণভাবে কতকগুলো সমস্যা আমাদের সামনে সব সময়ই থাকে। এই রকম কতকগুলো সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করেছি।

প্রথমতঃ বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন হওয়ায় এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর এসে পড়েছে। এই দায়িত্বের তাৎপর্য কি; এবং কিভাবে এই দায়িত্ব পালন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে "শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা" অধ্যায়ে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীতে পড়াতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই কিছু ছাত্র থাকে যারা খুব উৎসাহী এবং প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন এবং কিছু ছাত্র থাকে যাদের আমরা বোকা বা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন বলে থাকি। এই উভয় দলই আমাদের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে। এদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ শ্রেণী কক্ষে আচরণগত অসঙ্গতি একটা সাধারণ ঘটনা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আচরণগত অসঙ্গতি, শিক্ষার কাজকে ব্যহত করে। এই অসঙ্গতি মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। এই সব অসঙ্গতিকে কি ভাবে দূর করা যায়, তাদের কারণই বা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, "মানসিক স্বাস্থ্য" অধ্যায়ে।

চতুর্থতঃ শিখন বা শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিসত্বার যে উন্নতি হয়েছে, তা সঠিক ভাবে পরিমাপ করার দায়িত্বও শিক্ষকের। ব্যক্তির বিকাশ সংক্রান্ত যে সব তথ্য আমরা সংগ্রহ করি, সে গুলোকে তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে কি ভাবে পরিবেশন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, "শিক্ষার রাশিবিজ্ঞান" অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিচ্ছেদে। এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সব আধুনিক কৌশল আজকাল ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে শেষ অধ্যায়ে "শিক্ষার পরিমাপ"-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা
[EDUCATIONAL & VOCATIONAL GUIDANCE]

গত কয়েক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের উন্নতি হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল "নির্দ্দেশনার ধারণার" বিকাশ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব শিক্ষাবিদ্‌রা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন, ফলে তার বিকাশও হয়েছে খুব দ্রুত। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন 'নির্দ্দেশনা' (guidance) কথাটা আজকাল সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ্, শিল্পপতি, রাজনৈতিক প্রত্যেকেই ব্যবহার করছেন, এবং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক কথায়, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি মানব কল্যাণে আগ্রহী তিনিই যথাযোগ্য নির্দ্দেশনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু নির্দ্দেশনার এই সামাজিক গুরুত্ব বা মানবিক গুরুত্ব উপলব্ধির ফলে, এই প্রক্রিয়া বহুল প্রচার ও প্রয়োগ খুব অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধি পেলেও, এই নির্দ্দেশনার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও অর্থ সম্পর্কে এখনও অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে। এমন, অনেক শিক্ষাবিদ্, মনোবিদ্ যাঁরা এই নির্দ্দেশনা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তাঁদেরও এই 'নির্দ্দেশনা প্রক্রিয়া' (guidance) সম্পর্কে বিশদ ধারণা নেই। সুতরাং, বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার গুরুত্ব তাৎপর্য্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে 'নির্দ্দেশনা' বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

সূচনা

নির্দ্দেশনার অর্থ কি ? [Meaning of Guidance] :—

ইংরাজী guidance কথাটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। তাই তার এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি, তা অনেক সময় আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। নির্দ্দেশনা বলতে অনেক সময় বুঝি, 'নির্দ্দেশ করা' (to point out); আবার কোন সময় বুঝি, 'পরিচালনা করা' (to direct); কোন সময় শুধুমাত্র 'সাহায্য'কেও (to help) নির্দ্দেশনা হিসাবে বিবেচনা করি। কোন ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াকেও নির্দ্দেশনা বলে থাকি। সাধারণভাবে এই অর্থগুলো বিশ্লেষণ করলে, 'নির্দ্দেশনা' সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে এটা এক ধরনের ব্যক্তিগত সাহায্য (personal help)। অর্থাৎ, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে বিশেষ কোন অজানা পথে পথনির্দ্দেশে যে সাহায্য করেন তাই হ'ল নির্দ্দেশনা (the help given by a guide in a personally conducted expedition is

নির্দ্দেশনার সংকেত

guidance)। যিনি প্রকৃত নির্দ্দেশক তিনি কখনও নিজের মত বা অভিজ্ঞতা অন্যের উপর চাপিয়ে দেন না। তিনি পেছনে থেকে সাহায্য প্রার্থনা করলেই সাহায্য করেন মাত্র। তাই নিজের মত বা অভিজ্ঞতাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়াকে নির্দ্দেশনা বলা যায় না। অধ্যাপক জোনস্ (Jones) নির্দ্দেশনার এই তাৎপর্য্যকে পরিস্ফুট করার জন্য বলেছেন—নির্দ্দেশনার মধ্যে ব্যক্তিগত সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে ; কিন্তু সে সাহায্যের প্রকৃতি একটু ভিন্ন। নির্দ্দেশনা বলতে, সেই রকম সাহায্যকে বলছি যা ব্যক্তিকে তার উদ্দেশ্য স্থাপনে সহায়তা করবে ; নির্দ্দেশনা বলতে আমরা সেই রকম সাহায্যকে বলছি, যা ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পন্থার নির্ধারণে সহায়তা করবে ; এবং সবশেষে নির্দ্দেশক বলতে আমরা সেই ধরনের সাহায্যকে বলছি, যা ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। নির্দ্দেশনার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যক্তির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে দেওয়া নয়, তার নিজের সমস্যা, নিজে সমাধানে সহায়তা করা। নির্দ্দেশনার কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তির সমস্যা নয়, ব্যক্তি নিজে। তাই খুব সাধারণভাবে নির্দ্দেশনা কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বলতে গেলে বলতে হয়—**ব্যক্তির আত্মমুখী বিকাশে তাকে সহায়তা করার প্রক্রিয়াই হ'ল নির্দ্দেশনা।** মনোবিদ্ ক্রো (Crow) বলেছেন, "নিজের জীবনের বিভিন্ন কাজ সুসম্পন্ন করতে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে এবং নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজে পালন করতে **যে কোন বয়সের ব্যক্তি অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে যে সাহায্য নেয় তাই হ'ল নির্দ্দেশনা।**[1] নির্দ্দেশনাকে এই অর্থে বিবেচনা করলে, শিক্ষাকেও এক ধরনের নির্দ্দেশনা বলা যেতে পারে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে শিক্ষা এবং নির্দ্দেশনা সমধর্মী। জোন (Jones) বলেছেন, শিক্ষা এবং নির্দ্দেশনা উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা। তিনি বলেছেন "...the purpose of guidance is to help the individual to discover his own needs, to assess his own potentialities and to gradually develop his life goals, that are individually satisfying and socially desirable, to formulate plans of action in the service of these goals and to proceed in their realization."[2]

---

1. "Guidance is assistance made available by personally qualified and adequately trained men or women to an individual of any age to help him manage his own life activities, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden."

—Crow & Crow : An Introduction to guidance.

2. Principles of guidance : Jones.

নির্দ্দেশনার শ্রেণীভেদ [Types of Guidance] :—

শিক্ষা ও নির্দ্দেশনা ব্যক্তিজীবনের সব অঙ্গকেই স্পর্শ করে। পূর্বে নির্দ্দেশনার সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি ; ব্যক্তিজীবনের যে কোন ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সাহায্য তাই হ'ল নির্দ্দেশনা। তাই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ভেদে নির্দ্দেশনাকেও শ্রেণীবিভাগ করার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে মানুষের জীবনের কোন এক আচরণ ক্ষেত্রকে অন্য ক্ষেত্র থেকে পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় না। প্রত্যেকেই পরস্পর যুক্ত। তাই বিভিন্ন ধরনের নির্দ্দেশনা সম্পর্কে মনোবিদ্‌রা উল্লেখ করলেও, তাদের যে কোন একটার আলোচনা অপরগুলোকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় না। তবে মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন ধরনের নির্দ্দেশনায়, মানুষের জীবন বিকাশের এক একটা দিকের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এইটুকু বলা যায় মাত্র। তাঁরা নির্দ্দেশনার যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা বলেছেন, তা হ'ল—

বিভিন্ন ধরনের নির্দ্দেশনা

[এক] **পারিবারিক নির্দ্দেশনা (Home and family guidance),**

[দুই] **অবসর সময় যাপনের নির্দ্দেশনা (Liesure time guidance),**

[তিন] **দৈহিক বিকাশমূলক নির্দ্দেশনা (Guidance for Physical development & Health),**

[চার] **ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশমূলক নির্দ্দেশনা (Personality guidance),**

[পাঁচ] **ধর্মীয় নির্দ্দেশনা (Religious guidance),**

[ছয়] **সামাজিক নির্দ্দেশনা (Social guidance),**

[সাত] **শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনা (Educational guidance),**

[আট] **বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা (Vocational guidance)।**

এই আট রকমের নির্দ্দেশনার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দেওয়াই এদের উদ্দেশ্য। তবে এই সঙ্গে তাদের সঙ্গে যে বিভেদের সীমারেখা টানা হয়েছে, তা খুব স্পষ্ট নয়। কারণ, মানুষের জীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে, যাকে আমরা শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক সমস্যা বা শিক্ষামূলক সমস্যা বা পারিবারিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতে পারি না। একই সমস্যারই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম তাৎপর্য্য থাকা স্বাভাবিক। তাই এই শ্রেণীবিভাগের উপর যদি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি,

তাহ'লে নির্দ্দেশনার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং স্বাভাবিক ভাব অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। নির্দ্দেশনার এই শ্রেণীবিভাগ শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য ; তাদের প্রকৃতিগত বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই ; এই ধারণা মনে রেখে আমরা এখানে শুধুমাত্র **শিক্ষামূলক** (educational) ও **বৃত্তিমূলক** (vocational) **নির্দ্দেশনা** সম্পর্কে আলোচনা করব।

নির্দ্দেশনার সাধারণ অর্থ ও নির্দ্দেশনার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিকে যথাক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে সহায়তা করা। **মনোবিদ্ সুপার** (Super) বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তা আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি নির্দ্দেশনাকে বিশেষ এক ধরনের সাহায্যের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিকে আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে, এবং তার কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা বিকাশে সহায়তা করা যায়। এবং সবশেষে, এই সাহায্যের দ্বারা ব্যক্তির আত্ম-তৃপ্তি আসে এবং সামাজিক উন্নতিও হয়। সুপারের (D. E. Super) নিজের ভাষায়—"Vocational guidance is the process of helping a person to develop and accept an integrated picture of himself and of his role in the world of work, to test his concepts against reality with satisfaction to himself and benifit to society." অনুরূপভাবে, শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনা হ'ল নিজের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করা। সাধারণভাবে নির্দ্দেশনার এই দুই ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করে আমরা কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য স্থাপন করতে পারি।

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা কি ?

বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার (vocational guidance) উদ্দেশ্য হ'ল—

[এক] ব্যক্তিকে কর্ম নির্বাচনে সহায়তা করা (Vocational choice) ।

[দুই] ব্যক্তিকে বৃত্তি উপযোগী প্রস্তুতিতে সহায়তা করা (Vocational preparation) ।

[তিন] ব্যক্তিকে বৃত্তি খুঁজে পাওয়ায় সাহায্য করা (Securing vocation) ।

[চার] ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়ায় সহায়তা করা এবং তার কর্মজীবনের কৃতকার্য্যতায় সহায়তা করা ।

অন্যদিকে, শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনার (Educational guidance) উদ্দেশ্য হ'ল—

[এক] বিদ্যালয় নির্বাচনে সহায়তা করা।

[দুই] বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনে সহায়তা করা।

[তিন] কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হ'তে সাহায্য করা।

[চার] বিশেষ ধরনের পাঠ্যসূচী নির্বাচনে সহায়তা করা।

[পাঁচ] নির্বাচিত পাঠ্যসূচী সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে সহায়তা করা।

নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা [Need for guidance] :—

প্রত্যেক মানুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে অন্যের সাহায্য চায়। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সমস্যা আসে, আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সে সাহায্য ভিক্ষা করে। তবে কেউ হয়তো খুব বেশী সাহায্য প্রয়োজন বোধ করে; আবার কেউ খুবই কম। মানুষের এই পারস্পরিক নির্ভরতার নীতির উপর ভিত্তি করেই নির্দেশনার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু, নির্ভরশীলতা যদিও মানুষের সাধারণ ধর্ম, তবুও আধুনিক জীবন পরিবেশ বিশেষভাবে কিছু কিছু অবস্থার সৃষ্টি করে, যার জন্য নির্দেশনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাই সাধারণ মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও আধুনিক সামাজিক বিবর্তনমূলক নানা অবস্থা, নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্তিজীবনে বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে, আমরা এই সব অবস্থা (condition) বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। বৃত্তিমূলক এবং শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক সমাজে দু'দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার জন্য ব্যক্তি প্রকৃতভাবে অন্যের বা অন্য অভিজ্ঞব্যক্তির সাহায্য চায়। তার অভাবে সে সমাজ-জীবনের পক্ষে অচল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্যভাবে অভিযোজন করার জন্যও নির্দেশনার দরকার। আধুনিককালে, শিক্ষাক্ষেত্রে, নানা রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, শিক্ষার আদর্শ, বিদ্যালয়ের সংগঠন, পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে অনেক অভিনবত্ব এসেছে। এই সব নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনের জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দেশনা দিতে হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি আধুনিককালে নির্দেশনার (guidance) প্রয়োজনীয়তা দু'দিক থেকে অনুভূত হয়ে—একটা হ'ল সামাজিক পরিবর্তনের দিক থেকে এবং অপরটা হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রের নানা রকম

সামাজিক চাহিদা ও শিক্ষাগত চাহিদা

পরিবর্তনের দিক থেকে। এখন আমরা এই সব পরিবর্তন এবং তাদের নির্দ্দেশনামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

সামাজিক পরিবর্তন ও নির্দ্দেশনার গুরুত্ব :—

সামাজিক পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে ব্যক্তির বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তবে এই সব পরিবর্তন ব্যক্তির সাধারণ অভিযোজনের (adjustment) সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন—

[এক] আধুনিক কালে পরিবারের (family) বা গৃহের (home) সম্পর্কের অনেক পরিবর্তন হয়েছে; তার কাজেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে শিশুরা পরিবারের মধ্যে বসবাস করতে করতেই নানা ধরনের শিক্ষা পেত, ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ তাদের হ'ত। সব শিক্ষাই তাদের পর্য্যবেক্ষণ (observation) এবং অনুকরণ (imitation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হ'ত। প্রাচীন কালে, শিশুরা এমন অনেক জীবন ধারণের কৌশল, সাধারণভাবে গৃহ পরিবেশে শিখত যা আধুনিক কালে আমরা বিশেষ পারদর্শিতা হিসাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা করে থাকি। নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক উন্নতি, ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞের চাহিদা, সমাজ ব্যবস্থায় গৃহের 'শিক্ষার গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের উপর অনেক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের কেবলমাত্র দায়িত্ব পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া নয়; ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও তার উপর এসে পড়েছে। ফলে এই বৃহত্তর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য নির্দ্দেশনাকে (guidance) তার অঙ্গীভূত করা ছাড়া উপায় নেই।

[দুই] শিল্পক্ষেত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সেখানেও অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক যুগকে বিশেষজ্ঞের যুগ (age of specializatian) বলা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের কাজ করতে হয় এবং নিখুঁতভাবেই তা সম্পন্ন করতে হয়। পূর্বে একই ব্যক্তি কোন কাজের বিভিন্ন অংশ একাই সম্পন্ন করত। কিন্তু আজকে, সামান্য একটা কিছু জিনিস তৈরী করতে হ'লেও তার ছোট ছোট অংশ গুলো পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পন্ন করে থাকেন। এই ধরনের কাজের বণ্টন ও বিশেষ ধর্মীতা নির্দ্দেশনাকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

[তিন] আর এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন, যা নির্দ্দেশনার গুরুত্বকে বিশেষভাবে স্থাপিত করেছে, তা হ'ল আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ সংগঠন। আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, প্রায় সবাইয়ের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরের দিকে চলে আসার। এর ফলে শিল্প নগরীকে কেন্দ্র

করে গড়ে উঠছে নূতন সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজে বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার আচরণ সম্পন্ন লোকেরা একত্রে বাস করছে। সৃষ্টি হচ্ছে মিশ্র সংস্কৃতির। আর এই ধরনের সমাজে সার্থকভাবে অভিযোজন করা ব্যক্তির কাছে একটা বিরাট সমস্যা। এই অভিযোজনের যথাযোগ্য সাহায্য প্রত্যেক ব্যক্তি সচেতন বা অবচেতনভাবে প্রার্থনা করে। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় সবাইকে সুখী সদস্য করে তুলতে হ'লে যথাযোগ্য নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের স্বাভাবিক ধর্মের উপর শুধু ছেড়ে দিলে চলবে না।

[চার] আধুনিক কালে, আমরা লক্ষ্য করছি, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা জেগেছে। আমাদের দেশের কথাই যদি ধরা যায়, স্বাধীনতার পূর্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে এত শিক্ষার চাহিদা (demand for general education) ছিল না। এই চাহিদার ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, বিদ্যালয়ে তাদের স্থিতিকালও বেড়েছে। আগে যাদের পড়াশুনা পাঠশালার স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যা ১০ বৎসর বয়সেই শেষ হয়ে যেত, তারাই আজকে সতের/আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। সুতরাং, যে বয়সে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম বিশেষ অনুরাগ বা ঝোঁক পরিপূর্ণভাবে দানা বেঁধে ওঠে, সে বয়সেই তারা বিদ্যালয়ে থাকছে। সুতরাং, তাদের বৃহত্তর জীবনের জন্য যথাযোগ্য নির্দেশনা দেওয়া এই সময় একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, সাধারণ শিক্ষার চাহিদা ও সুযোগ শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

[পাঁচ] আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যা বিশেষভাবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। যাদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা উচিত, তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে, পড়াশুনা করতে পারছে না; আবার, যাদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার মত মানসিক ক্ষমতা নেই, তারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকার জন্য, পড়াশুনার দিকে আসছে। এর ফলে একদিকে মানুষের শক্তির অপচয় হচ্ছে; অন্যদিকে তার যথার্থ শক্তির বিকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। রাষ্ট্রের দিক থেকে অর্থনৈতিক ও মানসিক শক্তির অপচয় দুই হচ্ছে। তাই এই ধরনের পরিস্থিতিকে দূর করবার জন্য যথাযোগ্য নির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন।

[ছয়] আধুনিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, যান্ত্রিক উন্নতির ফলেও, মানুষের অবসর বেড়েছে। আজকের মানুষকে জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয় তার তুলনায় প্রাচীনকালে অনেক বেশী করতে হ'ত।

প্রাচীনকালে, মানুষের দিনের সব সময়টাই, এই কাজে ব্যয়িত হ'ত। কিন্তু এই অবসর (leisure) আমাদের জীবনে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই অবসর সময়ে সে যাতে অসামাজিক কিছু কাজে না লিপ্ত হয়ে পড়ে ; এই অবসর কালকে যথাযোগ্য ব্যবহার করে যাতে সে নিজের ব্যক্তিগত গুণ-গুলোকে প্রকাশ করতে পারে, তার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে এই যন্ত্র যুগে, মানুষের মানসিকতাও যান্ত্রিক হয়ে যাবে। এই কারণে অবসর যাপনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিকমত নির্দ্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন।

[সাত] সবশেষে, আধুনিক সামাজিক পরিবর্তন, মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। মানুষের আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে ; নৈতিক মূল্য বোধ কমে আসছে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরে আনার জন্য, তার নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য যথাযোগ্য নির্দ্দেশনার প্রয়োজন। কারণ, আগে মানুষের ধর্মীভাব এই কাজ করত, কিন্তু আজকে তার সেই ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। সুতরাং, এই আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ প্রকৃতি বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনার প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তৈরী করে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই আধুনিক শিক্ষায়, নির্দ্দেশনার অন্তর্ভূক্ত, সামাজিক এই সব চাহিদা পরিতৃপ্তির অনুকূলে কাজ করবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন ও নির্দ্দেশনার গুরুত্ব :—

আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানারকম প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গকে নবরূপে সজ্জিত করা হচ্ছে, ব্যক্তির সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভিক চাহিদাকে মেটানোর জন্য। কিন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে সমান তালে নিজেকে মানিয়ে চলার জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সাহায্য করারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই কারণে, নির্দ্দেশনা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় কৌশল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারী, 1966), মন্তব্য করেছেন—"The aim of guidance is both adjustive and developmental ; it helps the students in making the best possible adjustment to the situations in the educational institution and in home and at the same time facilitates the development of personality. Guidance, therefore, should be regarded as an integral part of education and not a special psychological or social

service which is perepherial to educational purpose."[1] শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন, নির্দ্দেশনাকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে তা হ'ল—

[এক] বর্তমান কালে, শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে, অনেক বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সব বৃত্তিমূলক পাঠ্যসূচীর নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা না করতে পারলে, শিক্ষার্থীরা সার্থকভাবে সমাজ পরিবেশে এবং কর্ম পরিবেশে অভিযোজন করতে পারবে না। বহুমুখী পাঠ্যসূচীর (diversified courses) সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদ্যালয়ে যদি নির্দ্দেশনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারি, এই পাঠ্যক্রমের যে উদ্দেশ্য তা কখনওই সফল হবে না।[2]

[দুই] বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্য্যাবলীর (Co-curricular activities) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণা, এই সব সহ পাঠ্যক্রমিক কার্য্যাবলী, শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ জীবন বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। আর এই সব সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্য্যাবলী সার্থকভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে নির্দ্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

[তিন] আধুনিক কলে শিক্ষা পদ্ধতির (teaching method) অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সব আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী তার শিক্ষার দানের পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে, এটাই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা। তাই শিক্ষক কি পদ্ধতি নির্বাচন করবেন, তার জন্য তাকে যথাযোগ্য নির্দ্দেশনার আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ, আধুনিক শিক্ষাজগতে, পাঠদানও নির্দ্দেশনার অন্তর্গত।

[চার] সবশেষে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পর শিক্ষার্থীরা বেশীর ভাগই বিশেষ বিশেষ কর্ম পরিস্থিতিতে প্রবেশ করবে। তাই বর্তমানে, শিক্ষালয়ে, শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক অনুরাগ (vocational interest) সৃষ্টি করা শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্গত। এবং এই বৃত্তিমূলক অনুরাগ ও শিক্ষামূলক অনুরাগ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দ্দেশনার প্রয়োজন।

---

1. Report of the Indian Education Commission, 1964-66.

2. The provision of diversified courses of instruction imposes on teachers and social administrators the additional responsibility of giving proper guidance to the pupils, in the choices of courses and carrier,"
—Report of the Indian Education Commission, 1964-66.

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার জন্য তথ্য [Basic data necessary for Educational and Vocational Guidance] :—

কোন ব্যক্তি যে পরিস্থিতিতে সাহায্য ভিক্ষা করে, তা অনেক সময় সহজ হ'তে পারে, আবার অনেক সময় কঠিনও হতে পারে। যদি সমস্যামূলক পরিস্থিতি খুব সহজ হয়, সে ক্ষেত্রে অনেক কম তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্দ্দেশনা দেওয়া যায়। আবার পরিস্থিতি জটিল হলে সে ক্ষেত্রে অনেক বেশী তথ্যের প্রয়োজন হয়। তবে পরিস্থিতি সহজই হউক বা জটিলই হউক, যে কোন ধরনের নির্দ্দেশনার জন্য যত বেশী পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, তত নির্দ্দেশনার কাজ ভাল হবে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কি কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন হবে, তা নির্ভর করবে সমস্যার প্রকৃতির উপর ঠিকই। কিন্তু, সাধারণ ভাবে কতকগুলো তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের নির্দ্দেশনা দিতে হয়। সাধারণতঃ শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য, মনোবিদ্‌রা বলেছেন, চার ধরনের তথ্যের প্রয়োজন। এই চার ধরনের তথ্য হ'ল— **(1) ব্যক্তিগত তথ্য (Individual data), (2) সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথ্য (Socio-economic data), (3) বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য (Occupational data)** এবং **(4) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (Educational data)**।

নির্দ্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য

১। ব্যক্তিগত তথ্য [Individual Data] :—

বৃত্তিমূলক বা শিক্ষামূলক যে কোন ধরনের নির্দ্দেশনার জন্য, প্রথম যে ব্যক্তিকে নির্দ্দেশনা দেওয়া হবে, তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। অর্থাৎ, ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ এবং বৈশিষ্ট্য কি কি আছে, তা সঠিকভাবে না জানলে, তাকে নির্দ্দেশনা দেওয়া যাবে না। ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নানা রকমের অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন, ব্যক্তি কি করতে পারে, কি পারে না, কি ধরনের বিষয় (school subject) আয়ত্ব করতে পারে, কি ধরনের বিষয় আয়ত্ব করতে পারে না, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য পারদর্শিতা পরিমাপক অভীক্ষা (Achievement test) ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির জন্মগত সাধারণ মানসিক ক্ষমতা কি আছে তা পরিমাপ করার জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির মধ্যে কি কি ধরনের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা আছে, তা নির্ণয় করার জন্য সম্ভাবনার অভীক্ষা (Aptitude test) প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তির অনুরাগ কোন কোন বিষয়ের উপর আছে, তা বের করার জন্য

অনুরাগ নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (interest inventories) ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিসত্বার গুণ পরিমাপক অভীক্ষা (personality test) ব্যবহার করা হয়। এই সব অভীক্ষার ফল এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ব্যক্তি নিজে কিরূপ তা সঠিকভাবে না জানলে, তার কি রকমের সাহায্য প্রয়োজন; তার জীবন বিকাশ কোন পথে পরিপূর্ণ হবে, এ সব সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারব না। শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা যদি আমাদের না থাকে, তাহ'লে, আমরা তাদের কোন রকম নির্দ্দেশনাই দিতে পারব না। তাই সর্ব প্রথম জানার দরকার শিক্ষার বা কর্মের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য আসার সম্ভাবনা আছে। এবং এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের কাজ করতে হবে।

২। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথ্য [Socio-Economic Data] :—

শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গুণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে না। ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ সম্পর্কেও বিশদ ভাবে জানার দরকার। নির্দ্দেশনাতাত্বিক কিছু ব্যাপার নয়। এটা মনোবিদ্যার প্রয়োগমূলক দিক। সুতরাং যে নির্দ্দেশনার ব্যবহারিক কোন মূল্য নেই, তা নির্দ্দেশনাই নয়। নির্দ্দেশনার উদ্দেশ্য শুধু মৌখিক উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা যখন, শিক্ষামূলক বা বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা দেব, তখন আমাদের বিবেচনা করে দেখার দরকার ব্যক্তি নির্দ্দেশিত পথে বিকাশের সুযোগ পাবে কি না। কারণ, আমরা তাকে শিক্ষার দিক থেকে যে পথের নির্দ্দেশনা দিলাম, তা হয়ত পড়বার সুযোগ তার বাড়ীর কাছাকাছি নেই; আবার দূরে থাকলেও সেখানে গিয়ে থেকে পড়াশুনাও করার আর্থিক সঙ্গতি হয়ত তার নাই। বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তা করার দরকার কি কি ধরনের বৃত্তি আমাদের দেশে বর্তমান। সুতরাং নির্দ্দেশনাকে ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন করে তুলতে হ'লে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক থেকেও নানা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া যে কোন ধরনের নির্দ্দেশনা দিতে গেলে, ব্যক্তির পরিবার ও পরিবেশ সংক্রান্তও কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়। কারণ, আধুনিক মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, পরিবারের অর্থ নৈতিক অবস্থা (economic status), বাবা-মায়ের কাজ (parental occupation), ইত্যাদি উপাদান শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম নির্বাচন এবং বৃত্তি নির্বাচনকে (educational and vocational choice) বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং, এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

৩। বৃত্তিমূলক তথ্য [Occupational Data] :—

এছাড়া, বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার জন্য বৃত্তি সংক্রান্ত বিশেষ রকমের তথ্য প্রয়োজন আছে। কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দেশনা দিতে গেলে, যিনি নির্দ্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকার দরকার। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কি ভাবে কাজ হয়, কি ধরনের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, বিভিন্ন চাকুরিতে কি ধরনের উন্নতির (promotion) সুযোগ আছে, চাকুরি পাওয়ার জন্য, কি কি গুণ থাকার দরকার, ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে, নির্দ্দেশনা দেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা দিতে হ'লে, প্রত্যেক বৃত্তিতে সাফল্যের জন্য কি কি ধরনের মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও বিজ্ঞান সম্মত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মনোবিদ্‌রা মনে করেন প্রত্যেক বৃত্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করতে হ'লে, ব্যক্তির বিশেষ মানসিক ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন। অর্থাৎ, শিক্ষকতা কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য যে মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, কোন কারখানায় বিশেষ কাজ করার জন্য সে রকমের মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক কাজই, নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলো দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। ব্যক্তিকে নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য তার নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গুলোকে, বৃত্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হয়। এই কারণে, বৃত্তি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ছাড়াও, বিশ্লেষনাত্মক তথ্যও নির্দ্দেশনার জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। বৃত্তি সম্পর্কে এই সব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিদ্‌রা যে বিশেষ কৌশলের প্রয়োগ করেন তাকে বলা হয় কর্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (job analysis)। এছাড়া, বিভিন্ন সূত্র থেকে বৃত্তি সম্পর্কে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করা যায়। বিশেষ ভাবে বিভিন্ন সংস্থার পারশোনেল বিভাগ, বিশেষ বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকেও বৃত্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৪। শিক্ষামূলক তথ্য [Educational Data] :—

শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্যও অনুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষাস্তরে কি কি ধরনের বিদ্যালয় আছে ; কোথায় কি ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় ; কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কি ধরনের শিক্ষাগত মান দরকার, ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করতে হবে যথাযোগ্য নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য। তাছাড়া আজকাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঐচ্ছিক বিষয় সমূহের প্রবর্তন হওয়ায়, বিষয়

নির্বাচনের একটা গুরুত্ব সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঠিক ভিন্ন বৃত্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি, বিভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা, মানসিক প্রস্তুতি, এবং অনুরাগের প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক নির্দ্দেশনা দিতে গিয়ে, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গুলোকে পাঠ্যক্রমের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এই ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণী, প্রস্‌পেক্টাস্, ইত্যাদি থেকে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রগতির হার অনুশীলন করে ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করা যায়, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য শিক্ষকরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার দরুণও পেতে পারেন।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, নির্দ্দেশনার জন্য কতটুকু তথ্য প্রয়োজন হবে, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। আর ব্যক্তিজীবনে কোন কোন দিক থেকে নির্দ্দেশনার তাগিদ আসবে, তাও পূর্বে থেকে আন্দাজ

আলোচনা

করা সম্ভব হয় না। তাই নির্দ্দেশকের বা সহায়কের (guidance councellor) কাজ হবে, যেখান থেকে যত রকম সম্ভব তথ্য পাওয়া যায়, সবই সংগ্রহ করা। বর্তমান পরিস্থিতি যে তথ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই মনে হচ্ছে, পরবর্তী যে কোন পরিস্থিতিতে সেই তথ্যকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। তাই যে কোন জায়গা থেকে যে কোন ধরনের তথ্যই পাওয়া যাক না কেন, তাকেই যত্ন করে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে, একটা কথা উল্লেখ করার দরকার। নির্দ্দেশনা ব্যক্তিজীবনের যে কোন অবস্থায়ই প্রয়োজন হতে পারে। তাই ব্যক্তি সংক্রান্ত সমস্ত সংগৃহীত তথ্যকে যত্ন করে গচ্ছিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্যকে তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। এই সব রীতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড কার্ড (cumulative record card), অ্যানেকডটেল রেকর্ড (anecdotal record) এবং ব্যক্তিগত প্রোফাইল (individual profile)। অনুরূপ ভাবে, বিভিন্ন বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যকে ও বৃত্তিগত প্রোফাইল (job profile), বৃত্তিসংক্রান্ত পুস্তিকা (career booklet) ইত্যাদির সাহায্যে সংরক্ষণ করা যায়।

বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনা দানের পদ্ধতি [Method of school guidance] :—

বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনার সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে

আমাদের এই আলোচনার কলেবর অনেক বেশী বেড়ে যাবে। সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশনা সূচী পরিচালনার জন্য যে সব বিষয় গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, তার সবকিছু বিদ্যালয়ে করা সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে বিদ্যালয়ে সামগ্রিক নির্দ্দেশনার কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা উচিত। একে বলা হয় সহায়ক (counsellor)। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন সহায়ক নিয়োগ করারও কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে নির্দ্দেশনার দায়িত্ব একজন শিক্ষককেই তার দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে সম্পন্ন করতে হয়। একে নাম দেওয়া হয়েছে কেরিয়ার মাষ্টার (career master)। ফলে, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনার সম্পূর্ণ কাজটাই আংশিক ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। তাই আদর্শগত ভাবে কি হওয়া উচিত তা বিবেচনা না করে, এই সব 'কেরিয়ার মাষ্টার'রা কি ভাবে তাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেন, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা কিছু উল্লেখ করব।

বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজ

[এক] বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য ভার প্রাপ্ত শিক্ষক (career master), বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারেন। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান করা উচিত। শিক্ষকদের মধ্য থেকে বক্তা নির্বাচন করে এক একদিন এক একটা বিষয়ের উপর বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানও যেমন বাড়ে, তেমনি বৃত্তিমূলক অনুরাগও (interest) দেখা যায়। তবে এই ধরনের বক্তৃতার ব্যবস্থাপনা করার সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিমনের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

[দুই] এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টির জন্য, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের (excursion) ব্যবস্থা করতে হবে।

[তিন] বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের কোন দিকে আগ্রহ আছে, তা নির্ণয় করতে হবে। এই সব সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মধ্যে দিয়ে একদিকে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিকাশ করতে পারে, অন্যদিকে তাদের বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি অনুরাগও সৃষ্টি হয়।

[চার] প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে তাদের নির্দ্দেশনা কাজ পরিচালনা করা যাবে না। তাই বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (test) শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করতে হবে, এবং তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারিবারিক তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে, বিভিন্ন জায়গা থেকে।

[পাঁচ] তথ্য সংরক্ষণের জন্য কিউম্যুলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড তৈরী করতে হবে বা ব্যক্তিগত প্রোফাইল (individual profile) তৈরী করতে হবে। এই রেকর্ড এর সাহায্যে নির্দ্দেশনা দিতে হবে।

[ছয়] পিতা মাতার ইচ্ছা অনুরাগ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য এবং নির্দ্দেশনার প্রতি তাঁদের আস্থা আনার জন্য, তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে। এই ধরনের বৈঠক (parent teacher conference) শিক্ষক এবং অভিভাবকদের চিন্তা ধারার মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করবে।

[সাত] এছাড়া, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যেও আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব আলোচনা থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী সম্পর্কে নানা রকমের তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষকদের সুবিধা, অসুবিধা এবং নির্দ্দেশনার প্রতি মনোভাব সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

[আট] সবশেষে, প্রত্যক্ষভাবে নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের (interview) ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব সাক্ষাৎকারে, সাধারণ ভাবে কথা বার্তার মাধ্যমে নির্দ্দেশনা দানের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সম্পর্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য যাচ্রাই করে দেখবেন এবং বিচার বিবেচনা করে তাদের যথাযোগ্য নির্দ্দেশনা দেবেন। এই নির্দ্দেশনা দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে তাঁর কাজ শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করা নয়। নির্দ্দেশনা সবসময়েই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। যদি কোন বিশেষ কাজে শিক্ষার্থীকে নিরুৎসাহী করতে হয়, তবে তার জন্যও শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, উপরোক্ত সব কাজের মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনার কাজ পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা সার্থকভাবে নির্দ্দেশনা দেওয়া যায় না। তবে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে, আমরা বলতে পারি, এইটুকু কাজ করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্যের পথে অন্ততঃ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারব। তবে আদর্শগতভাবে নির্দ্দেশনার থেকে ভাল ফল পেতে হ'লে, আরও সামগ্রিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এবং এই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ সহায়ক (counsellor) নিয়োগ করতে হবে।

আলোচনা

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা ও শিক্ষকের দায়িত্ব [Educational & Vocational Guidance and Teachers responsibilities] :—

বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশনা দেওয়ার জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সব সময় একক ভাবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না।

তাই নির্দ্দেশনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে, এই কাজে অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতাও তাঁকে প্রার্থনা করতে হবে। শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে অনেক গভীর ভাবে মেলামেশা করেন। ফলে, ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য তাঁরা সরবরাহ করতে পারেন। নির্দ্দেশনা যেহেতু বিদ্যালয়ের কাজের একটা অংশ এবং শিক্ষকদের কাজকে সহায়তা করার জন্য একই উদ্দেশ্য নিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে, শিক্ষকদের এবিষয়ে কিছু করণীয় আছে। সাধারণতঃ নির্দ্দেশনার বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী, শিক্ষকের কর্তব্যকে আমরা চারটে সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

শিক্ষকের দায়িত্ব

প্রথমতঃ শিক্ষক ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা 'কেরিয়ার মাষ্টার'কে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগেও তিনি সাহায্য করতে পারেন। এতে করে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজ অনেক কমে যায়। তিনি কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড কার্ড তৈরী করায় ও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। সবশেষে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্ত্বা সংক্রান্ত নানা ধরনের অভিজ্ঞতা তিনি সরবরাহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাগত ও বৃত্তি তথ্য সংগ্রহেও শিক্ষক সাহায্য করবেন। তিনি যে বিষয় পড়ান, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্য তিনি সরবরাহ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার বিষয়ের বৃত্তিমূলক উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বাড়ে এবং বৃত্তিমূলক আগ্রহেরও বিকাশ হয়। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তি বা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে নানা রকমের তথ্য তিনি আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবগত করতে পারেন। কারণ এই ধরনের তথ্য শিক্ষার্থীদের অবগত করাও নির্দ্দেশনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক সময় বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা ব্যক্তিজীবনে পরবর্তীকালে অকৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী। কোন ছাত্রের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রতি ঝোঁক আছে; কিন্তু সে জানে না যে ঐ বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়। ফলে, যখন পড়তে গিয়ে দেখে, সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলেজে থাকতে হয়, তখন তার পক্ষে পড়াশুনা চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনিভাবে অজ্ঞতাপূর্ণ বৃত্তিমূলক আগ্রহ জীবন বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কারণে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয় ও বৃত্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া নির্দ্দেশনার অন্তর্ভূক্ত। এই কাজ শিক্ষকরা খুব সহজভাবে পালন করতে পারেন। এই ধরনের তথ্য

সরবরাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (career master) যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তার সঙ্গে সহযোগিতা করা শিক্ষকের দায়িত্ব।

তৃতীয়তঃ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দ্দেশনার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করবেন। শ্রেণীকক্ষে, বিশেষ বিশেষ ভাবে ছাত্র বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। শিক্ষকের নিজস্ব কর্তব্য পালনে এই ধরনের সচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। অন্য দিক থেকে, এর দ্বারা নির্দ্দেশনার কাজকেও সহায়তা করা হয়। নানারকম আচরণমূলক অসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করার জন্যও তিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন। এর দ্বারা, নির্দ্দেশনার তথ্য সংগ্রহ হয় এবং সমস্যারও সমাধান হয়।

চতুর্থতঃ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সুযোগ দিয়ে, তিনি তাদের অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে পারেন। তাদের মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কেও ধারণা পেতে পারেন। এই ধারণা নির্দ্দেশনার কাজে তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুতরাং, বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনার কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, শিক্ষকের কিছু কিছু দায়িত্ব আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখার দরকার নির্দ্দেশনাকে শুধুমাত্র, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (career master) বা অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতার ফলে সার্থক করে তোলা যায় না। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলী, প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এর পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য যদি নির্দ্দেশনাকে বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাকে সফল করার জন্য সকলকে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে।

আলোচনা

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on Educational guidance with special reference to the question of selection at the Higher Secondary stage of education of West Bengal [C. U. B. T. '67]
[পৃঃ ১১১-১১৩]
2. Distinguish between educational and vocational guidance, What are the important facts on which educational guidance, say at the stage of diversification of courses, should be based ? [K.U.B.T.'63]
[পৃঃ ১০০-১০৩ ; ১০৮-১১১]

3. Discuss briefly the social and educational need for guidance.
[পৃ: ১০৩-১০৭]

4. What is meant by educational and vocational guidance. Mention the types of data that will be required for organising an effective guidance programme.
[পৃ: ১০৩-১০৭]

5. Write a short essay on the educational and vocational guidance of the school children, Discuss the role of the teacher in this context.
[সম্পূর্ণ অংশ]

6. Write notes on the following :
(a) Educational guidance.
[সম্পূর্ণ অংশ]
(b) Method of school guidance.
[১১১-১১৪]
(c) Guidance as a function of the teacher,
[১১৩-১১৫]

অষ্টম অধ্যায়

ব্যতিক্রম ভাবাপন্ন শিশু

[EXCEPTIONAL CHILDREN]

সাধারণতঃ শিক্ষা-মনোবিদ্যায় এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয় 'ব্যতিক্রম ভাবাপন্ন শিশু' (Exceptional Children)। এরা কারা ? যে সব শিশুরা দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণ শিশুর থেকে পৃথক তাদেরই বোঝানোর জন্য এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে, বোবা, খোঁড়া, তোতলা, বেশী রাগী বা ভীতু সব শিশুই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এই বইয়ের মধ্যে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে আমরা লক্ষ্য করি, কিছু শিক্ষার্থী আছে, যারা সাধারণ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকে ; মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে তারা সাধারণের দিক থেকে উন্নত। আর একদল শিক্ষার্থী দেখা যায়, শ্রেণীর সাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে এরা তাল রেখে এগিয়ে যেতে পারে না। সব সময় পিছিয়ে থাকে। এবং সেই পিছিয়ে থাকার কারণ তাদের মানসিক ক্ষমতার স্বল্পতা। শিক্ষক হিসাবে, এদের সমস্যাই আমাদের কাছে খুব বেশী রকম। তাই শুধুমাত্র এই সব শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ, এখানে আমরা শিশুদের ব্যতিক্রম **একটা মাত্র বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিবেচনা করব। আর তা হ'ল বুদ্ধি (intelligence)**। তবে এই ধরনের শ্রেণী বিভাগ যে সম্পূর্ণভাবে সার্থক শ্রেণী বিভাগ, এ-কথা আমরা বলতে পারি না। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা হ'য়ে থাকে। বুদ্ধির বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, বুদ্ধির দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধাঙ্কের (I. Q.), পরিমাপ স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে। এই বণ্টনের মাঝের অংশে যারা থাকে তাদের বলা হয় স্বাভাবিক বা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন (normal)। আর যারা এই মাঝের অংশের বাইরে দু' দিকে আছে, তাদের বলা হয় ব্যতিক্রম ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু (exceptional children)। এদের মধ্যে যাদের বুদ্ধাঙ্ক সাধারণের চেয়ে বেশী তাদের বলা হয় **উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু** (gifted children), আর যাদের বুদ্ধাঙ্ক সাধারণের চেয়ে কম তাদের বলা হয় **ক্ষীণ-**

ব্যতিক্রম ভাবাপন্ন শিশু কারা ?

বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু (feeble minded children)। আমরা এই দু' ধরনের ব্যতিক্রম সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু [Gifted Children] :—

সাধারণতঃ, 110 এর ওপরে যাদের বুদ্ধাঙ্ক তাদের উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু বলা হয়। কিন্তু, এদের মধ্যে 110 থেকে 120 মধ্যে যাদের বুদ্ধাঙ্ক, তাদের সাধারণের চেয়ে কিছু উন্নত বলা হয়। এরা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু 120 ওপরে যাদের বুদ্ধাঙ্ক তাদের সমস্যা একটু ভিন্ন রূপ। এদের কথাই বিশেষভাবে আমরা আলোচনা করব। এরা সংখ্যায় প্রায় শতকরা দু' ভাগ সাধারণভাবে, জ্ঞাননীতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের পৃথকভাবে বিবেচনা করার কথা চিন্তা করা হ'ত না। কিন্তু, বর্তমানকালে, এই সব শিশুদের কথা বিশেষভাবে ভাবা হচ্ছে। তার কারণ, এরা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই কারণে এদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কথা পৃথকভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন। এদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, এদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করার দরকার।

উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু কে?

উন্নতবুদ্ধির বৈশিষ্ট্য [Characteristics of brightness] :—

যদিও প্রত্যেক উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু এক ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় ; তবু কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আপাতঃভাবে তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে তাদের মধ্যেও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে। শ্রেণীকক্ষে বা সাধারণ জীবনে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করি, সেগুলো হ'ল—

উন্নত বুদ্ধির বাহ্যিক লক্ষণ

[এক] উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের ছোট বেলায় দৈহিক বিকাশ খুব তাড়াতাড়ি হয়। এরা বেশ আগে হাঁটতে শেখে।

[দুই] এই ধরনের শিশুদের ভাষার বিকাশও খুব দ্রুত হয়। প্রায় দু' বছর বয়সের মধ্যেই অনেক কথাই এরা পরিষ্কারভাবে বলতে পারে। শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে শেখে। এমনকি তিন বছর বয়সের মধ্যে একটার বেশী ভাষাও বেশ ভালভাবে বলতে পারে।

[তিন] এদের মধ্যে কৌতূহল প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। সবকিছু জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এবং এদের জানার আগ্রহ বিশেষভাবে বস্তুর সামগ্রিক

দিকের উপর হয়। কোন কিছু বিষয়ে আবছা ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

[চার] পড়তে এবং গণনা করতে খুব তাড়াতাড়ি শেখে। খুব সহজে অনুকরণের দ্বারা লিখতেও শেখে।

[পাঁচ] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের অনুরাগের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। নানারকম বিষয় বস্তুর প্রতি এদের অনুরাগ দেখা যায়, যা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না। বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে এদের ধারণাও (concept) তাড়াতাড়ি আসে।

[ছয়] প্রথম বয়সে এরা বাড়ীর বিভিন্ন কাজেও খুব বেশী পরিমাণ আগ্রহ দেখায় এবং বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিলে খুশী হয়।

[সাত] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের রসবোধ (sense of humour) খুব বেশী থাকে। এবং খুব সূক্ষ্মভাবে তারা তাদের এই রসবোধকে প্রকাশ করতে পারে।

[আট] প্রক্ষোভিক দিক থেকেও এরা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিপক্ক হয়। অর্থাৎ এদের প্রক্ষোভিক প্রকাশ অনেক সংযত হয়।

[নয়] অনেক সময়, এরা এদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কারণ, সমবয়সীদের মধ্যে তাদের মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলে তারা সব সময় খুঁজে পায় না।

[দশ] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের লক্ষ্য করা গেছে, খুব কম বয়স থেকেই যুক্তি সম্পন্ন কথা বলে। এদের প্রক্ষোভিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুণ, সমস্ত রকম আচরণই বিচার বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়।

[এগার] বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করা যায়, সমস্ত রকম বিষয়ে এদের বোধগম্যতা তাড়াতাড়ি আসে। সমস্যা সমাধানের ভঙ্গীতেও এদের নিজস্বতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

[বার] এদের মনোযোগের পরিসরও বিস্তৃত হয়, স্থায়ীত্বও বেশী হয়। একসঙ্গে এরা অনেক বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে এবং অনেক সময় ধরে একই বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে।

[তের] বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, এই সব উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা সারা জীবন ধরে তাদের উন্নত মান বজায় রাখে। তারা সাধারণতঃ নীচের দিকে নেমে আসে না।

উন্নত-বুদ্ধিদের যে সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হ'ল, তা সবই আপেক্ষিক। অর্থাৎ, তাদের দৈহিক বিকাশের হার, তাদের ভাষার বিকাশের হার বা যে কোন ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্যের মান, সাধারণ সমবয়সী শিশুদের

থেকে বেশী থাকে। তাই বেশী থাকার অর্থ এই নয় যে তা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের চাহিদা [Needs of the Gifted] ঃ—

সাধারণতঃ, উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ কতকগুলো চাহিদা থাকে। এই চাহিদাগুলোর যথাসম্ভব পরিতৃপ্তি না করতে পারলে, এদের মধ্যে নানারকম আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয়। তাই শিক্ষক এবং বাবা-মা ; সকলেরই এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকার দরকার। সাধারণতঃ, যে সব বৈশিষ্ট্যমূলক চাহিদা উন্নত-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বা শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তাহ'ল—

প্রশংসার চাহিদা

[এক] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা নিজেদের মতামতের প্রতি বিশেষভাবে অনুভূতি প্রবণ হয়। সমস্ত রকম কাজের অনুমোদনের চাহিদা এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাবা-মা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব সকলে তাদের প্রশংসা করুক এবং তার মতামতের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিক, এটা তারা সব সময় চায়। যদি তাদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি করার সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহ'লে তারা দিবাস্বপ্নে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে ; অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। ফলে ব্যক্তিসত্বার বিকাশ ব্যহত হয়। এই কারণে উন্নত বুদ্ধিদের সার্থক জীবন বিকাশের জন্য, তাদের উপর দায়িত্ব আরোপ করতে হয়, এবং তাদের বিচার-শক্তির আস্থা রাখতে হয়।

নিরাপত্তার চাহিদা

[দুই] উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের চেয়ে বাবা-মা, বয়স্কদের কাছ থেকে বেশী নিরাপত্তা চায়। সমস্ত দিক থেকে, এই সব শিশুদের নিরাপত্তার চাহিদা প্রবল। তারা আশা করে তাদের সমস্ত রকম অসুবিধা-মূলক পরিস্থিতিতে তাদের বাবা-মা সব রকম নিরাপত্তা দেবেন। তাঁদের মনে এরকম বদ্ধমূল ধারণা থাকে, যে তাঁরা তাদের জীবনের সমস্ত রকম সমস্যারই সমাধান করতে সহায়তা করতে পারেন। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা যদি এ নিরাপত্তা তাদের বাবা-মায়ের কাছে থেকে না পায়, তাহ'লে তারা নানারকম অসঙ্গত আচরণ করে, এবং ক্রমে তারা বয়স্কদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

জ্ঞানের চাহিদা

[তিন] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের চাহিদা খুব প্রবল থাকে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে। তাই এদের এই চাহিদা মেটানোর জন্য বাবা-মা, শিক্ষক এবং অন্যান্য বয়স্কদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে। এই সব শিশুদের মধ্যে, তাদের বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বস্তুর প্রতি কৌতূহল দেখা যায়। তাদের এই কৌতূহল মেটানোর জন্য যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা পাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

[চার] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের চেয়ে বাবা-মায়ের সান্নিধ্য বেশী করে পেতে চায়। তাই বাবা-মায়ের সান্নিধ্য যাতে এরা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু সময়ের জন্য হ'লেও, বাবা-মা তাঁদের কাজের ফাঁকে তাদের যদি সান্নিধ্য দেন, তাতেই তারা খুশী হয়।

সান্নিধ্যের চাহিদা

[পাঁচ] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে তীব্র কাজ করার চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। এরা কোন সময় অলসভাবে সময় কাটানো ভালবাসে না। তাই কোন না কোন কাজে এদের নিযুক্ত করে না রাখতে পারলে, এদের মানসিক বিকাশের ধারা ব্যহত হয়।

সক্রিয়তার চাহিদা

[ছয়] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা উপদেশের চেয়ে যুক্তিপূর্ণ তথ্যকে বেশী গুরুত্ব দেয়। কোন কিছু কাজ করানোর জন্য, বা কোন কিছু কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্য শুধুমাত্র উপদেশ দিলে, তা তারা সহজে মেনে নিতে চায় না। এর অর্থ এই নয় যে, এরা উচ্ছৃঙ্খল। এদের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ তথ্যের প্রতি চাহিদা থাকে বলে, কোন কিছুকে আপাতঃভাবে মানতে চায় না। কিন্তু যুক্তি দ্বারা তাদের কাছে কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করলে, তা তারা সহজে মেনে নেয়। বাবা-মা, শিক্ষক, প্রত্যেককে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার দরকার।

যুক্তিপূর্ণ তথ্যের চাহিদা

উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু ও শিক্ষকের দায়িত্ব [The Gifted Child and the Teacher's Responsibility] :—

উন্নত-বুদ্ধি শিশুদের মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ ধরনের মানসিক চাহিদার দরুণ বিদ্যালয়ে তারা কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণ পদ্ধতিতে আমরা যে বিদ্যালয় পরিচালনা করি, তার দ্বারা এই ধরনের শিশুরা উপকৃত হয় না। তাই শিক্ষক হিসাবে, এই সব শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করতে হ'লে, এদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যালয়ে আমরা যদি এই সব শিশুদের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম না হই, তাহ'লে তারা ধীরে ধীরে অসঙ্গতিমূলক আচরণ করবে। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা নিম্নলিখিত উপায়গুলো গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমত : বিদ্যালয়ে এমন সব কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যেগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা আনন্দ পায়। পাঠ্য বিষয় তাদের মানসিক ক্ষমতার অনুপাতে যদি সহজ হয় তাহ'লে তারা সেই সব বিষয়ের পাঠে আনন্দ পায় না। তাই তাদের জন্য উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে হবে। এই ধরনের শিশুদের হাতে-কলমে পরীক্ষা করে জ্ঞান আহরণের প্রতি

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন

ঝোঁক থাকে। সুতরাং, এদের শিক্ষাকে মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দিয়ে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এই সব শিশুদের মানসিক ক্ষমতানুযায়ী কাজ দিতে না পারলে, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের পথে এরা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় উন্নতবুদ্ধি সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অহমিকার ভাব এনে দেয়। শিক্ষকরা অনেক সময় এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে অত্যধিক গুরুত্ব দেন। শিক্ষকের এই গুরুত্বের ফলে, তাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতার ভাব গড়ে ওঠে। যা তাদের জীবন বিকাশকেই ব্যহত করে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং, শিক্ষকের দায়িত্ব তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া হ'লেও, সব সময় তাদের মধ্যে, এই বোধ আনতে হবে যে, উন্নতবুদ্ধির জন্য তাদের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী সামাজিক দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। সুতরাং সে দায়িত্ব পালন করতে হ'লে অন্য সহপাঠীদের মানসিক ক্ষমতা কম হ'লেও, তার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে হবে। এই ধরনের সামাজিক চেতনা উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে জাগাতে না পারলে, তারা বিদ্যালয়ে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আত্মসচেতনতা বোধ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

তৃতীয়তঃ উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে আত্ম-স্বীকৃতি প্রবল থাকে। তাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি না দিলে, তারা দুঃখিত হয়। বিদ্যালয়ে, এই সব শিশুদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা না দিলে, বিদ্যালয়ের প্রতি এদের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে। তাছাড়া, এর জন্য অনেক সময় অনেক খারাপ অভ্যাস গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে, এই সব উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মতামতের যথা-যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া। যদি তাদের উপর শিক্ষক কোন বিশেষ ইচ্ছা আরোপ করতে চান, তাহ'লে যুক্তির দ্বারা তা তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

আত্মস্বীকৃতির চাহিদা ও শিক্ষকের দায়িত্ব

চতুর্থতঃ উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশে পূর্ণ সহায়তা করতে হ'লে, তাদের সব সময় কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখতে হবে। দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক নানারকম কাজ দিয়ে তাদের নিযুক্ত রাখতে না পারলে, স্বাভাবিকভাবে অন্যদিকে তাদের মন আকর্ষিত হবে। তাদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিলে তারা আনন্দ পায়।

সক্রিয়তার তাগিদ ও শিক্ষকের দায়িত্ব

সবশেষে, উন্নতবুদ্ধি শিশুদের কিছু কিছু অভিযোজনের সমস্যা দেখা যায়। তাদের উন্নত মানসিক ক্ষমতার জন্য, অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না। ফলে তারা বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে অসুবিধা বোধ করে। তাদের এই সমস্যা সমাধানে সহায়তা করাও শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে। এছাড়া

সামাজিক অভিযোজন ও শিক্ষকের দায়িত্ব

তাদের শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সে সম্পর্কে আমরা নীচে আলোচনা করছি।

উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা [The Education of the Gifted Children] :—

উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা মানসিকতার দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা। তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও তাদের পাঠ্যক্রম যে অন্যান্য সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা হবে তা নয়, কিন্তু পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন কিছু উপাদান সংযোজিত করতে হবে যাতে করে এই সব শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা পরিতৃপ্তি করতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা, তাহ'লে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে, তাদের ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হবে না। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের এই চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য বর্তমানকালে তিন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে—[এক] **পাঠ্যসূচীর উন্নতিকরণ** (Enrichment), [দুই] **শিক্ষাস্তরে-ত্বরণ** (Grade Acceleration) এবং [তিন] **বিশেষ শ্রেণীকরণ** (Special Class)।

পাঠ্যসূচীর উন্নতিকরণ

প্রথমত : উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত জ্ঞানের চাহিদা পরিতৃপ্তি করার জন্য এবং তাদের মানসিক ক্ষমতানুযায়ী বিকাশে সহায়তা করার জন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ পাঠ্যসূচী উন্নতিকরণের (enrichment) কথা বলেছেন। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষক এই সব শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন সমস্যা নির্বাচন করবেন। তাদের কৌতূহলের বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির কথা চিন্তা করে, তাদের জন্য বিশেষ ধরনের সমস্যা নির্বাচন করবেন। শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষক যখন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন এই ধরনের অপেক্ষাকৃত কঠিন সমস্যার মধ্যে উন্নত-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের ব্যস্ত রাখলে, তাঁর কাজের সুবিধা হয়। যার ফলে একই শ্রেণীর মধ্যে সব রকম মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুরা নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে কাজ করার সুযোগ পায়। তবে এই পদ্ধতির অসুবিধা হ'ল এর দ্বারা উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করা যায় না। পাশাপাশি অন্য শিক্ষার্থীরা কম কাজ করছে দেখলে, তাদের উন্নত পাঠ্যক্রমের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ অনেকে বলেছেন, যেহেতু উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে, সেহেতু তাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ, তাদের বয়সের চেয়ে, এক বছর বা দু'বছর উপর স্তরে পড়াশুনা করার সুযোগ দিলে, মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজের সামঞ্জস্য থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়। একেই বলা হয় শিক্ষাস্তরে ত্বরণ (grade acceleration)। কিন্তু, বিভিন্ন মনোবিদ্ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, এই পদ্ধতির নানারকম অসুবিধা আছে। এর ফলে, শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের ব্যাঘাত ঘটে। বেশী বয়সের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়তে গিয়ে, এই সব শিশুরা যথাযোগ্য সামাজিক অভিযোজনে অক্ষম হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া, শিক্ষার্থীদের অনেক সময় বিশেষ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার ত্রুটি শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী উচ্চস্তরে শিক্ষাকে তা ব্যহত করে।

শিক্ষাস্তরে ত্বরণ

তৃতীয়ত ঃ পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতির পরিবর্তে অনেক মনোবিদ্ বিশেষ শ্রেণীকরণের (special class) কথা বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা পাঠ্যক্রমের উন্নতিকরণের পদ্ধতি এবং শিক্ষাস্তরের ত্বরণের পদ্ধতির সমন্বয় করতে চেয়েছেন এই পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির মূল বক্তব্য হ'ল, উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের জন্য পৃথক শ্রেণীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ পর্যন্ত, এ বিষয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া গেছে। কারণ, এর ফলে এই শ্রেণীর মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম রচনা করা সম্ভব হয়, এবং তাদের শিক্ষার দ্রুত গতির হারকে বজায় রাখা যায়। এতে কিছু কিছু অসুবিধা যে নেই তা নয়। যেমন এইভাবে পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, এই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রতি অবজ্ঞাভাব আসে। পরবর্তীকালে বৃহত্তর সমাজে এদের পক্ষে অভিযোজন করতে অসুবিধা হয়। এরা নিজের শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না।

বিশেষ শ্রেণীকরণ

চতুর্থত ঃ সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, উন্নত-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকের কিছু কিছু ভাল দিক আছে, আবার প্রত্যেকেরই কিছু অসুবিধা আছে। তবে অসুবিধা আছে বলে চুপচাপ বসে থাকা বা গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা ঠিক নয়। এর ফলে কোন দিক থেকেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হবে পূর্বোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটাকে কাজে লাগানো। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের অবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে শিক্ষক ঐ সব পদ্ধতির যে কোন

আলোচনা

একটাকে কাজে লাগাতে পারেন। অথবা তাদের সমন্বয়ে নূতন কিছু পদ্ধতির কথাও চিন্তা করতে পারেন। এই সব শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক যতটুকু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন, ততটুকুই লাভবান হবেন, এবং তা সব সময়ে গতানুগতিক অবস্থার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবে।

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু [Feeble minded Children] :—

সাধারণতঃ যে সব শিশুদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 75 এর নীচে, তাদের ক্ষীণ-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু বলা হয়। এই ধরনের শিশুরা সমাজে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি তো করেই বিদ্যালয়েও আমাদের কাছে বিশেষ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 25 বা 30 বা এর নীচে তাদের বলা হয় জড়-বুদ্ধি সম্পন্ন (idot)। যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 50 বা 55 থেকে 30-এর মধ্যে তাদের বলা হয় বোধ-হীন (imbacile) আর যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 70 বা 75 থেকে 50-এর মধ্যে তাদের বলা হয় স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন (moron)। জড়-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের কোনরকম শিক্ষার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্‌রা শিক্ষা-সমস্যার অন্তর্ভূক্ত করেন নি তাদের। তারা বিদ্যালয়ে আসার সুযোগই পায় না। কারণ জন্মাবস্থা থেকে এদের জীবনের সমস্ত রকম দিকেই অক্ষমতা দেখা যায়। বোধহীন (imbecile) শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবে দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানোর মত কিছু কৌশল এদের শেখানো যায়। শিক্ষা-মনোবিদরা এদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাই তারা এদের 'Trainable' হিসাবে বিবেচনা করেছেন। বিদ্যালয়ে এদেরও কিছু কিছু দেখা মেলে। স্বল্পবুদ্ধি (moron) সম্পন্ন শিশুদের কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। তবে এদের শিক্ষার গতি খুবই মন্থর (slow learner)। এদেরকে মনোবিদ্‌রা educable বলেছেন। আমরা বিশেষভাবে এই শ্রেণীভুক্ত শিশুদের শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। কারণ, এই ধরনের শিশু আমাদের বিদ্যালয়ে কিছু কিছু দেখা যায়, এবং তারা আমাদের কাজে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে।

ক্ষীণ-বুদ্ধি
- →স্বল্পবুদ্ধি [75—50 বুদ্ধ্যাঙ্ক]→Educable.
- →বোধহীন [26—49 বুদ্ধ্যাঙ্ক]→Trainable.
- →জড় [—25 বুদ্ধ্যাঙ্ক]→Non educable non trainable.

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Feeble-minded Children] :—

যদিও ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যেও শ্রেণীগত পার্থক্য আছে, তবুও তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব বৈশিষ্ট্য-গুলো দেখে শিশুর মানসিক ক্ষমতার দৈন্যতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। যেমন—

ক্ষীণবুদ্ধির লক্ষণ

[এক] ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের দৈহিক বিকাশের হার স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে কম থাকে। ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে এরা সমবয়সী সাধারণ শিশুদের থেকে পেছিয়ে থাকে। এদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপে অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করা যায়।

[দুই] এই সব শিশুদের ভাষার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হয়। অনেকের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ভাষা উচ্চারণের ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়।

[তিন] নূতন জিনিসকে জানবার কোন রকম আগ্রহ এদের মধ্যে দেখা যায় না। সব কিছুকেই এরা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখে।

[চার] সাধারণভাবে লেখা-পড়া এবং গণনা শিক্ষায়, একই বয়সের অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের থেকে সব সময় পিছিয়ে থাকে।

[পাঁচ] অনুরাগের ক্ষেত্রও এদের সীমিত হয়। সমবয়সী ছেলেদের যে-সব বিষয়ে অনুরাগ থাকে, এদের তা থাকে না। সামান্য কিছু বস্তুর প্রতি যা অনুরাগ দেখা যায়, তাও বয়স উপযোগী নয়। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে যে সব বস্তুর প্রতি সাধারণতঃ শিশুদের অনুরাগ থাকে, এদেরও সেই সব বস্তুর প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়।

[ছয়] ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা সব সময় নিজেদের চেয়ে বয়সে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করে না।

[সাত] বয়স অনুপাতে প্রক্ষোভিক বিকাশও এদের কম হয়।

[আট] কোন বিষয়বস্তুর প্রতি বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। মনোযোগের পরিসরও (span af attention) অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের।

[নয়] বয়স্ক জীবনেও এরা স্বল্পমানসিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়। তবে অনেক সময় পরিবেশের প্রভাবে কিছুটা পরিবর্তন কারও কারও ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে।

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও শিক্ষকের দায়িত্ব [Education of the Feeble-minded and teachers' responsibilities]ঃ—

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু তিন ধরনের হতে পারে—স্বল্প-বুদ্ধি (moron), বোধ-হীন (imbecile) এবং জড়-বুদ্ধি (idot)। এদের মধ্যে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা সমস্ত রকম শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার বাইরে বলা যায়। বাকী দু'শ্রেণীর মধ্যে স্বল্প বুদ্ধিরা সামান্য শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম এবং বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের কিছু উন্নতি করা যায়। এদের বলা হয় শিক্ষাগ্রহণক্ষম ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন (educable feeble-minded)। অন্যদিকে বোধহীনদের নিয়ম মাফিক শিক্ষার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা যায় না, সামান্য কিছু দৈনন্দিন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় মাত্র। তাই শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এদের বলা হয় প্রশিক্ষণক্ষম ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন (trainable feeble-minded)। আমরা এই দু' শ্রেণীর ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করব।

স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা

স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের খুব বেশী সংখ্যায় বিদ্যালয়ে দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেছে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই সব শিশুরা বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারে না। সব সময় লক্ষ্য করা গেছে, এরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রায় দু' বছর পিছিয়ে থাকে। তাই বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে, এদের ব্যক্তিসত্বার বিকাশে সহায়তা করা যায় না। স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের, আমাদের সব রকম উন্নত ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ সত্বেও, কখনওই স্বাভাবিক বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের স্তরে আনা সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষক হিসাবে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, এই সব শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সব শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে এদের মোটামুটিভাবে নাগরিকত্বের শিক্ষা দেওয়া, যাতে করে এরা সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে। কারণ, এদের ক্ষেত্রে আমরা পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের কথা চিন্তা করি, তাহ'লে আমরা কোনদিন সেই আদর্শে পৌছাতে পারব না। যাতে এরা আত্মনির্ভরশীল, পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসাবে বিকাশ লাভ করে, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দিক থেকে এ বিষয়ে চেষ্টা করতে পারি—

ব্যক্তিগত জীবনের জন্য শিক্ষা

প্রথমতঃ শিক্ষক হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ সাধন করা। তবে এদের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবন বিকাশ সাধারণতঃ নিজের দৈহিক যত্ন এবং আত্ম-সম্ভ্রমবোধ বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম তারা যাতে সহজভাবে সম্পাদন করতে

পারে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তাছাড়া, নিজের সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা আনতে হবে। এবং নিজেদের মধ্যে যেটুকু ভাল গুণ আছে, তার বিকাশ করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের ভাল গুণ দেখে তাদের ঈর্ষার মনোভাব না লাগে, সেদিকেও শিক্ষককে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ স্বল্প-বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশেও শিক্ষককে সহায়তা করতে হবে। তারা যাতে যথাযোগ্য সামাজিক আচরণ করতে পারে, সে দিকেও নজর দিতে হবে। যথাযোগ্য সামাজিক আচরণ করতে যদি তারা না শেখে, তা হ'লে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের গ্রহণ করবে না। ফলে, তারা সমাজজীবনের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিযোজনের অভাবে, নানারকম অপরাধমূলক আচরণ করবে।

সামাজিক জীবনের শিক্ষা

তৃতীয়ত ঃ স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা যাতে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে, শিক্ষার মধ্যে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ, তাদের মানসিক ক্ষমতানুযায়ী তারা যাতে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিতে এই সব শিশুদের শিক্ষা দিলে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হবে না। এই কারণে, এদের জন্য বৃত্তি কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

সাধারণতঃ এই তিন দিক থেকে আমরা যদি স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের জীবন বিকাশ করতে পারি, তাহ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে। এই সব শিশুদের, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশ করতে হ'লে, বিশেষ ধরনের পদ্ধতিও অবলম্বন করতে হয়। সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সকলের সঙ্গে এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, এদের সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। তাই, এদের **ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে** (individualised method) শিক্ষা দিতে হবে। দরকার হ'লে ছোট ছোট শ্রেণীতে ভাগ করে পড়ালে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা হয়। আবার স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের আমূর্ত কোন বস্তু সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করতে খুবই অসুবিধা হয়। তাই এদের ক্ষেত্রে **আত্ম সক্রিয়তার** দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারলেই, তা কার্যকরী হবে। স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষককে বিশেষ ধৈর্য্যশীল হ'তে হবে। একই বিষয়বস্তু বার বার **পুনরাবৃত্তি** করতে হবে। শিক্ষার হার এই ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই মন্থর হয়। এই জন্যই পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের মনোযোগও ক্ষণস্থায়ী হয়। সুতরাং এদের জন্য শিক্ষাকালও কমিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ, একই বিষয় বেশীক্ষণ পড়ানো চলবে না। এই ভাবে, বিভিন্ন বাস্তবধর্মী কৌশল অবলম্বন করে, স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে শিক্ষক সহায়তা করতে পারেন। সাধারণ ভাবে, এই সব

স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে, তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সুতরাং, পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা এদের জন্য করতে হবে। এই সব শিশুদের অনেক সময়, দৈহিক অসুস্থতার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সব অসুস্থতার জন্য চিকিৎসারও কিছু কিছু ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষককে।

বোধহীন শিশুদের শিক্ষা

অন্যদিকে, বোধহীন শিশুদের শিক্ষার কথা আরও পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে, শিক্ষক এদের কোনমতে নিয়মমাফিক পাঠ্যসূচীর সঙ্গে তাল রেখে চলাতে পারেন না। সুতরাং, এদের ক্ষেত্রে লেখা-পড়ার চেষ্টা করাই বৃথা। সাধারণ বিদ্যালয়ে বোধহীন শিশুদের কোন রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হবে, এই সব শিশুদের অন্যত্র কোন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া। সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যে তাদের রেখে দিলে, তাদের জীবন বিকাশ তো হয়ই না বরং নানা দিক থেকে তারা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা এদের জীবনধারণের জন্য কতকগুলো প্রয়োজনীয় কৌশল শেখানো যায় মাত্র। বোধহীন শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তিগত কিছু প্রয়োজনীয় কাজ শেখানো; কিছু কিছু সামান্য সামাজিক আচরণ শেখানো, এবং তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী, সামান্য কিছু হাতের কাজ শেখানো, যার দ্বারা তারা জীবিকা অর্জন করতে পারে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিম্নলিখিত দিকের প্রতি নজর দিতে হবে—

[এক] ব্যক্তিগত কিছু আচরণের শিক্ষা এই সব শিশুদের দেওয়া প্রয়োজন। মুখ ধোয়া, কাপড় পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি যে সব সাধারণ কাজগুলো শিশুরা অনুকরণের সাহায্যে শেখে, এরা তা পারে না। এদের এই সব কাজও বিশেষ যত্ন নিয়ে শেখাতে হয়। যেন দৈনন্দিন জীবনের এই সব সাধারণ কাজ তারা নিজেরা করতে পারে, তারই শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

[**দুই**] এই সব শিশুরা যেন বিভিন্ন দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তাছাড়া সাধারণ কিছু কিছু সামাজিক আচরণ সম্পর্কে এদের শিক্ষা দিতে হবে।

[**তিন**] বিভিন্ন বস্তুকে সার্থক প্রত্যক্ষ করার প্রশিক্ষণ বোধহীন শিশুদের বিশেষভাবে দেওয়া দরকার। এই ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ (sense training), সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শৈশবকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়; কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

[**চার**] যে সব কাজে বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন করা যায়, সেই ধরনের কিছু সাধারণ বৃত্তি-মূলক কাজ এদের শেখানো উচিত। এই ধরনের ছোটখাটো হস্ত-শিল্পের প্রশিক্ষণ এদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করবে।

[**পাঁচ**] ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও শিক্ষককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, এদের ভাষামূলক জ্ঞান সাধারণ নিয়মে হয় না বললেই চলে। তাই অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত এদের ভাষা শিক্ষার দিকে নজর দিতে হয়। যেন সাধারণ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মোটামুটি ভাষা তারা আয়ত্ব করতে পারে, সেই চেষ্টাই করতে হবে শিক্ষককে।

[**ছয়**] সামান্য একটু গান বা আবৃত্তি ইত্যাদি করতেও শিক্ষা দেওয়া যায়। এর ফলে, বোধহীন শিশুরা মনের প্রক্ষোভমূলক অবস্থার সুস্থ প্রকাশের কৌশল আয়ত্ব করতে পারে।

আলোচনা

মোটামুটিভাবে বলা যায়, এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র দৈহিক ও সামাজিক গুণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বৌদ্ধিক বিকাশের চেষ্টা এদের ক্ষেত্রে বৃথা। আর এদের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। সামান্য যেটুকু কৌশল এরা আয়ত্ব করবে, তা শিক্ষকের প্রচেষ্টার উপরেই নির্ভর করবে। একই কাজ বার বার করে তারা শিখবে। এই জন্য শিক্ষকের অত্যন্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। তাছাড়া এই সব শিশুদের মানসিক ও দৈহিক অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে, সমবেদনার সঙ্গে, এদের সমস্যাগুলোকে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। ঘৃণা বা অবজ্ঞা দিয়ে, এদের উন্নত করা যাবে না। বরং যত্নের অভাব, অসহযোগীমূলক মনোভাব, তাদের মধ্যে নানা ধরনের অসামাজিক আচরণ গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। সুতরাং, এই দিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার।

প্রশ্নাবলী

1. Who are exceptional children ? Discuss how they should be educated. [C. U. B. T. '66, K. U. B. T. '64] [সম্পূর্ণ অংশ]
2. Indicate at length the nature and needs of gifted children. [C. U B. T. '68] [১১৭-১২৫ পৃঃ]
3. Who are exceptional children ? How will you deal with them as an educator. [K. U. B. T. '66] [সম্পূর্ণ অংশ]
4. How are Feeble minded children ? Discuss the steps the teacher will follow in developing them. [১২৫-১৩০ পৃঃ]
5. What are the characteristics by which you can identify gifted child. Indicate the role of the teacher in developing them properly [১১৮-১২৫ পৃঃ]
6. Write notes on the following :
(a) The gifted [১১৭-১২৫ পৃঃ] (b) Moron [১২৬-১২৯ পৃঃ] (c) Imbecile [১২৭-১৩০ পৃঃ] (d) Grade-accereerlation [১২৫ পৃঃ]

সপ্তম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য

[MENTAL HYGIENE]

আমরা যেমন মাঝে মাঝে দৈহিক অসুস্থতায় ভুগি, তেমনি মাঝে মাঝে মানসিক অসুস্থতায়ও ভুগি। দেহের কোন বিশেষ অংশের ক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে, আমাদের দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়। তেমনি, আমাদের মানসিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে এ ধরনের অস্বাভাবিক মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের কাজের অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ কি ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, এবং কি ভাবে তাদের সমাধান করা যায়, তা জানতে হলে, প্রথমে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম কানুন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। সুতরাং আমরা প্রথমে সাধারণভাবে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ নিয়ম কানুন সম্পর্কে আলোচনা করব।

মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কি [What is mental Hygiene]:—

মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা খুব বেশী দিন আগে হয় নি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, **ক্লিফোর্ড বিয়ার্স** নামে এক আমেরিকান যুবক বাড়ীর পাঁচতলার জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তিনি সফল হন নি। বিচারে, তাঁকে মানসিক অসুস্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এবং তিন বৎসর তিনি উন্মাদাগারে (mental hospital) থাকেন। পরে তিনি সুস্থ হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে একটা বই লেখেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই বই 'A mind that found itself' প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশের পর সারা আমেরিকায় সাড়া পড়ে যায়। এবং মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তার সূত্রপাত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে **ইয়েলে** (Yale) মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন মানসিক রোগ চিকিৎসক (psychiatrist) **মেয়ার** (A. Mair)। প্রথম স্তরে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশেষভাবে, মানসিক

বিকারগ্রস্তদের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করত। কিন্তু বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বর্তমানে প্রধানতঃ তিনটে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে—

প্রথমত :, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের দেহ-মনের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা করা।

দ্বিতীয়ত :, ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষায় সহায়তা করা।

তৃতীয়ত :, মানসিক বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা।

মনোবিদ্ বার্ণার্ড (Bernard) বলেছেন—"It is the practical art of assisting oneself and others to the realization of a fuller, happier, more harmonious, and more effective life"[1] সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শারীরিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মতই মানুষের জীবন যাপনের জন্য একটা মান (standard) নির্ধারণ করে দেয়। শুধুমাত্র জীবন যাপনের মান নির্ধারণ করাই এর কাজ নয়। প্রত্যেক মানুষ যাতে সেই পথে এগিয়ে যেতে পারে সেদিকে তাদের সহায়তা করাও মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আর প্রত্যেক মানুষকে এই ব্যাপারে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সহায়তা করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মানব প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, এবং তাকে মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগও করে। তাই এই বিজ্ঞানের একই সঙ্গে পরীক্ষামূলক ও প্রয়োগমূলক দিক আছে।

মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শিক্ষা [Mental hygiene & Education] :—

শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞানের গুরুত্বকে বর্তমানে আর অস্বীকার করা যায় না। কারণ, শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নির্দেশ বিশেষভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তিকে সামাজিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, নৈতিক সমস্ত দিক থেকে বিকাশে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করাই হ'ল আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও হ'ল ব্যক্তি জীবনের সুষম বিকাশে সহায়তা করা। মনোবিদ্ **হ্যাড্‌ফিল্ডের** (Hadfield) এক মন্তব্য থেকে এই ধারণা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন—"Mental health is the full and harmo-

1. Bernard : Psychology of Teaching & Learning.

nious functioning of the whole personality".[1] সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সুস্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ একক ব্যক্তিসত্বার বিকাশ এবং শিক্ষারও উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিসত্বার বিকাশ। তাই মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শিক্ষা, উদ্দেশ্যের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের দিক থেকে নয়, ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্তমান। শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম অভিজ্ঞতা মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের সহায়তা করে। অনেক সময় মানসিক অসুস্থতার মূলে থাকে অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার দরুন শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জাগে, এবং তার থেকে ধীরে ধীরে মানসিক অসুস্থতার বিকাশ হয়। তাই শিক্ষাকালে, ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিষয়কে বিচার করতে শেখে, জীবনের অকৃতকার্যতাকেও বিচার বিবেচনার দ্বারা গ্রহণ করতে শেখে, ফলে, মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে দূর হয়। আবার, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের নানারকম অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মানসিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, যে শিশু বার বার কোন সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হয়, তার মনে হতাশা আসে এবং পরে এই হতাশা থেকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ (Maladjustment behaviour) তার মধ্যে দেখা দেয়। যে শিশু বিদ্যালয়ে তার স্বাভাবিক বিভিন্ন চাহিদার চরিতার্থ করতে পারে না সেও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করতে হলে, শিশুর শিক্ষাকে যেমন মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি, মানসিক স্বাস্থ্য যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার কাজ পরিচালনা করতে হবে। অর্থাৎ, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞান এদের পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ব্যক্তি জীবনের বিকাশ নির্ণীত হবে। এই কারণে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন।

সবশেষে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের একটা কল্যাণমূলক দিক আছে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়লে, ব্যক্তির নিজের জীবনের উপর তার প্রভাব এসে পড়ে। সাধারণ শারীরিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান যেমন, ব্যক্তির সু-স্বাস্থ্যাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞানও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের নিজেদের আচরণের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে এবং আদর্শ অনুযায়ী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে অনুপ্রাণিত করে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষভাবে শিক্ষককে তার কাজে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের সমস্যামূলক আচরণের

---

1. J. A. Hadfield : Psychology & Mental Health.

প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করে, তার দূর করার উপায় উদ্ভাবনে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষককে সহায়তা করে। এই কারণে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য কি [What is Mental Health] :—

বাস্তবিক পক্ষে মানসিক অসুস্থতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে বিভেদের সীমা-রেখা খুবই ক্ষীণ। দৈহিক দিক থেকে যেমন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নেই, তেমনি মানসিক দিক থেকেও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মনোবিদ্ বার্ণার্ড (Bernard) বলেছেন—"Mental health like physical health is a matter of degree. The deviding line between good and poor mental health, is a matter of degree." কিন্তু, প্রশ্ন হ'ল, এই মানসিক স্বাস্থ্য কি? দৈহিক স্বাস্থ্য বলতে আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয়তার মাধ্যমে পারিপার্শিকের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে চলাই হ'ল দৈহিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানসিক স্বাস্থ্যের মূলেও আছে এই সামঞ্জস্য বিধান বা সঙ্গতি বিধান (adjustment)। মানসিক দিক থেকে বিচার করে মনোবিদ্‌রা বলেছেন, মানুষের সমস্ত আচরণই (behaviour) উদ্দেশ্যমুখী। এই উদ্দেশ্যমুখী আচরণের মূলে আছে, কতকগুলো চাহিদা (need)। দৈহিক বিকাশের মূলে যেমন আছে জৈবিক (organic) চাহিদা; তেমনি মানসিক বিকাশের মূলে কাজ করছে, কতকগুলো মানসিক চাহিদা (mental or psychological needs)। এই চাহিদাগুলো ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার, সামাজিক জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন, ব্যক্তির মধ্যে, নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, তার ব্যক্তিগত দিকের প্রয়োজনীয়তা মেটায়। আবার সঙ্গলাভের চাহিদা, ভালবাসার চাহিদা ইত্যাদি ব্যক্তির সামাজিক চাহিদা। এই সব চাহিদার তৃপ্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। নৈব্যক্তিক অর্থে (objective sense), ব্যক্তি যদি তার চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, তা'হলে তার জীবনে প্রক্ষোভিক সমতা বজায় থাকবে এবং মানসিক সংগঠনের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। এই সঙ্গতি বিধানের জন্য, কখনও পরিবেশের পরিবর্তন করতে হয়, কখনও বা চাহিদার সংবোধন করতে হয়, আবার কখনও বা দু'য়েরই পরিবর্তন করতে হয়। এই ভাবে, যে কোন উপায়ে যদি চাহিদার তৃপ্তি হয়, তবেই সঙ্গতি বিধান সম্ভব হবে। এবং এই সার্থক সঙ্গতি বিধানের মধ্য দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে। কিন্তু যদি কোন কারণে, ব্যক্তি

মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা ও ব্যক্তিজীবনে সঙ্গতি

তার এই প্রাথমিক চাহিদার পরিতৃপ্তি না করতে পারে, তার মধ্যে প্রক্ষোভ-মূলক অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, মানসিক দ্বন্দ্বের (mental conflict) সৃষ্টি হয়। এই মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দেখা দেয়। সে নানারকম অসামাজিক বা অসামঞ্জস্য আচরণ করে। একেই বলা হয় **অপসঙ্গতি** (maladjustment)। তাহ'লে, দেখা যাচ্ছে, মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা ও পরিবেশের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, সেই মানসিক দিক থেকে সুস্থ। আর, ব্যক্তির মধ্যে এই মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য যে অভিযোজন বা সঙ্গতিমূলক প্রক্রিয়া কাজ করছে, তাই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য (a process of continuous adjustment on the part of the individual)।

এখন, এই চাহিদার পরিতৃপ্তি বা আচরণের সঙ্গতি, ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণ ভাবে আসতে পারে, বা আংশিকভাবে আসতে পারে। কোন বিশেষ চাহিদা কি ভাবে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করবে তার মানসিক সুস্থতা। যখন কোন বিশেষ চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয়, তখন ব্যক্তিজীবনে সমতা বজায় থাকে। অপসঙ্গতির (maladjustmet) কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অপসঙ্গতি ও মানসিক অসুস্থতা

আবার, চাহিদার যখন, পরিতৃপ্তি হয় না তখন অপসঙ্গতি-মূলক আচরণ দেখা দেয়। যদিও অনেক সময় বিশেষ চাহিদার চরিতার্থ না হওয়ার দরুন, তাকে আমরা অবদমন করার চেষ্টা করি এবং আপাতঃভাবে সচেতন মানসিক স্তরে তার অস্তিত্বকে মুছে ফেলি, তা'হলে তাদের প্রভাব আমাদের আচরণের মধ্যে দেখা দেয়। এর ফলে নানারকম অসামাজিক এবং অসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। এই অবদমনের ফলে যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তাই ব্যক্তি আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। এই ধরনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ব্যক্তিজীবনের অসুস্থতার কারণ। এবং এই অসুস্থতা নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু অনেক সময়, ব্যক্তি চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্পূর্ণরূপে করতে না পারলেও, আংশিকভাবে তা করতে সক্ষম হয়। ফলে অনেকটা আচরণের অসামঞ্জস্য দূর করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে অপসঙ্গতির তীব্রতা থাকে অনেক কম। চাহিদার এই আংশিক তৃপ্তির জন্য অপসঙ্গতির মাত্রা কম হয়। এই সঙ্গতি বিধানের প্রক্রিয়া অনুযায়ী মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যারা পরিপূর্ণভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, তাদের বলা হয়, **স্বাভাবিক** মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি (normal)। যারা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাদের বলা হয় **অস্বাভাবিক** মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তি (abnormal)। যে সব ব্যক্তিরা আংশিকভাবে,

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, তাদের বলা হয় **অনুস্বাভাবিক মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তি** (sub-normal)। সাধারণ মানুষ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা থেকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকতার মধ্যে যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য (mental health) কথাটা সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক। সুতরাং, মানসিক স্বাস্থ্য একটা গতিশীল ধারণা মাত্র, কোন স্থিতাবস্থা নয়। প্রত্যেক মানুষই চায় সে তার বর্তমান অবস্থা থেকে এগিয়ে যেতে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও অনুরূপভাবে ব্যক্তিকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে ক্রমন্নোয়নের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা।

এই কারণে, শিক্ষাক্ষেত্রে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের যথেষ্ট গুরুত্ব আধুনিক কালে, স্বীকার করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব চাহিদা থাকে বা যে চাহিদার সৃষ্টি হয়, তার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি না করতে পারলে, তাদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়। এবং, এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, বিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বর্তমানে, অনেক উন্নত দেশে, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধির মত, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানও অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়। তবে শুধুমাত্র, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে,' শিক্ষককে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতে হবে। আর,' মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ যতদূর সম্ভব দূর করতে হবে। তাই, আমরা এখানে এই অপসঙ্গতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করব। এই অপসঙ্গতির কারণ কি কি, এবং কি কি দিক থেকে বিদ্যালয়ে অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়; কি কি ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচনা

মানসিক অপসঙ্গতির কারণ [Causes of Maladjustment]:—

সাধারণভাবে চাহিদার অতৃপ্তিতে মানসিক অপসঙ্গতি এলেও, মনোবিদ্‌রা অপসঙ্গতির জন্য নানারকম বিশেষ কারণ নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ, মনোবিদ্‌রা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণ করে কতকগুলো মানসিক অবস্থার নির্দেশ করেছেন। যেমন—

[এক] নিরাপত্তার অভাববোধ (Sense of insecurity) থেকে অনেক সময় অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ, শৈশবে শিশুদের মধ্যে এই ধরনের নিরাপত্তার অভাববোধ লক্ষ্য করা যায়। কোন বিশেষ চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে, ব্যক্তি যদি বাধা পায় এবং তার

মধ্যে যদি এই ধারণা জন্মে যে পাশাপাশি অন্যান্য ব্যক্তিরা বা পরিবেশ তার এই চাহিদা তৃপ্তির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'হলে তার মধ্যে এই ধরনের অভাববোধ আসে। ব্যক্তির মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, সে অন্য সকলের কাছে অবাঞ্ছিত এবং সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। এর থেকেই ব্যক্তির মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয়। এবং এই নিরাপত্তার অভাববোধের দরুন ব্যক্তি নানারকম অসামঞ্জস্য আচরণ করতে থাকে। বাবা, মা, শিক্ষক বা অন্যান্য খেলার সাথীরা যদি শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন বা করে, তা'হলে শিশু নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে, এবং তার মানসিক সাম্য বিঘ্নিত হয়।

[দুই] **আক্রমণাত্মক মনোভাব (Hostile attitude),** অনেক সময় অপসঙ্গতির মূলে কাজ করে। স্বাভাবিক প্রবণতা এবং নানারকম বিরূপ অভিজ্ঞতা অর্জনের দরুন, ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাবের বিকাশ হয়। এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের অসামাজিক রূপ সম্পর্কে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে। ফলে তার অবদমনের চেষ্টা সে করে। অর্থাৎ, ব্যক্তির প্রবণতা এবং সামাজিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ, এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব (conflict), ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। এর ফলে আচরণের অপসঙ্গতি দেখা দেয়। নানা রকমের অসামাজিক আচরণ এর ফলে দেখা যায়।

[তিন] অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে **অপরাধমূলক অনুভূতি (feeling of guilt)** অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি করে। অনেক সময়, ব্যক্তি নিজের অসামাজিক কোন আচরণের জন্য নিজেকে দায়ী করে। এই অপরাধবোধের অনুভূতিতে জর্জরিত হওয়ার দরুন, ব্যক্তি সব সময় কাজ করার সময় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে এবং কোন কাজই দৃঢ়তার সঙ্গে বা আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে না। এই ধরনের অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য নানারকম অসামাজিক আচরণও করতে আরম্ভ করে। মিথ্যা কথা বলা, অন্যের উপর নিজের মনোভাবকে প্রক্ষিপ্ত করার আচরণ এর থেকেই আসে। অনেক সময় আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে ব্যক্তি এমন আচরণে প্রবৃত্ত হয় যা সামাজিক মূল্য বিচারে একেবারে নিন্দনীয়।

[চার] **মানসিক দ্বন্দ্বকে (Mental conflict)** মনোবিদ্‌রা অপসঙ্গতির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধী মানসিক ইচ্ছা সৃষ্টির দরুন, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংঘাতের ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই মানসিক দ্বন্দ্বের উপক্রমের জন্য ব্যক্তি নানা ধরনের আচরণ করতে থাকে সামাজিক নিয়মকানুনের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে, ব্যক্তি এমন

অনেক আচরণ করে, যাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অসামাজিকও বলতে পারি না বা সামাজিকও বলতে পারি না। কিন্তু, এই মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তি না করতে পারে, তা'হলে, তার মধ্যে নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

এই ধরনের সাধারণ কারণগুলো ছাড়া নানারকম সাধারণ কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। মনোবিদ্ কাপলান্ এবং ও'ডিয়া (Kaplan & O'Dea) এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বিস্তারিত এক তালিকা দিয়েছেন। তাঁদের মতে বিদ্যালয়ে শিশুদের নিম্নলিখিত কারণে, অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যেতে পারে:

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতির কারণ

[এক] অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বাবা, মা, বা অন্যান্য শিশুদের পরিবারের মধ্যে আচরণ, অনেক সময় শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে।

[দুই] বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম (curriculum) এর মধ্য দিয়ে শিশুরা অনেক সময়, তাদের সবরকম চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে পারে না বলে, অনেক সময় অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে থাকে। সাধারণ বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর সবরকম চাহিদার তৃপ্তিসাধন করতে পারে না। ফলে তারা তাদের চাহিদার তৃপ্তির জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

[তিন] শ্রেণীকক্ষের বসার অসুবিধা, অনেক সময়, অপসঙ্গতিমূলক আচরণে ইন্ধন জোগায়। শিক্ষার্থীদের বসবার স্থানের অকুলান হওয়ার দরুন শ্রেণীকক্ষে নানারকম অসামাজিক আচরণ করার সুযোগ করে নেয়।

[চার] অনেক সময় শিক্ষকের শাসনের দরুন, শিক্ষার্থীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। ফলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীর বিভিন্ন কাজে যোগ দিতে চায় না। এই ধরনের নিরাপত্তার অভাবের জন্য, শিশুরা অন্যভাবে নিজেদের প্রকাশ করে।

[পাঁচ] অনেক সময় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় না। ফলে যে কাজ কোন শিক্ষার্থী, তার নিজের মানসিক ক্ষমতার দ্বারা সম্পন্ন করতে পারে না, সে কাজ তাকে করতে দেওয়া হয়। এর ফলে সে অকৃতকার্য হয়। এবং এই অকৃতকার্যতা শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতা বোধ আনে। এই হীনমন্যতাই আবার তার মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি করে।

[ছয়] অনেক সময় বিদ্যালয়ে খেলাধূলার ব্যবস্থা না থাকার দরুন, শিক্ষার্থীরা তাদের নানারকম মানসিক প্রবণতার সুস্থভাবে প্রকাশের সুযোগ

পায় না। ফলে, তাদের এই সব প্রবণতার প্রকাশ নানা ধরনের অসামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে হ'য়ে থাকে।

[সাত] বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করে। তারা দলবদ্ধভাবে ঘোরাফেরা করে; দলবদ্ধভাবে শ্রেণীতে বসে; দলগতভাবে নানা কাজ করে। কিন্তু, কোন বিশেষ শিক্ষার্থী যদি কোন বিশেষ দল থেকে পরিত্যক্ত হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম অসঙ্গতিমূলক আচরণের বিকাশ হয়। সুতরাং, অনেক মনোবিদ্ বলেছেন, দলের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারার জন্য, বা কোন বিশেষ দল থেকে পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

[আট] অনেক সময়, অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক অসঙ্গতির জন্য বিদ্যালয়ের অনেক কাজে যোগ দিতে পারে না। তুলনামূলকভাবে পোষাক পরিচ্ছদও অনেকের খারাপ থাকে। এর জন্য, সেই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জাগ্রত হয় এবং তার ফলে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়।

[নয়] অনেক সময় শিক্ষকরা কোন কোন ছাত্রকে অপরাধ প্রবণ (dilinquent) হিসেবে বিবেচনা করেন। এবং তাঁরা সবসময়ে তাদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করে থাকেন। এই ধরনের বিরূপ আচরণ শিক্ষার্থীদের অপরাধ প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

[দশ] বিদ্যালয়ে আমরা যে রিপোর্ট দিই, তার দ্বারা অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয় না। কারণ, তার মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক সম্ভাবনার কোন বিবরণ থাকে না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্রমে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়ে এবং বিদ্যালয়ের কাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থার অভাবের দরুন তাদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

[এগার] বিদ্যালয়ের সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্ক অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি করে। যে পিতামাতার বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীর উপর আস্থা নেই, যে পিতামাতার শিক্ষকদের উপর আস্থা নেই, তাদের ছেলেমেয়েরা কখনওই বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে না। তাই পিতামাতার বিদ্যালয়ের প্রতি মনোভাব অনেক সময় শিক্ষার্থীর অপসঙ্গতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

[বার] এছাড়াও, **কাপলান্** এবং **ও'ডিয়া** (Kaplan & O'Dea) আরও কতকগুলো কারণের কথা বলেছেন, যে গুলোকে পৃথকভাবে আলোচনা না করলেও চলে। কারণ, এগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন তাঁরা বলেছেন, পিতামাতার মধ্যে অপসঙ্গতি, শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর

করা প্রয়োজন। হয় বহির্জগতের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়, অথবা তাকে জয় করতে হয়। কিন্তু অদসের (id) মত অন্ধ অবচেতন শক্তির দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব হয় না। এই কাজের জন্য ব্যক্তি মনের উচ্চতর স্তর আছে।

দ্বিতীয় স্তরে ফ্রয়েদ্ একে বলেছেন, **অহম্** (Ego)। অদস্ তার কোন ইচ্ছাই সরাসরি পূরণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা বাস্তবে চরিতার্থ করতে হ'লে অহম্ (Ego) এর প্রয়োজন। অহম্ এর বাস্তব অবস্থা এবং অবচেতন মনের অদস্ সম্পর্কে ধারণা থাকে। অহম্ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, বাস্তববাদী। তাই ফ্রয়েদ্ বলেছেন এই অহম্ বাস্তব নীতির দ্বারা (reality principle) পরিচালিত হয়। ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা যাতে সুসমঞ্জসভাবে পরিতৃপ্ত করা যায়, যাতে বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তি সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করে চলতে পারে এ চেষ্টাই সব সময় করে তার **অহম্** (Ego)। অর্থাৎ, অহম্ বহির্জগতের বাধাকে স্বীকার করে। এবং কোন প্রতিক্রিয়া করলে, যদি সে বোঝে, যে অদসের কোন বিশেষ চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে, অথচ, ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না, সেই কাজ সে করতে দেয়। অন্যথা সে অদসের ইচ্ছাকে চেপে রাখে, বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয় না। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে অহম্‌কে প্রহরী বলা যেতে পারে। সে বাস্তবমুখী প্রবণতার প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ দেয় মাত্র। জন্মের সময় এই অহম্ (Ego) থাকে খুবই দুর্বল। তাই শিশুরা স্বাধীনভাবে তাদের যে কোন প্রবণতাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অহম্ সত্বার বিকাশ হয় এবং ক্রমে তার আচরণ এই অহম্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে বাস্তবমুখী হয়।

ফ্রয়েদ্ মনের ক্রিয়াশীলতার **তৃতীয় স্তরকে** বলেছেন, **অধিশাস্তা** (super-ego)। মানুষের ব্যক্তিসত্বা গঠনে যেমন বহির্জগতের প্রভাব আছে, তেমনি, সামাজিক নৈতিক মানেরও প্রভাব আছে। ব্যক্তি সত্বা গঠনে সমাজ মনের এই প্রভাবিত দিককেই ফ্রয়েদ্ বলেছেন, **অধিশাস্তা** (super-ego)। সাধারণভাবে আমরা একে **বিবেক** (conscience) বলতে পারি। এই অধিশাস্তা, অহম্-এর কাজের সমালোচনা করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর কিছু গঠনাত্মক দিক থাকলেও, নিষেধাত্মক দিকই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতাকে নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে অহম্‌কে বাধ্য করাই হ'ল এর কাজ।

ফ্রয়েদের (Freud) মন সংক্রান্ত এই সংব্যাখ্যানের ব্যক্তিজীবনের আচরণগত সঙ্গতির উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংব্যাখ্যান থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা'হল মানুষের সমস্ত রকম সচেতন আচরণ তার

অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন, সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে, অবচেতন প্রক্রিয়া। এবং সব রকম আচরণের নির্ধারক হ'ল অবচেতন মন। তিনি তাঁর Law of psychic determinism-এ এই কথাই বলেছেন। সুতরাং, এর থেকে বলা যায়, অপসঙ্গতি বা সঙ্গতি উভয়েই এই অবচেতন মনের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রয়েদ্ বলেছেন, মানুষের মনের তিনটে ক্রিয়াশীল স্তর আছে,—অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তা। এখন, সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে, এই তিনটে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে। কিন্তু, যখন এই তিন স্তরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে তখন ব্যক্তি নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। এর ফলেই অপসঙ্গতি দেখা দেয়। তাহ'লে ফ্রয়েদের এই সংব্যাখ্যান থেকে অপসঙ্গতির দু'টো প্রধান কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হ'ল অবচেতন মনের ক্রিয়া; দ্বিতীয়টি হ'ল অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাব বা দ্বন্দ্ব।

ফ্রয়েদের মন সম্পর্কে ধারণা ও অপসঙ্গতির কারণ

সামগ্রিকভাবে অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাব ছাড়াও, ফ্রয়েদ্ আরও কতকগুলো বিশেষ কৌশলের কথা বলেছেন, যার দ্বারা ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির অহম্ সত্তাকে তিনটে সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়—অদস্, অধিশাস্তা এবং বাস্তব জগত। এই তিনটে সত্তার মধ্যে সততই সংগ্রাম চলছে। অহম্ এর কাজ হ'ল এদের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা। এই সঙ্গতি বিধানের জন্য অহম্ নানারকম কৌশল অবলম্বন করে। এই সব কৌশলকে বলা হয় অহম্ এর **আত্মরক্ষার কৌশল** (defence mechanism)। এই সব কৌশলদ্বারা অনেক সময় পরোক্ষভাবে বা আংশিকভাবে কোন চাহিদার পরিতৃপ্তিও হ'য়ে থাকে। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিজীবনে সঙ্গতি বিধান করা যায়, এইসব কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ হ'ল—**অবদমন (Repression)**। অদসের বিভিন্ন অসামাজিক ইচ্ছা সবসময়ে পরিতৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু এই সব অসামাজিক এবং নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছাকে সব সময় অহম্ এর পক্ষে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় চেতন মনেও এ ধরনের অসামাজিক আকাঙ্খা জাগে। এই সব ইচ্ছাকে অহম সত্তা অবদমন করে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই সব অবদমিত ইচ্ছা অবচেতন মনে নিষ্ক্রিয় হয়ে-থাকতে পারে না। তারা সব সময় চেষ্টা করে চেতন মনে বেরিয়ে আসার এবং পরিবেশের মধ্যে পরিতৃপ্তি পাওয়ার। কিন্তু অহম্ তাদের এই বহিঃপ্রকাশে বাধা বা **রোধ** (resistance) সৃষ্টি করে। একে বলা হয় অহম্ এর সেন্সর (censor)। অবচেতনের সেইসব ইচ্ছাকেই

অহম্ এর আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল ও অপসঙ্গতি

নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, লাজুকভাব (shyness), নানারকম দৈহিক ব্যাধি শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিতে সাহায্য করে থাকে।

বিদ্যালয়ে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ সম্পর্কে এটুকু বললেই শেষ হয় না। কারণ, এছাড়াও নানারকম কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাই পূর্বনির্দিষ্ট কোন তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে তাদের অপসঙ্গতির কারণ খুঁজতে গেলে ভুল করা হবে। তাদের অপসঙ্গতির কারণ, বিদ্যালয় পরিস্থিতির মধ্যেই থাকে। তাই কোন বিশেষ আচরণের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হ'লে তার আচরণমূলক পরিস্থিতিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

অবচেতন মন ও অপসঙ্গতি [Unconscious and Maladjustment]:—

মনোবিদ্যায় সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে, পাশাপাশি অবচেতন মনের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনারও বিস্তৃতি হয়েছে। অবচেতন মনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌রা, মানুষের সমস্ত রকম আচরণের নির্ধারক হিসেবে অবচেতন মনকে বিবেচনা করেছেন। মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ফলে মনোবিদ্যার এক বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাকে বর্তমানে বলা হয় **মনঃ-সমীক্ষণ বাদ (Psycho-analytic School)**। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে **সিগমুণ্ড ফ্রয়েদের (Freud)** নাম উল্লেখ করা হয়। ফ্রয়েদের পূর্ববর্তী অনেক মানসিক চিকিৎসক অবচেতন মনের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। ফ্রয়েদ্ নিজেও ছিলেন চিকিৎসক। পূর্ববর্তী বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌দের অভিজ্ঞতা ও তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে, মনোবিদ্যার এই নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের আচরণের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে মনোবিদ্যার এই শাখা বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই মতবাদ দ্বারা মানুষের অসঙ্গতিমূলক আচরণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে হলে, এর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকার দরকার।

সূচনা

ফ্রয়েদ্ (Freud) প্রথমতঃ, মনকে ক্ষেত্রগত দিক থেকে (topologically) তিনটে অংশে ভাগ করেছেন। ফ্রয়েদের পূর্বে পর্যন্ত মনের অন্যান্য অংশের ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞান সম্মত ধারণা ছিল না। তিনি বললেন, মনের তিনটে স্তর আছে—**চেতন** (consious), **প্রাক্-চেতন** (sub-conscious or pre-conscious) এবং **অবচেতন** (unconscious)। মনের যে অংশের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক বর্তমান, বা মনের যে অংশের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে

মন সম্পর্কে ফ্রয়েদের ধারণা

আমরা সচেতন, তাকেই তিনি বলেছেন চেতন মন (conscious mind)। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, এই চেতন মন আয়তন এবং ক্রিয়াশীলতা উভয় দিক থেকে অবচেতন মনের চেয়ে ছোট এবং দুর্বল। চেতন মনের ঠিক পরবর্তী স্তরেই হ'ল প্রাকৃচেতনার স্থান। অর্থাৎ যে সব বস্তু বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন নই, কিন্তু চেষ্টা করলেই চেতন প্রক্রিয়ায় তাদের স্থান করে দিতে পারি, তাই প্রাকৃচেতন স্তরের বিষয়বস্তু। প্রাকৃচেতন স্তর চেতন ও অবচেতন স্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাক্চেতন স্তরের পরেই আছে অবচেতন স্তর। এটা মনের সবচেয়ে বৃহত্তর অংশ। অবচেতন মনে অবস্থিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবচেতন মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না। এই অবচেতন মনে থাকে সমস্ত রকম আদিম প্রবৃত্তি ও কামনা। ফ্রয়েদ্, তাঁর এই ক্ষেত্রগত শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে সমতা রেখে, মনের ক্রিয়াগত দিককেও (dynamic aspect) তিনটে স্তরে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের মন তিনটে স্তরে কাজ করে। এই তিনটে স্তর হ'ল—**অদস্ (id)**, **অহম্ (ego)** এবং **অধিশাস্তা (super-ego)**। অদস্ (id) হ'ল পরিপূর্ণ ভাবে অবচেতন। তবে সবচেয়ে মৌলিক। এটাই হ'ল মানুষের সমস্ত রকম আদিম প্রবণতার উৎস। এর কাজ হ'ল মানুষের সমস্ত রকম প্রবৃত্তির চাহিদা পরিতৃপ্ত করা। এই ধরনের চাহিদা দু'ভাবে ব্যক্তি জীবনে আসে।

প্রথমতঃ, ব্যক্তি জন্মগতভাবে কিছু প্রবণতা নিয়ে আসে। এই জন্মগত প্রবণতাগুলোর উৎস হ'ল অদস্ একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এছাড়া ব্যক্তিজীবনে নানা রকম চাহিদার সৃষ্টি হয়। এবং সামাজিক নানা বাধা নিষেধ থাকার জন্য বা ব্যক্তি অক্ষমতার জন্য আমরা সব সময়, এগুলোকে চরিতার্থ করতে পারি না। তখন এই সব আকাঙ্খা বা চাহিদাগুলোকে আমাদের অবচেতন মনে অবদমন (repress) করি। এই অবদমিত চাহিদা ও জন্মগত চাহিদাগুলো অবচেতন মনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে না। তাদের মধ্যে সমন্বয়নের মাধ্যমে কমপ্লেক্স্ (complex) তৈরী করে এবং গতিধর্মী বল তাদের মধ্যে সঞ্চারিত। এই গতিধর্মীতার (dynamic nature) দরুন, এই সব চাহিদাগুলো সব সময় পরিতৃপ্তি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। এই জন্য ফ্রয়েদ্ বলেছেন, অদস্ (id) সব সময় সুখ ভোগের নীতি (pleasure principle) অনুসরণ করে। এই অদস্ (id) হ'ল অবচেতন জুড়ে বর্তমান; মানুষের নগ্নতার প্রতিরূপ। ভাল মন্দ বিচারের কোন অবকাশ তার নেই। সব সময় চায় মনের অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করতে। আর সুখই তার কাছে প্রধান। কিন্তু অদস্ এর বিভিন্ন কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য বাইরের জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া

করা প্রয়োজন। হয় বহির্জগতের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়, অথবা তাকে জয় করতে হয়। কিন্তু অদসের (id) মত অন্ধ অবচেতন শক্তির দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব হয় না। এই কাজের জন্য ব্যক্তি মনের উচ্চতর স্তর আছে।

দ্বিতীয় স্তরে ফ্রয়েদ্ একে বলেছেন, **অহম্** (Ego)। অদস্ তার কোন ইচ্ছাই সরাসরি পূরণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা বাস্তবে চরিতার্থ করতে হ'লে অহম্ (Ego) এর প্রয়োজন। অহম্ এর বাস্তব অবস্থা এবং অবচেতন মনের অদস্ সম্পর্কে ধারণা থাকে। অহম্ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, বাস্তববাদী। তাই ফ্রয়েদ্ বলেছেন এই অহম্ বাস্তব নীতির দ্বারা (reality principle) পরিচালিত হয়। ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা যাতে সুসমঞ্জসভাবে পরিতৃপ্ত করা যায়, যাতে বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তি সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করে চলতে পারে এ চেষ্টাই সব সময় করে তার **অহম্** (Ego)। অর্থাৎ, অহম্ বহির্জগতের বাধাকে স্বীকার করে। এবং কোন প্রতিক্রিয়া করলে, যদি সে বোঝে, যে অদসের কোন বিশেষ চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে, অথচ, ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না, সেই কাজ সে করতে দেয়। অন্যথা সে অদসের ইচ্ছাকে চেপে রাখে, বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয় না। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে অহম্‌কে প্রহরী বলা যেতে পারে। সে বাস্তবমুখী প্রবণতার প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ দেয় মাত্র। জন্মের সময় এই অহম্ (Ego) থাকে খুবই দুর্বল। তাই শিশুরা স্বাধীনভাবে তাদের যে কোন প্রবণতাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অহম্ সত্তার বিকাশ হয় এবং ক্রমে তার আচরণ এই অহম্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে বাস্তবমুখী হয়।

ফ্রয়েদ্ মনের ক্রিয়াশীলতার **তৃতীয় স্তরকে** বলেছেন, **অধিশাস্তা** (super-ego)। মানুষের ব্যক্তিসত্বা গঠনে যেমন বহির্জগতের প্রভাব আছে, তেমনি, সামাজিক নৈতিক মানেরও প্রভাব আছে। ব্যক্তি সত্বা গঠনে সমাজ মনের এই প্রভাবিত দিককেই ফ্রয়েদ্ বলেছেন, **অধিশাস্তা** (super-ego)। সাধারণভাবে আমরা একে **বিবেক** (conscience) বলতে পারি। এই অধিশাস্তা, অহম্-এর কাজের সমালোচনা করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর কিছু গঠনাত্মক দিক থাকলেও, নিষেধাত্মক দিকই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতাকে নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে অহম্‌কে বাধ্য করাই হ'ল এর কাজ।

ফ্রয়েদের (Freud) মন সংক্রান্ত এই সংব্যাখ্যানের ব্যক্তিজীবনের আচরণগত সঙ্গতির উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংব্যাখ্যান থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা'হল মানুষের সমস্ত রকম সচেতন আচরণ তার

ফ্রয়েদের মন সম্পর্কে ধারণা ও অপসঙ্গতির কারণ

অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন, সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে, অবচেতন প্রক্রিয়া। এবং সব রকম আচরণের নির্ধারক হ'ল অবচেতন মন। তিনি তাঁর Law of psychic determinism-এ এই কথাই বলেছেন। সুতরাং, এর থেকে বলা যায়, অপসঙ্গতি বা সঙ্গতি উভয়েই এই অবচেতন মনের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রয়েদ্ বলেছেন, মানুষের মনের তিনটে ক্রিয়াশীল স্তর আছে,—অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তা। এখন, সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে, এই তিনটে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে। কিন্তু, যখন এই তিন স্তরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে তখন ব্যক্তি নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। এর ফলেই অপসঙ্গতি দেখা দেয়। তাহ'লে ফ্রয়েদের এই সংব্যাখ্যান থেকে অপসঙ্গতির দু'টো প্রধান কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হ'ল অবচেতন মনের ক্রিয়া; দ্বিতীয়টি হ'ল অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাব বা দ্বন্দ্ব।

অহম্ এর আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল ও অপসঙ্গতি

সামগ্রিকভাবে অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাব ছাড়াও, ফ্রয়েদ্ আরও কতকগুলো বিশেষ কৌশলের কথা বলেছেন, যার দ্বারা ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির অহম্ সত্ত্বাকে তিনটে সত্ত্বার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়—অদস্, অধিশাস্তা এবং বাস্তব জগত। এই তিনটে সত্ত্বার মধ্যে সততই সংগ্রাম চলছে। অহম্ এর কাজ হ'ল এদের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা। এই সঙ্গতি বিধানের জন্য অহম্ নানারকম কৌশল অবলম্বন করে। এই সব কৌশলকে বলা হয় অহম্ এর **আত্মরক্ষার কৌশল** (defence mechanism)। এই সব কৌশলদ্বারা অনেক সময় পরোক্ষভাবে বা আংশিকভাবে কোন চাহিদার পরিতৃপ্তিও হ'য়ে থাকে। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিজীবনে সঙ্গতি বিধান করা যায়, এইসব কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ হ'ল—**অবদমন (Repression)**। অদসের বিভিন্ন অসামাজিক ইচ্ছা সবসময়ে পরিতৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু এই সব অসামাজিক এবং নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছাকে সব সময় অহম্ এর পক্ষে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় চেতন মনেও এ ধরনের অসামাজিক আকাঙ্খা জাগে। এই সব ইচ্ছাকে অহম সত্ত্বা অবদমন করে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই সব অবদমিত ইচ্ছা অবচেতন মনে নিষ্ক্রিয় হয়ে-থাকতে পারে না। তারা সব সময় চেষ্টা করে চেতন মনে বেরিয়ে আসার এবং পরিবেশের মধ্যে পরিতৃপ্তি পাওয়ার। কিন্তু অহম্ তাদের এই বহিঃপ্রকাশে বাধা বা **রোধ** (resistance) সৃষ্টি করে। একে বলা হয় অহম্ এর সেন্সর (censor)। অবচেতনের সেইসব ইচ্ছাকেই

অহম্ চেতন মনে প্রবেশ অধিকার দেয়, যেগুলো সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। আর বাকী গুলোর উপর বাধা দেয়। এইভাবে চাহিদার অবদমনের দ্বারা ব্যক্তিজীবনের অসামাজিক, অর্থনৈতিক আচরণের বহিঃপ্রকাশকে বন্ধ করা যায়। কিন্তু আপাতঃভাবে এই অবদমন সুস্থ ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করলেও, তার একটা সীমা আছে। এই অবদমন অতিরিক্ত হ'লে, এবং অবদমিত আকাঙ্খার সংখ্যা অত্যন্ত পরিমাণে বেশী হ'লে, তাকে আর বাধার দ্বারা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ফলে এই অত্যধিক অবদমনের দরুন অনেক সময়, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি হয়। এই অবদমন ছাড়া অহম্ এর আত্মরক্ষার আরও নানারকম কৌশল আছে। যেমন, **বিপরীত প্রতিক্রিয়া (Reaction formation)**—এখানে ব্যক্তি অবদমিত অতৃপ্ত আকাঙ্খাকে অস্বীকার করার জন্য বিপরীত ইচ্ছা বা মনোভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ, যে চুরি করেছে, সেই চোরকে ধরার জন্য অনেক সময় বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে। **যুক্ত্যভ্যাস** (rationalization) আর একধরনের কৌশল যার দ্বারা আমরা আমাদের নিজের কোন ইচ্ছাকে বিশেষ যুক্তির দ্বারা সামাজিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেমন, অনেকে বলেন, মাইনেতে খেতে কুলায় না, সুতরাং সেইজন্য ঘুষ নেওয়া অপরাধ নয়। অর্থাৎ, নিজের অসামাজিক আচরণের পেছনে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করছি। এছাড়া **অভিক্ষেপণের** (projection) সাহায্যে আমাদের বিশেষ কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অন্যের উপর আরোপ করি। যেমন, আসলে আমার হয়তো কোন ব্যক্তিকে ভাল লাগে না ; আমি বলি ওঁর আমাকে ভাল লাগে না ; তাই ওঁর সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করি না। **উদ্গমণও** (sublimation) এক ধরনের সুস্থ ব্যক্তি জীবন বিকাশের কৌশল। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত কোন যৌন কামনাকে আমরা সমাজ নির্ধারিত বিশেষ উন্নত পথে প্রবাহিত করি। কোন বিশেষ কামনাকে নিম্ন শ্রেণীর অসামাজিক লক্ষ্য থেকে সামাজিক উন্নত লক্ষের পথে পরিচালিত করার নামই উদ্গমণ (sublimation)। সবশেষে **তাদাত্ম্য** (identification) নামে আর এক ধরনের প্রক্রিয়া ব্যক্তিসত্বার সঙ্গতি বিধানে ও বিকাশে সাহায্য করে। এর সাহায্যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে কল্পনা করে। অন্যের কোন কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন মনে করে আনন্দ পায়। এই সব অহম্-এর আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া (defence mechanism) ব্যক্তি জীবনে অসামাজিক আকাঙ্ক্ষার বোধের মাধ্যমে বা আংশিক পরিতৃপ্তির মাধ্যমে, সুস্থ সঙ্গতিপূর্ণ জীবন বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু অনেক সময় এই সব কৌশলের অতিমাত্রায় ক্রিয়ার দরুন ব্যক্তি জীবনে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই সব আত্মরক্ষা কৌশল ছাড়াও ফ্রয়েদ্ আরও কয়েক ধরনের আত্মরক্ষা কৌশলের কথা বলেছেন, যে

গুলো ব্যক্তিজীবনে অপসঙ্গতির মূল কারণ। যেমন—**প্রত্যাবৃত্তি** (regression) ব্যক্তির বিশেষ কোন মানসিক আকাঙ্ক্ষা বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না, তখন অনেক সময় তা বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যেতে চায়। শৈশবে যে সব আচরণের মধ্যে সে আনন্দ পেত সেই সব আচরণ সম্পাদনের মাধ্যমে সে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করে। সুতরাং, ব্যক্তির মধ্যে এই পলায়নী মনোভাব এবং শৈশবের আচরণের পুনরাবৃত্তিকে মানসিক সুস্থতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাই এই ধরনের সঙ্গতিমূলক কৌশল, অপসঙ্গতিরই কারণ। এছাড়া অনেক সময় ব্যক্তি অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে, অবদমিত আকাঙ্ক্ষার আংশিক তৃপ্তি করে। কিন্তু এই **অবাস্তব কল্পনা** (fantasy) বা **দিবাস্বপ্ন** (day-dreaming) অনেক সময়, এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে তাকে আর মানসিক সুস্থতার লক্ষণ বলা যায় না। এ ছাড়া, অনেক সময়, মানসিক দ্বন্দ্বকে দৈহিক লক্ষণে রূপান্তরিত (conversion) করা হয়। এই সব রূপান্তরিত আচরণ অপসঙ্গতির কারণ বলা যেতে পারে। সুতরাং, ফ্রয়েদের মতে এই সব কৌশল স্বাভাবিক অবস্থায়, ব্যক্তিজীবনের সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করলেও, অনেক সময় তারা অপসঙ্গতি ও মানসিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্রয়েদের মতবাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল মানুষের যৌন শক্তি (libido) বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্ব (theory of libido development)।

যৌনশক্তি সম্পর্কে ফ্রয়েদের ধারণা

ফ্রয়েদের মতে মানুষের যৌন জীবন হঠাৎ বয়োঃপ্রাপ্তিতে একদিনে শুরু হয় না। জন্মমুহূর্ত থেকে তার মধ্যে যে জীবনীশক্তি থাকে তারই বিকাশের মাধ্যমে পরবর্তী জীবনের যৌনতার প্রকাশ হয়। মানুষের মনে প্রথম অবস্থা থেকে দুটো গতিশীল শক্তি থাকে। এই দুটোই আদিম শক্তি, এদেরই একটাকে তিনি বলেছেন, **জীবনীশক্তি** (eros) ; অপরটার নাম দিয়েছেন, **মরণ শক্তি** (thanatos)। এই পরস্পর বিপরীত ধর্মী এই দু'শক্তির একটার কাজ হ'ল মানুষের জীবনকে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা ; অপরটার কাজ হচ্ছে, ধ্বংসের পথে, অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। এদের অনেক সময় বলা হয়, ভালবাসার বা জীবনের প্রবৃত্তি (instinct of love) এবং মরণের প্রবৃত্তি (instinct of death)। এদের মধ্যে জীবনীশক্তির মূল কেন্দ্রকে ফ্রয়েদ্ বলেছেন, **যৌনশক্তি (libido or sex energy)**। তাঁর মতে এই জীবনীশক্তির মূলে আছে যৌন আকাঙ্ক্ষা। এই ধারণা অনুযায়ী, মানুষের জীবন বিকাশের মূলে যে শক্তি কাজ করছে, তা এই যৌনশক্তি। ফ্রয়েদের এই মতবাদ, মানুষের চিন্তার জগতে এই কারণে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই মতবাদ প্রচারের পর অনেক চিন্তাবিদ্, তাঁকে ঘৃণার চক্ষে

দেখেছেন। কিন্তু যৌনতা কথাটাকে ফ্রয়েদ্ আদৌ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নি। মানুষের জীবনের সব রকম আসক্তিকে তিনি যৌনতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আত্ম-প্রীতি, পিতা-মাতার প্রতি আসক্তি, ব্যাপক অর্থে প্রেম বলতে যা বোঝায়, তাকেই ফ্রয়েদ্ যৌনতা বলেছেন। তাই পরবর্তীকালে অনেক মনোবিদ্ ফ্রয়েদের মতবাদের যথার্থ্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। ফ্রয়েদের মতে, এই যৌনশক্তি একটা বিকাশমান সত্তা এবং এর বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ হয়। ফ্রয়েদ্ এই যৌনশক্তি বিকাশের কয়েকটি স্তরের কথা বলেছেন। জন্মকালে, শিশুর যৌনতা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই যৌনশক্তি (lidido), দেহের তিনটি অঙ্গে কেন্দ্রীভূক্ত হয়। ফ্রয়েদের অনুসরণে তাহাদের আলোচনা নিম্নে করা হ'ল—

[এক] যৌন জীবন বিকাশের প্রথম স্তর হ'ল—**আত্মরতির স্তর** (**Auto erotic stage**)—এই স্তরে শিশুর যৌনতা তিনটে কামোদ্দীপক দৈহিক কেন্দ্রের (erotic zones) মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয়। ঠোঁঠ (lips), পায়ু (anas) এবং লিঙ্গ (genital organ)। তিনটে দেহ কেন্দ্র অনুযায়ী ফ্রয়েদ্ এই স্তরে তিনটে পর্যায়ের কথা বলেছেন। শিশু মাতৃস্তন পানের মাধ্যমে চোষনের দ্বারা ঠোঁটে যে অনুভূতি হয় তার দ্বারা যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করে। এই পর্যায়কে **মৌখিক রতি স্তর** (oral erotic stage) বলেছেন। এই পর্যায়ে, প্রথম প্রথম শুধুমাত্র চোষণেরদ্বারা যে তৃপ্তি আসে, তাকে তিনি বলেছেন **নিষ্ক্রিয় পর্যায়** (passive phase); আবার একটু বড় হলে, সে মায়ের স্তন কামড়ে আনন্দ পায়, একে বলা হয় **সক্রিয় পর্যায়** (active phase)। এর পরবর্তী স্তরে শিশুর যৌনতা পায়ুতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই স্তরকে ফ্রয়েদ্ বলেছেন, **পায়ু-রতি স্তর** (**anal erotic stage**)। এই স্তরে শিশুর মলত্যাগ করার সময় পায়ুতে যে অনুভূতি হয়, তার মাধ্যমে যৌন আনন্দ পায়। একে বলা হয় নিষ্ক্রিয় **পায়ু-রতি পর্যায়** (passive phase)। আবার, পরবর্তী পর্যায়ে মলের বেগ ধারণ করে আনন্দ পায়। একে বলা হয় **সক্রিয় পায়ু-রতি পর্যায়** (active phase)। তৃতীয় স্তরে, যৌন অনুভূতি যৌন লিঙ্গকে কেন্দ্র করে চরিতার্থ হয়। এই স্তরকে বলা হয় **লৈঙ্গিক স্তর** (phallic phase)। এই লৈঙ্গিক স্তরে শিশুর যৌনশক্তি তার স্বাভাবিক দৈহিক অঙ্গের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে। প্রথম নিষ্ক্রিয় পর্যায়ে মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে শিশু আনন্দ পায়। পরে, সক্রিয় পর্যায়ে, মূত্র ত্যাগের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আনন্দ পায়।

[দুই] মৌখিক রতির পরবর্তী স্তরে, শিশুর যৌন আকাঙ্ক্ষা নিজের দেহ থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়ে চরিতার্থ হ'তে চায়। ফ্রয়েদ্ এই স্তরকে বলেছেন,—**বহির্কামের স্তর** (**allo-erotic stage**)। এই স্তরে শিশু

বাইরের বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বাভাবিকভাবে শিশুরা প্রথম বাইরের ব্যক্তি হিসেবে পিতা-মাতাকে নির্বাচন করে। প্রথম পর্যায়ে শিশুদের মধ্যে বিপরীত কাম (hetro-sexuality) লক্ষ্য করা যায়। ছেলেরা স্বাভাবিকভাবে মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাকে স্পর্শ করতে, চুম্বন করতে, মায়ের কাছে ঘুমাতে তারা ভালবাসে। এই সব আকাঙ্ক্ষা, সবই যৌনকেন্দ্রিক তবে সম্পূর্ণ অবচেতন। অনুরূপভাবে, মেয়েরা বাবাকে ভালবাসতে শুরু করে। ছেলেদের এই মনোভাবকে বলা হয় **ঈদিপাস্ কমপ্লেক্স্** (odipus complex)। এবং মেয়েদের মনোভাবকে বলা হয় **ইলেক্ত্রা কম্প্লেক্স্** (electra complex)। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদেরও সমাজের অনুশাসনের দরুন শিশুর মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। ছেলেরা ভাবে মায়ের প্রতি তাদের এই আসক্তি, বাবা ভাল চোখে দেখছেন না। সে বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, মেয়েরাও মায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়। এই ভয় ও মনোভাব থেকে তার মনে লিঙ্গচ্ছেদের ভয় বা লিঙ্গচ্ছেদের কমপ্লেক্স্ (castration complex) গড়ে ওঠে। তখন, শিশুরা নিজেদেরকে সমলিঙ্গ পিতামাতার সঙ্গে নিজেদের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে (identification) স্থাপন করে, তাদের প্রতি আসক্তি দেখায়। অর্থাৎ, ছেলেরা বাবার প্রতি আসক্তি দেখায়, এবং মেয়েরা মায়ের প্রতি আসক্তি দেখায়। অর্থাৎ, শিশুদের মধ্যে সমলিঙ্গ কাম (homo sexuality) লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পূর্ণ পর্যায়ের বিকাশ প্রায় ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে শেষ হয়। এরপর শিশুদের যৌনশক্তির কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না।

[তিন] প্রায় দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত যৌনশক্তি বিকাশের এই স্তরকে ফ্রয়েদ্ বলেছেন,—**সুপ্তস্তর (Latency period)**।

[চার] এরপর যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে, আবার শিশুর জীবনে সাময়িকভাবে আত্মকামের ভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজের দেহের গঠন, নিজের যৌন অঙ্গ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়কে ফ্রয়েদ্ নাম দিয়েছেন,—**নার্সিসিস্টিক পর্যায় (Narcissistic stage)**।

[পাঁচ] এই সময়কাল খুবই কম। এর পরে, কৈশোরে (adolescence) মধ্যে এসে যৌনশক্তি তার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতে চায়। যৌন আকাঙ্ক্ষা যৌন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হতে চায়, স্বাভাবিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। এই স্তরই যৌনশক্তি বিকাশের পরিণত স্তর, একে ফ্রয়েদ্ বলেছেন,—**স্বাভাবিক বিপরীত কামের স্তর (normal hetro-sexual stage)**।

যৌনশক্তির এই স্বাভাবিক বিকাশ থেকে, অনেক বিচ্যুতি হয়। এই বিচ্যুতির দরুন নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করা

যায়। যৌনশক্তি বিকাশের পথে বিভিন্ন স্তরে আটকে যায়। অর্থাৎ, তার পরে আর যৌনশক্তির বিকাশ হয় না। এই ঘটনাকে ফ্রয়েদ্ নাম দিয়েছেন, যৌনশক্তির সংবন্ধন (fixation of libido)। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে যৌন শক্তির সংবন্ধন কোন সময় হয় না। কিন্তু এই আংশিক সংবন্ধনের ফলে ব্যক্তিজীবনে নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। শৈশবের কোন বিশেষ কেন্দ্রে যৌনশক্তির সংবন্ধনের ফলে প্রাপ্ত বয়সে যৌন-জীবনের মধ্যেও নানারকম অপসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক সময় বাহ্যিক জগতে বিরূপ অভিজ্ঞতার ফলে অনেক সময়, যৌনশক্তির শৈশবে প্রত্যাবৃত্তি (regression) হয়। এর জন্য অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। যেমন, যৌনশক্তির মৌখিক রতি স্তরে সংবন্ধনের জন্য ব্যক্তির মধ্যে, যৌন আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র ঐ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই ধরনের ব্যক্তি স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপন করতে পারে না। এছাড়া ঐ একই কারণে, নানারকমের আচরণ-মূলক অপসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, ফ্রয়েদের এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী ব্যক্তির যৌন শক্তির অস্বাভাবিক বিকাশ, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের পেছনে কাজ করে।

যৌনশক্তির সংবন্ধন ও অপসঙ্গতি

অপসঙ্গতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ফ্রয়েদের ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করলাম। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার অবকাশ এই বইয়ে নেই। কারণ ফ্রয়েদের এই তত্ত্ব মনঃসমীক্ষণবাদ (psycho-analysis) এবং মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের (mental hygiene) সুপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। আমরা এ সম্পর্কে পরবর্তী অংশেও কিছু কিছু উল্লেখ করব। কিন্তু, সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, ফ্রয়েদের এই মতবাদের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রকে এই মতবাদ নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েদের এই তত্ত্বের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় ফিরে যাব। মনঃসমীক্ষণবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে নানারকম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অবচেতনবাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য

প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির শৈশবকালের জীবনযাত্রা নানাভাবে বয়স্ক জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিই হ'ল শৈশবের অভিজ্ঞতা। বিশেষভাবে শৈশবের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে শিশুকে প্রত্যেকবার খাওয়ানোর সময় মা কষ্ট দিয়েছেন, পরবর্তী জীবনে তার খাওয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা যায়। শৈশবের কোন ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা বয়স্ক জীবনের আচরণকে প্রভাবিত করে। মনঃসমীক্ষণবাদীরা শৈশবের এই গুরুত্বের কথা সর্বসমক্ষে

তুলে ধরে, শিক্ষকদের বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছেন। শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে, শিশুদের সব সময় খারাপ কোন অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে রক্ষা করা। তারা যাতে বস্তু জগতের বিভিন্ন অংশের সম্পর্কে আসার সময় আঘাতাত্মক (traumatic) অভিজ্ঞতা না পায় সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে অবচেতন প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেক আচরণের নির্ধারক হ'ল অবচেতন মন (unconscious mind)। শিক্ষকের কাছে এই তত্ত্বের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে যে সব আচরণমূলক অপসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে যে অবচেতন মনের ক্রিয়া আছে, সে সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতনা এনে দিয়েছে এই মতবাদ। পূর্বে আমরা শিশুদের সমস্যামূলক আচরণ দূর করার জন্য, তাদের শাস্তি দিতাম। এবং আচরণের আপাতঃ লক্ষণগুলোকে দূর করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু, এই মতবাদ থেকে জানা যাচ্ছে, এই সব লক্ষণ (symptom) গুলোর মূলে আছে অবচেতনের কোন জটিল ভাব জট্। সুতরাং, সেই ভাব জট্‌কে টেনে খুলতে না পারলে, ঐ ধরনের আচরণকে নির্মূল করা যাবে না। ফ্রয়েদের এই মতবাদ, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের আচরণের বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করে, তার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে সহায়তা করেছে।

তৃতীয়তঃ, মানসিক দ্বৈতবাদের (mental duality) প্রচার করে, মনঃসমীক্ষণবাদ, শিক্ষার্থীদের আচরণের স্ববিরোধিতার (contradiction) তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। এই মত অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দু'টো বিপরীত শক্তি সব সময় কাজ করে। একটা ভালবাসার শক্তি (eros) আর একটা ধ্বংসের শক্তি (thanatos)। একটা অন্ধ, বিবেচনাহীন, নগ্ন কামনার প্রতীক অদস্ এবং অপরটা বিচার বিবেচনাযুক্ত বাস্তবমুখী অহম্। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতধর্মী আচরণকে এদেরই ক্রিয়াশীলতার দিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এবং তাদের মধ্যেকার এই বিরোধ যতদূর সম্ভব শিক্ষার দ্বারা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।

চতুর্থতঃ, শৈশবের যৌন জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা, ও ভবিষ্যৎ জীবনে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের যে তত্ত্ব ফ্রয়েদ্ দিয়েছেন, তা শিক্ষকের কাজে অনেক সহায়তা করবে। এই যৌনশক্তি বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে। সেই সব আচরণকে অবদমনের দ্বারা চেপে রাখার চেষ্টা করলে খারাপ ফল হয়। এই সব আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে, তার যৌনজীবন বিকাশে সহায়তা করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বের গুরুত্বের

কথা বিবেচনা করে আধুনিককালে, বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষার (sex-education) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় [Diagnosis of Malabjustment] ঃ—

অপসঙ্গতি দূর করতে প্রথমে অপসঙ্গতির স্বরূপ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আমরা সাধারণভাবে অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর মধ্যে কি কারণে ঠিক অপসঙ্গতি এসেছে, তা না জানলে, অপসঙ্গতি দূর করা যাবে না। শুধুমাত্র, অপসঙ্গতির লক্ষণ দেখে তার নিরাময় করা যায় না। আর সে চেষ্টা করলে, তা কখনই সফল হবে না। যেমন, কোন বিশেষ ছাত্র অন্যের জিনিস চুরি করে। এই চুরি করার আচরণকে শুধুমাত্র তিরস্কার বা শাস্তির দ্বারা দূর করা যাবে না। বরং সে ধরনের চেষ্টা করলে পরে সে এমনভাবে চুরি করবে যাতে আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা না থাকে। তাই এই ধরনের আচরণের প্রবণতাকে দূর করতে হলে, এই প্রবণতার মূলে, কি কি ধরনের চাহিদার অতৃপ্তি কাজ করছে, বা কি ধরনের অবচেতন মানসিক আকাঙ্ক্ষা কাজ করছে তা বের করতে হবে, এবং ঐ সব চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে হবে বা শিক্ষার্থীর অবচেতন কমপ্লেক্সকে দূর করতে হবে। এই অপসঙ্গতির কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে দু'টো স্তরে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ অপসঙ্গতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ তথ্যের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়।

অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি

কোন ব্যক্তির অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় করতে হ'লে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। মনোবিদ্‌রা তথ্য সংগ্রহের জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। এদের মধ্যে সব পদ্ধতি শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে কতকগুলো পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক অসঙ্গতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। এইসব পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হ'ল শিশুর আচরণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে **পর্যবেক্ষণ** (Observation)। শিশুরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ করে ; কোন কোন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে, তা পর্যবেক্ষণ করে, তাদের অপসঙ্গতির কারণ ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। তবে খুব সাধারণ ধরনের আচরণমূলক অপসঙ্গতির বেলায়, এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু অপসঙ্গতি যদি কোন গভীর অবচেতন মানসিক কারণের জন্য হ'য়ে থাকে, তার প্রকৃতি এই ধরনের পর্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। **আরও গভীর অনুশীলন ও বিশেষ পর্যবেবেক্ষণের জন্য অনেক সময় সাক্ষাৎ-**

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

কারের (interview) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশে, আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে, তার অপসঙ্গতির কারণ নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়। তবে এই ধরনের সাক্ষাৎকার থেকে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে হলে প্রথম দরকার শিশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করার। এই অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে না পারলে, শিশুরা অনেক কিছু গোপন করতে পারে। এই সাক্ষাৎকার এক ঘণ্টায় বা একদিনে শেষ হয়ে যাবে না। বহুদিন ধরে এই সাক্ষাৎকার চলবে। এবং ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষককে শিশুদের কথা শুনতে হবে। ধৈর্য্য ও সমবেদনার মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলোর কথা শুনলে, তারা শিক্ষকের প্রতি আস্থাবান হবে এবং তাদের গোপন কথা গুলো বলবে। এইভাবে সাক্ষাৎকারে, শিক্ষক বেশী কথা বলবেন না, বা শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করবে তখন তাকে বাধা দিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবেন না। এই ধরনের সাক্ষাৎকার (interview) পরিচালনার কৌশল বিশেষভাবে আয়ত্ব করতে হয়। আর এক ধরনের পদ্ধতি মনঃসমীক্ষকগণ (Psycho-analysts) ব্যবহার করে থাকেন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **মুক্ত অনুষঙ্গের (Free association)** পদ্ধতি। যদিও এটা মনঃসমীক্ষক বা চিকিৎসকগণ ব্যবহার করে থাকেন, তা'হলেও শিক্ষকদেরও এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। শিশুর আচরণমূলক অপসঙ্গতির প্রকৃত কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। কারণ এই পদ্ধতির দ্বারা অবচেতন মনের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। এই পদ্ধতিতে, ব্যক্তিকে, খুব শান্ত পরিবেশের মধ্যে বসান হয়, এবং সেই অবস্থায় তার মনে যা আসে তা প্রকাশ করতে বলা হয়। অনেক সময় চিকিৎসক কিছু শব্দ বা কথার দ্বারা উদ্দীপনাও সরবরাহ করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের অবচেতন কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব হয় ঠিকই, কিন্তু ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার কিছু কিছু অসুবিধা আছে। এছাড়া, সাধারণতঃ, অপসঙ্গতির অবচেতন মূল নির্ণয় করার জন্য ফ্রয়েদ্ **স্বপ্ন বিশ্লেষণের (Dream analysis)** পদ্ধতিও ব্যবহার করেছেন। ফ্রয়েদ্ মনে করেন, আমাদের স্বপ্নের মধ্যে অবচেতন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। এই স্বপ্নের মধ্যে আমাদের অদস্ (Id), অহম্ এর সেন্সরকে (Censor) লুকিয়ে আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদার পরিতৃপ্ত করে থাকে। সুতরাং এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে, ব্যক্তির অবচেতন মন সম্পর্কে জানা যায় এবং অপসঙ্গতির প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ফ্রয়েদ্ স্বপ্ন বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। তবে সাধারণভাবে, শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার অনেক অসুবিধা আছে। তাই শিক্ষকের জন্য সাক্ষাৎকারই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি।

অপসঙ্গতির স্বরূপ জানতে হ'লে, শুধুমাত্র, তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে না, এই সব তথ্যের তাৎপর্যও নির্ণয় করতে হবে। সাক্ষাৎকারের ফলে যে সব তথ্য শিক্ষার্থীরা সরবরাহ করে, তার সবকিছুই যে তাৎপর্যপূর্ণ তা ঠিক নয়। অনেক অপ্রাসঙ্গিক তথ্য শিশু সরবরাহ করে, যার অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয়ে কোন গুরুত্বই নেই। বরং দেখা গেছে, অনেক সময়, ঐ সব অপ্রয়োজনীয় তথ্য আসল তথ্যকে চাপা দিয়ে রাখে। তাই এই সব তথ্য সামগ্রী থেকে প্রকৃত তথ্যকে খুঁজে বের করতে হবে এবং কিভাবে, তা ব্যক্তি জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা নির্ণয় করতে হবে। এই তাৎপর্য নির্ণয়ের কাজ শিক্ষকের অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রাপ্ত তথ্যের তাৎপর্য যেভাবে শিক্ষক নির্ণয় করবেন, তার উপরই নির্ভর করবে চিকিৎসা পদ্ধতি।

অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় [Cures of Maladjustment] :—

শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং অপসঙ্গতির বিশেষ কারণ নির্ণয় করার পর, আমাদের দায়িত্ব হবে এই অপসঙ্গতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে দূর করা। এখন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতি মূলক আচরণ অনেক সময় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; আবার কোন সময়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই নির্ধারিত হয়। যে সব অপসঙ্গতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তদের নিরাময়ের জন্য বিশেষ ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দৃঢ়তর না হওয়ার জন্য, সাধারণভাবে অপসঙ্গতির কারণ দূর করতে পারলে, তার নিরাময় করা যায়। তাই অপসঙ্গতির নিরাময় দূর করার দু'ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব।

অপসঙ্গতি নিবারণের সাধারণ কৌশল

সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ, কোন বিশেষ ধরনের চাহিদার পরিতৃপ্তির অভাবে হয়ে থাকে। অনেক সময়, সামাজিক চাহিদা, প্রক্ষোভমূলক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি না হওয়ার জন্য অপসঙ্গতি মূলক আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। সুতরাং এই ধরনের চাহিদাগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করলে, অপসঙ্গতি দূর করা যায়। এ সম্পর্কে শিক্ষক কি করতে পারেন, সে বিষয়ে প্রথম আমরা আলোচনা করব।

[এক] দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে। তাই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে এবং অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আবির্ভাব দূর করতে হলে শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের নানারকম শারীরিক অসুস্থতার কারণকে দূর করতে পারলে,

মানসিক অসুস্থতাও দূর করা যায়। এরজন্য তাদের যথাযোগ্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। শরীরচর্চ্চার ব্যবস্থা করতে হবে। শারীরিক সুস্থতার জন্য বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযোগ্য শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করা যায়।

[দুই] কোন কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাবের দরুন অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন অনেক শিক্ষার্থী আছে, যারা ভাল শুনতে পায় না বা দূরের লেখা দেখতে পায় না। এই সব শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না বলে, নানা ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে। এইসব শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করবার জন্য এদের ইন্দ্রিয়ের কাজের ত্রুটি চিকিৎসার দ্বারা দূর করা প্রয়োজন।

[তিন] অনেক সময় পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। অস্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এবং এই খারাপ প্রভাব দূর করতে না পারলে, শিশুদের অপসঙ্গতি দূর করা যায় না। তাই এবিষয়ে আমাদের যত্নবান হতে হবে। বিশেষভাবে বিদ্যালয় পরিবেশ যাতে সুন্দর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

[চার] শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক কৌতূহলকে অবদমন করার জন্য তাদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি হয়। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক জানবার চাহিদাকে অবদমন না করে প্রকাশের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। তবেই অপসঙ্গতিমূলক আচরণকে দূর করা সম্ভব হবে।

[পাঁচ] অনেক সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ করে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বা বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করে, এর ফলে তার মনে, অভাববোধ দেখা দেয়। আবার কোন কোন সময়, পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা তাদের মনে চাপ দেয়। এই দুই কারণেই অপসঙ্গতি আসে। বিদ্যালয়ে যাতে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে দলগত কাজ এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দূর করা যায়। তা'হলেই অপসঙ্গতিমূলক কারণ দূর করা সম্ভব হবে।

[ছয়] প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বীকৃতি লাভের চাহিদা থাকে, এবং যথাযোগ্য স্বীকৃতি যদি শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে না পায়, তা'হলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই বিদ্যালয়ের কাজের মাধ্যমে সকলকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ দিতে পারলে এবং সকলকে যোগ্য স্বীকৃতি দিলে, শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করা যায়।

অপসঙ্গতি দূর করার পূর্বোক্ত উপায়গুলোর দ্বারা আমরা খুব সাধারণ রকমের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করতে পারি বা অপসঙ্গতির আবির্ভাবকে নিবারণ করতে পারি। কিন্তু শিশুর মধ্যে যদি স্থায়ীভাবে কোন অপসঙ্গতিমূলক আচরণ গড়ে ওঠে, তাকে এই সব সাধারণ উপায়ের দ্বারা দূর করা যায় না, তার জন্য বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহার করতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অপসঙ্গতি দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই সব চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করাও শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

অপসঙ্গতি নিবারণের জন্য চিকিৎসা

অপসঙ্গতি দূর করার জন্য ফ্রয়েদ্ যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, তার নাম হ'ল **মনোবিকলন** (Psycho-analysis)। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর মত অনুযায়ী, মানসিক বিকার বা অপসঙ্গতির মূল কারণ হ'ল অবচেতন মনে কমপ্লেক্স গঠন। তাই তিনি বলেছেন, যদি কোন পদ্ধতি এই অপসঙ্গতির মূল কারণ, ব্যক্তির সামনে উদ্ঘাটন করা যায়, তা'হলে ব্যক্তির ঐ ধরনের উপসর্গ চলে যাবে। মনোবিকলন পদ্ধতিতে সেই চেষ্টার দ্বারা অপসঙ্গতি দূর করা হয়। শিক্ষার্থীর অপসঙ্গতিমূলক আচরণের অবচেতন মূলটি খুঁজে বের করা হয় এবং তা তাকে বুঝিয়ে বলা হয়। এর ফলে কারণ সম্পর্কে ব্যক্তি যখন সচেতন হয়, তখন তার অবচেতনের জট্ ভেঙে যায় এবং সে সুস্থ হয়ে যায়। ফ্রয়েদ্ নিজে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে নানা ধরনের রোগের চিকিৎসা করেছেন এবং ভাল ফল পেয়েছেন।

মনোবিকলন

কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতি ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ তাদের এমন মানসিক স্থৈর্য্য নেই যে তারা চিকিৎসকের কাছে বসে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। তাই আজকাল, শিশুদের জন্য আর এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর স্বাভাবিক খেলার প্রবণতাকে কাজে লাগান হয়। এই কারণে এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে **খেলাভিত্তিক চিকিৎসা** (play therapy)। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক অপসঙ্গতি সম্পন্ন শিশুদের নানারকম খেলনা নিয়ে খেলার সুযোগ দেন। তারা যখন, এই সব খেলনা নিয়ে খেলা করে তখন তিনি তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এর ফলে শিশুরা তাদের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিজের মানসিকতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এই মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে, তার শক্তি অনেকটা কমে যায়। তাই এই খেলাভিত্তিক পদ্ধতি একদিকে অপসঙ্গতির প্রকৃতি

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা

নির্ণয়ে যেমন সহায়তা করে, তেমনি তার নিবারণের পথকে প্রশস্ত করে। পরে অপসঙ্গতির স্বরূপ জেনে চিকিৎসক তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের রূপ [Some forms of Maladjusted Behaviour in the School Children] ঃ—

সমস্যামূলক আচরণ—কারণ ও নিবারণ

শ্রেণীকক্ষে পড়াতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকমের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখতে পাই। আপাতঃভাবে এগুলোকে আমরা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ হিসেবে বিবেচনা না করে, অসামাজিক বাহ্যিক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করি এবং বাহ্যিক লক্ষণের দিক থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। কিন্তু এই সব আচরণগত সমস্যাগুলোকে বাহ্যিক কোন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সবসময় দূর করা যায় না। এদের পেছনে মূল কারণ জানা থাকলে, এগুলোকে দূর করা অনেক সহজ হয়। তাই এরকম কতকগুলো অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বা সমস্যামূলক আচরণ (problem behaviour) সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

[এক] **নেতি মনোভাব [Negativism]**—নেতি মনোভাব বলতে শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ বিষয়ের দোষ খুঁজে বের করা, সব রকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা, যে কোন ধরনের নির্দেশ না মানা বা সহযোগিতা না করার প্রবণতাকে বোঝায়। এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময় একটা বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ে অনেক শিশুর মধ্যে, এই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। এদের দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এবং শিক্ষকের কাছে, বা বিদ্যালয়ের পরিচালকের কাছে এরা বিশেষ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ কিছুটা নেতি মনোভাব প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের মধ্যেই থাকে। তাই সাধারণ অবস্থায় নেতি মনোভাব অপসঙ্গতির লক্ষণ নয়। বরং দেখা গেছে, নেতি মনোভাবাপন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আলোচনামূলক পাঠে (discussion lesson) সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং পাঠে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়। কিন্তু, এই অবস্থা যদি খুব মারাত্মক রূপ ধারণ করে, এবং শিক্ষার্থীরা যদি ভাল মন্দ যা কিছু শিক্ষকগণ বলেন বা বয়স্কেরা বলেন তাতেই 'না' করে তা'হলে বুঝতে হবে এটা আর স্বাভাবিক সুস্থ পর্যায়ে নেই। সুতরাং, এই রকম নেতি ভাবাপন্ন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার দরকার। শিশুর ক্রমবর্ধমান আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার চাহিদা থেকে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই শুধুমাত্র শাসন দ্বারা নেতি মনোভাব দূর করা যাবে না। ফ্রয়েদ্ অনুগামীরা মনে করেন, বাস্তব

পরিস্থিতির সঙ্গে সজ্ঘাতের ফলে, শিশু যখন সার্থকভাবে অভিযোজন করতে বা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তখন তার মধ্যে শৈশবে প্রত্যাবৃত্তির (regression) প্রবণতা দেখা দেয়। তার থেকেই নেতি মনোভাব গড়ে উঠে। শিশুর মধ্যে প্রায় দু'বৎসর বয়সের সময়, এই ধরনের মনোভাব স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। কিন্তু, শিশুর স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা অতৃপ্ত থেকে গেলেই এ ধরনের সমস্যামূলক আচরণের সৃষ্টি হয়, তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এই ধরনের মনোভাব দূর করতে হ'লে ঐ সব চাহিদার পরিতৃপ্তির সুযোগ করে দিতে হবে।

[দুই] ভীরুতা [Timidity]—শ্রেণীকক্ষে অনেক শিক্ষার্থীকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়। এরা কোন সময় গণ্ডগোল করে না; সব সময় সংকুচিত মনোভাব এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী এদের ভাল ছেলে হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু, মনোবিদ্‌রা মনে করেন, এটাই হ'ল এক ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। যে সব শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে নি, তারাই পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে (withdrawl) আপন জগতে বাস করতে ভালবাসে। কোন কাজে এদের উৎসাহ দেখা যায় না। যারা নিজেদের অকৃতকার্যতাকে মেনে নেয়, তারাই এ ধরনের আচরণ করে। আবার, অনেক সময় অতিরিক্ত শাসনের জন্য ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার প্রকাশের বাধা এলে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়, মনঃসমীক্ষকগণ একে অন্তর্মুখী ব্যক্তিসত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন শিশুদের অহম্ সত্ত্বার বিস্তৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করলে, এই ধরনের আচরণ গড়ে ওঠে। এইসব শিশুদের স্বাভাবিক করে তুলতে হলে এদের আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিভিন্ন কাজের মধ্যে এদের বিশেষভাবে সাহায্য করতে হবে। বিশেষভাবে সাহায্য করে এদের কাজের মধ্যে সাফল্য আনার চেষ্টা করতে হবে। আবার, অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভমূলক বিশৃঙ্খলা থেকে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে সব ক্ষেত্রে ভীরুতাকে দূর করার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন।

[তিন] ক্লাস পালানো [Truancy]—ক্লাস পালানো শিক্ষার্থীদের খুব সাধারণ রকমের আচরণমূলক সমস্যা। এই ধরনের আচরণ নানা কারণ থেকে হ'য়ে থাকে। কিছু ছাত্র আছে, যারা সব সময় বিদ্যালয়ের সব রকম কাজ থেকে দূরে সরে থাকে, আবার কিছু আছে, যারা বিশেষ ক্লাসের কাজ থেকে সরে যায়। শিক্ষার্থীদের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যে সব কারণে, তাদের মধ্যে এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের বিকাশ হয়, তার

বেশীর ভাগের জন্তই বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থাই দায়ী। বিদ্যালয়ে, অত্যধিক শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে এবং সমস্ত কিছু আচরণকে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের আচরণ দেখা যায়। তা'ছাড়া, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক চাহিদা যদি পরিতৃপ্ত না হয়, তা'হলেও এ ধরনের আচরণমূলক অপসঙ্গতির সৃষ্টি হ'তে পারে। শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির দরুন শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কমে যায়, এবং ক্লাস পালানোর প্রবণতা দেখা যায়। আবার অনেক সময় উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে কাজে আনন্দ পায় না, ফলে তাদের মধ্যে পালানোর প্রবণতা দেখা দেয়। আবার সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ থাকে না বলে, তারা ক্রমেই বিদ্যালয়ের কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ক্লাশ পালাতে শুরু করে। সুতরাং এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করতে হ'লে তার কারণগুলোকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা তারা যাতে মেটাতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নানা রকম শিক্ষা-মূলক উদ্দীপণের ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত-ভাবে সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয়ে পাঠদানের কাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাকে কাজে লাগালে, এই ধরনের অপসঙ্গতি দূর করা যায়। কারণ্ অনেক সময় বাস্তব পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই ধরনের আচরণ শিক্ষার্থীরা করে থাকে। তাই বস্তুধর্মী কাজের মধ্যদিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারলে, এই ধরনের আচরণমূলক সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রথমস্তরে এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, পরবর্তী স্তরে অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাস দূর করা যায় না।

[চার] মিথ্যা কথা বলা [Lying]—বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতি-মূলক আচরণের একটি সাধারণ রূপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা। শিক্ষার্থীরা নানা কারণে মিথ্যা কথা বলে থাকে। মনোবিদ্ বার্ট (Burt) মিথ্যা কথা বলাকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। শিশুরা খেলাচ্ছলে মিথ্যা কথা বলে। কল্পনার জালে খেলার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অনেক সময় বিষয়বস্তুকে অতিরঞ্জিত করে পরিবেশন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই ধরনের মিথ্যা কথা বলা অতটা মারাত্মক নয় ; বা অপসঙ্গতির নির্দ্দেশক নয়। কিন্তু অনেক সময় বিশেষ ইচ্ছা প্রণোদিত হ'য়ে তারা মিথ্যা কথা বলতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সেটা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এই ধরনের মিথ্যা কথা বলাকে অস্বাভাবিক মিথ্যা (Pathalogical lie) বলা হয়। এই

রকম অস্বাভাবিক মিথ্যা কথা শিক্ষার্থীরা নানা কারণে বলে থাকে। বিশেষ ভাবে তারা মিথ্যা কথা বলে, নিজেদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করে। যে সব শিক্ষার্থীরা নিজের অক্ষমতার জন্য পড়াশুনা করতে পারে না, তারা শিক্ষককে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানারকম মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এই মিথ্যাকে শিশুরা অহম্ এর আত্মরক্ষার কৌশল (Defence mechanisim) হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত চাহিদার পরিতৃপ্তি হয় না বলে, ধীরে ধীরে, মিথ্যার পরিমাণ বাড়াতে থাকে। এই ধরনের মিথ্যা কথা বলার আচরণকে দূর করতে হ'লে মিথ্যার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করারও দরকার এবং তার জন্য চিকিৎসা করারও দরকার। কিন্তু সাধারণভাবে, বিদ্যালয়ে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে পারি, তা'হলে এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ সৃষ্টি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেক কমে যায়। প্রাথমিক স্তরে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলে, এই ধরনের আচরণকে দূর করা যায়।

[পাঁচ] চুরি [**Stealing**]—বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কারও কারও মধ্যে চুরি করার আচরণও লক্ষ্য করা যায়। এবং এই ধরনের আচরণও অপসঙ্গতিমূলক। কোন বিশেষ চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিশুরা অন্যের জিনিস চুরি করে থাকে। এই ধরনের আচরণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পরে প্রবল আকার ধারণ করে। তখন আমরা শিশুদের অপরাধপ্রবণ (Delinquent) বলে বিবেচনা করি। কোন কোন সময়ে চুরি বিশেষ ধরনের মানসিক বিচারের জন্য শিশুরা করে থাকে। এই ধরনের চুরিকে অস্বাভাবিক চুরি (Pathological stealing) বলা হ'য়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ মানসিক দ্বন্দ্বের দরুন, শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বস্তুকে কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে চুরি করে থাকে, এবং ঐ বস্তুর পাওয়ার মধ্যেই আনন্দ পায়। এই ধরনের চুরিকে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়া দূর করা যায় না। সাধারণভাবে, অপসঙ্গতিমূলক চুরির ক্ষেত্রে বিশেষ মানসিক চাহিদা বা অহম্ সত্বার প্রতিষ্ঠায় সুযোগ দিলে, তাকে দূর করা সম্ভব হয়।

[ছয়] যৌন অপরাধ [**Sex offences**]—শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৈশোরে নানারকম যৌন অপরাধ দেখা যায়। কৈশোরে, নতুন যৌন চেতনা আসার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম যৌন কৌতূহল দেখা দেয়। এই সব কৌতূহল শিক্ষার্থীরা সুস্থ উপায়ে মেটাতে না পারলে, অসামাজিক উপায় গ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে বিকৃত যৌন আচরণ সম্পাদনের প্রতি তাদের প্রবণতা দেখা যায়। নানা ধরনের অশালীন মন্তব্য ও ইঙ্গিত করে। এই ধরনের অপরাধ প্রবণতা দূর করতে হ'লে বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষা দেওয়ার

ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া তাদের সামনে সুস্থ জীবনাদর্শ তুলে ধরতে হবে।

[সাত] আক্রমণাত্মক মনোভাব [Aggresiveness]—বিদ্যালয়ে কিছু কিছু শিক্ষার্থী দেখা যায়, যারা প্রায়ই অন্তকে মারধোর করে। এদের বলা হয় আক্রমণাত্মক শিশু। নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেই আক্রমণাত্মক মনোভাব জাগে। আত্মস্বীকৃতি ফিরে পাওয়ার জন্য ও অন্যের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার্থীরা এই ধরনের আচরণ করে থাকে। যে চাহিদার অভাববোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে এই ধরনের আচরণ সৃষ্টি করছে, তাকে দূর করতে না পারলে, তা মেটাতে না পারলে এবং তার মধ্যে নিরাপত্তার যে অভাববোধ দেখা দিয়েছে, তা দূর করতে না পারলে, এই ধরনের আচরণ দূর করা যাবে না। তাই শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সমস্যাকে সমবেদনা ও ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে সংযত করার চেষ্টা করতে হবে।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও নানা রকমের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। যেমন—অবাধ্যতা, স্বার্থপরতা, মুখে আঙুল দেওয়া ইত্যাদি। এদের পৃথক পৃথক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে যে কোন ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ চাহিদার অতৃপ্তি থেকে আসে। সুতরাং, তাদের অপসঙ্গতি দূর করতে হ'লে ঐ সব চাহিদার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব চাহিদা প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না, সে গুলোর উদ্গামণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার। শাসন দ্বারা কোন রকম সমস্যামূলক আচরণকে দূর করা যাবে না। সমবেদনা ও ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের প্রকৃত কারণকে দূর করতে না পারলে, তাদের সুপথে পরিচালিত করা যাবে না বা সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যাবে না। তবে এ ব্যাপারে, শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব আছে, সমাজের অন্যান্য সংস্থারও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়। মনোবিদ্ কোলেসনিক্ (kolesnik) বলেছেন—"While the school has a very important role to play in Fostering students mental health, it responsibility in this matter is shared with the home, the church, the neighbourhood and society at large."[1]

আলোচনা

1. Kolesnik : Educational psychology.

প্রশ্নাবলী

1. Whit is mental hygiene ? Discuss the importance of mental hygene in the field of education. [পৃ: ১৩১-১৩৪]

2. Describe maladjusted children. How can they be psychologically helped ? [পৃ: ১৩৫-১৪০] [C. U. B. T. '67]

3. A valid criterion of mental health is the degree of satisfaction a person has attained the better satisfied he is, the beetter his mental health, Do you agree ? Give reasons. [C. U. B. A. '62] [পৃ: ১৩৬-১৪০]

4. What is maladjustment ? Name some of the maladjusted behaviour of the school children and discuss the causes behind their occurance. [পৃ: ১৩৫-১৩৬ ; পৃ: ১৫২-১৫৯]

5. Write an essay on the maladjustment of the School children. [পৃ: ১৩৬-১৫৯]

6. Write notes on the following.
   - (a) Mental health of the School children.
   - (b) Stealing [পৃ: ১৫৮]
   - (c) Lying [পৃ:১৫৭]
   - (d) Negativism [পৃ: ১৫৫-১৫৬]
   - (e) Aggressiveness [পৃ: ১৫৯]
   - (f) Psycho analysis [পৃ: ১৫৪-১৫৫]
   - (g) Play therapy [Do]

7. Write an essay on the psychology of the unconscious. [পৃ: ১৪০-১৫০]

নবম অধ্যায়

শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান

[EDUCATIONAL STATISTICS]

রাশিবিজ্ঞান কি ?

যে কোন বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিচার করা হয় সেই বিজ্ঞান কতটা গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করতে পেরেছে তা দিয়ে। গণিত অপরীক্ষিত বিজ্ঞান (Empirical Science) নয়। তাই এর তত্ত্বগুলোকে নির্ভরযোগ্যভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানের যুক্তিকে দৃঢ় করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। রাশিবিজ্ঞান হ'ল গণিতের একটা বিশেষ শাখা। **যে বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা রাশি-তথ্যের সংকলন (collection of data) ক'রে তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়, তাকে বলা হয় রাশিবিজ্ঞান (Statistics)।** মানুষ রাশি আবিষ্কার করেছিল তার মনের মধ্যেকার সুসংবদ্ধ (consistent) চিন্তাগুলোকে সহজভাবে প্রকাশ করার জন্য, তাই আজকে রাশিবিজ্ঞান যে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অপরিহার্য। বিশেষ করে কোন সমাজবিজ্ঞান (Social Science) রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গিয়ে রাশিবিজ্ঞান বিভিন্ন নাম নিয়েছে, যেমন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর নাম হ'ল—Psychometry, অর্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর নাম হ'ল Econometry, আবার নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় হ'ল Anthropometry, সমাজবিদ্যায় Sociometry, প্রাণীবিদ্যায় Biometry ইত্যাদি।

কেন রাশিবিজ্ঞান বিশেষভাবে অন্যান্য সব বিজ্ঞানে ব্যবহার করা হচ্ছে—তার কারণগুলো সংক্ষেপে হ'ল :—

[এক] রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে খুব সহজভাবে কোন বস্তুর প্রকৃত বিবরণ দেখা যায়।

[দুই] রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যেতে এবং সার্থকভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

[তিন] রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের ফলাফলকে অর্থপূর্ণ এবং বোধগম্যভাবে সংক্ষিপ্ত করতে পারি।

[চার] রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা খুব কম পরিমাণ সংখ্যা-তথ্য (data) থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি।

[পাঁচ] রাশিবিজ্ঞান আমাদের কোন বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে অন্য কোন বস্তু সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে।

[ছয়] এর দ্বারা আমরা কতকগুলো জটিল ঘটনার মধ্য থেকে আসল কারণ বাহির করতে পারি।

এর থেকে বোঝা যায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি। দেশের উন্নতিকর পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য এই রাশিবিজ্ঞান যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। অতীত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করতে হ'লে এই রাশিবিজ্ঞান অপরিহার্য। তাই এই অধ্যায়ে আমরা রাশিবিজ্ঞানের প্রাথমিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। বিশেষভাবে শিক্ষা মনোবিদ্যায় তার গুরুত্বের কথা চিন্তা করে।

রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি [Methods of Statistics] :—

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মত রাশিবিজ্ঞানেরও বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। সেইগুলো সম্বন্ধে আমরা এখানে পর পর আলোচনা করব।

[এক] **তথ্যসংগ্রহ** (Collection) :—মানুষের বা কোন বস্তুর বিশেষ গুণ সম্বন্ধে জানতে হ'লে প্রথম সে সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই তথ্য আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গুণবাচক বা সংখ্যাবাচক দুই হ'তে পারে। গুণবাচকই হ'ক আর সংখ্যাবাচকই হ'ক এর থেকে আমরা একটা রাশিমালা পাব যা আমাদের সেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে। তথ্যসংগ্রহ বিভিন্ন রকমে হতে পারে—

[১] বিশেষ ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করে।
[২] বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিশেষ সময়ে পর্যবেক্ষণ করে।
[৩] কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণী থেকে।

বিশেষ কোন লোকের বিভিন্ন দিনের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ থেকে তার দৈনিক গড় খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বাহির করতে পারি (১নং উপায়)। আবার একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের একদিনের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ থেকে আমরা পরিবারের দৈনিক গড় খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বাহির করতে পারি (২নং উপায়)।

এ ছাড়াও আমরা ঐ পরিবারের বার্ষিক হিসাবের খাতা থেকে তাদের দৈনিক খাদ্যগ্রহণের হার বাহির করতে পারি (৩নং উপায়)।

রাশিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার আগে কতকগুলো বিশেষ পদের (Terms) সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দরকার। ধরা যাক আমরা কোন শ্রেণীর 70 জন ছেলের ওজন জানতে চাই। এই 70 জনের প্রত্যেককে বলব **ব্যক্তি** বা Individual আর সবমিলে 70 জনকে বলব **সমষ্টি** বা aggregate। যে বিশেষ গুণ সম্বন্ধে জানতে চাই অর্থাৎ এখানে ওজন হ'ল **লক্ষণ** বা character। আবার আমরা যদি তাদের ওজনের সঙ্গে বয়সের তুলনা করতে যাই—তা'হলে দেখা যাবে যার বয়স বেশী ওজনও তার বেশী। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজনও বাড়ে। এখানে বয়সকে বলা হয় **'চলক'** (variate) এবং ওজনকে বলা হয় **'চল'** (variable)। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যে কোন একটা রাশির মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মানের পরিবর্তন হ'লে তাদের মধ্যে প্রথমটাকে বলে 'চলক' আর দ্বিতীয়টাকে বলে 'চল'। অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশির পরিবর্তনের জন্য প্রথম রাশি দায়ী।

রাশিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ

[দুই] **ছকবিন্যাস** (Tabulation):—তথ্য সংগ্রহ করার পর রাশিগুলো সব অমার্জিত অবস্থায় (ungrouped) থাকে। একে বলে কাঁচা তথ্য বা Raw data। নীচে এই রকম একটি কাঁচা তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে আছে 50টি ছেলের ইংরাজি নম্বর।

55	37	35	33	25	27	40	33	39	28
51	28	29	21	29	34	29	44	36	22
25	41	20	36	42	15	33	47	32	38
46	19	21	17	26	19	16	27	24	21
10	14	16	34	18	46	15	33	27	27

এখন এই কাঁচা তথ্য থেকে আমরা ক্লাসের নম্বর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা করতে পারি না। এই ক্লাসের ইংরাজির শিক্ষার মান সম্বন্ধে জানতে হলে এই কাঁচা তথ্যকে আরও কিছু করার প্রয়োজন। তাই দরকার পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা (Frequency distribution table)। এখানে আমরা দেখব ক্লাসে কতজন 15 পেয়েছে, আবার কতজন 16 পেয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু 50 জন ছেলের নম্বর এমন হ'তে পারে যে 14 বা 23 কেউই পায় নি। তাই এরকম ভাবে হিসাব করে খুব সুবিধা হয় না। রাশিবিজ্ঞানে সুবিধার জন্য এক একটা বিশেষ সংখ্যা না ধরে, রাশিমালার সংখ্যাগুলো কতকগুলো কম সংখ্যক সংখ্যা-

ছকবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

বিশিষ্ট বিভাগে (class) ভাগ করে নেওয়া হয়। যেমন—10, 11, 12, 13, 14, বা 15, 16, 17, 18, 19 ; ইত্যাদি। এদের সহজ ভাবে লেখা হয় এই ভাবে—10-14 ; 15-19। এই যে রাশিমালার অংশ একে বলা হয় তথ্যবিভাগ বা class ; প্রত্যেক বিভাগে সমান সংখ্যক সংখ্যা ধরা হয়।

এই বিভাগগুলো ঠিক করার পূর্বে আমাদের রাশিমালার সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন মান জানার দরকার। এর থেকে আমরা প্রসার (Range) বাহির করতে পারি। প্রধান রাশিমালার প্রসার রাশিমালার সর্বোচ্চ মান রাশিমালার সর্বনিম্ন মান। এই প্রসারকে আমরা সমভাবে ভাগ করে বিভাগ নির্ণয় করি। আলোচ্য উদাহরণে রাশিমালার প্রসার $=55-10=45$। এখন আমরা যদি প্রত্যেক বিভাগে 5টি করে সংখ্যা ধরি তা হলে আমাদের 7টি বিভাগ হয়। এই বিভাগ বাহির করার সময় সমান ভাগ করতে গিয়ে যদি কয়েকটি বেশী সংখ্যক সংখ্যা চলে আসে যা রাশিমালার মধ্যে নেই, তাতে কিছু অসুবিধা হয় না। তবে শ্রেণীর সংখ্যা খুব কম বা খুব বেশী কোনটাই না হওয়াই ভাল। সাধারণতঃ দশ থেকে বারটি শ্রেণী হ'লেই ভাল। এখন পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরী করার জন্য নীচের ছকের মত তিন স্তম্ভবিশিষ্ট একটি ছক তৈরী করতে হবে। প্রথম স্তম্ভে থাকবে তথ্যের বিভাগ, দ্বিতীয় স্তম্ভে তথ্যগণনার দাগ (Tallies), তৃতীয় স্তম্ভে পরিসংখ্যা (frequency)। এখন কাঁচা তথ্য থেকে এক একটি করে সংখ্যা পড়ে সেটা যে বিভাগের মধ্যে আসে সেই বিভাগের দ্বিতীয় স্তম্ভে দাগ দতে হবে। যেমন 55, পড়ে 50-55 এই বিভাগে, সুতরাং ঐ বিভাগের পাশে দ্বিতীয় স্তম্ভে একটি দাগ দিতে হবে। আবার 37, পড়ে 35-39 বিভাগে, সুতরাং এর জন্য এর পাশের স্তম্ভে দাগ দিতে হবে। এইভাগে স্তম্ভ কাঁচা তথ্যটিকে শ্রেণীবদ্ধ করাকে বলা হয় তথ্যগণনার দাগ দেওয়া বা Tally। কাজের সুবিধার জন্য এ দাগগুলোকে পাঁচটা-পাঁচটা করে এক সঙ্গে রাখা হয়। কি ভাবে তা করা হয় ছকে দেখান হয়েছে। চারটে দাগ একটু ডানদিকে বাঁকিয়ে টানা হয় এবং পঞ্চম দাগটা আড়াআড়ি ভাবে টানা হয়। সমস্ত সংখ্যাগুলোর জন্য দাগ দেওয়ার পর প্রত্যেক বিভাগের দাগগুলো গুনে পাশের স্তম্ভে লেখা হয়। এই সংখ্যাকে বলা হয় পরিসংখ্যা বা Frequency। এই সংখ্যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কোন বিভাগে কতগুলো সংখ্যা আছে।

পরিসংখ্যা বিভাজন

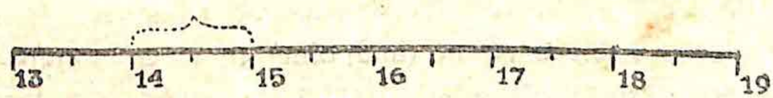
এখানে আর একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে রাশিবিজ্ঞানে আমরা যে কোন রাশিমালাই ধরি না কেন তাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন (continuous) হিসেবে কল্পনা করি। একটা মাপনি (scale) যেমন অবিচ্ছিন্ন হয় এই রাশিমালাকেও তেমন আমরা কল্পনা করি। সুতরাং রাশিমালার প্রথম মান 10টি আসলে 9·5 থেকে

অবিচ্ছিন্ন রাশিমালা

শুরু করে 10·5 পর্যন্ত আছে। তেমনি 11টি 10·5 থেকে শুরু করে 11·5 পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। তা না হ'লে আমরা অবিচ্ছিন্ন মান পাব না। নীচের

তথ্যের বিভাগ class	তথ্য গণনার দাগ Tallies	পরিসংখ্যা frequency
10 – 14	//	2
15 – 19	𝍸 ///	8
20 – 24	𝍸 /	6
25 – 29	𝍸 𝍸 //	12
30 – 34	𝍸 //	7
35 – 39	𝍸 /	6
40 - 44	////	4
45 - 49	///	3
50 – 54	/	1
55 – 59	/	1

এই মাপনীতে আমরা কোন বিভাগ-সীমা 14 পর্যন্ত ধরি এবং তার পরে বিভাগ 15 থেকে ধরি তা হ'লে দেখতে পাব যে 14 এবং 15 এর মধ্যে যে



ফাঁকটা তা কখনও পূরণ হচ্ছে না। সুতরাং একে আমরা অবিচ্ছিন্ন রাশিমালা বা মাপনি ব'লতে পারি না।

এখন যদি আমরা 14কে শুধুমাত্র 14 না ধরে একটা বিস্তৃত জায়গা—13·5 থেকে 14·5 পর্যন্ত ধরি এবং 15কে ঠিক ঐ ভাবে একটা বিন্দু না ধরে 14·5 থেকে শুরু করে 15·5 পর্যন্ত বিস্তৃত কল্পনা করি তা'হলে আমাদের অবিচ্ছিন্ন রাশিমালার কল্পনা করার মধ্যে কিছু ভুল থাকে না; রাশিবিজ্ঞানে প্রত্যেক রাশির মানকে এই ভাবেই ধরা হয়। এই প্রসারের সবচেয়ে ছোট মান অর্থাৎ 13·5কে বলা হয় নিম্নসীমা (Lower limit) আর সবচেয়ে বেশী মান অর্থাৎ 14·5কে বলা হয় ঊর্ধ্বসীমা (Upper limit)। প্রত্যেক রাশির মান যেমনি ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্নসীমার মধ্যে বিস্তৃত ঠিক তেমনি প্রত্যেক বিভাগ একইরকম বিস্তৃত। যেমন 10-14 এই বিভাগের নিম্নসীমা হ'ল 9·5 এবং ঊর্ধ্বসীমা হ'ল 14·5। সুতরাং 10-14 এই বিভাগটি আসলে 9·5 থেকে 14·5 [9·5

—14·5] পর্যন্ত বিস্তৃত। একেই বলে বিভাগের প্রকৃত প্রসার। এই ধারণা আমাদের সব সময় কাজে লাগবে, সুতরাং মনে রাখা প্রয়োজন।

[তিন] **বিশ্লেষণ** (Analysis) :—পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরী করার পর আমরা রাশিমালাকে ইচ্ছামত বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন —গড় (mean), চ্যুতি (deviation), ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

[চার] **রাশিমালার তাৎপর্য-নির্ণয়** (Interpretation of the data) :—রাশিমালার বিশ্লেষণ থেকে আমরা যে ফলাফল পাই তার তাৎপর্য নির্ণয় করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি।

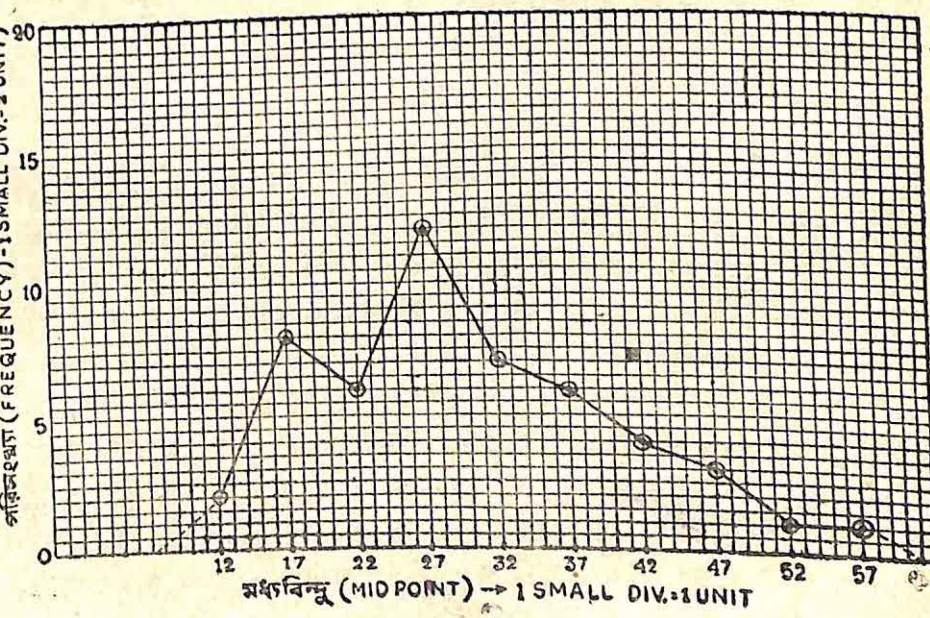
এই গেল সংক্ষেপে রাশিবিজ্ঞানের চারটি বিশেষ পদ্ধতি। এ ছাড়াও লেখ-চিত্রের সাহায্যে রাশিতথ্যগুলো বোঝানোর রীতি রাশিবিজ্ঞানে আছে। এখন আমরা তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

পরিসংখ্যা বহুভুজ [Frequency Polygon] :—

আমরা জানি যে কোন লেখ-চিত্রের দু'টি অক্ষ থাকে—একটিকে বলা হয় X-অক্ষ (X-axis) অপরটিকে বলা হয় Y-অক্ষ (Y-axis)। কোন জিনিসকে লেখ-চিত্রের সাহায্যে বোঝাতে হ'লে দু'অক্ষ বরাবর দু'রকম চল (variable) ধরতে হয়। রাশিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও X-অক্ষ বরাবর রাশিগুলির মান ধরা হয় এবং Y-অক্ষ বরাবর পরিসংখ্যা ধরা হয়। কিন্তু যখন রাশিমালাটি পরিসংখ্যা বিভাজনের আকারে থাকে তখন X-অক্ষে আমরা প্রত্যেক রাশির বদলে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান (midpoint) ধরি। এই মধ্যমান বাহির করতে হলে বিভাগের দুই সীমার বিয়োগফলকে অর্ধেক করে নিম্নসীমার সঙ্গে যোগ বা উর্ধ্ব-সীমার থেকে বিয়োগ করতে হয় যেমন, 10-14 এই বিভাগের মধ্যমান হ'ল $9{\cdot}5+\dfrac{14{\cdot}5-9{\cdot}5}{2}$ বা $14{\cdot}5-\dfrac{14{\cdot}5-9{\cdot}5}{2}$ অর্থাৎ 12.

এখন এই মধ্যমানগুলোকে X-অক্ষে ধরে Y-অক্ষে তাদের প্রত্যেকের যা পরিসংখ্যা তা বসালেই আমরা কতকগুলো বিন্দু পাব। এই বিন্দুগুলো যোগ করলে লেখ পাব। এই X-অক্ষে বিভাগের মধ্যমান আর Y-অক্ষে পরিসংখ্যা ধরে আমরা যে লেখচিত্র পাই একে বলা হয় পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)। এটা যাতে দেখতে ভাল হয় তার জন্য X এবং Y অক্ষের এককে 4 : 3 অনুপাতে ধরা হয়, এবং প্রাপ্ত বিন্দুগুলো যোগ করার পর এর দু'দিকটা বাড়িয়ে X-অক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে এই রকম একটি বহুভূজ দেখানো হ'ল। এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্র দ্বারা পরিসংখ্যার পরিমান নির্ণয় করা হয়।

বিভাগ	মধ্যবিন্দু	পরিসংখ্যা
9·5—14·5	$9·5+\frac{14·5-9·5}{2}=12$	2
14·5—19·5	$14·5+\frac{19·5-14·5}{2}=17$	8
19·5—24·5	$19·5+\frac{24·5-19·5}{2}=22$	6
24·5—29·5	$24·5+\frac{29·5-24·5}{2}=27$	12
29·5—34·5	$29·5+\frac{34·5-29·5}{2}=32$	7
34·5—39·5	$34·5+\frac{37·5-34·5}{2}=37$	6
39·5—44·5	$39·5+\frac{44·5-39·5}{2}=42$	4
44·5—49·5	$44·5+\frac{49·5-44·5}{2}=47$	3
49·5—54·5	$49·5+\frac{54·5-49·5}{2}=52$	1
54·5—59·5	$54·5+\frac{59·5-54·5}{2}=57$	1



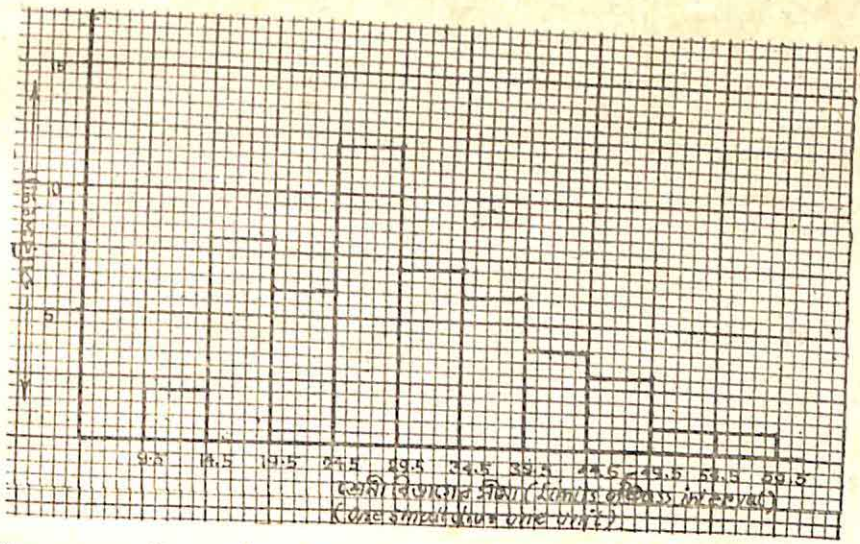
হিস্টোগ্রাম [Histogram] :—

পরিসংখ্যা বহুভুজ ছাড়া আরও একভাবে পরিসংখ্যা বিভাজনকে লেখচিত্রের সাহায্যে পরিবেশন করা যায়। এই ধরনের লেখচিত্রকে বলা হয় **হিস্টোগ্রাম** (histogram)। হিস্টোগ্রাম তৈরী করার পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ তৈরী করার পদ্ধতি প্রায় একই রকম। এখানে X অক্ষ বরাবর বিভাগের মধ্যমানের (midpoint) পরিবর্তে বিভাগ-সীমা স্থাপন করা হয়। পরিসংখ্যা বহুভুজের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মধ্যমানকে ধরা হয়েছিল। Y অক্ষে, পূর্বের ন্যায় পরিসংখ্যাকে স্থাপন করা হয়। এখন, প্রত্যেক বিভাগের সীমার মধ্যে পরিসংখ্যা অনুযায়ী উচ্চতা সম্পন্ন এক একটা আয়তক্ষেত্র তৈরী করা হয়। যেমন, 9·5—14·5, এই শ্রেণীর পরিসংখ্যা 2। সুতরাং 9·5—14·5 কে ভূমি ধরে, 2 একক উচ্চতা বিশিষ্ট একটা আয়তক্ষেত্র আঁকা হয়। এমনিভাবে, 39·5—44·5 শ্রেণীর পরিসংখ্যা 4 ; সুতরাং, ঐ 39·5—44·5 দৈর্ঘ্যকে ভূমি ধরে, 4 একক উচ্চতা সম্পন্ন অপর একটা আয়ত আঁকা হয়। এমনিভাবে পাশাপাশি সব আয়তগুলো আঁকলে, লেখচিত্র সম্পূর্ণ হয়। এই ধরনের লেখচিত্রকেই হিস্টোগ্রাম বলা হয়। এই লেখচিত্রে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পরিসংখ্যা বিশেষ বিশেষ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে পাওয়া যায়। আবার, সম্পূর্ণ পরিসংখ্যা সব আয়তক্ষেত্রের যোগফল থেকে পাওয়া যায়।

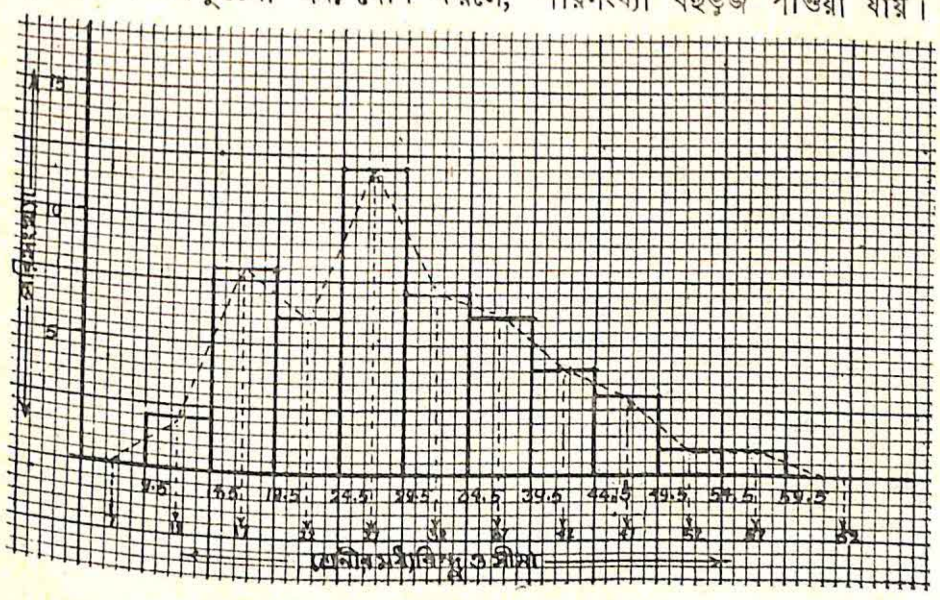
একই অক্ষের উপর হিস্টোগ্রাম ও পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন [Drawing Histogram and frequency polygon on the same axis] :—

পরিসংখ্যা বহুভুজ ও হিস্টোগ্রাম দু'ধরনের লেখচিত্রের দ্বারাই আমরা যে কোন তথ্যকে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু, পরিসংখ্যা বহুভুজের চেয়ে হিস্টোগ্রামের মাধ্যমে পরিসংখ্যাকে অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়। কারণ, হিস্টোগ্রামে, আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর পরিসংখ্যা সম্পর্কে বিশদ ধারণা পাই। পরিসংখ্যা বহুভুজ থেকে, এই ধরনের ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন লেখ চিত্রের সাহায্যে আমরা দুই বা তার বেশী পরিসংখ্যা বিভাজনকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে চাই, তখন, পরিসংখ্যা বহুভুজের দ্বারা সুবিধা হয়। কারণ একই অক্ষের উপর একের বেশী হিস্টোগ্রাম আঁকলে, অনেক সময় সমপাতনের জন্য সঠিকভাবে ক্ষেত্র নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, একই অক্ষের উপর হিস্টোগ্রাম এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ আঁকারও রীতি

আছে। এই ধরনের অঙ্কনের জন্য যে কোন একটা লেখচিত্র আঁকার পর, অপরটা সহজে আঁকা যায়। প্রথম হিস্টোগ্রাম আঁকলে, প্রত্যেক আয়তের



উপরের অনুভূমিক লাইনের মধ্যবিন্দুই ঐ শ্রেণীর মধ্যমান নির্দেশ করে। সুতরাং ঐ বিন্দুগুলো সব যোগ করলে, পরিসংখ্যা বহুভুজ পাওয়া যায়।



পরিসংখ্যা বহুভুজ……হিস্টোগ্রাম— একক : x-অক্ষ—এক বর্গক্ষেত্র = এক একক
y-অক্ষ—দুই বর্গক্ষেত্র = এক একক

আবার পরিসংখ্যা বহুভুজ প্রথম আঁকলে, প্রত্যেক মধ্যমানের দু'দিকে শ্রেণী সীমা বরাবর বৃদ্ধি করে, আয়তক্ষেত্র সম্পূর্ণ করলে হিস্টোগ্রাম পাওয়া যায়। অন্যান্য লেখ চিত্র সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রশ্নাবলী

1. How will you proceed to find a frequency distribution from the raw data. Discuss with examples. [পৃঃ ১৬৩-১৬৬]
2. Explain the terms with examples :—
   (i) Variable—dependent and independent ; (ii) Class interval ; (iii) Frequency ; (iv) Midpoint ; (v) Range of distribution ; (vi) Raw data ; (vii) Limits of the class interval ; (viii) Frequency polygon. [সম্পূর্ণ অংশ]
3. You are given the following list of marks in school examination. Set up a frequency distribution by using a class interval of 5.

60	49	54	48	58	65	63	66	58	58	82	84
49	66	77	54	62	38	52	52	64	82	61	78
72	58	83	67	55	62	77	51	58	59	53	58
41	54	68	72	62	56	74	51	71	60	51	60
70	68	67	48	57	44	55	48	82	77	70	

4. Given the following list of marks in Bengali of 50 students, find the range of the distribution. Also set up a frequency distribution by using a class interval of 6. Find the midpoint and the exact limits of the class intervals.

52	34	50	27	33	67	70	34	48	48
46	50	26	38	49	63	42	49	57	46
76	65	35	67	57	74	53	61	51	36
45	22	42	31	17	59	56	32	45	63
54	74	35	21	19	34	41	29	43	42

5. Find the exact limit and the midpoint of the following distribution.

Class	5·9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Frequency	0	2	8	6	12	7	6	4	1

6. Draw a frequency polygon for each one of the data given in questions No. 3, 4 and 5. [পৃঃ ১৬৬]
7. Taking the same axis draw the frequency polygon and Histogram of the data given in question No. 5. [পৃঃ ১৬৮-১৬৯]

দশম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় মানের পরিমাপ
[MEASUREMENT OF CENTRAL TENDENCIES]

এই অধ্যায়ে আমরা কেন্দ্রীয় মানের বিভিন্ন সূচক সম্বন্ধে আলোচনা করব। কতকগুলি সংখ্যার গড় বলতেও আমরা ঐ সংখ্যাগুলির কেন্দ্রীয় মান বুঝি।

সূচনা

যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ইংরাজীর মান কি রকম?" এর উত্তর গত বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রের ইংরাজীর নম্বর বলার চেয়ে শ্রেণীর গড় ইংরাজীর নম্বর বলাই সুবিধাজনক এবং বোঝানোর পক্ষে ভাল। সুতরাং কেন্দ্রীয় মানকে বিশেষ কোন সময়ে বিশেষ কোন পরিসংখ্যানের সহজ এবং ছোট্ট অভিব্যক্তি হিসেবে ধরতে পারি। এ ছাড়াও কেন্দ্রিয় মানকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। কেন্দ্রীয় মান অনেক রকম হ'তে পারে—(1) **গাণিতিক গড়** (Arithmetic Mean), (2) **মধ্যমমান বা মধ্যক** (Median), (3) **ভূষিষ্টক** (Mode), (4) **গুণোত্তর গড়** (Geometric Mean), (5) **প্রতিগাণিতিক গড়** (Harmonic Mean)। এদের মধ্যে গুণোত্তর গড় আর প্রতিগাণিতিক গড় রাশিবিজ্ঞানে বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এই কারণে আলোচ্য অধ্যায়ে বাকী তিন রকম কেন্দ্রীয় মান সম্বন্ধে আলোচনা করব। কি কি উপায়ে গাণিতিক গড়, মধ্যমমান আর ভূষিষ্টক পাওয়া যায় এবং কখন কি প্রকার গড় ব্যবহার করতে হয় তা আলোচনা করব।

গাণিতিক গড় [The Arithmetic Mean] :—

পাটীগণিতে আমরা গড় নির্ণয় শিখেছি। যে সংখ্যাগুলির গড় বাহির করতে হয় তাদের যোগ করে যতগুলি সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ,—

$$\text{গণিতিক গড়} = \frac{\text{সংখ্যাগুলির যোগফল}}{\text{যতগুলো সংখ্যার গড় বাহির করতে হবে}}$$

রাশিবিজ্ঞানেও কতকগুলো সংখ্যার গড় বাহির করতে হলে ঐ একই নিয়ম

ব্যবহার করতে হয়। এবং উপরের ঐ সূত্রকে বীজগাণিতিক সূচক ব্যবহার করে লেখা হয়—

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

M = গাণিতিক গড়
X = পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি রাশি
N = যতগুলি সংখ্যা আছে
Σ = চিহ্নের দ্বারা রাশিগুলির যোগফল বোঝাচ্ছে।

ধরা যাক—14, 10, 13, 10, 11, 17, 11, 14, 17, 16 হ'ল দশজন ছেলের ভূগোলের নম্বর। এদের গড় বাহির করতে হবে। প্রথম এই সংখ্যাগুলির যোগফল বাহির করা হ'ল। যোগফল হ'ল, 133 অর্থাৎ $\Sigma X = 133$। এখন 10টি সংখ্যা আছে,

$\therefore \quad N = 10$

$\therefore$ নির্ণেয় গাণিতিক গড় $(M) = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{133}{10} = 13{\cdot}3$

এখানে একটা কথা মনে রাখার প্রয়োজন, যে রাশিমালার গড় নির্ণয় করা হচ্ছে তারা যা একক, নির্ণেয় গড়ের এককও তাই হবে। যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর উচ্চতা মিটারে মেপে গড় বাহির করি তবে ঐ শ্রেণীর গড় উচ্চতা মিটারেই বাহির হবে। তেমনি গড় ওজনও কিলোমিটারে বাহির হবে।

পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে গাণিতিক গড় নির্ণয় [Mean from Grouped data] :—

যখন রাশিমালায় সংখ্যার পরিমাণ কম থাকে তখন উপরোক্ত নিয়মে খুব সহজেই গড় বাহির করা যায়। আমরা জানি রাশিবিজ্ঞানে সুবিধার জন্য রাশিমালাকে পরিসংখ্যা বিভাজনের আকারে সাজানো হয়। এই সব পরিসংখ্যা বিভাজনে সজ্জিত রাশিমালার গড় বাহির করার জন্য বিশেষ নিয়ম প্রয়োগ করতে হয়। অবশ্য নিয়ম কিছু নতুন নয়। পূর্বের সূত্রেরই একটু অন্যরকম প্রয়োগ। এই পরিসংখ্যা বিভাজনের গড় আমরা দু'রকম ভাবে বাহির করতে পারি—(A) **দীর্ঘ পদ্ধতি** (Long Method), আর (B) **কল্পিত গড় পদ্ধতি** (Assumed Mean Method) দ্বারা। এখন দু'টি নিয়ম সম্বন্ধে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করব।

(A) দীর্ঘ পদ্ধতি (Long Method) :—পূর্বের সূত্রকে $\left(M = \Sigma \frac{X}{N}\right)$ যদি পরিসংখ্যা বিভাজনে প্রয়োগ করতে হয় তবে আমাদের প্রথমে প্রত্যেক

X-এর মান জানা দরকার। কিন্তু এখানে আমরা প্রত্যেকটি সংখ্যা পাই না, তার বদলে পাই তথ্যশ্রেণী। তাই এখানে প্রকৃত পরিমাপ বা সংখ্যাকে X না ধরে প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একটি করে X ধরা হয়। এটা পাই আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমান থেকে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমানকে বোঝার সুবিধার জন্য X_i চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয়। এই মধ্যমান কি করে বাহির করতে হয় তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন কথা হ'ল আমরা এই মধ্যমানকে বিভাগে যতগুলি সংখ্যা আছে তার প্রতিনিধি হিসেবে ধরছি। এতে ভুল কিছুটা হয়, যেমন, 55-59 এই বিভাগের 55, 56, 57, 58, 59 সংখ্যা আছে, (এটা আমরা কাঁচা তথ্য থেকে বুঝতে পারি)। এই সংখ্যাগুলির প্রতিনিধি কোন সময় ঐ বিভাগের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 57 হ'তে পারে না ; হওয়া উচিত এই সংখ্যাগুলির গড় 56·6। কিন্তু অনেক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে এই ভুল এত নগণ্য যে একে ভুল হিসেবে ধরা চলে না।

এই উপায়ে গড় বাহির করতে এখন আমাদের সংখ্যাগুলির যোগফল দরকার। কিন্তু সমস্ত মধ্যমান (X_i) গুলোকে যোগ করলে আমরা সংখ্যাগুলোর যোগফল পাব না। যোগফলের সঙ্গে প্রত্যেক মধ্যমান ততবার যোগ করতে হবে— যতগুলি পরিসংখ্যা ঐ বিভাগে আছে, অর্থাৎ, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান বাহির করবার পর তাকে সে বিভাগের পরিসংখ্যা (frequency, f) দিয়ে গুণ করতে হবে। এখন এই সমস্ত fx_i যোগ করে যা হবে তা হ'ল সংখ্যাগুলোর আপাত যোগফল। এই যোগফলকে N (যতগুলি সংখ্যা আছে) দিয়ে ভাগ করলে আমরা গড় পাব। নীচে ছকের সাহায্যে ঐ নিয়মে গড় বাহির করা দেখানো হ'ল। এই নিয়মে গড় বাহির করার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো পর পর অনুসরণ করতে হবে :—

(i) প্রথমে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান বাহির করতে হবে (x_i)

(ii) প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমানকে সে শ্রেণীর পরিসংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে (fx_i)

(iii) পরিসংখ্যাগুলির যোগফল (N) বাহির করতে হবে।

(iv) সব fx_i গুলিকে যোগ করতে হবে (Σfx_i)

(v) এখন এই সূত্রের সাহায্যে গড় বাহির করতে হবে।

$$M=\frac{\Sigma fx_i}{N}$$

নীচের ছকে $\Sigma fx_i=344$; $N=20$

$\therefore$ গাণিতিক গড় $(M)=\frac{344}{20}=17{\cdot}2$

তথ্য বিভাগ	পরিসংখ্যা f	মধ্যমান x_i	fx_i
9—10	2	9·5	19
11—12	3	11·5	34·5
13—14	3	13·5	40·5
15—16	2	15·5	31·0
17—18	1	17·5	17·5
19—20	3	19·5	58·5
21—22	2	21·5	43·0
23—24	2	23·5	47·0
25—26	1	25·5	25·5
27—28	1	27·5	27·5
	N = 20		$\Sigma fX_i = 344·0$

(B) কল্পিত গড় পদ্ধতি (Assumed Mean Method) :—যখন রাশিমালায় অনেক বড় বড় সংখ্যা থাকে, অর্থাৎ যখন বিভাগগুলির মধ্যমান খুব বড় বড় সংখ্যা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে পরিসংখ্যাও বেশী থাকে তখন আমাদের দীর্ঘ পদ্ধতির সাহায্যে গড় বাহির করা খুব লাভজনক নয়। তখন আগের ঐ নিয়মের বদলে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে খুব সহজেই গাণিতিক গড় বাহির করা যায়।

ইচ্ছামত কোন রাশিকে গড় হিসেবে অনুমান করলে, ঐ রাশিকে **কল্পিত গড়** বলা হয়। গড় থেকে প্রত্যেক রাশির অন্তরকে বলে পার্থক্য বা চ্যুতি (Deviation)। খুব সাধারণ ভাবে এই নিয়ম হ'ল এইরূপ—তিন জন লোকের ওজন যথাক্রমে 180, 182 আর 186 পাউণ্ড, এদের গড় ওজন বাহির করতে হবে। মনে করা যাক্ এদের গড় ওজন হবে 182 পাউণ্ড, অতএব এটাই হ'ল কল্পিত গড়। এখন এই কল্পিত গড় থেকে প্রথম ব্যক্তির ওজন 2 পাউণ্ড কম। অর্থাৎ তাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল 180—182 বা—2 পাউণ্ড, আবার তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে গড়

ওজনের পার্থক্য হ'ল 186—182=4 পাউণ্ড [**সব সময়ে মনে রাখার দরকার রাশিবিজ্ঞানে পার্থক্য (deviation) বাহির করবার সময় প্রত্যেক রাশি থেকে গড় বিয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ, পার্থক্য বা চ্যুতি, $x' = X - M$। যেমন এখানে 180 থেকে এবং 186 থেকে 182 বিয়োগ করা হ'ল।**] এখানে মোট পার্থক্য হচ্ছে তা'হলে (−2+4) বা +2 পাউণ্ড, তিন জন লোকের ওজনের গড় 182 পাউণ্ড ধরায় মোট 2 পাউণ্ড কম ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ওজন যদি 182 পাউণ্ড হিসেবে ধরি তা'হলে যে মোট ওজন হয় তা তিন জনের প্রকৃত ওজনের যোগফলের চেয়ে 2 পাঃ কম। এখন, **তিন জনের জন্য পার্থক্য হয় 2 পাঃ, ∴ একজনের জন্য পার্থক্য হয় $\frac{2}{3}$ পাঃ** বা **˙66 পাঃ**, অর্থাৎ এই ˙66 পাঃ যদি কল্পিত গড়ের সঙ্গে যোগ দিই তা'হলেই আসল গড় পাবো। ∴ **গড় ওজন=(182+˙66) পাঃ বা 182˙66 পাঃ।**

এই নিয়মের সাহায্যে কি ভাবে পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে গড় বাহির করা যায় তা নীচের ছকের সাহায্যে দেখানো হ'ল।

তথ্য বিভাগ	পরিসংখ্যা f	পার্থক্য x'	fx'
190—199	3	2	6
180—189	9	1	9
170—179	18	0	0
160—169	10	−1	−10
150—159	6	−2	−12
140—149	4	−3	−12
	N=50		$\Sigma fx' = -19$

এখানে 170—179 এই বিভাগের মধ্যমান 174˙5কে কল্পিত গড় ধরা হয়েছে। **কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে কোন বিভাগে কল্পিত গড় ধরলে,**

গাণিতিক গড় একই বাহির হবে। এখানে এই বিভাগে কল্পিত গড় ধরার কারণ হ'ল যে গুণ এবং যোগে সুবিধা হয়। 18 সংখ্যাটি কোন কাজে লাগে না। তাছাড়া, এই শ্রেণীটা মাঝখানে অবস্থিত।

এই নিয়মে গড় বাহির করবার জন্য পর পর এই ভাবে অগ্রসর হ'তে হয়—

(i) **প্রথমে বিভাগ ও তাদের পরিসংখ্যাগুলি লেখা হ'ল।**

(ii) একটি কল্পিত গড় (M') ঠিক করা হ'ল। এই কল্পিত গড় M' হ'ল যে কোন একটি বিভাগের মধ্যমান। তবে কল্পিত গড়টি প্রকৃত গড়ের যত নিকটবর্তী হয় ততই ভাল।

(iii) এখন পার্থক্য স্তম্ভে (x'-column) কল্পিত গড়ের ঘরে 0 বসান হ'ল। এর পর উপরের দিকে এক একক করে বাড়িয়ে ছোট ছোট পূর্ণ ধনাত্মক সংখ্যা বসান হ'ল, আর নীচের দিকে ঠিক ঐভাবে ঋণাত্মক সংখ্যা বসান হ'ল। সম পরিমাণে ক্রমবর্ধমান যে কোন সংখ্যাই বসাতে পারা যায়। তবে 1, 2, 3...... বসানোই ভাল। এতে কাজের সুবিধা হয়। **এখানে উপর বলতে রাশিগুলো বাড়ছে, সেদিকটা বোঝায় এবং যেদিক কমছে, সেদিকটা নীচের দিকটা বোঝায়।**

(iv) এর পর পরিসংখ্যা ও পার্থক্যকে গুণ করে fx' স্তম্ভে বসান হয়।

(v) সব fx' গুলি চিহ্ন ঠিক রেখে যোগ করতে হবে ($\Sigma fx'$)

(vi) পরিসংখ্যাগুলি যোগ করতে হবে (N)

এইবার নীচের সূত্রের সাহায্যে প্রকৃত গড় পাওয়া যাবে।

$$M=M'+i\left(\frac{\Sigma fx'}{N}\right)$$

M = প্রকৃত গাণিতিক গড়; M' = কল্পিত গড়;
i = বিভাগ অন্তর; x' = পার্থক্য।

উপরের ছকে, $M'=174{\cdot}5 \quad \Sigma fx'=-19, i=10, N=50$

$$\therefore \quad M=174{\cdot}5+10\times\frac{-19}{50}=174{\cdot}5-3{\cdot}8=170{\cdot}7$$

একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগবে যে আমরা $\frac{\Sigma fx'}{N}$ কে কেন 'i' দিয়ে গুণ করেছি? এর কারণ হ'ল আমরা পার্থক্য ধরার সময় এক একক হিসেবে ধরেছি, কিন্তু আসল পার্থক্য তো তা নয়।

কল্পিত গড় M থেকে তার উপরের শ্রেণীর এবং নীচের শ্রেণীর মধ্যমানের পার্থক্য যথাক্রমে 10 এবং −10 এবং পরের দুটির

যথাক্রমে পার্থক্য **20** এবং **—20**। কিন্তু, আমরা ধরেছি **1,—1—2,** আর **2** হিসেবে। তাই সমস্ত ফলাফলকে শেষে **10** অর্থাৎ বিভাগ অন্তর 'i' দিয়ে গুণ ক'রে দিচ্ছি। দশ দশ ক'রে বাড়িয়ে গেলে বা কমিয়ে গেলে একই গড় পাওয়া যেত, কিন্তু খাটুনী বেশী হ'ত।

মধ্যমমান বা মধ্যক [Median] :—

কতকগুলি রাশির মধ্যমমান হ'ল এমন একটি বিন্দু যার উপরে এবং নীচে ঠিক সমান সংখ্যক সংখ্যা আছে। সব সময়ে মনে রাখতে হবে এটা একটা বিন্দু, কোন বিশেষ তথ্য (data) নয়। যদি একটি রাশিমালার রাশিগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো হয় তবে যে রাশিটির সামনে এবং পরে সমান সংখ্যক রাশি থাকে সেই রাশিটিই হবে ঐ রাশিমালার মধ্যমমান (Median)। একটি বিজোড় সংখ্যক রাশিমালা ধরা যাক্—1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16। এই নয়টি রাশির মধ্যে পঞ্চমটি হবে মধ্যরাশি। কারণ এর আগে এবং পরে চারটি করে রাশি আছে অর্থাৎ $\left(\frac{9+1}{2}\right)$ টি বা পঞ্চম রাশিটি হ'বে মধ্যমমান। এখানে পঞ্চম রাশি হ'ল 8 এবং ইহাই মধ্যমমান। কিন্তু জোড়সংখ্যক রাশি থাকলে একটু অসুবিধা আছে। ধরা যাক রাশিগুলি এইরূপ আছে,—1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18। এখানে 10টি রাশির মধ্যে এমন কোন একটি রাশি নেই যার আগে এবং পরে সমান-সংখ্যক রাশি আছে। সুতরাং এখানে $\frac{10}{2}$ আর $\frac{10}{2}+1$ এই দুটো পদকে মধ্য রাশি ধরতে হয়। কারণ $\frac{10}{2}$ বা পঞ্চম পদের আগে অথবা $\frac{10}{2}+1$ বা ষষ্ঠ পদের পরে 4টি করে রাশি আছে। এখন এক্ষেত্রে মধ্যমমান পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাশির গড় হয়। অর্থাৎ এখানে হবে—

$$\frac{8+9}{2}=8{\cdot}5\text{।}$$

পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে মধ্যমমান নির্ণয় [Median from grouped data] :—

পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে কি ভাবে মধ্যমমান বাহির করতে হয় তা নীচে ছকের সাহায্যে দেখানো হ'ল।

তথ্যবিভাগ	পরিসংখ্যা	
44·5—49·5	1	
39·5—44·5	2	
34·5—39·5	2	যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার উপর পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফল=9।
29·5—34·5	4	
24·5—29·5	9	
19·5—24·5	8	
14·5—19·5	3	যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নীচের বিভাগ পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফল=12।
9·5—14·5	0	
4·9— 9·5	1	
	N=30	

এখানে 30টি সংখ্যা আছে। অতএব মধ্যমমান হবে সেই বিন্দু যার উপরে এবং নীচে 15টি করে সংখ্যা আছে। এখন নীচে থেকে উপরের দিকের পরিসংখ্যাগুলো যোগ করে গেলে আমরা দেখি যে 24·5—29·5 বিভাগ পর্যন্ত 1+0+3+8+9=21টি সংখ্যা আছে। অর্থাৎ আমরা যা চাই তার থেকে 6টি বেশী। আবার 19·5—24·5 বিভাগ পর্যন্ত আছে 12টি—আমরা যা চাই তা অপেক্ষা 3টি কম। 15টি সংখ্যা পেতে হ'লে আমাদের 9টি সংখ্যার মধ্য থেকে কেবল মাত্র 3টি প্রয়োজন। সুতরাং মধ্যমমান 24·5—29·5 বিভাগের মধ্যে কোথাও আছে। আমরা জানি এই বিভাগের নিম্নসীমা হ'ল 24·5। এখন আমাদের দেখতে হবে 24·5 এর উপর কতদূর এগুলে আমরা মধ্যমমান পাব। এটা আমরা সহজ ঐকিক নিয়মের সাহায্যে বাহির করতে পারি।

প্রত্যেক বিভাগে 5টি করে সংখ্যা আছে। এখন যে শ্রেণীতে মধ্যমমান আছে তার পরিসংখ্যা হ'ল 9 এবং আমাদের দরকার মাত্র তিনটি। সুতরাং,

9টি পরিসংখ্যা আছে 5টি এককের জন্য
∴ 1টি ,, ,, $\frac{5}{9}$,, ,,
3টি ,, ,, $\frac{5}{9}\times 3$ বা 1·67টির জন্য।

এখন এই 1·67 যদি, যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নিম্নসীমার সঙ্গে যোগ দিই তা'হলেই মধ্যমমান পাব।

∴ মধ্যমমান $=24{\cdot}5+1{\cdot}67=26{\cdot}17$।

আবার আমরা যদি উপর থেকে ধরে আসি ঠিক ঐ একই মান পাব। 9-এর উপর পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফলও 9, অর্থাৎ বাকী আছে 6টি। ∴ মধ্যমমান $=29{\cdot}5-\frac{6}{9}\times 5=26{\cdot}17$, সুতরাং আমরা দেখছি যে মধ্যমমান বাহির করার সময় আমরা যে খণ্ড মান পাই তা নিম্ন বিভাগসীমার সঙ্গে যোগ

দিতে পারি বা উচ্চ বিভাগসীমা থেকে বিয়োগ দিতে পারি। উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যমমান একই বাহির হবে। তবে দুই দিক থেকে মধ্যমমান বাহির করা ভাল—তাতে যদি কিছু ভুল থাকে ধরা পড়বে।

মধ্যমমান নীচের সূত্রের সাহায্যে খুব সহজে বাহির করা যায়। এই সূত্রের ভিতর কোন নতুনত্ব নেই, শুধু আগে যা করা হ'ল তাকে সূত্রাকারে লেখা হচ্ছে।

$$\text{মধ্যমমান (Mdn.)} = L_e + i\left(\frac{\frac{N}{2} - F_b}{F_m}\right)$$

L_e = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নিম্নসীমা
N = রাশিমালায় যতগুলি সংখ্যা আছে
F_b = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নীচ পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফল
F_m = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে সেই বিভাগের পরিসংখ্যা
i = বিভাগ অন্তর

পূর্বের উদাহরণে—

$$L_e = 24{\cdot}5\ ;\ \frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15\ ;\ F_b = 12\ ;\ F_m = 9\ ;\ i = 5$$

$$\therefore\ \text{মধ্যমমান (Mdn.)} = 24{\cdot}5 + 5 \times \frac{15-12}{9}$$

$$= 24{\cdot}5 + \tfrac{3}{9} \times 5 = 26{\cdot}17$$

আবার যদি উপর দিক থেকে ধরি তা'হলে সূত্রটি এইরূপ হবে—

$$\text{মধ্যমমান (Mdn.)} = U_e - i\left(\frac{\frac{N}{2} - F_a}{F_m}\right)$$

এখানে, U_e = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার উচ্চ সীমা
F_a = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার উপরের বিভাগ পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফল।

উদাহরণে,

$$U_e = 29{\cdot}5\ ;\ F_a = 9.$$

$$\therefore\ \text{Mdn.} = 29.5 - \frac{15-9}{9} \times 5 = 29{\cdot}5 - 3{\cdot}33 = 26{\cdot}17.$$

কতকগুলি বিশেষ সমাধান (Solution of some special Cases) :—

(A) যখন মধ্যমমান দু'টো বিভাগের মাঝখানে থাকে, অর্থাৎ পর পর

নীচ থেকে পরিসংখ্যাগুলি যোগ করে যেতে যেতে দেখা যায় যে বিশেষ একটা বিভাগে গিয়ে ঠিক $\frac{N}{2}$ পরিসংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তখন ঐ বিভাগের উচ্চ সীমাই ঐ রাশিমালার মধ্যমমান হবে। যেমন নীচে লক্ষ্য করা যায় 44টি সংখ্যা আছে। অতএব $\frac{N}{2}$ হ'ল 22.

বিভাগ	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49
পরিসংখ্যা	1	5	6	10	14	6	2

এখন নীচ থেকে যোগ করে গেলে দেখছি 30—34 এই বিভাগ পর্যন্ত ঠিক 22টি পরিসংখ্যা আছে। অতএব মধ্যমমান হবে ঐ বিভাগের উচ্চসীমা অর্থাৎ 34·5 আর উপর থেকে যোগ করে এলে 22 হয় 35—39 এই বিভাগে। এখানে মধ্যমমান হবে ঐ বিভাগের নিম্নসীমা অর্থাৎ 34·5।

(B) যদি মধ্যমমান এমন একটি বিভাগে পড়ে যে বিভাগে পরিসংখ্যা শূন্য (0) তা'হলে ঐ বিভাগের মধ্যমানকে (Midpoint) মধ্যমমান হিসেবে ধরা হয়।

ভূয়িষ্টক [Mode] :—

যদি একটি রাশিমালা ক্রমানুসারে সাজানো থাকে তবে যে রাশিটি বেশীবার পুনরাবৃত্তি হয় তাকে ঐ রাশিমালার ভূয়িষ্টক বলে। যেমন—2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10। এই রাশিগুলির ভূয়িষ্টক (Mode) হ'ল 5। ভূয়িষ্টক বাহির করতে হলে প্রথমে রাশিগুলিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিতে হয়। তারপর এর মধ্যে থেকে যেটি বেশীবার আছে সেটিকে খুঁজে বাহির করতে হয়।

আবার শ্রেণীবিভক্ত রাশিমালায় যে বিভাগের পরিসংখ্যা বেশী সেই বিভাগের মধ্যমমানই ঐ রাশিমালার ভূয়িষ্টক হয়। যেমন নীচের ছকে 23—25, এই বিভাগের পরিসংখ্যা বেশী। অতএব এই রাশিমালার ভূয়িষ্টক হ'বে 23—25 বিভাগের মধ্যমমান বা 24।

বিভাগ	14—16	17—19	20—22	23—25	26—28	29—31	32—34
পরিসংখ্যা	2	5	5	8	7	5	3

ভূয়িষ্ঠক গাণিতিক গড় ও মধ্যমমানের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এর থেকে আমরা যে কোন দুটো জানা থাকলে আর একটা বাহির করতে পারি। সম্বন্ধটা হ'ল—

ভূযিষ্ঠক (Mode)=3 মধ্যমমান (Median)=2—গাণিতিক গড় (Mean)।

গাণিতিক গড়, মধ্যমমান এবং ভূযিষ্ঠকের মধ্যে তুলনা (Comparison between Mean, Median and Mode) :—

গাণিতিক গড়ের একটা বিশেষ গুণ হ'ল যে রাশিমালার যে কোন একটি রাশির পরিবর্তনের সঙ্গে এর নাম বদলায়। অর্থাৎ সব সময় আমরা আসল কেন্দ্রীয় মান পাই। কিন্তু মধ্যমমান বা ভূযিষ্ঠকের বেলায় তা হয় না, যেমন—

4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, এই সংখ্যাগুলির গাণিতিক গড় 9 আর মধ্যমমানও 9। কিন্তু এখন যদি শেষ সংখ্যাটি 14 না হ'য়ে 21 হ'ত তা'হলে গাণিতিক গড় হ'ত 10, কিন্তু মধ্যমমান ঠিক 9-ই থেকে যেত। আবার 9-এর পর যতগুলো সংখ্যা আছে তাদের যত ইচ্ছা পরিবর্তন করলে গাণিতিক গড় ঠিক পরিবর্তন হবে—কিন্তু মধ্যমমান ঠিক একই থাকবে। ছোট রাশিমালার ক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধা এবং ভুল হয়। তাই সম্ভব হলে আমরা সব সময় গাণিতিক গড় ব্যবহার করব। ভূযিষ্ঠকের বেলায়ও ঠিক একই ভুল হয়।

গাণিতিক গড়, মধ্যমমান ও ভূযিষ্টকের মধ্যে কোনটা কখন ব্যবহার করা হবে? (When to use the Mean, Median and Mode) :—.

তখনই গাণিতিক গড় বাহির করব যখন—

[এক] প্রকৃত কেন্দ্রীয় মান দরকার ;

[দুই] যখন রাশিমালার অন্যান্য তাৎপর্য নির্ণয় করার দরকার। বিশেষ করে সমক পার্থক্য (Standard deviation) বা সহগতি (correlation)।

মধ্যমমান তখনই বাহির করব যখন—

[এক] খুব তাড়াতাড়ি একটা কেন্দ্রীয় মান বাহির করার দরকার ;

[দুই] রাশিমালার রাশিগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে ;

[তিন] দেখার প্রয়োজন—কয়টি রাশি গড়ের উপরে বা নীচে আছে।

ভূযিষ্ঠক বাহির করব তখনই যখন—

[এক] সবচেয়ে কোন সংখ্যাটি বেশী আছে তা জানার প্রয়োজন,

[দুই] খুব তাড়াতাড়ি একটা কেন্দ্রীয় মান প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by the central tendency? What are the different measures of central tendencies and when to use them?
2. Define Mean, Mode and Median and make a comparative study on them. What is the relation that exist between the three measures of central tendencies?
3. Define a median. How will you proceed to find the Median of a data given in a frequency distribution?
4. Find the Mean of the following data given in frequency distribution by using long method.

60-61	58-59	56-57	54-55	52-53	50-51	48-49	46-47	44-45	42-43
0	5	2	11	14	7	8	6	5	3

5. Find the mean age in years of 30 men from the following table by 'assumed mean method'.

Age	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	0-4
Frequency	1	2	3	3	5	10	4	1	1

6. Find the mean of the data given in Question No. 4 by 'assumed mean method'. Account for the difference in result, if there be any.
7. Find the mean age of the 30 men given in Question No. 5 and account for the discrepancy, if any.
8. Find the Median of the data given in Questions No. 4 and 5.
9. Find out the Mean, Mode and Median of the following measures :—

   72, 80, 82. 90, 86, 74 86, 82, 92, 78, 88, 86, 86, 84, 84 and 88.
10. The Mean and the Median of a group of measures is 92·52 and 88·50 respectively. Find the mode of the distribution.

একাদশ অধ্যায়

বিষমতার পরিমাপ

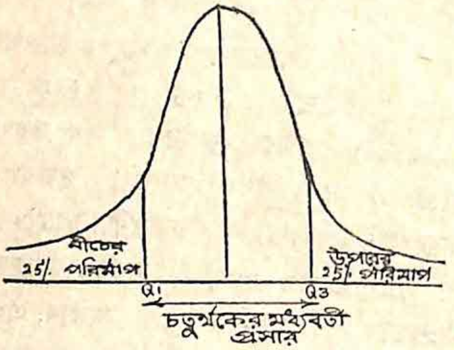
[MEASURES OF VARIABILITY]

যে কোন ধরনের কেন্দ্রীয় মানের পরিমাপ হ'ল একটা রাশিমালার প্রতিনিধিস্থানীয় মান। কেন্দ্রীয় মান থেকে আমরা রাশিমালা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করতে পারি। কিন্তু শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মান বা বিশেষভাবে গড় দিয়ে রাশিমালার সামগ্রিক একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেও বিশেষ বিশেষ সংখ্যার বৈশিষ্ট্য বুঝাতে পারি না। মনে করা যাক, দুটো শ্রেণীর ছাত্রদের আমরা উচ্চতা পরিমাপ করছি। দেখলাম দু'টো শ্রেণীরই গড় উচ্চতা 5 ফুট। অতএব আমরা বলব যে উচ্চতার দিক থেকে দুটো শ্রেণীর ছাত্ররাই সমান। কিন্তু দুটো শ্রেণীর উচ্চতার বিভিন্ন পরিমাপকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান। একটা শ্রেণীতে সব ছাত্রদের উচ্চতা $3\frac{1}{2}$ ফুট থেকে $5\frac{1}{2}$ ফুটের মধ্যে বিস্তৃত এবং অপর শ্রেণীতে 3 ফুট থেকে 6 ফুটের মধ্যে বিস্তৃত। এখন এক্ষেত্রে, যদিও দুটো শ্রেণীর গড় উচ্চতা এক তবুও তাদের পরিমাপের বিস্তৃতির (despersion) মধ্যে পার্থক্য আছে। সুতরাং, এর থেকে বলা যেতে পারে প্রথমোক্ত শ্রেণীর ছাত্ররা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের চেয়ে উচ্চতার দিক থেকে সমভাবাপন্ন (homogeneous)। অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ও তাদের গড় উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য কম। অর্থাৎ, এই সব পরিমাপের বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত কম। যে রাশিমালার বিস্তৃতি যত কম হবে তা তত নিয়ত (uniform) হবে। কোন রাশিমালার বিস্তৃতি বুঝানোর জন্য যে সব পরিমাপ ব্যবহার করা হয় তাদের বলা হয় **বিষমতার পরিমাপ** (measures of variability)। সুতরাং রাশিমালার গড়ের সঙ্গে যদি আমরা এই বিষমতার পরিমাপ দিই, তা'হলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা হয়। সাধারণতঃ রাশিবিজ্ঞানে, চার ধরনের বিষমতার পরিমাপ ব্যবহার করা হয়—[এক] **প্রসার (Range)**, [দুই] **চতুর্থক** (Quartile), [তিন] **গড় চ্যুতি** (Average deviation ; Mean deviation) এবং [চার] **সমক চ্যুতি** (Standard deviation)। এখানে আমরা এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

॥ এক ॥ **প্রসার (Range)**—খুব সহজভাবে বিস্তৃতির ধারণা দেওয়ার যে পদ্ধতি তাই হ'ল প্রসার (range)। কোন রাশিমালার প্রসার বলতে,

ঐ রাশিমালার অন্তর্গত বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম রাশির অন্তরকে বুঝি। ধরা যাক একটি শ্রেণীতে বিভিন্ন ছাত্র অংকে যা নম্বর পেয়েছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ নম্বর 60 এবং সর্বনিম্ন নম্বর 10। তা'হলে ঐ শ্রেণীর নম্বরের প্রসার হবে $60-10=50$ একক। এই ধরনের পরিমাপ দিয়ে কেবলমাত্র আমরা সাধারণভাবে বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারি। এর দ্বারা শুধুমাত্র প্রান্তিক রাশি দুটো সম্পর্কে ধারণা হয়। অন্য কোন রাশি-সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকে না। ঐ নম্বরের মধ্যে একজন ছাত্র যদি 90 নম্বর পেতো এবং অন্যান্যদের নম্বর একই রকম থাকত তা'হলে তাদের প্রসার $(90-10=80)$ প্রায় 30 একক বেশী হয়ে যেতো। তাই প্রসারের সাহায্যে আমরা বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা পাই মাত্র।

॥ দুই ॥ চতুর্থক বা চতুর্থাংশ চ্যুতি (Quartile deviation)— পরিমাপক স্কেলে, যে বিন্দুর নীচে শতকরা 25টি পরিমাপ আছে, তাকে এক-চতুর্থাংশ (first quartile) বিন্দু বলা হয়। এই বিন্দুকে Q_1 চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয়। আবার, পরিমাপক স্কেলে যে বিন্দুর নীচে শতকরা 75 ভাগ পরিমাপ আছে, তা তিন-চতুর্থক (third quartile) বিন্দু বলা হয়। পাশের চিত্রে, Q_1 এবং Q_3-এর অবস্থান দেখান হচ্ছে।



Q_1 এবং Q_3-এর মধ্যের দূরত্বকে বলা হয় চতুর্থকের মধ্যবর্তী দূরত্ব (inter quartile range)। আর চতুর্থক চ্যুতি (quartile deviation) বলতে আমরা এই চতুর্থকের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেককে বুঝি।

অর্থাৎ, এই ধারণা অনুযায়ী, চতুর্থক চ্যুতি $(Q)=\frac{Q_3-Q_1}{2}$ তা'হলে, চতুর্থক চ্যুতি বাহির করার জন্য আমাদের Q_1, এবং Q_3 বাহির করার প্রয়োজন। কি ভাবে চতুর্থক চ্যুতি (Q) বাহির করা হয় তা নীচে তালিকায় দেখান হ'ল। তার পূর্বে, Q_1 এবং Q_3 বাহির করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলছি — Q_1 এবং Q_3 ঠিক মধ্যমমানের (median) মতই বাহির করা যায়। শুধুমাত্র মধ্যমমানের সূত্রের কিছু পরিবর্তন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যমমান হ'ল Q_2 বা দ্বিতীয় চতুর্থক বা এমন একটা বিন্দু যার নীচে এবং উপরে শতকরা

50 ভাগ পরিমাপ আছে। তা'হলে, Q_1 ও Q_3 বাহির করার জন্য আমরা যে সূত্র ব্যবহার করব তা'হল—

শ্রেণী	পরিসংখ্যা f	
44·5—49·5	1	
39·5—44 5	2	
34·5—39·5	2	
27·5—34·5	4	এই শ্রেণীতে Q_3 বর্তমান ; $f_{a3}=4$
24·5—27·5	9	$f_b=21$
... .	....	....
19·5—24·5	8	এই শ্রেণীতে Q_1 বর্তমান ; $f_{a1}=8$
....	....	... .
14·5—19·5	3	$f_b=4$ ↑
9·5—14·5	0	
4·9—9 5	1	

$N=30$

এখানে মোট 30টি রাশি আছে। সুতরাং, Q_1 এবং Q_3 বাহির করতে হলে প্রথম 30 এবং 25% এবং 75% বা, $\frac{N}{4}$ এবং $\frac{3}{4}N$ নির্ণয় করার দরকার। $\frac{N}{4}=7·5$; $\frac{3N}{4}=22·5$। এর পর নীচের দিক থেকে পরিসংখ্যা যোগ করে দেখা যাচ্ছে 14·5—19·5 শ্রেণী পর্যন্ত যোগ করলে যুক্ত পরিসংখ্যা হচ্ছে 4 কিন্তু তার পরবর্তী পরিসংখ্যা যোগ করলে, 7·5 ($\frac{N}{4}$)-এর বেশী হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, 19·5—24·5 এই শ্রেণীর মধ্যেই Q_1 আছে। সুতরাং, Q_1 বাহির করার জন্য সূত্র প্রয়োগ করলে দেখা যায়—

$[L_e=19·5, \frac{N}{4}=7·5,\ f_b=4, f_{a1}=8\ ;\ i=5]$

$$Q_1=L_e+i\times\frac{\frac{N}{4}-f_b}{8}=19·5+5\times\frac{7·5-4}{8}=19·5+2·2=21·7$$

একইভাবে নীচ থেকে পরিসংখ্যা যোগ করে গেলে দেখা যায় 24·5—27·5 শ্রেণী পর্যন্ত যুক্ত পরিসংখ্যা হয় 21 এবং তার পরের পরিসংখ্যা (4) যোগ

করলে 22·5 ($\frac{3N}{4}$) এর চেয়ে বেশী হয়ে যায়। সুতরাং, Q_3, 27·5—34·5 এই শ্রেণীতে আছে। এখন, Q_3 বাহির করার সূত্র প্রয়োগ করলে পাই—

$[L_e = 27\cdot5\ ;\ i = 5,\ \frac{3N}{4} = 22\cdot5,\ f_b = 21,\ f_{a3} = 4]$

$$Q_3 = L_e + i \times \frac{\frac{3N}{4} - f_b}{f_{a3}} = 27\cdot5 + 5 \times \frac{22\cdot5 - 21}{4} = 27\cdot5 + 1\cdot9 = 29\cdot4$$

Q_1 এবং Q_3 বাহির করার পর চতুর্থক চ্যুতি (quartile deviation) বাহির করার সূত্রের সাহায্যে Q বাহির করা হয়।

সুতরাং, $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{29\cdot4 - 21\cdot7}{2} = \frac{7\cdot7}{2} = 3\cdot85$

তা'হলে Q বাহির করার জন্য আমরা পর পর নিম্নলিখিত পদগুলো বাহির করব—

[এক] $\frac{N}{4}$ ও $\frac{3N}{4}$ নির্ণয় করব।

[দুই] রাশিমালার নীচের দিক থেকে পরিসংখ্যা যোগ করে কোন্ শ্রেণীতে Q_1 আছে নির্ণয় করব।

[তিন] $Q_1 = L_e + i \times \frac{\frac{N}{4} - f_b}{f_{a1}}$ এই সূত্রের সাহায্যে Q_1 বাহির করব।

[চার] রাশিমালার নীচের দিক থেকে পরিসংখ্যা যোগ করে কোন্ শ্রেণীতে Q_3 আছে নির্ণয় করব।

[পাঁচ] $Q_3 = L_e + i \times \frac{\frac{3N}{4} - f_b}{f_{a3}}$ এই সূত্রের সাহায্যে Q_3 বাহির করব।

[ছয়] $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$, এই সূত্রের সাহায্যে Q বাহির করব।

এখন, এই চতুর্থক চ্যুতি বা Q এর সাহায্যে আমরা মাঝের শতকরা 50টি পরিমাপ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে পারি। যদি রাশিমালার বণ্টন স্বাভাবিক হয় তা'হলে কেন্দ্রীয় মানের দু'দিকে এক চতুর্থক চ্যুতি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারের মধ্যে শতকরা 50টি পরিমাপ থাকবে। অর্থাৎ, আমরা যদি আলোচ্য উদাহরণকে কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিষয়ের নম্বর হিসেবে বিবেচনা করি, তা'হলে এই তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা হবে। এই রাশিমালার গড় হ'ল 17·2 এবং $Q = 3\cdot85$, এর তাৎপর্য হ'ল $17\cdot2 \pm 3\cdot85$ বা, 13·35 – 21·05 এই প্রসারের মধ্যে শতকরা 50 জন ছাত্র নম্বর পাবে। তবে এই নিয়ম স্বাভাবিক বণ্টনের (normal distribution) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

॥ তিন ॥ গড়চ্যুতি [Average deviation] :—

কোন রাশিমালার প্রত্যেক সংখ্যা থেকে ঐ রাশিমালার গড় বিয়োগ দিলে যে সংখ্যা পাই তা হ'ল চ্যুতি (deviation)। এই পার্থক্যের কথা আমরা আগেও একবার বলেছি, প্রত্যেক সংখ্যাই গড় থেকে একটু না একটু পৃথক হ'বে। যদি ঐ রাশিমালার কোন সংখ্যা গড়ের সমান হয় তবে সে ক্ষেত্রে চ্যুতি হ'বে শূন্য (0)। এই চ্যুতি ধনাত্মক হয়, যখন রাশিমালার সংখ্যাটি গড় অপেক্ষা বড় হয় আর ঋণাত্মক হয় যখন রাশিমালার সংখ্যাটি গড় অপেক্ষা ছোট হয়। আমরা এই চ্যুতি বীজগাণিতিক আকারে এইভাবে লিখতে পারি।

$$x = X - M$$

যখন,

x = নির্ণেয় চ্যুতি, X = রাশিমালার যে কোন সংখ্যা, M = গাণিতিক গড়।

এখন স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে একটি রাশিমালার সমস্ত চ্যুতিগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল সব সময় শূন্য হ'বে। যেমন 6, 8, 10, 12, 14 এই সংখ্যাগুলির গড় 10, অতএব পার্থক্যগুলি যথাক্রমে—4, −2, 0, 2, 4। এখানে চ্যুতিগুলোর যোগফল হচ্ছে, শূন্য (0)। যে কোন রাশিমালার ক্ষেত্রেই এটা সত্য। এখন আমরা যদি এই চ্যুতিগুলিকে চিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে (without considering sings) যোগ করি এবং গড় বাহির করি তা'হলে যে সংখ্যা পাব তাই হবে ঐ রাশিমালার গড় চ্যুতি। উপরের উদাহরণে পার্থক্যগুলির চিহ্ন-নিরপেক্ষ যোগফল হয় 12, মোট সংখ্যা আছে 5টি, $\therefore$ গড় চ্যুতি $= \frac{12}{5} = 2{\cdot}4$; এই নিয়মকে বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে এইভাবে লখতে পারি—

$$\text{গড় চ্যুতি (A:D)} = \frac{\Sigma\,|x|}{N}$$

যখন $\Sigma\,|x|$ = চ্যুতিগুলির যোগফল (॥, চিহ্ন দ্বারা বুঝান হ'চ্ছে যে x-এর মানগুলি সব চিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে যোগ করতে হবে)।

N = রাশিমালায় যতগুলি সংখ্যা আছে।

যখন রাশিমালায় সংখ্যাগুলির প্রকৃত মান দেওয়া থাকবে গড় চ্যুতি তখন এই ভাবে বাহির করব—

(a) সংখ্যাগুলির গড় বাহির করব (M)

(b) প্রত্যেক সংখ্যা থেকে গড়ের চ্যুতি নির্ণয় করব ($x = X - M$)

(c) সব চ্যুতিগুলি চিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে যোগ করব ($\Sigma\,|x|$)

(d) চ্যুতিগুলির সমষ্টিকে যতগুলি সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ করব।

রাশিমালা যখন পরিসংখ্যা বিভাজনে বিভক্ত থাকে তখন কি করে গড় চ্যুতি বাহির করতে হয় তা নীচে ছকের সাহায্যে দেখানো হ'ল ঃ—

বিভাগ	পরিসংখ্যা f	মধ্যমমান	চ্যুতি x = X'—M	fx
195—199	1	197	26·20	26·20
190—194	2	192	21·20	42·40
185—189	4	187	16·20	64·80
180—184	5	182	11·20	56·00
175—179	8	177	6·20	49·60
170—174	10	172	1·20	12·00
165—169	6	167	—3·80	—22·80
160—164	4	162	—8·80	—35·20
155—159	4	157	—13·80	—55·20
150—154	2	152	—18·80	—37·60
145—149	3	147	—23·80	—71·40
140—144	1	142	—28·80	—28·80
	N = 50			$\Sigma \lvert fx \rvert = 504{\cdot}00$

এই রাশিমালায় 50টি সংখ্যা আছে এবং এর গাণিতিক গড় হ'ল 170 80। এখন এই 170·80-কে গড় ধরে চ্যুতি বাহির করা হয়েছে। আগের নিয়মের সঙ্গে এর তফাত হ'ল এই যে এখানে চ্যুতিগুলি বাহির করার সময়, বিভাগের মধ্যমান থেকে গড় বাদ দেওয়া হচ্ছে, আর চ্যুতিগুলিকে যোগ করার আগে তাদের বিভাগের পরিসংখ্যা দিয়ে গুণ করা হচ্ছে, এখানে $AD. = \frac{\Sigma \lvert fx \rvert}{N}$ তা'হলে গড় চ্যুতি বাহির করতে হ'লে—

(a) প্রথমে রাশিমালার গড় বাহির করতে হবে।

(b) প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান থেকে গড় বিয়োগ দিয়ে চ্যুতি বাহির করতে হবে (x = X' – M)।

(c) প্রত্যেক চ্যুতিকে সেই বিভাগের পরিসংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে (fx)। এখানে সব fx-এর মানগুলি চিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে যোগ করতে হবে ($\Sigma|fx|$)।

(d) যোগফলকে রাশিমালায় যতগুলি সংখ্যা আছে (N) দিয়ে ভাগ করতে হবে।

উপরের ছকে $\Sigma|fx| = 504 \cdot 00$

এবং $N = 50$

$$\therefore \quad A.D. = \frac{504}{50} = 10 \cdot 08$$

গড় চ্যুতির তাৎপর্য নির্ণয় (Interpretation of the average deviation) :—কোন রাশিমালায় সংখ্যাগুলি এবং গড়ের মধ্যে গড়পড়তা পার্থক্য আমরা গড় চ্যুতি থেকে বুঝতে পারি। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে উপরের উদাহরণে গড় এবং বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ, তা'হলে সবচেয়ে ভাল উত্তর হবে "গড়পড়তা 10'08"। অর্থাৎ, প্রায় 10।

আবার রাশিমালায় যখন বেশী সংখ্যা থাকে তখন বলা যেতে পারে যে গড়ের 1 গড় চ্যুতি উপরে এবং 1 গড় চ্যুতি নীচে রাশিমালার শতকরা 58 ভাগ সংখ্যা থাকে, অর্থাৎ উপরোক্ত উদাহরণ অনুযায়ী (170·80+10) বা 180·80 (170·80−10) বা 160·80 এই প্রসারের মধ্যে 50-এর 58% অর্থাৎ 29টি সংখ্যা থাকবে। ছকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় 160-164 বিভাগ থেকে 175-179 পর্যন্ত বিভাগের পরিসংখ্যাগুলির যোগফল 28, আমাদের প্রসার 18·18 পর্যন্ত, সুতরাং উপরের 5টি পরিসংখ্যা থেকে আর একটি নিতে পারি, তা'হলে আমরা বলতে পারি ± 1 গড় পার্থক্যের মধ্যে রাশিমালার 58% সংখ্যা থাকে।

॥ চার ॥ সমক চ্যুতি [Standard deviation] :—

সাধারণতঃ রাশিবিজ্ঞানে বিস্তৃতি বুঝানোর জন্য সমক চ্যুতি ব্যবহার করা হয়। এর কারণ হ'ল এই মানটি খুব নির্ভরযোগ্য, এক কথায় বলতে গেলে—**কোন রাশিমালার প্রত্যেক রাশি আর গড়ের অন্তরের বর্গ ক'রে, তার গড়ের বর্গমূল বাহির করলে যে মান পাওয়া যায় তাই সমকচ্যুতি।** 6, 8, 10, 12, 14 এই সংখ্যাগুলি ধরা যাবে। এদের গাণিতিক গড় হ'ল 10। ∴ চ্যুতিগুলি যথাক্রমে হ'ল— −4, −2, 0, 2 আর 4। এখন এদের বর্গ করলে পাই, 16, 8, 0, 4, 16, এই বর্গ চ্যুতিগুলির গড় হ'বে $\frac{16+4+0+4+16}{5}$ বা 8। এই 8-এর বর্গমূল = 2·13। এই 2·13-ই হ'ল

এই পাঁচটি রাশির সমক চ্যুতি, এই সমকচ্যুতি S.D. বা σ (Sigma—সিগমা) এই চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয়। তা'হলে এখন আমরা লিখতে পারি—

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}},$$ σ = সমকচ্যুতির চিহ্ন।

x = প্রকৃত সংখ্যা থেকে গড়ের অন্তর।
N = রাশিমালার সংখ্যার পরিমাণ।

এখানে কতকগুলি জিনিস মনে রাখার মত আছে। বর্গমূলের চিহ্নের ভিতর যে রাশিটি আছে তাকে বলে variance, অর্থাৎ আমরা অন্যভাবে সহজে বলতে পারি variance হ'ল সমকচ্যুতির বর্গ। এই variance এবং Σx^2, এর প্রয়োজন রাশিবিজ্ঞানে যথেষ্ট আছে।

যখন রাশিমালার প্রকৃত মান থেকে সমক চ্যুতি বাহির করতে হয় তখন এইভাবে বাহির করব—

(a) গাণিতিক গড় বাহির করব (M)
(b) প্রত্যেক সংখ্যা থেকে গড়ের অন্তর বাহির করব ($x = x - M$)
(c) ঐ চ্যুতির বর্গ করব (x^2)
(d) সমস্ত চ্যুতির বর্গগুলি যোগ করব (Σx^2)
(e) এখন ঐ মানকে রাশিমালার সংখ্যার পরিমাণ (N) দিয়ে ভাগ দেব।
(f) যে মান পাব তার বর্গমূল বাহির করব।

আবার পরিসংখ্যা বিভাজনে আমরা গড়ও যেমন দু'রকমের বাহির করতে পারি তেমন সমকচ্যুতিও দু'ভাবে বাহির করতে পারি। একটি হ'ল সোজাসুজি ভাবে গাণিতিক গড় বাহির করে, আর একটা হ'ল কল্পিত গড় ধরে। দুটো নিয়মই ছকে দেখানো হ'ল।

মধ্যবিন্দু	পরিসংখ্যা	চ্যুতি—x	fx^2
197	1	26·20	686·44
192	2	21·20	898·88
187	4	16·20	1049·76
182	5	11 20	627·20
177	8	6·20	307·52
172	10	1·20	14·40
167	6	—3·80	86·64
162	4	—8 80	309·76
157	4	—13·80	761·70
152	2	—18·80	706·88
147	2	—23·80	1699·32
142	1	—28·80	829·44

N = 50

$\Sigma fx^2 = 7977{\cdot}94$

এখানে গাণিতিক গড় ধরা হয়েছে 170·8, এই নিয়মে সমক চ্যুতি বাহির করতে হলে গড় নিজেদের আগেই বাহির করে নিতে হবে। এই নিয়মে সমক চ্যুতি বাহির করার সূত্র হ'ল—

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}}\ \text{উপরের ছকে}\ \sigma=\sqrt{\frac{7977\cdot94}{50}}=12\cdot649$$

সাধারণতঃ এই নিয়মের সাহায্যে সমক চ্যুতি বাহির করা খুব পরিশ্রম-সাধ্য; কল্পিত গড় পদ্ধতির সাহায্যে আমরা খুব সহজে এই মান বাহির করতে পারি। এই নিয়মের সাহায্যে কি ভাবে সমক চ্যুতি বাহির করতে হয় তা এখন বলব।

বিভাগের মধ্যবিন্দু	পরিসংখ্যা f	কল্পিত গড় থেকে চ্যুতি x'	fx'	fx'²
197	1	5	5	25
192	2	4	8	32
187	4	3	12	36
182	5	2	10	20
177	8	1	8	8
172	10	0	0	0
167	6	—1	—6	6
162	4	—2	—8	16
157	4	—3	—12	36
152	2	—4	—8	32
147	3	—5	—15	75
142	1	—6	—6	36
			$\Sigma fx' = -11$	$\Sigma fx'^2 = 322$

এই নিয়মে সমক চ্যুতি বাহির করতে হলে আমরা নিম্নলিখিত সূত্র প্রয়োগ করি :

$$\sigma=i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N}-\left(\frac{\Sigma fx'}{N}\right)^2}$$

উপরের ছকে 172-কে কল্পিত গড় ধরে আমরা,

$\Sigma fx' = -12$, এবং $\Sigma fx' = 322$ পেয়েছি

এবং জানি যে, $i=5$ (বিভাগের দৈর্ঘ্য) আর $N=50$,

$$\therefore\ \sigma=5\sqrt{\frac{322}{50}-\frac{(-12)^2}{50}}=5\sqrt{6\cdot44-\cdot06}=5\times2\cdot52$$

$$=12\cdot60$$

এই কল্পিত গড় নিয়মে সমকচ্যুতি করার সংক্ষেপ পর্যায়গুলো হ'ল—

(i) যে কোন একটি বিভাগের মধ্যবিন্দুকে কল্পিত গড় ধরবো।

(ii) গাণিতিক গড় বাহির করার সময় যে রকম চ্যুতিগুলি বসানো হয়েছিল সেই রকম বসাব (x')

(iii) সমস্ত fx'গুলি বাহির করব এবং যোগ দেব ($\Sigma fx'$)

(iv) এখন প্রত্যেক fx'-কে তাদের x' দিয়ে গুণ করব, তা'হলে fx'^2 পাব।

[বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এটা $(fx')^2$ নয়, $fx' \times x'$]

(v) সব fx'গুলি যোগ করব ($\Sigma fx'^2$)

(vi) এখন ঐ উপরের সূত্রের সাহায্যে সমক চ্যুতি বাহির করব।

উপরের দু'রকম উপায়ে আমরা সমক চ্যুতি প্রকাশ করেছি। এর ফলাফল থেকে আমরা বুঝতে পারছি—উভয় ক্ষেত্রে সমক চ্যুতি প্রায় সমান, কিন্তু এই দুই নিয়মের মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মটা অনেক সহজ। তাই সম্ভব হ'লে এই নিয়মটা ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু তথ্য বিভাজনে বিভাগ সংখ্যা কম থাকলে, এই নিয়ম ব্যবহারে একটু ভুল হয়। বিভাগ সংখ্যা যখন 12র চেয়ে কম থাকে তখন এই নিয়ম প্রয়োগ করতে হ'লে এর সঙ্গে একটা শুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়, একে বলে **সেফার্ড**-এর শুদ্ধি (Shaphard's Correction)। এই শুদ্ধি প্রয়োগ করলে সূত্রটি এইরূপ দাঁড়ায়, $\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fx}{N}\right)^2 - \cdot 0833}$

রাশিমালার প্রকৃত মান থেকে সমক চ্যুতি নির্ণয় :—

যখন রাশিমালায় খুব কম সংখ্যক রাশি থাকে তখন আমরা সেই রাশিমালাকে পরিসংখ্যা বিভাজনে বিভাগ না ক'রে সোজাসুজি রাশিগুলি থেকে সমক চ্যুতি বাহির করতে পারি। এই নিয়মের সাহায্যে সমক চ্যুতি বাহির করার সূত্র হ'ল—

$$\sigma = \frac{1}{N}\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

অর্থাৎ এই ভাবে বাহির করব—

(i) প্রত্যেকটি সংখ্যার বর্গ বাহির করে (X^2]

(ii) সব বর্গফলগুলি যোগ করে (ΣX^2)

(iii) সব সংখ্যাগুলি যোগ করে (ΣX)

(iv) এখন ঐ সংখ্যাগুলির যোগফলকে বর্গ করে [$(\Sigma X)^2$]

(v) ΣX^2-কে N দিয়ে গুণ করে ($N\Sigma X^2$)

(vi) $N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2$ বাহির করে

(vii) উপরোক্ত ফলাফলের বর্গমূল বাহির করে এবং N দিয়ে ভাগ দিলে সমক চ্যুতি পাব।

13, 17, 11, 15, এই রকম একটি রাশিমালা আছে, সমক চ্যুতি বাহির করার জন্য কি ভাবে কাজ করতে হয় তা দেখানো হ'ল—

x	x^2
11	121
13	169
15	225
17	289
$\Sigma x=56$	$\Sigma x^2=804$

$N=4$

$$\therefore \sigma=\frac{1}{4}\sqrt{4\times804-56^2}=\frac{1}{4}\sqrt{3216-3136}=\frac{1}{4}\times\sqrt{80}$$
$$=\sqrt{5}=2{\cdot}236$$

সমক চ্যুতির তাৎপর্য নির্ণয় [Interpretation of the standard deviation] :—ঠিক গড় পার্থক্যের মতই সমক চ্যুতির তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়। এখানে $+\sigma$ এবং -1σ এই প্রসারের ভিতর রাশিমালার 68·27% সংখ্যা থাকে, অর্থাৎ ±1 সমক চ্যুতির মধ্যে রাশিমালার $\frac{2}{3}$ সংখ্যক সংখ্যা থাকবে। অবশ্য যদি রাশিমালাটি নিয়মিত (uniform) হয়।

গড় চ্যুতি এবং সমক চ্যুতির ও চতুর্থক চ্যুতির মধ্যে সম্বন্ধ [Relation between the average deviation and the standard deviation & Quartile deviation] :

কোন রাশিমালার যদি তিনটি বিস্তৃতির মান বাহির করি তা'হলে দেখব যে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হ'ল—

সমক চ্যুতি = 1·253 × গড় চ্যুতি = 1·483 × চতুর্থক চ্যুতি।

উপরের উদাহরণে গড় চ্যুতি এবং সমক চ্যুতি বাহির করার সময় একই রাশিমালা ব্যবহার করেছি। ওখানে গড় চ্যুতি বেরিয়েছিল 10·04 এবং সমক চ্যুতি বেরিয়েছিল 12·60। এখন গড় চ্যুতিকে 1·253 দিয়ে গুণ করলে হয় 12·57, লক্ষ্য করা যায় এ মান প্রায় সমক চ্যুতির সমান, যেটুকু ভুল আছে তার বেশী সংখ্যাবিশিষ্ট রাশিমালার ক্ষেত্রে নগণ্য।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by dispersion ? What are the measures of variability ? Write what do you khow about them.
2. Define the average deviation (A.D.) of a distribution. How will you proceed to find the average deviation of a data given in frequeney distribution. What are its defects.
3. Define a standard deviation. What are the methods you will follow to find the S. D. of a given data ? How will you interpret the result ? Discuss with examples.
4. Explain the terms 'average deviation' and 'standard deviation'. What relation they bear to each other ? Given the standard deviation of a data 10·04 find its average deviation.
5. Find the average deviation of the following data given in frequency distribution.

Class interval	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Frequency	2	8	6	12	7	6	4	3	7	1

6. Find the average deviation of the data given in Question No. 7.
7. Find the standard deviation of the following data. Use both long and short method. (Use Shappard's correction)

Class interval	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
Frequency	1	2	3	3	5	10	4	1	1

8. Find the standard deviation of data of Question No. 5 and interpret the result.
9. Find the 'Q' for the distribution given in Question No. 5.

দ্বাদশ অধ্যায়

সহগতি

[CORRELATION]

এ পর্যন্ত আমরা এক বা একাধিক ব্যক্তির গুণ, ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ এবং পরিমাপের তাৎপর্য কি ভাবে রাশিবিজ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এ ছাড়াও আর একটা বিষয় সম্বন্ধে মনোবিদ্‌গণ বিশেষ সচেতন ও কৌতূহলী। তাঁরা শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের পরিমাপ করেই ক্ষান্ত নন। তাঁরা দেখতে চান একটি বস্তু, ঘটনা, বা ক্ষমতার সঙ্গে অপর একটি বস্তুর, ঘটনার, গুণের বা ক্ষমতার কি সম্পর্ক থাকে। কতকগুলো ক্ষমতার সঙ্গে কি কতকগুলো ক্ষমতার খুব মিল আছে? চালাক ছেলেরা কি বোকা ছেলেদের চেয়ে কম মানসিক অসুস্থ? যে ছাত্র ইংরাজীতে ভাল সে কি বাংলায়ও ভাল হবে? যে ছাত্র-ছাত্রীদের যত স্বাস্থ্য ভাল তারা কি তত লেখাপড়ায় ভাল? এই ধরনের প্রশ্নের তিন ধরনের উত্তর হ'তে পারে। ধরা যাক শেষের প্রশ্নটাই—এর উত্তর হতে পারে "না, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে পড়াশুনার কোন রকমেই সম্পর্ক নেই।" "হ্যাঁ, স্বাস্থ্যের সঙ্গে লেখাপড়ার ঐ ধরনের সম্পর্কে আছে"। বা "হ্যাঁ, স্বাস্থ্যের সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্ক আছে ঠিকই তবে উল্টো ধরনের"। সুতরাং কোন দুটো বস্তু বা ঘটনার বা গুণের মধ্যে এই তিন রকমের সম্পর্ক থাকতে পারে। এদের প্রথমটাকে বলে **প্রভাবমুক্ততা** (indifference), দ্বিতীয়টি হ'ল **ধনাত্মক সহগতি** (positive correlation) আর শেষ ধরনের সম্পর্কের নাম হ'ল **ঋণাত্মক সহগতি** (negative correlation)। এদের সম্বন্ধে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করলেই সহজে বুঝতে পারা যাবে।

দু'টো ঘটনা বা গুণ যখন একটা আর একটার উপর কোন কারণেই নির্ভর করে না তখন তাদের বলা হয় যে উভয়ে উভয়ের প্রভাবমুক্ত। যেমন ট্রেনের গতির সঙ্গে পাখী উড়ে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। লোভী ছেলে বুদ্ধিমান হতেও পারে, নাও হতে পারে। এ রকম ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় প্রভাব-মুক্ততা।

সাধারণতঃ আমরা দেখি, যে ছেলেরা যত বুদ্ধিমান তারা তত লেখাপড়ায় ভাল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতাও বাড়ে। দুটো জিনিসের মধ্যে একটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়স আর একটা বাড়ে বা একটা কমলে আর একটা কমে। একে বলা হয় ধনাত্মক সহগতি।

আবার আমরা জানি—পৃথিবীর উপর প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেক জিনিসকে আকর্ষণ করছে। এখন এই আকর্ষণের বল নির্ভর করে বস্তু দুটোর মধ্যে দূরত্ব আর তাদের ভর-এর উপর। দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণের বল কম হয়। এই

এদের সম্পর্ক অর্থাৎ একটা বাড়লে আর একটা কমে, আবার একটা কমলে আর একটা বাড়ে, একে বলা হয় ঋণাত্মক সহগতি।

তা'হলে উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে **সহগতি বলতে আমরা বলতে চাইছি একটার সম্পর্ক বা দুটি বিষয়ের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরটার যদি ঠিক ঐ পরিমাপে হ্রাসবৃদ্ধি হয় তা'হলে আমরা বলব যে ঐ দুটো জিনিসের মধ্যে সম্পূর্ণ সহগতি** (perfect correlation) **আছে**। আমি ঘণ্টায় 2 কিলোমিটার হাঁটতে পারি। এখন আমাকে যদি 4 কিলোমিটার হাঁটতে হয় অর্থাৎ দু'গুণ হাঁটতে সময় লাগবে 2 ঘণ্টা অর্থাৎ সময়ও দু'গুণ লাগবে। তার মানে এখানে সময় আর দূরত্বের মধ্যে সম্পূর্ণ ধনাত্মক সহগতি আছে। **আবার অনেক সময় এর উল্টোও হয় অর্থাৎ একটা যে অনুপাতে বাড়ে আর একটা যদি সেই অনুপাতে কমে বা একটা কমলে ঠিক সেই অনুপাতে আর একটা বাড়ে। এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় সম্পূর্ণ ঋণাত্মক সহগতি** (perfect negative correlation)। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার: সহগতি সব সময়েই যে সম্পূর্ণ হবে এমন কোন কথা নেই। কোন একটি ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে দেখা গেল যারা বাংলায় বেশী নম্বর পেয়েছে ইংরাজীতেও তারা বেশী নম্বর পেয়েছে। কিন্তু বাংলার নম্বরের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীর নম্বর সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং **এই ধরনের সম্পর্ককে আমরা বলব ধনাত্মক সহগতি ঠিকই তবে সম্পূর্ণ নয়** (imperfect)। তেমনি সম্পূর্ণ ঋণাত্মক সহগতিও হতে পারে।

উপরের এই আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে দুটো জিনিসের মধ্যে সহগতির প্রকৃতি জানলে আমরা তাদের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক আছে তা নির্ণয় করতে পারি। শুধুমাত্র সহগতির ঋণাত্মক বা ধনাত্মক প্রকৃতি থেকে আমরা হ্রাসবৃদ্ধির প্রকৃতি বুঝতে পারি, কিন্তু কি পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে তা ঠিক আমরা বুঝতে পারি না। এর জন্য একটা পরিমাপের দরকার। এই পরিমাপ পাই সহগতির সহগাঙ্ক থেকে।

রাশিবিজ্ঞানে দু'টি বস্তুর মধ্যের হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ককে সহগতির সহগাঙ্কের (correlation co-efficient) **সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।** সহগতির সহগাঙ্ক হ'ল একটি সূচক রাশি যেটা দুটো জিনিসের মধ্যে কি ধরনের সহগতি আছে এবং একটা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কি অনুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে তা প্রকাশ করে। সহগাঙ্কের কোন একক (unit) নেই। অর্থাৎ কোন সহগাঙ্কের মানকে আমরা ইঞ্চি, ডিগ্রি বা কিছুই বলব না। এই সহগাঙ্কের মান সবচেয়ে বেশী $+1$ (সম্পূর্ণ ধনাত্মক সহগতি)

থেকে সবচেয়ে কম −1 (সম্পূর্ণ ঋণাত্মক সহগতি) হতে পারে। সহগাঙ্কের বীজগাণিতিক চিহ্ন থেকে সহগতির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি আর এর পরিমাণ (size) থেকে বুঝতে পারি এই সম্পর্ক কত ঘোরালো। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবেঃ সহগাঙ্ক যখন (0) হয় তখন বিষয় দুটো প্রভাবমুক্ত হয়।

এই সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয়ের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে আমরা শুধু দুটি পদ্ধতির কথা এখানে আলোচনা করব। তাদের নাম হ'ল **অনুক্রমিক সহগতি নির্ণয় পদ্ধতি** (rank differerence method of finding correlation co-efficient)। **প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি** (product method of finding correlation of co-efficient)।

অনুক্রমিক সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি [Rank difference of finding Correlation Co-efficient] :—

ধরা যাক ক্লাসের 15 জন ছাত্রের ইংরাজী আর বাংলা পরীক্ষা নেওয়া হ'ল। এখন যদি আমরা জানতে চাই এই দু'রকম ফলাফলের মধ্যে কোন সহগতি আছে কি না,—তা'হলে আমাদের সহগাঙ্ক বাহির করার দরকার। সেটা বাহির করব এখানে আমরা অনুক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয়-পদ্ধতির দ্বারা। নীচের ছকের সাহায্যে আমরা এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করছি।

A থেকে O পর্যন্ত 15টি ছাত্রের বাংলার আর ইংরাজীর নম্বর আছে। প্রথম তাদের প্রত্যেকের নামের পাশে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তম্ভে দু'টো বিষয়ের নম্বর লেখা হ'ল। তারপর সহগাঙ্ক বাহির করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে কাজ করা হ'ল।

ছাত্রের নাম	ইংরাজীতে শতকরা নম্বর	বাংলার শতকরা নম্বর	ইংরাজীতে নম্বর অনুযায়ী ক্রমাবস্থা (R_1)	বাংলার নম্বর অনুযায়ী ক্রমাবস্থা (R_2)	দুই অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য (D)	পার্থক্যের বর্গ (D^2)
A	49	77	11	8	3	9·00
B	73	81	4	6	2	4·00
C	54	87	9	5	4	16·00
D	50	52	10	14	4	15·00
E	37	51	14·5	15	·5	·25
F	43	77	12·5	8	4·5	20·25
G	84	93	1	3	2	4·00
H	74	96	3	1	2	4·00
I	58	89	7	4	3	9·00
J	61	72	6	10	4	16·00
K	75	94	2	2	0	0·00
L	62	56	5	13	8	64·00
M	57	77	8	8	0	0·00
N	43	70	12·5	11	1·5	2 25
O	37	51	14·5	12	2·5	6·25
						$\Sigma D^2 = 171{\cdot}00$

(1) এই ভাবে দু'টি স্তম্ভ তাদের নম্বর সাজানোর পর, তাদের ক্রমাবস্থান (rank position) নির্ণয় করা হ'ল। প্রত্যেক বিষয়-এর জন্য আলাদা করে, যেমন ইংরাজীতে সব চেয়ে বেশী নম্বর যে পেয়েছে তার ক্রমাবস্থান হ'ল—1 এই সংখ্যা তার পাশের স্তম্ভে লেখা হ'ল, আবার দ্বিতীয় যে হয়েছে তার পাশে লেখা হ'ল—2। এমনি করে ক্রমাবস্থানগুলি বসানো হ'ল! এমনি ভাবে বসিয়ে যেতে যেতে 11 পর্যন্ত ঠিক হওয়ার পর একটু অসুবিধা হ'ল। কারণ 49-এর পরের নম্বর 43, F আর N দুজনে পেয়েছে। এখানে ক্রমাবস্থান বাহির করার জন্য এদের পরপর ক্রমাবস্থান হওয়া উচিত তার গড় বাহির করতে হয়। এখানে 11-এর পর এদের দু'জনের জন্য দু'টো অবস্থান 12 ও 13 হওয়া উচিত। এখনকার পাশে লিখব 12 আর কার পাশে লিখব 13? সুতরাং এক্ষেত্রে 12 আর 13-এর গড় অর্থাৎ 12·5 দু'জনের পাশেই লেখা হয়। এমনি যদি তিনটে থাকে, তিনটে অবস্থানের গড় বাহির করে পাশে লেখা হয়।

ঠিক এমনি ভাবে আবার বাংলার নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকের অবস্থান নির্ণয় করা হ'ল এবং আর একটা স্তম্ভে লেখা হ'ল। তা'হলে দু'টো স্তম্ভ R_1 আর R_2-তে আমরা ক্রমাবস্থানগুলো পেলাম।

(2) এর পরে প্রত্যেকের দুটো ক্রমাবস্থানের পার্থক্য বাহির করে D স্তম্ভে লেখা হ'ল। বিয়োগ করার সময় যেটা বড় সেটা থেকে বিয়োগ হ'ল $(D=R_1 \sim R_2)$

(3) প্রত্যেক পার্থক্যকে বর্গাকারে পাশের স্তম্ভে লেখা হ'ল (D^2)

(4) সব D^2-গুলি যোগ করা হ'ল (ΣD^2)

(5) এখন সহগতির সহগাঙ্ক নীচের সূত্র অনুসারে নির্ণয় করা হ'ল—

$$\rho = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$$

ρ = নির্ণেয় সহগাঙ্ক; ΣD^2 = ক্রমাবস্থানের পার্থক্যের বর্গের যোগফল, N = রাশির সংখ্যা।

এখন, $\Sigma D^2 = 171$; $N = 15$,

$$\therefore \rho = 1 - \frac{6 \times 171}{15(225-1)} = \cdot 695$$

সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয়ের প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি [Product moment method of finding Co-efficient of Co-rrelation]:—

সাধারণতঃ স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে, প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতিতে দু'টো

রাশিমালার মধ্যে সহগতি নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে যে সহগাঙ্ক পাওয়া যায়, তাকে 'γ' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দুটো চল, x, এবং y এর মধ্যে সহগাঙ্ককে γxy চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচের ছকে দেখানো হ'ল। এখানে, ধরা যাক দুটো স্তম্ভে, দুটো বিষয়ের দশজন ছাত্রের নম্বর আছে। একটি ইংরাজীর নম্বর অপরটি বাংলার নম্বর।

ছাত্রের নাম বা সংকেতে চিহ্ন	ইংরাজীর নম্বর X	বাংলার নম্বর Y	ইংরাজীর নম্বরের চ্যুতি x	বাংলার নম্বরের চ্যুতি y	চ্যুতির বর্গ x^2	চ্যুতির বর্গ y^2	xy
A	49	77	−9	0	81	0	0
B	73	81	15	4	225	16	60
C	54	87	−4	10	16	100	−40
D	50	52	−8	−25	64	625	200
E	37	51	−21	−26	441	676	546
F	43	77	−15	0	225	0	0
G	84	93	26	16	676	256	416
H	74	91	16	14	256	196	224
I	55	89	−3	12	9	144	−36
J	61	72	3	−5	9	25	−15

$\Sigma X = 580,\ \Sigma Y = 770$ $\qquad \Sigma x^2 = 2002;\quad \Sigma y^2 = 2038;$

$Mx = 58,\ My = 77$ $\qquad \Sigma xy = 1355$

$$\gamma xy = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \times \Sigma y^2}} = \frac{1355}{\sqrt{2002 \times 2038}} = {}^{\cdot}67$$

অথবা, $\gamma xy = \dfrac{\Sigma xy}{N\sigma x\sigma y} = \dfrac{1355}{10 \times 14{\cdot}1 \times 14{\cdot}2} = {}^{\cdot}67$

$$\left[\sigma x = \sqrt{\tfrac{2002}{10}} = 14{\cdot}1\ ;\ \sigma y = \sqrt{\tfrac{2038}{10}} = 14{\cdot}2\right]$$

এই পদ্ধতি সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পর পর অগ্রসর হওয়ার দরকার।

[এক] প্রথম X ও Y রাশিমালার গড় পৃথক পৃথক ভাবে নির্ণয় করতে হবে। গড় বাহির করার জন্য রাশিমালার রাশিগুলোর যোগফল বাহির করে রাশিমালার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখানে ইংরাজী ও বাংলার নম্বরের যোগফল যথাক্রমে, 580 ও 770 ; সুতরাং, ইংরাজীর গড় নম্বর (MX) হ'ল 58 ; এবং বাংলার গড় নম্বর (My) হ'ল 77 $[MX = \frac{580}{10}\ ;\ My = \frac{770}{10}]$

[দুই] এর পর ইংরাজীর নম্বরের চ্যুতি নির্ণয় করে 'x' স্তম্ভে লেখা হয়েছে। চ্যুতি [X—M]।

[তিন] অনুরূপ ভাবে বাংলার নম্বরের চ্যুতি নির্ণয় করে 'y' স্তম্ভে লেখা হয়েছে।

[চার] এই দুই শ্রেণীর চ্যুতিকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্গ করে x^2 এবং y^2 স্তম্ভে লেখা হয়েছে।

[পাঁচ] দুই স্তম্ভের চ্যুতির বর্গের যোগফল Σx^2 ; Σy^2 পৃথক পৃথক ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

[ছয়] সব শেষ স্তম্ভে 'x' এবং 'y' দুটি চ্যুতির পৃথক পৃথক গুণফল xy নির্ণয় করা হয়েছে।

[সাত] সব শেষে সব xy-গুলোকে যোগ করা হয়েছে, Σxy।

[আট] এর পর সূত্রের সাহায্যে x এবং y-এর মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ক বা γxy বাহির করা হয়েছে।

$$\gamma xy = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \times \Sigma y^2}}$$; এখানে $\Sigma xy = 1355$; $\Sigma x^2 = 2002$,

$$\Sigma y^2 = 2038 \; ; \; \therefore \gamma xy = \frac{1355}{\sqrt{2002 \times 2038}} = \frac{1355}{2019{\cdot}8} = {\cdot}67$$

[বিকল্প অন্য সূত্র দ্বারাও সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। এই সূত্র অনুযায়ী, $\gamma xy = \frac{\Sigma xy}{N\sigma x \sigma y}$; σx, σy যথাক্রমে দুই রাশিমালার সমক চ্যুতি। সুতরাং এই পদ্ধতিতে প্রথমে দুটো রাশিমালার সমক চ্যুতি বাহির করে নিতে হয়। এখানে—

$$\sigma x = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}} = \sqrt{\frac{2002}{10}} = 14{\cdot}1 \; ; \; \sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma y^2}{N}} = \sqrt{\frac{2038}{10}} = 14{\cdot}2$$

$$\therefore \; \gamma xy = \frac{1355}{10 \times 14{\cdot}1 \times 14{\cdot}2} = \frac{1355}{2002{\cdot}2} = {\cdot}67]$$

সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয়ের আরও নানারকম পদ্ধতি আছে। তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। অনেক সময় কম সংখ্যক রাশি থাকলে, গড় বা চ্যুতি কোন কিছু নির্ণয় না করে, সহগাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে যে সূত্র ব্যবহার করা হয়, তা'হল—

$$\gamma xy = \frac{N\Sigma XY - \Sigma X \times \Sigma Y}{\sqrt{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

অর্থাৎ, এখানে, γxy নির্ণয় করতে হ'লে, রাশিগুলোর পৃথক পৃথক বর্গ

$(x^2\ ;\ y^2)$ নির্ণয় করতে হয় এবং রাশিগুলোর পারস্পরিক গুণফল (xy) বাহির করতে হয়। আবার, পরিসংখ্যা বিভাজনে সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য অন্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে সহগাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য পরিসংখ্যাকে দ্বিবিভাজন ছকে (Two-way classification table) স্থাপন করতে হয়। এখানে গড় বা সমকচ্যুতি বাহির করার মত কল্পিত গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

$$\gamma xy = \frac{\frac{\Sigma x'y'}{N} - cxcy}{\sigma x'\sigma y'}$$; x´, y´ কল্পিত গড় থেকে চ্যুতি ;

সহগতির সহগাঙ্কের তাৎপর্য [Interpretation of Co-efficient of Correlation] :—

সহগতির সহগাঙ্কের দ্বারা আমাদের একটা পরিমাপ জানা থাকলে, অন্যটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর জন্য রাশিবিজ্ঞানে রিগ্রেসান সমীকরণ (Regression equation) ব্যবহার করা হয়। আমরা X চল থেকে যখন Y চল সম্পর্কে ধারণা পেতে চাই তখন যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় তা হ'ল—

$$Y = \gamma\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(X - M_x) + M_y \cdots\cdots\cdots(1)$$

আবার, $$X = \gamma\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y - M_y) + M_x \cdots\cdots\cdots(2)$$

এর থেকে ইংরাজীর নম্বর জানা থাকলে বাংলায় কোন ছাত্র কত নম্বর পেতে পারে, তা নির্ণয় করা যায়, বা বাংলার নম্বর জানা থাকলে ইংরাজীর নম্বর বাহির করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by the expressions "correlation" and "co-efficient of correlation"? Describe any one method of determining the co-efficient of correlation of a distribution. [সম্পূর্ণ অংশ]

2. Write a short essay on the concept of correlation. [সম্পূর্ণ অংশ]

3. The correlation co-efficients of three sets of data are ·69, –·69 and o respectively, Explain what is meant by this statement.

4. Find the correlation between two sets of numbers obtained by 10 pupils in two subjects by the Rank difference method.

Name of the Pupil	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
No. in Eng.	48	72	54	51	37	43	83	74	58	61
No. in Beng.	77	81	86	52	51	76	94	79	55	58

5 The following are the marks in English and Bengali obtained by 10 students in their annual examination. Find the correlation between the numbers obtained, by the product moment method. Interprete the result.

Name of the Pupil	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Marks in English	61	35	46	59	70	83	37	39	66	54
Marks in Bengali	43	43	56	47	62	65	41	42	69	43

6. Find the co-efficient of correlation of the distribution in Q. 5 by the Rank difference method.

7. Find the co-efficient of correlation of the distribution in Q. 5, by the product moment method.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিগ্‌মা স্কোর বা আদর্শ স্কোর

[SIGMA SCORE OR STANDARD SCORE]

আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার নানা রকম ত্রুটি আছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় ত্রুটি আছে বিভিন্ন বিষয়ের স্কোর (score) বা নম্বর সংক্রান্ত তাৎপর্য নির্ণয়ের মধ্যে। আমরা সাধারণতঃ পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর যোগ করে শ্রেণীতে তার স্থান নির্ণয় করি। ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান, ইত্যাদির প্রাপ্ত নম্বর একত্রে যোগ করি এবং মোট নম্বর দেখে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করি। কিন্তু, এই ধরনের পদ্ধতিতে একটা মারাত্মক ত্রুটি থেকে যায়। কারণ, প্রত্যেক বিষয়ের নম্বরের পরিমাপক স্কেলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কারণ প্রত্যেক স্কেলের একক পৃথক। তাই বিভিন্ন জাতীয় একককে কোন সময় একত্রে যোগ করা যায় না; যেমন ওজনের একককে দৈর্ঘ্যের এককের সঙ্গে যোগ করা যায় না। তাছাড়া, দু'জন ছাত্রের যদি মোট নম্বর এক হয়, তাদের আমরা এই রকম পারদর্শিতা সম্পন্ন বলতে পারি না। একজন ছাত্র ইংরাজী ও বাংলায় যথাক্রমে নম্বর 60 ও 70; আর একজন পেয়েছে 70 ও 60; এখন দু'জনের মোট নম্বর 130; সুতরাং আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বলব তাদের পারদর্শিতা সমান। কিন্তু, যে ছাত্র ইংরাজীতে 70 পেয়েছে এবং যে ছাত্র 60 পেয়েছে; তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমরা বিবেচনা করছি না। বা, যে ছাত্র বাংলায় 70 পেয়েছে এবং যে 60 পেয়েছে, তাদের মধ্যেকার পার্থক্যও আমরা বিবেচনা করছি না। বাংলায় 60 এবং 70 নম্বরের মধ্যে যে পার্থক্য, ইংরাজীতে ঐ নম্বরের মধ্যে পার্থক্য এক হতে পারে না।

সুতরাং, তুলনামূলক ভাবে বিচার করার জন্য যে কোন পরিমাপকে একটা স্থির এককে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন। অথবা, এইসব পরিমাপকে একই একক সম্পন্ন স্কেলে পরিবর্তন করা দরকার। রাশি বিজ্ঞানে রাশিমালাকে স্কেলে পরিবর্তিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি (Scaling procedure) আছে। এখানে আমরা এক রকম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। এই পদ্ধতিতে স্কেলের একককে এক সমক-পার্থক্যের (standard deviation, σ) সমান ধরা হয়। এর ফলে পরস্পর নম্বরের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। কারণ, প্রত্যেক পরিমাপই σ এককে থাকে। সিগ্‌মা স্কোর (σ—Score) বাহির

করার জন্য, স্কোরের বা রাশির বিচ্যুতিকে σ বা সমক চ্যুতি দিয়ে ভাগ করে, σ-স্কোর বাহির করা হয়। একে অনেক সময় Z-স্কোরও বলা হয়। অর্থাৎ, σ-স্কোর $= \frac{X-M}{\sigma} = \frac{x}{\sigma}$; σ=স্কোর নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচে দেখানো হ'ল। এখানে চারটা রাশি আছে। তাদের গড় হ'ল 14, এবং সমক পার্থক্য হ'ল 2·2। প্রথম, Z-স্কোর নির্ণয় করার জন্য প্রত্যেক রাশির চ্যুতি (x) বাহির করা হ'ল। পরে Z-স্কোর বাহির করা হল—প্রত্যেক চ্যুতিকে সমক চ্যুতি (2·2) দিয়ে ভাগ দিয়ে। এখান, থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, Z-স্কোর গুলো যতটা ধনাত্মক (Positive) আছে, ততটাই ঋণাত্মক (Negative) আছে। অর্থাৎ, Z-স্কোরের গড় সব সময় শূন্য (o) হবে। তাছাড়া Z-স্কোরের পরিমাণও খুব কম হয় এবং খুব ছোট দশমিক ভগ্নাংশের আকারে থাকে বলে, এদের নিয়ে কাজ করার অসুবিধা হয়। এই জন্য আজকাল, Z-স্কোরকে কল্পিত কোন বণ্টনে পরিবর্তিত করার রীতি প্রচলন করা হ'য়েছে। এই বণ্টনের গড় এবং সমক চ্যুতি এমন ধরা হয় যাতে সব Z-স্কোরগুলো ধনাত্মক হয় এবং পরিমাণেও বেশী হয়। এই ধরনের স্কোর বা রাশিকে বলা হয় আদর্শ স্কোর (standard score)। মনোবিদ্ **গ্যারেট**, আদর্শ স্কোরের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"...σ-*scores are usually converted into a new distribution with M and σ so selected as to make all scores positive and relatively easy to handle. Such scores are called standard scores.*" এই পদ্ধতিতে গড় এবং সমক চ্যুতির পরিবর্তন করলেও বণ্টনের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। যে সূত্রের সাহায্যে কোন বিশেষ স্কোরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করা হয়, তা'হল—

রাশি X	$x = X - M$	$Z = \frac{x}{\sigma}$
11	−3	−1·35
13	−1	−·45
15	+1	+·45
17	+3	−1·35

$M = \frac{56}{4} = 14$, $\sigma = 2{\cdot}2$

$$\text{আদর্শ স্কোর } (X') = \frac{\sigma'}{\sigma}(X - M) + M'$$

X′=আদর্শ স্কোর ; X=প্রদত্ত বা প্রাপ্ত স্কোর ; M=প্রদত্ত বা প্রাপ্ত রাশিমালার গড় ; M′=যে আদর্শ বণ্টনে পরিবর্তিত করা হচ্ছে তার গড়। σ=প্রাপ্ত রাশিমালার সমক চ্যুতি, এবং σ′=আদর্শ বণ্টনের চ্যুতি।

এখন একটা উদাহরণের সাহায্য নিলে, কি ভাবে এই পরিবর্তন করা হয়

সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ধরা যাক, দু'জন ছাত্র A এবং B, কোন একটি পরীক্ষায়, বিশেষ বিষয়ে যথাক্রমে নম্বর পেয়েছে 85 এবং 65। তাদের শ্রেণীর ঐ বিষয়ে গড় নম্বর 55 এবং সমক চ্যুতি 10। এখন যদি এই দুই ছাত্রের নম্বরকে 100 গড় ও 20 সমক চ্যুতি সম্পন্ন বণ্টনের আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করতে বলা হয়। তা'হলে আমরা কি ভাবে অগ্রসর হ'ব।

A ছাত্রদের ক্ষেত্রে $X=85, \sigma=10, \sigma'=20, M=55, M'=100$

$\therefore$ A ছাত্রের আদর্শ স্কোর $(X') = \frac{\sigma'}{\sigma}(X-M)+M'$

$$= \frac{20}{10}(85-55)+100$$

$$= 2(30)+100=160$$

অনুরূপভাবে, B-ছাত্রের আদর্শ স্কোর $(X') = \frac{20}{10}(65-55)+100$

$$= 2\times 10+100=120$$

[$\therefore$ এক্ষেত্রে $X=65$]

আমরা ইচ্ছা করলে, যে কোন রকম গড় ও চ্যুতি ধরে যে কোন স্কোরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করতে পারি। তাছাড়া আদর্শ স্কোর (standard) গুলোকে যোগ করা যায়। একই ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করে যোগ করলে তবেই তা তুলনামূলক পর্যায়ে এসে পড়ে।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by standard score ? What the difference between standard score and σ-score. [সম্পূর্ণ অংশ]

2. Write notes on : (a) σ-score

   (b) Standard Score. [সম্পূর্ণ অংশ]

3. Convert the following scores of two boys in different subjects in a school examination into corresponding Z-score and compare their achievement.

Subject	Boy-I	Boy-II
A.	50	45
B.	53	58
C.	45	65
D.	64	63
E.	73	44

4. In a particular test in which the average score for a group is 63 and standard deviation 15, two boys have score 44 and 75 respectively. Convert their score to a standard score with a mean of 100 and σ of 10.

5. In the following table the score of an individual student in some school subject are given along with the average score and σ for the class. Convert these score of the student to standard scores with a mean of 100 and σ of 10.

Subjects	Individual score of the student	Class Mean	Class σ
English	38	43	4
Bengali	41	56	8
Mathematics	47	65	10
History	55	49	9
Geography	36	53	7

চতুর্দশ অধ্যায়

কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার লেখচিত্র
ও
শতাংশ বিন্দু

[CUMULATIVE FREQUENCY CURVE & PERCENTILES]

আমরা পরিসংখ্যা বহুভুজ এবং হিস্টোগ্রাম (Histogram) সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই দু'ধরনের লেখচিত্রের দ্বারা আর কোন রাশিমালাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবেশন করিতে পারি। এছাড়া আর এক ধরনের লেখ-চিত্রের সাহায্যেও আমরা পরিসংখ্যাকে পরিবেশন করতে পারি। এই লেখচিত্রে আমরা ক্রমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যা বা কিউম্যুলেটিভ্ পরিসংখ্যার (cumulative frequency) সাহায্য নিই। **কোন বিশেষ শ্রেণীর ক্রমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যা বলতে, সেই শ্রেণী ও তার নিম্নবর্তী সব শ্রেণীর পরিসংখ্যার যোগফলকে বুঝায়।** এখন কোন রাশিমালার বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্চমান (upper limit) x-অক্ষে এবং ক্রমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যাকে y-অক্ষে স্থাপন করে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাকে বলে **কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার লেখ** (cumulative frequency graph)। আবার এই ধরনের লেখচিত্রে অনেক সময় ক্রমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যাকে না ধরে তার শতকরা হারকে ধরা হয়। অর্থাৎ, বিভাগসীমার উচ্চমান ও ক্রমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যার শতকরা হারকে যে লেখচিত্রে পরিবেশন করা হয়, তাকে বলা হয় কিউম্যুলেটিভ্ পরিসংখ্যার শতকরা হারে লেখ বা ওগিভ্ (cumulative perecntage frequency curve or Ogive)। কোন বিশেষ রাশিমালা থেকে কি ভাবে এই লেখচিত্র আঁকতে হয় তা নীচে দেখান হ'ল।

শ্রেণী	f	কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা cf	কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার শতকরা হার cf %
9·5—14·5	1	1	2
14·5—19·5	2	3	6
19·5—24·5	4	7	14
24·5—29·5	5	12	24
29·5—34·5	8	20	40
34·5—39·5	10	30	60
39·5—44·5	6	36	72
44·5—49·5	4	40	80
49·5—54·5	4	44	88
54·5—59·5	2	46	92
59·5—64·5	3	49	48
64·5—69·5	1	50	100

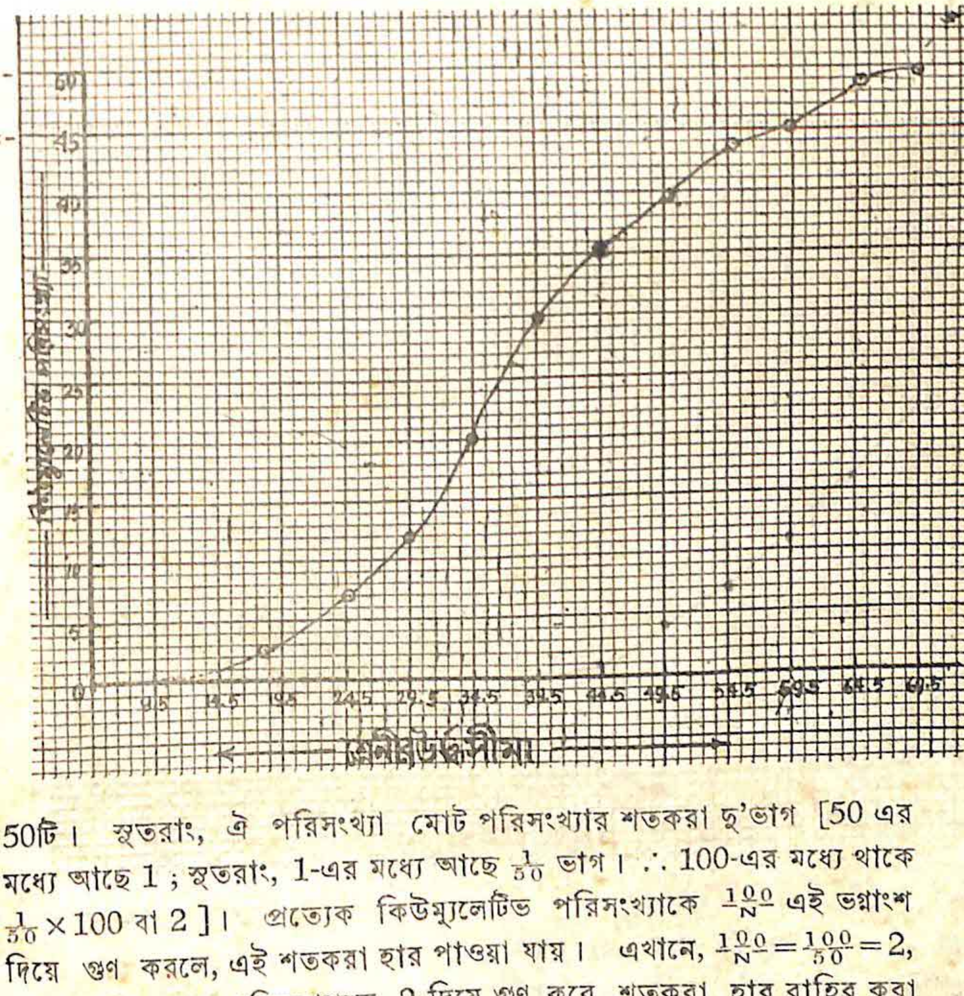
N=50

[এক] কিউম্যুলেটিভ্ পরিসংখ্যার লেখচিত্র তৈরী করার জন্য প্রথম প্রত্যেক শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা নির্ণয় করতে হয়। এখানে cf স্তম্ভে এই কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা বাহির করা হয়েছে। 9·5—14·5 এই শ্রেণীর নীচের শ্রেণীর পরিসংখ্যা শূন্য। সুতরাং এই শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা = $0+1=1$; এর পরবর্তী শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা হবে $1+2=3$; তার পরের শ্রেণীর হবে $1+2+4$ বা $3+4=7$। এমনিভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। সব শেষ শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা রাশিমালার রাশির সংখ্যা সমান হবে

[দুই] এখন ছক্‌কাটা কাগজে x অক্ষ বরাবর প্রত্যেক শ্রেণীর উর্ধসীমা স্থাপন করা হ'ল এবং y অক্ষ বরাবর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা স্থাপন করা হ'ল। পরে প্রত্যেক উর্ধসীমার বিপরীতে কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা স্থান বিন্দুর দ্বারা নির্দেশ করে, সে বিন্দুগুলোকে যোগ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাই কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার চিত্র। এই চিত্র দেখতে অনেকটা ইংরাজী S-এর মত হয়। এই চিত্র আঁকার পর নীচের দিকে এক শ্রেণী অন্তরে এটাকে x অক্ষের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। পরিসংখ্যা বহুভুজেও একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। (চিত্র পৃঃ ২০৯ দ্রষ্টব্য)

কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার শতকরা হারের লেখ বা ওগিভ্ (Ogive) আঁকতে হ'লে একই রকম পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। শুধুমাত্র এখানে কিউম্যুলেটিভ্ পরিসংখ্যার পরিবর্তে ঐ পরিসংখ্যার শতকরা হারকে ধরা হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা কত

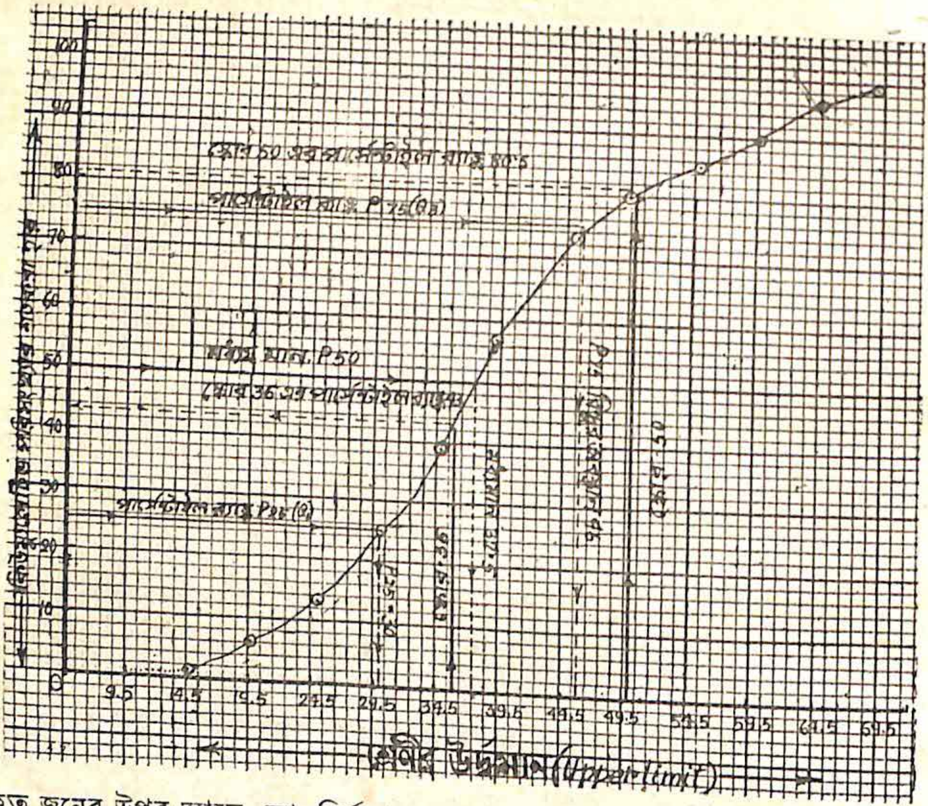
ভাগ তা প্রথমে বাহির করে নেওয়া হয়। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে, 9·5—14·5 এই শ্রেণীতে কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা 1 ; আর রাশিমালায় মোট সংখ্যা আছে



50টি। সুতরাং, ঐ পরিসংখ্যা মোট পরিসংখ্যার শতকরা দু'ভাগ [50 এর মধ্যে আছে 1 ; সুতরাং, 1-এর মধ্যে আছে $\frac{1}{50}$ ভাগ। ∴ 100-এর মধ্যে থাকে $\frac{1}{50} \times 100$ বা 2]। প্রত্যেক কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যাকে $\frac{100}{N}$ এই ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করলে, এই শতকরা হার পাওয়া যায়। এখানে, $\frac{100}{N} = \frac{100}{50} = 2$, সুতরাং প্রত্যেক পরিসংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করে শতকরা হার বাহির করা হয়েছে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে লেখচিত্রে পরিবেশন করলে, যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তা পরের পাতায় দেওয়া হ'ল।

এই ওগিভ (Ogive)-এর প্রধান সুবিধা হ'ল এর থেকে আমরা সরাসরি ভাবে মধ্যমমান (median), চতুর্থক (quartiles) ইত্যাদি বাহির করতে পারি। বা, সাধারণভাবে, রাশিমালার যে কোন বিন্দু নির্দেশ করতে পারি যার নীচে শতকরা নির্দিষ্ট সংখ্যক রাশি আছে। যেমন, মধ্যমান হ'ল সেই বিন্দু যার নীচে রাশিমালার শতকরা 50 ভাগ রাশি আছে ; প্রথম চতুর্থক (first quartile, Q_1) হ'ল এমন বিন্দু যার নীচে আছে শতকরা 25 ভাগ রাশি। এই ধরনের বিন্দুর সাধারণ নাম হ'ল শতাংশ বিন্দু (percentile

point)। অর্থাৎ, শতাংশ বিন্দুর দ্বারা আমরা পরিমাপক স্কেলের এমন একটা বিন্দুকে বুঝাই, যার নীচে শতকরা নির্দিষ্ট সংখ্যক রাশি আছে। যেমন ত্রিশ শতাংশ বিন্দু হ'ল এমন একটা বিন্দু যার নীচে শতকরা 30টি রাশি আছে। বিশেষ পরিমাপের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হ'ল এর দ্বারা আমরা বিশেষ শিক্ষার্থী



কত জনের উপর আছে তা নির্ণয় করতে পারি। কোন বিশেষ পরীক্ষায় কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর স্কোর বা নম্বর থেকে আমরা যখন শ্রেণীতে তার আপেক্ষিক স্থান নির্ণয় করি এই পদ্ধতির দ্বারা তখন তাকে ঐ শিক্ষার্থীর পার্সেণ্টাইল র্যাঙ্ক (Percentile Rank, PR) বলা হয়। অর্থাৎ, ঐ শিক্ষার্থীর নম্বরের নীচে কতজনের নম্বর আছে, তা বুঝানো হয় এই র্যাঙ্ক দ্বারা। সাধারণভাবে শতাংশবিন্দু বাহির করার জন্যে আমরা মধ্যমমান (median) বাহির করার সূত্রের কিছু পরিবর্তন করেই ব্যবহার করে থাকি। চতুর্থক চ্যুতি বাহির করার পদ্ধতির সময় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু ওগিভ (Ogive)-এর সাহায্যে আমরা যে কোন রাশি বা স্কোর এর পার্সেণ্টাইল র্যাঙ্ক সহজে বাহির করতে পারি।

ধরা যাক উপরোক্ত ছকে, যে রাশিগুলো আছে তা একটা বিশেষ শ্রেণীর অঙ্কের নম্বর। কোন বিশেষ ছাত্র যদি ঐ পরীক্ষায় 50 নম্বর পায়, তা'হলে

তার পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক কত? শিক্ষার্থীর র‍্যাঙ্ক বাহির করতে হ'লে, প্রথম লেখচিত্রে x-অক্ষে 50 নম্বর নির্দেশক বিন্দু থেকে একটা লম্ব টানা হয়। ঐ লম্ব লেখচিত্রকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দু থেকে x-অক্ষের সমান্তরাল রেখা টানা হয়। ঐ রেখা y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই বিন্দুই শিক্ষার্থীর র‍্যাঙ্ক (rank) নির্দেশ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক হ'ল P80। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী তার শ্রেণীতে শতকরা 80 জনের নম্বরের উপরে আছে। এমনিভাবে যে কোন শিক্ষার্থীর যে কোন বিষয়ে পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। আবার কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক জানা থাকলে সম্ভাব্য নম্বর তার কত হতে পারে তাই নির্ণয় করা যায়, ঠিক একইভাবে বিপরীত দিক থেকে শুরু করে, x-অক্ষে স্থান নির্দেশ করে। ছবিতে বিভিন্ন স্কোরের র‍্যাঙ্ক (rank) এবং বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের (rank) স্কোর কিভাবে বাহির করতে হয় তা দেখানো হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Draw a Cumulative frequency curve for the following distribution.

Score	60-69	50-59	40-49	30-39	20-29	10-19	0-9	Total
f	1	2	3	9	15	8	2	N=40

2. Draw an Ogive on the following distribution.

Score	90-99	80-89	70-79	60-69	50-59	40-49	30-39	20-29	10-19
f	2	4	8	22	20	10	6	2	1

(i) Determine from the graph—P25, P35, P60. P75 and P80

(ii) Determine from the graph the PR for score value of 45, 66 and 85.

(iii) Determine from the graph the median and Q1.

3. Draw an Ogive on the distribution given in Question No. 1.

4. Write notes on the following:

(a) Percentile.

(b) Percentile Rank.

(c) Cumulative frequency.

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিক্ষায় পরিমাপ
[MEASUREMENT IN EDUCATION]

শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিজীবনে আমরা কতকগুলো পরিবর্তন (change) আনতে চাই। অর্থাৎ, ব্যক্তির গতানুগতিক আচরণ ধারার মধ্যে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ে, শিক্ষকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা করে যান। কিন্তু, শুধুমাত্র শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই শিক্ষকের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে ঠিকমত হচ্ছে কি না, তাও মাঝে মাঝে দেখার দরকার। তাই শিক্ষাগত উন্নতির ঠিকভাবে পরিমাপ করা, তাঁদের কাছে একটা সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, তাঁর গতানুগতিক ব্যবস্থা জানা আছে। পরীক্ষা নেওয়া। কিন্তু এই গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির নানা রকম ত্রুটি আছে। এর দ্বারা আমরা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের প্রগতির হার, পরিমাণ করতে পারি না। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী, শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ করতে চাই না; শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মানসিক বৈশিষ্ট্য, মনোভাব, অনুরাগ ইত্যাদি বিকাশ করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় এই সব বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার বিশেষ কোন সুযোগ নেই। তাই এই পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কাউকেই অনুপ্রাণিত করতে পারে না।[1]

পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষককে এই কাজে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা মনোবিদ্‌গণ এগিয়ে এসেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিমাপের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ-পরিমাপ করার জন্য এই ধরনের কৌশল বিশেষভাবে উপযোগী। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপের পরিবর্তে মূল্যায়ণের (evaluation) যে ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে সার্থকভাবে কার্যকরী করতে হ'লে, শিক্ষা মনোবিদ্‌গণের আবিষ্কৃত এই সব কৌশলের প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এই সব কৌশলকে বলা হয় **অভীক্ষা** (test)। আমরা এই অধ্যায়ে এই সব অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা

পরিমাণের আধুনিক কৌশল

1. এ সম্পর্কে আমরা শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন বিভাগে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

করব। পরিমাপের অন্যান্য সামগ্রিক দিক সম্পর্কে আর কিছু উল্লেখ করব না। কারণ, শিক্ষক হিসেবে আমাদের এই অভীক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

অভীক্ষা কাকে বলে [What is a Test]?

মনোবিদ্যায় অভীক্ষা বলতে আমরা পরিমাপক যন্ত্রকে (measuring instrument) বুঝাই। অর্থাৎ, এই সব অভীক্ষার দ্বারা বিশেষ ধরনের মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে থাকি। তবে সাধারণভাবে পরিমাপক যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, এ গুলো কিন্তু সে রকম নয়। সাধারণতঃ যে কোন পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কোন কিছুকে পরিমাপ করি, তখন ঐ বস্তুকে যন্ত্র মধ্যে বা পাশে স্থাপন করতে হয়। কিন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রে, মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা শিক্ষাগত বা মানসিক বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করার জন্য, এই সব বৈশিষ্ট্যকে আচরণের মধ্যে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। অর্থাৎ, এই সব অভীক্ষার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সামনে কতকগুলো উদ্দীপক (stimulus) উপস্থাপন করি। স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তি এই সব উদ্দীপকের দরুন প্রতিক্রিয়া (response) করে। এই অবস্থায় তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ ধরনের মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। তাই মনোবিদ্ **মার্শেল** (Murshell) মানসিক অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—**মানসিক অভীক্ষা হ'ল কতকগুলো উত্তেজনার সমষ্টি, যেগুলো ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করলে, সে বিশেষ একভাবে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এই সাড়াগুলো তার বিশেষ মানসিক অবস্থাকে আমাদের সামনে প্রকাশ করে।**[1] মানসিক অভীক্ষা যেমন, উদ্দীপকের সমবায়, শিক্ষামূলক অভীক্ষাও তেমনি উত্তেজকের সমবায়। অর্থাৎ, **যে উদ্দীপকের সমবায় দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে, তাকে শিক্ষামূলক অভীক্ষা (educational test)** বলা হয়। এখন, অভীক্ষার মধ্যে যে সব উদ্দীপক থাকে, তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন, এক অর্থ বা বিভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দ (words having same or opposite meaning), রঙীন নক্সা (coloured design), অসম্পূর্ণ বাক্য (incomplete sentences) ইত্যাদি নানা রকমের হতে পারে।

অভীক্ষার সংজ্ঞা

---

1. "A psychological test is a pattern of stimuli selected and organised to elicit responses which will reveal certain psychological characteristics in the person who takes them."—Murshell : Psychological testing.

অভীক্ষার পরিভাষায় এই সব উদ্দীপকগুলোকে বলা হয় **অভীক্ষার পদ** (test item)। আবার একই অভীক্ষায় যে সব উদ্দীপক দ্বারা একই মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের একত্রে বলা হয় **অভীংশ** (sub-test)। একই জাতীয় অনেক পদ (test-item) বা উদ্দীপক অভীক্ষায় রাখার উদ্দেশ্য হ'ল, যে মানসিক বা শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য আমরা পরিমাপ করতে চাই তাকে সহজভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ করা।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, অভীক্ষা এবং পরীক্ষণের (experiment) মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপতঃ দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না।

অভীক্ষা ও পরীক্ষণ

দু'ধরনের পরিস্থিতিতেই পরীক্ষার্থীকে কতকগুলো কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তেজনায় সাড়া দিতে হয়। কিন্তু, তাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের দিক থেকে পার্থক্য আছে। অভীক্ষার (test) দ্বারা আমরা মানসিক অবস্থা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ করতে চাই। কিন্তু, পরীক্ষণের দ্বারা আমরা কেবলমাত্র মানসিক বা শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করি মাত্র।

ভাল অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Good Tests] :—

মানসিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষা তৈরী করার পদ্ধতি নিয়ে, মনোবিদ্যা ও রাশিবিজ্ঞানে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। অভীক্ষা তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে না জানলেও ভাল অভীক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকার দরকার। এই জ্ঞান আমাদের যথাযোগ্য অভীক্ষা নির্বাচনে সহায়তা করবে। যে কোন পরিমাপক যন্ত্রের (measuring instrument) মত এই সব অভীক্ষাগুলোরও কতকগুলো গুণ দেখে নির্বাচন করা উচিত। যে সব গুণ থাকলে, অভীক্ষার পরিমাপ নিভু'ল হবে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করব।

ধরা যাক একটা মেশিন চলছে। এই মেশিন চলার সময় কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তা পরিমাপ করতে চাই। এই পরিমাপের জন্য আমরা একটা

যথার্থ

থার্মোমিটার যন্ত্রের কাছে স্থিরভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি এবং মাঝে মাঝে ঐ থার্মোমিটারের পারদের উচ্চতা দেখে তাপমাত্রার পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু থার্মোমিটারটাকে মেশিনের গায়ে লাগাতে না পারার জন্য সব সময় আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভুল পরিমাপ পাব। কারণ, থার্মোমিটারটাকে দূরে রাখার জন্য মেশিনের প্রকৃত তাপের পরিবর্তে, বিকিরিত (radiated) তাপের পরিমাপ পাব। এই ধরনের ভুলকে বলা হয় ধ্রুবক ভ্রান্তি (constant error)।

ঠিক একই রকমভাবে মানসিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষায় আমরা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাইছি, অভীক্ষার পদগুলো যদি সেই মানসিক বা শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অক্ষম হয়, তা'হলে সব সময় আমাদের পরিমাপে একই রকম ভুল থেকে যাবে। অর্থাৎ, আসলে আমরা যে মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করতে চাইছি তা কোন সময়ে পরিমাপ করতে পারব না। অভীক্ষার এই ত্রুটি দূর করার জন্য, মনোবিদ্‌গণ অভীক্ষার **যাথার্থ্য** (validity) নির্ধারণ করেন। তাঁরা প্রত্যেক অভীক্ষার যাথার্থ্য (validity) নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। প্রত্যেক অভীক্ষার যাথার্থ্য (validity) নির্দ্দেশ করার জন্য মনোবিদ্‌গণ এক ধরনের সূচক (index) ব্যবহার করেন; তাকে বলা হয় যাথার্থ্যের সহগাঙ্ক (validity co-efficient)। সুতরাং, শ্রেণীকক্ষে বা বিদ্যালয়ে অভীক্ষা প্রয়োগের জন্য নির্বাচনের পূর্বে তার এই যাথার্থ্য দেখে নির্বাচন করা উচিত।

নির্ভরযোগ্যতা

আবার, অভীক্ষার গঠনের ত্রুটির জন্য একই মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম পরিমাপ পেতে পারি। অর্থাৎ, থার্মোমিটারই যদি খারাপ হয়, তা'হলে আমরা তার থেকে কোন সময়ে সঠিক মাপ পাব না। একই তাপমাত্রার জন্য বিভিন্ন সময়ে পারদস্তম্ভ বিভিন্ন উচ্চতায় দেখা যাবে। পরিমাপক যন্ত্রের এই ধরনের ত্রুটিকে **চলমান বা পরিবর্তনশীল ভ্রান্তি** (variable error) বলা হয়। মানসিক বা শিক্ষামূলক অভীক্ষার এই ধরনের ত্রুটি থাকলে, একই শিক্ষার্থীর একই রকম বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হবে। তাই অভীক্ষা প্রস্তুত করার সময় তার **নির্ভরযোগ্যতা** (reliability) স্থির করা হয়। বিভিন্ন জটিল গাণিতিক পদ্ধতির দ্বারা এই নির্ভরযোগ্যতা স্থির করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে অভীক্ষা নির্বাচনের সময় তার নির্ভরযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার। অভীক্ষার সঙ্গে এই নির্ভরযোগ্যতার সহগাঙ্কও (reliability co-efficient) দেওয়া থাকে।

নৈর্ব্যক্তিকতা

একটা থার্মোমিটারে পারদস্তম্ভ একই জায়গায় রেখে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাপের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে দেখা যায়, কেউ বলছে, 30·9°c. কেউ বা, 30·8°c আবার কেউ বা 30°c.। সুতরাং, দেখা যায়, একই পরিমাপ পড়তে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম ভুল করছে। এই ধরনের ভুলকে বলা হয় ব্যক্তিগত ভ্রান্তি (personal error)। মানসিক বা শিক্ষামূলক অভীক্ষায়, এ ধরনের ভুল আরও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মনোবিদ্‌গণ যতদূর সম্ভব এই সব অভীক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক (objective) করার চেষ্টা করেন। যে সব প্রশ্ন এখানে

উদ্দীপকের আকারে থাকে, সেগুলোকে যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক করা হয়। অভীক্ষার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity)। সুতরাং অভীক্ষা নির্বাচনের সময় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

আদর্শ বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সবশেষে, পরিমাপের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের ভুলও খুব বেশী পরিমাণে হয়। পরিমাপের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বা তার তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম ভুল করতে পারেন। শিক্ষামূলক অভীক্ষায় বা মানসিক অভীক্ষায় এই ধরনের ভুল খুব বেশী পরিমাণে হয়। এই জাতীয় ভুলকে বলা হয়, **তাৎপর্য নির্ণয়ের ভ্রান্তি** (error of interpretation)। এই ত্রুটি দূর করার জন্য অভীক্ষার একটা স্থির বিশ্লেষণ পদ্ধতি (standardized method) থাকার প্রয়োজন। অভীক্ষায় এই ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয়, আদর্শায়িত অভীক্ষা (standardized test)।

তা'হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাল অভীক্ষার চারটে গুণ থাকবে—(1) **যাথার্থ্য** (validity), (2) **নির্ভরতা** (reliability), (3) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (objectivity), এবং (4) **স্থির বিশ্লেষণ পদ্ধতি** (standardization)। সুতরাং, এই চারটে দিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শিক্ষামূলক বিকাশের পরিমাণের জন্য অভীক্ষা নির্বাচন করতে হবে।

অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ [Classification of Tests] :—

শিক্ষামূলক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ পরিমাণ করার জন্য বর্তমানে যে সব অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এই শ্রেণীগত বিভাগ থেকে এদের সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

শিক্ষাগত ও মানসিক অভীক্ষা

উদ্দেশ্যের দিক থেকে অভীক্ষাগুলোকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলো অভীক্ষা দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত পারদর্শিতার পরিমাপ করে থাকি। অর্থাৎ, শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণে আয়ত্ব করছে, বা কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন তারা হয়েছে, ইত্যাদি নির্ধারণ করা এই সব অভীক্ষার কাজ। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় **শিক্ষাগত অভীক্ষা (educational test)**। আবার, কতকগুলো অভীক্ষা দিয়ে আমরা বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়ার পরিমাপ করে থাকি। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় **মানসিক অভীক্ষা** (psychological test)। উদ্দেশ্যের দিক থেকে মানসিক অভীক্ষাগুলো অনেক বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ, শিক্ষামূলক অভীক্ষা দিয়ে, কোন বিশেষ

ব্যক্তির বিশেষ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু মানসিক অভীক্ষার দ্বারা আমরা সেই মানসিক ক্ষমতা বা প্রক্রিয়াকে পরিমাপ করি যা ব্যক্তির উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করে। সাধারণতঃ উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ সংখ্যামানের সাহায্যে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের পরিমাণকে প্রকাশ করে থাকি।

সাধারণ ক্ষমতার ও বিশেষ ক্ষমতার অভীক্ষা

আবার অভীক্ষাকে অন্য এক দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এক ধরনের অভীক্ষা আমরা ব্যক্তির শুধু জন্মগত সাধারণ ক্ষমতাকে পরিমাপ করি। বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় আমরা উল্লেখ করেছি, বুদ্ধি হ'ল মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতা মানুষের সমস্তরকম বৌদ্ধিক কাজেই প্রয়োজন হয়। এই সাধারণ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষাকে বলা হয় **বুদ্ধির অভীক্ষা** বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষা (intelligence test ; test of general mental ability)। বুদ্ধি ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন রকমের মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই সব বিশেষ ক্ষমতাকে পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা আছে, তাদের বলা হয় **বিশেষ ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষা** (aptitude test)। বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ পাঠ্যবিষয় আয়ত্ব করার জন্য শিক্ষার্থীদের সাধারণ বুদ্ধি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই বিশেষ ক্ষমতার অভীক্ষা দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের এই বিশেষ ক্ষমতাকে পরিমাপ করতে পারি।

অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

এছাড়া, আমরা বুদ্ধির অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, অভীক্ষাকে বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন, অভীক্ষার পদের (test item) প্রকৃতি অনুযায়ী অভীক্ষাকে দু'ভাগে শ্রেণীবিভাগ করা হয়—**ভাষামূলক অভীক্ষা** (verbal test) এবং **সম্পাদনী অভীক্ষা** (performance test)। আবার, অভীক্ষার প্রয়োগমূলতার (administrability) দিক থেকে তাদের দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে অভীক্ষার দ্বারা এক সঙ্গে কেবলমাত্র একজন শিক্ষার্থীর মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়, তাদের বলে **ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (individual test)। আর যে অভীক্ষার দ্বারা এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়, তাদের বলা হয় **দলগত অভীক্ষা** (group test)। তবে, অভীক্ষার এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ আমাদের আলোচনার দিক থেকে বিশেষ কিছু প্রয়োজনে আসবে না। এছাড়াও অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরও নানাভাবে তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। তাই তাদের আর উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন নেই।

বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষার বিবরণ [Description of Different Types of Tests] :—

আমরা এখানে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর অভীক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করব। তবে পূর্বেই আমরা বুদ্ধির অভীক্ষার সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি, তাই এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু আলোচনার প্রয়োজন নেই। শিক্ষামূলক অভীক্ষা, বিশেষ ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষা (aptitude test), সম্পর্কেই আমরা এখানে উল্লেখ করব।

শিক্ষামূলক অভীক্ষা [Educational test]—পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিক্ষামূলক অভীক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল—শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক বিকাশের পরিমাপ করা। এই ধরনের অভীক্ষাকে সাধারণতঃ বর্তমানে দু' ভাবে ভাগ করা হয়—**পারদর্শিতার অভীক্ষা** (achievement test) এবং **নির্ণায়ক অভীক্ষা** (diagnostic test)। পারদর্শিতার অভীক্ষার দ্বারা আমরা একটা মাত্র সাংখ্যমানের ভিত্তিতে কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ শিক্ষাগত বিকাশ হয়েছে, তা প্রকাশ করি। এই ধরনের অভীক্ষা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের (school subject) জন্য পৃথক হয়। যেমন, ইতিহাসের পারদর্শিতার অভীক্ষা (achievement test of History), গণিতের পারদর্শিতার অভীক্ষা (achievement test of mathematics), ইত্যাদি। আবার, অনেক সময় শ্রেণী অনুযায়ীও এদের পৃথক করা হয়। যেমন, পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাসের পারদর্শিতার অভীক্ষা, ষষ্ঠ শ্রেণী ইতিহাসের পারদর্শিতার অভীক্ষা, ইত্যাদি। অর্থাৎ, বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিষয়ের অভীক্ষার দ্বারা সে শ্রেণীর শিক্ষার্থী ঐ বিষয়ে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছে তা পরিমাপ করতে পারি। অন্যদিকে নির্ণায়ক অভীক্ষার দ্বারা আমরা বিশেষ কোন শিক্ষার্থীর কোন বিষয় আয়ত্ব করতে কি কি অসুবিধা হচ্ছে, তা নির্ণয় করা হয়। অবশ্য এই অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার ভাল দিকগুলোও নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ, এই ধরনের অভীক্ষায় একক সাংখ্যমানের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থী কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর করতে পারছে এবং কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর করতে পারছে না, সেগুলোই বেশী করে দেখা হয়। এই সব প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষার্থী কোন কোন অংশগুলো আয়ত্ব করতে পেরেছে এবং কোন অংশগুলো আয়ত্ব করতে পারে নি তা বুঝা যায়।

পারদর্শিতার অভীক্ষা ও নির্ণায়ক অভীক্ষা

আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষার (standardized achievement test) সাধারণতঃ বিষয় (school subject) কেন্দ্রীক জ্ঞান পরিমাণ করার চেষ্টা

করা হয়। ফলে এখানে প্রশ্ন বা অভীক্ষা পদ (test item) গুলো বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞানের উপর থাকে। যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য অভীক্ষা তৈরী করা হচ্ছে, সে শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের সমস্ত দিকে পারদর্শিতা পরিমাপ করার জন্ত এই ধরনের প্রশ্ন বা উদ্দীপকগুলো নির্বাচন করা হয়। যেমন, শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানে, বিভিন্ন যৌগের (compound) আনবিক সূত্র (molecular formula) লিখতে শিখে। তারা কতটা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে, তা পরিমাপ করার জন্ত নিম্নরূপ উদ্দীপক দেওয়া হয়।

পারদর্শিতার অভীক্ষা

নিম্নলিখিত যৌগগুলির আনবিক সূত্র লিখ—

(1) নাইট্রিক এসিড --

(2) নাইট্রিক অক্সাইড —

(3) সালফিউরিক এসিড —

(4) সোডিয়াম ক্লোরাইড—

(5) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড—

(6) হাইড্রোজেন সালফাইড —।

আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করার জন্ত বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে, এবং এই পদ্ধতি বিশেষ পরিশ্রম সাধ্য। কিন্তু, একবার যে কোন বিষয়ের একটা অভীক্ষা তৈরী করতে পারলে, তা সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

নির্ণায়ক অভীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দীপকগুলো একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়। এখানে বিশেষ বিষয়ের মূল ধারণাগুলোকে আরও বিশ্লেষণ করে, শিক্ষার্থীদের কোথায় ক্রটি আছে, তা নির্ণয় করা হয়। যেমন, অঙ্ক শিখতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের কি অসুবিধা হচ্ছে না দেখার জন্ত যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। আবার যোগ করতেই বা তার কি অসুবিধা হচ্ছে তা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার ব্যবস্থা করা হয়। স্কোনেলের (schonell) এর এমনি ধরনের যোগের নির্ণায়ক অভীক্ষার কিছু নমুনা সমস্যা নীচে দেওয়া হ'ল—

নির্ণায়ক অভীক্ষা

নীচে কতকগুলি সমস্যা দেওয়া আছে, যোগফল নির্ণয় কর:

(1) $1+1=$;	$0+0=$;	$2+2=$;
(2) $2+0=$;	$3+1=$;	$3+3=$;
(3) $1+6=$;	$4+0=$;	$4+4=$;
(4) $7+1=$;	$1+8=$;	$1+5=$;
(5) $2+5=$;	$3+2=$;	$1+4=$;

এই ধরনের সমস্যায় শিক্ষার্থীরা কোন গুলো সমাধান করতে পারছে, আর কোনগুলো করতে পারছে না, সেটাই বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। যে ধরনের

সমস্যা সমাধানে তার অসুবিধা হচ্ছে, সেই সমস্যা সংক্রান্ত ধারণা দেওয়ার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ভাবে, নির্ণায়ক অভীক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন অসুবিধা দূর করতে পারি।

বিশেষ ক্ষমতা বা সম্ভাব্য দক্ষতার পরিমাপ [Aptitude Test]:—

বিশেষ ক্ষমতা ও সম্ভাব্য দক্ষতা

মনোবিদ্ স্পিয়ার ম্যান যখন বললেন, মানুষের যে কোন রকম বৌদ্ধিক সম্পাদনের ক্ষেত্রে দু'ধরনের মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয় এবং এই উপাদানের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান, আর একটা বিশেষ উপাদান, তখন থেকে মানুষের কর্মসম্পাদনী বিশেষ উপাদানকে পরিমাপ করার জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা তৈরী করা হ'ল। এই সব অভীক্ষাকে বলা হয় বিশেষ ক্ষমতার অভীক্ষা (test of special ability)। কিন্তু বর্তমানে, এই সব অভীক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র, মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁরা মনে করেন, এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতা, সাধারণ মানসিক ক্ষমতার (বুদ্ধি) মত ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করে। সুতরাং, ব্যক্তির বিশুদ্ধ মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেয়ে, সেই ক্ষমতার জীবন বিকাশ করার সম্ভাব্যতাকে পরিমাপ করা অনেক বেশী লাভজনক। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কথা যদি বিবেচনা করি, তাহলে কোন বিশেষ ক্ষমতা তার কোন পাঠ্যবিষয়কে আয়ত্ব করতে কি পরিমাণে সহায়তা করবে, তা বিবেচনা করাই সুবিধাজনক। তাই আজকাল, শুদ্ধ ক্ষমতার (pure ability) পরিবর্তে ক্ষমতার সম্ভাব্যতাকে পরিমাপ করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা ব্যক্তিজীবনে যে সম্ভাব্যতা নির্ণয় করে তাকেই বলা হয় সম্ভাব্য দক্ষতা (aptitude)। মনোবিদ্যায় এই সম্ভাব্য দক্ষতাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—"*a condition or set of characteristics regarded as symptomatic of an individual's ability to acquire with training some knowledge, skill or set of responses such as the ability to speak to produce music etc.*"

সম্ভাব্যতার অভীক্ষা

মানুষের দক্ষতার এই সম্ভাব্যতা পরিমাপ করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরী হয়েছে, যাদের বলা হয় সম্ভাব্য দক্ষতার অভীক্ষা (aptitude test)। যেমন, স্টেনকুইস্ট্ এর যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপক অভীক্ষা (Stenquist's mechanical aptitude test), সিসোর এর সংগীতের দক্ষতা পরিমাপক অভীক্ষা (Seashore's musical ability test), ইত্যাদি এই শ্রেণীর অভীক্ষা।

যান্ত্রিক দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির যান্ত্রিক দক্ষতা কি পরিমাণে আছে, ও প্রশিক্ষণের দ্বারা তার কতটুকু বিকাশ হ'তে পারে তা পরিমাপ করা যাবে। সংগীতের দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির ঐদিকে কতটা উন্নতি হবে তা পরিমাপ করা যাবে। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক দক্ষতার অভীক্ষা দ্বারা বর্তমানে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির দক্ষতা কোন দিক থেকে আসতে পারে তা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। এদের বলা হয় পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা সমষ্টি (Differential test battery)। এই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করে ব্যক্তির বিশেষ কোন দিকে ঝোঁক আছে, তা নির্ণয় করতে পারি। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ায় ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায়, এই সব অভীক্ষা আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

অনুরাগের অভীক্ষা [Test for Interest] :—

শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের অনুরাগের পরিমাপ করতে পারলে, আমাদের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে এবং তাদের শিক্ষামূলক নির্দেশনা দিতে সুবিধা হয়। মনোবিদ্‌গণ শিক্ষার্থীদের অনুরাগ (interest) পরিমাপ করার জন্য বিশেষ এক ধরনের অভীক্ষার প্রবর্তন করেছেন, যাদের বলা হয় অনুরাগ নির্দেশক অভীক্ষা (interest inventories)। এই ধরনের নির্দেশ অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আছে, তা নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে অনুরাগ পরিমাপের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে স্ট্রং (strong)-এর অভীক্ষা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কুডারের (kuder) অভীক্ষাও বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

অনুরাগের নির্দেশক

আমরা সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও মানসিক অভীক্ষাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এছাড়া, বুদ্ধির অভীক্ষা, ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপের অভীক্ষাও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বুদ্ধির অভীক্ষা ও ব্যক্তিসত্বার অভীক্ষার সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বিদ্যালয়ে এই সব অভীক্ষা প্রয়োগ করার সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই সব অভীক্ষা থেকে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পাই, তার উপর সম্পূর্ণভাবে সব সময় নির্ভর করা যায়। তাই অভীক্ষালব্ধ ফলকে অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সবসময় বিচার করতে হবে। তাদের ফলকে এককভাবে বিচার করে, শুধুমাত্র তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমাদের ভুল থেকে যেতে পারে।

আলোচনা

প্রশ্নাবলী

1. What are educational and Psychological tests? Discuss the various characteristics of good tests? [পৃঃ ২১২-২১৬]
2. What are educational and Psychological tests? Discuss the usefulness some of these tests in the field of education. [পৃঃ ২১২-২১৪ ; ৫১৮-২২১]
3. Write notes on the following :
   (a) Validity [পৃঃ ২১৪-২১৬];
   (b) Aptitude test [পৃঃ ২২০-২২১].